বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

পঞ্চম খণ্ড

মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য
শ্রীভূমি মুদ্রণিকা
৭৭ লেনিন সরণী
কলকাতা-১৩।

সূচীপত্র

(পঞ্চম খণ্ড)

প্র স্তা ব না

পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হল। কথা ছিল চতুর্থ খণ্ডেই গ্রন্থ সমাপ্ত হবে। (প্রকাশক অবশ্য জেনেছিলেন, বই দুখণ্ডের বেশি হচ্ছে না)। ঐ খণ্ডের ভূমিকায় পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে, আর একটি খণ্ডকে প্রশ্রয়ের ছাড়পত্র দেবার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। হায়, সেই একই কাজ পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকাতেও করতে হচ্ছে, কেননা এই খণ্ড ঠাসা সওয়া-পাঁচশো পৃষ্ঠাতে পৌঁছেও দেখা গেল—প্রয়োজনীয় বহু উপাদান সঞ্চিত হয়ে আছে। পাঠকের ধৈর্যের উপর এই অত্যাচারের জন্য আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত। একমাত্র ভরসা, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কৌতূহল কখনই ধৈর্যহারা হয় না, এবং পাঠকের সেই দুর্বলতার কথা আমি জানি।

অথচ ষষ্ঠ খণ্ড প্রস্তুত না করেও উপায় নেই, কারণ সেই খণ্ডের উদ্দিষ্ট বস্তু—জাতীয় ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান। বিবেকানন্দ তাঁর সমকালে তো নিশ্চয়ই, উত্তরকালেও ভারতের মনোজীবনের সর্বপর্যায়ে অনুপ্রবিষ্ট। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সেবা, ত্যাগ, সংগ্রাম—সর্বত্রই তাঁর জীবন ও চিন্তার অস্তিত্ব। যেখানে শুভশক্তি সক্রিয় সেখানেই বিবেকানন্দের বিস্তার। বিবেকানন্দের ব্যাপক প্রভাবের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয় কিন্তু একটা খসড়া বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা দরকার। জানা দরকার, কোথায় তিনি গৃহীত, আর কোথায় প্রত্যাখ্যাত। এই জানাটা একটা মহৎ শিক্ষা। সেই শিক্ষা দেবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে যাঁরা সেই শিক্ষা দেবেন, সেই সকল সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের জন্য, সেইসঙ্গে আদর্শবাদী কর্মী মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিতে পারি। ষষ্ঠ খণ্ডে সেই চেষ্টাই করব।

বর্তমান খণ্ডে গুরুত্ব পেয়েছে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে স্বামীজীর দানের কথা। এইসকল বিষয়ে স্বামীজীর দিগ্‌-নির্ণায়ক বক্তব্যের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সচেতনতা আছে কিনা সন্দেহ। ধরা যাক, সত্যই কজন জানেন—স্বামীজী পত্র-পত্রিকার প্রবর্তনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন; শুধু তাই নয়, তাঁর প্রবর্তিত কয়েকটি ইংরাজি ও বাংলা সাময়িকপত্র সমকালে ও পরবর্তীকালে নিজস্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের সমাদব পেয়েছে? কয়েক বৎসর আগে যখন আমি 'সাংবাদিক স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে উদ্বোধন ও প্রবুদ্ধ ভারতে প্রবন্ধ লিখেছিলাম তখন অনেকেই কটাক্ষে তাকিয়েছিলেন—বীরপূজায় বাড়ানো হাতের দৈর্ঘ্য দেখতে। তবু একথা কি করে অস্বীকার করা যাবে—মাসিক উদ্বোধন পত্রিকা এখন বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত, সুসম্পাদিত ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় পত্রিকা? এবং সেটি নিয়মিত প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন বাংলা মাসিক পত্রিকা! (পত্রিকাটি গোড়ায় অল্পদিন পাক্ষিক ছিল)। একই ধরনের কথা সর্বভারতীয় ইংরাজি মাসিকের ক্ষেত্রে প্রবুদ্ধ ভারত সম্বন্ধে বলা যাবে। এই পত্রিকাদুটির প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দই। প্রখ্যাত ব্রহ্মবাদিন পত্রিকার সূচনাও তিনিই করিয়েছিলেন। অন্যান্য দিকের মতো, পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের আন্দোলনের সর্ব-ভারতীয় রূপ লক্ষণীয়। আরও লক্ষ্য করি, অন্যত্র যেমন এখানেও তাই—বিবেকানন্দ কিছু মানুষের রক্ত নিংড়ে, তার সঙ্গে নিজের রক্ত যোগ ক'রে, পত্রিকাগুলির তলায় ঢেলে, তাদের বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

সাময়িকপত্রের প্রবর্তকরূপে বিবেকানন্দের ভূমিকা একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বিবেকানন্দের জীবনের আর একটি দিকও কি আমাদের মনোযোগ যথেষ্ট আকর্ষণ করেছে—চারুশিল্প সম্বন্ধে তাঁর পাগল ভালবাসার দিক? এই উন্মাদ শিল্পপ্রেমিকের শিল্প-

দর্শন যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি দৃষ্টি-উন্মোচক। একালে ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে বিবেকানন্দের ভূমিকা অগ্রগামী চিন্তানায়কের। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য যেমন গভীর ও তত্ত্বগ্রাহী তেমনি জীবনধর্মী। সেকালের শিল্পবিষয়ক দীন চিন্তার পাশে স্বামীজীর চিন্তা—সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল। বিবেকানন্দের শিল্প-চিন্তার অধ্যায়ে তথ্যযোগে দাবি করেছি—ঐ কালের বিখ্যাত ভারতীয়দের মধ্যে কেউই তাঁর তুল্য ব্যাপকভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তোর শিল্পনিদর্শন সরাসরি দেখেন নি। ভারতবর্ষে তখনকার দিনে শিল্পচিন্তার চেহারা কি ছিল—রবিবর্মা, হ্যাভেল প্রভৃতি কী করেছিলেন বা বলেছিলেন—সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য সমকালীন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে পরিবেশন করেছি। সেই পটভূমিকায় বিবেকানন্দের বক্তব্য ছিল চমকপ্রদ অথচ সত্যসন্ধ, তাই নানা প্রণালীপথে সে-সকল কথা শিল্প-সমালোচক ও শিল্পীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিলই। প্রসঙ্গটি একটি অধ্যায়ে আলোচিত।

আর একটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু স্বামীজীর সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যদর্শন। এসব সম্পর্কে ইদানীং অল্পবিস্তর আলোচনা হচ্ছে। স্বামীজীর সাহিত্যের রস-বিশ্লেষণের চেষ্ট সেসব জায়গায় দেখা যায়। রসবিশ্লেষণে আমার আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু গ্রন্থোদ্দেশ্য অনুযায়ী আমি প্রধানতঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর সাহিত্য ও সাহিত্যদর্শনকে স্থাপন করে বুঝতে চেষ্টা করেছি; তদনুযায়ী সমকালীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। প্রতিক্রিয়া প্রধানাংশে তিক্ত ও কটু। গদ্যসাহিত্যের একাংশে তাঁর পথিকৃতের ভূমিকা নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। সেখানে আবার দেখা গিয়েছিল বিবেকানন্দের বিজয়ী পৌরুষের আকার। তাই বলে বিবেকানন্দের সাধুগদ্য কম মূল্যবান নয়। সাধুগদ্য থেকে চলিত গদ্যে অবতীর্ণ হবার কালে তাঁকে দ্বিধান্বিত হতে হয়েছিল—সে ইতিহাস কৌতূহলকর। বিবেকানন্দের ব্যাপক সাহিত্যপাঠের (অন্যান্য পাঠের সঙ্গে) একটা হিসাব দেবার চেষ্টা করেছি প্রাসঙ্গিকভাবে, এবং দুটি ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকার কথা বলতে চেয়েছি—এক, গদ্যে বীররসের সৃষ্টি, দুই অজস্র প্রবচনের নির্মাণ।

সঙ্গীততাত্ত্বিক বিবেকানন্দের কিছু পরিচয় এই অধ্যায়ে আছে।

বিজ্ঞান—বিবেকানন্দের কাছে মানবসংস্কৃতির মহান বিস্তার। 'প্যারিস কংগ্রেস' অধ্যায়ের অন্তর্গত জগদীশচন্দ্র বসু-প্রসঙ্গে স্বামীজীর বিজ্ঞানপ্রীতির কিছু পরিচয় মিলবে। প্যারিসে ডাঃ বসুর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়। জগদীশচন্দ্র তখন বৈজ্ঞানিক সাফল্যের দ্বারা পাশ্চাত্ত্যজগতে চমক সৃষ্টি করেছেন। সে সম্বন্ধে অনেক নূতন সংবাদ দিয়েছি; সেইসঙ্গে নিবেদিতার পত্র ও রোমা রোলাঁর ডায়েরি ইত্যাদি থেকে বিবেকানন্দ-বসু সম্পর্কের বিষয়ে অজানিত সংবাদ। প্যারিসের বিদগ্ধ-মহলে বিবেকানন্দের মর্যাদার অবস্থান, প্যারিস কংগ্রেসে তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিকের ভূমিকা ইত্যাদি সংবাদের সঙ্গে কয়েকটি চমৎকার স্মৃতিকথা এই অধ্যায়ে যুক্ত হয়েছে।

বিবেকানন্দের বিজ্ঞানপ্রীতি দুইখাতে প্রবাহিত—তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। অদ্বৈতবাদী তিনি, সত্যের সন্ধানে আপসহীন, জনগণের কুসংস্কারমুক্ত জীবনের জন্য বিজ্ঞানচেতনা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাই বিজ্ঞানের মূলগত তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ছিল ঐকান্তিক আগ্রহ। আবার তিনি ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতি দেখে এদেশে যন্ত্রশিল্পায়নের সমর্থক। যন্ত্রের কলুষ অপেক্ষা যন্ত্রের গতিশীল সৃষ্টিশক্তির দিকেই তাঁর বেশি নজর ছিল। টাটা সম্পর্কিত অধ্যায়ে সে-বিষয়ে অনেক সংবাদ আছে। ঐ অধ্যায়ে আরও দেখা যাবে, লর্ড কার্জনের ভারতে বিজ্ঞান-শিক্ষা সংকুচিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জামসেদজী টাটা বিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিরাট দানের প্রস্তাব করে কি রকম চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, এবং বিবেকানন্দ তাঁকে কি রকম

সমর্থন জানিয়েছিলেন। এইক্ষেত্রে স্বামীজীর অনুমোদনে নিবেদিতা টাটার পক্ষে যে-সকল কাজ করেছিলেন, তার কিছু উল্লেখ নিবেদিতার অপ্রকাশিত পত্র থেকে করা হয়েছে।

ভারত-ইতিহাসের দুই বিরাট পুরুষ—বিবেকানন্দ ও তিলকের সম্পর্কের উপর রচিত হয়েছে দীর্ঘ একটি অধ্যায়। সমকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের অনেক সংবাদ এখানে আছে (যথা, শিবাজী উৎসব, গণপতি উৎসব, রমাবাঈয়ের উৎসাহিত ভারত-কুৎসা)। তিলকের ক্রমপরিবর্তিত উদারতর ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা ঐ অধ্যায়ে এসেছে।

ভারতের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের কালে ভারতীয় সংহতি প্রশ্নে বিবেকানন্দের কথা ও কাজের বিষয়ে জানতে অনেকে আগ্রহী হবেন। সে সম্বন্ধে যথাসম্ভব তথ্য সরবরাহের চেষ্টা করেছি একটি অধ্যায়ে। বিবেকানন্দের ভারতচেতনার বিশালতা, জাতীয় সংহতি-ক্ষুণ্নকারী শক্তিগুলি সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ সচেতনতা, আমাদের বিস্মিত করে। ভারতের জাতীয় সমস্যার চেহারাটা তাঁর পুরো জানা ছিল, আর অদ্ভুত ছিল তাঁর নিকট ও দূর-দৃষ্টি। উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের ভেদকারী শক্তিগুলির বিষয়ে তিনি কি-ভাবে সতর্ক করেছিলেন, আর্যসমাজের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য কী ছিল, হিন্দু-শিখ সমস্যার কাঁটাকে কিভাবে উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন—সমকালীন ইতিহাসের বহু অজানা সংবাদের সঙ্গে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এখানে বিবেকানন্দ জাতীয় নায়ক। হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় বিবেকানন্দের 'নীরবতার' বিরুদ্ধে যাঁরা 'সরব', তাঁরা জেনে দুঃখিত হবেন যে, এ-সম্পর্কেও বিবেকানন্দের জীবনে ও চিন্তায় আশ্চর্য প্রগতিশীল আলোক ছিল। 'ইসলাম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ' অংশটি মনে হয়, প্রচলিত অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সাহায্য করবে।

জাপানী শিল্পতাত্ত্বিক কাকুজো ওকাকুরা বিশ শতকের গোড়ায় এদেশে আসেন, এবং রাজনীতিতে, বিশেষতঃ শিল্পে, কিছু প্রভাব বিস্তার করেন। তদনুযায়ী তিনি প্রাসঙ্গিক বিবরণী সমূহে উল্লিখিত। কিন্তু তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দের সূত্রেই ভারতে আসেন, একথা অনেকেই জানেন না। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক একটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। হিমালয়ে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপনে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারের ভূমিকা নিয়েও অধ্যায় আছে। এঁদের দুজনের নিঃসীম ত্যাগ স্বামীজীর 'হিমালয় স্বপ্ন'কে সফল করেছিল। এই অধ্যায়ে মুদ্রিত হয়েছে শ্রীমা সারদাদেবীর একটি পত্র, যার মধ্যে মনস্বিতা ও মুক্তদৃষ্টির আশ্চর্য প্রকাশ। পত্রটি দেখিয়ে দেয়—রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সর্বদাই বিশ্বতোমুখ। আবার তা ভারতমুখীও বটে। তারই রূপ দেখা যাবে—"শেষ অভিযান পূর্ববঙ্গে"-এর মধ্যে। বিবেকানন্দ পূর্ববঙ্গে শেষবারের মতো তাঁর 'সমরনীতি' নিয়ে বজ্ররবে বিদীর্ণ হয়েছিলেন।

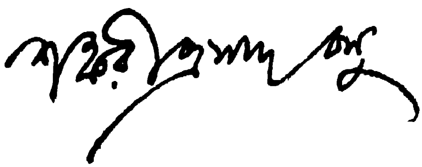
কিন্তু সমস্ত গরিমাই বোধহয় আচ্ছাদিত হয়ে যায় বিবেকানন্দের মৃত্যুর হিরণ্ময়পাত্রের দ্বারা। সাধক যে-মৃত্যুর জন্য তপস্যা করে, সাহিত্য যে-মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে, সঙ্গীত যে-মৃত্যুর সমে স্তব্ধ থাকে—বিবেকানন্দ সেই মৃত্যু-পরিণামকে পেয়েছিলেন। জীবনের আলোকতরঙ্গে দুলতে-দুলতে বিবেকানন্দ কিভাবে আলোকহীন আলোকে বিলসিত ছিলেন, কিভাবে মহাপূর্ণ মহাশূন্যে মিলাইল, সে-কাহিনী লেখার সাধ্য এই তথ্যসন্ধানী এবং তাতেই আবদ্ধ লেখকের নেই। আমরা পক্ষে যা সম্ভব তাই করেছি—প্রাপ্ত সংবাদের বিন্যাস—বাকিটা রইল পাঠকের কল্পনা ও অনুভূতির রাজ্যে।

বর্তমান খণ্ডের জন্য কিছু তথ্য দিয়েছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মচারী শংকর এবং অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। কোন্ তথ্য দিয়েছেন তা গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

যাঁদের নিরন্তর শুভেচ্ছা ও উৎসাহ আমার প্রেরণার কারণ হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ; এবং বহুদূরে থেকেও এই কাজের প্রতি যিনি সমর্থন জানাতে ভোলেন না সেই স্বামী চেতনানন্দ। আমাব পূজ্য শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহাশিস সর্বদাই পেয়েছি।

গ্রন্থ প্রস্তুতকালে পূর্ববৎ সাহায্য করেছেন শ্রীবিমল ঘোষ। ধারাবাহিক সহায়তা করে গেছেন শ্রীমতী মায়া বসু। প্রকাশক-বন্ধু শ্রীসুনীল মণ্ডল ঝুঁকি নিয়ে এই ব্যয়সাধ্য বইটি প্রকাশ করে যাচ্ছেন—তিনি আর একটি খণ্ড প্রকাশের দুশ্চিন্তার অধীন হলেন। শিল্পী-বন্ধু শ্রীগণেশ বসু যথারীতি চিত্রসজ্জা করে দিয়েছেন। শ্রীমান অনিল বেরা ও শ্রীমান অশোক আইচের কাছ থেকে প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি।

এঁদের শুভকামনা কবি।







স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর কয়েকজন গুরুভাই ও শিষ্য
(বাম দিক থেকে) ত্রিগুণাতীত (দাঁড়িয়ে), শিবানন্দ, বিবেকানন্দ, তুরীয়ানন্দ, ব্রহ্মানন্দ। (মেঝেয়) সদানন্দ

উ ন ত্রিং শ ৎ অ ধ্যা য়

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সাময়িক পত্র

॥ ১ ॥ ব্রহ্মবাদিন ও আলাসিংগা পেরুমল

[এক]

স্বামীজীর বহুমুখী চিন্তা ও কর্মের অনেকগুলি দিকের আলোচনা অল্পবিস্তর হলেও, আমরা যতদূর দেখেছি, একটি বিষয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মূল্য দিয়ে আলোচনা করা হয়নি—সাময়িকপত্র প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা। অথচ সামান্য সন্ধানেই দেখা যায়, এই ব্যাপারটি তাঁর মনের অনেকখানি অংশ অধিকার করেছিল।

এক কথায় বলতে গেলে, স্বামীজী ভারতবর্ষে তিনটি সাময়িকপত্রের প্রবর্তক, এবং তাঁর জীবনকালের মধ্যে পত্রিকাগুলি বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। এছাড়া ভারতবর্ষের বাইরেও ক্ষুদ্রাকারে পত্রিকা বার করার চেষ্টা তাঁর ভাবানুরাগীরা করেছেন। পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রয়াস-সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট বেদান্ত-প্রচারক পত্রিকা পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে বেরিয়েছে, যাদের কোনো-কোনোটি বহু বৎসরের আয়ু পেয়েছে। ঠিক বর্তমানে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পত্রিকার সংখ্যা কম নয়, যাদের কতকগুলির প্রচারসংখ্যা যথেষ্ট।১

---

১ রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় কেন্দ্রগুলি থেকে প্রকাশিত যেসব পত্রিকা এখন চালু আছে, সেগুলি হল :

প্রবুদ্ধ ভারত (১৮৯৬; মায়াবতী থেকে প্রকাশিত; ইংরাজি মাসিক); উদ্বোধন (১৮৯৯; কলকাতা থেকে; বাংলা মাসিক; গোড়ায় ছিল পাক্ষিক); বেদান্ত কেশরী (১৯১৪; মাদ্রাজ থেকে ইংরাজি মাসিক); বেদান্ত ফর ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট (১৯৫২; লণ্ডন থেকে; ইংরাজি দ্বৈমাসিক); বেদান্ত (১৯৬২; গ্রেত্জ, প্যারিস থেকে; ফরাসি ত্রৈমাসিক); বুলেটিন অব দি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (১৯৫০; কলকাতা থেকে; ইংরাজি মাসিক); প্রবুদ্ধ কেরলম (১৯১৬; ত্রিচুড় থেকে; মলয়ালম মাসিক); জীবন বিকাস (১৯৫৭; নাগপুর থেকে; মরাঠি মাসিক); শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়ম (১৯২১; মাদ্রাজ থেকে; তামিল মাসিক); শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা (১৯৪৪; মাদ্রাজ থেকে; তেলেগু মাসিক); বিবেক জ্যোতি (১৯৬৩; রায়পুর থেকে; হিন্দী ত্রৈমাসিক); সমাজ শিক্ষা (১৯৫৭; কলকাতা নরেন্দ্রপুর থেকে; বাংলা মাসিক)।

বন্ধ হয়ে গেছে :

ব্রহ্মবাদিন (মাদ্রাজ থেকে); দি মর্নিং স্টার (পাটনা থেকে; ইংরাজি সাপ্তাহিক); সমন্বয় (মায়াবতী থেকে; হিন্দী; স্বামী মাধবানন্দ এবং বিখ্যাত হিন্দী কবি 'নিরালা' এর সম্পাদক ছিলেন); মেসেজ অব দি ইস্ট (প্রথমে বস্টন, পরে লা ক্রেসেণ্টা, কালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত হত; এই কেন্দ্র পরে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত থাকেনি; ইংরাজি); ভয়েস অব ফ্রিডম (১৯০৯; সানফ্রান্সিস্কো থেকে; প্রবর্তক স্বামী ত্রিগুণাতীত; ১৯১৬ সাল থেকে বন্ধ হয়ে যায়); দি ভয়েস অব ইণ্ডিয়া (১৯৩১; সানফ্রান্সিস্কো থেকে; ইংরাজি মাসিক); বেদান্ত অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট (১৯৬২: এই পত্রিকাটির সঙ্গে ক্রিস্টোফার ইশারউড প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা জড়িত ছিলেন; ইংরাজি দ্বৈমাসিক); বেদান্ত প্যাসিফিক; সুটিং স্টার (বোম্বাই থেকে ইংরাজি মাসিক, সম্পাদক জগতিয়ানী)।

রামকৃষ্ণ সংঘের বাইরে থেকে প্রকাশিত, বর্তমানে প্রচলিত পত্রিকাগুলির মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বাংলা মাসিক বিশ্ববাণী (১৯২৬) সুপরিচিত। ধর্মচক্রম্ (জনপ্রিয় তামিল মাসিক; তিরুপ্পরাইত্তুরাই-এর শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবনম্ থেকে প্রকাশিত) তুলসী সুগন্ধম্ (কেরালার ওট্টাপালম

পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে স্বামীজীর ইচ্ছার সূত্রপাত ঠিক কোন্ সময়ে হয়েছিল, তার সঠিক সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়; তবে সহজেই বোঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রচারের সংকল্প যখন তিনি গ্রহণ করলেন, তখন থেকেই প্রচার-বাহন পত্রিকার কথা তাঁর মনে উঠেছিল। ভারতে নবোদ্ভূত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত-প্রচারে পত্রিকার বড় ভূমিকার রূপ তিনি বাল্যকাল থেকেই দেখেছেন। আবার ঐসব পত্রিকার শূন্যগর্ভতার রূপও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি দেখেছিলেন—পাশ্চাত্ত্যপন্থায় ও পাশ্চাত্ত্য বিষয়ে শিক্ষিত কতকগুলি লোকের সাম্প্রদায়িক বা স্বার্থগত চীৎকার কিভাবে পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে পড়ছে, যার মধ্যে কাজের আহ্বান নেই, আছে শুধু কথার রাশি—জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন যে-পত্রিকাগুলি জনসাধারণের মতপ্রকাশের ভঙ্গি করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ এহেন প্রাণহীন সংবাদপত্রের কোলাহলকে ঘৃণা করেছিলেন, আবার সেইসঙ্গে তিনি জানতেন, ভারতীয় সভ্যতার বিকৃত অথবা আংশিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তার প্রাণসত্যকে তুলে ধরতে সত্যসন্ধ পত্রিকার দরকার কতখানি। আমেরিকায় থাকাকালেই ভারতবর্ষের জন্য বেদান্ত-আন্দোলনের সমর্থক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে। স্বামীজী সংবাদপত্রের সংবর্ধনা যে-পরিমাণে পেয়েছিলেন, সেই পরিমাণেই সংবাদপত্রে তাঁর মত বা চরিত্রকে বিকৃত করার চেষ্টাও দেখেছিলেন। ভারতবর্ষের কতকগুলি কাগজ তাঁর মতের যথেষ্ট পার্বালিশিটি দিলেও, স্বামীজী জানতেন, সংবাদপত্রের এই সমর্থন ততক্ষণ বজায় থাকবে যতক্ষণ সংবাদপত্রের মনোমত তিনি—কিন্তু মতপার্থক্য আসবেই। সেক্ষেত্রে এই সকল পত্রপত্রিকার সমর্থন পেয়ে যেতে হলে তাঁকে নিজের মতের স্বাধীনতা খর্ব করতে হবে। সেটা নিশ্চয় তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়! সুতরাং, বেদান্ত-আন্দোলনের মুখপত্র অবশ্যই চাই।

পত্রিকা-প্রকাশে স্বামীজীর **সক্রিয় ইচ্ছার** সূত্রপাত পাশ্চাত্ত্যে হিন্দুধর্মের আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করার পর থেকেই। তাঁর কীর্তিকথা সংবাদপত্র-মারফত ভারতে পৌঁছে প্রবল আবেগের সৃষ্টি করেছিল, সেই ভাবাবেগকে নিছক বন্দনাগানের মধ্যে নিঃশেষিত হতে দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করতে চাইলেন। সংঘ, এবং সংঘের মুখপত্র-প্রতিষ্ঠায় তাই আগ্রহী হলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর মনে প্রথমেই সেই মানুষটির মুখ ভেসে উঠল, যিনি তাঁর আমেরিকাগমনের নিমিত্ত হয়েছিলেন—আলাসিঙ্গা পেরুমল। ধন্য চরিত্র! রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে অক্ষয় স্থানের অধিকারী এই মানুষটি বিবেকানন্দের

থেকে প্রকাশিত মলয়ালম মাসিক), বিবেকদীপ (কলকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির বাংলা ত্রৈমাসিক), আশ্রম (কলকাতার বাংলা সাপ্তাহিক), বিবেক ভারতী (হুগলী ইটাচুনার বাংলা ত্রৈমাসিক), ভাবমুখে (বরাহনগর রামকৃষ্ণ সেবায়তন থেকে প্রকাশিত); শ্রীমা সারদা (লিলুয়া শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ থেকে) ইত্যাদি পত্রিকার কথা জানা যায়। কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্র একাধিক পত্রিকা চালান। বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, কলকাতা, প্রকাশ করেন বিবেক জীবন। বিবেকানন্দ কেন্দ্র ব্রহ্মবাদিনের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়েছে, বেরুচ্ছে বাঙ্গালোর থেকে; ইংরাজি পত্রিকা। এঁরাই বার করছেন যুবভারতী (ইংরাজি মাসিক, মাদ্রাজ), কেন্দ্রভারতী (হিন্দী মাসিক, নয়াদিল্লী)।

জাপানী পত্রিকাও আছে। ১৯৫৯ সাল থেকে একটি জাপানী মাসিক পত্রিকা বেরুচ্ছে; প্রকাশক টোকিওর নিকটবর্তী জুসি-তে অবস্থিত নিপ্পন বেদান্ত কিয়োকাই [Vedanta Society of Japan]। পত্রিকার নাম—ফুমেৎসু নো কোতবা [*Fumetsu No Kotaba* = The Universal Gospel]. জাপানের ওশাকা থেকেও এই ভাবের একটি পত্রিকা বেরোয়।

এই তালিকা অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়। রামকৃষ্ণ ভাবধারার অনুগামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক যে অজস্র প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁরা নিয়মিত ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক পত্রিকা বার করেন, বিশেষ সংখ্যাও বার করেন—তাদের উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এই ভাবধারার ছোটখাট সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকা প্রায়ই বেরোয়, কম-বেশি আয়ু তাদের।

পত্রপত্রিকার এই তালিকা রচনায় আমি রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী শঙ্করের সাহায্য পেয়েছি।

বিদেশগমনের প্রধান উদ্যোক্তা এবং বিবেকানন্দ-আদিষ্ট প্রধান বেদান্ত-পত্রিকার পরিচালক-সম্পাদক। ভগিনী নিবেদিতা ভিন্ন স্বামীজীর কাজে এত বড় ভূমিকা স্বামীজীর আর কোনো শিষ্যের আছে কিনা সন্দেহ, এবং সেইজন্যই নিবেদিতার কাছে—"No one like him, Dear Alasinga !" [মিস ম্যাকলাউডকে; ৩১.৮.১৯০৪]।

আর একটি ব্যাপারে গোটা ভারতবর্ষের অপরিসীম ঋণ আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছে—তাঁকে সম্বোধন করেই স্বামীজীর অগ্নিময় পত্রের অধিকাংশ লিখিত—ভারতবর্ষ তার আত্ম-বোধ ও আত্মপ্রসারের মহাবাণী যে-পত্রগুলি থেকে সংগ্রহ করেছিল তার সংগ্রামের কালে।

পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা স্বামীজীর মতো আলাসিঙ্গাও অনুভব করেছিলেন। স্বামীজীর কাছে সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামীজী সে-ইচ্ছার যৌক্তিকতা স্বীকার করেও গোড়ায় মানবসেবামূলক কর্মের অধিক মূল্যের কথা লিখে পাঠান। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮ মে, চিকাগো থেকে আলাসিঙ্গাকে উদ্দীপনাময় এক চিঠিতে ঐ কথা লেখেন :

"আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই। তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করে একটি ফণ্ড খুলবার চেষ্টা করো। শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা-নির্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত করো। গোটাকতক ম্যাজিক-লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় করো। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব, অনুন্নত, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো করো; তাদের প্রথমে ধর্মউপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক-লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন করো। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাদের ভিতর জেবলে দাও। আর ক্রমশঃ এই সংঘ বাড়াতে থাকো—ওর পরিধি বাড়তে থাকুক। তোমরা যতটুকু পারো, করো। নদীতে যখন জল থাকবে না, তখন পার হব বলে বসে থেকো না। **পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতির পরিচালন ভাল সন্দেহ নেই; কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা অপেক্ষা প্রকৃত কার্য, যতই সামান্য হোক, অনেক ভাল।**...একটি কুটীর ভাড়া লও এবং কাজে লেগে যাও। **পত্রিকাদি গৌণ, ইহাই মুখ্য।** যে-কোনোরূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্র লোকের মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করতেই হবে। কার্যের সামান্য আরম্ভ দেখে ভয় পেয়ো না, কাজ সামান্য থেকেই বড় হয়ে থাকে। সাহস অবলম্বন করো। নেতা হতে যেও না, সেবা করো।"

এই পত্রের রচনাভঙ্গি থেকে মনে হয়, আলাসিঙ্গা সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে কোনো অভিপ্রায় ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন। স্বামীজী সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে সেবা ও শিক্ষাবিস্তারের অধিক মূল্যের বিষয়ে অধিক জোর দিয়েছেন। কিন্তু এর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই দেখতে পাব, স্বামীজীই আলাসিঙ্গাকে পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে অনুরোধ জানাচ্ছেন, যা ক্রমে তাগিদে পরিণত হবে। স্বামীজীর মনোভাবের এই ঈষৎ দিক-পরিবর্তনের কারণ কি?

যতদূর মনে হয়, স্বামীজী, আলাসিঙ্গা ও মাদ্রাজী ভক্তগণের প্রকৃতি ও সামর্থ্যসীমা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই আর একবার চিন্তা করে নিয়েছিলেন। যে মানবসেবা ও দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কথা তিনি ভাবছিলেন, সে-কার্য সিদ্ধ করার উপযোগী মানুষ সম্ভবতঃ আলাসিঙ্গারা ছিলেন না। আলাসিঙ্গা ধর্মপ্রচারে উৎসাহী। এ-ব্যাপারে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করতে পারেন। আলোচনা-চক্র, প্রচার, জনসংযোগ, পত্রিকা ও পুস্তিকা-প্রকাশ—এ সকল তাঁর প্রিয় কার্য। স্বামীজী সে-কথা বুঝে আলাসিঙ্গাকে তাঁর স্বধর্মেই শেষ-পর্যন্ত নিয়োগ করলেন। আমরা দেখতে পাব, আলাসিঙ্গা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই 'স্বধর্মে' নিরত ছিলেন।

এ ছাড়া, শ্রীমতী লুই বার্কের গবেষণা অনুযায়ী বলা যায়—১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে স্বামীজীর মনে বেদান্তকে বিশ্বধর্ম করে তোলার ইচ্ছা জাগে। মনে হয়, তদনুযায়ী ঐ বেদান্তের ভারতীয় প্রচার-পত্রিকার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন ও সে-বিষয়ে আলাসিঙ্গাকে উৎসাহ দেন।

[দুই]

এইখানে পত্রিকা-বিষয়ক বর্ণনা কিছু সময়ের জন্য থামিয়ে আমরা আলাসিঙ্গার জীবন-তথ্যের মধ্যে অল্পভাবে প্রবেশ করতে চাই। স্বামীজী কেন পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন, তা এই জীবনতথ্যের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হবে।

দুঃখের বিষয়, আলাসিঙ্গার জীবন সম্বন্ধে বেশী উপাদান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেছে—(১) তাঁর দেহত্যাগের পরে 'ব্রহ্মবাদিনে' প্রকাশিত শোক-প্রবন্ধে; (২) 'দিনমণি' পত্রিকার ১৯৩৮ বার্ষিক সংখ্যার একটি প্রবন্ধে ('বেদান্ত কেশরী'তে ডিসেম্বর ১৯৪১, অনূদিত); (৩) 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ১৯৪৭, অগস্ট সংখ্যায় আলাসিঙ্গার নাতি এম জি শ্রীনিবাসন-এর প্রবন্ধে।

আলাসিঙ্গার শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর নাতি শ্রীনিবাসনের লেখা থেকে তথ্য সংকলন করে দিচ্ছি :

"মহীশুর রাজ্যের চিকমাগালুরে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে আলাসিঙ্গার জন্ম। পিতা নরসিমাচার্য ধনী না হলেও সম্ভ্রান্ত। তাঁরা শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, মহীশুরের মাণ্ড্য গ্রামে আদি বাস। স্থানীয় এক মিউনিসিপ্যালিটিতে পিতা কেরাণী ছিলেন; পরে মাদ্রাজে চাকরি নেন। আলাসিঙ্গার শিক্ষা প্রথমে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে, পরে মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজে। শেষোক্ত কলেজে তিনি সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী ডাঃ উইলিয়ম মিলারের এক প্রিয় ছাত্র। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানে ডিগ্রি নেবার পরে আলাসিঙ্গা ল' কলেজে সামান্য কিছু সময়ের জন্য পড়েন। অনিবার্য কারণে আইনপড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁকে অল্প বয়সেই চাকরির সন্ধান করতে হয়। প্রথমে কুম্ভকোনমের এক স্কুলে শিক্ষক; তা ছেড়ে দিয়ে ১৮৮৭ সালে চিদাম্বরমে পচিআপ্পা স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক। সেখানে এমন যোগ্যতার পরিচয় দেন যে, তিন বছরের মধ্যে মাদ্রাজে পচিআপ্পার হাইস্কুলে প্রধানশিক্ষক। এই পদে তিনি তাঁর অল্পায়ু জীবনের প্রায় শেষপর্যায় পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। মৃত্যুর কিছু আগে পচিআপ্পা কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ অবধি তিনি 'পচিআপ্পা ট্রাস্ট'-এর সেবা করে গেছেন পরম আনুগত্যের সঙ্গে। ছাত্র ও সহকর্মীদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তিনি প্রচুর লাভ করেছেন।"২

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন অতঃপর জানিয়েছেন, বিজ্ঞানশিক্ষা দান করাই কিন্তু আলাসিঙ্গার জীবনোদ্দেশ্য ছিল না, কিংবা রাজনৈতিক বীরত্বও তিনি কামনা করেননি, ভারতের জীবন-সঙ্গীত যে, ধর্মেই ঝংকৃত তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন; খ্রীস্টান মিশনারীরা ভারতীয় ধর্মের যে-সব বিকৃত ব্যাখ্যা বা কুৎসা করত, তা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। আলাসিঙ্গা যখন প্রতিকারের উপায়-সন্ধানে ব্যাকুল, তখনি তাঁর সঙ্গে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পরিচয়।

১৮৯৩ সালের শেষ দিকে চিকাগোয় বিরাট আকারে ধর্মমহাসভা বসছে, এই সংবাদ আলাসিঙ্গাকে চঞ্চল করে তোলে। ডাঃ বারোজ, ডাঃ উইলিয়ম মিলারকে ধর্মমহাসভার বিষয়ে

---

২ আলাসিঙ্গার দেহান্ত হয় ১১ মে, ১৯০৯। এইসময়ে তাঁর বয়স ছিল ৪৪ বৎসর। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে নীচের চোয়ালে ক্যানসার হয়। তাতেই তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল এর চার বছর আগে।

লিখেছিলেন। আলাসিঙ্গার কাকা বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত যোগী পার্থসারথি আয়েঙ্গার আমেরিকার 'হিন্দু লীগের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনিই আলাসিঙ্গাকে ধর্মমহাসভার সংবাদ দেন। হিন্দুধর্মের উত্থানের ভাবনায় আলাসিঙ্গা পূর্বাবধি ব্যাকুল, আন্তর্জাতিক এমন একটি অধিবেশনের গুরুত্ব তাঁর চোখে স্বভাবতই ধরা পড়ে—হিন্দুধর্মের পক্ষে একজন যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণের ভাবনায় তাই খুবই উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন. অধ্যাপক এম রঙ্গাচার্যকে আমেরিকা যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান, কিন্তু তিনি রাজি হননি। আলাসিঙ্গা কিছুটা হতাশ হলেও চেষ্টা ছাড়েননি। এই সময়ে একদিন তিনি তাঁর ছোট ভাই এম সি কৃষ্ণমাচারের কাছ থেকে শুনলেন, একজন তরুণ সন্ন্যাসী মাদ্রাজে এসেছেন, অ্যাসিস্টান্ট অ্যাকাউনটান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে আছেন, হিন্দুশাস্ত্র এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল। কৌতূহলী আলাসিঙ্গা—জি জি নরসিমাচার, আর এ কৃষ্ণমাচার প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। "প্রথম দর্শনেই আলাসিঙ্গা যেন পূর্ব-সংস্কারে বুঝলেন—এই সেই প্রার্থিত পুরুষ।...স্বামীজীর চোখে যে আলো জ্বলছিল তা যেন আলাসিঙ্গাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এই অজানা সন্ন্যাসীকে ভালবাসবার, গুরুরূপে বরণ করবার অনিবার্য আবেগে তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন।"

আলাসিঙ্গা স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "স্বামীজী, আপনি চিকাগোয় যাচ্ছেন না কেন?" "কেন নয়? ঠিক তো!"—স্বামীজী বলেছিলেন। আলাসিঙ্গা ক্রমেই অনুরোধের পরিমাণ বাড়াতে লাগলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, বহির্জগতে সনাতন হিন্দুধর্মের উপস্থিত হবার এই পরম সুযোগ, বোধহয় চরম সুযোগ। স্বামীজীর মনস্থির করতে সময় লেগেছিল। কিন্তু আলাসিঙ্গার নিঃস্বার্থ আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না। "১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের শিবরাত্রির দিন; সারাক্ষণ স্বামীজী প্রায় মৌন, গভীর ধ্যানে আচ্ছন্ন; সেই রাত্রেই স্বামীজী স্থির করলেন—তিনি আমেরিকায় যাবেন।"

এরপরে স্বামীজীর যাত্রার জন্য আলাসিঙ্গা কিভাবে অর্থসংগ্রহ করেছেন, কিভাবে তাঁকে বিদায় দিয়েছেন, সেকথা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন বলেছেন তাঁর লেখায়। পূর্বে আমরা তার আলোচনা করেছি। আলাসিঙ্গার বিষয়ে উপরের তথ্যের সঙ্গে 'দিনমণি' পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত আর একটি সংবাদ যোগ করে দেওয়া উচিত—আলাসিঙ্গা ভারতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা আলাসিঙ্গাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। শ্রীনিবাসনের লেখায় এবং 'দিনমণি' পত্রিকার লেখায় অ্যানী বেশান্তের সঙ্গে আলাসিঙ্গার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা পাওয়া যায়।

[তিন]

সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে আলাসিঙ্গার মিশবার ক্ষমতা, সেইসঙ্গে কর্মপটুতা ও নিষ্ঠাশক্তির দ্বারা দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে তাঁর সামর্থ্যের কথা স্বামীজীর জানা ছিল। তিনি বুঝেছিলেন, এই ক্ষমতার জন্য আলাসিঙ্গার পক্ষে পত্রিকা চালানোই সম্ভবপর শ্রেষ্ঠ কাজ; তদনুযায়ী ঐ কাজে তিনি আলাসিঙ্গাকে উৎসাহিত করতে থাকেন। আলাসিঙ্গাকে লেখা স্বামীজীর কয়েকটি চিঠির অংশ পরপর উদ্ধৃত করা যাক :

"পত্রিকাখানা বার করো—আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাব।...কাগজ ছাপানো ও অন্যান্য খরচের জন্য মাঝে-মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেষ্টা করব।...মাদ্রাজ থেকে যে-কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, তার কি হল?...কিডিকে দিয়ে লেখাতে থাকো, তাতেই তার মেজাজ ঠিক থাকবে।" (১১ জুলাই, ১৮৯৪)

"একটা ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা করো, তার মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাময়িকপত্র বার

করো—তুমি তার সম্পাদক হও। কাগজটা বার করবার, ও কাজটা আরম্ভ করে দেবার জন্য, খুব কমপক্ষে কত খরচ পড়ে, হিসেব করে আমাকে জানাবে, আর সমিতিটার নাম ও ঠিকানা জানাবে। আমি তাহলে তার জন্য টাকা পাঠাব, শুধু তাই নয়, আমেরিকায় আরও অনেককে ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা করব। কলকাতায়ও ঐ রকম করতে বল।... আমার হাতে এখন ৯০০০ টাকা আছে—তার কতকটা ভারতের কাজ আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব, আর এখানে অনেককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। এখন তুমি সমিতিটা খুলে ফেল, এবং কাগজটা বার করে দাও; আর-আর আনুষঙ্গিক যা আবশ্যক, তার তোড়জোড় করো। এ ব্যাপারটা খুব অল্প লোকের মধ্যেই রেখো।...সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোনো আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতে ('প্র+বুদ্ধ') বুদ্ধ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ আছেন—তার সঙ্গে 'ভারত' জুড়লে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে।" (৩১ অগস্ট, ১৮৯৪)

"তোমাদের যে খবরের কাগজ বার করবার কথা ছিল তা ছেড়ো না।...**যদি পারো তবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র উভয়ই বার করো।** আমার যে-সকল ভ্রাতা চারিদিকে ঘুরছেন, তাঁরা গ্রাহক সংগ্রহ করবেন। আমিও অনেক গ্রাহক জোগাড় করব এবং মধ্যে-মধ্যে কিছু কিছু টাকা পাঠাব।" (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪)

"যদি বৈদান্তিক ভাবধারার একটি পত্রিকা বার করতে পারো, তাহলে আমাদের কাজকে এগিয়ে দেবে। কাজে লেগে পড়ো। অপরকে সমালোচনা করো না। যদি সত্যকার কিছু বাণী দেবার থাকে দাও, শেখাবার থাকে, শেখাও, তার বেশী দরকার নেই।...একটা কিছু করে আমায় দেখাও। একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, থাকবার জন্য একখানা বাড়ি করে আমায় দেখাও।" (১৮৯৪)

স্বামীজীর যে-সকল পত্রাংশ উদ্ধৃত করলাম, তার থেকে দেখা যায়, স্বামীজী প্রস্তাবিত কাগজের পূর্ণ কর্তৃত্ব আলাসিঙ্গার উপরে দিয়েছিলেন; এবং কাগজের অর্থের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিলেন। আরও দেখতে পাওয়া যায়, কাগজের সঙ্গে স্বামীজী একটি সংঘ ও একটি মন্দিরের পরিকল্পনাও করেছেন। সংঘের নামকরণ করেছেন 'প্রবুদ্ধ ভারত।' ঐ নামকরণের কারণও জানিয়েছেন। পত্রিকার নাম 'প্রবুদ্ধ ভারত' করতে হবে একথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেননি, কিন্তু মনোগত অভিপ্রায় হয়ত তাই ছিল। পরে দেখা যাবে, তাঁর দ্বিতীয় পত্রিকার ক্ষেত্রে এই নামটিই গৃহীত হয়েছিল।

উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে আর একটি জিনিস দেখা যায়, স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, সাময়িক পত্রিকার মতো সংবাদপত্রও প্রকাশিত হোক। তাঁর সে অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়নি, তখন বা পরে।

স্বামীজীর পরিকল্পনা এখানেই শেষ নয়—ইংরাজির মতো দেশীয় ভাষাতেও পত্রিকা চাইলেন। ১৮৯৫, ৩ জানুয়ারি বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখলেন :

"প্রথমে মাদ্রাজে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, ক্রমশঃ তাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করতে হবে।...ঐ বিদ্যালয়ের মুখপত্রস্বরূপ একখানি ইংরাজি ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ থাকবে।"

যতদূর পেয়েছি, ১১ জুলাই, ১৮৯৪, পত্রে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে পত্রিকা বার করার চেষ্টা করতে প্রথম বলেন। পত্রিকার অভিপ্রায় যে, আলাসিঙ্গার মাথায় তার পূর্ব থেকেই ছিল, তাও দেখেছি। তাহলেও, স্বামীজীর নির্দেশ পাবার পরেও, আয়োজন করতে বছরখানেক কেটে গেল। স্বামীজী ১৮৯৫, ৬ মে, আলাসিঙ্গাকে যে-চিঠি লেখেন, তাতে

মনে হয়, তিনি জেনেছেন যে, আলাসিঙ্গা পত্রিকা-প্রকাশের ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। স্বামীজী ঐ চিঠিতে প্রস্তাবিত কাগজের উচিত-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বিস্তারিত লিখে পাঠান :

"এখন কাগজখানা কোনরূপে বার করবার খুব ঝোঁক হয়েছে আমার। এই পত্রিকায় গুরুগম্ভীর বিষয় যেন লঘুভাবে আলোচিত না হয়, এর সুর ধীর-গম্ভীর উচ্চ গ্রামে বাঁধা চাই। আমি এখানে অনেক গ্রাহক যোগাড় ক'রে দেবো, আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখব এবং সময়ে-সময়ে আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও একদল পাকা নিয়মিত লেখক ধরো। তোমার ভগিনীপতি [অধ্যাপক রঙ্গাচার্য] তো একজন খুব ভাল লেখক। তারপর আমি তোমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস-ভাই, খেতড়ির রাজা, লিমডির ঠাকুর-সাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেবো, তাতে তাঁরা কাগজটার গ্রাহক হবেন—তা হলেই ওটা খুব চলে যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং কাজ ক'রে যাও। আমরা বড় বড় কাজ করব—ভয় পেও না। এই একটি নিয়ম করো যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় পূর্বোক্ত তিনটি ভাষ্যের (দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত) মধ্যে কোনো না কোনো একটির খানিকটা অনুবাদ থাকবে।...কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি ওর জন্য একটা প্রবন্ধ লিখব। আর ভারতে ভালো-ভালো লেখকদের কাছ থেকে ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়েব ভালো-ভালো প্রবন্ধ সংগ্রহ করো. .পত্রিকার প্রচ্ছদপত্রে প্রবন্ধ ও লেখকদের নাম থাকবে।...আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাঠাচ্ছি।"

পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব যে স্বামীজী এই পর্যায়ে নিজে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা এই পত্রেই রয়েছে :

"এখন কাজে লাগো—কাগজখানার জন্য এখন উঠে-পড়ে লাগো। আমি কলকাতায় কিছু টাকা পাঠিয়েছি, মাসখানেকের ভেতর কাগজটার জন্য তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে পারবো। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাব, পরে নিয়মিতরূপে কিছু-কিছু পাঠাতে পারবো। এখন কাজে লাগো। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেও না। আমি নিজের মস্তিষ্ক এবং সবল দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই সব করব। এখানে বা ভারতে আমি কারও সাহায্য চাই না। আমি কলকাতা ও মাদ্রাজ দু'জায়গায় কাজের জন্য যা টাকার দরকার, তা নিজেই রোজগার করব।"

স্বামীজী অতঃপর প্রথম দফায় টাকা পাঠালেন ১০০ ডলার (২৮ মে, ১৮৯৫ চিঠি), মাসখানেক পরে আরও টাকা পাঠাচ্ছেন লিখলেন (১ জুলাই), সেইসঙ্গে পত্রিকা প্রকাশের জন্য আবার তাগিদ দিলেন। আরও মাসখানেক পরে এক পত্রে পত্রিকার নাম ও মটো অনুমোদন করলেন (৩০ জুলাই), নাম—**ব্রহ্মবাদিন**, মটো—**"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"** —এবং উৎসাহ দিয়ে লিখলেন "'সন্ন্যাসীর গীতি'—এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ। নিরুৎসাহ হয়ো না।...যতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ, এবং গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস —এই তিনটি জিনিস থাকবে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পারবে না।"

কিন্তু যখন আরও এক মাসের উপর কেটে গেল, অথচ পত্রিকা বেরুল না, তখন স্বামীজী বিশেষ বিরক্ত হলেন। নিশ্চয় ইতিমধ্যে আরও টাকার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁকে লেখা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতে মার্ডকস প্রভৃতি মিশনারীদের কুৎসাপ্রচারে আতঙ্ক প্রকাশ করেও আলাসিঙ্গারা চিঠি দিয়েছিলেন এইকালে। স্বামীজী ৯ সেপ্টেম্বর, মিথ্যা মিশনারী-নিন্দায় কর্ণপাত করার জন্য তীব্র ধিক্কার দিয়ে আলাসিঙ্গাকে চিঠি লিখলেন, তার শেষাংশে পত্রিকা-ব্যাপারে লিখেছিলেন : "আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার ক'রব, মনে করছি। সুতরাং কাগজের জন্য যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করো, তাহলে চলবে না। তোমাদের ছাড়াও আমার অনেক জিনিস দেখবার আছে।"

অবশেষে ব্রহ্মবাদিন প্রকাশিত হল, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫। এটি তখন পাক্ষিক পত্র। ৪ অক্টোবর পর্যন্ত স্বামীজী পত্রিকা বার হওয়ার সংবাদ পাননি। অত্যন্ত হতাশ হয়ে ঐ তারিখে কলকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন :

"মান্দ্রাজীরা দেখছি, কাগজ বার করতে পারলে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দুজাতির যে একেবারেই নাই! যে-সময়ে যে কাজ প্রতিশ্রুত হও, ঠিক সেই সময়ে তা করা চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যায়।"

এই চিঠি লেখার অল্পদিনের মধ্যে, ২৪ অক্টোবরের ভিতরে, স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেয়ে যান। সংখ্যাদুটির উপর সংক্ষেপে তিনি যে-সকল মন্তব্য করেন, এককথায় বলা যায় সেইগুলিই ব্রহ্মবাদিন সম্বন্ধে স্বামীজীর স্থায়ী সমালোচনা। ২৪ অক্টোবর তিনি লেখেন : "ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে—এইরূপ করে চলো। কাগজের কভারটা একটু ভাল করবার চেষ্টা করো, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু উজ্জ্বল করবার চেষ্টা করো। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান-প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও।" একই চিঠিতে তিনি কাগজটার দিকে 'পুরোপুরি নজর' দিতে বলেন, এবং জানান, হাতে টাকা না থাকায় তখনি তাঁর পক্ষে আরও টাকা পাঠানো শক্ত।

এর পরে বহু চিঠিতে ব্রহ্মবাদিনের প্রসঙ্গ থাকবে। তার একটা বড় অংশ ব্রহ্মবাদিনের অর্থসংগ্রহ নিয়ে। স্বামীজী তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের ব্রহ্মবাদিনের জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেন, নিজে যথাসম্ভব টাকা পাঠাবেন বলেন, এবং 'বিজ্ঞাপনের জোরে পত্রিকা চলে', একথা জানিয়ে আলাসিঙ্গাকে বিজ্ঞাপন-সংগ্রহে মনোযোগ দিতে নির্দেশ দেন।

ব্রহ্মবাদিনে কি-জাতীয় রচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত সে-বিষয়ে স্বামীজী ১৮ নভেম্বর, ১৮৯৫ লিখলেন : "ব্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়তঃ, লেখার ধাঁজটা ভারি কটমটে হচ্ছে। একটু যাতে স্বচ্ছ, সরস ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা করো। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ানো হয়েছে; পরে ব্রাহ্মণদের খুব প্রশংসা করো, তার পরের সংখ্যায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে খুশী করো। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সঙ্গে নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাকো; আর এখন যেরূপ বাধাই আসুক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে।" এই পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরে তাঁর কি-ধরনের নজর থাকত, তার নমুনা আছে এই একই চিঠির শেষাংশে : "ব্রহ্মবাদিনে বিবিধ সংবাদের একটা স্তম্ভ থাকা উচিত। একটি ভক্ত বৈরাগী shuffled off his mortal coil—এইরূপ ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এইরূপ বাক্যযোজনা একটু হাস্যোদ্দীপক।" পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে স্বামীজীর অনেক আশাই গড়ে উঠেছিল, এবং তিনি কতখানি তীব্র প্রীতি ও আগ্রহের সঙ্গে এর অগ্রগতি লক্ষ্য করছিলেন তার নিদর্শন আলাসিঙ্গাকে লেখা ২০ ডিসেম্বর, ১৮৯৫-র পত্রটি, যার সবটাই ব্রহ্মবাদিনের আলোচনায় পূর্ণ। অনেকখানি অংশ উদ্ধৃত করছি :

"এইসঙ্গে 'ভক্তিযোগে'র কপি কতকটা পাঠাচ্ছি, সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম সম্বন্ধেও একটা বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সংকেতলিপিকর নিযুক্ত করেছে এবং আমি ক্লাসে যা-কিছু বলি, সে সেগুলি টুকে নেয়। সুতরাং এখন তুমি কাগজের জন্য যথেষ্ট মাল পাবে। এগিয়ে চলো। স্টার্ডি পরে আরও লিখবে। ইংলণ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ বের করবে মনে করছে, 'ব্রহ্মবাদিনে'র জন্য তাই বেশি কিছু করতে পারিনি। কাগজটার একটা মানানসই মলাট না দেবার মানেটা কি বলো দেখি? এখন কাগজটার ওপর তোমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করো; কাগজটা দাঁড়িয়ে যাক—আমি এটা দেখতে দৃঢ়সংকল্প। ধৈর্য ধরে থাকো এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকো। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। টাকা-কড়ির

লেন-দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ খাঁটি হও। তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না—ও-সব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড়-বড় কাজ করবো জেনো।...

"বৈদিক সূক্তগুলির অনুবাদের সময় ভাষ্যকারদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো; আর [পাশ্চাত্ত্যের] প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের কথায় কোনোরকম মনোযোগ দিও না। ওরা আমাদের শাস্ত্র-গুলি সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না; নীরস ভাষাতত্ত্ববিদেরা ধর্ম বা দর্শন বুঝতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্বেদের 'আনীদবাতং' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে—'তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে লাগলেন।' প্রকৃতপক্ষে এখানে মুখ্যপ্রাণ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে এবং 'অবাতং' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ—অবিচলিতভাবে অর্থাৎ অস্পন্দভাবে। কল্পারম্ভের পূর্বে প্রাণ অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী জাগতিক শক্তি যে অবস্থায় থাকে, তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (ভাষ্যকারগণ দ্রষ্টব্য)। আমাদের ঋষিদের ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা করো, তথাকথিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতানুসারে নয়। তারা কি জানে?

"ভক্তিযোগ সম্বন্ধে লেখাগুলো অনেকটা প্রণালীবদ্ধ আকারে আছে; কিন্তু ক্লাসে যে-সব বলা হয়েছে, সেগুলি অমনি এলোপাতাড়ি—সুতরাং সেগুলি একটু দেখে-শুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলির ওপর বেশি কলম চালিও না।..'ভক্তিযোগ'টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। তারপর ওটা গ্রন্থাকারে ছাপিও। ভারত, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বইটি খুব বিক্রি হবে। মনে রেখো, থিওজফিস্টদের সঙ্গে যেন কোনো প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যদি সকলে আমাকে ত্যাগ না ক'রো, আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো, এবং ধৈর্য না হারাও, তবে আমি তোমাদের নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, আমরা আরও খুব বড়-বড় কাজ করতে পারব! হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে-ধীরে খুব বড় কাজ হবে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি মাঝে-মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড়। মনে রেখো, ইতিহাসের অব্যর্থ সাক্ষ্য, গুরুভক্ত জগৎ জয় করবে। আমি জি জি-র চিঠি পেয়ে ভারি খুশি হয়েছি। বিশ্বাসই মানুষকে সিংহতুল্য বীর্যবান করে। তুমি সর্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ করতে হয়। কখনো কখনো দিনে দু-তিনটা বক্তৃতা দিতে হয়। এইভাবে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা কাটিয়ে পথ ক'রে নিচ্ছি—কঠিন কাজ! আমার চেয়ে নরম প্রকৃতির লোক হ'লে এতে মরে যেত। স্টার্ডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি?...বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাকো। সত্যনিষ্ঠ, সাধু ও পবিত্র হও, আর নিজেদের ভেতর বিবাদ করো না।"

[চার]

স্বামীজীর এই বিপুল আশা ও আগ্রহ প্রচণ্ড ধাক্কা খেল একটি ব্যাপারে—তিনি ব্রহ্মবাদিনে থিয়জফির অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করলেন। স্বামীজী অনেকদিন ধরেই এই ভয় করছিলেন। বহু চিঠিতে তিনি যে আলাসিঙ্গাকে গুরুভক্তিতে দৃঢ় হতে বলেছিলেন, তাঁর একটা কারণ আলাসিঙ্গার কর্মোদ্দীপনাকে জাগ্রত করে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করা, কিন্তু অন্য কারণ সম্ভবতঃ আলাসিঙ্গা প্রভৃতিকে থিয়জফি থেকে দূরে রাখা। তিনি জানতেন, তাঁর মাদ্রাজী ভক্তদের মধ্যে থিয়জফি সম্বন্ধে আকর্ষণ রয়েছে, অনেকেই বেশান্তের বিপুল প্রভাবে আচ্ছন্ন, এবং মাদ্রাজ থিয়জফি-আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি। থিয়জফিকে স্বামীজী যেভাবে বেদান্ত-বিরোধী মনে করতেন, মাদ্রাজী ভক্তদের মনোভাব যে ঠিক সেরূপ ছিল না, তাও তাঁর জানা ছিল। ব্রহ্মবাদিনে ক্রমান্বয়ে থিয়জফি-প্রভাব বেড়ে উঠে যখন অ্যানী বেশান্তের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত তাতে বেরুল (২১ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ সংখ্যায়), তখন তিনি ধৈর্য হারালেন, এবং কঠোরতম ভাষায় আলাসিঙ্গাকে তিরস্কার করলেন, যার মধ্যে 'বিশ্বাসঘাতকতা' শব্দটি পর্যন্ত ছিল। এই প্রসঙ্গ আমি আগে বহুলাংশে উদ্ধৃতিযোগে আলোচনা করেছি। (তৃতীয় খণ্ড, ৭১-৭৪)। স্বামীজী পরিষ্কার লিখেছিলেন, "তোমরা

কী ঠিক করলে তা পত্রপাঠ আমায় লিখবে। এ-বিষয়ে আমার মতামত একচুল নড়বার নয়।" (২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৬)। কঠোরভাবে জানালেন, ব্রহ্মবাদিন বেদান্ত প্রচারের পত্রিকা, থিয়জফি-পত্রিকা নয়।

গুরুর রূঢ় তিরস্কারে শিষ্য কতখানি আহত হয়েছিলেন, অনুমান করতে পারি। লজ্জিতও হয়েছিলেন নিশ্চয়। তিনি অবিলম্বে পত্রে উত্তর দিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে নিশ্চয় আলাসিংগা পত্রিকা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। প্রিয় শিষ্যের আহত অভিমানে স্বামীজী ব্যথিত হলেন, তৎক্ষণাৎ নিজের ত্রুটি স্বীকার করে অনুতপ্তভাবে লিখলেন (স্বামীজীর মধ্যে 'রুদ্র' ও 'আশুতোষ' অংগাংগি)—

"এই মাত্র তোমার পত্র পেয়ে এবং তোমরা সকলে সংকল্পে দৃঢ়ব্রত আছ জেনে খুব খুশি হলাম। আমার চিঠিগুলিতে খুব কড়া কথা ব্যবহার করেছি; সেজন্য তুমি কিছু মনে ক'রো না, কারণ তুমি তো জানই, মাঝে-মাঝে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এখানে কাজ ভয়ানক কঠিন, আর যতই তা বাড়ছে, ততই কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অথচ এখনই আমার সম্মুখে ইংলণ্ডে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। তোমায় অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে জেনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম।

"ধৈর্য ধরে থাকো, বৎস! কাজ এত বাড়বে যে, তুমি ভাবতেও পার না। আমরা আশা করছি এখানে শীঘ্রই বহু সহস্র গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারব, আর আমি ইংলণ্ডে গেলে সেখানেও অনেক পাব। স্টার্ডি ব্রহ্মবাদিন-এর জন্য তোড়জোড় করছে। সবই সুন্দর, খুব সুন্দর চলছে। **তুমি পত্রিকাখানিকে একটা কমিটির হাতে দেবার যে সংকল্প করেছ, আমি তা মোটেই অনুমোদন করি না। ও-রকম কিছু করো না। পত্রিকার সমস্ত পরিচালনা নিজ হাতে রাখো এবং তুমিই স্বত্বাধিকারী থাকো।** পরে কি করা যায় দেখা যাবে। তুমি ভয় পেও না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—যেমন করেই হোক, আমি ব্যয় নির্বাহ ক'রব। কমিটি করা মানে—নানা রুচির লোক আসবে তাদের বিভিন্ন খেয়াল প্রচার করতে, আর অবশেষে সবটা পণ্ড করবে। **তোমার ভগ্নীপতি পত্রিকাখানি সুন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন,** তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত ও অদম্য কর্মী। তাঁকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাবে এবং আর সব বন্ধুকেও জানাবে। সকল কাজেই কৃতকার্য হবার পূর্বে শতশত বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। যারা লেগে থাকবে, তারা শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক আলো দেখতে পাবে।" (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬)।

এই চিঠি থেকেই দেখা যায়, স্বামীজী মাদ্রাজী ভক্তদের মধ্যে আলাসিংগার কর্মদক্ষতায় সর্বাধিক আস্থাবান ছিলেন, এবং তাঁরই নির্দেশে আলাসিংগা পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হয়েছিলেন।

ব্রহ্মবাদিনের থিয়জফি-প্রীতির বিষয়ে সন্দেহ দূর করতে আলাসিংগা অতঃপর ১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমেরিকা থেকে প্রেরিত কৃপানন্দের এক চিঠি ছাপলেন, যার মধ্যে আমেরিকায় থিয়জফি-রহস্যবাদের অতি শোচনীয় রূপ চিত্রিত হল৩ এবং তারপরে ১৪ মার্চ ম্যাক্সমুলারের যে পত্রটি তিনি ছাপলেন, তাতে পণ্ডিতপ্রবরের থিয়জফির বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশিত ছিল। ম্যাক্সমুলার লিখেছিলেন—

৩ কৃপানন্দের চিঠির বিষয়বস্তু তৃতীয় খণ্ডে (৭২-৭৪) উপস্থিত করেছি। সেখানে দেখিয়েছি, স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের মতো উচ্চ ভাবপূর্ণ পত্রিকায় দলীয় কলহের হেতু হতে পারে, এমন রচনার প্রকাশ পছন্দ করেন নি। তাই কৃপানন্দের এই রচনায় আপত্তি জানিয়েছিলেন।

স্বামীজীর কঠোর তিরস্কার হস্তগত হবার আগেই অ্যানী বেশান্তের 'কর্মযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতার সারাংশ ব্রহ্মবাদিনে ৪ জানুয়ারি, ১৮৯৬, সংখ্যায় বেরিয়ে গিয়েছিল।

"I have read with great pleasure the numbers of the *Brahmavadin* which you have kindly sent me. What I like is the spirit of pure Hinduism, more particularly Vedantism, unadulterated by so-called Theosophy."

এই পত্রের তলায় সম্পাদকের পক্ষ থেকে ব্রহ্মবাদিনের নীতির পুনর্ঘোষণা ছিল, যা ম্যাক্সমুলারকে জানাবার জন্য প্রধানতঃ লেখা হয়নি, হয়েছিল স্বামীজীকে আশ্বস্ত করবার জন্যই।—

"We heartily thank the Professor [Max Muller] for the advice he has given us and wish to assure him that, although we have no kind of quarrel with the 'so-called Theosophy' and the Theosophists, we find both it and them to be too occult for our understanding. It is our declared policy to propagate 'the spirit of pure Hinduism' in open day-light without any resort to the more or less dark shadows of occultism and mystic magnetism; and in the editorial columns of the very first number of the *Brahmavadin* may be found the following statement of our view in regard to the matter: 'The sublime rationality of the Vedanta can allow the roughest handling of it, without the slightest injury to itself, and although it is sometimes spoken as *Rahasya, Guhya,* as something secret and hidden, it stands in no need of mystic justification.'"

স্বামীজী আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মবাদিনের আর্থিক দিকটায় তিনি আবার মনোযোগ দিলেন। টাকা পাঠালেন,৪ সকলকে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন, এবং তাতেও যখন ব্রহ্মবাদিনের অর্থকষ্ট দূর হল না, তখন ৬ অগস্ট, ১৮৯৬, সুইজারল্যান্ড থেকে পুনশ্চ লিখে পাঠালেন :

"ব্রহ্মবাদিন কতটা আর্থিক দুরবস্থায় পড়েছে, তা তোমার পত্রে জানলাম। লণ্ডনে যখন ফিরে যাব, তখন তোমায় সাহায্য করতে চেষ্টা ক'রব। তুমি সুর নামিও না যেন—কাগজখানি চালিয়ে যাও; অতি শীঘ্রই এমন সাহায্য করতে পারব যে, বাজে শিক্ষকতার কাজ থেকে তুমি অব্যাহতি পাবে। ভয় পেও না। বড়-বড় কাজ হবে, বৎস! সাহস অবলম্বন করো। ব্রহ্মবাদিন একটি রত্নবিশেষ, একে নষ্ট হ'তে দেওয়া হবে না। অবশ্য এ-জাতীয় পত্রিকাকে সর্বদাই ব্যক্তিগত বদান্যতার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আর আমরা তাই ক'রব।"

এর দুদিন পরেই আবার আলাসিঙ্গাকে লিখলেন, "আমার পক্ষে তোমায় বর্তমানে জানান সম্ভবপর, ব্রহ্মবাদিন-এর জন্য আমি তোমায় দু-এক বছরের জন্য মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে অর্থাৎ বছরে ৬০ বা ৭০ পাউন্ড হিসাবে সাহায্য করতে পারব; তাতে তুমি নিজে স্বাধীন হয়ে ব্রহ্মবাদিন-এর কাজ করতে পারবে ও সেটিকে ভাল ক'রে দাঁড় করাতে পারবে। মণি আয়ার এবং অন্য কয়েকটি বন্ধু কিছু টাকা তুলে পত্রিকার মুদ্রণ প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। গ্রাহকদের চাঁদা থেকে কত আয় হয়? তা খরচ ক'রে ভালো ভালো লেখকদের কাছ থেকে ভালো ভালো প্রবন্ধ সংগ্রহ করা চলে না কি? ব্রহ্মবাদিনে যা কিছু বেরুবে, তার সবটাই যে সকলকে বুঝতে হবে, তার কোনো মানে নাই; কিন্তু দেশ-

৪ "এই সঙ্গে পত্রিকার জন্য তোমাকে ১৬০ ডলার পাঠালাম। আমি আমার শিষ্যদের বলেছি, যাতে তারা তোমার জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে।" (মার্চ, ১৮৯৬)।

প্রেম-প্রণোদিত হয়ে ও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সকলের এ-পত্রিকার গ্রাহক হওয়া উচিত—অবশ্য আমি হিন্দুদের লক্ষ্য করেই এ কথা বলছি।...ব্রহ্মবাদিনটিকে ভালভাবে পরিচালনা করার উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, এই ভাব নিয়ে এগোও। উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-বিষয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা প্রয়োজন। এই পত্রিকাই তোমার ইষ্টদেবতা হোক।...এই চিঠি পেয়ে তুমি আমায় ব্রহ্মবাদিন-এর সমস্ত আয়ব্যয়ের একটা পরিষ্কার হিসাব পাঠিও—যাতে আমি বুঝতে পারি, কি করা উচিত। মনে রেখো—অখণ্ড পবিত্রতা ও গুরুর প্রতি স্বার্থশূন্য একান্ত আজ্ঞাবহতাই সিদ্ধির মূল।

"দু-বৎসরের মধ্যে আমরা ব্রহ্মবাদিন-কে এরূপ দাঁড় করাব যে, পত্রিকার আয় থেকে শুধু যে, খরচ চলে যাবে তা নয়, স্বতন্ত্র একটু আয়ও হবে। বিদেশে ধর্মপত্রিকার বেশি কাটতি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে যদি এখনও কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকে তবে এ-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা তাদেরই করতে হবে।"

শুধু টাকাকড়ি নয়, ব্রহ্মবাদিনের সব কিছুতে স্বামীজীর মনোযোগ। পত্রিকার প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয়তে দুর্বোধ্য তাত্ত্বিকতা বা পারিভাষিক শব্দব্যবহারে বারবার আপত্তি জানালেন, কারণ তাঁর মতে, ব্রহ্মবাদিনের দায়িত্ব হল "সারা পৃথিবীকে সম্বোধন করে কথা বলা।"

পাক্ষিক ব্রহ্মবাদিনকে[৫] কিছুদিনের মধ্যে মাসিকপত্রে পরিবর্তিত করতে চান আলাসিঙ্গা। ১৮৯৬, ২২ সেপ্টেম্বর, স্বামীজী ইংলণ্ড থেকে আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে ব্রহ্মবাদিন সম্বন্ধে আবার বিস্তারিত আলোচনা করেন যার শেষাংশে পূর্বোক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে এবং ব্রহ্মবাদিনের আদর্শরূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য আছে :

"যথেষ্ট প্রবন্ধ দিয়ে কাগজখানিকে বড় করতে পারবে—এমন ভরসা যদি না থাকে, তবে এখনই ওটিকে মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। এ-পর্যন্ত তো পত্রিকার আকার ও প্রবন্ধগুলি আশানুরূপ নয়। এখনও অনেক বিশাল ক্ষেত্র পড়ে আছে, যেখানে আমরা প্রবেশও করিনি। যথা—তুলসীদাস, কবীর, নানক ও দক্ষিণ-ভারতীয় সাধুদের জীবন ও বাণী। এসব অসাবধানে ও যা-তা ভাবে না লিখে সঠিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে লেখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এ পত্রিকার আদর্শ বেদান্ত-প্রচার তো হবেই, তা ছাড়া এটি ভারতীয় গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের মুখপত্র হবে—অবশ্য ঐ গবেষণাদি হবে ধর্ম সম্বন্ধে। তোমার উচিত কলকাতা ও বোম্বের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সংস্পর্শে আসা ও তাঁদের কাছ থেকে সযত্নে রচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ করা।"

এর কয়েকমাস পরে, ২০ নভেম্বর, ১৮৯৬, স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের ক্রমোন্নতিতে আনন্দিত হয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে লিখলেন—"এখন তো আমাদের ইংরাজী পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে গেছে। অতঃপর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কয়েকখানা আরম্ভ করতে পারি।"

বৎসরাধিক পরিশ্রমের ও উদ্বেগের অন্তে স্বামীজী যে লিখতে পারলেন, পত্রিকাটি দাঁড়িয়ে গেছে—তা কিন্তু সত্য-সত্যই কোনোদিন দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। স্বামীজীর প্রেরণা ও সাহায্য, এবং আলাসিঙ্গার প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে পত্রিকাটি আলাসিঙ্গার মৃত্যুকাল অবধি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তারপরে আলাসিঙ্গার উত্তরাধি-কারীদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও আর কয়েক বৎসর মাত্র চলে। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। আলাসিঙ্গার দেহত্যাগের পর-বৎসরের নভেম্বর সংখ্যায় ব্রহ্মবাদিনে, এই পত্রিকার ব্যাপারে স্বামীজী ও আলাসিঙ্গার ভূমিকা বিষয়ে লেখা হয় :

"ব্রহ্মবাদিন স্বর্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণবায়ুর স্পর্শে উদ্গত হয়েছিল। পাঁচ

---

৫ ব্রহ্মবাদিনের প্রসপেকটসে সাপ্তাহিক পত্ররূপে ব্রহ্মবাদিন আরম্ভ করার ইচ্ছার কথা বলা হয়েছিল।

বৎসর তা তাঁর প্রেমময় করস্পর্শে সঞ্জীবিত ও পুষ্ট থেকেছিল। তখন তার রাজ-রূপ। পরবর্তী ঘটনাবহুল দশ বৎসরে তার দাস-রূপ, যখন বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রাম তাকে করে যেতে হয়েছে।...[এই শেষ পর্বে] পত্রিকার প্রেরণাপুরুষ ও প্রবর্তক স্বামীজীর দেহ-ত্যাগ ঘটেছে।...এবং আমাদের প্রতিভাবান ও সহৃদয় সম্পাদক এম সি আলাসিঙ্গা পেরুমলেরও মৃত্যু হয়েছে।...তথাপি পত্রিকাটি এখনো বর্তমান রয়েছে। জন্মক্ষণে মহাপুরুষ হস্তের স্পর্শ ও আশীর্বাদের শক্তি লাভ করেছিল বলেই এটি সম্ভব হয়েছে।...আর্থিক-ভাবে পত্রিকাটি যদিও সাফল্য অর্জন করেনি, তথাপি যথাসাধ্য সে জনকল্যাণের চেষ্টা করে গেছে। লোকান্তরিত আচার্যশ্রেষ্ঠ যে-আদর্শ এর জন্য নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রয়াস এই পত্রিকা সর্বপ্রযত্নে করে গেছে।" (অনূদিত)।৬

[পাঁচ]

ব্রহ্মবাদিনের ভিতরের ইতিহাস এই—জ্বলন্ত আদর্শবাদ, এবং আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-বিস্তারের কঠোর সংগ্রাম। বাইরের ইতিহাসে কিন্তু অভিনন্দনের অজস্র বর্ষণ। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পত্রিকাটি প্রভূত পরিমাণে পেয়েছিল।

কেন সমাদর—তার মূল কারণ—এটি তখন একটি পত্রিকা-মাত্র নয়—বিবেকানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রথম মুখপত্র। বিবেকানন্দ যে-তরঙ্গ তুলেছিলেন তারই প্রাণধ্বনি এই পত্রিকার শব্দে-শব্দে ঘোষিত হবে, এমন প্রত্যাশা সর্বত্র জেগেছিল।

ব্রহ্মবাদিন প্রকাশের আগে তার 'প্রসপেকটাস' বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রেরিত হয়।৭ ভারতের অনেক পত্রিকাতে সেটি পূর্ণতঃ বা অংশতঃ প্রকাশিত হয়, এবং অগ্রিম অভিনন্দন ঘোষিত হয়।৮ এইসকল মন্তব্যে পরিষ্কার দেখা যায়, ব্রহ্মবাদিনকে একটি সম্ভাবনাময় আন্দোলনের সম্ভাবনাময় মুখপত্ররূপেই বিবেচনা করা হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তৎকালীন ভারতবর্ষে দেশী-বিদেশী মহলে কোন্ গভীর ঔৎসুক্য ও প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছিলেন, তাও এইসব মন্তব্য থেকে দেখতে পাই। সাহেবী কাগজ মাদ্রাজ টাইমস লিখে-ছিল : "পত্রিকাটি স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ এবং উদ্যোগে প্রকাশিত হবে, যিনি এর

অন্যতম নিয়মিত লেখক হবেন বলে আশা করা যায়। এহেন পক্ষচ্ছায়ে যখন উদ্ভূত, তখন সাফল্যের সমূহ সম্ভাবনা।...শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এই-যে ধর্মজাগরণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, একে সকল মতের মানুষই স্বাগত জানাবেন।" মাদ্রাজ মেল অনুরূপ লিখেছিল : "পাশ্চাত্ত্য-দেশে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার দ্বারা যে-আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, তা ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-প্রতিপাদিত ভারতীয় দর্শনের বিষয়ে ক্রমবর্ধিত আগ্রহে বিকশিত হচ্ছে। [তারই ভাবী বাহক] এই পত্রিকার আবির্ভাবের জন্য আমরা সানন্দে অপেক্ষা করব।" সোস্যাল রিফর্মার এই পত্রিকার সংগঠকদের ঘনিষ্ঠভাবে জানত। তাই মনে করেছিল, যেহেতু "প্রসপেকটসের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলি উচ্চশিক্ষা এবং সামর্থ্যের জন্য পরিজ্ঞাত, তাই তাঁরা অবশ্যই আমাদের এই ভাবী সহযোগী পত্রিকার সুরকে সমুচ্চ এবং বিশুদ্ধ রাখতে সমর্থ হবেন।"

এই অগ্রিম শুভেচ্ছা, পত্রিকা প্রকাশের পরে অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। ইণ্ডিয়ান মিরার সুন্দরভাবে সর্বমোট কথাটা লিখতে পেরেছিল : "স্বামী বিবেকানন্দ [পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচারের প্রাথমিক পর্ব সমাধা করার পরে] এবার স্বদেশের দিকে মন দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ—ব্রহ্মবাদিন নামক একটি ধর্মীয় পত্রিকার প্রকাশ।...চতুর্দিকে ধর্মীয় চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষার যুগসূচনা ঘটছে। আশা করা যায়, ব্রহ্ম-বাদিন তার উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এই যুগচেতনার সুরকে প্রকাশ করতে পারবে। কতকগুলি প্রবন্ধে যে-ধরনের দক্ষতা ও মৌলিকতার পরিচয় আছে তাতে বোঝা যায়, লেখকেরা অত্যন্ত শক্তিশালী মনস্বিতার অধিকারী।...পত্রিকাটি একালের ধর্ম-পত্রিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।" (মিরার, ২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৫। এর আগে ২৪ সেপ্টেম্বর, মিরার কিছু মন্তব্য করেছিল)। থিয়জফিক থিংকার ব্রহ্মবাদিনের সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির—যা রক্ষণশীলতা এবং উগ্র আধুনিকতার আতিশয্যের মধ্যে শ্রেয়ঃপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল—প্রশংসা করেছিল।৯ মাদ্রাজের 'হিন্দু' (১৬ সেপ্টেম্বর), এর "উত্তম" প্রথম সংখ্যাটির মধ্যে এমন বহু বস্তু দেখেছিল, যা "হিন্দুদের দার্শনিক রচনার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে অতীব আকর্ষক ঠেকবে।" থিয়জফিক্যাল সোসাইটির মুখপত্র 'থিয়জফিস্ট', ব্রহ্মবাদিনের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় অনেকখানি উদ্ধৃত করে বলেছিল, "এই নূতন হিন্দু পাক্ষিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা...আকারে পরিচ্ছন্ন, ভাবে সমুন্নত, এবং উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল ও সহিষ্ণু।" (অক্টোবর, ১৮৯৫)। বাংলার মনীষী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লাইট অব দি ইস্ট বলেছিল, এই প্রথম সংখ্যা "সুসম্পাদিত এবং যথার্থ হিন্দু ভাব ও চেতনায় পরিপূর্ণ।" পত্রিকাটি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে বেরুচ্ছে বলে এর দার্শনিক সম্পদ সমধিক হবে, কারণ ঐ প্রদেশে বেদান্ত অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক সমাদৃত—এ কথাও লাইট অব দি ইস্ট বলেছিল। (অক্টোবর, ১৮৯৫)। সাহেবী কাগজ মাদ্রাজ মেল ব্রহ্মবাদিনের আবির্ভাবে সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখেছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫-এর সেই সম্পাদকীয়তে সে সমাদরের সঙ্গে ব্রহ্মবাদিনের ঘোষিত উদ্দেশ্যের উল্লেখ করে। প্রশংসা করে বলে : ধর্ম ও সমাজব্যাপারে সংস্কারকদের ধ্বংসাত্মক মনোভাবের পরিবর্তে এই পত্রিকা যে ধীর স্থির সহানুভূতির সঙ্গে অগ্রসর হতে চায়, তার দ্বারা সে অনেক বেশি পরিমাণে সমাজসংস্কারের আসল কাজ সম্পাদন করে ফেলতে পারবে। প্রথম সংখ্যাটিতে যে উচ্চমান দেখা গেছে, তা যদি পরেও বজায় থাকে তাহলে এই পত্রিকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—মাদ্রাজ মেল বলেছিল। মাদ্রাজ টাইমস

---

৯ **"Hitherto we have been having only most orthodox or most radical journals. A journal, progressive and tolerant in aim, has been a long felt want... We have no doubt in saying that the *Brahmavadin* would fill up the gap." [*Theosophic Thinker,* Oct. 12, 1895].**

একই সুরে অভিনন্দন জানিয়েছিল। (১৮ সেপ্টেম্বর)। "প্রাচীন প্রজ্ঞার সঙ্গে আধুনিক জীবনের বাস্তব পদ্ধতির সম্মিলন ঘটলে পূর্ণ মানব সৃষ্টি হবে"—এবং ব্রহ্মবাদিন নামক 'বৈদান্তিক আদর্শের উচ্চশ্রেণীর প্রবক্তা" পত্রিকাটি সেই পথে প্রেরণা দেবে—এই আশা মাদ্রাজ টাইমস প্রকাশ করেছিল।

আরম্ভের এই প্রশংসা পরে কমেনি বরং বেড়েছে। অনেক পত্রিকাই নিয়মিত ব্রহ্মবাদিনের রচনাসূচীর উল্লেখ করেছে, কিংবা রচনাংশ উদ্ধৃত করেছে; এতে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্য বা অন্যান্য রচনার উপর দার্শনিক আলোচনাও হয়েছে।১০ শেষপর্যন্ত বিচারশীল ব্যক্তিরা একটি ব্যাপারে ঐকমত হয়েছেন—দার্শনিক পত্রিকা হিসাবে ব্রহ্মবাদিন ভারতে সর্ব-শ্রেষ্ঠ। একথা দক্ষিণভারতের সেরা পত্র-পত্রিকায় অকুণ্ঠে স্বীকার করা হয়। আলাসিঙ্গার মৃত্যুর পরে মাদ্রাজ মেল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে-কথা লিখেছিল, তা সমকালে অনেকেরই মত ছিল :

"He [Alasinga Perumal Iyengar] was also instrumental, with the literary help of the Swamis of the Ramakrishna Mission in establishing the *Brahmavadin, the first and foremost Indian journal conducted in English, devoted to the exposition of Vedanta philosophy and to recording the progress of the Ramakrishna Movement, in various parts of the world.*"১১

---

১০ থিয়জফিস্ট পত্রিকা ১৮৯৫—১৯০২ প্রায় প্রতি সংখ্যায় ব্রহ্মবাদিনের রচনাসূচী জানিয়েছে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ধৃতও করেছে। ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-উক্তি এই পত্রিকাটির বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল, যা অন্য অনেক পত্রিকার সম্বন্ধেও সত্য। ব্রহ্মবাদিনের এক সংখ্যায় রামকৃষ্ণ-উক্তি ছিল না বলে থিয়জফিক থিংকার দুঃখপ্রকাশ করেছিল, তার ২১ মার্চ, ১৮৯৬ সংখ্যায়। এই পত্রিকাটি ব্রহ্মবাদিনের উপর প্রায়ই বিস্তারিত আলোচনা করেছে। অনুরূপ নিয়মিত আলোচনা আমরা পেয়েছি দক্ষিণ ভারতের শৈবসিদ্ধান্তবাদীদের পত্রিকা 'লাইট অব ট্রুথ, বা 'সিদ্ধান্ত দীপিকা'র নানা সংখ্যায়। ঐসব আলোচনায় ব্রহ্মবাদিনের বৈদান্তিক মতকে শৈবসিদ্ধান্তগত দৃষ্টিতে ধীরস্থিরভাবে বিচার করার চেষ্টা করা হয়। একই ধরনের আলোচনা করেছে সিংহলের 'বুদ্ধিস্ট' পত্রিকা। মহাবোধি সোসাইটি পত্রিকা জানুয়ারি ১৮৯৬ সংখ্যায় এ-সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য করেছিল। 'আর্য বাল বোধিনী' পত্রিকাতেও ব্রহ্মবাদিনের উল্লেখ পাওয়া যায়; এবং তৎকালে রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর 'সোফিয়া' পত্রিকায় খ্রীস্টীয় দর্শনের পক্ষে ব্রহ্মবাদিনের বৈদান্তিক মতকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন, সে আলোচনাগুলি দীর্ঘ এবং দার্শনিক। এইরকম আলোচনা পাই সোফিয়ার নভেম্বর ১৮৯৫, জুন ১৮৯৭, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ সংখ্যাগুলিতে।

১১ *Madras Mail,* quoted in the *Brahmavadin,* May, 1909.

ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকা একই কথা লিখেছিল।

এর সাত বছর আগেও, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে, মাদ্রাজ মেল ব্রহ্মবাদিন সম্পর্কে একই ধরনের মন্তব্য করেছিল :

"He [Vivekananda] was instrumental in establishing the *Brahmavadin* of Madras, which as an enlightened exponent of the Vedanta, is the leading magazine in India" [*Madras Mail*, July 7, 1902].

ব্রহ্মবাদিনের প্রথম বর্ষ পূর্তির পরে মাদ্রাজ মেল ৩১ ডিসেম্বর ১৮৯৬, অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখেছিল, পত্রিকাটি "অল্পকালের মধ্যেই বেদান্ত সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার বৃহৎ অংশকে দূর করতে সমর্থ হয়েছে।" "সুলিখিত সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধে" পত্রিকাটি পূর্ণ, এবং এর দার্শনিক মত অত্যন্ত উদার—তাও মাদ্রাজ মেল বলেছিল।

এক্ষেত্রে আরও প্রমাণরূপে মাদ্রাজ টাইমস পত্রিকার কিছু মন্তব্যের উল্লেখ করা যায় :

"It is a scholarly exponent of philosophical Hinduism, and is of considerable

রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে, এবং ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে, ব্রহ্মবাদিনের ভূমিকা কী ছিল, তা ব্রহ্মবাদিন প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যে ইণ্ডিয়ান মিরার ১৪ জুন, ১৮৯৬, তারিখে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনার মধ্যে লিখেছিল। উপলক্ষ ছিল, মাদ্রাজ থেকে বেদান্ত-আন্দোলনের দ্বিতীয় পত্রিকা 'অ্যাওকেন্ড্ ইণ্ডিয়া' বা প্রবুদ্ধ ভারতের অভ্যুদয়। এই সম্পাদকীয়ের বড় অংশে ছিল ব্রহ্মবাদিনের ইতিমধ্যে কৃত-কর্মের মূল্যায়ন। তাতে পাই ঃ ব্রহ্মবাদিন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গোষ্ঠীর স্বীকৃত মুখপত্র; ব্রহ্মবাদিনে স্বামীজীর মূল্যবান বক্তৃতাসমূহ প্রকাশিত হয়; ভারতীয় হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ দর্শন বেদান্তদর্শনের উপর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই পত্রিকাতে পাওয়া যায় ইত্যাদি। যেহেতু মাদ্রাজে বেদান্তের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা আছেন তাই মাদ্রাজ থেকে এই ধরনের উচ্চাঙ্গের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারছে—একথা বলার পরে, একালে ভারতবর্ষে বেদান্ত-চর্চার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের আন্দোলনের মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছিল। রাজা রামমোহন অদ্বৈত বেদান্তের আলোচনার জন্য অনেক চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ সফল হন নি। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রিকা সেই কাজকে সফল করে তুলতে পারবে, এমন সম্ভাবনা ইঙ্গিত করে, মিরার বলেছিল, "আমাদের বিশ্বাস, কালক্রমে বেদান্ত সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হবে; এবং এই বেদান্তের পুনরুত্থানের দিন থেকে ভারতে নবজন্মের দিন আরম্ভ হয়েছে, এমন মনে করতে হবে।"

---

literary merit. It has lately met with commendation from high quarters, none other than Professor Max Muller... It is at least evident that the Professor's interest in Hinduism was no passing freak... He asks for the particulars of the lives and teachings of the Paramahansa Sri Ramakrishna and of Ramanuja," (Feb. 20, 1896). "The paper is considered one of the best exponents of the Vedanta philosophy and seems to uphold the excellence of the early issues." (Sept. 15, 1897).

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ লুইস জি জেনস তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার গুরুত্ব স্বীকার করে লিখেছিলেন,

"I wish to add my personal appreciation...of the *Brahmavadin,* and its able corps of writers... Interest in the comparative study of religious and philosophical systems is certainly increasing here [in America] and there is a growing desire to receive the highest truths, and make them helpful to the lives of men and women, whatever may be their source or name." [*Brahmavadin,* March 27, 1897].

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, তদনুযায়ী তাৎপর্যপূর্ণ ছিল সোস্যাল রিফর্মারের মুক্ত সমাদর। ধর্ম-জাগরণের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে ব্রহ্মবাদিন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল—তাই ছিল সোস্যাল রিফর্মারের বিশেষ আগ্রহের বিষয়।—

"It [*Brahmavadin*] has been remarkably successful in pursuing its single aim... We have no hesitation in according to the *Brahmavadin* the high praise of having lifted the revival of religion from the mire of mere reaction against wholesome social changes." [*Reformer,* Oct. 25, 1896].

ব্রহ্মবাদিনের উদার সার্বভৌমিক ভাবধারার প্রশংসা ভারতের বাইরের পত্র-পত্রিকাও করেছে। "দি ওয়ার্লডস্ অ্যাডভান্স থট্ অব পোর্টল্যান্ড অরিগন্" মন্তব্য করেছিল :

"He who reads this new, enlightened Hindu publication will see that all truth are One, and that the true religion of the soul is not founded by geographical lines, nor restricted to certain creedal systems. Its editor is a ripe scholar and a spiritual man." [Quoted in the *Brahmavadin,* May 23, 1896].

ব্রহ্মবাদিনের শ্রেষ্ঠত্বের এক বিশেষ প্রমাণ—শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের অকুণ্ঠ সমাদর, যার বিষয়ে কিছু উল্লেখ আগেই করেছি। ম্যাক্সমূলার ব্রহ্মবাদিনকে বেদান্ত-আলোচনার সর্বোত্তম আকর-পত্রিকা মনে করেছিলেন। ব্রহ্মবাদিনের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হবার পরে, এতে প্রকাশিত প্রবন্ধের এক সংকলন বার করার কথা হয়। তার ভূমিকা লিখে দেন ম্যাক্সমূলার। সংকলনটি প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু ভূমিকাটি ব্রহ্মবাদিনে জানুয়ারি, ১৯০৯ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। সেই মূল্যবান রচনার অংশ এই :

"I was very glad to hear that you intend to publish a selection of the articles bearing on the Vedanta philosophy which have appeared from time to time in the interesting journal, the *Brahmavadin.* I read most of the articles, when they appeared... [The] numerous articles which are contained in the twenty-four numbers of the *Brahmavadin,* all treating of different aspects of the ancient and modern Vedanta philosophy and all intended to excite a more general interest in that marvellous system of philosophical and religious thought. I mean more particularly the papers contributed by Professor Rangacharyar of the Presidency College, Madras, Professor Vythinatham, formerly Professor at the same college, Mr. N. Ramanujam, of the Pachippa's College Madras, Mr. G. Venkata Rangam, of the same college, Professor Sundara Rama Iyer and several others. They treat of the religion, the ethics, the social ideas of the Vedanta... They touch on many points which are of great interest at the present moment when the philosophy elaborated by Badarayana in the Sutras, and fully explained by Sankaracharya and Ramanuja in their great commentaries, is beginning to claim its rightful place among the classical systems of philosophy, which have ruled the minds of men for more than the last two thousand years. It may seem indeed to superficial observers as if the very age of the Vedanta proved it to be an antiquated system of thought, not likely to help us at the present day or influence in any way our own philosophical speculations. This would be very true with regard to scientific observations, but the great problems of philosophy are the same to-day as they were thousands of years ago, and neither the careful observations on the developments of cells, or the watching of the operations of our physical organs concomitant with our perceptions, or what has truly been called Physical Psychology, is likely to bring us one step nearer to that borderland where the objective world ends and that of the subjective begins... And I know of no philosophy that has a better right to be heard and to be studied by our own philosophers than the ancient philosophy of India, and more particularly the Vedanta philosophy... What is peculiar to the Vedanta is its longevity. If it is the oldest philosophy in India, it is also the newest, for it sways the thoughts of your countrymen as much as ever. Of late years its rejuvenescence has been most surprising, and

while in Europe we hardly find a single man excepting, it may be, a special scholar, who would still call himself a Platonist, or even a Cantesian, or Spinozist without very considerable reservations, there are in India ever so many journals, ever so many societies, which proclaim doctrines of the Vedanta, and see in them their only guide towards truth."

[ছয়]

একটি প্রশ্ন ওঠে—যে-ব্রহ্মবাদিন তার প্রথম কয়েক বৎসরের সম্পাদকীয় রচনার চিন্তা-গভীরতায় বিশিষ্ট মনীষীদের চমকিত করেছিল—সেই সম্পাদকীয়গুলি কার রচনা? ব্রহ্মবাদিনের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক যেখানে আলাসিঙ্গা পেরুমল, সেখানে এ-প্রশ্ন ওঠে কেন? কারণ আর কিছু নয়, আলাসিঙ্গা সম্বন্ধে অন্য যত প্রশংসাই থাক, তাঁকে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক রচনায় সমর্থ লেখক বলে কেউ জানান নি। তাছাড়া স্বামীজী তাঁর পূর্বে উদ্ধৃত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬, তারিখের চিঠিতে আলাসিঙ্গাকে বলেছেন, আগেই দেখেছি, "তোমার ভগিনীপতি পত্রিকাখানি সুন্দরভাবে সম্পাদনা করছেন; তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং অদম্য কর্মী।"

সমস্যার সমাধান এখানেই হয়েছে। প্রথম কয়েক বৎসর ব্রহ্মবাদিনের আসল সম্পাদক ছিলেন আলাসিঙ্গার ভগিনীপতি অধ্যাপক এম রঙ্গাচার্য। এঁর সম্পাদনায় ব্রহ্মবাদিনের অসাধারণ গুণগৌরব বিচিত্র কিছু নয়, কারণ অধ্যাপক রঙ্গাচার্য ছিলেন তৎকালে দক্ষিণ-ভারতের বিরাটতম পণ্ডিত, অন্ততঃ যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিধ ধারাকে নিজের মধ্যে সম্মিলিত করার দিক দিয়ে বিষয়টির বিচার করা হয়। অধ্যাপক রঙ্গাচার্য সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু সংবাদ পরিবেশন করা যায়। আমি এ-ব্যাপারে মাদ্রাজ হিন্দু পত্রিকায় রঙ্গাচার্যের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের (যিনি স্বয়ং মাদ্রাজের আর এক দিকপাল পণ্ডিত ও লেখক) প্রবন্ধ,১২ এবং পি সুব্বা রাও লিখিত একটি পুস্তিকা থেকে তথ্যসংগ্রহ করেছি।১৩

এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব পরিবারে ১৮৬১ সালে রঙ্গাচার্যের জন্ম—শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকট মেলকোট নামক বৈষ্ণব পীঠস্থানে। তাঁদের পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। পণ্ডিত বংশের সন্তান হিসাবে তিনি বাল্যাবধি ধর্মে অনুরক্ত এবং সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তদনুযায়ী পরীক্ষার ফল সর্বদাই উত্তম। মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ থেকে ১৮৮১ সালে প্রথম শ্রেণীতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখনকার পাঠ্য-সূচী অনুযায়ী বি-এ পাঠকালে তিনি ইংরাজি সাহিত্য, ভারতীয় সাহিত্য, ইংরেজি ও ইউরোপীয় ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, ও দর্শন পড়েছিলেন। বিশেষ বিষয়-রূপে নিয়েছিলেন পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা। বি-এ পাসের পরে তিনি সমকালীন ব্রাহ্মণ-বংশের রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে তিন বৎসর চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়েন, (যেকথা শুনলে ব্রাহ্মণদের উদরে পবিত্র অন্ন বিদ্রোহ করত সেই শবব্যবচ্ছেদ পর্যন্ত করেছেন), এবং সেই

১২ অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের পুত্র এম আর সম্পতকুমার ১৯৭২ সালে মাদ্রাজে আমাকে সুন্দর-রাম আয়ারের লেখাটির কপি দেন, কিন্তু হিন্দুতে ঠিক কোন্ সময় লেখাটি বেরোয় তা উক্ত কপিতে লেখা ছিল না।

১৩ *Rao Bahadur Prof. M. Rangacharya, M.A. : Scholar—Scientist—Educator* by P. Subba Rao. Reprinted from the *Educational Review*, Madras, October, 1914.

এই লেখাটিও সম্পতকুমার আমাকে দিয়েছেন।

কালে আরও গভীরভাবে বিজ্ঞানচর্চা করেন। তারপর তিনি "ফিজিক্যাল সায়েন্স" নিয়ে এম-এ পাস করেন ১৮০৪ সালে—অধীত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল পদার্থবিদ্যা, জৈব ও অজৈব রসায়ন, ভূবিদ্যা, খনিবিদ্যা এবং জীবাশ্ম-বিজ্ঞান। এর সঙ্গে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে তড়িৎবিদ্যাও শিখে নিয়েছিলেন।

এহেন মানুষ যে-কোনো বিভাগেই চাকুরি করতে সমর্থ, কিন্তু ইনি শিক্ষাবিভাগকেই কর্মক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে দক্ষিণভারতের প্রখ্যাত অধ্যাপক হয়ে ওঠেন। তাঁর অধ্যাপনার বিষয়বৈচিত্র্য এখনকার পক্ষে কল্পনাতীত। সেকালে জ্ঞানসাধনার কেন্দ্রভূমি, 'দক্ষিণের কেম্ব্রিজ' নামে খ্যাত কুম্ভকোনমে তাঁর চাকুরির শুরু—কুম্ভকোনম কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের তরঙ্গে আলোড়িত সেই বিদ্যাভূমিতে এই তরুণ অধ্যাপক অবিচলিত প্রজ্ঞায় আত্মমর্যাদা ও দেশমর্যাদা নিয়ে বর্তমান ছিলেন। তার ফলে গোঁড়া খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধেছিল, কিন্তু মনীষার পরিমণ্ডল-সৃষ্টিকারী এই 'প্রফেসার' (এই সম্মানসূচক শব্দেই তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন) সেই সংঘাতের মধ্য থেকে বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

কুম্ভকোনম কলেজ থেকে তিনি ১৮৯০ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে যান, রসায়নের অস্থায়ী অধ্যাপক হয়ে (ঐ পদে তিনিই প্রথম ভারতীয়)। তার আগে কিছুদিন মাদ্রাজ রেল বিভাগে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করেছেন, এবং সেখানে নতুন একটা পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর গেলেন ত্রিবান্দ্রামে রসায়নের অধ্যাপক হয়েই। সেখান থেকে রাজমুন্দ্রীর প্রেসিডেন্সি কলেজে এলেন—এবার পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে। মধ্যবর্তীকালে নানা সময়ে তিনি ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস, জীববিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব পড়িয়েছেন। ১৯০১ সালে দেখা গেল, তিনি হয়ে গেছেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। একই সময়ে নিযুক্ত হলেন 'রেজিস্ট্রার অব বুকস" পদে, যে-পদের অন্যতম যোগ্যতা সকল দক্ষিণভারতীয় ভাষায় দক্ষতা, যা তাঁর ছিল। এছাড়া তিনি সরকারের 'প্রাচ্য পুথিশালা'র কিউরেটর হয়েছিলেন। শেষোক্ত পদে থাকাকালে তিনি কেবল অপরের গবেষণাকার্যে সাহায্য করেননি, সেইসঙ্গে নিজেও বহুসংখ্যক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, তার মধ্যে স্তম্ভিত করার মতো কাজ—২৫ খণ্ডে প্রায় ৯ হাজার পৃষ্ঠায় পুথিশালার "বিবরণযুক্ত তালিকা।" এছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থের লেখক।১৪ অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের ইংরাজি ভাষাজ্ঞান বিশিষ্ট ইংরাজ অধ্যাপকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে, এবং তিনি শক্তিশালী বাগ্মীরূপে দক্ষিণভারতে সুপরিচিত ছিলেন।

অধ্যাপক রঙ্গাচার্য তাঁর সর্ববিধ বিজ্ঞানচর্চা সত্ত্বেও ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনকে তার উপযুক্ত মূল্যদান করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তার জন্য তাঁকে বহুবার খ্রীস্টান মিশনারি এবং তাঁদের সমর্থক উগ্র সংস্কারপন্থীদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। খোলাখুলি গোঁড়ামির

---

১৪ অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে :

ইংরাজি অনুবাদসহ সটীক সংস্করণ :

Sarva-Siddhanta-Sangraha by Sankara. *Ganita-Sara-Sangraha* by a Jaina author of 9th century. *Rupavatara* (treatise on Sanskrit grammer). *Kavyadarsa,* by Dandin. *Prayogasangraha,* by Vararuchi. *Sri Bhashya* by Ramanuja.

তাছাড়া আরও লিখেছেন :

The Yugas (rational and historical interpretation of the Hindu conception of four cyclic periods as found in Indian astronomy in the Vedas and Puranas). *Function of Religion in Social Evolution. Lectures on the Bhagavadgita. Ramanuja and Vaishnavism. Orthography and Pronunciation in Tamil. Personal Equation in History.*

জয়ধ্বজাধারী মিশনারি ডাঃ লুন থেকে, উদারনৈতিকতার আলখাল্লা-পরা ডাঃ ফেয়ারবার্ণ পর্যন্ত অনেকের সঙ্গেই তাঁর সংঘর্ষ হয়েছে। অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার জানিয়েছেন, ইউরোপীয়দের প্রাচ্যদেশের উপর "সামাজিক বিজয়" রোধ করার প্রয়োজনে, সেইসঙ্গে বিবেচনাহীন সংস্কারের আতিশয্যকে নিবারণ ক'রে "জাতীয় পন্থায় সংস্কার" প্রবর্তন করার জন্য, যে "মাদ্রাজ হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন" স্থাপিত হয়েছিল, অধ্যাপক রঙ্গাচার্য তার অন্যতম সমর্থক ছিলেন, এবং ঐ আদর্শ প্রচারের জন্য যে "ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেস" পত্রিকা বেরিয়েছিল, তার দুই বৎসরের জীবনের প্রধান লেখক ইনিই। ১৮৯৩ সালের মধ্যেই মাদ্রাজের সাংস্কৃতিক জগতে এঁর গুরুত্ব এমনভাবে স্বীকৃত হয়েছিল যে, চিকাগো ধর্মমহাসভার ঠিক আগে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির সমর্থনে এঁর বক্তব্যকে খণ্ডন করতে ব্যস্ত হতে হয়েছে তখনকার দিনের অপ্রতিহত প্রতিপত্তিশালী মিশনারি পত্রিকাকে। তার উল্লেখ আগেই করেছি। (১ম, ২য় সং, ২১-২২)।

এই মানুষটি—"দীর্ঘ মহিমময় আকার, প্রশস্ত বক্ষ, সুগঠিত স্কন্ধ, বৃহৎ মস্তক, প্রশস্ত ললাট, ঈষৎ বক্র খড়্গ নাসা, দূরপ্রসারী দৃষ্টি, দৃঢ়তাব্যঞ্জক চাপা ঠোঁট, নড়াচড়ায় মর্যাদাগম্ভীর"—ইনি ১৮৯২, ডিসেম্বরে মুখোমুখি হয়েছিলেন এমন একজনের যাঁর অবয়ব পৌরাণিক দেবতার মতোই সৌন্দর্যময় বলে স্বীকৃত। ত্রিবান্দ্রামে অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের।

বিবেকানন্দ ও রঙ্গাচার্যের সেই প্রথম পরিচয়ের প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার বলেছেন, বিবেকানন্দ যখন ত্রিবান্দ্রামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের মধ্যে স্বচ্ছন্দ প্রতিভায়, বৈদ্যুতিক তেজে বিরাজ করছেন, তখন তারই মধ্যে তিনি "অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের মধ্যে সেই মানুষটিকে পেয়েছিলেন যিনি অন্য সকলের তুলনায় তাঁর মনের সবচেয়ে কাছাকাছি। স্বামীজী যেসব জিনিসকে জীবনের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতেন, অধ্যাপক রঙ্গাচার্য সেইসব জিনিসে সম্পন্ন ছিলেন—প্রায় বিশ্বকোষ-জাতীয় জ্ঞানের সঞ্চয়, স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তির বিরল ক্ষমতা, বিরাট জ্ঞানসম্পদকে মুহূর্তে আকর্ষণ ক'রে শ্রেয়ঃপথ নির্দেশ করার শক্তি, কিংবা সাজানো অন্তঃসারশূন্য যুক্তির বুদ্বুদকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার পারদর্শিতা, গভীর অনুভূতিশক্তি, যা মানবজীবন, নিসর্গপ্রকৃতি বা শিল্পেব শ্রেষ্ঠ বস্তুর দিকে অভ্রান্তভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে সমর্থ।"

রঙ্গাচার্য বিবেকানন্দকে দেখলেন, জানলেন। বিবেকানন্দও তাই। বিবেকানন্দ আমেরিকায় গেলেন, আলোড়ন তুললেন। তারপর ভারতবর্ষে তাঁর ভাবধারাকে স্থায়ী আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করলেন। ব্রহ্মবাদিনের পরিকল্পনা হল। অধ্যাপক আয়ার লিখেছেন :

"স্বামীজী তখন তাঁর পবিত্র মাতৃভূমির দিকে তাকালেন। কে আছেন সেখানে যিনি তাঁকে ভারতের শাস্ত্র-নিহিত তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে পাশ্চাত্ত্যের কাছে সুন্দরভাবে, সুষ্ঠুভাবে উন্মোচন করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন? কে তিনি, যাঁর আছে একই সঙ্গে প্রাচীন পণ্ডিতগণের তুল্য যুক্তি-তর্ক ও ব্যাখ্যার ক্ষমতা?—যে-পণ্ডিতগণ বহু শত বৎসর ধরে ভারতীয় শাস্ত্রাদিকে সতর্ক যত্নে রক্ষা করেছেন এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অপব্যাখ্যার সম্মুখে তাদের মর্যাদার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এক্ষেত্রে স্বামীজী অধ্যাপক রঙ্গাচার্য ভিন্ন আর কারো কথা ভাবতে পারেননি, ১৮৯২ ডিসেম্বরে ত্রিবান্দ্রামে নয় দিন অবস্থানকালে যাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সেইসময় তিনি রঙ্গাচার্যের মধ্যে প্রতিভা ও দক্ষতার এমন সমন্বয় দেখেছিলেন, যা বহুলাংশে তাঁরই অনুরূপ—এবং তা দেখে তিনি তারিফ করেছিলেন।...সুমহান স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত অনুরোধেই অধ্যাপক রঙ্গাচার্য ব্রহ্মবাদিন পত্রিকার 'আসল' সম্পাদক হয়েছিলেন।...যে চার কি পাঁচ বছর রঙ্গাচার্য ব্রহ্মবাদিন পরিচালনা করেন, সেইসময়ে তিনি এর প্রধান সম্পাদকীয় লেখক ছিলেন, এবং অন্ততঃ

তিরিশটি কি তারও বেশি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।...১৫ তাঁর সম্পাদকীয়গুলি প্রধানতঃ স্বামীজীর আমেরিকাবাসী শিষ্যদের শিক্ষার জন্য লিখিত হয়েছিল, এবং সেগুলি তাদের দ্বারা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়, কারণ সেগুলি স্বামীজী-প্রদত্ত মৌখিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় ঋষিগণের ঐতিহ্যসম্মত পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিরীতিকে যুক্ত করেছিল।"
[শ্রীসম্পতকুমার-প্রদত্ত 'হিন্দু'র প্রবন্ধ থেকে]।

রঙ্গাচার্য তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যসহ শেষ পর্যন্ত হয়ত একজন বাগ্মী-অধ্যাপক এবং গ্রন্থ-সম্পাদক হয়েই জীবন শেষ করতেন, কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁকে আকর্ষণ করে একটি মহৎ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর জীবনের কয়েক বৎসরকে অন্ততঃ একটি মহৎ সার্থকতা দান করেছিলেন। সেকথা তাঁর জীবনচিত্রের লেখক পি সুব্বারাও স্বীকার করেছেন।১৬ অপরপক্ষে রঙ্গাচার্যের সামর্থ্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মবাদিন ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের আধুনিক প্রাসঙ্গিকতার দিকটি শক্তির সঙ্গে উন্মোচন করতে পেরেছিলও।

[সাত]

ব্রহ্মবাদিন-প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আবার এই পত্রিকার স্থপতি আলাসিঙ্গা পেরুমলের ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করব। নিস্কাম কর্মের যদি কোনো প্রতীক থাকে—সে এই আলাসিঙ্গা পেরুমল। তাঁর দেহত্যাগের পরে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার মন্তব্যে [ব্রহ্মবাদিন, মে ১৯০৯ সংখ্যায় উদ্ধৃত] ভারতের ধর্মজাগরণের ইতিহাসে আলাসিঙ্গার ভূমিকার উপস্থাপনা আছে :

---

১৫ রঙ্গাচার্য মোট চার-পাঁচ বৎসর ব্রহ্মবাদিনের কার্যতঃ সম্পাদক ছিলেন, একথা পি সুব্বা রাও-ও বলেছেন। পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধে শ্রীনিবাসন বলেছেন, প্রথম দু'বৎসর রঙ্গাচার্য নিয়মিত লেখা দিয়ে গেছেন। পরবর্তী দশ বৎসর, এঁর মতে, আলাসিঙ্গার সম্পর্কের ভাই জি জি নরসিমাচার, আর এ কৃষ্ণমাচার ও আরও কয়েকজন ব্রহ্মবাদিন পরিচালনায় আলাসিঙ্গাকে সাহায্য করেছেন। তার পরবর্তী চার বৎসর, অর্থাৎ ১৯০৯ সালে মৃত্যু পর্যন্ত আলাসিঙ্গা এককভাবে পত্রিকাটি চালিয়েছেন। আলাসিঙ্গার মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্রেরা পাঁচ বছর পত্রিকাটিকে টিকিয়ে রাখেন, তারপর ১৯১৪ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৬ পি সুব্বা রাও উল্লিখিত জীবনচিত্রে লিখেছেন :

"If was then [at Trivandrum in Dec. 1892] that he saw for the first time the late Swami Vivekananda, whose grand mational work was the dynamic expression of the thoughts and labours of numerous Indian idealists like Professor Rangacharya."

১৮৯৭, ফেব্রুয়ারির গোড়ায় স্বামীজী যখন কুম্ভকোনম থেকে ট্রেনে মাদ্রাজ আসছিলেন, তখন তাঁকে ইন্টারভিউ করতে মাদ্রাজ মেলের সাহেব-প্রতিনিধি ট্রেনে তাঁর সঙ্গে চলেছিলেন। পরে চমৎকার এক সাক্ষাৎকার-বিবরণ মাদ্রাজ মেলে বেরোয়। অধ্যাপক রঙ্গাচার্য অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারকে বলেন, প্রশ্নগুলি তিনিই করেছিলেন, সাংবাদিক ভদ্রলোক উত্তরগুলি কেবল টুকে নেন। [রেমিনিসেনসেস, ৮৩]।

এর কিছুদিনের মধ্যে আমরা কলকাতায় অধ্যাপক রঙ্গাচার্যকে বক্তৃতা করতে দেখি। রঙ্গাচার্য উক্ত সভায় বলেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দই একাজে তাঁকে প্রণোদিত করেছেন।

"THE PRIEST AND THE PROPHET. Professor Rangacharya, a distinguished scholar of Madras, delivered a lecture on *The Priest and the Prophet* at the Star Theatre, on the 17th instant. Pundit Nilmoni Mukerjee, M.A., B.L., Principal, Sanskrit College, took chair. The lecturer said that he ventured to lecture at the instance of Swami Vivekananda, and asking for the generous indulgence of the audience proceeded to the subject, which, he observed, was of great interest to students of Comparative Religion." [*Indian Nation,* May 24, 1897].

"স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর জীবনোদ্দেশ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্য দিয়ে তিনি [আলাসিঙ্গা পেরুমল] এদেশের সাম্প্রতিক ধর্মজাগরণের ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করে গেছেন। বস্তুতঃ বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে **অপরিচিত সন্ন্যাসিরূপে** মাদ্রাজে উপস্থিত হন, তখন এ'র অন্তর্দৃষ্টিতেই তাঁর মহিমা ধরা পড়ে, এবং ইনিই দেশবাসীর কাছে তাঁকে উপস্থিত করেন। ১৮৯৩ সালে চিকাগোর সুমহান ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থনের জন্য স্বামীজী এ'রই চেষ্টার ফলে যেতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের পরে কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত ভূখণ্ডে ক্রমান্বয়ে যেসব সংবর্ধনা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তার মূলেও প্রধানতঃ ছিল স্বামীজী ও তাঁর কাজের জন্য এ'র ভালবাসা ও উদ্দীপনা। স্বতঃই ইনি অতীব অমায়িক ও সহৃদয় মানুষ, সেজন্য এ'র বন্ধুগোষ্ঠী খুবই বৃহৎ ছিল। বিবেকানন্দের মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলে বেদান্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ভারতের, এবং ইওরোপ-আমেরিকার বহু কর্মীর সঙ্গে এ'র সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, এবং তাঁদের উচ্চ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ইনি লাভ করেছিলেন। বেদান্তের আধুনিক প্রবক্তারূপে নিজ সুবিখ্যাত ভূমিকা গ্রহণ করার পরেই স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজিতে একটি ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেন, যে-পত্রিকার দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্মকে তার সর্বাধিক বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সার্বভৌমিক রূপে উপস্থিত করা যাবে। এ-ব্যাপারে তাঁর কর্মধারার একান্ত সমর্থক ও সবিশেষ অনুগত আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছেই কথাটি পাড়েন। আলাসিঙ্গা তৎক্ষণাৎ কাজটি গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ভারতীয় বন্ধুর সক্রিয় সহযোগিতায় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি পত্রিকা বার করলেন, স্বামীজীর নির্দেশে পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাম হল ব্রহ্মবাদিন। পনের বছর ধরে পত্রিকাটি চলছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি প্রেম ও ভক্তিতে যে-পত্রিকাটি তিনি আরম্ভ করেছিলেন, তার পত্রে-পত্রে আলাসিঙ্গার অদম্য উৎসাহ ও উচ্চ আদর্শের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। ব্রহ্মবাদিনকে কেন্দ্র করে আলাসিঙ্গার কার্যকলাপকে তাঁর জীবনের মূল কীর্তি বলা চলে। পত্রিকাটির উচ্চ মান তিনি কখনই নামাননি, তার জন্য বহু দুর্ভোগ ঘটেছে, প্রভূত আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। এই ধরনের আরও কত কাজই না তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল! তাঁর অকালমৃত্যু তাই দেশের পক্ষে বিরাট ক্ষতি। সেবাই ছিল তাঁর ব্রত। বিপদে বা প্রয়োজনে মানুষ যখন তাঁর সাহায্য চেয়েছে সানন্দে তিনি তা দিয়েছেন। বিধবা মা, চার পুত্র ও এক কন্যার একটি পরিবার তিনি রেখে গেছেন। তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদ সারা দেশ জুড়ে তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব, ও ভক্ত ছাত্রদের হৃদয়ে গভীর শোকচ্ছায়া বিস্তার করবে।" [অনূদিত]

আলাসিঙ্গার কর্মপ্রচেষ্টার মূল অংশ ব্রহ্মবাদিন গ্রাস করে থাকলেও উদ্বৃত্ত প্রবাহে আরও বহু ভূমি সিঞ্চিত হয়েছিল। এ বিষয়ে কিছু তথ্য পাই 'দিনমণি' পত্রিকার পূর্বোক্ত রচনায় :

"১৯০৭ সালে থিরুমলাচার্য আলাসিঙ্গার সঙ্গে যোগ দেন ব্রহ্মবাদিনকে ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু থিরুমলাচার্য রাজনীতিতে চরমপন্থী। ব্রহ্মবাদিনে রাজনৈতিক বিষয় আমদানি করলে সরকার পত্রিকাটির ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কা করে থিরুমলাচার্য ব্রহ্মবাদিন প্রেস থেকে আর একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা আরম্ভ করলেন, তার নাম 'ইণ্ডিয়া'। কিছুদিন পরে 'ইণ্ডিয়া' তার নিজস্ব প্রেস থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। আলাসিঙ্গা লেখায় তেজ-বীর্য চাইতেন, তাই 'ইণ্ডিয়া'-তে তিনি কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে আনালেন। ভারতী তখন 'স্বদেশমিত্রম্'-এ কাজ করছিলেন।" (বেদান্তকেশরী, ডিসেম্বর, ১৯৪১)১৭

১৭ শ্রীনিবাসনের প্রবন্ধে পাই, 'ইণ্ডিয়া' কাগজ ছাড়াও 'উইকলি রিভিউ' এবং 'নেটিভ স্টেট' কাগজের সঙ্গে আলাসিঙ্গার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল।

এ-বিষয়ে সুবিখ্যাত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী 'ইণ্ডিয়া' কাগজে যা লিখেছিলেন, তার অংশ :

"দু-ধরনের দেশপ্রেমিক আছেন। এক যাঁরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, দুই, যাঁরা যবনিকার অন্তরালে থাকেন, নামযশের জন্য বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করেন না।...আলাসিঙ্গা শেষোক্ত ধরনের। পাচি-আপ্পা কলেজে তিনি দীর্ঘদিন প্রধানশিক্ষক ছিলেন। অন্য অনেকগুলি কাজও তাঁর ছিল। এই সকল কাজের মধ্যে থেকেও তাঁর হৃদয়ে অনির্বাণ ছিল দেশপ্রেমের অগ্নি। বর্তমান লেখককে [সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে] আলাসিঙ্গা প্রভৃত সাহায্য করেছেন, তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের সহায়তা আমি পেয়েছি। এই 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকা যাঁদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি তাঁদের অন্যতম। ভগিনী নিবেদিতাকে যখন আমি কলকাতায় বলেছিলাম, 'মাদ্রাজে আপনার মতো বয়সের কোনো দেশপ্রেমিক নেতা নেই যিনি আমাদের মতো তরুণদের নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে পারেন, এক্ষেত্রে আমরা কী করব বলুন?'—ভগিনী তখন উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন, আলাসিঙ্গা রয়েছেন! জনজীবনের ব্যাপারে যদি কোনো প্রশ্ন জাগে, তাঁর কাছ থেকে তা তোমরা পরিষ্কার বুঝে নিতে পারো।'"

আলাসিঙ্গার ত্যাগ ও স্বাধীনচিত্ততা বিষয়ে শ্রীনিবাসনের লেখায় পাই :

"অভাব যদিও লেগেই থাকত, তাহলেও নিজের সামান্য আয়েই আলাসিঙ্গা সন্তুষ্ট থাকতেন। অর্থ বা ক্ষমতার লোভ তাঁর কখনই ছিল না। একবার স্বামী বিবেকানন্দের এক ধনী আমেরিকান শিষ্য আলাসিঙ্গার অর্থকষ্টে সহানুভূতি বোধ করে ভগিনী নিবেদিতার কাছে বলেন, তিনি আলাসিঙ্গাকে এক লক্ষ টাকা দেবেন, যাতে তিনি অর্থকষ্ট থেকে মুক্ত থাকেন।১৮ ভগিনী নিবেদিতা যখন আলাসিঙ্গাকে একথা জানালেন, তখন তিনি কিছুসময় ভাবলেন তারপর ভগিনীকে বললেন, আমেরিকান ভদ্রমহোদয়কে তাঁর উদার প্রস্তাবের জন্য আমার ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আমার পক্ষে ও-টাকা নেওয়া সম্ভব নয়। পরে তিনি বন্ধুদের জানান, কিছু ব্যক্তিগত লাভের জন্য তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্জন করতে পারেন না।"

এ সকলের উপরে আছে গুরু ও শিষ্যের অপূর্ব সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কী, তা আলাসিঙ্গা নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন। অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার এ-বিষয়ে যে সুন্দর বর্ণনা করেছেন, তা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। [২য়, ৩৬০]

স্বামীজী স্বয়ং তাঁর প্রিয় শিষ্যের কথাচিত্র একবার এঁকেছিলেন। তাঁর আপাত-কৌতুকময় রচনাভঙ্গির মধ্য থেকে কী গভীর শ্রদ্ধাই না ফুটেছিল!—

"আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু-পায়ে জাহাজে চড়ে বসল। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখনো-কখনো জুতো পায়ে দেয়।...আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার 'ব্রহ্মবাদিন', মাইসোরী রামানুজী রসম্-খেকো ব্রাহ্মণ, কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে 'তেংকেলে' তিলক, 'সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে' এনেছেন কি দুটো পুঁটুলি! একটায় চিঁড়ে-ভাজা, আর একটায় মুড়ি-মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি-মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে। আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারি-লোক একটু গোল করবার চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে ওঠেনি। ভারতবর্ষে ঐটুকুই বাঁচোয়া, বেরাদারি যদি কিছু না বলল তো কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি—কোনটায় আছেন সবসুদ্ধ পাঁচ-শ, কোনটায় সাত-শ, কোনটায় হাজারটি প্রাণী—কনের অভাবে ভাগিনিকে বে করে। যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে-যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখতে গিছল,

১৮ এক লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব চমকপ্রদ। এই তথ্যের উৎস লেখক জানাননি।

তারা জাতচ্যুত হয়। যাইহোক, এই আলাসিঙ্গার মতো মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প হে ভায়া!" [পরিব্রাজক]

আলাসিঙ্গার প্রতি কী অপরিসীম স্নেহই না তাঁর ছিল!—

"বেচারা আলাসিঙ্গা! আমি তার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এইটুকু করতে পারি যাতে সে একবৎসরের জন্য সকল সাংসারিক দায় হইতে মুক্ত থাকবে, যাতে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রহ্মবাদিন কাগজের জন্য খাটতে পারে। তাকে বলো, সে যেন চিন্তিত না হয়। তার কথা আমার সর্বদাই মনে আছে। তার ভক্তির প্রতিদান আমি কখনই দিতে পারব না।... আলাসিঙ্গার প্রতি একটু নজর রেখো। আমার যেন মনে হয়, সে কাজে ডুবে গিয়ে নিজের শরীরপাত করছে। তাকে বলো, শ্রমের পর বিশ্রাম এবং বিশ্রামের পর শ্রম—এইভাবেই সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হতে পারে। তাকে আমার ভালবাসা জানিও।" [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে: ১৮৯৮, মার্চ]

না, এও যথেষ্ট নয়—স্বামীজীর হৃদয়ের কোন্ গভীরে আলাসিঙ্গার স্থান ছিল, তা একটি স্মরণীয় ঘটনায় অব্যর্থ ফুটেছে। মিস ম্যাকলাউড তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"স্বামীজী ভারতে ফিরে যাবার পরে আমি তাঁকে কোনো চিঠিই লিখিনি, অপেক্ষা করছিলাম তাঁর বার্তার জন্য। অবশেষে চিঠি পেলাম—'তুমি চিঠি লিখছ না কেন?' তখন উত্তরে লিখলাম, 'আমি কি ভারতে যেতে পারি?' উত্তর এল, 'হ্যাঁ, আসতে পারো, যদি ক্লেদ, পতন ও দারিদ্র্য দেখতে চাও, সেইসঙ্গে কটিমাত্রবস্ত্র-পরা মানুষ ধর্মকথা বলছে—এই দৃশ্য। যদি অন্যকিছু আশা করো, কদাপি এসো না। একটি বাড়তি সমালোচনাও সহ্য হবে না।' স্বভাবতই আমি প্রথম জাহাজ ধরলাম।...বোম্বায়ে পৌঁছলাম ১২ ফেব্রুয়ারী (১৮৯৮), মিঃ আলাসিঙ্গা সেখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি কপালে বৈষ্ণবের রক্ততিলক ধারণ করেছিলেন। পরে কাশ্মীর যাত্রাপথে একদিন যখন স্বামীজীর সঙ্গে বসে আছি, আমি মন্তব্য করলাম, 'কী অদ্ভুত! মিঃ আলাসিঙ্গাও কপালে ঐসব বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ করেন!' তৎক্ষণাৎ স্বামীজী ঘুরে অতি কঠিন স্বরে বললেন, 'থামো! এ-পর্যন্ত তুমি কী করেছ?' আমি কি দোষ করেছিলাম তখন জানিনি। অবশ্য উত্তরে কিছু বলিনি। আমার দুচোখ জলে ভরে গেল, আমি অপেক্ষা করে রইলাম। পরে জেনেছিলাম, মিঃ আলাসিঙ্গা পেরুমল তরুণ ব্রাহ্মণ, মাদ্রাজে একটি কলেজে দর্শন [না, বিজ্ঞান] পড়ান, মাইনে পান মাসে ১০০ টাকা, তাতে পালন করেন পিতা, মাতা, স্ত্রী ও চারটি শিশু সন্তানকে। ইনিই দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করেছেন বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যে পাঠাবার জন্য। তিনি না-থাকলে হয়ত আমরা কোনোদিন বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেতাম না। এই শোনার পরে বুঝলাম, মিঃ আলাসিঙ্গা সম্বন্ধে সামান্যতম কটাক্ষেও স্বামীজী কেন অত রুষ্ট।" [রেমিনিসেনসেস, ২৩৯-৪০]

॥ ২ ॥ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকা ও তার দুই পর্ব

[এক]

ব্রহ্মবাদিন উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল—একটু বেশি রকম উচ্চাঙ্গের হয়ে উঠেছিল পাশ্চাত্যের মানুষদের বুঝবার পক্ষে। সাধারণ শিক্ষিত ভারতবাসী সম্বন্ধেও সেকথা খাটে। স্বামীজী আপত্তি জানিয়ে ২৩ মার্চ, ১৮৯৬ আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন :

"ব্রহ্মবাদিনে লম্বা-লম্বা সংস্কৃত প্রবন্ধ থাকায় ইউরোপ ও আমেরিকায় ওটা চলার সম্ভাবনা অল্প। তুমি ওটাকে তাহলে তো গোটাগুটি সংস্কৃতে ছাপলেই পারো! সংস্কৃত শ্লোকাদি উদ্ধৃত করলে হিন্দুদের ও সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের হয়ত বেশ সাহায্য

হতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্ত্যবাসী তো আর তোমার হিন্দুদর্শনের ধার ধারে না। একান্তই যদি রাখতে চাও তো না-হয় একটা প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ করো—বাকিগুলিতে সংস্কৃত শব্দ না থাকাই উচিত এবং লেখা সহজ হওয়া উচিত। **আমার যে সাফল্য হচ্ছে তার কারণ আমার সহজ ভাষা। আচার্যের মহত্ত্ব হচ্ছে—তাঁর ভাষার সরলতা।** তুমি যদি জনসাধারণের উপযুক্ত করে বেদান্ত সম্বন্ধে লিখতে পারো তবে ব্রহ্মবাদিন এখানে জনপ্রিয় হবে—নতুবা নয়। যে কয়েকজন গ্রাহক হয়েছে, তা শুধু আমার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার ফলে।"

একই ধরনের কথা স্বামীজী এই বৎসর কিছু পরেও বলেছেন। দাঁতভাঙা সংস্কৃত শব্দ এবং অত্যধিক পরিভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার পরে তিনি বলেন, "কোনো একটা বিশেষ মতের পক্ষে ওকালতি করা হচ্ছে, এমন একটি কথাও যেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে না থাকে। সর্বদা মনে রেখো, তোমরা শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎকে সম্বোধন করে কথা বলছ। অথচ যেভাবে সেই কথা বলে চলেছ, সেই বিষয়ে জগৎ একেবারে অজ্ঞ।"১৯

স্বামীজী ইচ্ছা থেকে আর একটি পত্রিকার জন্ম হল—প্রবুদ্ধ ভারত। এই পত্রিকার বয়স ইতিমধ্যে ৮৩ বছর পেরিয়ে গেছে। ভরসা করা যায়, পত্রিকাটি আরও বহু বৎসর জীবিত থাকবে। এই পত্রিকা এখন ইংরাজিতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মাসিক পত্র, এবং অনেকের মতে, ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন-সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

স্বামীজীর সমালোচনা শোনার পরে আলাসিঙ্গা এবং তাঁর বন্ধুবর্গ সহজতর দ্বিতীয় একটি পত্রিকা বার করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। শ্রীনিবাসন তাঁর প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তের গৌরব একমাত্র আলাসিঙ্গার উপরই অর্পণ করেছেন। আলাসিঙ্গাই নাকি রাজম আয়ারকে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত করেন। শ্রীনিবাসনের কথা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে ব্যাপারটা আলাসিঙ্গার মাথাতে উঠেছিল, এমন কোনো সমকালীন সমর্থন এখনো পাইনি। স্বামীজীর পত্রাবলী থেকে ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের প্রারম্ভিক পরিকল্পনার কথাই পাচ্ছি। অবশ্য ডাঃ রাওয়ের পিছনে আলাসিঙ্গা থাকতে পারেন, কিংবা তিনি ছিলেনই।

নিউইয়র্ক থেকে ডাঃ রাওকে লেখা স্বামীজীর ১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬, চিঠিতে প্রথম এই কাগজটির উল্লেখ দেখি। তিনি লিখেছিলেন :

"ছেলেদের জন্য প্রস্তাবিত কাগজের বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এবং তার জন্য আমি যথাসাধ্য সাহায্যও করব। আপনার উচিত ব্রহ্মবাদিনের ধারায় এই কাগজ-টাকেও স্ব-নির্ভর করা; তবে ভাষা ও লেখাগুলো যাতে সহজতর হয় সেদিকে নজর দেবেন। ধরুন, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যেসব অপূর্ব গল্প ছড়ানো আছে তা সহজবোধ্য ভাষায় আবার লিখে জনপ্রিয় করা দরকার। এই একটা মস্ত সুযোগ, যার কথা হয়ত আপনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। সময় পেলেই আপনাদের জন্য যত বেশি পারি গল্প লিখব। কাগজটাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ করার চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করুন। তার জন্য ব্রহ্মবাদিন রয়েছে।...গল্পের ভেতর নীতি ও আদর্শ ঢুকিয়ে দেওয়াই হবে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।...লেনদেনের দিকটা সম্পূর্ণ নিজের হাতে রাখবেন—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।"

---

১৯ ব্রহ্মবাদিনের রচনারীতির কাঠিন্যের বিরুদ্ধে আপত্তি ভারতবর্ষেও উঠেছিল। থিয়জফিস্ট থিংকার ১৪ মার্চ, ১৮৯৬, ব্রহ্মবাদিনের রচনাগৌরবের প্রভূত প্রশংসা করবার পরে বলেছিল, "কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি, তরুণ সম্প্রদায় এই পত্রিকার প্রভাবাধীন হবে কি? পত্রিকার রচনারীতি এবং ভাববস্তু তাদের মানসিক স্তরের অনেক উপরে স্থাপিত। আমরা ব্রহ্মবাদিনের সম্পাদকবর্গ, বিশেষতঃ আমাদের পণ্ডিত ভ্রাতা অধ্যাপক রঙ্গাচার্যকে বলব—ছেলেদের জন্য একটা পত্রিকা বার করুন। তাদের পক্ষে কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের প্রবন্ধাবলী অনেক বেশি উপকারী, একই বিষয়ে ব্রহ্মবাদিনের দার্শনিক রচনা বা থিয়জফিক্যাল পত্রিকাগুলির গুপ্ত রহস্যপূর্ণ রচনা যে-উপকার করতে সমর্থ নয়।"

এই চিঠি থেকে পরিষ্কার দেখা যায়—আলোচ্য পত্রিকার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের, এবং স্বামীজী ব্রহ্মবাদিনের ক্ষেত্রে যেমন আলাসিঙ্গাকে ভারার্পণ করেছিলেন, এক্ষেত্রে ডাঃ রাওয়ের উপর সেই ভার দেন। আমাদের অনুমান, ননজুণ্ডাই এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এঁকে স্বামীজী বারংবার টাকাকড়ির ব্যাপারে সাবধান করেন; বলেন, এক্ষেত্রে "বন্ধুত্ব বা চক্ষুলজ্জার স্থান নেই।...যদি কাউকে না খেয়ে মরতে হয় তবু শাকের কড়ি মাছে দেবে না। এরই নাম বৈষয়িক সততা।" আমরা আরও দেখেছি, একই চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন, তখনকার মতো তাঁর 'সাহায্য' কিন্তু আর্থিক সাহায্য হতে পারবে না, কারণ তাঁর হাতে দেবার মতো টাকাকড়ি নেই। তিনি অবশ্য আর্থিক সাহায্য করার মতো লোক জুটিয়ে দেবেন বলেছিলেন।

আর্থিক সাহায্য স্বামীজী যদি নাও করতে পারেন, অন্য সকল সাহায্য সর্বদাই করেছেন, কারণ এই পত্রিকাটি সম্বন্ধে তাঁর সবিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা ব্রহ্মবাদিনের মতো এই পত্রিকাতে বেরিয়েছে, (তাঁর যে-বৈদেশিক কীর্তিকথা তখন ভারতবাসীর কাছে সম্পদতুল্য, তাও এতে পরিবেশিত হয়েছে), এবং আমরা আগেই দেখেছি, তিনি তাঁর একটি প্রিয় বাসনা এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করার ইচ্ছা অনেকবার প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের গল্পগুলি স্বচ্ছন্দ ইংরাজিতে লেখার জন্য তিনি খুবই উৎসুক ছিলেন।২০

সবচেয়ে বড় কথা, স্বামীজী তাঁর শ্রেষ্ঠ দান এই পত্রিকাকে দিয়েছিলেন—ব্রহ্মবাদিনের মতো করেই—তিনি তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে পত্রে বাঙ্ময় করে পাঠিয়েছিলেন ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের আত্মাকে জাগাতে :

"বীরের মতো এগিয়ে চলুন। এক দিনে বা এক বছরে সফলতার আশা করবেন না। সর্বদা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় থাকুন। ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিন। নেতার আদেশ মেনে চলুন। আর, সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির নিকট চিরবিশ্বস্ত হোন। তাহলেই সমগ্র জগৎকে কাঁপিয়ে তুলতে পারবেন। মনে রাখবেন, ব্যক্তিগত 'চরিত্র' এবং 'জীবনই' শক্তির উৎস—অন্য কিছু নয়। **এই চিঠিখানা রেখে দেবেন—যখনই উদ্বেগ বা ঈর্ষার ভাব মনে উঠবে তখনই এই শেষের কটা লাইন পড়বেন।**"

আলাসিঙ্গাকে যে-মন্ত্র ব্রহ্মবাদিনের জন্য স্বামীজী দিয়েছিলেন, সেই অক্ষয় মন্ত্রই তিনি ডাঃ রাওকে দিলেন :

"চাই অদম্য উৎসাহ। যখন যা করবেন, তখনকার মতো তাই হবে ভগবৎসেবা। এই পত্রিকাটি এখনকার মতো আপনার আরাধ্য দেবতা হোক—তাহলেই সফল হবেন।"

প্রবুদ্ধ ভারতের বিষয়ে স্বামীজী নানা সময়ে যেসব মন্তব্য লিখে পাঠিয়েছেন, তাদের কয়েকটি সম্বন্ধে, একালের ভাষায় বলতে পারি—সেগুলি "মলাট সমালোচনা।" আক্ষরিকভাবে কথাটা সত্য, কারণ স্বামীজী প্রবুদ্ধ ভারতের প্রচ্ছদ-চিত্র বিষয়ে রীতিমতো কড়া

---

২০ স্বামীজী ১৮৯৬ সালে লেখা এক চিঠিতে প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য গল্প লেখার ইচ্ছার কথা বলেছেন : "আমি একটু সময় পেলেই প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য কয়েকটি গল্প লিখব।" ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৬, লিখেছেন : "প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য একটি গল্প আরম্ভ করেছি, শেষ হলেই পাঠিয়ে দেব।" প্রবুদ্ধ ভারতে তাঁর সহজতর লেখাগুলি ছাপার নির্দেশ দিয়ে তিনি ২২ সেপ্টেম্বর আলাসিঙ্গাকে লেখেন : "জ্ঞানযোগের বক্তৃতাগুলি তুমি অনায়াসে ছাপতে পারো, আর ডাঃ ননজুণ্ডা রাও সহজ বক্তৃতাগুলি প্রবুদ্ধ ভারতে ছাপতে পারেন।"

কাব্য-পুরাণের গল্প ইংরাজিতে লেখার ব্যাপারে স্বামীজীর ইচ্ছাকে, তাঁর অন্য অনেক ইচ্ছার মতো, ফলবতী করে তোলেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর "ক্র্যাডল্ টেলস্ অব হিন্দুইজম" গ্রন্থে। স্বামীজীর কাছে শোনা বহু গল্প তিনি এই গ্রন্থে (বইটি সেকালে দেশে-বিদেশে বহুল প্রচারিত) দিয়েছেন, একথা নিবেদিতা তাঁর অনেক চিঠিতে জানিয়েছেন।

সমালোচনা করেছিলেন, যদিচ সেই ছবিটি সমকালে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে বুঝতে পারি, স্বামীজীর শিল্পবোধ কত উঁচুতে, এবং সেকালে ভারতীয় শিল্পভাবনা কত নীচুতে অবস্থিত ছিল। বিষয়টি পরবর্তী এক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

মলাট সমালোচনা করার পরে স্বামীজীর বোধহয় আশংকা হয়েছিল—উল্টো উৎপত্তি না হয়! গৌণ বস্তুর বিরুদ্ধে আপত্তি যেন মুখ্যের ব্যাপারে সংগঠকদের নিরুৎসাহ করে না তোলে। তিনি ১৪ জুলাই, ১৮৯৬, ডাঃ রাওকে লেখেন :

"বীরের মতো কাজ করে চলুন। [মলাটের] নক্সা-টক্সার চিন্তা এখন থাক, ঘোড়া হলে লাগামের জন্য আটকাবে না। আমরণ কাজ করে যান। আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। আর আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের মধ্যে কাজ করবে। জীবন তো আসে যায়—ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ, সবই দুদিনের জন্য। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মতো মরার চেয়ে কর্মক্ষেত্রে সত্যপ্রচার করে মরা ঢের ভালো—ঢের ভালো। চলুন—এগিয়ে চলুন।"

[দুই]

প্রবুদ্ধ ভারতের সঙ্গে যুক্ত স্বামীজীর ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের বিষয়ে এইটুকু জানানো যায়—তিনি মাদ্রাজ শহরের এক সেরা ডাক্তার, কিন্তু ডাক্তারি কাজেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখেন নি, দার্শনিক চিন্তাতেও সমর্থ ছিলেন—তাঁর *Cosmic Consciousness of the Vedantic Idea of Mukti* নামক বইটি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়ে সারা দেশের সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং নানা পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়। বইটি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনানুভূতির আলোকে রচিত। এছাড়া ইনি পত্রপত্রিকায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদি লিখেছেন।

ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের অনবদ্য বিবেকানন্দ স্মৃতি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অংশতঃ উদ্ধৃত করেছি [১১৪-২১], তার মধ্যে বিজ্ঞানের অধ্যাপক যুক্তিবাদী নাস্তিক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়রের কোন্ অপূর্ব রূপান্তর ঘটেছিল, তার বর্ণনা আছে। [১১৮-২১]। স্বামীজীর আর এক মাদ্রাজী ভক্ত সি রামানুজাচারিয়ারের বিবেকানন্দ-স্মৃতিকথার মধ্যেও সিঙ্গারা-ভেলুর ঐ রূপান্তরের বিবরণ আছে, এবং গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা তাও উপস্থিত করেছি। [১১০]। সিঙ্গারাভেলুর কথা এখানে উত্থাপনের কারণ—তিনি ছিলেন প্রবুদ্ধ ভারত বা *Awakened India*-এর ম্যানেজার। তাঁর ত্যাগ এবং নিষ্ঠা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একে সার্থক করে তুলেছিল। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে অকালে তাঁর দেহত্যাগ হয়। ব্রহ্মবাদিন এই লোকান্তরিত মহাপ্রাণ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়ে লিখেছিল :

"সহজ মানুষটি, মঙ্গলময় হৃদয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানসম্পদে পূর্ণচিত্ত, সত্যের বেদীমূলে আত্মনিবেদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদীপ্ত ছাত্র হলেও পরীক্ষার সাফল্য তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি, জ্ঞানতৃষ্ণা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরিণতি ১৮৯৪ সালে সাংসারিক সম্পর্কের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদে। স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শের ফলেই এ-জিনিস ঘটে-ছিল, অনেকেই তাই মনে করেন। তাঁর বন্ধুত্বলাভের সুখসৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন, তাঁর দেহমনের মধ্যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার কোন্ সুর বাজত। এই জিনিসই প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সাফল্যের মূল কারণ, গোড়া থেকেই তিনি যার ম্যানেজার। ধৈর্য এবং অবিচলিত প্রয়াসের দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করবেনই—তাঁর পরিচিত মানুষেরা এই ধারণাই করতেন। এক্ষেত্রে কতখানি অগ্রগতি তাঁর হয়েছিল তা অবশ্য কেউ ঠিকভাবে বলতে সমর্থ নন, কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ পর্বে অন্তরের পূর্ণতার যে-দীপ্তি

তাঁর বহিরবয়বে প্রতিফলিত হত, তার তাৎপর্য যেন আমরা অনুধাবন করতে পারি।" [অনুদিত]।২১

এইসব মানুষই ছিলেন প্রবুদ্ধ ভারত ও ব্রহ্মবাদিনের পিছনে। এঁদের কথা পত্রিকার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণ করার কারণ—এই ধরনের পত্রিকা বস্তুতঃ জীবনসাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। এহেন পত্রিকা নির্মাণ করতে পারে মানুষের 'চরিত্র'- যে-চরিত্র স্বামীজী কত না চেয়েছিলেন তাঁর স্বদেশের জাগরণের জন্য।

[তিন]

পত্রিকা আরম্ভের আগে প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসপেকটসও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়। বিস্ময়ের কথা, পত্রিকার মুখ্য সংগঠক ডাঃ ননজুণ্ডা রাওয়ের নাম প্রসপেকটসে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিল না; অপরপক্ষে তাঁর নাম ছিল ব্রহ্মবাদিনের প্রসপেকটসে। প্রবুদ্ধ ভারতের ক্ষেত্রে যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হলেন : পি আয়াসাম্বী, এম-এ, বি-এল; বি আর রাজম আয়ার, বি-এ; জি জি নরসিমাচার্য, বি-এ; বি ভি কামেশ্বর আয়ার, বি-এ। এঁরা কেউই ব্রহ্মবাদিনের প্রসপেকটসে স্বাক্ষরকারী নন। এর থেকে বোঝা যায়, দুটি কাগজই সমবেত প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়েছিল।

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসপেকটাস ভারতে অনেকগুলি পত্রিকায় উদ্ধৃত বা উল্লিখিত হয়। প্রসপেটাসের বক্তব্য অনুসরণ করে প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যায় *Ourselves* নামক আত্ম-পরিচয় লিখিত হয়েছিল। এই দুইটি লেখাতেই স্বামীজীর ইচ্ছা এবং আদর্শের কথা ব্যক্ত হয়, যদিও লেখাদুটি একটু বেশি পরিমাণে আবেগবহুল ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ ছিল।২২

---

২১ ৩ অক্টোবর, ১৯০১, হিন্দু-তে সিঙ্গারাভেলুর মৃত্যুতে যে সুষ্ঠু বিবরণ বেরোয় তার থেকে এঁর চরিত্র সম্বন্ধে মাদ্রাজের শিক্ষিত মহলের শ্রদ্ধার পরিমাণ বোঝা যায় :

"Mr P. Singaravelue Mudaliar, B.A.,...an old student of the X'ian College, Madras, and later on an Assistant Professor of Science in that very college,... was one of Dr. Miller's pets. From the beginning he was bred up, so to say, to a life of sincere convictions, living a 'Life of Truth', unmixed with religion... [But] he began to think some seven years ago that his happiness consisted more in renouncing what little he had than upon the gains a man in his position would have calculated. And this thought took firm root in him and ultimately led him to sever his connection with the College to the sincere regret of his employers. He had a strong affinity to the movement of Swami Vivekananda. He ever afterwards looked like a *Sannyasi,* and really more so then he appeared. As the manager of the *Prabuddha Bharata* journal in the two years of its regime, he in conjunction with the late Mr Rajam Aiyer, B.A., worked it up to advantage... [He died only] after two days illness...Feeling...that his end was near, he cheerfully and completely disengaged himself from his little concerns and was quite prepared to meet with his death in the old *Prabuddha Bharata* office on the 27th ultimo with a calm and cheerful bearing... In him the Ramakrishna Mission has lost a sincere worker."

২২ প্রসপেকটাসে লিখিত নিম্নের কথাগুলিতে স্বামীজীর পত্রে-লিখিত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি ছিল :

"It has been arranged to start a journal devoted to our religion and philosophy and called the *Prabuddha Bharata* or *Awakened India*. It will be a sort of supplement to the *Brahmavadin* and seek to do for students, youngmen and others, what that is doing so sucessfully for the more advanced classes. It will,

প্রবর্তকগণ জানিয়েছিলেন : স্বামী বিবেকানন্দের সমর্থন এই পত্রিকার পিছনে আছে; কোনো ব্যক্তিগত লাভের বাসনা তাঁদের নেই; সেই কারণে পত্রিকার মূল্য অত্যন্ত অল্প রাখা হয়েছে (বছরে দেড় টাকা, অর্থাৎ প্রতি সংখ্যা দু' আনা, ডাক ব্যয়সহ) : জড়বাদের দ্বারা বিভ্রান্ত যুবকবৃন্দকে আত্মস্থ করাই অভিপ্রায়, বিশেষতঃ তাদের বেদান্তে অভিষিক্ত করা, যে-বেদান্ত 'মিশিগান হ্রদতীর থেকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত সুপরিচিত।'

পত্রিকার সূচনা-নিবেদনে ("আওয়ারসেলভস্") বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত বেদান্ত-আন্দোলনের মূলগত বক্তব্য উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়। সেইসঙ্গে কোন্ সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় পত্রিকাটির আবির্ভাব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বলা হয় :

"আমাদের প্রসপেকটাস সর্বদিকে যে-ধরনের উদ্‌গ্রীব সমাদরে গৃহীত হয়েছে, এবং আমাদের আন্দোলন যে-ধরনের আগ্রহে অভ্যর্থিত হয়েছে, তদুপরি কিছু-কিছু মহল থেকে যে-ধরনের উদার সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, তা দেখিয়ে দেয়, এই প্রকার প্রচেষ্টার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে।...কয়েকবৎসর আগেও প্রবুদ্ধ ভারত বা ব্রহ্মবাদিনের আবির্ভাব অসম্ভব ব্যাপার ছিল।"

ব্রহ্মবাদিনকে তার আবির্ভাবে যে-কারণে সারা ভারতে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল—প্রবুদ্ধ ভারতকে অভ্যর্থনা জানানোর কারণও তাই—বিবেকানন্দের আন্দোলনের অংশরূপেই তার ঐ প্রাপ্তি। বিবেকানন্দ-আন্দোলন অনেকের কাছেই তখন ভারতের নবজাগরণের আন্দোলন। নচেৎ প্রবুদ্ধ ভারতের আবির্ভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচিত হত না।২৩

---

with that view, endeavour to present the sacred truths of Hindu religion and the sublime and beautiful ideal of the Vedanta in as simple, homely and interesting a manner as possible and amongst others, will contain 'Pouranic' and Classical episodes,. . . philosophical tales,. . .lives and teachings of great sages and Bhaktas irrespective of caste, creed or nationality." [Quoted in the *Mirror*, June 14, 1896].

'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটি স্বামীজীর কাছ থেকেই পাওয়া। আগেই দেখেছি, তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে একটি সংঘ স্থাপন করতে বলেছিলেন। সেই সংঘ-নামটি পত্রিকার নাম হিসাবে নেওয়া হয়, কিংবা স্বামীজী পত্রিকার জন্য ঐ নামটি নিতে বলেন, বলতে পারব না।

২৩ মিরার, প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসপেকটাস পেয়ে ১৪ জুন, ১৮৯৬, দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখেছিল, একথা আগেই বলেছি। ব্রহ্মবাদিন স্বভাবতই ৪ জুলাই সংখ্যায় এই পত্রিকার পরিচয় দেয়। পত্রিকাটি বের হবার পরে তার এক বা একাধিক সংখ্যা পেয়ে সংবাদপত্রগুলি বিস্তারিত আলোচনা করে, যার বড় অংশ প্রশংসাপূর্ণ। বৌদ্ধ মুখপত্র মহাবোধি সোসাইটি জার্নাল (অক্টোবর, ১৮৯৬) অত্যন্ত খুশি হয়েছিল এই কারণে যে, "পত্রিকাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য—অপর ধর্মের বিরুদ্ধে এর কোনো গোঁড়ামি বা বিরুদ্ধ মনোভাব নেই।" বেদান্তের উদার সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ ভারতের মত এই পত্রিকা সাদরে উপস্থিত করেছিল : "মানবের কাছে মানবতা যে-জিনিস, বিভিন্ন ধর্মের কাছে বেদান্ত তাই। বেদান্ত—ধর্মসমূহের সার, তার অন্তর্নিহিত ঐক্যের দর্শন।...বিজ্ঞানের ...সঙ্গে বেদান্তের বিরোধ নেই। প্রয়োজন, বিজ্ঞানকে ধর্মচেতনায় মণ্ডিত করা এবং ধর্মকে যুক্তিতে গ্রথিত করা।" মহাবোধি আরও লিখেছিল, "চিন্তার ঐশ্বর্য, সুরের মহত্ত্ব, এবং দৃষ্টিভঙ্গির উদার বিস্তৃতি এই পত্রিকার রচনায় বিশেষরকম লক্ষিতব্য।" মাদ্রাজ মেল ৭ জুলাই, ১৮৯৬, পত্রিকাটিকে অভিনন্দন জানিয়ে, প্রথম সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের দুটি রচনার উল্লেখ করেছিল, এবং বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই পত্রিকায় প্রকাশিত দক্ষিণ ভারতের অচ্ছুৎ সাধু নন্দের জীবনকাহিনীর দিকে। থিয়জফিস্ট, অগস্ট ১৮৯৬ সংখ্যায়, এই পত্রিকার "প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির" উল্লেখ করে বলে, "পত্রিকাটির প্রবর্তকেরা যুগধর্মের এবং ভারতের বিশেষ প্রয়োজনের বিষয়ে অবহিত, এবং তার সম্মুখীন হতেও প্রস্তুত।" প্রবুদ্ধ ভারতের প্রসপেকটাস কিয়দংশে অতঃপর উদ্ধৃত হয়। অক্টোবর সংখ্যায় আমেরিকা থেকে থিয়জফিস্ট পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত

প্রকাশের অব্যবহিত পরে প্রবুদ্ধ ভারত সত্যই "অভাবিত" সাফল্য অর্জন করেছিল, কারণ দেখা যায়, এক বৎসরের মধ্যে সে সমগ্র ভারতবর্ষে "সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা।" বর্ষপূর্তিতে এই সংবাদ জানাবার কালে পত্রিকার ২৫ বৎসর বয়সী সম্পাদক খুবই ভাবাবেগ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, যা তাঁর বয়সের একজন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি সহ-কর্মীদের "উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতা এবং হৃদয়ের পবিত্রতার কথা" বলেছিলেন, স্বামীজীর আশীর্বাদেই যে এত সাফল্য, তাও বলেন। এক বছর পত্রিকা চালিয়ে কোন্ সর্বোত্তম শিক্ষা

এক পত্রলেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত হয় : "প্রবুদ্ধ ভারত আরম্ভ করেছেন যেসব মহৎ-হৃদয় তরুণগণ ঈশ্বর তাঁদের আশীর্বাদ করুন।" থিংকার (যা পূর্বে ছিল থিয়জফিক থিংকার; কিন্তু থিয়জফির সবকিছুকে মানতে অসমর্থ হওয়ায় নতুন নাম নেয় 'থিংকার') ৮ অগস্ট, ১৮৯৬, পত্রিকাটির প্রথম কয়েক সংখ্যার বিষয়-পরিচয় দিয়ে অভিনন্দন জানায়। আর্য বালবোধিনী (জুলাই, ১৮৯৬) অত্যন্ত প্রশংসা করে লেখে : "শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটিতে বহুল পরিমাণে প্রয়োজনীয় এবং আনন্দজনক বিষয়বস্তু রয়েছে। বর্তমান সংখ্যাটির [প্রথম সংখ্যা] বিষয়বস্তু দেখে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এই পত্রিকা যুবকগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী হবে, যেমন হয়েছে ব্রহ্মবাদিন অধিক পরিণত মন ও বয়সের মানুষদের পক্ষে।..যদি স্বামী বিবেকানন্দের মতো বিরাট পুরুষ একে উপদেশ ও রচনাদিব দ্বারা পুষ্ট করে যেতে থাকেন, তাহলে স্বচ্ছন্দে আশা করা যায়, অ্যাওকেনড্ ইন্ডিয়ান বহুল প্রচার হবে, এবং জড়বাদের জালে আবদ্ধ বহু যুবক শীঘ্রই ভারতীয় ধর্মের আত্মোন্নতিকারক গৌরব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে।" চিদাম্ববম থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্ম-বিদ্যা' নামক দ্বিভাষী পত্রিকা (তামিল-ইংরাজি) ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ সংখ্যায় প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম দু'সংখ্যার বিচার করে বলে, প্রবর্তকরা পত্রিকাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

কেবল প্রশংসা নয়, অল্পবিস্তর সমালোচনাও হয়েছিল। কিছু বিস্ময়কর ছিল 'হিন্দু'র সমালোচনা। ১৮৯৬, ২ জুলাই-এর দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনার সবটাই ব্যঙ্গাত্মক। যে-হিন্দু পূর্বাবধি স্বামী বিবেকানন্দের আন্দোলনের বিষয়ে সমাদরের মনোভাব দেখিয়েছিল, সে এই ধরনের আক্রমণাত্মক সম্পাদকীয় কেন লিখেছিল? আমাদের মনে হয়, প্রবুদ্ধ ভারতের যুবক পরিচালকদের আতিশয্যপূর্ণ আত্মপরিচয় হিন্দুর কাছে অসহ্য ঠেকেছিল, এবং জড়বাদকে নির্বিচার আক্রমণ সে পছন্দ করেনি। পরিচালকদের কারো-কারো বিষয়ে ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণাও হিন্দু-সম্পাদকের থাকতে পারে। তাছাড়া হিন্দুর তৎকালীন সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য আয়ার পাশ্চাত্ত্য জীবন-রীতির পক্ষপাতীও ছিলেন। জড়বাদে হাবুডুবু-খাওয়া বিভ্রান্ত তরুণদের উদ্ধার করার বাসনা প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক প্রকাশ করেছিলেন; তাতে 'হিন্দু' লিখেছিল : হায়, তিনি বা তাঁরা, ঐ পাশ্চাত্ত্য জড়বাদমূলক শিক্ষারই উৎপাদন। "আমরা জানতে পারিনি যে, ভারতে সত্যই এহেন বাড়াবাড়ি-রকম জড়বাদ আছে, কিংবা আধ্যাত্মিকতার এমনই অভাব হয়েছে যে [হিন্দু লিখেছিল], তা সৎ-হৃদয়কে উৎপীড়িত করছে, এবং পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদী শিক্ষার সন্তান গ্রাজুয়েটগণকে...প্রণোদিত করেছে তাঁদের দেশবাসীকে স্থূলতর কিন্তু জীবনযাত্রার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু-সন্ধান থেকে সরিয়ে আনাবার প্রচেষ্টায়।. আমাদের জানানো হয়েছে, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পরিণয়বন্ধনের আর দেরী নেই, এবং তা হবে ইতিহাসের সবচেয়ে এক ফলপ্রদ রোমান্টিক বিবাহ।' স্বামী বিবেকানন্দ হবেন এই বিবাহের পুরোহিত, এবং তার ফল হবে—সর্বপৃথিবীতে উপনিষদের ভাব-বীজের বিস্তার। অর্থাৎ ইউরোপের পক্ষে রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, বণিক, মহাজন, ভ্রমণকারী, সাম্রাজ্যস্থাপক ইত্যাদি সৃষ্টি করার সম্ভাবনা প্রায় থাকবে না—তাদের সেরা লোকেরা ব্যাস, পরাশর, ধর্মপুত্রের ছাঁচে গড়ে উঠবে। আর, আমাদের দেশবাসী আত্মার সমুদ্রে আরও বেশি ডুব দিয়ে, নৈরাশ্যপূর্ণ স্বপ্নে কালহরণ করবে, যে-কাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে করার ফলে পূর্বতন এক পৌরুষপূর্ণ, আনন্দময় প্রগতিশীল জাতি [অর্থাৎ আর্য জাতি] বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে।" মরাঠা অপরপক্ষে ১২ জুলাই, ১৮৯৬ সংখ্যায় সম্পাদকীয় টীকায় সম্পাদকের রচনাভঙ্গিতে প্রাচ্য আতিশয্য সম্বন্ধে ঈষৎ আপত্তি জানালেও, "এই পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠা ঐকান্তিকতার সুরে ঝঙ্কৃত"—তা না বলে পারেনি। এইসঙ্গে সমূহ প্রশংসা করেছিল স্বামীজীর রচনাগুলির।

প্রবুদ্ধ ভারতের জুন, ১৮৯৭ সংখ্যায় অনেকগুলি প্রশস্তিসূচক পত্র উদ্ধৃত হয়, তার মধ্যে ধর্মপাল ও অ্যানী বেশান্ত-সহ বিদেশীয় নানা ব্যক্তি ও পত্রিকার বক্তব্য ছিল।

লাভ করেছেন, সে প্রসঙ্গে না বলে পারেন নি, "উদ্দেশ্যনিষ্ঠা ও হৃদয়ের পবিত্রতা এই লৌহযুগে পর্যন্ত অলৌকিক কান্ড ঘটায়।" নিজেদের নিঃস্বার্থ প্রয়াসের ব্যাপারে কিছু উচ্চভাষিত অবশ্যই হয়েছিলেন তিনি : "নাম যশ, প্রতিপত্তি, টাকাকড়ি প্রভৃতি লাভ করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। পত্রিকাটি আরম্ভ করার বাসনা যেন আমরা দৈববশে পেয়ে গিয়েছিলাম; এবং ভবিষ্যতে এর ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, এই কাজে আমাদের যে সম্পূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে প্রবেশ করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। ...আমরা যথাস্থান থেকে অনুমতি চেয়েছিলাম, তা পেয়েছিলাম, এবং আমাদের 'সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল'।"

[চার]

সত্যই এই পত্রিকাটি (সেইসঙ্গে ব্রহ্মবাদিন) অল্পকালের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল—তার অব্যর্থ প্রমাণ—মিশনারি পত্র-পত্রিকাগুলির কোলাহল। তাদের কাছে এই পত্রিকার বক্তব্য, সেইসঙ্গে নাম পর্যন্ত যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। নামটি অসহ্য হতেই পারে, কারণ ভারত 'প্রবুদ্ধ' হোক—অন্ততঃ ভারতীয় ধর্মাদর্শ অবলম্বন করে প্রবুদ্ধ হোক—এটা তাদের কাছে চরম অবাঞ্ছিত ব্যাপার। মিশনারি পত্রিকাগুলি নানাভাবে এই পত্রিকাকে আক্রমণ করেছে। তবে তাদের মধ্যে বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন যারা তারা একই সঙ্গে এই পত্রিকার শক্তিকেও স্বীকার করেছিল।

সোফিয়া পত্রিকায় অগস্ট ১৮৯৬ সংখ্যায় প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যার আলোচনায় পত্রিকাটির "প্রচ্ছদ ভালো এবং এটি সুলিখিত" বলার পরে মতের সমালোচনা করা হয়। সেই একই কাজ সোফিয়ায় অতঃপর ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতি সংখ্যায় করা হয়েছে—কেবল প্রবুদ্ধ ভারতের মতের বিরুদ্ধে নয়, ব্রহ্মবাদিন সম্পর্কেও।

মিশনারি পত্রিকা 'প্রগ্রেস' ১৮৯৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, সানন্দে প্রবুদ্ধ ভারত সম্বন্ধে হিন্দুর ব্যঙ্গাত্মক লেখার অংশ উদ্ধৃত করেছিল (যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি), তারপর সে প্রবুদ্ধ ভারতের যোগী-আদর্শের শ্রাদ্ধ পাকিয়েছিল যথেষ্ট জায়গা নিয়ে। একই মহৎ কাজে সে নিযুক্ত ছিল ১৮৯৬ নভেম্বর সংখ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে, কারণ তিনিই প্রবুদ্ধ ভারত নামক ব্যাপারটির মূলে। বিবেকানন্দ-বিষয়ক বিদ্রূপবহুল লেখাটির নাম ছিল—*The Rishi of 'Awakened India'*. অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রগ্রেস পরবর্তী-কালে, ডিসেম্বর ১৯০২ সংখ্যায়, একটি দীর্ঘ লেখা ছাপে, যা প্যামফ্লেট আকারেও প্রকাশিত হয়, তার নাম ছিল—*The Call of the Twentieth Century to Awakened India.*

'অ্যাওয়েকেনড্ ইন্ডিয়া' কথাটি ভারতবাসীর মনে ধরিয়ে দেওয়ার মতো অপরাধকে বিখ্যাত মিশনারি পত্রিকা হার্ভেস্ট ফিল্ডের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব ছিল না। ১৮৯৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় "রেস্টলেস ইন্ডিয়া" নামক সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এতে বেরোয়। গোটা রচনাটিতে প্রবুদ্ধ ভারতের বক্তব্য খন্ডনে আপ্রাণ প্রয়াস। ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা দেখাতে, এবং খ্রীস্ট ছাড়া যে ভারতবর্ষের ত্রাণ নেই তা বোঝাতে, সম্পাদকের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই লেখাটি থেকে দেখা যায়, এঁরা প্রবুদ্ধ ভারত (ও ব্রহ্মবাদিনের) আবির্ভাবে কি রকম বিচলিত। এতদিন ভারতবাসীর পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতিতে ইংরাজি ভাষায় মিশনারিদের মত খন্ডনের বিশেষ চেষ্টা হয়নি। যেটুকু হয়েছিল, তার পিছনে জাগ্রত জনসমর্থন ছিল না। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের প্রভাবে সে জিনিসটি ঘটায় পত্রিকাটি বেসামাল হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক রঙ্গাচার্যের বেদান্ত-বিষয়ক মত উদ্ধৃত করে সে তাকে খন্ডন করতে চেয়েছিল, এবং নিজের মতের পক্ষে ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার পত্রিকার বক্তব্য উদ্ধৃত করেছিল। মিশনারিদের ভারত-কুৎসার বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ ভারত আপত্তি জানিয়েছিল;

তার প্রতিবাদ ক'রে, উক্ত কুৎসা-কর্মের ঔচিত্যও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল এই মিশনারি পত্রিকাটি। প্রবুদ্ধ ভারতের শক্তিকে অস্বীকার করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একে মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বলতে হয়েছিল—এসব হবেই, না হবে কেন, ভারত যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পেয়ে চঞ্চল হয়েছে, তাই এখন কিছু-একটা করতে ব্যস্ত।২৪ এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় (অক্টোবর, ১৮৯৭) ভারতবর্ষে শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রেভারেণ্ড টি ওয়াকারের যে দারুণ হুংকার প্রকাশিত হয়েছিল (প্রথম খণ্ডে তার কথা বলেছি), সেই যুদ্ধ-পত্রের শিরোনামা ছিল—*The Awakening of India*, যার শেষ বাক্যে ছিল স্বামীজীর মতের প্রতিবাদ : "The giant is not awakened."

বুদ্ধিমান মিশনারি রেভারেণ্ড স্লেটার (যাঁর বিষয়ে অনেক উল্লেখ প্রথম খণ্ডে আছে) কিন্তু তাঁর বাৎসরিক রিপোর্টে ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারতের প্রভাবকে স্বীকার করে, সে-বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।২৫ স্লেটারের একটি গ্রন্থের আলোচনাকালে হার্ভেস্ট

---

২৪ "A band of so-called reformers are dissatisfied with the present, but they believe India has really awakened to a true sense of her condition and destiny, and they issue their message to the world as 'Awakened India.' All this is to us indicative of the power that has entered India, taking possession largely of the youth of the land. ...That power has come from the West in many forms... Swami Vivekananda is apparently the inspirer of a new paper just begun in Madras, called *Awakened India.* This periodical very accurately reflects the restlessness, the vagueness, the patriotism, the exaggeration both in style and sentiment, the feeling that India has in herself all necessary moral and spiritual nourishment, so prevalent at the present time... This paper has called forth a chorus of praise in certain quarters, though in others it has been less favourably reviewed." [*Harvest Field*, Sep. 1896, *The Restless India*].

২৫ "In reflecting on another year of most interesting work in this ancient land, the impression that stands out most vividly is that of an *Awakened India.* The religious indifference of the educated Hindu is fast coming to an end. The scepticism that was in vogue ten or twenty years ago, is now old-fashioned. In the place of Bradlaugh's and Ingersol's tracts...we see now pamphlets and journals set apart for the propagation of the truths of the Hindu religion... Within the last eighteen months, two high-class journals—the *Brahmavadin* and the *Prabuddha Bharata* or *Awakened India*—conducted by Hindu graduates of the Madras University, and aided by Swami Vivekananda, of Chicago fame, have been started in this city for the exposition of the truths of the Vedanta". [*Harvest Field,* April 1897].

ব্রহ্মবাদিন-জাতীয় পত্রিকায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ রূপের সমর্থনে যেসব যুক্তিপূর্ণ লেখা হচ্ছিল, তাদের শক্তিকে বাৎসরিক রিপোর্টে স্বীকার করেছিলেন চিকবালপুর লণ্ডন মিশনের রেভারেণ্ড ই পি রাইস। ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এঁদের বিস্মিত করেছিল।

"This local change is but part of a similar change taking place with great rapidity all over India. In no previous year would it have been possible to give so many and notable illustrations of this great transition... Hinduism...now-a-days represented in very different colours from what it was a few years ago... Now it is made to rest wholly on the Upanishads and the Bhagabad Gita... Now the principal and most scholarly organ for the defence of Hinduism assures its readers that 'Hinduism has lent no kind of moral or intellectual support to caste distinctions.' (*Brahmavadin,* Oct. 24, 1896, page 42). Once the

ফিল্ড পত্রিকায় অগস্ট ১৯০২ সংখ্যায় জে এ ভেনস্ ব্রহ্মবাদিন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ইংরাজি মাসিক ব্রহ্মবাদিন অতীব সামর্থ্যের সঙ্গে এই কাজ [প্রাচীন হিন্দু মতবাদের সঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের সমন্বয়] করে যাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস এক বিরাটসংখ্যক প্রভাবশালী গ্রাজুয়েটকে একেবারে বশীভূত করে ফেলেছেন, এবং তাদের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছেন যে, [হিন্দুধর্মের] প্রাচীন রচনাসমূহকে সঙ্গতভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়।" [মূল ইংরাজি ১ম খণ্ডে, ৩৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে]।

[পাঁচ]

এমনই একটি পত্রিকা প্রবুদ্ধ ভারত—মধ্যাহ্নদীপ্ত—আরম্ভের ঠিক দু'বছর পরে (১৮৯৮ জুন মাসে) এতে একটি সম্পাদকীয় বেরুল—*Farewell*—বিদায়!—তার মানে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হল!! এরই নাম "মধ্যাহ্নে অন্ধকার।"

অন্ধকার অবশ্য অনন্ত রাত্রির অন্ধকার না হয়ে সূর্যগ্রহণের অন্ধকার হয়েছিল—কারণ মাত্র দু'মাসের মধ্যে পত্রিকাটির পুনরভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু ঐ বিস্ময়কর সমাপ্তির কারণ কি? আর্থিক অসুবিধা? না। 'ফেয়ারওয়েল'-এর মধ্যে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, "পত্রিকাটি পুরোপুরি ব্যবসায়িক সাফল্যলাভ করেছে।"২৬ পত্রিকাটির মৃত্যুর কারণ ভিন্নতর—সম্পাদকের মৃত্যু—যিনি ছিলেন এর "দেহ এবং প্রাণ।" "বিদায়" রচনার সূচনাতে এ-সম্বন্ধে বলা হয় :

"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে গ্রাহকদের জানাচ্ছি—বর্তমান সংখ্যার পর থেকে এই পত্রিকার প্রকাশ আমরা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ আমরা অনুভব করেছি, আমাদের সম্পাদক মিঃ বি আর রাজম আয়ারের অকাল মৃত্যুতে যে-ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ হবার নয়। বাইরের লেখকের অল্প-স্বল্প লেখা ও সংকলন ভিন্ন এই পত্রিকার বাকি সমস্তই এঁর রচনা, তাদের অনেকগুলিই এইসব ছদ্মনামে লিখিত হয়েছিল : 'টি সি নটরাজন', 'এম রঙ্গনাথ শাস্ত্রী' 'এ রেক্লুজ্', এবং 'নো-বডি নোজ্ হু।'"

রাজম আয়ার মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁর জীবন ঘটনাবহুল নয়। তাঁর দেহত্যাগের পরে প্রবুদ্ধ ভারতে জুন ১৮৯৮ সংখ্যায় 'জি এস কে'-লিখিত *Our Late Editor* রচনা থেকে জানতে পারি, মাদুরা জেলার বাটলাগুণ্ডু গ্রামে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। বাল্যে খেলাধুলো ইত্যাদিতে আসক্তি ছিল না। মাদুরা থেকে এফ-এ পরীক্ষায় পাস করে ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে এসে ক্রীশ্চান কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে বি-এ পাস করেন ১৮৮৯ সালে। পরবর্তী তিন বৎসরে যখন তিনি মাদ্রাজে ল' কলেজের ছাত্র, তখন ইংরাজ কবি ও ঔপন্যাসিকদের রচনাপাঠে মনোযোগ দেন। তিনি কল্পনা ও অনুভূতিশক্তি নিয়ে ইংরাজি সাহিত্যের জগতে বিচরণ করতেন, বিশেষতঃ শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশেষ প্রভাব তাঁর উপরে ছিল। এঁদের কাব্যের মধ্যে "সত্য, শক্তি ও সৌন্দর্যের জন্য গভীর ব্যাকুলতা" ইনি দেখেছিলেন; তা এঁকে সত্য ও আত্মার অন্তর্নিহিত রূপকে জানবার আগ্রহে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল। কেবল ইংরাজ কবিগণ নন,

---

Hindu glorified in the fact that his was not a proselytising religion. Now the claim is made that it is the Universal Religion and proposals are made to send its missionaries into all lands." [*Harvest Field,* March, 1897].

২৬ তা হলেও, প্রবুদ্ধ ভারতের পরিচালনার ব্যাপারে কিছু অব্যবস্থা ঘটছিলই। স্বামীজী মার্চ, ১৮৯৮-এর এক চিঠিতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন : "প্রবুদ্ধ ভারত অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে মনে হয়। তার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো।"

বিখ্যাত তামিল ঋষি-কবি থায়ুমনবরের কাব্যের অধ্যাত্মসৌন্দর্যে তিনি অবগাহন করেছিলেন, এবং তাঁর কাছে তামিল কবি কম্বনই ছিলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ কবিপ্রতিভা। ১৮৯২ সালে ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে একটি সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময়ের পরেই 'বিবেক চিন্তামণিতে' তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'কমলাম্বল' ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন। মহান তামিল কবি কম্বন-কে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসে রাজম ঐ কবির ঐশ্বর্যময় বাগ্‌ধারার পুনঃপ্রয়োগ করেন। শেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কল্পনার সূক্ষ্ম রসসঞ্চারের চেষ্টাও এর মধ্যে করেছিলেন, হিন্দু গৃহজীবনের সুন্দর ছবিও ছিল। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল "অশান্ত আত্মার অন্তর্গহনের তীব্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তোলা", যে-আত্মা "বহু যন্ত্রণার অন্তে অবশেষে পেয়েছিল অকলুষিত বিশুদ্ধ সায়রের সন্ধান, যেখানে তার যুগ-যুগের জ্বলন্ত তৃষ্ণা প্রশমিত হবে।" এইকালেই রাজম বেদান্ত দর্শনের প্রভাবে আসেন, স্বামী বিবেকানন্দকেও 'সম্ভবতঃ' দর্শন করেন, এবং দেখা যায়, তাঁর উপন্যাসের পরিণতিতে বেদান্তের দার্শনিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। কবিতার সৌন্দর্যের অতিবড় ভক্ত হলেও, ঐশ্বরিক চেতনার বিরাট তত্ত্বের কাছে কাব্যানুভূতিকে তিনি খুব সীমাবদ্ধ ব্যাপার বলে মনে করেছিলেন—বড় জোর তা যেন মন্দিরের প্রবেশপথে একটি বিশ্রামাগার।

রাজম ১৮৯৬ সালে একবার গুরুতর অন্ত্র-পীড়ায় আক্রান্ত হন। ১৮৯৮ সালে মূত্রাশয়ের ব্যাধিতে তাঁর দেহান্ত হয়। মৃত্যুকালে পত্নী এবং বৃদ্ধ পিতামাতাকে রেখে গিয়েছিলেন।

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হল—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে রাজম আয়ারের উল্লেখ প্রায় নেই। এমন হবার কারণ—স্বামীজীর প্রকাশিত পত্রাবলীতে রাজম অনুল্লেখিত। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, রাজম স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন নি। কিন্তু রাজম যে স্বামীজীর দ্বারা সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তা প্রত্যক্ষদর্শী পি এন শ্রীনিবাসাচারীর স্মৃতিকথায় (বেদান্তকেশরী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬) পাওয়া যায় :

"এই মাদ্রাজে আমরা কয়েকজন স্বামীজীর বিরাট জীবনসৃষ্টিকারী সত্তাজাগরণী শক্তির প্রত্যক্ষদর্শী। আমি নিজে ও-বিষয়ে জানি। ৬০ বছর আগেকার ঘটনার কথা বলছি। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা যাবার আগে স্বামীজী মায়লাপুরে দুটি সত্তাকে জাগিয়েছিলেন। তার একজন—বি আর রাজম আয়ার—'র‍্যামবলস্ ইন বেদান্ত' গ্রন্থের অমর লেখক। স্বামীজী রাজমকে দেখেন, তাঁকে দিব্য আবেশ দান করেন, তার ফলে রাজম অধ্যাত্মরসে নিমজ্জিত হয়ে যান। অপরজন সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র। স্বামীজী তাঁকে খুবই ভালবাসতেন, 'কিডি' বলে ডাকতেন। সিঙ্গারাভেলু প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দেন, সংসার ত্যাগ করেন, এবং স্বামীজীর পদে আত্মসমর্পণ করেন। এমনই ছিল স্বামীজীর চৌম্বকশক্তি, প্রাণসৃষ্টিকারী, সত্তাসৃষ্টিকারী অলৌকিক শক্তি। আমি নিজে সে জিনিস দেখেছি।...আসলে স্বামীজী নন—ঐসব মানুষদের নির্মাণ করেছিল স্বামীজীর দারুণ অগ্নিময় দৃষ্টি—ব্রহ্মণ্য-শক্তিতে জ্বলন্ত সেই দৃষ্টি।"

প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত রাজমের প্রবন্ধ সংকলন করে যে "র‍্যামবলস্ ইন বেদান্ত" বই বেরোয় তাতে শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদান্ত-বিগ্রহরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। সাধারণে রাজমকে স্বামীজীর শিষ্য বলেই জানত।[২৭] কিন্তু ঠিকভাবে বলতে গেলে রাজম স্বামীজীর শিষ্য

---

২৭ স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে 'মালাবার মেল' লেখে :

"And that famous periodical, edited also at his [Swamiji's] instance by the late Mr B. R. Rajam Ayer, who too like his master [Vivekananda] died alas ! too early."

ছিলেন না। স্বামীজীর প্রভাবে উদ্বোধিতচিত্ত রাজম ১৮৯৪ সাল থেকে বৈদান্তিক চেতনাকে নিজ জীবনে লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, এবং তাঁর অন্তর্জ্বালা নিবারণ করাতে পারেন এমন মানুষ খুঁজতে থাকেন। স্বামীজী তখন এদেশে নেই। ১৮৯৫ [১৮৯৬?] সালে রাজম মাদ্রাজ শহরে তাঁর বাঞ্ছিত মানুষের সন্ধান পান, ও সেই 'মুনি'র কাছে দীক্ষা নেন। তাঁর নির্দেশে রাজম সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন—এমন যে, প্রবুদ্ধ ভারতের কাজ তাঁর কাছে ভারস্বরূপ মনে হয়। এই সাধনার আতিশয্য তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ, কোনো-কোনো মহলে এমন গুঞ্জন ওঠে, যার প্রতিবাদ করেন 'জি এস কে' তাঁর পূর্ব-কথিত 'আওয়ার লেট এডিটর' রচনায়।

এই 'জি এস কে' রাজমের গুরুর অন্যতম শিষ্য। ইনি এবং এঁর মতো কয়েকজন পূর্ব থেকেই উক্ত গুরুর প্রভাবাধীন ছিলেন। এঁরাই রাজমকে ঐ গুরুর কাছে নিয়ে যান, তা 'বিদায়' রচনার মধ্যে দেখতে পাই। এখন, রাজমের ব্যক্তিগত গুরুর প্রসঙ্গটির বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন থাকত না, যদি ঐ ব্যাপারটি প্রবুদ্ধ ভারতের উপর প্রভাববিস্তার না করত। 'জি এস কে' জানিয়েছেন, এই গুরুর সংস্পর্শে আসার পরে রাজম এঁরই চিন্তার প্রতিধ্বনি প্রবুদ্ধ ভারতে করে গেছেন, এবং এই গুরু বলেছিলেন, রাজমের রচনা "প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ।" 'জি এস কে' দাবি করেছেন—প্রবুদ্ধ ভারতের জনপ্রিয়তার মূলে এই নতুন ধরনের বেদান্ত ব্যাখ্যা; এবং যেহেতু রাজম আয়ার ছাড়া ঐ প্রকার ব্যাখ্যা আর কারো স্বারা করা সম্ভব নয়, তাই এঁরা পত্রিকা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।২৮

মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকা সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সংখ্যায় রাজমের *Rambles in Vedanta* বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলে :

"The late Swami drew together a large body of young men, fired with lofty ideals and patriotic fervour, ready to work for the intellectual and moral elevation of their countrymen. Among those...was the late Mr B. R. Rajam Aiyer, then young man of about 23, fresh from the college. When Swami Vivekananda urged on the community in Madras the necessity of establishing a journal,...Rajam Aiyer was among the very few who gave themselves up heart and soul to this laudable work."

২৮ "To those who could read between the lines it must have been evident that the *Prabuddha Bharata* presented a peculiar interpretation of Vedanta, and in this sense the journal had a marked individuality or personality, that of its editor, or of the sage, his Guru. It is our belief that the extraordinary popularity of the journal was due not so much to the Vedanta...as to the peculiarly beautiful and non-mystical interpretation which the journal presented. As there is none to our knowledge who can rightly fill the place of the saint-editor whom we have lost, we are unabble to continue the journal as other journals or magazines might under similar circumstances have been continued."

[*Prabuddha Bharata*, June, 1898, *Our Late Editor*].

প্রবুদ্ধ ভারতের ক্ষেত্রে রাজমের ভূমিকার গুরুত্ব বিষয়ে থিয়জফিস্ট পরিচালিত আর্য বাল বোধিনী জুন ১৮৯৮ সংখ্যায় লেখে :

"The *Awakened India* was his [Rajam's] child... The respectable position which the magazine had attained to among the religious journals of India was due entirely to his deep knowledge of Vedanta, his remarkable power of exposition, and the wonderful felicity with which he popularised the doctrines of Karma and Free Will."

এখানে একটি প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে—প্রবুদ্ধ ভারত যেখানে ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা, এবং আর্থিকভাবে সফল—সেখানে সম্পাদকের মৃত্যুতে পত্রিকা কেন বন্ধ হয়ে যাবে? প্রবুদ্ধ ভারত তো রাজম আয়ার এবং তাঁর গুরুর ভাবনা প্রকাশের জন্য আরম্ভ হয়নি। অর্থাৎ পত্রিকাটি কি কয়েকজনের করায়ত্ত হয়ে পড়েছিল ('জি এস কে' যাঁদের অন্যতম), যার জন্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তিরা বিরক্ত হয়েছিলেন এবং সরে গিয়েছিলেন? সর্বোপরি রাজমের "বিচিত্র ধরনের বেদান্ত ব্যাখ্যা" স্বামীজী কি পছন্দ করেছিলেন?

[ছয়]

রাজম আয়ার-সম্পাদিত প্রবুদ্ধ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি যে স্বামীজীর সম্পূর্ণ অনুমোদন পায়নি তার প্রমাণ—নবপর্যায়ের প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সম্পাদকীয়। ১৮৯৮ জুন মাসে প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যায়—মাত্র এক মাস বাদ দিয়ে তার নবপর্যায় শুরু হয় অগস্ট থেকে। প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যেতে অনেকেই দুঃখিত হয়েছিলেন। স্বামীজীর কাছে ব্যাপারটি বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল। শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই এই ঘটনা বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত বেদান্ত-আন্দোলনের সংগঠনের পক্ষে অন্যতম পরাজয়ের নিদর্শন বিবেচিত হয়। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে এ-ধরনের পরাজয়-স্বীকৃতি মারাত্মক। তাছাড়া আরও একটি প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয়ে গেছে—তার মুখপত্র চাই। ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারত বিবেকানন্দ-সমর্থক, কিন্তু বিবেকানন্দ-স্থাপিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পত্রিকা তারা নয়; তাদের মালিকানা অন্যের (স্বামীজী ব্যক্তিগতভাবে মালিকানা নিতে রাজি হননি); তারা নীতির ব্যাপারে স্বামীজীর মতাবলম্বী থাকতে পারে, অল্পবিস্তর ছিলও, কিন্তু তা থাকতে হবেই এমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। স্বামীজী যে-পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করেন নি, সে-অবধি ভক্ত সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা দিয়ে কাজ চলে যেত, কিন্তু প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরে তার বিশেষ বক্তব্য-প্রকাশক পত্রিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে—এবং প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সুপরিচিত পত্রিকাটিকে রামকৃষ্ণ মিশনের বাহন করার সুবিধা আসে। আমাদের বিশ্বাস, যদি প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ নাও হত, তথাপি রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে নিজস্ব পত্রিকা বার করা হত।২৯

নব পর্যায়ের প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যাতে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হল: প্রতিভাবান সম্পাদকের মৃত্যুতে যে-প্রবুদ্ধ ভারতের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, তা আবার পাশ্চাত্ত্য পুরাণ-কথিত ফিনিক্স পাখির মতো নিজের ভস্মরাশির মধ্য থেকে নিজ কর্মফলে জাগরিত হয়েছে; পূর্ববর্তী দুই বৎসরে পত্রিকাটি সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছে; ভবিষ্যতে এই নবপর্যায়ের পত্রিকা একই ধারাতে চলবে, ইত্যাদি। তার পরেই কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথা দৃঢ়ভাবে জানানো হয়। প্রবুদ্ধ ভারতের আগেকার প্রচ্ছদ এবং মটো বদলে দেওয়া হল।

---

২৯ প্রবুদ্ধ ভারতের নীতি সম্বন্ধে স্বামীজীর অননুমোদনের ইঙ্গিত কয়েকটি পত্র থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করা যায়, তবে এটা সম্পূর্ণই অনুমানমূলক। স্বামীজী ১৮৯৭, ৯ জুলাই, ব্রহ্মানন্দকে লেখেন, "মেটিরিয়াল জোগাড় করছ না কেন, আমি নিজেই এসে কাগজ স্টার্ট করব।" এই কাগজ কি উদ্বোধন? মনে হয় না। পরের দিন মিস ম্যাকলাউডকে স্বামীজী লিখেছেন, "মাদ্রাজে শীঘ্রই একখানা পত্রিকা আরম্ভ করা হবে, গুডউইন সেই কাজে সেখানে গেছে।" এই পরিকল্পিত পত্রিকাই বা কোন্ পত্রিকা? নিশ্চয় কোনো দেশীয় ভাষার পত্রিকা নয়, যখন ইংরাজ গুডউইন সেই কাজে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজে তখন ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারত চালু আছে, তৎসত্ত্বেও স্বামীজী তৃতীয় পত্রিকার কথা ভেবেছেন—নিশ্চয় সেকথা ভাবতেন না, যদি ঐ দুটি পত্রিকা তাঁর সর্ববিধ প্রয়োজন পূরণ করছে মনে করতেন।

আগেকার প্রচ্ছদে যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের উক্তি অনুযায়ী ভারতীয় অরণ্য, পাহাড়, বটবৃক্ষতলে ধ্যানস্থ ঋষি, সেখানে আগত ইউরোপীয় দম্পতি ইত্যাদি আঁকা হয়েছিল। তখন মটো ছিল তৈত্তিরীয় উপনিষদের—He who knows the Supreme attains the Highsest. স্বামীজী এক চিঠিতে প্রচ্ছদের ব্যাপারে যে-আপত্তি করে পাঠিয়েছিলেন, তারই অনুসরণে নবপর্যায়ের প্রবুদ্ধ ভারতে সূচনার সম্পাদকীয়তে লেখা হল : শোপেনহাওয়ার যে-কালের কথা বলেছেন, সে-কালের পরিবর্তন হয়েছে, এখন ভারতীয় সন্ন্যাসীরাই পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে প্রবেশ করে ভারতীয় ধর্মসত্য প্রচার করছেন; সুতরাং ঐ ছবিটি anachronism বা কাল-বিরোধ দোষে দুষ্ট।৩০ প্রবুদ্ধ ভারতকে কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে। প্রাচীন ভারতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকা নয় (প্রবুদ্ধ ভারত যা থাকতে চাইছিল রাজম আয়ারের সম্পাদনায়)—প্রাচীনের ভিতর থেকে নতুনের অভ্যুত্থানই ছিল স্বামীজীর অভিপ্রেত। তদনুযায়ী পূর্বতন মটো বদলে এল নতুন মটো—কঠোপনিষদের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—এই মহাবাণীর বিবেকানন্দ-কৃত স্বচ্ছন্দ অনুবাদ: Arise, Awake, and stop not till the goal is reached." বলা হল, প্রবুদ্ধ ভারতের ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

[সাত]

স্বামীজীর অনেকগুলি স্বপ্নের মধ্যে সুন্দরতম একটি স্বপ্ন—হিমালয়ে অদ্বৈত আশ্রম। এই অদ্বৈত আশ্রমের সঙ্গে নবপর্যায়ের প্রবুদ্ধ ভারত যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। হিমালয় আশ্রমের স্বপ্নকে রূপায়িত যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার। প্রবুদ্ধ ভারত পরিচালনাতেও এঁদের বিরাট দান ছিল। এঁদের কথা, এবং স্বামীজীর হিমালয় আশ্রমের কল্পনার কথা, পরে আমরা বলব। বর্তমানে প্রবুদ্ধ ভারতের নির্দিষ্ট আলোচনাতেই নিবদ্ধ থাকা উচিত। স্বামীজী, আমরা দেখি, তাঁর প্রস্তাবিত হিমালয়-আশ্রমের সঙ্গে বহিরঙ্গ কর্মরূপে পত্রিকার কাজ জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ১৭ জুলাই, ১৮৯৮, ব্রহ্মানন্দকে লেখেন : *"আলমোড়ায় কাগজটা বাহির করিলে অনেক কাজ এগোয়, কারণ সেভিয়ার বেচারা একটা কাজ পায়, এবং আলমোড়ার লোকেও একটা পায়।"*

স্বামীজী, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার প্রভৃতির সঙ্গে আলমোড়া শহরে 'টমসন হাউস' নামক একটা ভাড়া বাড়িতে বাস করেছিলেন ১৮৯৮, মে-জুন মাসে। এখানে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার হ্যান্ড-প্রেসের ব্যবস্থা করে ফেলেন—এবং এখান থেকেই অগস্ট মাসে প্রবুদ্ধ ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। সম্পাদক—স্বামী স্বরূপানন্দ; ম্যানেজার—ক্যাপ্টেন সেভিয়ার। স্বামীজীর দুটি কবিতা এই সংখ্যাতে বেরিয়েছিল—*To the Awakened India* এবং *Requiescat in Peace*। প্রথম কবিতাটিতে তিনি নতুন ভারতের উদ্দেশ্যে উদ্বোধনের

---

৩০ পূর্বতন প্রচ্ছদচিত্রের উল্লেখ করার পরে নবপর্যায়ের প্রারম্ভিক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়: "If hardly needs saying that it is a phase long out of date. It would be an anachronism to continue to paint Western men and women straying to-day into Indian woods, and alighting, as if by the merest chance, upon a Hindu sage, and standing there, shy and uncertain, at a safe distance, ready to fly at a moment's notice, when as a matter of fact the Sannyasin's banner has been carried by the rising sun of the *Prabuddha Bharata* itself, to the very heart of the West, and that noble Truth...that behind this manifold curtain of existence there is Unity—is winning its way daily and hourly deeper into the hearts of men and women in the West, illuminating their science and philosophy, and giving a colour all its own, to their profoundest utterances." [*PB*, Aug. 1898, *Editorial Section*].

আহ্বান জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় কবিতায় এই নতুন ভারতের জন্য যে মহাপ্রাণ বিদেশী প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন, সেই গুডউইনের জন্য পরম শান্তি প্রার্থনা করেছিলেন। নতুন ভারত বলি চায়, প্রাণবলি, যে দেবে সে ধন্য—বিবেকানন্দের কবিতা দুটির মধ্যে ছিল সেই ইঙ্গিত।

আলমোড়ায় থাকাকালে প্রবুদ্ধ ভারতের চিন্তায় স্বামীজী কতখানি ব্যাপৃত থাকতেন, সে-বিষয়ে নিবেদিতা তাঁর "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে" গ্রন্থে লিখেছেন :

"এই সময়ে [জুন-জুলাই, ১৮৯৮] সদ্য-প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে [নিবেদিতা কিছু ভুল করেছেন; মায়াবতী আশ্রম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে আরও আট মাস পরে] মাদ্রাজ থেকে প্রবুদ্ধ ভারতের স্থানান্তর ব্যাপারটি আমাদের সকলের মন অধিকার করেছিল। এই কাগজটির প্রতি স্বামীজীর সব সময়েই বিশেষ ভালবাসা ছিল—তিনি যে-চমৎকার নামটি একে দিয়েছেন তার থেকে তা বোঝা যায়। তাছাড়া **নিজস্ব মুখপত্র প্রবর্তনেও তিনি সর্বদা উৎসুক ছিলেন**। আধুনিক ভারতের শিক্ষায় এই পত্রিকার মূল্য তাঁর কাছে স্বতঃ-প্রতীয়মান ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, এই পত্রিকার মারফত তাঁর আচার্যের ভাবনা ও বাণী ছড়িয়ে পড়বে—যেমন তা ছড়াবে প্রচার ও কর্মের দ্বারা। সুতরাং নিজস্ব পত্রিকা ইত্যাদির ব্যাপারে তিনি দিনের পর দিন ভেবেছেন—যেমন ভেবেছেন বিভিন্ন কেন্দ্রের কার্যের বিষয়ে। দিনের পর দিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির বিষয়ে কথা বলেছেন। এক অপরাহ্নে, যখন আমরা সকলে বসে আছি, তিনি একটি কাগজ এনে হাজির করলেন, যা, 'পত্রাকারে তিনি কিছু লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে কবিতা'—সে কবিতা—*To the Awakened India*।"

প্রবুদ্ধ ভারতের কাজে নিবেদিতার যোগদানের কথাও উঠেছিল। নিবেদিতা-গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কে পাই : "প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম সংখ্যা সদ্য এসেছে। সম্পাদকের সাহায্যার্থে নিবেদিতাকে আলমোড়ায় পাঠানোর বিষয়ে খুবই চিন্তা চলেছে।"৩১

আলমোড়া শহর থেকে বেশ কিছু মাইল দূরে মায়াবতীতে স্থায়ীভাবে হিমালয়-আশ্রম স্থাপিত হয়েছিল অদ্বৈত আশ্রম নাম দিয়ে, ১৮৯৯, ২১ মার্চ। সেখানেই স্থাপিত হয় প্রবুদ্ধ ভারতের কার্যালয়। সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি ছোট প্রেস, এবং কয়েকজন কর্মী।

লোকালয় থেকে বহুদূরে, নির্জন শ্বাপদসংকুল আরণ্য পর্বতে বসে পত্রিকা চালানো যে, সাধারণ কাজ নয়, বস্তুতঃ সাধনা, তা না বললেও চলে। খুবই সম্ভাবনা ছিল, বহিরঙ্গ কর্মকে গ্রাস করে ফেলবে আত্মানুসন্ধানের সর্বগ্রাসী আবেগ। তা হয়নি—স্বরূপানন্দ প্রাণপণ প্রয়াসে পত্রিকার মানকে উচ্চে তুলে রেখেছিলেন। স্বামীজী খুশি হয়ে নিউইয়র্ক থেকে অগস্ট ১৯০০, লিখেছিলেন, "স্বরূপকে বলবি, আমি তার কাগজ চালানোতে বিশেষ খুশি। He is doing splendid work." প্রশংসা এসেছিল অন্য নানা মহল থেকেও।৩২

৩১ *The Complete Works of Sister Nivedita,* Vol. 1, 361.

৩২ প্রবুদ্ধ ভারত বন্ধ হয়ে যেতে অনুরাগী মহলে যে-হতাশা দেখা গিয়েছিল, তা প্রবুদ্ধ ভারতের নব আবির্ভাবে কেবল দূর হয়নি, নতুন আশায় উচ্চকিত হয়েছিল সকলে, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ সরাসরি এই পত্রিকার পরিচালক হবেন, এমন ঘোষিত হয়েছিল। মাদ্রাজ টাইমস (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) সানন্দে লিখেছিল, প্রবুদ্ধ ভারত আবার বেরুবে, এবার স্বামী বিবেকানন্দের সম্পাদনায়। থিয়জফিস্ট (অক্টোবর, ১৮৯৮) প্রবুদ্ধ ভারতের পুনর্জন্ম সংবাদ দিয়ে বলেছিল—বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দই এর প্রধান পরিচালক ও লেখক। লাইট অব ট্রুথ বা সিদ্ধান্ত দীপিকা (সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) প্রবুদ্ধ ভারতের নব আবির্ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিল। লাইট অব দি ইস্ট (সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) স্বামীজীর পরিচালনার কথা জানিয়েছিল। নব আবির্ভাবের সংবাদ দেয় থিয়জফিক গিলনার (নভেম্বর, ১৮৯৮)।

সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দের কথা এই প্রসঙ্গে কিছু বলে নেওয়া উচিত। রামকৃষ্ণ সংঘে স্বরূপানন্দের যোগদানকে স্বামীজী 'অ্যাকুইজিশন' বা রত্নলাভ বলেছিলেন। ওকথা বলার কারণ নিশ্চয়ই তাঁর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চরিত্রের মহিমা। কিন্তু আরও কারণ ছিল। স্বরূপানন্দের সন্ন্যাস হয় ২৯ মার্চ, ১৮৯৮। ঐকালে স্বামীজী মিশনের নিজস্ব পত্রিকার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। স্বরূপানন্দের মধ্যে নিশ্চয় তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পত্রিকার ভাবী সম্পাদককে দেখতে পেয়েছিলেন। স্বরূপানন্দ পূর্বজীবনে ছিলেন অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ডন' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। তিনি অধিকন্তু কট্টর অদ্বৈতবাদী। স্বামীজী সত্যই একজন খাঁটি অদ্বৈতবাদী চাইছিলেন যিনি ভক্তিস্রোতে গা-ভাসান দেবেন না—রামকৃষ্ণসংঘের অন্তর্ভুক্ত, এবং একনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ-ভক্ত হয়েও রামকৃষ্ণ-মূর্তির পূজক হবেন না—যিনি অদ্বৈতবাদী অভারতীয়দের কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে ভারতীয় অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিনিধিত্ব করবেন, এবং সেই অদ্বৈত ভাবনার ভিত্তিতেই রামকৃষ্ণ সংঘের ইংরাজি পত্রিকাটি চালাবেন। স্বরূপানন্দ স্বামীজীর সেই আকাঙ্ক্ষিত শিষ্য।৩৩

প্রবুদ্ধ ভারত নবরূপে যে তার পূর্বতন রূপের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আকার ধরেছে, একথা আর্য-বাল বোধিনী (ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯) খোলাখুলি লিখেছিল :

"The tone of the magazine has, since the demise of the late editor, and its translation to Kumaon, distinctly changed and, in our humble opinion decidedly for the better... The journal contents itself with providing spiritual food and the right sort of it to millions and millions of seekers after truth."

দ্বিতীয় পর্যায়েও যে প্রবুদ্ধ ভারত সমচরিত্রের পত্রিকার মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত তা ব্রহ্মবাদিনের এপ্রিল, ১৯০০ সংখ্যায় দেখি :

"[The *Prabuddha Bharata*] is most widely circulated among the educated portion of the Indian nation."

৩৩ স্বরূপানন্দ দীর্ঘজীবী হননি। ১৯০৬ সালে তাঁর দেহান্ত হয়। মাইসোর হেরাল্ড পত্রিকায় ২৮ অগস্ট, ১৯০৬, তাঁর বিষয়ে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা হয় :

"The Swami was 38 years of age when he died. He took sannyasam 8 years ago and immediately became the editor of *Prabuddha Bharata.* He had also been the editor of *Dawn.* He was a devoted student of Sankaracharya and was very well-known for his Sanskrit and English scholarship."

প্রবুদ্ধ ভারতে স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পরে লিখিত শোকবার্তাটি হয় মাদার সেভিয়ারের লেখা, কিংবা তাঁর নির্দেশে লেখা। এর মধ্যে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠায় স্বরূপানন্দের প্রধান ভূমিকা, তাঁর ত্যাগ তপস্যা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কথা লেখা হয়। স্বরূপানন্দ আশ্চর্য শক্তিতে ধ্যানের জীবনের সঙ্গে কর্মের জীবনকে মিলিয়েছিলেন। এঁর সম্পাদনায় প্রবুদ্ধ ভারতের সাফল্য, তৎসহ তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে বলা হয় :

"It was under his able editorship that the *Prabuddha Bharata* attained to its present wide circulation. What he sought were the attainments of high ideals, which...emanated from.. .the greatest and purest aspirations and an inextinguishable belief in the truth of Advaita.."

এই কালেই নিবেদিতা, যিনি একদা স্বরূপানন্দের কাছে বাংলা ও সংস্কৃতের পাঠ নিয়েছেন, এবং ধ্যানশিক্ষাও করেছেন, তিনি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করেছিলেন প্রবুদ্ধ ভারতে এক রচনায়। তার মধ্যে তিনি স্বরূপানন্দের বিষয়ে পূর্বকথিত সংবাদগুলি দিয়েছিলেন (অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি, প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক, সংস্কৃতে পণ্ডিত, শঙ্করাচার্যের মতে বিশ্বাসী, ডন পত্রিকার সম্পাদক ইত্যাদি)—কিন্তু আরও গভীরভাবে বলতে চেয়েছিলেন তাঁর মহৎ আধ্যাত্মিক চরিত্রের কথা :

প্রবুদ্ধ ভারতের পরবর্তী ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এখনো জীবিত, সুপ্রচারিত, প্রভাবশালী এই পত্রিকাটি রামকৃষ্ণ সংঘ এবং বাইরের বহু শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মানুষের রচনায় পুষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে। স্বরূপানন্দের দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা কিছুদিন এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখেছেন। নিবেদিতার বহু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাঁর লেখা সমকালীন শিক্ষিত মহলে উচ্চ সমাদরের সঙ্গে পঠিত হত। স্বামী বিরজানন্দ বা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের [পূর্বে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা দেবব্রত বসু] মতো শক্তিশালী সন্ন্যাসী প্রবুদ্ধ ভারত ও মায়াবতীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নানা সংকটের সময়ে। তার পরে স্বামী অশোকানন্দের নির্ভয় মনীষাপূর্ণ রচনাদি এই পত্রিকার পৃষ্ঠাকে অলংকৃত করেছে। প্রবুদ্ধ ভারত উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলেছে।

॥ ৩ ॥ আরও কয়েকটি পত্রিকা-সংবাদ

স্বামীজীর চিঠিপত্র থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রস্তাবিত আরও দু'একটি পত্রিকার সংবাদ পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে ই টি স্টার্ডি গোড়া থেকেই পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহী। স্বামীজীর সঙ্গে স্টার্ডির যখন প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেনি, পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ, তখনই তিনি বেদান্ত-বিষয়ক পত্রিকার কথা স্বামীজীর কাছে উত্থাপন করেছিলেন। ১৮৯৫, ২৪ এপ্রিল, স্বামীজী নিউইয়র্ক থেকে তাঁকে লেখেন, "পত্রিকা বার করা বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু এসব করবার মতো ব্যবসাবুদ্ধি আমার একেবারে নেই। আমি শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার করতে পারি, মধ্যে-মধ্যে কিছু লিখতে পারি। সত্যের উপর আমার গভীর বিশ্বাস। প্রভুই আমাকে সাহায্য করবেন, এবং তিনিই প্রয়োজনমত কর্মীও পাঠাবেন।"

এর পরে আলাসিঙ্গাপ্রমুখরা যখন মাদ্রাজ থেকে ব্রহ্মবাদিন প্রকাশ করে উঠতে পারছিলেন না, তখন স্বামীজী ১৮৯৫, ৯ সেপ্টেম্বর, লিখেছিলেন, "আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার করব, মনে করছি।" ধরে নেওয়া যায়, পত্রিকার ব্যাপারে স্টার্ডি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর আরও কথাবার্তা হয়েছে। এর পরে ১৮৯৬ মার্চে, স্বামীজী আমেরিকায় পরিকল্পিত পত্রিকার বিষয়ে আলাসিঙ্গাকে লেখেন, "এখানে একখানি পত্রিকা চালাব। লণ্ডনে যাচ্ছি এবং যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে ওখানেও তাই ক'রব।" একই বিষয়ে স্বামীজী লণ্ডন থেকে ৫ জুন, ১৮৯৬, ওলি বুলকে লেখেন, "গুডউইন আমেরিকায় একখানি মাসিকপত্র বার করা সম্বন্ধে আপনাকে এই ডাকে একখানা চিঠি লিখছে। আমার মনে হয়, কাজটি বজায় রাখতে হ'লে এই রকমের একটা কিছু দরকার। আর সে যেভাবে কাজ করবার প্রস্তাব করছে, তাকে সেইভাবে ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।" এইখানে উল্লেখযোগ্য, গুডউইন স্বামীজীর সঙ্গে ইংলণ্ডে ছিলেন; স্টার্ডির সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়ায়

"এঁর বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কতখানি উচ্চ ধারণা ছিল বোঝা যায় যখন দেখি যে, বেলুড়-মঠে যোগদানের অব্যবহিত পরেই তিনি এঁকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন—অন্যান্যের মতো প্রারম্ভিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্য দিয়ে এঁকে যেতে হয়নি। স্বামীজীর এই বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করেছিলেন।...ত্যাগ তপস্যা ও পবিত্রতার উদ্দেশ্যে তাঁর আত্মার ব্যাকুল অভিসার।...কিন্তু অনেক সময়ে বৈরাগ্য হয়ে দাঁড়ায় তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার আবরণে কাপুরুষতার প্রশ্রয়—তাঁর ক্ষেত্রে বিপরীতটাই সত্য। তাঁর মননশীল বুদ্ধি বাস্তব সমস্যার সম্পূর্ণ অনুধাবনে সমর্থ ছিল—তার সমাধানে অকুতোভয় ছিল তাঁর মন।...তাঁর জীবনের সমাপন হয়েছে মৃত্যুতে, একথা ভাবতেই পারি না। খুলে গেছে দ্বার—গভীর নীরবের—পূর্ণনৈঃসঙ্গ্যের। আত্মলয়ে চির-আকাঙ্ক্ষী আত্মা সেখানে প্রবেশ করেছে ত্বরিত বেগে। এই বিশ্বাস করি—জীবনের চরম ত্যাগে অর্জিত মৃত্যুর মহা-সন্ন্যাস—নিশ্চয় নবজন্মে বিদীর্ণ হবে পূর্ণ তেজে, নূতন প্রাণে ও দানে, প্রেমে ও জ্ঞানে—যখন পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন হবে তাঁর আবির্ভাবের।" ['নিবেদিতা লোকমাতা']

স্বামীজী দুঃখের সঙ্গে তাঁকে আমেরিকা যেতে বলেন; এবং স্বামীজী ভাবেন, গুডউইন যদি আমেরিকা যান, তিনি সবচেয়ে সুন্দরভাবে আমেরিকায় প্রস্তাবিত কাগজটির পরিচালক হতে পারবেন।

স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব তাঁর পার্শ্বস্থ সকলকে সর্বসময় উদ্দীপ্ত রাখত। ফলে তিনি কাছে থাকলে তাঁর ভক্ত বা সঙ্গীদের কর্মোৎসাহের সীমা থাকত না। স্বামীজী ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে ১৪ জুলাই ১৮৯৬, লিখলেন, "এখানে মুশকিল এই যে, এরা সকলেই নিজেদের কাগজ বের করতে চায়। আর এমনই হওয়া উচিত। কারণ সত্যি বলতে গেলে, কোন বিদেশীই খাঁটি ইংরেজের মতো ইংরাজি লিখতে পারে না এবং খাঁটি ইংরাজিতে লিখলে ভাবের যা বিস্তার হবে, হিন্দু-ইংরাজিতে তা হ'তে পারে না। তারপর বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখা আরও শক্ত।"

এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইউরোপ বা আমেরিকায় ভারতবর্ষ থেকে পরিচালিত ইংরাজি পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজী সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং ইংলণ্ড বা আমেরিকায় সেই দেশীয়দের পত্রিকার উপরই নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ইতিমধ্যে স্টার্ডির পত্রিকার আয়োজন আরও এগিয়েছিল, এবং এ-ব্যাপারে ম্যাক্সমুলার সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন। স্টার্ডিকে লেখা ৫ অগস্ট, ১৮৯৬, চিঠিতে সেই সংবাদ পাই, "ম্যাক্সমুলার আমাদের কার্যধারা জানতে চান, এবং মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও খবর চান।...আশা করি, বড় পত্রিকাখানি সম্বন্ধে ভাল ক'রে ভেবে দেখবে। আমেরিকায় কিছু টাকা তুলতে পারা যাবে এবং কাগজখানি নিজেদের হাতেই রাখা যাবে। তুমি ও ম্যাক্সমুলার কি-প্রকার কার্যধারা ঠিক কর, তা জেনে আমি আমেরিকায় পত্র লিখব ভেবেছি।"

তাহলেও ইংলণ্ডের পত্রিকার বিষয়ে স্বামীজীর মনে একটা দ্বিধা ছিল। স্টার্ডি-প্রচেষ্টার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশংকা বোধহয় সব সময়েই তিনি বোধ করেছেন। তাছাড়া বাইরে পত্রিকা বের হলে ব্রহ্মবাদিনের সম্ভাব্য ক্ষতি-বিষয়েও তিনি চিন্তা করতে পারেন। এ-বিষয়ে তাই অল্প কয়েকদিন পরেই, ১২ অগস্ট, স্টার্ডিকে লিখলেন, "আজ আমেরিকা থেকে একখানা চিঠি পেলাম, ত তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের আমি লিখেছি, আমার অভিপ্রায় এক-কেন্দ্রীকরণ—বর্তমান কার্যারম্ভে তো বটেই। আমি তাদের এ পরামর্শও দিয়েছি যে, অনেকগুলি কাগজ ছাপাবার বদলে তারা ব্রহ্মবাদিনের সঙ্গে আমেরিকায় লেখা কয়েক পাতা জুড়ে শুরু করুক এবং কিছু চাঁদা তুলে আমেরিকার খরচাটা পুষিয়ে নিক। জানি না, তারা কি করবে।"

স্টার্ডি স্বামীজীর কথায় রাজী হননি বলেই মনে হয়। তিনি পত্রিকা বের করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। স্বামীজী তখন ১০ সেপ্টেম্বর, তাঁকে লিখলেন, "তোমার মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনায় তিনি [ডয়সন] খুব আনন্দিত এবং এসব বিষয়ে লণ্ডনে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান; শীঘ্রই তিনি সেখানে যাচ্ছেন।..."

স্টার্ডি কিন্তু যত তাড়াতাড়ি কাগজ বার করবেন ভেবেছিলেন, তা পারেননি। আলাসিঙ্গাকে লেখা এক চিঠিতে (তারিখ শুধু আছে ১৮৯৬) স্বামীজী লেখেন, "স্টার্ডির কাগজ বের করবার মতলব এখনো কাজে পরিণত হয়নি।"

স্টার্ডির কাগজ বেরিয়েছিল, যদিও তার আয়ু স্থায়ী হয়নি। স্বামীজী ২০ নভেম্বর, লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গাকে যে-পত্র লেখেন, তার মধ্যে সেই সংবাদ আছে। এই পত্রে আন্তর্জাতিক পত্রিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর কিছু বক্তব্য পাই : "উইম্বলডনের মিস নোবল একজন ভাল কর্মী। তিনিও মান্দ্রাজের দুইটি পত্রিকার জন্য গ্রাহক সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবেন। তিনি তোমায় পত্র লিখবেন। এইসব কাজ ধীরে-ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠবে। অল্পসংখ্যক অনুগামীরাই এই-জাতীয় কাগজের পৃষ্ঠপোষক হয়। এখন কথা এই—এরূপ

আশা করা চলে না যে, তারা একসঙ্গে অত্যধিক কাজের ভার নেবে। ইংলণ্ডের কাজের জন্য তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বই কিনতে হবে, এখানকার পত্রিকার জন্য গ্রাহক যোগাড় করতে হবে এবং সর্বশেষে ভারতের পত্রিকার চাঁদা দিতে হবে। এতটা করা চলে না। এরূপ করলে তা ধর্মপ্রচার না হয়ে বরং ব্যবসার মতোই দেখাবে। সুতরাং তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে আমার মনে হয়, এখানে জনকয়েক গ্রাহক পাওয়া যাবে। ভারতের লোকেরাই ভারতের কাগজগুলির পৃষ্ঠপোষক হবে। সব জাতির নিকট সমানভাবে গ্রহণীয় কোনো কাগজ প্রকাশ করতে হ'লে সব জাতিরই লেখক সংগ্রহ করতে হবে; আর তার মানে হচ্ছে— বছরে অন্ততঃ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। তা ছাড়া আমার অনুপস্থিতিতেও এখানকার লোকদের কাজ থাকা চাই; তা না-হলে সব ভেঙেচুরে যাবে। অতএব একখানি পত্রিকা চাই; ক্রমে আমেরিকাতেও চাই। এ কথা ভুলে যেও না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান রয়েছে, শুধু ভারতের প্রতি নয়।"

ইংলণ্ড বা আমেরিকা থেকে স্বামীজীর জীবিতকালে ঠিক কতগুলি ও কি-জাতীয় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। ইণ্ডিয়ান মিরারে ১৮৯৬, জুলাই, আমেরিকা থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্পের কথা পাই। পত্রিকাটি মাসিক। 168, Brattle Street, Cambridge, Mass, U.S.A.—তার প্রকাশ-স্থান, এমন লেখা হয়েছিল। সত্যই এই পত্রিকা বেরিয়েছিল কি না জানি না। স্বামীজীর দেহত্যাগের অল্প পূর্বে ১৯০২ সালের প্রথম দিকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে *Pacific Vedantin* নামে একটি পত্রিকা সত্যই প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসের ব্রহ্মবাদিনে সংবাদ পেয়েছি।

॥ ৪ ॥ উদ্বোধন এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত

স্বামীজীর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তিনি তাঁর অভিপ্রেত বস্তুকে ব্যাপক ও নির্দিষ্ট উভয় ক্ষেত্রেই আঘাত করতেন। বেদান্তের প্রথম মুখপত্র নিশ্চয়ই ইংরেজিতে হবে, যার ফলে তা সর্বভারতীয়, কিংবা আন্তর্জাতিক প্রচার পাবে, কিন্তু ভারতীয় জন-সাধারণের কাছে উপস্থিত হতে গেলে তাদের মাতৃভাষাকেই অবলম্বন করতে হবে। মাতৃ-ভাষায়, জনগণের মুখের ভাষায়, কথা না বললে তাদের অন্তর স্পর্শ করা যায় না; বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরাই লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা জনগণের ভাষাতেই কথা বলেছেন —একথা স্বামীজী তৎকালীন শিক্ষাভিমানীদের দৃপ্ত ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং ইংরেজিতে একটি পত্রিকা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরেই তিনি দেশীয় ভাষায় পত্রিকার কথা ভাববেন, তাই স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণ মিশনের সেই প্রথম দেশীয় ভাষায় পত্রিকার নাম, 'উদ্বোধন'। তার ভাষা বাংলা, কারণ স্বামীজী স্বয়ং বাঙালী, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের হেড-কোয়ার্টার বাংলাদেশে। কিন্তু স্বামীজী যে, ভারতের সকল দেশীয় ভাষাতে পত্রিকা চাইতেন, তা তাঁর পত্রাবলী থেকে বোঝা যায়।

দেশীয় ভাষায় পত্রিকার কল্পনা স্বামীজীর মনে প্রথমাবধি সক্রিয় ছিল, তার প্রমাণ— ১৮৯৪, ২৫ সেপ্টেম্বর, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্রে বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন। এইকালে, স্মরণ রাখতে হবে, ব্রহ্মবাদিন প্রকাশিত হয়নি। স্বামীজী লিখেছিলেন, "তোমাদের একটা কিনা কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর?...একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit করতে হবে, আদ্দেক বাংলা আদ্দেক হিন্দী—পারো তো আর একটা ইংরেজিতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ—খবরের কাগজের subscriber সংগ্রহ করতে ক'দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে, subscriber যোগাড় করুক। গুপ্ত—হিন্দী দিকটা লিখুক, বা অনেক হিন্দী লিখবার লোক পাওয়া যাবে। মিছে ঘুরে বেড়ালে চলবে না।" এখানে স্বামীজী তাঁর

গুরুভাইদের (যাঁরা বাঙালী) বাংলা ও হিন্দীর দ্বিভাষী কাগজ করতে বললেন, [স্বামীজীর কালে ভারতের নানা স্থানে দ্বিভাষী পত্রিকার চল ছিল।] সেই সঙ্গে ইংরেজি কাগজও। এর পরে স্বামীজী ১৮৯৫ সালে লেখা এক চিঠিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে খবরের কাগজ প্রকাশের ব্যাপারে তাগিদ দেন। ঐ বৎসরের ১১ এপ্রিল রামকৃষ্ণানন্দকে একই বিষয়ে লেখেন, "মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পারো, তার চেষ্টা দেখ দিকি।" ১৮৯৫-এর আর এক চিঠিতে হিন্দী কাগজের ব্যাপারে স্বামী অখণ্ডানন্দকে —হিন্দী ভাষা ও হিন্দীভাষী অঞ্চল যাঁর নখদর্পণে—পুনশ্চ তাগিদ দিলেন : "যজ্ঞেশ্বর বাবু মীরাটে একটা কি সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করতে চান। ভাল, তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কালীকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও, কালী যদি পারে মীরাটে একটা centre করুক এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দী ভাষাতে হয়, এমন চেষ্টা করুক— আমি কিছু-কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব।" একই বৎসরে মঠে লিখলেন, "হরমোহন নাকি একটা কাগজ বার করবার যোগাড় করছিল, তার কি হ'ল? কালী, শরৎ, হরি, মাস্টার, G. C. Ghosh [গিরিশবাবু] যোগাড় ক'রে একটা যদি পারো তো ভালই বটে।"

এখানে স্বামীজী যাঁদের নাম করলেন, তাঁরা বাংলাদেশে সত্যই কাগজ বার করতে সমর্থ ছিলেন। এঁদের মধ্যে গিরিশ ঘোষ বাংলাদেশের প্রধান নট ও নাট্যকার; মাস্টার মহাশয় বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শিক্ষাব্রতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র। সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে কালী অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দ, শরৎ অর্থাৎ স্বামী সারদানন্দ, হরি অর্থাৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ যথেষ্ট শিক্ষিত, এবং এঁরা তিনজনই স্বামীজীর প্রচারে সহায়তা করবার জন্য তাঁর জীবনকালেই পাশ্চাত্ত্যে গিয়েছিলেন। হরমোহন মিত্রের সঙ্গে পাঠকদের ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে। এই 'পাগলা হরমোহন' রামকৃষ্ণ-আন্দোলন-সংক্রান্ত বহু পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশক, এবং কিছু ছিটগ্রস্ত হওয়ার জন্য উদ্যমে উন্মত্ত।

এই চিঠিতে একজনের উল্লেখ নেই—তাঁর নাম স্বামী ত্রিগুণাতীত। শ্রীরামকৃষ্ণের অল্প বয়সী এই শিষ্যকে কাজের ব্যাপারে বিশেষ কেউ গণনার মধ্যে আনেননি। কিন্তু বিবেকানন্দ জানতেন, কোথা থেকে কি হয়। গুরুভাইদের সস্নেহ কৌতুকের পাত্র ঐ যুবকটির সামনে ছিল গৌরবময় কর্মজীবন, এবং পরিণতি—মর্মান্তিক কিন্তু মহান। ইনি ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সানফ্রানসিসকোয় জনৈক উন্মাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে যখন নিহত হন, তার পূর্বেই অন্ততঃ দুটো বড় কীর্তি রেখে যেতে পেরেছিলেন—উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশ এবং পাশ্চাত্ত্যে প্রথম হিন্দু-মন্দির-স্থাপনা। স্বামী ত্রিগুণাতীতই, আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র শহীদ।৩৪

---

৩৪ উদ্বোধন পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগের সংবাদ এইভাবে বেরিয়েছিল :

"আমরা অতীব শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত প্রবীণ সন্ন্যাসি-গণের অন্যতম, উদ্বোধনের প্রতিষ্ঠাতা, কালিফোর্নিয়ার বেদান্ত-প্রচারক বহুগুণাধার শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীত গত ১০ই জানুয়ারি তারিখে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণপাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। শরীরত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কোর হিন্দু-টেম্পলে অবস্থান করিতে-ছিলেন। তিনি একদিন সমবেত ভক্তবৃন্দ-সমক্ষে বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাবরা নামক এক ব্যক্তি আসিয়া সহসা তথায় এক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটা ফাটিয়া অনেককে আহত করে। ভাবরা নিজে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ভাবরা কেন এই দুষ্কার্যের অনুষ্ঠান করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনও মূল্যস্বরূপে প্রদান করিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই ব্যক্তি বড় অস্থিরচিত্ত ছিল এবং কয়েক বৎসর যাবৎ একটির পর একটি করিয়া ধর্মমত ও সমিতিতে যোগদান করিয়া আসিতেছিল এবং বৎসরাধিক পূর্বে কিছুদিন হিন্দু-টেম্পলেও ছিল। অনুমান হয় ধর্ম-বিষয়ে

ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ সারদাপ্রসন্ন স্বামীজীকে জানান, স্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী তিনি বাংলায় পত্রিকা বার করতে চান। স্বামীজী ১৮৯৫-তে এক চিঠিতে ব্রহ্মানন্দকে লেখেন, "সারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধহয়, সকলকে সাহায্য করবে, যেখানটা ভাল না বোধহয়, ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে Criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল! দল ভাঙবার ঐটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' 'তুই আবার কি করবি?'—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র।" স্বামীজী কিভাবে মানুষের ভিতরের শক্তি দর্শন ও আকর্ষণ করতেন, এই পত্র তার আর একটি প্রমাণ।

১৮৯৬, জানুয়ারিতে স্বামীজী ত্রিগুণাতীতকে তাঁর বাংলা পত্রিকা-বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখলেন—ভিতরের ব্রহ্ম-জাগানো বিবেকানন্দের এক রচনা : "তোর কাগজের idea অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো, ভাবনা নাই টাকার জন্য। আপাততঃ এই চিঠি দেখিয়ে কারুর কাছে ধার ক'রে নে। এই চিঠির জবাব-চিঠির উত্তরে আমি ৫০০ টাকা পাঠিয়ে দেবো। ৫০০ টাকায় কিছু আসে যায় কি?...কোনও আরবীজানা মুসলমানভায়া ধরে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পারো, ভাল হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক Indian History আছে। যদি সেগুলো ক্রমে-ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল। উপায়—তোরা দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধরে কাগজ গতিয়ে দিবি।...চালাও কাগজ, কুছ্ পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে [মিলে] লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস! গুজগুজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ ক'রে আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে!—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব এমনি মাতাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন, যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন; কিন্তু কাজের বেলা তো 'খোঁজ খবর নাহি পাওয়ে।' লেগে যা, যত পারিস।...গঙ্গাধর খুব বাহাদুরি করছে। সাবাস! কালী তার সঙ্গে কাজে লেগেছে। খুব সাবাস! একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর—তোলপাড় কর দুনিয়া।...একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা। এ গৃহস্থদের কাজ নয়।...এ সান্ন্যসীর দলকে হুঙ্কার দিতে হবে—'হ-র, হ-র, শম্ভো!'"

১৭ জানুয়ারি স্বামীজী আবার লিখলেন ত্রিগুণাতীতকে, "তুমি খবরের কাগজ এখন বার করতে লেগে যাও।" ২৪ জানুয়ারি, ১৮৯৬, তিনি যোগানন্দকে লিখলেন, তিনি যেন সারদার সংকল্পে উৎসাহ দেন।

কিন্তু এর পরে কয়েক মাস চিঠিতে 'সারদার কাগজ' সম্বন্ধে উল্লেখ দেখি না। এর দুটি

কোনো মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিয়াই সে ঐরূপ করিয়াছে। বিশেষ যত্নে স্বামী ত্রিগুণাতীতের চিকিৎসা হইতে থাকিলেও, বিষাক্ত বিস্ফোরক দ্রব্যের সংস্পর্শে রক্ত দূষিত হইয়া সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্কানুসারী কর্মবীর কর্মক্ষেত্রেই বহুজনহিতায় বহুজন-সুখায় জীবন বিসর্জন করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে মিশনের যে ক্ষতি হইল, তাহা বর্ণনাতীত।"

১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, ক্রিশমাসের তিন দিন পরে, 'হিন্দু-মন্দিরে' যখন খ্রীস্টোৎসব হচ্ছিল, সেই সময়ে বোমাটি ছোঁড়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ত্রিগুণাতীতকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন পথিমধ্যে তিনি শুধু বলেছিলেন, 'বেচারা ছেলেটি! ও এখন কোথায়?' তাঁর দেহত্যাগের দিন ১০ই জানুয়ারি সেবার স্বামীজীর জন্মতিথি পড়েছিল। আগের দিন সেবক শিষ্যকে ত্রিগুণাতীত বলেছিলেন—পরদিন, স্বামীজীর জন্মতিথিতে, তাঁর দেহান্ত হবে।

কারণ সম্ভবপর। আমরা আগেই বলে এসেছি, বাংলাদেশের সন্ন্যাসী বা গৃহী গুরুভাইদের ইংরেজি পত্রিকা বার করবার সামর্থ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে কিছু সন্দেহ ছিল। এ-ব্যাপারে তিনি মাদ্রাজীদের উপযুক্ততর ভেবেছিলেন। মঠ-গঠন ইত্যাদি কাজই সন্ন্যাসীদের পক্ষে অধিকতর সম্ভবপর। সুতরাং ইংরেজি পত্রিকার ব্যাপারে আলাসিংগা প্রভৃতির উপর নির্ভর করেন এবং ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারত প্রকাশ করে মাদ্রাজী ভক্তগণ স্বামীজীর অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। তারপর স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন বাংলা পত্রিকার ব্যাপারে উঠে-পড়ে লাগলেন, তখন স্বামীজী নতুন করে উৎসাহিত হলেন, কিন্তু একটা নতুন প্রতিবন্ধক দেখা গেল—অর্থের অভাব। স্বামীজীকে ব্রহ্মবাদিনের টাকার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ক্রমে তিনি দেখলেন, তাঁর পক্ষে নতুন টাকার ঝুঁকি নেওয়া আর সম্ভব নয়। এই বিষয়ে ১৮৯৬, ১৪ এপ্রিল, ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে লেখেন, "কলকাতায় বাংলা ভাষায় একখানি পত্রিকা আরম্ভ করতে সাহায্য ক'রব ব'লে কথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার এই—প্রথম দু'বছরই মাত্র বক্তৃতার জন্য টাকা আদায় করেছি; গত দু'বছর আমার কাজের সংগে দেনা-পাওনার কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলে আপনাকে বা কলকাতার লোকদের পাঠাবার মতো টাকা আমার মোটেই নেই।" কয়েক দিন পরে, ২৭ এপ্রিল, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে দেখি, বাংলা পত্রিকার সম্পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণে তাঁর যেন সম্পূর্ণ ইচ্ছা নেই : "সারদা যে কাগজ বার করতে চেয়েছে, সে উত্তম কথা বটে; কিন্তু সকলে মিলেমিশে করতে পার তো আমরা সম্মতি আছে।"

বাংলা কাগজের মতোই অন্যান্য দেশীয় ভাষার পত্রিকায় স্বামীজীর কতখানি আগ্রহ ছিল, তার কিছু নিদর্শন হিন্দী পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছা থেকে দেখে এসেছি। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা সম্বন্ধে ডাঃ ননজুণ্ডাকে ২৬ অগস্ট, ১৮৯৬ লিখলেন, "যখন এই পত্রিকাটি [প্রবুদ্ধ ভারত] দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন, তখন তামিল, তেলুগু, কানাড়া প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ঠিক ঐ ভাবের কাগজ বের করুন।" আলাসিংগাকে ২০ নভেম্বর লিখলেন, "এখন তো আমাদের ইংরাজি পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে গেছে; অতঃপর ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় কয়েক-খানি আরম্ভ করতে পারি।"

স্বামীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী মাদ্রাজে তামিল পত্রিকা বার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাজম আয়ার এই পত্রিকারও ভারগ্রহণ করবেন ঠিক হয়; পত্রিকার নামকরণ করা হয়েছিল—'প্রবোধচন্দ্রিকা'। রাজমের মৃত্যুর সংগে সেই বাসনার সমাপ্তি ঘটে।৩৫

বাংলা পত্রিকার ব্যাপারে আরও অগ্রগতির সংবাদ পাই স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে শুদ্ধানন্দকে লেখা তাঁর ১৮৯৭, ১১ জুলাই-এর পত্রে : "ব্রহ্মানন্দকে বলবে, সে যেন অভেদানন্দ ও সারদানন্দকে...লেখে—যে-বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য যেন তারা প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান মঠে পাঠায়। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র করছেন?"

এই চিঠি থেকে মনে হয়, বাংলা পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তখনি। কিন্তু তিন মাস কেটে যাবার পরেও পত্রিকা বেরোয়নি। ১৮৯৭, ১১ অক্টোবর, স্বামীজী নানা বিষয়ে অত্যন্ত নৈরাশ্য ও অভিমান প্রকাশ করে ব্রহ্মানন্দকে যে পত্র লেখেন, তাতে ছিল—"সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি ক'রব?...আমি গাল দিই; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে।...আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওর প্রবন্ধ লিখেছি।" মনে হয় এটি উদ্বোধনের বিখ্যাত প্রস্তাবনা প্রবন্ধ।

---

৩৫ "Of course the proposed Tamil journal, *Probodha Chandrika*, which promised to give full scope to the rich imagination, fine critical faculty and ecstatic outpouring of the departed genius, will not be started." (*P. B.*, June, 1898).

নানা কারণে উদ্বোধনের প্রকাশ ক্রমেই পেছোতে থাকে। মূল কারণ অর্থকষ্ট। উদ্বোধন প্রকাশিত হতে আরও প্রায় দেড় বছর লেগে যায়। প্রথম প্রকাশকাল ১৮৯৯, ১৪ই জানুয়ারি। এই দেড় বৎসরের মধ্যে পত্রিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা থামেনি। ১৮৯৮, মার্চ মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে দেখতে পাই, স্বামীজী 'ডন' পত্রিকার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছেন : "ডন কাগজখানির প্রতি সংখ্যার জন্য ৪০ টাকা খরচ হইবে, এবং দুইশত গ্রাহক পাইলেই উহা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারিবে, ইহা মস্ত খবর।" এর থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী ডন পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং পত্রিকাখানি স্বামীজীর আদর্শে পরিচালিত হবে, এমন স্থির হয়েছিল।

ডন পত্রিকার সতীশ মুখোপাধ্যায় রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে পরিচিত ব্যক্তি। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত নন, অথচ তার ভাবধারার প্রতি সহানুভূতি আছে, এমন সকলকে স্বামীজী কাজের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ করতে চাইতেন। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের পুরানো ভক্ত অথচ রামকৃষ্ণ সংঘের বহির্বর্তী নৃত্যগোপালের পত্রিকা-বিষয়ক পরিকল্পনাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ২৩ এপ্রিল, ১৮৯৮ লেখেন, "নৃত্যগোপাল বলে, ইংরাজি কাগজটায় খরচ অল্প; অতএব প্রথম উহা বাহির করিয়া পরে বাংলাটা দেখা যাবে। এ-সকলও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যোগেন কাগজের ভার লইতে রাজি আছে?... শরৎকে জিজ্ঞাসা করবে—জি-সি, সারদা, শশীবাবু প্রভৃতি প্রবন্ধ তৈয়ার রেখেছেন কিনা।"

"কলকাতা থেকে ইংরাজি কাগজ"-এর বদলে যখন আলমোড়া থেকে ইংরাজি কাগজ প্রবুদ্ধ ভারতের পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হল, তারপর স্বভাবতঃই আবার বাংলা কাগজের ব্যাপারে স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ল। বাংলা কাগজ প্রকাশের দরকারও হয়ে পড়েছিল। স্বামীজীর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল আক্রমণ তখন বাংলা কাগজে সবেগে চলেছে, এবং বেদান্ত-আন্দোলনকে হয় ঔদাসীন্যে, নয় আঘাতে বিধ্বস্ত করার চেষ্টার অন্ত নেই। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন গঠিত হয়ে গেছে, এবং তার প্রধান কার্যালয় হয়েছে বাংলা দেশে। সুতরাং বাংলা ভাষায় জনগণের কাছে সংঘের মত ও পথের কথা উপস্থিত করা আশু প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগ তো ছিলই। অথচ সংকল্পের পথে প্রধান বাধা টাকার। তখন স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডকে অনুরোধ করে লিখলেন (২৯ এপ্রিল, ১৮৯৮) : "প্রত্যুত আমি কলকাতায় একখানি কাগজ চালাব। তুমি যদি ঐ কাগজ চালু করতে আমায় সাহায্য করো, তবে খুবই কৃতজ্ঞ হব।" ম্যাকলাউড নিশ্চয় অর্থসাহায্যে রাজি হয়েছিলেন। স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কিছুদিন পরেই (২০ মে) লিখলেন, "কাগজের জন্য টাকার চেষ্টা হইতেছে। যে ১২০০ টাকা তোমায় কাগজের জন্য দিয়াছি, তাহা ঐ হিসাবেই যেন থাকে।" কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কাগজের ব্যাপারে সমস্যার শেষ হয়নি। প্রায় এক মাস পরে ব্রহ্মানন্দকে আবার লিখলেন, "সারদার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, বাঙলা ভাষার magazine paying করা মুশকিল, তবে সকলে মিলিয়া দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া subscriber যদি যোগাড় করা যায় তো সম্ভব বটে। এ বিষয়ে তোমাদের যে-প্রকার মত হয় করিবে। সারদা বেচারা একেবারে ভগ্নমনোরথ হইয়াছে। যে লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য এক হাজার টাকা যদি জলেও যায় তো ক্ষতি কি?"

উদ্বোধন শেষ পর্যন্ত বেরিয়েছিল।৩৬ ১৮৯৯, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে

৩৬ তখন উদ্বোধনের "আয়তন ছিল ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য ২ টাকা। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে এক মাস (দুই সংখ্যা) পাক্ষিক উদ্বোধন-প্রকাশ বন্ধ থাকিত।" "প্রথমে পাক্ষিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া পরে দশম বর্ষ হইতে উদ্বোধন মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।" "প্রথম বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষের অষ্টাদশ সংখ্যা পর্যন্ত উদ্বোধন নিজস্ব প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। পরে নানা কারণে প্রেসটি বিক্রয় করিয়া দিতে হয়।"

(১৩০৫ সনের ১লা মাঘ) পাক্ষিক পত্রিকারূপে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল দৈনিক পত্র প্রকাশ করবেন! অর্থাভাবে তা করা সম্ভব হয়নি। স্বামীজী-প্রদত্ত এক হাজার টাকার উপরে হরমোহন মিত্রের কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধার নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রথম কার্যালয়—"কলিকাতা, কম্বুলেটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, গিরীন্দ্র-মোহন বসাকের বাড়িতে।" "প্রথম হইতেই 'উদ্বোধন প্রেস' নামে উদ্বোধনের একটি নিজস্ব প্রেস ছিল। এই প্রেসটিও গিরীন্দ্র বাবুর বাটীতেই স্থাপন করা হইয়াছিল।"৩৭ প্রথম সম্পাদক (এবং প্রকাশকও) স্বামী ত্রিগুণাতীত। তিনি চতুর্থ বর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা (১৩০৯) পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন।

কেন প্রেসটি বিক্রয় করে দিতে হয়েছিল, তার কিছু কারণ পরে উদ্ধৃত কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথায় পাওয়া যাবে।

উদ্বোধনের জন্য ত্রিগুণাতীত কি ধরনের প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন তা দেখা যায় ঢাকার যতীন্দ্রচন্দ্র দাসকে লেখা তাঁর দুটি চিঠি থেকে। উদ্বোধন প্রকাশিত হবার আগে, ১৯শে পৌষ, ১৩০৫, তাঁকে লেখেন :

"আগামী ১লা মাঘ হইতে কাগজ ('উদ্বোধন' নামে বাঙগলা পাক্ষিক পত্র) বাহির হইবে। ছাপা হইয়া গিয়াছে।...আপনি যথার্থই নিঃস্বার্থ কার্য হিন্দুধর্মের জন্য করিতেছেন; নচেৎ 'উদ্বোধনে'র জন্য এত পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। ঢাকায় যাবতীয় কলেজ, স্কুল ও আফিসে এবং স্টেশনে হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করাইবেন। তাহার দরুন পৃথক হ্যাণ্ডবিল অদ্য পাঠাইলাম।"

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০০, একই জনকে লেখেন :

"অদ্য ডাকে এক হাজার হ্যাণ্ডবিল আপনাকে পাঠাইয়াছি।. আপনাকে পদে-পদে কষ্ট দিতেছি, কিছু মনে করিবেন না। আপনাদের দ্বারাই পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ প্রচারকার্য হওয়া সম্ভব এবং হইতেছেও।...যাহা হউক, ঢাকায় প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এক এক খানি হ্যাণ্ডবিল দিয়া 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিবেন। হ্যাণ্ডবিলে কি আছে তাহা সকলকেই খুব ভালরূপ বুঝাইয়া দিবেন, নচেৎ কেহ হ্যাণ্ডবিল বুঝিতে পারিবে না। রীতিমত লেকচার দেওয়ার মত হ্যাণ্ডবিলে কি কি বিষয় আছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন।" [উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫৫]

৩৭ উদ্বোধন-প্রেস কেনা হয়েছিল মিস ম্যাকলাউডের টাকায়। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে মিস ম্যাকলাউডের নাম অবিস্মরণীয়। প্রথম পর্বে বহির্ভারতে এই আন্দোলনের তিন শ্রেষ্ঠ সহায়িকা—তিনজনই মহিলা—দুইজন আমেরিকান, মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড, তৃতীয় জন স্কট-আইরিশ, সিস্টার নিবেদিতা। মিসেস ওলি বুল প্রধানতঃ আর্থিক সাহায্য করেছেন, এবং সিস্টার নিবেদিতা তাঁর রচনাদির দ্বারা প্রচার চালিয়েছেন (নিবেদিতা ভারতকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র করেছিলেন); মিস ম্যাকলাউড সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্ত্যখণ্ডে এই আন্দোলনের ধাত্রীর কাজ করেছেন। স্বামীজীর ভারতীয় কাজকেও তিনি নিজের কাজ বলে নিয়েছিলেন। অর্থে ও সামর্থ্যে তিনি যৎপরোনাস্তি করতেন—কতখানি করেছেন সে ইতিহাস যদি সম্পূর্ণ জানা যায়, দেখা যাবে যে, প্রতিষ্ঠানগতভাবে রামকৃষ্ণ মিশন অ-সন্ন্যাসী যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদের মধ্যে মিস ম্যাকলাউডের স্থান সর্বাগ্রে।

উদ্বোধন-প্রেস কেনার বিষয়ে ম্যাকলাউডের স্মৃতিকথায় পাই : "মিসেস ওলি বুল মঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক সহস্র ডলার দিয়েছিলেন। আমার সামর্থ্য অল্পই, আটশো ডলার সংগ্রহ করতেই কয়েক বছর লেগে গেল। একদিন স্বামীজীকে বললাম, 'এই আমার অল্প কিছু টাকা, আপনি প্রয়োজনে লাগাতে পারবেন।' তিনি বললেন, 'কী? কি বললে?' আমি বললাম, 'হাঁ।' 'কত?'—জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, 'আটশো ডলার।' তখনি স্বামী ত্রিগুণাতীতের দিকে ফিরে বললেন, 'এই তোমার টাকা, যাও, প্রেস কেনো গিয়ে।' ত্রিগুণাতীত প্রেস কিনলেন, তাই দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র উদ্বোধন বেরুল।" [রেমিনিসেনসেস]

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনার প্রকাশক্ষেত্ররূপে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে মূল্যবান ভূমিকা নিয়েছিল। তার পিছনে পরোক্ষ সাহায্য ছিল এক ইংরেজিভাষী মহিলার।

"স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখকবর্গ" উদ্বোধনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় পত্রিকাটি অচিরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।৩৮ প্রথম পর্বে স্বামীজী ছাড়া উদ্বোধনের উল্লেখ-যোগ্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি। স্বামী সারদানন্দের ওজস্বিতাপূর্ণ রচনাতেও এইকালে উদ্বোধন সমৃদ্ধ। স্বামী শুদ্ধানন্দের অনুবাদ-রচনারও উল্লেখ করতে হয়। শুদ্ধানন্দ আত্মবিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন। স্বামীজী তাঁর ইংরাজি রচনা ও ভাষণাদি অনুবাদ করার কথা বললে তখন অনেকে যখন অতি সম্ভ্রমে পেছিয়ে গেলেন, তখন এগিয়ে আসেন 'ঝাঁপ না-দিলে সাঁতার শেখা যায় না' নীতিতে বিশ্বাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ।৩৯ তাঁর অনুবাদের ভাষাগত ওজস্বিতার জন্য 'রাজযোগ' 'জ্ঞানযোগ', 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতিকে অনেকে স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলে মনে করেছেন। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের নাম প্রথম সারিতে।৪০

---

৩৮ স্বামী বিবেকানন্দ যুক্ত আছেন, এটাই সম্ভ্রম ও প্রত্যাশা আকর্ষণের পক্ষে তখন যথেষ্ট। সুবিখ্যাত লাহোর ট্রিবিউন, ২৪ জানুয়ারি, ১৮৯৯, তারিখে উদ্বোধন প্রকাশিত হবে, এই সংবাদের উপর লেখে :

"Swami Vivekananda is far from being in good health. Yet in conjunction with other followers of Ramkrishna Paramhansa, he is about to bring out a Bengali magazine, under the name of *Udbodhan*, which will be devoted to all manner of subjects from religion and ethics down to politics and the industrial arts, and will surely prove to be a valuable acquisition to the periodical Press of Bengal." [*Tribune*, January 24, 1899].

৩৯ এই অনুবাদকার্যের সূচনা সম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখেছেন : "সেইসময়ে স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন হইতে ই টি স্টার্ডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইতেছে—মঠেও উহার দুই-এক কপি প্রেরিত হইতেছে। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে তখনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহ সহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈত-তত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরাজী জানেন না—কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'নরেন' বেদান্ত সম্বন্ধে বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে তাহা শুনেন। তাঁহার অনুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়িয়া তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাংলা অনুবাদ কর না।' তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত pamphletগুলির মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করিয়া অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইতিমধ্যে স্বামীজী আসিয়া পড়িয়াছেন। একদিন প্রেমানন্দ-স্বামী স্বামীজীকে বলিলেন, 'এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।' পরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও দেখি।' তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ আনিয়া কিছু-কিছু স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু'একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এই শব্দের এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ দুই-একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, 'রাজযোগটা তর্জমা কর না।' আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করিলেন? আমি তাহার বহুদিন পূর্ব হইতে রাজযোগের অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম...রাজযোগের অনুবাদ করিলে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখিয়া, সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল।...যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" ['স্বামীজীর কথা' গ্রন্থ]

৪০ শোনা যায় স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রথমাবধি উদ্বোধনের সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। ত্রিগুণাতীতের পরে তিনি উদ্বোধনের সম্পাদক হন। এ বিষয়ে 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত

কিন্তু আর কারো নয়, স্বামীজীর রচনাই উদ্বোধনকে মহিমান্বিত করেছিল। উদ্বোধনই বিবেকানন্দকে বাংলা লেখক করেছিল, এ গৌরব তার চিরদিনের। পত্রিকাটির প্রতি স্বামীজীর অসীম মমত্ব ছিল, সদ্য-প্রবর্তিত সংঘ-মুখপত্রের প্রতি দায়িত্বও ছিল অশেষ। অন্তরের তাগিদে যদি নাও হয়, পত্রিকার প্রয়োজনেও তাঁকে লিখতে হয়েছে। মা, অন্তরের তাগিদ অল্প ছিল না। পরম প্রিয় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যে যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তা পুনঃস্থাপনের ইচ্ছাও তাঁর মনে জেগেছিল। স্বামীজীর প্রায় সকল মৌলিক বাংলা লেখাই উদ্বোধনে বেরিয়েছে, উদ্বোধনের পক্ষে তা সম্পদ, মানব-চিন্তার ক্ষেত্রেও সে রচনাগুলির গুরুত্ব এমনই ছিল যে, ইংরাজিতে অনুবাদ করে অন্যান্য পত্রিকা তা প্রকাশ করত। স্বামীজী কেবল চিন্তা-বস্তুতেই উদ্বোধনকে গরীয়ান করেননি, রীতির ক্ষেত্রেও বাংলা গদ্যে নূতন ধারার সূচনা করেছিলেন। এ-বিষয়ে অন্য অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

উদ্বোধন নিয়ে স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিচয় স্বামী-শিষ্য সংবাদে রয়েছে। তার একাংশে পাই, 'শিষ্য' যখন উদ্বোধন, পাক্ষিকের বদলে সাপ্তাহিক হোক, এমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন, তখন স্বামীজী বলেন, "তা তো বটে, কিন্তু funds কোথায়? ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে—রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে-গলিতে free distribution করা যেতে পারে।" এই পত্রিকার চিন্তায় এবং দায়দায়িত্বের ভারে স্বামীজী এতই অস্থির ছিলেন যে, অপরের কর্মশৈথিল্য দেখলে প্রায়ই ধমকাতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি লন্ডন থেকে ১০ অগস্ট, ১৮৯৯, এ-সম্পর্কে লেখেন : "সারদা বলে, কাগজ চলে না।...আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত খুব advertise করে ছাপাক দিকি—গড়গড় করে subscriber হবে। খালি ভট্টচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে? যা হোক, কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ করো। 'টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সব দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে?...একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারুর নেই, এক লাইন লিখবার...ক্ষমতা কারুর নেই—সব খামকা মহাপুরুষ।"

উদ্বোধনের ক্ষেত্রে, স্বামীজীর জোয়াল একজন সত্যিই ঘাড়ে নিয়েছিলেন, তাঁর নামোল্লেখ আগেই করেছি, স্বামীজীর পত্রেও এ-ব্যাপারে বারবার তাঁর উল্লেখ আছে—তিনি প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত। তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়ে এই দীর্ঘ বিবরণ শেষ করব। এক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষদর্শীর কিছু স্মৃতিকথা সরাসরি উদ্ধৃত করতে চাই। স্মৃতি-কথাগুলি থেকে বিবেকানন্দ ও ত্রিগুণাতীত, নেতা ও বিশ্বস্ত কর্মী, উভয়েরই ছবি পাই। নেতার ছিল—প্রেরণা, ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা, প্রতিহত ইচ্ছার ক্রুদ্ধ গর্জন, তারপরেই অনন্ত

'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়' পুস্তিকায় কিছু সংবাদ পাই, সেইসঙ্গে পাই উদ্বোধন পত্রিকার সঙ্গে স্বামী সারদানন্দের সম্পর্কের সংবাদও :

"১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি [ত্রিগুণাতীত] আমেরিকা গমন করিবার পর উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশন লইয়া গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এমন কি পত্রিকাটির প্রকাশন বন্ধ হইবার আশঙ্কাও দেখা দেয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দের একান্ত ইচ্ছা ও স্বামী সারদানন্দের প্রচেষ্টার ফলে এই সংকট কাটিয়া যায়। স্বামী শুদ্ধানন্দকে পত্রিকা-সম্পাদনার ও প্রকাশনের ভার দেওয়া হয়। তাঁহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা এবং অধ্যবসায় সহকারে সুযোগ্য পরিচালনার ফলেই উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশন অতি সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকে। স্বামী সারদানন্দ এই সময় হইতেই উদ্বোধনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন; অবশ্য ১৯০৮ খৃস্টাব্দে ১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন-এ তাঁহারই প্রচেষ্টায় নির্মিত নিজস্ব ভবনে উদ্বোধন কার্যালয় উঠিয়া আসিবার সময় হইতে উদ্বোধন কার্যালয় পরিচালনার ভার তিনি পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন।"

ভালবাসার প্লাবন; অপরদিকে নেতার প্রতি কর্মীর (যে-কর্মী কিন্তু গুরুভাই, তার কম নন) ছিল—আনুগত্য ও অব্যাহত অনুরাগ এবং শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও সংগ্রাম। সারদাপ্রসন্ন কী ভালবাসাই না বাসতেন নরেন্দ্রনাথকে!৪১ অভিজাত ঘরের ছেলে, পড়াশোনায় ভালো, কিন্তু খেয়ালী, মুষড়ে পড়েন সহজে, ঝাঁপিয়েও পড়েন তেমনি স্বচ্ছন্দে, ছেলেধরা মাস্টার-মহাশয় (শ্রীম) তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ছেলে-ধরার কাছে—সারদা তার ফলে রামকৃষ্ণ-শিষ্য হয়েছিলেন। ঘুরে বেড়ানো এ'র বাতিক ছিল, সন্ন্যাসী হয়ে আরও বাধাবন্ধহারা, দুরদুর্গম তিব্বত, মানসসরোবর পর্যন্ত পরিব্রজ্যা থেকে বাদ পড়েনি, (ইনি তিব্বত ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন ইংরেজিতে, ইণ্ডিয়ান মিরারে),৪২

---

৪১ এই ভালবাসার এক স্নিগ্ধ সহাস ছবি এ'কেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত : "নরেন্দ্রনাথের পিতা একখানি মলিদা চাদর ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথও পরে সেই মলিদা চাদরখানি ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথ গুজরাটে অবস্থানকালে নিজের চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ চাদরখানি সারদা-মহারাজকে পরাইয়া দিলেন। তিনি সেই জীর্ণ চাদরখানি অমূল্য মনে করিয়া আলমবাজারে লইয়া আসিলেন।... নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ মলিদাখানি কখনো মাথায় দিয়া, কখন বা বগলে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। একদিন আলমবাজার-মঠের ভিতর দিককার পূর্বদিকের খোলা ছাতে ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। শশী-মহারাজ কৌতুক করিয়া বলিলেন, 'আরে সারদা, নরেন তোকে দেয় নাই; আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে, তাই তোকে দিয়ে আমাকে দিয়েছে।' নিরঞ্জন-মহারাজ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন 'দূঃ শালা, তোকে দেবে কেন রে? তুই শালা বে'টে, তিন তাল মোহনভোগ খাস, একি তোর উপযুক্ত? এ তোকে দেয়নি, শশীকেও দেয়নি, নরেন আমাকে কত ভালবাসে, সেইজন্য তোর হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।' এইরূপে সকলে বালকের মত নৃত্য ও আনন্দ করিতে লাগিলেন।" [ঘটনাবলী, ২য়]

৪২ থিয়জফিক থিংকার জানুয়ারি, ১৮৯৬ সংখ্যায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের হিমালয়ে মানস সরোবর ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছিল। তার মধ্যে সেকালের পক্ষে চাঞ্চল্যকর খ্রীস্টের তিব্বতী জীবনীর প্রসঙ্গ ছিল।—

"Swami Trigunatitananda, Sannyasi disciple of Paramahansa Ramakrishna, undertook a few months ago a perilious journey over the snowy ranges of the Himalayan mountain, with a view to visit the holy shrines of Mount Kailas and lake Manas-Swaravara... The Swami, with commendable zeal and fortitude, had to go on foot for days together through perpetual snow ranges at an altitude, of 22,000 feet. After an eventful journey, he has come back to Calcutta. He has observed some old photos of Christ in some monasteries of Tibet, and he believes, from what he has seen of Tibet, that the discovery of Tibetan record of Christ's life by the Russian explorer is not without foundation. Christ is regarded by the Lamas to be an Indian God. The Swami is much pleased at the reception which he received in the monasteries from the Lamas. Swami Trigunatitananda, we believe, is writing a description of this interesting journey."

একই সংবাদ বেরিয়েছিল মহাবোধি সোসাইটি জার্নালে ১৮৯৬, জানুয়ারি সংখ্যায়।

যীশুর তিব্বতী জীবনী ব্যাপারটিকে স্বামীজী ধাপ্পাবাজি মনে করতেন—তা আগেই দেখেছি। ত্রিগুণাতীতের অতি সরল বিশ্বাসকে ধাতানি দিয়ে লিখেছিলেন (মার্চ, ১৮৯৬) :

"টিবেটের সম্বন্ধে তোমার পত্র পাঠ করে তোমার বুদ্ধির উপর হতশ্রদ্ধা হল। প্রথম—নোটো-ভিচের [রাশিয়ান লেখক] বই সত্য?—nonsense! তুমি কি original দেখেছ? বা ইণ্ডিয়ায় এনেছ? দ্বিতীয়—Jesus এবং Samaritan woman-এর [যীশু ও সামারিয়া দেশের নারী] ছবি কৈলাস মঠে দেখেছ; কি করে জানলে সে যীশুর ছবি, ঘিযুর নয়? যদি তাও হয়, কি করে জানলে যে কোনো ক্রিশ্চান লোকের দ্বারা তাহা উক্ত মঠে স্থাপিত হয় নাই?"

এর ঠিক উল্টোদিকে ছিল—তিব্বতীদের অসদ্ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে ত্রিগুণাতীতের মন্তব্য। স্বামীজী সেখানেও আপত্তি করলেন, কারণ, উপর-উপর দু'চারজন লোককে দেখে জাতির বিচার করা উচিত নয়। বিশেষতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেরা সাধারণতঃ সাধু হয় না।

বেপরোয়া, খাওয়ার ব্যাপারেও, প্রচুর খেতে পারতেন, প্রায় না-খেয়েও থাকতে পারতেন, বিচিত্র সব শখ ছিল, 'কাকচরিত-শিক্ষা' করা পর্যন্ত, ব্যস্ত থাকতেন সব সময়ে, হয় কাজে, না-হয় পড়াশোনায়, না-হয় ধ্যানে-জপে। ইনি বি-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন, ঘোর বৈরাগ্যের জন্য পরীক্ষা দিয়ে ওঠা হয়নি, নরেন্দ্রনাথ অন্যদিকে বি-এ পাসের বেশি করেননি, তাহলেও নরেন্দ্রের কাছ থেকেই সব সময়ে শিখতেন। নরেন্দ্রনাথ সারদাপ্রসন্নকে কিভাবে পড়াতেন, তার একটি ছবি দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত :

"নরেন্দ্রনাথের যখন পাথুরীর অসুখ হয় তখন ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে সারদা-মহারাজ শুশ্রূষার জন্য আসিয়া থাকিতেন। তিনি 'ক্যাসেলে'র মুদ্রিত ছবিওয়ালা শেক্সপীয়ারের গ্রন্থগুলি পড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থবোধ করিলে সারদা-মহারাজকে শেক্সপীয়ারের নানা গ্রন্থ ও কাব্যের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। বালক সারদা-মহারাজ সম্মুখে বইখানি খুলিয়া রাখিয়া একমনে নরেন্দ্রনাথের নিকট শেক্স-পীয়ারের কাব্যের সহিত সংস্কৃত কাব্যের কোথায় মিল ও বৈষম্য আছে সেই সমস্ত স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেন। শুনিতে-শুনিতে সারদা-মহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া উঠিত। তখন তিনি আর পড়িতে পারিতেন না, বইখানি বন্ধ করিয়া স্থির মনে জপ করিতেন। তিনি যখন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তখনও ঠিক এইরকম একমন-প্রাণ হইয়া পড়িতেন। বৈকাল হইল, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সারদা-মহারাজের কোনো হুঁস থাকিত না। অন্ধকার হইয়া আসিলে আলো জ্বালিয়া আবার পড়িতে বসিতেন, এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষরূপে শিখিয়াছিলেন।"

['ঘটনাবলী', ২য়]

পরবর্তী কয়েক বৎসর ছেড়ে একেবারে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর চলে যাওয়া যাক। উদ্বোধন প্রেস কেনা হয়েছে। সারদা-মহারাজ 'ওয়ার্ক' করতে বড় ব্যস্ত, প্রেস কেনার পরে ওয়ার্কের উপাদান পেয়েছেন—ফল কি হয়েছে, সাক্ষাৎদর্শী শচীন্দ্রনাথ বসু সদ্য পত্রযোগে তা জানিয়েছিলেন। একেবারে জ্বলজ্বলে জীবন্ত ছবিখানি, প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করছি :

"গত সোমবার [৬ নভেম্বর, ১৮৯৮]...স্বামীজী ও আমি [বেলুড় মঠ থেকে] বাগবাজারে আসিলাম।...[বলরাম বাবুর বাড়ির] হলঘরে [স্বামীজী] বসিলেন, আমরাও বসিলাম—কেবল আমি ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরৎ চক্রবর্তী আসিল। নানাবিধ কথা হইতেছে, এমন সময় সারদা-মহারাজ টলিতে-টলিতে আসিয়া হাজির—জ্বর হইয়াছে।

"স্বামীজী যখন আলমোড়াতে তখন হইতে ত্রিগুণাতীত-মহারাজ তাঁহাকে বারবার চিঠি লেখেন—ভাই, আমি work করিব—তুমি আমাকে ২,০০০ টাকা দাও, আমি প্রেস করিব, কাজ চালাইব। স্বামীজী তাঁহাকে ১,০০০ টাকা দিয়াছেন, বাকি ১,০০০ টাকা ধার করিয়াছেন। মাসে ১০ টাকা সুদ লাগে। ১,৫০০ টাকায় দুটি বেশ ভাল প্রেস কিনিয়াছেন. কিন্তু কিনিলে কি হইবে, কোনো কাজ নাই, ঠায় বসিয়া আছেন; বড়বাজারের এক গুদামে ৮ টাকা ভাড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। সুধীরের [শুদ্ধানন্দ] 'রাজযোগ' বইখানি [স্বামীজীর বইয়ের অনুবাদ] ছাপাইবার সংকল্প হইয়াছে, কিন্তু পয়সা নাই, কাগজ আসিবে কোথা হইতে?...আমি একবার ত্রিগুণাতীত-মহারাজকে বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ, ও কাজ [প্রেসের কাজ] বড় nefarious [হীন], আপনার কর্ম নয়। অপর লোকের করা উচিত।' তখন ভাবী spirit; বলিলেন, 'না, any work is sacred. আমি কাজ পেলে খুশি; কাজ করতে আমি নারাজ নই।' আমি চুপ করিয়া গেলাম। এখন রোজ ৬টার সময়ে প্রেসে যান, সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া হয়, আর আসেন রাত ৮টার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জ্বর হয়।

"কলকেতার চীনেবাজার আর বড়বাজার দেখে যদি কেউ বাঙালীমাত্রকেই চোর বলে, তা কি যথার্থ হয়?"—স্বামীজী বলেছিলেন।

"স্বামীজী ও রাখাল-মহারাজ একসঙ্গে ত্রিগুণাতীতজীকে অভ্যর্থনা করিলেন—কি বাবাজি, এসো, আজকের খবর কি? প্রেসের কতদূর? বলো বলো, বসো বসো!

"ত্রিগুণাতীত—(নাকি-সুরে ফোঁপাইতে-ফোঁপাইতে)—আঁর ভাই, আঁর পাঁরিনি—ওসব কাঁজ কি আঁমাদের পোঁষায় ভাই?...সারাদিন তীর্থির কাকের মতন বসে থাকতে হয়; না আছে একটা কাজ, না আছে কিছু। একটা job work পাওয়া গেছে, তাতে কি হবে? আট আনা বড় জোর পাওয়া যাবে। আমি প্রেস বিক্রী করে ফেলার চেষ্টা করছি।

"স্বামীজী—বলিস কি রে? এরই মধ্যে তোর সব শখ মিটে গেল? আর দিন-কতক দেখ্, তবে ছাড়বি। এই দিকে প্রেসটা নিয়ে আয় না, কুমারটুলীর কাছে! আমরা সকলে দেখতে পেতুম।

"ত্রিগুণাতীত—না ভাই, সেইখানেই থাক। দিনেক দুদিন দেখা যাক। ১৫-২০ টাকা লোকসান করে বেচে দেব।

"স্বামীজী—ও রাখাল, বলে কি? ওর যে খুব ট্রায়াল হল দেখছি। তোর এরই মধ্যে সব গুঁড়িয়ে গেল! Patience রইল না!

"এই কথা বলিতে-বলিতে স্বামীজীর চক্ষু ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন ও গর্জিয়া বলিলেন—বলিস কি রে? দে, প্রেস বিক্রী করে দে। আমার টাকার ঢের দরকার আছে। এই বেলা বিক্রী কর্—১০০-১৫০ টাকা লোকসান করেও বেচে ফেল্।...কাজের নামটি হলেই এদের সব বৈরাগ্যি উপস্থিত হয়—'আঁর ভাই পাঁরি নি—ওঁসব কাঁজ কি আঁমাদের?' কেবল খেয়ে-খেয়ে ভুঁড়ি উপুড় করে শুয়ে থাকতে পারে। যাদের কোন কাজে patience নেই তারা কি মানুষ?...তুই তিন দিন এখনো প্রেস করিসনি। যাঃ যাঃ তোর ঢের experiment হয়েছে—তোর বড় আস্বা হয়েছিল। কে তোকে প্রেস করতে সেধেছিল? তুই-ই তো আমাকে লিখে-লিখে টাকা আনালি। নিয়ে আয়না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার তোর মানে কি? আর এই তোর জ্বর-জ্বর হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখছিস্ না?

"ত্রিগুণাতীত—৮ টাকা ভাড়া দিতে হবে, এক মাসের এগ্রিমেণ্ট হয়েছে।

"স্বামীজী—দূর-দূর, ছি-ছি! এ বলে কি? এসব লোক কি কোন কাজ করতে পারে? ৮ টাকার জন্য পড়ে আছিস? তোদের এ ছোটলোকপনা কিছুতেই যাবে না। তুই আর হরমোহনটা সমান। তোদের কখনো কোনো business হবে না। সেও এক পয়সার আলু কিনতে পঞ্চাশ দোকান ঘুরবে আর ঠকে মরবে।...দে প্রেস আমাদের মঠে পেঁাছে—আমাদেরও তো একটা প্রেস চাই। দেখ্, কত লেকচার দিয়েছি, কত লিখেছি, তার অর্ধেকও ছাপা হল না। তুই আমাকে work দেখাস্? রাখাল, মনে কর্, সে আজ কত দিনের কথা—আজ সে ১২-১৩ বৎসরের কথা—সেই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কয়জনে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁদছি। আমি বললাম, তাঁর অস্থি গঙ্গার ধারে রাখা উচিত, গঙ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত, কারণ তিনি গঙ্গার ধার ভালবাসতেন।...আমার কথা শুনল না। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁকুড়-গাছির বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজেছিল। রাখাল, মনে কর্. আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ ১২ বছর bull-dog-এর মতন সেই idea নিয়ে তামাম দুনিয়া ঘুরেছি, একদিনও ঘুমোইনি। আজ দেখ্ তা সফল করলাম। সেই idea আমাকে একদিনও ছাড়েনি।...এ জাতের কি আর উন্নতি আছে?

"ত্রিগুণাতীত—ভাই, তোমার brainটি কেমন! তোমার brainটি আমায় দিতে পারো?

"এই কথায় খুব হাসি পড়িয়া গেল, কারণ বলিবার তারিফ ছিল। পরে ত্রিগুণাতীত বলিলেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটু সাবু খাইয়াছিলেন; এ-বেলা এক সের রাবড়ি, আধ সের কচুরী ও তদুপযুক্ত তরকারী আহার করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামীজী

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—শালা! তোর stomachটা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দি। লাহোরে সুরজলাল বলেছিল, 'স্বামীজী, তোমায় নানকের brain আর গুরুগোবিন্দের heart এসে গিয়েছে—কেবল জগমোহনের [খেতড়ির দেওয়ান] মত পেটটি চাই।'"৪৩ [উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৯]।

নেতার কাছে বন্ধু ও অনুগত সহকর্মীর চেহারা ঐরকম। বিবেকানন্দের কাছে সকলে উপনীত—অগ্নি আহরণের জন্য। তারপরে তাঁরা কী করতেন—তাঁদের একজন ত্রিগুণাতীত কী করেছেন—তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন কুমুদবন্ধু সেন তাঁর স্মৃতিকথায়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে উদ্বোধন প্রেসের প্রতিষ্ঠা, উদ্বোধন-পত্রিকা বেরুল ১৮৯৯-এর জানুয়ারি মাসে। সেই দিনটি এবং পরবর্তী দিনগুলির কথা কুমুদবন্ধু লিখেছেন :

"উদ্বোধন প্রকাশের দিন এখনো স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজী-লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়ন-সম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা, সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস, ও ছোট ছাপাখানা—তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।...আজ মনে পড়ে উদ্বোধনের সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরু দায়িত্বভার একাকী বহন করিয়াছিলেন।...দেখিয়াছি—শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কতদিন তিনি কখনো অনাহারে, অর্ধাহারে প্রেস ও পত্রিকার কার্য দেখিতেছেন। শুধু পরিদর্শকভাবে দেখা-শুনা নহে, আজ কম্পোজিটর অনুপস্থিত, তাঁহাকে নিজে সন্ধান করিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইতেছে, কাল প্রেসম্যান অসুস্থ, কোথায় প্রেসম্যান পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানে নানা স্থানে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কোথায় সস্তায় প্রেসের কোন্ উপকরণ পাওয়া যায়, সেই তথ্য লইবার জন্য কখনও ছুটাছুটি করিতেছেন, আবার কখনও-কখনও প্রেসের লোকজনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রবন্ধসংগ্রহ এবং প্রবন্ধরচনা করিতেও হইত। ঠিক সময়ে পত্রিকা-প্রকাশ না হইলে স্বামীজীর নিকট তিরস্কৃত হইতেন। ইহা ছাড়া ছাপাখানার কাহারও ব্যায়রাম হইলে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইত। নানাদিকে এইসব কঠোর পরিশ্রমেও তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত—ক্লান্তির কোনো কালিমা দেখা যাইত না। বেশীর ভাগ কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান বস্তীতে বাস করিত। তিনি বিনা সংকোচে বস্তীর মধ্যে যাইয়া তাহাদের খোঁজ করিতেন। কতদিন দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্ত স্বর্গীয় মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে অপরাহ্নকালে তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলপান করিতেছেন এবং তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি তাঁহার তখনও স্নানাহার হয় নাই। মণীন্দ্রকৃষ্ণ মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র এবং তাঁহার দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদনা তিনি নিজেই করিতেন। তাঁহাদের 'প্রভাকর প্রেস' নামক একটি প্রেস ছিল, সুতরাং

৪৩ ত্রিগুণাতীতের অধিক আহার রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে সবিস্ময় কৌতুকের বিষয় ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত একটি মজার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একদিন বাবুরাম-মহারাজের বাড়িতে সারদা-মহারাজ ও আরও দুজনের নিমন্ত্রণ। কার্যগতিকে সারদা-মহারাজ ছাড়া কেউ হাজির হতে পারেননি। তিন জনের রান্না হয়েছিল। পাছে রুটি তরকারি নষ্ট হয়, সারদা-মহারাজ একাই তিনজনের খাবার শেষ করলেন। বাবুরাম-মহারাজের মা কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বৃদ্ধার সারারাত্রি উদ্বেগে গেল। না-জানি কি অসুখ বাধে। পরদিন সকালে সারদা মহারাজকে সুস্থ দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "সারদা কি খায়রে! ও অনেক পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়িয়েছে, ও অনেক 'মোন্তর' শিখেছে, তাই উড়ো মোন্তরে উড়িয়ে দেয়; তা না হলে মানুষ কি অত খেতে পারে।"

সন্ধান লইতে সেখানে অনেক সময়ে তিনি যাইতেন। এদিকে পত্রিকায় কোন-প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল-ত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলের ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ তখন উদ্বোধনে সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই উদ্বোধনে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, 'কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তা তো বুঝতে চাও না!' স্বামীজী বলিলেন, 'ও-সব কথা রেখে দে। তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের উপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটররাও বিদ্বান নয়। যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল, তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক-ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়! তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি, তবে উন্নতিটা কি হল বল্?' স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রহিলেন। প্রেস ও পত্রিকা, দুটির জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে, বিশেষ, কম্পোজিটর প্রভৃতির সন্ধানে তাঁহাকে বস্তীতে-বস্তীতে ঘুরিতে হইতেছে শুনিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ্ করিলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করিলেন। কখনও-কখনও তিনি উদ্বোধনের জন্য বাগবাজার পল্লীর যুবকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।" ['উদ্বোধনের জয়যাত্রা'—উদ্বোধন সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা; ১৩৫৪]।

সামনে যাঁর লাঞ্ছনা করছেন, তাঁকে স্বামীজী শ্রদ্ধা করছেন একই সঙ্গে, অন্তরালে প্রশংসা ঢেলে দিচ্ছেন—তিনি এমনই করতেন। তিনি জানতেন, ত্রিগুণাতীত কী করছেন! মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন—ঠাকুরের সন্তানের পক্ষেই এ জিনিস করা সম্ভব। জগদ্ধিতায় এঁদের দেহধারণ।৪৪

'উদ্বোধন' কী, সেই কথাটাই সবশেষে স্মরণ করতে চাই। উদ্বোধন কি পত্রিকা মাত্র? কদাপি নয়। উদ্বোধন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী-শরীর। তাই হোক—স্বামীজী অন্ততঃ তাই চেয়েছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা অমোঘ, এই বিশ্বাস আমরা

---

৪৪ জগতের হিতকর্মে স্বামী ত্রিগুণাতীতের ক্লান্তি ছিল না। পত্রিকার দ্বারা ভাবপ্রচারের ভাবটি তাঁর মাথায় গেঁথে ছিল। আমেরিকায় প্রচারকার্যে গিয়ে তিনি কেবল সানফ্রানসিসকোর হিন্দুমন্দিরই স্থাপন করেননি, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে *Voice of Freedom* নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বের করেছিলেন। *The Disciples of Ramakrishna* গ্রন্থে পত্রিকাটির বিষয়ে পাই :

"The magazine ever and always held constant to the high ideals of truths of the Vedanta philosophy and the varieties of materials published soon attracted a wide circle of readers. Soon the *Voice of Freedom* was an established success with a growing list of interested friends and subscribers. The magazine continued for seven years, after which period it was stopped to the disappointment of many Vedanta friends."

রাখতে চাই। স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধনের পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১ মাঘ, ১৩০৯) উদ্বোধনের স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন : "শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্য বা ব্রহ্মশক্তি, বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া, পরম কল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেইজন্য আপাত শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী, এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণ-সাধনে বদ্ধপরিকর।"

অবিশ্বাস্য বৃহৎ আশা। কিন্তু সে আশা অন্য কারো নয়, স্বামী সারদানন্দের তপস্যা-সংস্কৃত চিত্তের। স্বামী বিবেকানন্দের আশা আরও বৃহৎ—অন্ততঃ অতুলনীয় বৃহৎ ও গম্ভীর ভাষায় তাঁর আশা প্রকাশিত হয়েছিল—উদ্বোধনের প্রস্তাবনায় যা পেয়েছি। "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"—সঘন কণ্ঠে স্বামীজী বলেছিলেন। সে ভারতবর্ষ শুধুই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হবে না, নূতনের উদ্বোধন-ভূমিও হবে। তার জন্য—"চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি; আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।" আধ্যাত্মিক ভারত-বর্ষে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রজোগুণ চান—কি বিচিত্র বিপরীত আকাঙ্ক্ষা! বিবেকানন্দ হাহাকার করে উঠলেন—সত্ত্বগুণ—সত্ত্বগুণ কোথায়?—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল! যেথায় মহাজড়বুদ্ধি, পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস, বৈরাগ্যের আবরণ নিজ অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী, তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুর-তাকেও ধর্ম করিয়া তোলে; যেথায় নিজ সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে, এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"

"অতএব, সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূরে";—স্বামীজী বললেন,—তমোগুণকে বিতাড়িত করতে প্রয়োজন রজোগুণের, ভারতে যার একান্ত অভাব। পাশ্চাত্ত্যে অপরপক্ষে রজোগুণের পূর্ণ প্রকোপ। ভারত যদি রজোগুণের দ্বারা উদ্দীপিত করতে পারে নিজেকে, তাহলে তমোগুণ পরিষ্কৃত হয়ে সত্ত্বগুণ নির্মল আলোকে পুনঃপ্রকাশিত হবে, যে-সত্ত্বকে অপরপক্ষে রজো-গুণী পাশ্চাত্ত্যের বড় প্রয়োজন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে গুণের বিনিময় না হলে পৃথিবীর কল্যাণ নেই। "এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।"

ভারতের জন্য 'উদ্বোধন' বিশেষভাবে কি করবে? স্বামীজী বললেন, ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখবে, যাতে সকলে পিতৃধন দেখতে ও জানতে পারে। তারপর? বিবেকানন্দ তারপর যা লিখেছিলেন, সে রচনা একমাত্র তাঁরই, যাকে প্রাণবাণী না করলে কোনো উদ্বোধন'ই সম্ভব নয় :

"নিভীক হইয়া সর্ব দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্ত্যকিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল, তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"

॥ ৫ ॥ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বসুমতী ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত পত্রিকা-প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। 'দৈনিক বসুমতী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে' (১৩৭১) আমি 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ও বসুমতীর উপেন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রধানতঃ তা থেকেই তথ্যসংগ্রহ করে দিচ্ছি। কিছু সংবাদ ঐ স্মারক গ্রন্থের অন্যান্য রচনা থেকেও নিয়েছি। উক্ত প্রবন্ধ-সূচনায় লিখেছিলাম :

"বসুমতী সংবাদপত্রগোষ্ঠী ও বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের সংস্কৃতি-জীবনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম। দুঃখের বিষয়, বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই শ্রেষ্ঠ কর্মী মানুষটির যোগ্য স্থান এখনো নির্ধারিত হয়নি। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে একদা বসুমতী ছিল তাদের 'নিজস্ব' সংবাদপত্র।...বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের সুলভ প্রকাশনগুলি দীর্ঘদিন ধরে সর্বসাধারণের কাছে শ্রেষ্ঠ ও নাতিশ্রেষ্ঠ রসসাহিত্য ধর্মসাহিত্য, বিদেশী ক্ল্যাসিকের অনুবাদ পৌঁছে দিয়ে এসেছে।...বাংলার লোকশিক্ষার সংগঠক এই মানুষটি তাঁর সমস্ত প্রেরণার উৎসরূপে পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং গুরুভ্রাতা ও বাল্যবন্ধু স্বামী বিবেকানন্দকে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের সংযোগ প্রথমাবধি। অবশ্য সূচনাপর্বে তাঁর ভূমিকা খুব বড় নয়। পরবর্তীকালেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। তিনি গৃহী ও ব্যবসায়ী থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ভক্ত গৃহী এবং পুস্তকই তাঁর ব্যবসায়-সামগ্রী। অধিকন্তু তিনি সংবাদপত্রের পরিচালক। সুতরাং আমরা দেখতে পাই ভক্ত উপেন্দ্রনাথ তাঁর পত্রিকা এবং প্রকাশনের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করে যাচ্ছেন প্রবল উৎসাহে। সাধারণ বাঙালীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে উপেন্দ্রনাথের বসুমতীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।"

উপেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন না, একথা স্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে উপেন্দ্রনাথের উল্লেখ মাত্র একবার পাওয়া গিয়েছে। শোনা যায়, কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শেষ অসুখের সময়ে যখন 'আত্মপ্রকাশে ভক্তদের অভয়দান' করেছিলেন (যা এখন শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরুভাব নামে সুপরিচিত) তখন সেখানে উপেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ-পত্নীর স্মৃতিকথায় (শ্রীমতী রাণী চন্দ-সংগৃহীত) উপেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের স্নেহের কথা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁকে দাহ করতে যাঁরা নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ছিলেন এবং ফেরার পথে বিষাক্ত সর্পদষ্ট হয়েও আশ্চর্যভাবে পরিত্রাণ পান।

ভাবাদর্শে উপেন্দ্রনাথ কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকানন্দ-সমর্থক ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে তাঁর দেহাস্থি সংরক্ষণের ব্যাপারে, এবং তাঁর জীবন ও বাণী প্রচারের পদ্ধতি সম্বন্ধে, ভক্তদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। এক দিকের নেতা ছিলেন বৈষ্ণবপন্থী গৃহী ডাঃ রাম দত্ত, অন্য পক্ষে অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাম দত্ত চেয়েছিলেন, কাঁকুড়গাছিতে তাঁর বাগানে দেহাস্থি সংরক্ষণ করা হোক; সন্ন্যাসী শিষ্যদের অভিপ্রায় ছিল, গঙ্গাতীরে কোনো স্থানে তাকে স্থাপনা করবেন। রাম দত্তের ইচ্ছাই তখন কার্যকরী হয়েছিল, কারণ গৃহত্যাগী নিঃসম্বল সন্ন্যাসী যুবকদের পক্ষে ইচ্ছানুরূপ কাজ করা সম্ভব ছিল না। উপেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে রাম দত্তেরই সমর্থক, 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থ থেকে তা পাই।

এ-ব্যাপারেই শুধু নয়, রাম দত্ত যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার আরম্ভ করেন প্রকাশ্য বক্তৃতায় ও কীর্তনাদির দ্বারা (১৮৮৭-১৮৯৩) তখনো উপেন্দ্রনাথ আরও কয়েকজনের সঙ্গে রাম দত্তের সহায়তা করেন প্রবল উৎসাহে, একথা পেয়েছি তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকায় এবং 'ভক্ত মনোমোহন' গ্রন্থে।

এই সব তথ্য থেকে বুঝতে পারি, স্বামীজীর পক্ষে উপেন্দ্রনাথকে নিজ ভাবপ্রচারে শ্রেষ্ঠ সহায়ক মনে করা সম্ভব ছিল না। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৫ অগস্ট সাপ্তাহিক বসুমতী ভূমিষ্ঠ হয়েছিল—তা সত্ত্বেও স্বামীজী সংঘ-ভাব-বাহন একটি বাংলা পত্রিকার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যায় যে 'আত্মনিবেদন' বেরিয়েছিল, তার মধ্যেও লেখা ছিল না—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারের জন্যই এই পত্রিকার জন্ম। সাধারণ একটি সংবাদপত্ররূপেই বসুমতীর আবির্ভাব, এই রকমই ঘোষিত হয়েছিল।৪৫ আমাদের বিশ্বাস, তার ফল ভালই হয়েছিল, কারণ সংঘ-মুখপত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রচারিত বলে ধরে নেওয়া হয়, সেজন্য পাঠকের অধিক আকর্ষণ ও অধিক বিকর্ষণ দুই-ই তা পায়; কিন্তু দলীয় মুখপত্ররূপে চিহ্নিত নয়, এমন পত্রিকার প্রচারণা স্বচ্ছন্দে পাঠকচিত্তে প্রবেশ করে যায়।

যাইহোক, শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"আমাদের নরেন আর উপেন প্রচারের কাজ করবে। নরেন লেকচার দেবে, উপেন ছাপাখানা করবে।"৪৬ আরও শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ উপেন্দ্রের বটতলার ছোট বইয়ের দোকানে গিয়েছিলেন। দোকানের দরজা ছোট, নীচু। বিব্রত উপেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "যা, তোর দরজা বড় হবে।"৪৭

বটতলায় একখানি 'ছোট কেতাবের দোকান' করে উপেন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ। সম্ভবতঃ ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ঐ দোকানের পত্তন। উপেন্দ্রনাথ অতীব সাহসের সঙ্গে সৎসাহিত্য প্রচারের পরিকল্পনা করেন, যা ভবিষ্যতে বাংলার সংস্কৃতিজীবনে তাঁর ভূমিকাকে গৌরবান্বিত করবে। তিনি অত্যন্ত অল্প মূল্যে বাংলা, এবং সংস্কৃত ও বিদেশী সাহিত্যের [অনুবাদের দ্বারা] প্রচারের ব্যবস্থা করেন।৪৮

উপেন্দ্রনাথ এতেই সন্তুষ্ট থাকেননি। পত্রপত্রিকা প্রকাশে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। প্রথমপর্যায়ে তাঁর এই বিষয়ে প্রচেষ্টা সম্বন্ধে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি জানিয়েছেন, 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রবর্তন উপেন্দ্রনাথই করেন : "উপেন্দ্রবাবুর সহিত 'সাহিত্যে'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৯৬ [১৮৮৯] সালে উপেন্দ্রনাথ ৩নং বিডন স্কোয়ার হইতে

---

৪৫ 'আত্মনিবেদনে'র অংশ : "সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয় রাজনীতিও ইহাতে থাকিবে, দেশের অভাব-অভিযোগাদির কথাও থাকিবে। তদ্ভিন্ন ইতিহাস, দেশ-নগরাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, হিন্দুর পুরাতন মহিমার কথা, ধর্মশাস্ত্রাদির কথা, উপন্যাস, রঙ্গরহস্য প্রভৃতি সুখপাঠ্য বিষয় থাকিবে। অন্নপ্রাণ বাঙালী অবসন্ন প্রাণে যাহাতে দুটো সুখের কথা, দুটো অর্থের কথা, দুটো উপায়ের কথা, দুটো আশার কথা, দুটো হাসির কথা, পড়িতে পায়, বসুমতীতে প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টা করা যাইবে।" [বসুমতী স্মারক গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'বসুমতীর ইতিকথা']

৪৬ প্রাণতোষ ঘটক-লিখিত 'জয়তু দৈনিক বসুমতী' রচনা। [বসুমতী স্মারক গ্রন্থ]

৪৭ *Seven Gates of Wisdom*—দিলীপ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ। [ঐ]

৪৮ এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন—"তিনি যখন সাহিত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন বাংলায় এত পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। তখন মধুসূদন 'মহীর পদে মহানিদ্রাগত', বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তখন মধ্যগগনে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় কেবল অরুণবিকাশ সূচনা। তখনও 'বটতলা' বাংলার পুরাতন সাহিত্যের দ্বারপাল; পরিবর্দের কল্পনা তখনও বিকশিত হয় নাই। সেই সময়ে উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পরিণতি বসুমতী সাহিত্যমন্দিরে। এই সাহিত্যমন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলি নামমাত্র মূল্যে বাঙালীর গৃহে-গৃহে বিরাজিত হইয়াছে। সেই মন্দির হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের গ্রন্থসমূহ, সঞ্জীবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে। এই সাহিত্য-প্রচারই বোধহয় তাঁহার নিয়তিনির্দিষ্ট কার্য ছিল।...পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের মধ্যে এক-এক জন এক-এক দিকে দিক্‌পাল। এক-এক জন এক-এক দিকে কাজ করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের মত উপেন্দ্রনাথও এক বিভাগে কার্যের ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ]

'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামে একখানি মাসিকপত্রের প্রচার করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' সম্পাদক ছিলেন। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' প্রকাশিত হয়। শিবপ্রসন্নবাবু চারি পাঁচ মাস 'সাহিত্য কল্পদ্রুমের' সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। বোধ হয়, অগ্রহায়ণ মাসে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' আমার চোখে পড়ে এবং আমি উপেন্দ্রবাবুর সহিত পরিচিত হই। উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল, আমার অগ্রজ-তুল্য সুহৃৎ মথুরানাথ সিংহের প্রেরণায়, আমি 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। আমার সহিত 'কল্পদ্রুমের' কোনও আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না।...চৈত্র মাসে প্রথম খণ্ড শেষ করিয়া আমি বৈশাখ হইতে বর্ষ গণনার ও নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা করি এবং 'কল্পদ্রুম' বর্জন করিয়া 'সাহিত্য' নাম রাখি। কিন্তু ডাকঘরে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র নামে স্ট্যাম্পের টাকা জমা ছিল। এই জমা [জমার জন্য] প্রথম তিন মাস 'সাহিত্যে'র মলাটে 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র নামও রাখিতে হইয়াছিল। ১২৯৭ সালেও উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১২৯৭ সালের শেষভাগে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে'র স্বত্ব ও স্বামিত্ব ত্যাগ করেন। আমি ১২৯৮ সাল হইতে 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হই। আমাকে 'সাহিত্য' দিবার পর বোধ হয় ১২৯৮ সালে উপেন্দ্রবাবু আবার 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র প্রচার করিয়াছিলেন। সে পর্যায়ে সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তফী 'সাহিত্য কল্পদ্রুমে'র সম্পাদক হইয়াছিলেন। অল্পকাল পরে উপেন্দ্রবাবু 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' বন্ধ করিয়া দেন।" সমাজপতি জানিয়েছেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'র প্রতি প্রীতি বজায় রেখেছিলেন, এবং তার বিপদের দিনে সাহায্য করেছেন।৪৯

'সাহিত্য কল্পদ্রুম' ও 'সাহিত্যের' প্রবর্তন হয়েছিল বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে। বাংলা দেশে এইকালে প্রধান সাময়িক পত্রিকাগুলি সংস্কারবাদী ও ব্রাহ্মদের করায়ত্ত। তার ফলে হিন্দু ঐতিহ্যবাদীরা যথেষ্ট পরিমাণে নিজ বক্তব্য তুলে ধরতে পারতেন না। সেই অসুবিধা দূর করার জন্য প্রথমে উপেন্দ্রনাথ, পরে সমাজপতি এগিয়ে এসেছিলেন। এ বিষয়ে হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ ১৭ চৈত্র, ১৩২৫ সালে দৈনিক বসুমতীতে লিখেছিলেন : "যে 'সাহিত্য' আজ সমাজপতির সম্পাদকত্বে সর্বত্র সমাদৃত, উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক। তখন বাংলায় উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রের অভাব ছিল—বিশেষ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাহেতু তখনকার মাসিকপত্রগুলি সম্প্রদায়বিশেষরই রচনায় সমৃদ্ধ হইত—নূতন লেখকদিগের প্রতিভা সাহিত্যে প্রযুক্ত হইবার অবসর পাইত না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য 'সাহিত্যে'র প্রচার—উপেন্দ্রনাথ তাহার প্রবর্তক, সমাজপতি তাহার সম্পাদক।" সংবাদপত্রজগতে উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা হেমেন্দ্রপ্রসাদ অতঃপর লিখেছেন : "একসময়ে 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্র, 'হিতবাদী'র কাব্য-বিশারদ ও 'বসুমতী'র উপেন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রত্রয়ের পরিচালক ছিলেন,—উপেন্দ্র-নাথ তাঁহাদের শেষ।"

আগেই বলা হয়েছে, নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যাবধি পরিচয়। সে পরিচয়ের অল্প হলেও অন্তরঙ্গ ছবি দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ-পত্নী তাঁর স্মৃতিকথনে (রাণী চন্দের 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থে সংকলিত)। মামার বাড়িতে মানুষ, দরিদ্র বালক উপেনের প্রতি কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের নয়, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেরই গভীর স্নেহ-সহানুভূতি ছিল। এবিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : "উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্রাহ্মণকুমার শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের নিকট যাইতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট 'আমার অর্থ হউক' এইরূপ প্রার্থনা

৪৯ পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

করিয়াছিলেন। কাশীপুর বাগানের শেষ সময় বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর যোগেন-মহারাজ [স্বামী যোগানন্দ] চৌদ্দ টাকা দিয়া একটি পুরাতন হ্যাণ্ড প্রেস (যাহার কাঠ মাত্র অবশেষ ছিল) কিনিয়া উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেন। তারপর তিনি চিৎপুর রোড়ে বটতলায় একখানি ছোট দোকান করেন।৫০ যোগেন-মহারাজ সেই দোকানের সামনে দিয়া যাইলে উপেন মুখোপাধ্যায় আসিয়া প্রণাম করিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতেন। ১৮৯০ সালে উপেন মুখোপাধ্যায় বিডন উদ্যানের পূর্বদিকের রাস্তাটির দক্ষিণ কোণে একখানি বাড়ি ভাড়া লইয়া একটি ছাপাখানা স্থাপন করিলেন, এবং সময় পাইলেই নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন-মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও সর্ববিষয়ে পরামর্শ লইতেন। তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন-মহারাজের নিতান্ত অনুগত এবং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে প্রায় সন্ধ্যার সময় আসিতেন। পুস্তক ছাপিবার বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উপাদান দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে তিনি 'রাজভাষা' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার বিশেষ অর্থাগম হয়।৫১ নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁহার ছাপাখানার বাড়িতে যাইতেন।" ['ঘটনাবলী', প্রথম খণ্ড]৫২

১৮৮০-৮১ থেকে ১৮৯০-৯১ পর্যন্ত সময়ে নরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথের পুস্তকব্যবসায়ে কতখানি সাহায্য করেছিলেন, তার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সাহায্যের পরিমাণ যে সবিশেষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইকালে নরেন্দ্রনাথ ও যোগেন-স্বামীর কাছে পরামর্শ নিতে উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন, এবং ঐ দুজনে উপেন্দ্রনাথের বিডন স্ট্রীটের দোকানে প্রায়ই যেতেন, এই সংবাদ মহেন্দ্রনাথের লেখায় পেয়েছি। নরেন্দ্রের নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত, তাঁর পরামর্শকে বন্ধুবান্ধবেরা মান্য করতেন; এবং বিস্ময়কর হলেও সত্য—তাঁর বাস্তব বুদ্ধি ছিল অসাধারণ, বৈষয়িক পরামর্শ দিতে পারতেন, দিতেনও সহজ খুশিতে, অবশ্য নিজের জন্য সে বিষয়বুদ্ধি প্রয়োগ করা তাঁর হয়ে ওঠেনি, কারণ ঈশ্বর তাঁকে বিষয়াসক্তি

---

৫০ দোকানটি বোধহয় কিছু আগেই হয়েছিল, সম্ভবতঃ ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে। মাসিক বসুমতী স্মারক গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দোকানে গিয়েছিলেন—নিশ্চয়ই তিনি শেষ অসুখের আগেই গেছেন। আগে বটতলার দোকান, তারপরে সেখানে প্রেস—এমন হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ উপেন্দ্রনাথের দোকানে সত্যই গিয়েছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। বসুমতী স্মারক গ্রন্থে দিলীপ দাশগুপ্ত লিখেছেন, তিনি গিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ গ্রন্থের মূলে সম্পাদকীয়ের ('লহ প্রণাম') বিবরণ অন্যপ্রকার : "দৈনিক বসুমতী তখনও প্রকাশিত হয়নি। সাপ্তাহিকও না। উপেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বসুমতী সাহিত্যমন্দির তখন রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল ধর্মগ্রন্থ থেকে শুরু করে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাবলী সুলভে প্রকাশ করে সুধীসমাজে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।...বিরাট চাহিদা মেটাতে হিমসিম খান উপেন্দ্রনাথ। ছোট্ট প্রেস, সময়মত বই ছেপে বার করার ভীষণ সমস্যা। ছোট্ট বাড়ি, ছাপা বই রাখবার স্থান সঙ্কুলান হয় না।...দৈনিক বিক্রি হাজার-বারশো টাকার মত, সে যুগে এক অকল্পনীয় ঘটনা। কিন্তু ঋণও অনেক।...হাতে প্রয়োজনমত টাকা জমে না। বড় বাড়ি, বড় প্রেস স্বপ্নেই থেকে যায়। শেষে একদিন কথায় কথায় এই সমস্যার কথা নিবেদন করলেন উপেন্দ্রনাথ গুরুদেব রামকৃষ্ণের কাছে। সব শুনে সস্নেহে ঠাকুর বললেন—"উপীন, যা তোর দরজা বড় হবে।"

৫১ বসুমতী স্মারক গ্রন্থে শ্রীসুধীর বেরা লিখেছেন : "বসুমতী-প্রকাশিত 'রাজভাষা ইংরেজি শিক্ষার প্রামাণ্য বই হিসাবে স্বীকৃত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।" এই বইখানি 'উপেন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য কীর্তি।'

৫২ ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে (১৮৯০?) উপেন্দ্রনাথ বিডন স্ট্রীটের বাড়িটি কিনে যোগেন-মহারাজকে খবর দিতে যান বলরাম বসুর বাড়িতে—সেখানে উপস্থিত মহেন্দ্রনাথ দত্ত সে বিষয়ে লিখেছেন। ঐ বাড়িটি ১৩,০০০ টাকায় কেনা হয়েছিল। "উপেন মুখুজ্জে যোগেন-মহারাজকে গুরুর মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, তাই আহ্লাদ করিয়া খবরটি দিতে আসিয়াছেন।" ['ঘটনাবলী', ২য়]

দেননি। 'রাজভাষা' গ্রন্থের পরিকল্পনা ছাড়াও, (যে-বইয়ের আর্থিক সাফল্য, উপেন্দ্রনাথকে বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত করেছিল) উপেন্দ্রের ব্যবসার প্রয়োজনেই নরেন্দ্রনাথ হারবার্ট স্পেন-সারের 'এডুকেশন' বইটি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। এ-জাতীয় সাহায্য করতে নরেন্দ্রনাথ অভ্যস্ত ছিলেন। "কোনো দরিদ্র সঙ্গীতপুস্তক-প্রকাশককে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া-ছিলেন।" [বইটির বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।]

উপেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার প্রতি নরেন্দ্রনাথের সহানুভূতির আর একটি প্রমাণ, উপেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত পূর্বোক্ত 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকার একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকে (১২৬১) তিনি টমাস-আ-কেম্পিসের *Imitation of Christ* গ্রন্থটির অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন 'ঈশা-অনুসরণ' নাম দিয়ে। অনুবাদ-সূচনায় তিনি একটি ভূমিকাও নিজস্বভাবে যোগ করেছিলেন। অনুবাদটি অবশ্য শেষ হয়নি, পাঁচ সংখ্যা মাত্র বেরিয়েছিল, কারণ ঈশা-অনু-সরণে নরেন্দ্রনাথ অতঃপর বেরিয়ে পড়েছিলেন।৫৩

পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ যখন চিকাগোয় সহসা খ্যাতিলাভ করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন, এদেশ তাঁর বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে, তখনো তাঁকে অযথা নিন্দা করার লোকাভাব হয়নি। সেইকালে এন এন ঘোষের ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকায় স্বামীজীর বিরুদ্ধে অযথা আক্রমণাত্মক লেখা বেরিয়েছিল (এন এন ঘোষ এই অন্যায় পরে স্বীকার করেন), তখন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, এবং সে প্রতিবাদ এমনই জোরালো হয়েছিল যে, এন এন ঘোষকে তার বিস্তৃত উত্তর দিতে হয়। [প্রসঙ্গটি প্রথম খণ্ডে, ২৫০-৫১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে]। উপেন্দ্রনাথ ঠিক কী লিখেছিলেন, কোথায় তা প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা তা জানি না। যাইহোক, ১৮৯৪, ৯ই এপ্রিল, ইণ্ডিয়ান নেশনে এন ঘোষ উপেন্দ্রনাথের প্রতিবাদের উত্তরে যা লিখেছিলেন তার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি :

"Our friend Babu Upendra Nath Mukerjee of Shampukur Street is charming in company but is apt to be fretful in controversy on paper. Our notice of Swami Vivekananda's paper on Hinduism has elicited from him a criticism which is quite needlessly snappish, and, we feel bound to say, is not nearly as acute and coherent as we might expect. He is angry for our calling the name 'Swami Vivekananda' a disguise; but we meant no offence. Every disguise is not dishonest, and a change of name is a disguise. We pass on to his arguments...."

অনুপস্থিত বন্ধুর পক্ষসমর্থনে দাঁড়িয়ে মাত্র উপেন্দ্রনাথ বন্ধুকৃত্য করেননি, তিনি বন্ধুর ইচ্ছাপূরণেও এগিয়ে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণভাবপ্রচারের জন্য পত্রপত্রিকার প্রকাশে স্বামীজী কতখানি উৎকণ্ঠিত ছিলেন আমরা আগে প্রচুরভাবে দেখে এসেছি। স্বামীজীর ভারতত্যাগের পূর্বে, উপেন্দ্রনাথ যখন বসুমতী সাহিত্যমন্দির স্থাপন করে ফেলেছেন, স্বামীজীর সঙ্গে তখন নিশ্চয় তাঁর পত্রপত্রিকা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। স্বামীজী নিশ্চয় তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' দিয়ে উপেন্দ্রনাথের কার্যারম্ভ, তার প্রথম পরিণত রূপ সাপ্তাহিক বসুমতী। আগেই জানিয়েছি, পত্রিকাটি বেরিয়েছিল ১৮৯৬ সালের অগস্ট মাসে। স্বামীজী তখন কিন্তু বিদেশে। তিনি ভারতে ফেরেন ১৮৯৭ সালের গোড়ায়। অথচ ১৮৯৬ সালের অগস্ট মাসের সাপ্তাহিক বসুমতী প্রাণমন্ত্ররূপে

৫৩ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ, ১৬

স্বামীজীর প্রদত্ত 'নমো নারায়ণায়' বাণীকে শিরোধার্য করেছিলেন।৫৪ দুভাবে তা হওয়া সম্ভবপর—হয়, স্বামীজী ভারতত্যাগের আগেই মন্ত্রটি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, নয়, আমেরিকা থেকে পত্রযোগে বাণীটি পাঠিয়েছিলেন।৫৫

বসুমতী-প্রবর্তনে বিবেকানন্দেরই যে মূল প্রেরণা, একথা প্রায়-সমসাময়িক কালের সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের রচনা থেকে পাই। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি হেমেন্দ্র-প্রসাদের রচনাংশ উদ্ধৃত করেছিলেন তাঁর লেখায় :

"যেদিন তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] দেহত্যাগ করেন, সেদিন উপেন্দ্রনাথ যেরূপে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, সে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বটে। গুরু দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার শব জাহ্নবীপুলিনে শ্মশানে আনিয়াছিলেন—পথে উপেন্দ্রনাথ বিষধর-দশনদষ্ট হইলেন। তিনি নীলবর্ণ হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। সে অবস্থায় কেহ জীবনলাভ করে না। কিন্তু এক-রূপ বিনা চিকিৎসাতেই উপেন্দ্রনাথ জীবনলাভ করিলেন। যে জীবনের কাজ তখন কেবল আরম্ভ হইয়াছে, সে কাজ সম্পন্ন না করিলে তিনি ত যাইতে পারেন না।...সেই ভাব-বিকাশের অন্যতম উপায় 'বসুমতী'। **বিবেকানন্দ যখন তাঁহার গুরুভাই উপেন্দ্রনাথকে পুনঃ পুনঃ সংবাদপত্র প্রচারে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, তখন উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'সাহস হয় না'**। তিনি তখন সে কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি তখন বাংলা সাহিত্যের সাধনা করিতেছিলেন। তদবধি তিনি একাধিক পত্র প্রচার করেন—নানা কারণে সে সকলের স্থায়িত্ব সম্ভব হয় নাই। তাহার পর বসুমতী প্রচার।"

১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাপ্তাহিক বসুমতী নিশ্চয় যথাসম্ভব রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সংবাদ প্রকাশ করে গেছে, ধরে নেওয়া যায়। কিছু-কিছু সংবাদ অন্য সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হয়েছে দেখেছি। ইণ্ডিয়ান মিরারে ৩০ জানুয়ারি, ১৮৯৮, এবং ২৯ মার্চ, ১৮৯৮, বসুমতী থেকে বিবেকানন্দ-সংবাদ গৃহীত হয়েছিল। নব্যভারত পত্রিকা বসুমতী থেকে স্বামীজীর সঙ্গে মধুসূদন সরকারের কথাবার্তার মূল্যবান বিবরণ সংকলন করেছিল, তার পরিচয় আমরা দিয়েছি। [তৃতীয় খণ্ড, ১৭০-৭১]। তার আগে ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর কলকাতা সংবর্ধনায় উপেন্দ্রনাথ প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বামীজীর মর্যাদারক্ষায় তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন। ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন "সংসার"

---

৫৪ সাপ্তাহিক বসুমতীর এই কালের ফাইল পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক শুধু তার প্রথম সংখ্যাটি পেয়েছিলেন, সেটি তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন, এবং তার উপর নির্ভর করে ব্রজেন্দ্রনাথ বসুমতী সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে কিন্তু স্বামীজী-প্রদত্ত 'নমো নারায়ণায়' বাণীর উল্লেখ নেই। সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যাটিও এখন প্রাপ্তব্য নয়; ব্রজেন্দ্রনাথের হঠাৎ মৃত্যুর ফলে তা অদৃশ্য। প্রাণতোষবাবু আমাকে জানিয়ে-ছিলেন, 'নমো নারায়ণায়' বাণী ঐ প্রথম সংখ্যাতে ছিল, তাঁর বেশ মনে আছে।

৫৫ তৃতীয় সম্ভাবনা প্রাণতোষবাবুর স্মৃতি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে—সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রথম সংখ্যাতে ঐ মন্ত্রটি ছিল না; স্বামীজী ভারতে ফেরার পরে ওটি দেন, এবং পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক বসুমতী, ও তারও অনেক পরে দৈনিক বসুমতী সেটি গ্রহণ করে।

স্বামীজী 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্রটি কেন দিয়েছিলেন—বসুমতীকে এবং তার পাঠকবৃন্দকে—প্রচলিত হিন্দুধর্মমতে 'নারায়ণ'-উপাসক করবার জন্য? মনে হয় না। স্বামীজীর নারায়ণ শুধু বৈকুণ্ঠে থাকতেন না, তিনি সর্বজীবের অন্তরশায়ী নারায়ণ। স্বামীজীর সেই অপূর্ব মানবতার বাণী স্মরণ করি : "নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে-ভগবান বিদ্যমান, একমাত্র যে-ভগবানে আমি বিশ্বাসী,—এই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ।" 'নমো নারায়ণায়' বলে সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে সম্বোধন করেন, নমস্কার করেন, তা করেন পরস্পরের অন্তরদেবতাকে লক্ষ্য করেই—এমনই নমস্কারমন্ত্র স্বামীজী বসুমতীকে দিয়েছিলেন।

পত্রিকার ২০ চৈত্র, ১৩০৪ সংখ্যায় "মার্কিন স্বামীর দল" নামে স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে নিছক বিদ্বেষপূর্ণ একটি লেখা লেখেন, তার বিরুদ্ধে বসুমতী পত্রিকায় প্রতিবাদ জানানো হয়—সে সংবাদ পাই সংসার পত্রিকাতেই, ৪ বৈশাখ, ১৩০৫ সংখ্যায়, চন্দ্রশেখর সেনের সমর্থক গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তীর "একটি প্রতিবাদ" নামক রচনার মধ্যে।৫৬

রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে উপেন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে উপযুক্ত মূল্যায়ন করেছেন সুবিখ্যাত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। উপেন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে, ১৮ চৈত্র, ১৩২৫, দৈনিক বসুমতীতে তিনি লিখেছিলেন :

"বাংলার বিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিতের ও বসুমতীর উপেন মুখুজ্জে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত ও তদীয় ভক্তমণ্ডলীর চিরপ্রিয় উপেন...ধর্মপ্রাণ, ধর্মনিষ্ঠ, রামকৃষ্ণ-চরণ-কমলের মধুমত্ত ভৃঙ্গ উপেন—অন্তিমে তাঁহারই নামকীর্তন শুনিতে শুনিতে সেই চিরবাঞ্ছিত পদারবিন্দে শান্তি ও নিবৃত্তি লাভ করিলেন।...

"কৈশোরে উপেন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশ্রয়ে ধন্য হইয়াছিলেন। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সেই দেবতার পূজাই তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। 'তস্য প্রিয়কার্যসাধনম' যদি 'তদুপাসনম্' হয়, তাহা হইলে ভক্ত গৃহী উপেন্দ্রনাথ চিরজীবন তাঁহারই উপাসনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বাংলায় অবতীর্ণ হইয়া বাঙালীকে যে মুক্তিমন্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন রূপে তাহা সপ্রকাশ। উপেন্দ্রনাথের ঐহিক কর্মেও সেই দেবতার আশীর্বাদ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ধর্মজীবনের উপযোগী কর্মজীবন গঠন করিবার জন্য স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ গৌড়ভূমির উর্বর ক্ষেত্রে যে লোক-শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ললাটের স্বেদে সেই বীজে জলসেক করিয়াছেন। ইহাই ত 'তদুপাসনম্।'

"উপেন্দ্রনাথের কর্মসূচনা ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র। সাংসারিক প্রয়োজনে তাহার সৃষ্টি; ঐহিক ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার পুষ্টি; আপাতদৃষ্টিতে তাহা সংসারীর খেলাঘর বটে। কিন্তু এই ঐহিক কর্মের সিকতাবিস্তারের অন্তস্তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত যে প্রবাহিণী বহিয়া গিয়াছে, তাহা সেই রামকৃষ্ণ-ভক্তির মন্দাকিনী; বাংলা দেশে তাহা জ্ঞানের, ভাবের অমৃত বিতরণ করিয়াছে।

"উপেন্দ্রনাথ সংকল্প করিয়া, লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া, নবভাবের নূতন উচ্ছ্বাস বাংলার গ্রামে গ্রামে বিতরণ করিবার জন্য বটতলায় সেই ছোট কেতাবের দোকানখানির পত্তন করিয়া-ছিলেন, তাহার পর সেই ক্ষুদ্র সূচনা বসুমতীর বর্তমান সাফল্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়া-ছিল, প্রতিষ্ঠাতার গুরুমন্ত্রপ্রচারে সহায় হইয়াছিল...

"বসুমতীর একজন প্রিণ্টার ৺রাধিকাপ্রসাদ একদিন বলিয়াছিলেন, 'এটা বসুমতীর অফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদাব্রত।' ইহা সত্য। উপেন্দ্রনাথ এই সদাব্রতের ভাণ্ডারী ছিলেন। এই সদাব্রত হইতে ভাঁড়ারী উপেন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ পুঁথি প্রচার করিয়া বাঙালীকে মনের খোরাক জোগাইয়াছেন।...

"বসুমতীর প্রবর্তক হইতে নিম্নপর্যায়ের সেবক পর্যন্ত সকলেই রামকৃষ্ণভক্ত। এ সমবায় আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ বাছিয়া বাছিয়া এ ভক্তমণ্ডলীর গঠন করেন নাই। তিনি গুরুর কৃপায় যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই রামকৃষ্ণ-পরিবারে পরিণত হইয়া-ছিল।"

---

৫৬ রচনা দুটি আমায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রতাপ মুখোপাধ্যায়।

একটি ছবি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য লাটু-মহারাজের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের গভীর প্রীতির সম্পর্ক। রাখতুরাম নামক নিরক্ষর বিহারী একটি ভৃত্য শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শে সন্ন্যাসী হন—নাম হয় স্বামী অদ্ভুতানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টি রূপে গণ্য। সেই তিনি অর্থাৎ লাটু-মহারাজ, তাঁর গুরু-ভাই 'লোরেন'কে প্রাণের অধিক ভালবেসেও রামকৃষ্ণ সংঘের কর্মবন্ধনে ধরা দিতে রাজি হননি, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন, কখনো মঠে হাজির হতেন, আবার বেরিয়ে পড়তেন। ১৯০০, ডিসেম্বর মাসের ঘটনা—স্বামীজী সহসা পাশ্চাত্ত্যভ্রমণ সাঙ্গ করে বেলুড়ে ফিরেছেন, তাঁকে পেয়ে মঠে আনন্দের প্লাবন। লাটু-মহারাজ তখন গঙ্গাতীরে ধ্যান করছিলেন; খেয়ালী তিনি, খবর পেয়েও এলেন না। স্বামীজী তারপর আহারাদি করে লাটু-মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার জন্য গঙ্গাতীরে গেলেন। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন পরম প্রেমে। রাত্রি জ্যোৎস্নাভরা—সুনীল সুন্দর। তার নীচে ভালবাসার পবিত্র দৃশ্য। অতঃপর—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য গ্রন্থ "লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা"-র অংশ :

"স্বামীজী লাটু-মহারাজকে বলিলেন—হাঁ রে! আমি যে অনেকক্ষণ এসেছি। সবাই দেখা করলে, তুই যে বড় এখানে বসে রইলি? তোর কি অভিমান হয়েছে?

"লাটু-মহারাজ তাহাতে বলিলেন—অভিমান আবার কিসের? এখানে হামার মন বসে থাকতে চাইলে, তাই গেলুম না।

"স্বামীজী বলিলেন—হাঁ রে! শুনলুম তুই মঠে থাকতিস নি, এদিকে-ওদিকে বিগড়ে-বিগড়ে থাকতিস—তোর চলত কিসে?

"তাহার উত্তরে লাটু-মহারাজ বলিলেন—কেনো! ওপেন ঠাকুর [উপেন্দ্রনাথ] সাহায্য করত। যেদিন কুছু জুটত না, সেদিন তার দোকানের সামনে দাঁড়ালেই সে বুঝতে পারত—সিকিটা, দুয়ানিটা দিয়ে দিত।

"এই কথা শুনিয়া স্বামীজী ঊর্ধ্বমুখ হইয়া বলিলেন—ঠাকুর! উপেনের কল্যাণ করুন।"

ত্রিংশ অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা

॥ ১ ॥ ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব

স্বামী বিবেকানন্দের মনীষার আর একটি প্রায় অনালোচিত দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। স্বামীজীর শিল্পচিন্তার বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের মনোযোগ যথেষ্ট পড়েছে বলে মনে হয় না। অথচ সামান্য পরিশ্রমেই দেখা যায়—বাংলাদেশে পরবর্তী কলাশিল্প-আন্দোলন স্বামীজীর চিন্তাসূত্র ধরেই অগ্রসর হয়েছে (এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে নিবেদিতা লোকমাতা গ্রন্থের এক খণ্ডে), এবং যেখানে তা তাঁর চিন্তাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, সেইখানে সে দুর্বল এবং পথভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কলাশিল্প সম্বন্ধে মন্তব্যের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তিনি বিরাট পণ্ডিত ছিলেন, বহু বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, তার মধ্যে শিল্পও ছিল, সুতরাং কিছু পুঁথিপড়া মন্তব্য করেছেন—এইটুকু? না, তা ঠিক নয়। অবশ্যই তিনি শিল্প-ইতিহাস ও শিল্পশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু সেইসঙ্গে শিল্পের পাগল প্রেমিকও ছিলেন। আর তিনি ভারতবর্ষ ও সারা পৃথিবীর শিল্পনিদর্শন এমনভাবে খুঁটিয়ে দেখেছেন যে, তাঁর সমকালে কোনো ভারতবাসী ঐভাবে তা দেখার সুযোগ পেয়েছেন, কিংবা সুযোগ নিয়েছেন, কি-না সন্দেহ। এ-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে আছে। তারই পটভূমিকায় স্বামীজীর শিল্পচিন্তাকে উপস্থিত করলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝা যাবে।

তার আগে বলে নেওয়া যেতে পারে, ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ইতিহাসে বিবেকানন্দের বিশেষ উল্লেখ না থাকার কারণ আছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো বড় শিল্পীকে হাত ধরে কাজ শেখাননি। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রিয়নাথ সিংহ বিরাট কোনো শিল্পী নন। জুবিলী আর্ট একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে স্বামীজীর একদিনের শিল্পালোচনার বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু একদিনের আলোচনায় রণদাপ্রসাদ কতখানি পরিবর্তিত হয়েছিলেন বলতে পারব না। "রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ, সুপণ্ডিত, ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী"—একথা আমরা জেনেছি; স্বামীজীর কথা শুনে তিনি "হৃদয়ে মহা উৎসাহ" পেয়েছিলেন, সে কথাও ঠিক। স্বামীজীর প্রেরণাতেই তিনি স্বামীজীর "কালী দি মাদার" কবিতার ভাবকে চিত্ররূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন; এবং, স্বামীজীর শিল্পচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার পরে বলে-ছিলেন : "আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত; শিল্প-বিষয়ে আপনি আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন; শিল্প সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ-জীবনে আর কখনো শুনিনি; আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে-সকল ভাব পেলাম তা যেন কার্যে পরিণত করতে পারি।" [৯-১৯২] রণদাপ্রসাদের এ-সকল কথার অবশ্যই দাম ছিল, কারণ, শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি নগণ্য ব্যক্তি নন; হ্যাভেল-সাহেব আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতি বর্জনের সিদ্ধান্ত করলে যে-সব ছাত্র বিদ্রোহ ক'রে বেরিয়ে এসে-ছিলেন, রণদাপ্রসাদ তাঁদের নেতা ছিলেন; তিনি ১৮৯৭ সালে বৌবাজারে আর্ট একাডেমীর প্রতিষ্ঠা করেন ও দুই দশক সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়টি চালিয়েছিলেন।১

---

১ বিদ্রোহী রণদাপ্রসাদের ভূমিকা সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন :
"The seceders under the leadership of Ranada Prasad Gupta, a student of

রণদাপ্রসাদের নিজস্ব শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পাঁচ বছর পরে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনা হয়েছিল। রণদাপ্রসাদ সুস্পষ্টভাবে পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যের বর্জন চাইতেন না, কিন্তু পুরো বিদেশী পদ্ধতিতে দেশীয় প্রাণ-মন-আত্মার শিল্পগত অভিব্যক্তি সম্ভব, নিশ্চয় একথাও বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে, স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার পরে রণদাপ্রসাদ নূতন পথ বা মিশ্র পথ ধরেছিলেন, ততক্ষণ ঐ ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব প্রমাণিত হবে না। রণদাপ্রসাদের শিল্পরীতিতে যদি স্বামীজীর প্রভাব প্রমাণিত হয়ও, যেহেতু তিনি শিল্প-আন্দোলনে শেষ-পর্যন্ত বিরাট কোনো ভূমিকা নিতে পারেন নি, তাই স্বামীজীর প্রভাবের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হবে না। তাছাড়া আরও বলতে হবে, স্বামীজী স্বয়ং শিল্পী নন; সেজন্য তাঁর আঁকা ছবি দেখে কারও পক্ষে প্রেরণা পাওয়াও সম্ভব নয়, যেমন পাওয়া সম্ভব ছিল, ধরা যাক, তাঁর গদ্যরচনা থেকে, যেখানে ব্যক্তিগতভাবে তিনি উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা। শিল্পের ক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রভাব বিস্তৃত হতে পারে অন্যের মাধ্যমে—শিল্পতত্ত্বে যাঁদের তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের দ্বারা, কিংবা তাঁর স্বল্প পরিমাণ শিল্প-বিষয়ক রচনা থেকে, যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও তেজে জ্বলন্ত।

সব জড়িয়ে আমাদের বলতে হবে, স্বামীজীর প্রভাব এক্ষেত্রে অবশ্যই পরোক্ষ, কিন্তু তা, অধিকন্তু বলছি, মোটেই সামান্য নয়। ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিবেদিতা প্রচণ্ড এক প্রেরণা—সেই নিবেদিতার ভারত-শিল্পবোধ স্বামীজীই দান করেছেন, এবং ভারতশিল্পের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পী নন্দলাল বসু প্রথমে নিবেদিতার মধ্য দিয়ে, পরে সাক্ষাৎভাবে, স্বামীজীর জীবনাদর্শ ও রচনা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি স্বামীজীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত।

এই সঙ্গে আরও জানানো যায়, ভারতের শিল্প-আন্দোলনে যাঁর বিশেষ প্রভাব আছে, সেই ওকাকুরার বিখ্যাত "আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট" গ্রন্থের অংশবিশেষে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রভাবই আছে। এবং, পরবর্তী কালে ভারতশিল্প ও প্রাচ্যশিল্পের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাতা আনন্দ কুমারস্বামী অবশ্যই স্বামীজীর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথাও আমাদের জানা আছে। হ্যাভেল, উড্‌রফ প্রভৃতিও স্বামীজীর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে সেইকালে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিরা এইসব সংবাদ উপযুক্তভাবে সংগ্রহ ক'রে রাখেন নি, তাই আজ আর সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

তথাপি শিল্প-আন্দোলনে স্বামীজীর ভাব-নেতৃত্ব সম্বন্ধে স্বীকৃতি একেবারে নেই তা

---

the third year class, started in 1897 a new school of art at Bowbazar, Calcutta. 1897 being the Diamond Jubilee Year of the Queen Victoria, the School was named the Jubilee Art Academy. A real lover of art, Ranada Prasad, though a student, conducted the School with a great zeal and courage rarely to be found in young men of little or no experience. A section of the elite of the city came to his support from the very beginning and we find the Municipality of Calcutta granting pecuniary aid to the institution from time to time. The School continued to exist for more than two decades and the personal contribution of Ranada Prasad Gupta cannot be over estimated." [*History of the Govt. College of Art and Craft* by Jegesh Chandra Bagal]

যোগেশচন্দ্রের রচনা থেকে রণদাপ্রসাদের সাহসিক ভূমিকার কথা যেমন জানা যায়, তেমনি বোঝা যায়, শিল্পের জাতীয়করণ করতে গিয়ে হ্যাভেল 'পরানুকরণপ্রিয়' ভারতীয়দের কতখানি চঞ্চল করেছিলেন।

ময়। এই পর্বের প্রত্যক্ষদর্শী, ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ" গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, "আমার ধারণা, স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি সকলের আগে প্রেরণা পাইয়াছিল।" 'উদ্বোধনে'র সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় (১৩৫৬) ডাঃ কালিদাস নাগের একটি প্রবন্ধের নামই হল—"ভারতীয় শিল্প-জাগরণে বিবেকানন্দ নিবেদিতা অধ্যায়।" ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে শিল্পসমালোচক-রূপে স্বামীজীর ভূমিকার গুরুত্বের বিষয়ে যথাসম্ভব আলোচনা করেছেন।

ঐ সকল রচনা মূল্যবান—কিন্তু স্বামীজীর ভূমিকার মূল্যের তুলনায় অপ্রচুর। আরও সন্ধান ক'রে আমরা প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সংবাদ জোগাড় করতে পেরেছি। **সমস্ত মিলিয়ে আমাদের এই অপরিহার্য সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে—বিবেকানন্দ ভারতের শিল্প-জাগরণে ব্রাহ্ম মুহূর্তের ঋষি।** সেই সকল তথ্য-প্রমাণ আমরা ক্রমে উপস্থিত করব, তার আগে বলে নিতে চাই, বিবেকানন্দ যদি প্রত্যক্ষভাবে শিল্পবিষয়ক কোনো বক্তব্য উপস্থিত নাও করতেন তবু এই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভাবপুরুষ তিনিই হতেন, কারণ, একালে সামগ্রিক ভারত-চেতনা তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন, ভারতশিল্পে যা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে আলিঙ্গন ক'রে উত্থিত হয়েছিলেন, আর একালের ভারতশিল্পেও দেখি অজন্তা, মুঘল, রাজপুত, কাংড়া রীতি মিলিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের ভাস্কর্য এবং মুঘল স্থাপত্যের অলঙ্করণ। ভারতশিল্পের মূল ধারার পাশে লোকশিল্প অবলম্বন ক'রে যে স্বতন্ত্র একটি ধারা গড়ে উঠেছে, তাও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহমর্মিতা করে। "স্বামী বিবেকানন্দ"—ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন—"এই মহাদেশের আত্মার প্রতিভূ। তিনি এর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও তার পূর্ণতার প্রতীক। সেই আত্মিক শক্তিই ভক্তের সঙ্গীতে, ঋষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় অভিব্যক্ত। ভারতের এই চিরন্তন সত্তাকে তিনি মূর্তি দিয়েছেন, বাণী দিয়েছেন।"২

॥ ২ ॥ স্বামীজীর ব্যক্তিগত শিল্প-প্রয়াস

শিল্প-বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্যের আলোচনায় আসার আগে এক নজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে—শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগ কী রকম ছিল? এটা জানানো যেতে পারে, শিল্পী না হলেও তিনি রঙ তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন বাল্যকাল থেকেই। মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বলতে পারি, এগারো-বারো বছর বয়সে তিনি পারিবারিক অভিনয়-মঞ্চে রঙিন দৃশ্যপট আঁকতেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে যে খাতবদল হয় তাতে রঙ তুলির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকার কথা নয় কিন্তু তাঁর কলাকুতূহল লুপ্ত হয়নি, তার প্রমাণ আছে নিবেদিতার চিঠিতে। ১৮৯৯, ১৮ অক্টোবরের চিঠিতে নিবেদিতা, আমেরিকায় থাকাকালে স্বামীজীর পোরট্রেট-আঁকায় মহা উৎসাহের কথা জানিয়েছেন। উৎসাহ অবশ্য যতখানি, নৈপুণ্য সম্ভবতঃ ততখানি নয়, ব্যাপারটা সাময়িক খেয়ালেরই, এবং এই খেয়ালের শিকার যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁরা ঐ উৎসাহী শিল্পীর হাতে স্ব-মুখের বিচিত্র রূপান্তর দেখে আনন্দে আঁতকে উঠেছিলেন, অন্ততঃ নিবেদিতা। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর পূর্বোক্ত চিঠি থেকে দেখতে পাই : "আমরা মধ্যাহ্নভোজনের অবসরে মজা করে স্বামীজীকে খোঁচাতে লাগলাম—ধর্মাচার্যের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর উদাসীনতা, এবং পোর্ট্রেট আঁকার ব্যাপারে তাঁর বিপুল গর্ব নিয়ে। তিনি আমার তিন-চারটি পোর্ট্রেট

এ'কে ফেলেছেন। সেগুলি, অন্য সকলে বলছে, এমন-কি আমার চেহারার পক্ষেও মানহানিকর। কিন্তু তাঁর তো স্ফূর্তির সীমা নেই।"

স্বামীজীর শিল্পগুরু কিন্তু নিবেদিতার মতো কঠোর হতে পারেননি। ফরাসি চিত্র-শিল্পী শ্রীমতী মড স্টামের কাছে স্বামীজী ঐসময়ে শিল্পদীক্ষা নেন। তিনি স্বামীজীকে যোগ্য ছাত্ররূপেই দেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য মড স্টামের কাছে চিত্র-স্রষ্টা বিবেকানন্দ অপেক্ষা চিত্র-উপাদান বিবেকানন্দই অধিক বরণীয়।৩ তথাপি তিনি তাঁর এই প্রফেট-শিষ্যকে নৈপুণ্যের, তৎসহ সর্বাধিক আনুগত্যের, সার্টিফিকেট না দিয়ে পারেন নি। তিনি লিখেছেন :

"একদিন স্বামীজী আমাকে বললেন, তিনি এমন-কিছু কাজ চান যা তাঁকে ব্যস্ত রাখবে, এবং ঐকালে যে-চিন্তা তাঁকে উত্ত্যক্ত করছিল, তাকে দূর করবে। আমি কি তাঁকে অংকনশিক্ষা দিতে পারি না? তদনুযায়ী আঁকার সরঞ্জাম এল, এবং একেবারে নির্ধারিত সময়ে তিনি হাজির হলেন। খুবই বিনীত কুণ্ঠিতভাবে তিনি একটি মস্ত আপেল আমার হাতে দিয়ে নত হয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন। এই ফল দেওয়ার তাৎপর্য কী, আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'শিক্ষা যাতে ফলপ্রদ হয় তার প্রণামী।' দারুণ ছাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু একবার কিছু বললেই চলে যেত। অসাধারণ তাঁর স্মরণশক্তি ও মনঃসংযোগের ক্ষমতা—নবশিক্ষার্থীর পক্ষে তাঁর ড্রইং অদ্ভুতভাবে বুদ্ধিযুক্ত ও নিখুঁত। চতুর্থ পাঠ নেবার কালেই তিনি পোর্ট্রেট আঁকার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছেন বলে অনুভব করলেন। সুতরাং...তুরীয়ানন্দ মডেল হয়ে বসলেন—ব্রোঞ্জমূর্তির মতো—তাঁর ছবিও আঁকা হল উৎকৃষ্টভাবে। মিঃ লেগেটের পাঠগৃহই স্টুডিও হয়ে দাঁড়াল।...পরবর্তী বৎসরগুলিতে ঐ ঘরে অনেক বৃহৎ মানুষ আসবেন, আসবেনই, কিন্তু সেই শিশুর মতো মানুষটিকে ওখানে পাওয়া যাবে না—ক্রেয়ন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন, তাতে এমন মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন মনে হয়, বুঝি ঐ তাঁর বৃত্তি। ছবি আঁকা থেকে তিনি কত না আনন্দ পেয়েছেন, শিখতে পেরে তাঁর কী না গভীর উল্লাস—আর সে সকলের জন্য আমাকে ধন্যবাদের পর ধন্যবাদ।"

শিল্পসৃষ্টির আনন্দে মগ্ন থাকার মতো যথেষ্ট অবসর স্বামীজী তাঁর জীবনে খুঁজে পাননি, যদিও রামকৃষ্ণ সংঘের প্রয়োজনে এক্ষেত্রে কিছু সক্রিয় তাঁকে হতে হয়েছিলই। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মবাদিন বেরুলে তার শ্রীহীন প্রচ্ছদ সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করেছিলেন। ফলে একই গোষ্ঠী অতঃপর মাদ্রাজ থেকেই প্রবুদ্ধ ভারত বার ক'রে পত্রিকার প্রচ্ছদে চিত্র-শিল্পের পরাকাষ্ঠা ঘটালেন। প্রচ্ছদে দেখা গেল অঙ্কিত আছে, শোপেনহাওয়ারের উক্তির অনুসরণে : এক শ্বেতাঙ্গ-দম্পতি ভারতের অরণ্যভূমে ঘুরতে-ঘুরতে, প্রাণদায়িনী নদীতটে, বৃদ্ধ বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় উপবিষ্ট ঋষিকে দেখতে পেয়েছেন—তাঁর মুখ থেকে উৎসারিত হচ্ছে প্রাচীনতর, স্নিগ্ধতর, প্রাণরসপূর্ণ দর্শনধারা—সাহেব-মেম তাতে একেবারে বিমোহিত। এহেন বিরাট বিষয় নিয়ে আঁকা একটি জটিল ছবি পরিবেশন করতে পেরে স্বামীজীর মাদ্রাজী ভক্তগণ বিশেষ পুলকিত হয়েছিলেন—কম পুলকিত হননি শিক্ষিত ভারতীয়গণ, কারণ ভারতীয় চিত্রশিল্পের তৎকালীন মান অনুযায়ী ছবিটি দর্শনীয় ছিল।

---

৩ মড স্টাম তাঁর বিবেকানন্দ-স্মৃতিকথায় বলেছেন :

"কী কথা! কী বাণী! অগ্নিশিখার মতো রেশমী পোশাকে আবৃত দেহ—অসাধারণ মহিমার আকার—মন-প্রাণ-হৃদয়-কল্পনাকে একেবারে ক্রীতদাস করে রাখে। হলে আগুনের ধারে বসে আছেন—সঘন, কৃষ্ণ, গভীর আর্দ্র নয়ন—প্রাচ্য কবিদের উপমার ভাষায় ভ্রমরবরাজিতুল্য—ধীরে তা সরে যাচ্ছে একজন থেকে অন্যজনের উপর দিয়ে। কিংবা রিজলির উদ্যানে পায়চারি করছেন—প্রত্যেক পদপাতে যেন প্রত্যাখ্যান করছেন পৃথিবীকে—যে পদপাতের বর্ণনা করেছেন কবিরা তাঁদের কাব্যে—না না, ও-জিনিস এ-জীবনে আর কখনো দেখার আশা করি না।" [রেমিনিসেনসেস, ২য় সং]।

তাই পুনার মরাঠা লিখেছিল, "The front page is almost picturesque." এ-ধরনের কথা অন্য পত্রিকাও বলেছে।৪ কিন্তু বিদেশে বসে সেই ছবি দেখে স্বামীজীর লজ্জার সীমা রইল না। ১৪ জুলাই, ১৮৯৬, ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে তিনি এ-সম্বন্ধে লিখে পাঠালেন: "একটা বিষয়ে মন্তব্য করতেই হচ্ছে—প্রচ্ছদটা একেবারে বর্বর, বীভৎস, কদর্য। সম্ভব হয় তো বদলে ফেলুন। ওটাকে সহজ করুন—ওতে প্রতীক-ভাব দিন। মানুষের চেহারা একদম নয়। বটবৃক্ষ জাগরণের চিহ্ন নয়, পাহাড়ও তা নয়, ঋষিও নয়, ইউরোপীয় দম্পতিও নয়। পদ্ম জাগরণের অন্যতম প্রতীক। চারুশিল্পে আমরা দুঃখজনকভাবে পেছিয়ে আছি, বিশেষতঃ চিত্রশিল্পে। ধরুন, বনে বসন্ত জাগছে, এমন ভাবের একটা ছবি আঁকালেন, তাতে দেখা গেল, মুকুল, কিশলয় উদ্‌গত হয়েছে। এটা তো একটা ভাব, এরকম কতশত ভাব আছে—ক্রমে ফুটিয়ে তুলুন। লঙম্যান গ্রীন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত রাজযোগ বইয়ের জন্য আমি যে প্রতীক তৈরী করেছি তা আপনি দেখে নেবেন।" একই প্রসঙ্গে তিনি পরেও মন্তব্য করেছেন।৫

স্বামীজীর কড়া সমালোচনা থেকে তাঁর ভক্তগণ অবিলম্বে কতখানি শিল্প শিখেছিলেন বলা শক্ত, কিন্তু খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। স্বামীজী তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের শিল্পবুদ্ধিতে আস্থা রাখতে না পেরে লিখে পাঠিয়েছিলেন, (আলাসিঙ্গাকে, ১৮৯৬-এর এক চিঠিতে)—ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য লোহার ব্লক-সমেত নক্সা তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে পাঠিয়ে দেবেন।

স্বামীজী ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য ঐ জিনিসগুলি পাঠিয়েছিলেন কি-না জানি না, সম্ভবতঃ সময়ের অভাবে তা করে উঠতে পারেননি, কিন্তু তাঁর চিঠি থেকে এই দরকারী খবরটি পাই—তিনি নিজ গ্রন্থের জন্য একটি 'প্রতীক' স্বয়ং প্রস্তুত করেছিলেন, যা ভারতীয় প্রতীকী শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কার্যকর করার ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে দেখিয়ে দেয়। এই ক্ষমতার অন্যতর উৎকৃষ্ট প্রকাশের সঙ্গে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অনেক মানুষ পরিচিত—রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক তাঁরই নির্মাণ। এই নক্সার ভাব ও তাৎপর্য স্বামীজী একাধিকবার ব্যাখ্যা করেছেন।৬

---

৪ চিদাম্বরম থেকে প্রকাশিত "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকার ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬, সংখ্যায় লেখা হয়:
"The design of the cover is original and represents the picture of the white man and his fair lady straying into the Indian woods, and there, coming across the Hindu sage under the hoary banyan tree, by the side of the cool refreshing stream, teaches the most profound philosophy to his attentive disciples."

নবপর্যায়ে প্রবুদ্ধ ভারত পূর্বের প্রচ্ছদ-চিত্রটি স্বতঃই বাদ দিয়েছিল। সেটি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকা মোটেই পছন্দ করেনি, কারণ পূর্বের প্রচ্ছদগত বক্তব্যই ছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মনোমত ব্যাপার। তাই এই পত্রিকা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, সংখ্যার নবপর্যায়ের প্রবুদ্ধ ভারত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখে:

"The get-up does not appear to be what it should have been, and we hope that the manager will mend this defect in the future issues."

৫ ডাঃ ননজুণ্ডা রাওকে স্বামীজী ২৬ অগস্ট, ১৮৯৬, লেখেন: "প্রবুদ্ধ ভারতের প্রচ্ছদ-চিত্রের বিষয়ে আমার আপত্তি কেবল তার রুচিহীন চটকদারির বিরুদ্ধে নয়—অকারণ একগাদা মূর্তি-সমাবেশের বিরুদ্ধেও। নক্সা হওয়া উচিত সহজ, স্বল্পাঙ্কিত এবং প্রতীক-চিহ্নিত। লণ্ডনে আমি প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য একটি নক্সা তৈরী করে তোমাকে পাঠাবার চেষ্টা করব।"

৬ শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে মিশনের সীলমোহর নিয়ে স্বামীজীর কথাবার্তার বিবরণ দিয়েছেন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর স্বামী-শিষ্য সংবাদে।' ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের কোনো সময়ে ঐ আলোচনা হয়। তার আগে, ২৪ জুলাই ১৯০০, তারিখে স্বামীজী নিউইয়র্ক থেকে মিস

চিত্রশিল্প অপেক্ষা স্থাপত্য বা ভাস্কর্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহ কম ছিল না, বরং মনে হয়, আপেক্ষিকভাবে কিছু বেশিই ছিল। ভারতবর্ষে তখন চিত্রশিল্প অপেক্ষা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নমুনা বেশি প্রাপ্তব্য ছিল। স্বামীজী, আমরা দেখি, স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে একালের ভারতের সর্বোত্তম এক সৃষ্টির আদি কল্পনাকার—যা তাঁর দেহান্তের পরে রূপায়িত হয়। বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নিঃসংশয়ে আধুনিক ভারতবর্ষে গঠনমহিমার দিক দিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠতম?) সৃষ্টি। মন্দিরটির ছন্দ এবং সামঞ্জস্য অনবদ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পরিকল্পনায় স্বামীজী সর্বদা আনন্দলাভ করতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যরীতির মিশ্রণ কিভাবে এই মন্দিরে ঘটবে, তা তিনি বহুভাবে বলেছেন, এবং স্থাপত্য-বিদ্যায় পারদর্শী স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দ্বারা এই মন্দিরের নক্সা তৈরী করিয়েছিলেন। তাঁর বিশাল কল্পনার প্রকাশ ঐ নক্সায় করা যায়নি, কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে যে অর্থ-সঙ্গতির প্রয়োজন তাও তাঁদের ছিলনা; পরবর্তীকালে বিজ্ঞানানন্দের নক্সাকেও নানা কারণে পুরোপুরি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এখানে কেবল এইটুকু স্মরণ করিয়ে দেব, যদি কেউ স্বামীজীর কল্পনাকে বড়-বেশি কল্পনা মনে করেন, তিনি আধুনিক রূপকল্পনাময় পাশ্চাত্য স্থাপত্যের নিদর্শন পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন—স্বামীজীর কল্পনা সত্যই 'অসম্ভব কল্পনা' ছিল না। এখানে অপূর্ব ভাবময় প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ভারতীয় স্থাপত্য-কীর্তিগুলির কথা নাই-বা তুললাম। অধিকন্তু বলা যায়, রামকৃষ্ণ-মন্দির কল্পনা করার সময়ে স্বামীজী কেবল ভারতীয় আদর্শের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না। রণদাপ্রসাদকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের নক্সা দেখাবার পরে বলেছিলেন, "এই ভাবী মঠ-মন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আমার আছে। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্প সম্বন্ধে যতসব আইডিয়া নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার

ম্যাকলাউডকে লেখা এক চিঠিতে ঐ প্রতীকটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। মনে হয়, ঐ সময়েই স্বামীজী প্রতীকটি তৈরী করে প্রথম মুদ্রিত আকারে ব্যবহার করেন; এবং তার ব্লক নির্মিত হয়েছিল নিউইয়র্কেই। [মিস ম্যাকলাউডকে লেখা পত্রের প্রতিলিপি চতুর্থ খণ্ডে ছাপা হয়েছে।]

যাইহোক শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর রচনায় প্রতীক প্রসঙ্গ এই : "স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সীল-মোহরের জন্য বিকশিত কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পযুক্ত যে-ক্ষুদ্র ছবিটি করাইয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন : চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি—কর্মের; কমলগুলি ভক্তির; এবং উদীয়মান সূর্যটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনীশক্তির পরিচায়ক; আর চিত্রমধ্যস্থ হংস-প্রতিকৃতিটির অর্থ—পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ। [৯-১৯০]।

স্বামীজী তখন বলেননি কিন্তু আমরা সহজেই বুঝতে পারি—ঐ প্রতীকটি বিবেকানন্দ-কৃত রামকৃষ্ণ-প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের সমস্ফূর্তির কথা স্বামীজী বারবার বলেছেন। ["অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং, প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং, কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং।" যিনি "নিরঞ্জন," তথাপি "নররূপধর"—"নির্গুণ," তথাপি "গুণময়।" যিনি "জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।" স্বামীজী ঐ প্রতীকের কেন্দ্রে একেবারে 'হংস'কে বসিয়েছেন—এবং তা ধ্বনিসাম্যে, বস্তু ও ভাবসত্যে 'পরমহংস' ছাড়া কিছু নয়। অর্থাৎ এক কথায় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক হল স্বামীজীর রামকৃষ্ণ-দর্শনের চিত্র-সূত্র।

যাইহোক, আমরা দেখি, রণদাপ্রসাদ স্বামীজীর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হয়ে বলেছিলেন—"আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত।" রণদাপ্রসাদের এই স্বীকারোক্তি থেকে বুঝতে পারা যায়, ভারতীয় শিল্পকলার প্রতীকী ভাষা সম্বন্ধে ঐকালে ভারতীয় শিল্পী ও শিল্পশিক্ষকেরা কতদূর অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং ধরে নিতে হবে, হ্যাভেলের বিরুদ্ধে রণদাপ্রসাদের পূর্বকথিত বিদ্রোহের যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।

চেষ্টা করব।” কিভাবে “বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর” স্থাপিত প্রকাণ্ড নাটমন্দিরটি নির্মিত হবে, যার “দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে,” কিভাবে “মন্দিরের মধ্যে একটি রাজহংসের উপরে ঠাকুরের মূর্তি” রাখা হবে (এখানে পুনশ্চ রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রতীক-চিত্র স্মরণ করা যাক), এবং প্রবেশদ্বারের কাছে সিংহ ও মেষের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে মহাশক্তি ও মহানম্রতার মিলন দেখানো হবে—তা স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। মন্দিরের বহিরবয়ব সম্বন্ধেই তিনি তাঁর দুঃসাহসী কল্পনায় সবচেয়ে আনন্দবোধ করেছিলেন: “শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক ওঁকার বলে মনে।” [আবার স্মরণ করা যাক—মিশন-প্রতীকের যোগ-সর্প বেষ্টনকে। কুণ্ডলিনী সর্প দিয়েই ওঁকার-চিত্র আঁকা হয়। যে-মন্দিরের পরমাত্মা হলেন পরমহংস, সেই মন্দিরের বাইরের আকার ওঁকার।]৭

॥ ৩ ॥ ভারত ও পৃথিবীর শিল্প-নমুনার সঙ্গে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ পরিচয়

(ক)

ভারত-শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিজ্ঞতা : যে-গবেষণাটি স্থগিত আছে তা সেরে নেওয়া যাক। ভারত ও পৃথিবীর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে স্বামীজী সাক্ষাৎভাবে কতখানি পরিচিত ছিলেন? অগ্রিম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া যায়—তিনি সম্ভবতঃ তাঁর কালের ‘বিখ্যাত’ ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ভারত ও পৃথিবীর শিল্পসৃষ্টি স্বচক্ষে দেখেছেন।৮ কোন্ সংবাদের উপর নির্ভর করে এই দাবি আমরা করছি?

---

৭ শিল্প-বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পনায় স্বামীজী ভরপুর থাকতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, “ঠাকুর এসেছিলেন, দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।” শিল্প একটি প্রধান বিদ্যা। স্বামীজী চাইতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠকে কেন্দ্র করে ভারতশিল্পের জাগরণ ঘটুক। ১৩ মার্চ, ১৯২৯, বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেই উপলক্ষে লিখিত একটি চিঠিতে স্বামী অখণ্ডানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির সম্বন্ধে স্বামীজীর ভাবকল্পনার কিছু বিবরণ দিয়েছিলেন। মঠ তখনও বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। [বর্তমান মঠের পূর্ব দিকে]। এখনকার মঠের জমি অল্প কিছুদিন আগে কেনা হয়েছে, স্বামীজীর আদেশে বিজ্ঞানানন্দ-স্বামী ঐ জমিতে প্রস্তাবিত মন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করেন অনেকদিনের চেষ্টায়। ঐ নক্সা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়। এমনি এক সময়ে স্বামীজী সদ্য-কেনা মঠের জমিতে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে পায়চারি করছিলেন। অখণ্ডানন্দ লিখেছেন : “আমি তাঁহার কাছে ভাবী মঠের নক্সার কথা পাড়িলাম। তাহা শুনিয়া স্বামীজী ..কোথায় তাঁহার সেই অর্ধচন্দ্রাকার মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং মন্দিরের মধ্যে ঘরের দেওয়ালের গায়ে বড়-বড় কুলুঙ্গিতে যেরূপে যত দেবদেবী ও পৃথিবীর যাবতীয় মহাপুরুষ ও মহাজনগণের বিগ্রহ স্থাপিত হইবে, এবং যেরূপে মন্দিরের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীর উপরে হীরা-চুনি-পান্না-খচিত সদাসমুজ্জ্বল একটি ওঁকার থাকিবে—তাহাই তিনি আমাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়াছিলেন।”

হীরা-চুনি-পান্নার কথা শুনে গরীবের বন্ধু অখণ্ডানন্দ আপত্তি করেছিলেন। গরীবের আরও বড় বন্ধু বিবেকানন্দ ব্যাপারটির অন্য রূপ উন্মোচন করেন। স্বামীজীর কল্পনায় এই মন্দির ভারত-বর্ষে শিল্পের নবজন্মের গর্ভগৃহ।—“উত্তরে তিনি [স্বামীজী] সেইসময়ে যে-পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথায় এই নবযুগের ক্রমাভিব্যক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি কথাই আমার বেশ মনে আছে। প্রথমেই বলিলেন, ‘এই রেনেসাঁসের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অতীতকালে যেমন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে আর্টের বিকাশ হয়েছিল, তেমনি এই নবযুগেরও উপযোগী শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই বিকাশ অবশ্যম্ভাবী’।” [উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬]

৮ সমকালে যথেষ্ট পরিমাণে ইউরোপীয় শিল্প-নিদর্শন দেখেছেন—শশিকুমার হেশ। তাঁর আগে রোহিণীকুমার নাগও ইউরোপে গিয়েছিলেন শিল্পশিক্ষা করতে—সেখানে অকালে মারা যান।

প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেব, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসাবে বিবেকানন্দ বছরের পর বছর পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ দেখেছেন। স্বামীজীর দুই বিশাল চোখ ছিল (এবং তৃতীয় নয়ন)—তাদের যখন ধ্যানে ঢেকে না রাখতেন, তখন তারা ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সুন্দর শিল্পকীর্তিগুলিকেও দেখত—দেখতই—কারণ তাঁর মতে, আর্ট ধর্মের অঙ্গ। ভারত-শিল্পকে স্বামীজী কেবল অতীত নিদর্শনের মধ্যে দেখেননি—লোকজীবনের মধ্যে অব্যাহত ধারায় প্রবহমান তার রূপকেও তিনি সানন্দে দেখেছেন।

ভারতশিল্পের কোন্-কোন্ নিদর্শনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন, এখন তা ঠিকভাবে বলা শক্ত। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অভাবের কথা বলতে পারি—তিনি উড়িষ্যা যান নি, যে-ভূখণ্ড হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নমুনায় পূর্ণ। উড়িষ্যার প্রত্নকীর্তি নিয়ে আলোচনা পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বেরিয়েছিল ভারত সরকারের আনুকূল্যে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "দি অ্যান্টিকুইটিস্ অব উড়িষ্যা"—একশো বছর পরেও সে গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টে মুদ্রিত ছবিগুলি দেখে চমকে যেতে হয়। ধরে নিতে পারি, স্বামীজী মিউজিয়ামে গিয়ে উড়িষ্যার শিল্পনিদর্শন দেখেছিলেন, এবং আমরা জানি, তিনি রাজেন্দ্রলাল প্রমুখের এইজাতীয় রচনার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও সাগ্রহ পরিচয় ছিল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু ও মুঘল স্থাপত্য-কীর্তির প্রভূত প্রশস্তি তিনি করেছেন, যথা, আলোয়ারের বা দিল্লী ও আগ্রার স্থাপত্যের। না, মুঘল স্থাপত্যের প্রশংসা করেছেন বললে যথেষ্ট বলা হয় না—কার্যতঃ তিনি তাদের বন্দনা করেছেন।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, রাজপুত চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এবং সমসাময়িক রবিবর্মার ছবি তিনি মনোযোগের সঙ্গে দেখেছেন।

চারুকলার বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে স্বামীজীর সুগভীর আকর্ষণের একটি চমৎকার কাহিনী আছে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে তিনি মহীশূরে উপস্থিত হলে, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পরে মহারাজা বিশেষ আকৃষ্ট হন, এবং জনৈক রাজকর্মচারীকে দিয়ে স্বামীজীকে বাজারে পাঠিয়ে দেন—যাতে করে তিনি তাঁর পছন্দসই জিনিস কিনে নিতে পারেন। মহীশূরের বহু দোকানে স্বামীজী উৎসাহের সঙ্গে ঘুরেছিলেন, কিন্তু কেনার বেলায় চার পয়সা দামের একটি চুরুটের বেশি কিছু কেনেন নি। সঙ্গের রাজকর্মচারী এতে খুবই ক্ষুণ্ণ হন—তাঁর কমিশন মারা গিয়েছিল বলে। আসল ব্যাপার ছিল—স্বামীজী কিছু কেনার জন্য দোকানে-দোকানে ঘোরেন নি—তিনি মহীশূরের উৎকৃষ্ট লোকশিল্পের নমুনাগুলি দেখতে চাইছিলেন।৯

স্বামীজীর পার্শ্ববর্তী মানুষেরা অধিকাংশক্ষেত্রেই কলাশিল্প সম্বন্ধে উৎসুক ছিলেন না, অন্ততঃ তাঁর ভারতীয় সঙ্গী বা ভক্তগণের সম্বন্ধে একথা সত্য। সুতরাং তাঁরা যেসব স্মৃতিকথা বা বিবরণ রেখে গেছেন তাদের মধ্যে স্বামীজীব জীবনের এই দিকটি অবজ্ঞাত। তাহলেও, সকল ঔদাসীন্যের আবরণ ঠেলে, কিছু-কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ বেরিয়ে এসেছে। ১৮৯৭-৯৮ সালে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর সংকলনগ্রন্থ "ভারতে বিবেকানন্দ"-এর মধ্যে পাই—ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে স্বামীজী প্রথমে সিংহলে উপস্থিত হয়ে, তার অভ্যন্তরে নানা স্থান পরিদর্শন করেন। সেইকালে সেইসব জায়গায় প্রত্নকীর্তির নানা নিদর্শন দেখেন, বিশেষতঃ অনুরাধাপুরে। "অনুরাধাপুর এক অতি প্রাচীন শহর। এখানে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। সেইসকল দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্বে

১৮৪২ সালে ইউরোপ ভ্রমণকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সেখানকার অনেক শিল্পনিদর্শন দেখেছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ আছে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'দ্বারকানাথ ঠাকুর' গ্রন্থে। [অনুবাদ ও সম্পাদনা, ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত]

ইহা পৃথিবীর এক বৃহত্তম শহর ছিল। এখানে বৌদ্ধগণের অনেক প্রাচীন কীর্তি এখনো বর্তমান আছে। যথা—বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের একটি শাখা হইতে উৎপন্ন এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ; সেই সুপ্রাচীন যুগের স্থাপত্যবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এক প্রাচীন সরোবর; 'দাগোবা' নামে বিখ্যাত প্রাচীন স্তূপসমূহ।" ['ভারতে বিবেকানন্দ', ১৩শ সং, ২৭]।

ভারতের মূল ভূখণ্ডে এসে স্বামীজী তাঁর পূর্বে-দেখা মন্দিরাদি পুনশ্চ নতুন আগ্রহে দেখেছিলেন।—"[রামেশ্বর] মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর স্বামীজী ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে মন্দিরের মণিমাণিক্য হীরা জহরত প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। স্বামীজী সমস্ত মন্দিরটি বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাকে মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্যসকল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সহস্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত চাঁদনিটিও স্বামীজী দেখিলেন।" [ঐ, ৬৫]। "মাদুরায় অবস্থিতিকালে স্বামীজী একদিন তথাকার সুবিখ্যাত মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ঐ মন্দির ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট মন্দিরসমূহের অন্যতম।" [ঐ, ১২০]।

১৮৯৭-এর শেষভাগে স্বামীজী উত্তরভারত সফর করেন। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে তিনি লাহোর মিউজিয়ম দেখেন, যার সুদূরপ্রসারী ফল হয় (কী, তা পরে লক্ষ্য করব)—অথচ তার বিষয়ে সামান্য উল্লেখের বেশি পাই না।—"স্বামীজী সঙ্গিগণসহ লাহোরের মিউজিয়ম বেড়াইয়া গেলেন।"

স্বামীজীর পঞ্জাব ও কাশ্মীর অবস্থানকালের অন্যতম সঙ্গী, আর্যসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক স্বামী অচ্যুতানন্দ, সংক্ষিপ্ত ডায়েরী রেখেছিলেন, যার কিয়দংশ মাত্র "ভারতে বিবেকানন্দ"-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখি, ১০ সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামীজীকে সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করে, "ছবি ও পুস্তক" দেখিয়েছিলেন। তারপর : "২২ সেপ্টেম্বর—নৌকাযোগে অনন্তনাগ গমন। বিজবেরার মন্দির দেখা। অনন্তনাগ দর্শন। ২৩ সেপ্টেম্বর—অনন্তনাগে ভোজনাদি সমাপন করিয়া পদব্রজে মার্তণ্ডে গমন। ২৪ সেপ্টেম্বর—মার্তণ্ড ধর্মশালা...হইতে অক্ষয়বল (আচ্ছাবল) যাত্রা। রাস্তায় লোকেরা একটি মন্দিরকে পাণ্ডবের মন্দির বলিয়া দেখাইল। মন্দির দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, ২০০০ বৎসরেরও পূর্বে ইহা নির্মিত। এমন উত্তম মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মন্দির পর্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া স্বামীজী ঘোড়ায় চড়িলেন। এখানে নানাবিধ চর্চা হইল।" [ঐ, ৪৪৯]।

এই পর্যায়ে স্বামীজী দিল্লীতে শিল্পকীর্তিগুলি পুনশ্চ দেখেছিলেন। সে সম্বন্ধে উৎসাহিতভাবে "ভারতে বিবেকানন্দ" গ্রন্থে তিনটি পূর্ণ বাক্য ব্যয় করা হয়েছে, যা অতৃপ্তির নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছু দেয় না।—"দিল্লীর কেল্লা, কুতুবমিনার, প্রাচীন দিল্লী প্রভৃতি সমুদয় দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করা হইল। স্বামীজী সঙ্গিগণকে এইসকল ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া কত প্রাচীন শিল্পের কথা, কত ইতিহাসের কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেইসকল কথার কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিলে এক-একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারিত।" [ঐ, ৬০০]

তা যে সত্যই পারত, ঠিক পরবৎসর স্বামীজীর সঙ্গে উত্তরভারত ভ্রমণের কালে লিখিত নিবেদিতার ডায়েরির বিবরণ থেকে কিছুটা বুঝতে পারি। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে দীক্ষা নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, তা তাঁর স্বীকারোক্তি থেকেই দেখা যায়। এখানে স্মর্তব্য, ভারতীয় প্রত্নকীর্তির আলোচনার সময়ের নিবেদিতা আঙ্গিক-বিচারের সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টিতে ওতপ্রোত ভাবসত্যকে যেভাবে উন্মোচন করেছেন, তা বহুলাংশে এখনো অনতিক্রান্ত।

১৮৯৮ সালে নিবেদিতাদিকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী যখন উত্তরভারত ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ করে নিবেদিতাকে ভারতবর্ষ দেখানো, তাঁকে প্রস্তুত করে তোলা, যাতে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ্য ব্যাখ্যাতা হতে পারেন। নিবেদিতা তা হবেন—স্বামীজী ধরেই নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নিবেদিতার মহীয়সী কীর্তির দিকে তাকিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন-প্রকাশিত বিবেকানন্দ-জীবনীতে বলা হয়েছে

—এই পর্বে নিবেদিতার গঠন ভিন্ন স্বামীজী যদি আর কিছু নাও করতেন তবু বলা যেত না, অকৃতার্থ হয়েছে তাঁর কাজ।

নিবেদিতা তাঁর "দি মাস্টার" গ্রন্থে, স্বামীজী কিভাবে তাঁদের ভারতীয় শিল্পকীর্তি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন বুঝিয়েছিলেন, তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন। পাটলীপুত্র বা পাটনা থেকে স্বামীজীর শিক্ষাদান শুরু হয়। "জগতের দর্শনীয় স্থানগুলির অন্যতম" কাশীর গঙ্গার ঘাটের "সাগ্রহ প্রশংসা" স্বামীজী যথেষ্ট করেছিলেন; এবং "লখনৌ-এ যেসব শিল্পদ্রব্য ও বিলাস-উপকরণ প্রস্তুত হয়, তাদের নাম ও গুণবর্ণনা" তাঁর মুখে নিবেদিতারা অনেকক্ষণ ধরে শুনেছিলেন। স্বামীজীর "অসাধারণ ঐতিহাসিক মূল্যবোধ" নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। নিবেদিতা এইসঙ্গে জানিয়েছেন, স্বামীজী যে, কেবল "যে-সকল মহানগরীর সৌন্দর্য সর্বস্বীকৃত ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ"—তাদের বিষয়েই বলেছিলেন তা নয়, আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত খেত, খামার এবং গ্রামবহুল সমতল প্রদেশের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যগ্র ছিলেন। এরই ফলে আমরা দেখতে পাব, নিবেদিতা পরবর্তীকালে কেবল অজন্তা, ইলোরা, বিহার, বা কাশীর প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্যের ব্যাখ্যাতা হননি—তিনি ভারতীয় জীবনের অব্যাহত ছন্দের মহান কাব্যস্রষ্টা হতে পেরেছিলেন—তাঁর "দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ" এবং "স্টাডিজ্ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম" প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে।

এই পর্যায়ে উত্তরভারত পেরিয়ে কাশ্মীরের পথে গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে স্বামীজী যখন সদলবলে চলেছিলেন, তখনও পথিমধ্যে মন্দির দেখে নিতে ভোলেন নি। নিবেদিতা "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে" গ্রন্থে লিখেছেন: "পরদিন (২০ জুন, ১৮৯৮) গিরিসংকটের সবচেয়ে সুন্দর অংশটির মধ্য দিয়া চলিয়া এবং গির্জার আকারবিশিষ্ট পাহাড়গুলি ও একটি প্রাচীন সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া, আবার বারামুল্লায় পৌঁছিলাম।"

শ্রীনগরে পৌঁছবার পরে, স্বামীজীর মন্দিরবিষয়ক একটি বিশেষ ধারণার সমর্থক-প্রমাণ নিবেদিতারা পান। সে-বিষয়ে তিনি লিখেছেন: "আর একদিন (২৯ জুন) আমরা নিজেরা বিনা আড়ম্বরে দুই-তিন সহস্র ফুট উচ্চ একটি ক্ষুদ্র পর্বতের শিখরদেশে খুব ভারী-ভারী উপকরণে গঠিত তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান নামক একটি ক্ষুদ্র মন্দির দর্শন করিলাম। তথায় শান্তি ও সৌন্দর্য বিরাজ করিতেছিল, এবং বিখ্যাত ভাসমান উদ্যানগুলি নিম্নে চারিপাশে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তির জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের মধ্যে হিন্দুদের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় আছে—এই কথার সমর্থনে স্বামীজীর যুক্তিতর্কের পক্ষে বিরাট দৃষ্টান্তের মতো ছিল এই মন্দিরটি। যেমন, লণ্ডনে তিনি একবার বলিয়াছিলেন—ঋষিরা নিসর্গসৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য পর্বতশীর্ষে বাস করেন। আর এখন তিনি একের পর এক দৃষ্টান্তযোগে দেখাইয়া দিলেন—ভারতবাসীরা চিরকাল বিশেষ সৌন্দর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পূজামন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাকে পবিত্রতামণ্ডিত করিয়া তোলে। সমগ্র উপত্যকাটি যে-স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ একটি গিরি-শীর্ষের সুমহিম অবস্থানে নির্মিত ক্ষুদ্র তখ্‌ৎ-মন্দিরটি স্বামীজীর বক্তব্যের পক্ষে অন্যতম সাক্ষ্যরূপে বর্তমান ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।" [পূর্বোক্ত গ্রন্থ]।

স্বামীজী কিভাবে নিবেদিতাকে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পে দীক্ষা দিয়েছিলেন, একই গ্রন্থ থেকে তার কিছু বিবরণ উদ্ধার করা যাক:

"১৯ জুলাই। প্রথম অপরাহ্ণে আমরা ঝিলাম নদীতীরে এক জঙ্গলের মধ্যে বহু আকাঙ্ক্ষিত পাণ্ড্রেনথান (পাণ্ড্রেস্থান বা পাণ্ডবস্থান?) মন্দির খুঁজিয়া পাইলাম। ক্ষুদ্র মন্দিরটি গাঢ় ফেনায় পূর্ণ একটি সরোবরের মধ্য হইতে উঠিয়াছে—ধূসর ভারী চুনা-পাথরে নির্মিত, ভিতরে কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, চারিদিকে চারিটি

দ্বার। বাহির হইতে দেখিতে, ইহা চৌতারায় বসানো চারিপার্শ্বে ফোকরবিশিষ্ট একটি মাথাকাটা পিরামিডের মতো সরু হইয়া উঠিয়াছে—মাথায় ঝোপ জন্মিয়াছে। ইহার স্থাপত্য কৌশলে দেখা গেল—অদ্ভুতভাবে ত্রিপত্র ও ত্রিভুজাকার খিলান পরস্পর মেলানো হইয়াছিল, সেইসঙ্গে যুক্ত ছিল সরল রেখাকার সরদাল (লিণ্টেল)। অসাধারণ দৃঢ়ভাবে মন্দিরটি নির্মিত, এবং বিভিন্ন নির্মাণপদ্ধতির জন্য যে-পার্থক্যটুকুর চিহ্ন অবশ্যম্ভাবী, তা ভারী-ভারী কারুকার্যের দ্বারা ঢাকা পড়িয়াছিল।

"বনমধ্যে সরোবরের ধারে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র মন্দিরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আভ্যন্তরীণ কারুকার্যগুলি পরীক্ষা করা যাইবে না (যাইবার অসুবিধার জন্য), তাহাতে আমরা খুবই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। গাইড-বইয়ে মন্দিরটি 'যথার্থই ক্লাসিক্যাল' অর্থাৎ তাহা আকারে ও কারিগরিতে আদ্যন্ত গ্রীক ও রোমান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।"

নিবেদিতাদের বিষাদ আনন্দে রূপান্তরিত হল যখন হাজি অর্থাৎ মাঝিরা একটা নৌকা জোগাড় করে অনেক কষ্টে তাঁদের মন্দিরের মধ্যে তুলে দিল। তারপর :

"স্বামীজী ছাড়া আমাদের সকলের পক্ষে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে এই সবে হাতেখড়ি সুতরাং নিজের দেখা শেষ করিয়া তিনি আমাদের শিখাইয়া দিলেন, কিভাবে ভিতরটি দেখিতে হইবে।

"ভিতর-ছাতের মধ্যস্থলে সমচতুষ্কোণের মধ্যে এক বৃহৎ সূর্যমূর্তিবিশিষ্ট চক্র বসানো রহিয়াছে। তাহার চারিটি কোণ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিকে। ইহাতে ছাতটির চারি কোণে চারিটি সমান ত্রিভুজ রহিয়া গিয়াছে। সেগুলি সর্পবেষ্টনাবদ্ধ নারী-পুরুষের রূপ খোদাই করা অতি সুন্দর কারুকার্যে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালগুলিতে যে-সকল খালি জায়গা পড়িয়া আছে, সেইসকল স্থানে একসারি স্তূপ ছিল মনে হয়।

"বাহিরেও খোদাইয়ের কাজ সমভাবে বিন্যস্ত। ত্রিপত্র খিলানগুলির একটিতে—সম্ভবতঃ পূর্ব দরজার উপরে যে-খিলানটি, তাহাতেই—বুদ্ধ দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার একটি হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত—এই সুন্দর মূর্তিটি রহিয়াছে। এই থাম দুইটির শিরোদেশ ব্যাপিয়া বর্তমান একটি বৃক্ষতলে এক রমণী আসীনা—এইরূপ খোদিত আছে। মূর্তিটি অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে। ইহা বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মূর্তি-ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। অপর তিনটি দরজার খিলানে কোনো নক্সা ছিল না। কিন্তু পুকুরপাড়ে যে-চাপড়াখানি পড়িয়াছিল, সেটি ইহাদেরই কোনো স্থান হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল মনে হইল। ইহাতে বাজেভাবে তৈরী একটি বাজার মূর্তি আছে। স্থানীয় লোকেরা উহাকে সূর্যের মূর্তি বলে। ক্ষুদ্র মন্দিরটির গাঁথুনি অনবদ্য। সম্ভবতঃ সেই কারণেই উহা এতদিন টিকিবা আছে। পাথরের চাঙড়গুলি এমনভাবে কাটা হইয়াছে যে, সেগুলি দেওয়ালের ইঁটের মতো না হইয়া স্থপতির পরিকল্পনার অংশস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল পাথরের কোণ ঘুরিয়া গিয়া দুইটি বা কোথাও তিনটি দেওয়ালের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারটি হইতে মন্দিরটি অতি প্রাচীন, এমন-কি মার্তণ্ড মন্দির হইতেও প্রাচীনতর মনে হইল। কারিগরের কাজের ধরন গৃহস্থাপত্য-নির্মাণপদ্ধতি অপেক্ষা সূত্রধরের কাজের রীতির সহিত অধিক ঐক্যযুক্ত ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণের জলরাশি সম্ভবতঃ কোনো কুণ্ড ছাপাইয়া সৃষ্টি হইয়াছে—সেই কুণ্ডের স্মারক হিসাবেই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে—স্বামীজী তাহাই ধারণা করিয়াছিলেন।

"স্বামীজীর চোখে স্থানটি ইতিহাসের আনন্দপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। ইহা বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ স্মারকভূমি। কাশ্মীরের ইতিহাসের যে-চারিটি ধর্মযুগ রহিয়াছে, তাহার একটির পরিচয় মন্দিরটিতে রহিয়াছে।—(১) কাশ্মীরে বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ, যাহা হইতে কুণ্ডগুলির নাগ-শব্দান্ত নামকরণ হইয়াছে, যথা ভেরিনাগ ইত্যাদি; (২)

বৌদ্ধধর্মের যুগ; (৩) হিন্দুধর্মের যুগ, যাহা সূর্য-উপাসনার আকারে বর্তমান ছিল; (৪) মুসলমানধর্মের যুগ। স্বামীজী বলিলেন, ভাস্কর্যই বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট শিল্প; সূর্যচিহ্নিত চক্র বা পদ্ম ঐ যুগের অতি প্রচলিত অলংকরণ। সর্পযুক্ত মূর্তিগুলি প্রাক্-বৌদ্ধযুগের স্মারক। সূর্য-উপাসনার [হিন্দু-] যুগে ভাস্কর্যের বিশেষ অবনতি হইয়াছিল, সেই কারণে পূর্বোক্ত সূর্যমূর্তির ঐ স্থূল আকার।"

পাণ্ড্রেস্থানের মন্দিরটিকে নিবেদিতা তখন যত প্রাচীন মনে করেছিলেন (১৫০ খ্রীস্টাব্দের), সেটি তত প্রাচীন কিনা সে-বিষয়ে পরে তিনি সন্দেহবোধ করেন। সে যাই হোক, ঐকালে তাঁদের চোখের সামনে সুদূর অতীতের দৃশ্যাবলী জেগে উঠেছিল—তাঁরা ভাববার চেষ্টা করেছিলেন, আঠারশো বছর আগে পৃথিবী যখন বিরাট-বিরাট ঘটনার মুখে দাঁড়িয়ে, তখন এই মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন্ দেবতাকে মানুষ পূজা করত! মন্দিরের ভিতরে কোনো দেবতার মূর্তি না পেলেও বাহির-দ্বারে শিক্ষাদানরত বুদ্ধের যে-মূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর পাদমূলেই প্রণত হবার সৌভাগ্যে তাঁরা আনন্দিত হয়ে ওঠেন, এবং নিবেদিতা লিখেছেন : "আমরা একটি চিত্র মানসনেত্রে ফুটাইতে পারিয়াছিলাম—বিশাল একটি দারুময় নগরী—তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই মন্দির—বহুদিন পরে কোনো অগ্নি-কাণ্ডে নগর ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং প্রায় পাঁচ মাইল দূরে সরিয়া যায়।" এই স্বপ্নকল্পনার অন্তে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তরুরাজির মধ্য দিয়ে তাঁরা যখন নদীতীরে ফিরে এসেছিলেন—তখন যে-অপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলেন তা স্বামীজীকে পুনশ্চ সেই ভাবকল্পনার জগতে নিয়ে গিয়েছিল, যা সকল চারুকলার অন্তর্জগৎ।—

"তখন সূর্যাস্তের সময়—অপরূপ। পশ্চিমের পর্বতগুলি রক্তরঙে ঝলসিত। আরও উত্তরে মেঘে ও তুষারে সেগুলি নীলাভ। আকাশ সবুজে হলুদে মাখা, তাহার উপর লালের ছোপ—নীল এবং 'ওপ্যাল' পটভূমিকার উপরে ড্যাফোডিল ফুলের তুল্য হরিদ্রাবর্ণ এবং অগ্নিশিখার উজ্জ্বল বর্ণ। আমরা দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। তারপরে আচার্য-দেবের দৃষ্টি গিয়া পড়িল 'সুলেমানের সিংহাসনে'র উপর—ইতিমধ্যেই যা আমাদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী আবেগে বলিয়া উঠিলেন : মন্দিরের স্থান নির্বাচনে হিন্দুর প্রতিভার কী অপূর্ব পরিচয়! সব সময়েই সে মহান নিসর্গসৌন্দর্যের স্থানটি বাছিয়া লয়। দেখো, তখ্‌ৎ হইতে সমস্ত কাশ্মীরটি দেখা যায়। নীল জলরাশির ভিতর হইতে লোহিতাভ হরিপর্বত উঠিয়াছে—যেন মুকুট পরিয়া একটি সিংহ অর্ধশায়িত। আর মার্তণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে রহিয়াছে উপত্যকাটি।"

স্বামীজীর সঙ্গে মার্তণ্ড মন্দির দর্শনের বিবরণও নিবেদিতা দিয়েছেন। "মন্দিরটির অদ্ভুত প্রাচীন সৌধ-স্থাপত্য"; তাতে মন্দির অপেক্ষা মঠের লক্ষণই অধিক; "বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া অগ্রসর ঐ মন্দির-মঠে বিভিন্নযুগের নির্মাণপদ্ধতির চিহ্ন আছে।" এইসকল বিষয় উল্লেখের পরে, নিবেদিতা বিস্তৃতভাবে মন্দিরটির গঠনভঙ্গি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তারপর মন্তব্য করেছেন : "প্রত্যেক সৌধ এত সর্বাঙ্গসুন্দর, এবং তাহাদের মধ্যে দুই নির্মাণ-যুগের উদ্দেশ্য এত স্পষ্ট যে, মন্দিরটির অঙ্গসংস্থান দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ হইল।" নিবেদিতা অবিলম্বে মন্দিরটির বহিরবয়বের স্কেচ করে ফেলেছিলেন। মন্দিরটির স্থাপত্যরীতির বর্ণনায় স্বামীজীর উৎসাহ সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন : "ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই স্বামীজী অবেক্ষণ ও উদ্দেশ্য নিরূপণে যার-পর-নাই ব্যস্ত হইলেন, এবং দেখাইয়া দিলেন যে, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের মার্গ হইতে উহার মধ্যাংশের ভিতর দিয়া পশ্চিমদিকে যে-কার্নিস চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপরিভাগে পূর্বোক্ত খিলান দুটির উচ্চ ত্রিপত্র, আবার একটি frieze ও বর্তমান। সেইসঙ্গে দেবশিশু-মূর্তিবিশিষ্ট প্যানেলগুলিও স্বামীজী আমাদের দেখাইয়া দিলেন।"

[খ]

বহির্ভারতের শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিজ্ঞতা। রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে স্বামীজী বলেছিলেন. "পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখে এলুম।" শিল্প-নমুনার এই সাক্ষাৎদর্শন এবং শিল্পবিষয়ক পড়াশোনার ফলে [রণদাপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনার পরেই দেখি, স্বামীজী "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার শিল্প সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ" করেছিলেন] স্বামীজীর ইচ্ছা হয়েছিল, "ইউরোপীয় ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির কথা" বলবেন। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য" গ্রন্থের একেবারে শেষে লিখিত তাঁর সেই অভিপ্রায়, পরম দুঃখের বিষয়, তিনি সিদ্ধ করে যেতে পারেন নি।

ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অপরাপর দেশের শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কিছু সংবাদ এবার দেওয়া যাক।

(১) অপরিচিত সন্ন্যাসীরূপে আমেরিকা যাওয়ার পথে চীনের ক্যান্টন নগরে তিনি একটি মন্দির দেখে আসেন, যার কাঠের মূর্তিগুলি "সুন্দররূপে খোদিত।" একই পথে জাপানের যেটুকু দেখেছিলেন, তাতেই প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানবিক রূপচর্চার দিক দিয়ে জাপানকে "সৌন্দর্যভূমি" বলে বোধ হয়েছিল। সেইসঙ্গে জাপানের উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য দেখে তিনি এমনই মোহিত হন যে, খেতড়ির রাজাকে জানিয়েছিলেন—টাকাকড়ি যদি ব্যাঙ্কের মারফত আগেই আমেরিকা চলে না যেত, তাহলে তিনি হয়ত জাপানের শিল্পদ্রব্য কিনে দেশে ফিরে আসতেন—আমেরিকা যাওয়া আর হত না।১০ সত্যই তা করতেন কিনা জানি না—কিন্তু ঐ কথাগুলির মধ্য থেকে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর প্রবল প্যাশনের চেহারা দেখা যায়। জাপানের শিল্পানুরাগের কথা তিনি অবিরাম বলতেন।

(২) আমেরিকায় থাকাকালে স্বামীজীর মতো শিল্পতৃষ্ণ মানুষ অবশ্যই মিউজিয়ম ঘুরে শিল্পসংগ্রহ দেখেছেন। আমেরিকার নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি বিরাট কিছু না হতে পারে কিন্তু বিরাট তার অর্থসম্পদ, ও সেই অনুপাতে সংগ্রহবাসনা। ইংলণ্ডের বিষয়েও সেকথা কিছুটা সত্য।

লুই বার্কের "ডিস্‌কভারিজ" গ্রন্থে শিল্প বিষয়ে স্বামীজীর আগ্রহ ও বক্তব্যের সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাই। ডেট্রইটে বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী চার্লস এল ফ্রিয়ার সামাজিক আকর্ষণের লক্ষ্যবস্তু স্বামী বিবেকানন্দের ["The social lion of the day, Swami Vivekananda, the Hindoo monk"] সম্মানে বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। "চার্লস ফ্রিয়ারের আগ্রহের কেন্দ্রবস্তু ছিল প্রাচ্যশিল্প। একথা বলা হয়, তিনি আমেরিকায় চীনা ও জাপানী শিল্পের বৃহত্তম সংগ্রহের অধিকারী ছিলেন।" লুই বার্ক জানিয়েছেন, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে চার্লস ফ্রিয়ার পুরোদমে তাঁর সংগ্রহকাজ শুরু করেন, কিন্তু তার আগেই, ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই, তাঁর ভবনে প্রাচ্যশিল্পের মিউজিয়াম অনেকটা গড়ে উঠেছিল। ধরে নেওয়া যায়, স্বামীজী ঐসব শিল্পনিদর্শন সাগ্রহে পরীক্ষা করেছিলেন।

(৩) আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে স্বামীজী প্রথমবারের জন্য যাত্রা করেন ১৮৯৫, অগস্ট মাসের মাঝামাঝি। ঐ মাসের শেষের দিকে প্যারিসে পৌঁছান। সেখানে স্বল্পকালীন অবস্থানে (২৪ অগস্ট—৯ সেপ্টেম্বর) স্বামীজী অন্যান্য কাজ থাকা সত্ত্বেও শিল্পদর্শনের আনন্দ ত্যাগ করেন নি। তাঁর ইংরাজি জীবনীতে পাই :

He made the best of his brief stay by visiting its museums, its churches, its Cathedrals, its art galleries, and was pleased to see how highly the artistic instincts of the French nation were developed."১১

এইবারই বোধহয় তিনি প্যারিসের লুভার মিউজিয়ামে গিয়েছিলেন (১৮৯৬ সালে তাঁর প্যারিসে অবস্থান একদিন-দুদিনের বেশি নয়), কারণ ১৮৯৭, ৩০ মে তিনি তাঁর "স্নেহের ভগিনী" মেরী হেলকে সকৌতুকে "ভেনাস ডি মিলো"-র মূর্তি দেখার কথা জানিয়েছিলেন।১২

অল্পদিন পরে, স্বামীজী তাঁর প্রথম ইংলণ্ড অবস্থানকালে "ইতিহাস এবং শিল্পের দিক থেকে আকর্ষক প্রতিটি স্থান পরিদর্শন করেছিলেন।"১৩

(৪) ১৮৯৬, জুলাই মাসের শেষের দিকে স্বামীজী লণ্ডন থেকে কণ্টিনেণ্ট ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়ে জেনিভা যান। সেখানে যেসব স্থাপত্য ও শিল্পকীর্তি দেখেন, তাদের মধ্যে "ক্যাসল অব শিল°" ছিল। সেইসংগে ওখানকার "জাতীয় প্রদর্শনীতে" লোকশিল্পের বিবিধ নিদর্শন, বিশেষতঃ বিখ্যাত কাঠখোদাইয়ের কাজ দেখেছিলেন। রাইন নদীর তীরে কোলন শহরের বিরাট ক্যাথিড্রল দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। জার্মানীর কিয়েল শহরে বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক অধ্যাপক ডয়সনের সংগে যখন কাটাচ্ছিলেন তখন উক্ত অধ্যাপকের অনুরোধে সেখানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী দেখতে যান, যাতে কলাশিল্পের যথেষ্ট নমুনা সংগৃহীত ছিল।

স্বামীজীর এই কণ্টিনেণ্ট-ভ্রমণের কোনো ভালো স্মৃতিকথা নেই। তাঁর ইংরেজি জীবনী থেকে কিছু প্রাসংগিক বিবরণ উপরে দিয়েছি। এই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী লণ্ডন থেকে কণ্টিনেণ্ট হয়ে ভারতে ফিরেছিলেন—সে ভ্রমণের কিয়দংশের, অর্থাৎ রোম ও পার্শ্বস্থ অঞ্চল দর্শনের কিছু বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সহযাত্রিণী মাদার সেভিয়ার।১৪ রোমে পৌঁছবার আগে স্বামীজী যেসব শিল্পনিদর্শন দেখেছিলেন, সে-বিষয়ে তাঁর ইংরাজি জীবনীতে পাই : মিলানে তিনি লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির সুবিখ্যাত ছবি "লাস্ট সাপার" দেখে মুগ্ধ হন। মিলান শহরেই ইতালির সংগে স্বামীজীর প্রথম পরিচয়। মিলান থেকে তিনি সদলবলে পিসা গিয়ে সুবিখ্যাত হেলানো টাওয়ার দেখেন, সেইসংগে "ক্যাম্পো ম্যাণ্টো" নামক ক্যাথিড্রলটিও। মিলান ও পিসায় শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের অপূর্ব ব্যবহারের সবিশেষ প্রশংসা তিনি করেন। অতঃপর শিল্পরসিকদের আনন্দভুবন সুন্দরী ফ্লোরেন্স নগরীতে গিয়ে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের সংগে আর্ট-গ্যালারিগুলিও দেখেছিলেন। ফ্লোরেন্স ইউরোপের এক প্রধান শিল্পকেন্দ্র, এখানকার সংগ্রহশালায় সঞ্চিত হয়ে আছে পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পবস্তু।

"চিরনগরী রোম"—সেখানে সব আগ্রহেরই খাদ্য রয়েছে। মিসেস সেভিয়ার লিখেছেন: "বস্তুতপক্ষে গোটা রোম শহরটিই একটি মিউজিয়ম। যদি কেউ ছবি চায়, তার সেরা নমুনা

---

১২ চিকাগোর হেল-পরিবারে স্বামীজী বাড়ির মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন—বাড়ির চারটি মেয়ে তাঁর স্নেহের ভগিনী। চারজনের একজন—ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলির মুখশ্রী ভেনাস ডি মিলো-র মতো, একথা ওখানকার সকলেই বলত, এমন-কি তা স্থানীয় সংবাদপত্রে উল্লেখের বিষয় পর্যন্ত হয়েছিল। লুভারে স্বচক্ষে উক্ত ভেনাসের মূর্তি দেখার পরে স্বামীজী সহাস্যে লিখেছিলেন : "হাঁ, কথায়-কথায় জানাই, তোমরা যাকে ভেনাস বলো, তাকে আমি দেখেছি; তোমাদের কথাই ঠিক, ইসাবেলের মুখ প্রায় তারই মতো। অবশ্য ইসাবেলের হাতদুটির অবস্থা অধিক উত্তম, কারণ মূর্তিটি নুলো, অন্ততঃ আমার অমার্জিত রুচিতে তাই ঠেকল। সে যাই হোক, ইসাবেল সুন্দরী কারণ সে ভেনাসের মতো দেখতে, আর ভেনাস সুন্দরী কারণ সে ইসাবেলের মতো দেখতে! সব জড়িয়ে ইসাবেল মূর্তিটির চেয়ে অনেক সুন্দরী—মূর্তির ভাঙা হাতের ছাড় ধরেও।" [ডিসকভারিজ, ১৭৫-৭৬]।

এখানে পাবে; যদি স্থাপত্যের ভক্ত হয়, তাহলে ল্যাটিন মনোধর্মের রহস্য তার কাছে উন্মোচন করে দেবে গির্জার সৌন্দর্যমহিমা; যাঁরা প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহী, অতীতের শুষ্ক পঞ্জরের মধ্যে সন্ধান করে যাঁরা ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ের কোনো-কোনো পৃষ্ঠাকে আবিষ্কার করতে উৎসুক, তাঁদের প্রীতিপূর্ণ আগ্রহের কাছে রোম বিপুল উপাদানস্তূপ।" "এই রোমে স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ভ্রমণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিমিশ্র আনন্দের কারণ হয়েছিল।" মিসেস সেভিয়ার আরও লিখেছেন : "অতীব উদাসীন অলস ভ্রমণকারীও এই চিরনগরীতে প্রথম প্রবেশকালে নূতন ভাবোন্মাদনা বোধ করবেন—আর সেখানে আমাদের সঙ্গী ছিলেন অন্য কেউ নন স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁর ছিল সদাজাগ্রত দৃষ্টিশক্তি, এবং ইতিহাসের রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করার সহজাত সুগভীর ক্ষমতা।"

রোমের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভ্রমণের ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়ে প্রথমে তাঁরা গিয়েছিলেন সিজারের প্রাসাদে, তারপর ফোরাম-এ। যাবার পথে তাঁরা "পিয়াজা ডি সপাগ্না"-এর ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন—অতি সুন্দর সিঁড়িগুলি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—যা গিয়ে পেঁছিছিল "সেন্ট ট্রিনিটি ডি মন্টি" নামক গির্জায়। ঐ গির্জাটি "ক্রুশ থেকে অবতরণ" নামক চিত্রের জন্য বিখ্যাত। সিজারদের অপূর্ব প্রাসাদগুলি তাঁরা দেখেছিলেন, ক্রমান্বয়ে সেগুলি বিরাজিত। নির্মাণ আরম্ভ করেন অগস্টাস সিজার—পরবর্তী সিজারগণ ক্রমেই তাদের সংখ্যা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে গেছেন। নীরো তৈরী করেছিলেন দুটি প্রাসাদ, যার প্রথমটিতে যখন আগুন লেগেছিল তখন তিনি তাঁর ইতিহাসবিখ্যাত বীণাবাদন-কর্ম করেছিলেন। দ্বিতীয় প্রাসাদটি তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি—যেটুকু পেরেছিলেন তাতেই তাকে মণিরত্ন, স্বর্ণরৌপ্য, এবং মূর্তি ও চিত্রে এমনই অলংকৃত করেছিলেন যে, তা "স্বর্ণ-ভবন" নামে পরিচিত। প্রাচীন প্রাসাদের পাশে খননকাজ চালিয়ে প্রাচীন ভিত্তিচিত্রের নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিশাল স্থাপত্যসমূহে গৌরবান্বিত ফোরাম-এ গিয়ে স্বামীজী রোমের সুন্দরতম স্তম্ভ ট্রাজান পিলার খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। ১১৭ ফুট উঁচু, বাস-রিলিফে অলংকৃত, ট্রাজানদের কীর্তিস্মারক এই স্তম্ভটিতে দু'হাজারের বেশি মনুষ্যমূর্তি আছে। জেরুজালেম অধিকারের স্মারক, ৮১ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত টিটাস বিজয়তোরণ এখনও সুন্দরভাবে বর্তমান। "স্বামীজী গোড়ার দিকে নীরব ছিলেন। কিন্তু ক্রমেই বোঝা যাচ্ছিল, তাঁর আপাত শান্ত ভাবের ভিতরে তিনি কতখানি উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রাচীন রোমের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, যে-রোম তার বৃহৎ আকাঙ্ক্ষাকে মহাবিস্ময়কর আকার ও সৌন্দর্যের স্থাপত্য কর্মে রূপায়িত করেছে। স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার পথে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন; ইতিহাস এবং স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন অজস্র খুঁটি-নাটি তথ্য, যা ঐ প্রাচীন কীর্তিগুলিকে যেন আবৃত করে দিল ইন্দ্রজালে।"১৫

অতি পুরাতন এবং অত্যন্ত পূজার্হ, রোমের গৃহদেবী ভেস্টা'র মন্দির তাঁরা দেখেছিলেন, যার মধ্যে ছিল পবিত্র বর্ম ও পবিত্র অগ্নি। তাঁরা দেখেছিলেন সুমহান স্থাপত্য-সৌন্দর্যপূর্ণ রোমের সাধারণ স্নানাগারগুলিকে, যেখানে কেবল স্নানব্যবস্থাই নয়, অধিকন্তু ছিল ক্রীড়াঙ্গন, ব্যায়ামাগার, সভাগৃহ, গ্রন্থাগার। টাইটান ও ক্যারাকালার স্নানাগারগুলি তো মহাবিস্ময়ের সৃষ্টি।

দর্শনীয় রোমেও পরম দর্শনীয় স্থান কলোসিয়াম—রোমের বিশাল শক্তি ঐ সুন্দরতম অ্যাম্ফিথিয়েটারটির সৃষ্টি করেছিল। বারো হাজার ইহুদি ও খ্রীস্টানের ক্রীতদাস-বাধ্য পরিশ্রমে এক বছরের মধ্যে নির্মিত, লক্ষাধিক দর্শকের উপবেশনের উপযোগী সেই রঙ্গ-

স্থলটির অবশ্য অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। স্বামীজী সদলে চলে গিয়েছিলেন কনস্টান-টাইনের অতিখ্যাত বিজয়তোরণ দেখতে, তারপর ফিরে আসেন নির্মল সুন্দর চন্দ্রালোকে কলোসিয়াম দর্শনে। "সেই বিশাল রঙ্গস্থলের উপরে বিস্তারিত ঘননীল আকাশ, সেখানে জ্বলছিল নক্ষত্র ও তারকাপুঞ্জ, চতুর্দিকে মৃত্যুর মতোই স্তব্ধ নীরবতা—অপূর্ব, অপূর্ব সেই মহিমা।"

কনস্টানটাইন-নির্মিত "সেন্ট জন ল্যাটেরন" চার্চই রোমের প্রধান গির্জা। প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্যসৌন্দর্যের জন্য এটি অবশ্য-দর্শনীয়। যে-সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে গিয়ে যীশুখ্রীস্ট তাঁর শেষ বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা এখানে রয়েছে, এর প্রতিটি অংশ খ্রীস্টধর্মের ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে পূর্ণ—এর মধ্য দিয়েও স্বামীজী অগ্রসর হয়েছিলেন।

রোমের গির্জাগুলি কেবল ধর্মের নয়, শিল্পেরও আগার। যাঁরা ভাস্কর্যে আগ্রহী তাঁরা কেউ ভিঙ্কোলায় সেন্ট পিয়েত্রো চার্চ দেখতে ভোলেন না, কারণ সেখানে রয়েছে মোজেস-এর মূর্তি। বলাবাহুল্য এঁরাও সে ভুল করেননি। মোজেসমূর্তি মাইকেল এঞ্জেলোর মহত্তম সৃষ্টির একটি—মানবিক শক্তিমহিমার অপূর্ব আদর্শায়িত রূপ। চিত্তাকর্ষক ছিল সংগীতের ঋষি-গুরু সেন্ট সিসিলিয়ার মর্মরমূর্তি দর্শন—তাঁর নামাঙ্কিত গির্জার অভ্যন্তরে। এবং সেইসঙ্গে রোমের সবচেয়ে জমকালো সমাধিস্থল—হাড্রিয়ান সমাধিভূমি—যা পূর্বে ভূষিত ছিল বহু অলঙ্কারে।

ক্রুশের আকারে নির্মিত সর্ববৃহৎ গির্জা সেন্ট পিটারস্ চার্চ তাঁরা দেখেছিলেন। গির্জার দৈর্ঘ্য ৬১৩ ফুট, সর্বোচ্চ শিখর ৪৪৮ ফুট, ভিতরে ঐশ্বর্যের বিপুল সমারোহ। বড়দিনের সময়ে বিপুল জাঁকজমকের যে-রূপ তাঁরা দেখেছিলেন, তাতে তাঁদের চক্ষু অভিভূত হলেও আত্মা ছিল অতৃপ্ত। স্বামীজী চাপাস্বরে শুধিয়েছিলেন : "এই যে গির্জায় অনুষ্ঠানের এত বাহুল্য, ঐশ্বর্যের ব্যাপক আড়ম্বর—এখানকার কর্মকর্তারা কি সেই আনত খ্রীস্টের অনুগামী যিনি তাঁর মাথাটি রাখবার ঠাঁইটুকু খুঁজে পাননি?" স্বামীজী আরও বলেন : "বাইরের অনুষ্ঠানের সেইটুকুই মূল্য যেখানে সে অন্তরের পবিত্রতা বিকাশে সহায়তা করে। যদি জীবনের বিকাশে সে সমর্থ না হয়, তাহলে মায়া না রেখে তাকে চূর্ণ করে ফেলো।"

খ্রীস্টের প্রতিনিধি পোপের বাসস্থান—এগার হাজার কক্ষসমন্বিত ভ্যাটিকান প্রাসাদে—অন্যান্য বিতৃষ্ণাকর ঐশ্বর্যের সঙ্গে কিন্তু আকর্ষক ঐশ্বর্যও ছিল—শিল্পের সম্ভার। সিস্টিন চ্যাপেলের সিলিংয়ে মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রাবলী। বেদীপার্শ্বের দেওয়ালে রয়েছে একই শিল্পীর আঁকা "শেষ বিচারের" চিত্র। সেইসঙ্গে রয়েছে—বটিচেল্লী, পেরুগিনো, সিনরেল্লীর চিত্রাবলী। আরও আছে—র‍্যাফেল ও অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীর খিলানের উপর আঁকা ছবি।

ভাস্কর্য-গ্যালারিতে মেলে বিশাল সর্পের সঙ্গে যুদ্ধরত লাওকুনের অসাধারণ ভাস্কর্য—শিল্পরসিকেরা যার তুলনা খুঁজে পান না। সেইসঙ্গে আরও বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সিঁড়ির পাশে দুই মিশরীয় সিংহের মূর্তি; ক্যাস্টর ও পল্যাক্সের দুই বিশাল প্রতিমূর্তি; মার্কাস অরেলিয়াসের অশ্বারূঢ় ব্রোঞ্জমূর্তি। শেষোক্ত মূর্তিটিতে মাইকেল এঞ্জেলো-সুলভ জীবনা-বেগ এতই বেশি যে, দেখলে মনে হয়, এখনই বুঝি ধাবিত হবে। মার্কাস অরেলিয়াসের মধ্যে দুর্ধর্ষ জীবনগতির সঙ্গে যুক্ত ছিল সুগভীর ধ্যানলীনতা—মূর্তিতে তাও প্রকাশিত। ক্যাপিটল প্রাসাদের মিউজিয়ামে মুমূর্ষু গ্লাডিয়েটর-এর মূর্তি বিখ্যাত। এবং চিত্ররসিকেরা বারবেরিনি প্রাসাদের মধ্যে গুইদো রেনী-কৃত বিয়েট্রিস সেনসির পোরট্রেট স্বতঃই দেখে থাকেন, সেইসঙ্গে রেসপিগলিওসি প্রাসাদের দেওয়ালের সুন্দর চিত্রগুলিও। এই সকলের মধ্যে যথার্থ চিত্রসৃষ্টিরূপে এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ভ্যাটিকানে র‍্যাফেল-অঙ্কিত যীশুখ্রীস্টের অলৌকিক রূপান্তরের ছবি, এবং ডিমিনিচিনো-অঙ্কিত সেন্ট জেরোমের চিত্র।

গির্জা ও মিউজিয়াম থেকে মুক্ত হয়ে স্বামীজী সদলবলে চলে গিয়েছিলেন রোমের বিখ্যাত সমাধিভূমে—সেখানেও দেখেছিলেন মৃত্যুকে গরিমাময় ঐশ্বর্যে ভূষিত করার রোমক প্রয়াস। তাঁরা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন অস্তগামী সূর্যকে পিছনে রেখে—সামনে পিছনে উপরে নীচে বিস্তৃত বিশাল শান্তি। তাঁরা অনুভব করেছিলেন—সৃষ্টির আনন্দের অনুরূপ বা ততোধিক গভীর বস্তু হল—সৃষ্টি-সমাপনের মৌন প্রত্যাহার।

রোম থেকে নেপলস। সেখান থেকে পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন। "স্বামীজী বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন খননের ফলে সদ্য-আবিষ্কৃত একটি গৃহের সম্পর্কে—যার মধ্যে এখনো বর্তমান আছে পূর্বেকার ফ্রেস্কো, প্রতিমূর্তি এবং ফোয়ারা।" পম্পেই স্বামীজীর মন লুটে নিয়েছিল।

(৫) ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রা করেন। ১৯০০, অগস্টের গোড়া থেকে প্রায় তিনমাস তিনি ফ্রান্সে ছিলেন—যার অনেকটা সময় প্যারিসে কেটেছিল। স্বামীজী প্যারিসে গিয়েছিলেন "ধর্মেতিহাস সভায়" যোগ দিতে। "এ-বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র; এ-বৎসর মহাপ্রদর্শনী; নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জন-সঙ্গম"—স্বামীজী "পরিব্রাজক" গ্রন্থে লিখেছেন। লেগেট-ভবনে, যেখানে স্বামীজী ছিলেন, সেখানে মিঃ লেগেটের আমন্ত্রণে সমবেত হতেন ফ্রান্সের ও অন্যান্য স্থানের বহু বিদগ্ধজন। "মিঃ লেগেট প্রভৃত অর্থব্যয়ে [স্বামীজী পরিব্রাজক গ্রন্থে লিখেছেন,] তাঁর প্যারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী যশস্বিনী নর-নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন।...কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক-গায়িকা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতির গুণিগণ-সমাবেশ।...সে পর্বত-নির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষী-মনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ।" এহেন মণ্ডলীতেও স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কেন্দ্র-পুরুষ। এই সমাবেশে স্বামীজীকে কিছুকাল দর্শন করে, তারপর অন্যত্র গিয়ে, নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে ঐ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "By this time I suppose Swami has all Paris at his feet."

স্বামীজীর সঙ্গে এইকালে, আমরা জেনে উৎসাহিত, সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল অগুস্ত রদ্যাঁর। "শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর" রূপে কথিত রদ্যাঁর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয়ের সংবাদটি অবশ্যই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আলাপের বিষয়বস্তু আমরা জানতে পারিনি। স্বামীজী কি রদ্যাঁর শিল্পশালায় গিয়েছিলেন? নিবেদিতার চিঠি থেকে জানতে পারি, নিবেদিতা ও মিস ম্যাকলাউড রদ্যাঁর প্রদর্শনীতে পরমানন্দে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর, বিবেকানন্দ-রদ্যাঁর সাক্ষাৎকার-সংবাদ পেয়েছি মিস ম্যাকলাউডকে লেখা অ্যালবার্টার (পরে লেডি স্যাণ্ডউইচ) চিঠি থেকে।

"Swami is in a splendid mood last night and our little dinner was consequently a great success...He enjoyed seeing Paris, was meeting all artists and thinkers, Rodin etc."

একই চিঠিতে জনৈক নামকরা ফরাসি চিত্রশিল্পীর কাছে স্বামীজীর যাওয়ার ইচ্ছার সংবাদ আছে, যদিচ উক্ত শিল্পীর নাম অ্যালবার্টা জানান নি :

"Swami will go to Brittany next Monday, as Thursday he goes to visit a French painter of note in the country."

প্যারিসে থাকাকালে স্বামীজী প্রায় প্রতিদিন সকালে প্যাট্রিক গেডেস (বিখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী) ও মিঃ লেগেটের সঙ্গে প্যারিস-প্রদর্শনীতে যেতেন। এই প্রদর্শনীতে নানা দেশের শিল্পদ্রব্যের সমাবেশ করা হয়েছিল, যা স্বামীজী সযত্নে দেখেছেন।

স্বামীজীকে তাঁর অনুরাগীরা শিল্পের পটভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্যারিসের শিক্ষাকেন্দ্র সরবোনে স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন—ধর্মেতিহাস সভায়। সরবোনের বিরাট অ্যাম্পিথিয়েটারের সভাগৃহে ৭৫ ফুট দীর্ঘ এক বিখ্যাত ম্যুর‍্যাল আছে; শিল্পী ফরাসি, নাম—প্যুভি-দ্য-শ্যভানে; চিত্রের নাম—পবিত্র অরণ্য; বিষয়—সরবোনের অধিষ্ঠাত্রী বসে আছেন বনমধ্যে সিংহাসনের উপর, পরিবৃত হয়ে আছেন সাহিত্য, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যামিতি, বাগ্মিতা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রীদের দ্বারা। এহেন পটভূমিকার উপরে স্থাপিত বিবেকানন্দ—সুমহান দৃশ্য!! বিস্ময়োৎক্ষিপ্ত বাক্যে উন্মোচিত হয়েছিল মিসেস লেগেটের আনন্দোচ্ছ্বাস :

"Swami at the Sorbonne! enfin. What would I give for a photograph of him with the Puvis de Chavannes background!"

এইবারও স্বামীজী লুভারে গিয়েছেন, এবং সেখানে গ্রীক শিল্পের নিদর্শন খুঁটিয়ে দেখেছেন।

প্যারিস থেকে স্বামীজী নরম্যান্ডিতে সমুদ্রমধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর নির্মিত মঠ "মন্ট সেন্ট মাইকেল" দেখতে গিয়েছিলেন। আর্ক-এঞ্জেল মাইকেলের স্মরণে নির্মিত এই মধ্যযুগীয় মঠটিতে "স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন" বর্তমান ছিল। সর্বোচ্চ স্থানটিতে নির্মিত হয়েছিল একটি উচ্চাঙ্গের গথিক রীতির গির্জা—তার চূড়ায় পাখা-মেলে-দেওয়া আর্ক-এঞ্জেলের মূর্তি। গির্জার পার্শ্বস্থ খিলান-পথটির দুইপাশে ছিল একশো কুড়িটি অলঙ্কৃত স্তম্ভ। এই খিলান-পথটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে স্বীকৃত। ঐতিহাসিক পরিবেশে, স্থাপত্যসৌন্দর্যে, এবং স্থানমাহিমায় মুগ্ধ বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "ধ্যানের পক্ষে কী অপূর্ব এই স্থান।"১৬

(৬) কেবল লুভারে বা অন্য মিউজিয়ামে নয়, গ্রীকশিল্পের নিদর্শন সাক্ষাৎ গ্রীসেই দেখবার সুযোগ স্বামীজীর ঘটে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। স্বামীজীর জীবনীতে পাই—প্যারিস থেকে বেরিয়ে তিনি তৎকালীন পাশ্চাত্ত্যের প্রধান অপেরা গায়িকা এমা কালভের অতিথি হিসাবে ভ্রমণ করেছিলেন—ঐ ভ্রমণে অন্যান্য সঙ্গীরা হলেন, মঁসিয়ে জুল বোয়া, পিয়ের হিয়াসান্থ ও তাঁর পত্নী, এবং মিস ম্যাকলাউড। এইবারই স্বামীজী ভিয়েনা যান, সেখানে তিনদিন থেকে দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখেন, দৃষ্টবস্তুর অন্যতম ছিল সানবোর্ন প্রাসাদ, যার প্রতিটি কক্ষ বিভিন্ন শিল্পরীতিতে ও শিল্পদ্রব্যে সজ্জিত। ভারতীয় ও চীনা সজ্জায় ভূষিত কক্ষ দেখে তিনি আনন্দিত হন। সেখানকার ভারতীয় অলঙ্করণ তিনি খুব পছন্দ করেছিলেন। আর মিউজিয়ামে দেখেছিলেন—বিখ্যাত ডাচ শিল্পীদের চিত্রাবলী।

তারপর তাঁরা গিয়েছিলেন কনস্টানটিনোপলে। গ্রীক সম্রাটদের প্রাচীন অন্দরমহলে স্থাপিত মিউজিয়াম দেখেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল—শবদেহ রক্ষার প্রস্তরনির্মিত অপূর্ব আধারগুলি (sarcophage)।

তারপর গ্রীস—শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী এথেন্স। এথেন্সে স্বামীজী চারদিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই শিল্প-পরিব্রজ্যাকে ভাষারূপ দেবার চেষ্টা কেউ পরবর্তীকালে করেন নি, যদিও এই ভ্রমণের অপূর্বত্বের কথা সঙ্গীরা বলেছেন। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে প্রদত্ত বিবরণ মোটামুটি এই :

"কনস্টানটিনোপলে কয়েকদিন কাটিয়ে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা এথেন্সের স্টিমার ধরলেন। পথিমধ্যে তাঁরা 'গোল্ডেন হর্ন' এবং মারমোরা দ্বীপ দেখলেন। শেষোক্ত স্থানে

একটি গ্রীক মঠ দেখে তাঁর বিশেষ ভালো লাগে।...আর একটি দ্বীপে তিনি সমুদ্রতীরে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখেন; তাঁর ধারণায় সেটি নেপচুনকে উৎসর্গীকৃত মন্দির। ঐতিহাসিক এথেন্স এবং তার সন্নিহিত সকল ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ স্বামীজী দেখেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অ্যাক্রোপলিস, বিজয়দেবীর মন্দির, পার্থেনন,...অলিম্পিয়ান জুপিটারের মন্দির, ডায়োনিসিস থিয়েটার,...ইউলিসিস। এই শেষোক্ত স্থানটি প্রাচীন ইউলিসীয় রহস্যের কেন্দ্রস্থল, এবং এটি স্বামীজীকে বিশেষ আগ্রহান্বিত করেছিল। এথেন্স ত্যাগের আগে তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৫৭৬-৪৮৬ কালের বিখ্যাত ভাস্কর অ্যাগিলাডাস-এর ভাস্কর্য দেখতে গিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে প্রাচীন শিল্পাচার্যের তিন মহান শিষ্য—ফিডিয়াস, মাইরন, ও পলিকলিটাসের শিল্পকর্মও দেখেছিলেন।"

আর এক পুরাতন পৃথিবী—মিশরে—তাঁরা গিয়েছিলেন। কায়রো মিউজিয়াম যে তাঁরা সযত্নে দেখেছিলেন, সেকথা না বললেও চলে। দেখেন ফিংক্স ও পিরামিড। এই প্রসঙ্গে মাদাম কালভে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য ও বন্ধু সহকারে তাঁহাকে লইয়া আমরা তুরস্ক, গ্রীস ও মিশরদেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম।...কী সুন্দর এই তীর্থযাত্রা! বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসের মধ্যে যেন স্বামীজীর অজ্ঞাত কিছু নাই।...খ্রীস্টধর্মের ইতিহাস লইয়া তর্কের সময় স্বামীজী একখানি প্রাচীন দলিল অবিকল মুখস্থ বলিলেন, এবং একটি চার্চ-কাউন্সিলের তারিখ জানাইলেন, যাহার কথা ফাদার লয়সনও (অর্থাৎ পিয়ের হিয়াসান্থ, যিনি খ্রীস্টান শাস্ত্রে বিরাট পণ্ডিত ও বাগ্মী) নির্দিষ্টভাবে বলিতে পারিলেন না।

"আমরা গ্রীসে ইউলিসিস দর্শন করিলাম। স্বামীজী ইহার রহস্য ব্যাখ্যা করিলেন। আমাদিগকে বেদী ও মন্দিরগুলি দেখাইলেন; কোন্‌খানে কি হইত বুঝাইয়া দিলেন; পুরোহিতগণের উপাসনা ও পূজার বিশেষ প্রণালী ব্যাখ্যা করিলেন, এবং প্রাচীন মন্ত্র ও গাথা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন।।

"আবার একদিন মিশরদেশে—এক চিরস্মরণীয় রজনীতে তিনি আমাদিগকে সুদূর অতীতে লইয়া গেলেন—ফিংকসের ছায়ায় বসিয়া রহস্যময় ভাষায় কত ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন।"

উপরে যেসব সংবাদ পরিবেশন করেছি, তার থেকে আমাদের প্রতিপাদ্য কিছুটা প্রমাণিত হয়েছে, ভরসা করি একথা বলতে পারি।

॥ ৪ ॥ স্বামীজীর শিল্পবক্তব্য কোন্‌-কোন্‌ সূত্র থেকে সংগৃহীত

স্বামীজী যে-পরিমাণে শিল্পনিদর্শন দেখেছেন, ও ঘরোয়াভাবে সে-সম্বন্ধে বলেছেন, সেই পরিমাণে কিন্তু প্রকাশ্য বক্তৃতায় বা লেখায় শিল্পপ্রসঙ্গ করেন নি। সেই কারণেই এতদিন স্বামীজীর মনোজীবন বা ভাবজীবনের এই দিকটির উপরে উপযুক্তভাবে আলোকসম্পাত করা হয়নি। তবু নানাসূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাঁর শিল্পধারণার একটা মোটামুটি পরিচয় আমরা পেয়েছি। স্বামীজী ধর্মবেত্তা ও ধর্মপ্রচারক; ধর্ম ও দর্শন-সংক্রান্ত বিষয়েই প্রধানতঃ কথা বলতেন বা বক্তৃতা করতেন; তাহলেও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় যখন দিতে গেছেন, তখন ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞানের কথা না বলে পারেন নি। যেমন ধরা যাক, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের মেমফিস্‌ শহরে "ভারতের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে ভারতের স্থাপত্যশিল্পের গৌরবের কথা তিনি বলেছিলেন। 'অ্যাপীল অ্যাভালেঞ্চ' পত্রিকার ২১ জানুয়ারির (১৮৯৪) বিবরণের মধ্যে ছিল :

"His [Swamiji's] description of the ancient mausoleums and temples were beautiful beyond comparison, and goes to show that the ancients possessed scientific knowledge far superior to the most expert artisans of the present day." [*Discoveries*, 161]

খুবই দুঃখের বিষয়, প্রাচীন মন্দিরাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর ঐ "অতুলনীয় সুন্দর বর্ণনা"র কোনো অংশই উক্ত সংবাদপত্রের বিবরণে নেই।

ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে রমাবাঈ-গোষ্ঠীর ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কুৎসার বিরুদ্ধে স্বামীজী যখন আমেরিকায় একা প্রাণপণ লড়াই করছেন, তখন অনেক সময়েই তাঁকে পৃথিবীর সভ্যতায় ভারতের দানের বিষয়ে বলতে হয়েছে। ঐ ধরনের একটি বক্তৃতার রিপোর্ট বেরিয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫-এর "ব্রুকলিন স্ট্যান্ডার্ড ইউনিয়ন" পত্রিকায়। বক্তৃতার মধ্যে বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, সংগীতে, এমন কি খেলাতে পর্যন্ত ভারতের দানের কথা তিনি বলেছিলেন—শিল্পদ্রব্যের কথাও অবশ্যই বলেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেবল উল্লেখের অধিক কিছুই সংবাদপত্রের বিবরণে পাই না। [ঐ, ৫০৭-৮]।

সানফ্রানসিসকোয় স্বামীজী "ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান"—এই নামেই একটি বক্তৃতা করেছিলেন, কিন্তু সামান্য কয়েক লাইন রিপোর্ট মাত্র মিলেছে। তার মধ্যে আছে, স্বামীজী পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগতি কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার পর বলেছিলেন—এলিজাবেথের স্বর্ণযুগও সমকালীন ভারতের তুলনায় অন্ধকারযুগ, এবং ভারত একদিন সংগীত, নাটক ও ভাস্কর্যে পৃথিবীতে নেতৃত্ব করেছিল। বর্তমানে কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভারতবাসীকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয় বলে তাদের শিল্প ও সাহিত্য নিছক অনুকরণের বেশি কিছু নয়। [ইং-রচনাবলী, ৪র্থ, ১৯৬-৭]।

স্বামীজীর শিল্প-বিষয়ের বক্তব্য প্রধানতঃ পাই শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর ডায়েরী, প্রিয়নাথ সিংহ, সিস্টার ক্রিস্টিন ও ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিকথা, স্বামীজীর কয়েকটি চিঠি এবং 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য থেকে। শিল্প সম্বন্ধে যখনই সুযোগ ঘটেছে তখনি স্বামীজী আলোচনা করেছেন। জীবনের শেষ পর্বেও তিনি কতখানি উৎসাহের সংগে শিল্পালোচনায় যোগ দিতেন, তা 'কাশীধামে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়।১৭ক

॥ ৫ ॥ ভারতবর্ষে ধর্মের সংগে শিল্পের সম্পর্ক : শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পবোধ

স্বামীজীর শিল্প-বক্তব্য আলোচনার আগে এক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্য করবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা চলে, অন্ততঃ সে প্রশ্ন কেউ-কেউ করেছেন। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহকে জনৈক

১৭ক জীবনের একেবারে শেষ পর্বে, ১৯০২ ফেব্রুয়ারি মাসে, স্বামীজী কাশীতে গিয়েছিলেন। হরিনাথ ওদেদার [স্বামী সদাশিবানন্দ] সেই সময়কার প্রত্যক্ষ দর্শনের বহু কথা মহেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন। তার মধ্যে স্বামীজীর শিল্পানুরাগের বিষয়ও ছিল। প্রমদাদাস মিত্রের পুত্র কালিদাস মিত্র, শিল্পকলাবেত্তা, স্বামীজীর সাক্ষাতে এসেছিলেন। তিনি আসা-মাত্র স্বামীজী উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর সংগে শিল্পতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন।—

"স্বামীজী তখন চিত্র, আলেখ্য, প্রাকৃতিক চিত্রের বিষয় পুঙ্খাপুঙ্খভাবে বলিতে লাগিলেন। [মনে হইল] চিত্রকর যেন শিল্পসভায় গিয়া চিত্রের বিষয়ে লেকচার দিতেছেন, চিত্রই যেন তাঁহার একমাত্র জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বস্তু, তিনি যেন সমস্ত জীবনব্যাপী চিত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বর্ণসংযোগ, বর্ণের তারতম্য, সৌষ্ঠব, অধিষ্ঠান, নেত্রাদির বহুপ্রকার দৃষ্টি, কটিদেশ ও বক্ষঃস্থল বক্রভাবে বা অন্যভাবে দাঁড়াইলে যে নানাপ্রকার ভাবব্যঞ্জক হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বহুপ্রকার কহিতে লাগিলেন।...তাহার পর তিনি ইটালি, ফ্রান্স, চীন ও ভারতের...নানা সময়ের চিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিলেন" [মহেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ', ৭১]।

ইউরোপীয় পরিষ্কার বলেছিলেন—স্বামীজীকে তিনি ছবি সম্বন্ধে কখনো সঠিক বিচার করতে দেখেন নি, কারণ ছবি ইন্দ্রিয়জগতের ব্যাপার, আর স্বামীজী অতীন্দ্রিয় জগতের মানুষ। উক্ত ইউরোপীয় অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত খুব ভাল বুঝতেন। প্রিয়নাথ সিংহ প্রবুদ্ধ ভাবতে এক প্রবন্ধে১৭খ উক্ত ইউরোপীয়ের মতের প্রতিবাদ ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন—স্বামীজী শিল্পে কতখানি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ সিংহ একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলেন নি—বিবেকানন্দের চিত্রবিচার সাধারণভাবে ইউরোপীয়দের মনঃপূত হতে পারে না, যেহেতু তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত পার্থক্য বর্তমান। উক্ত প্রকার ইউরোপীয়দের বক্তব্যের আর একটি অসম্পূর্ণতার কথাও প্রিয়নাথ সিংহ বলেন নি। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শিল্পের যতখানি বিরোধের কথা উক্ত ইউরোপীয় বলেছেন, ততখানি বিরোধ সত্যই ছিল না; তার প্রমাণ বৌদ্ধমঠের ও সংঘারামের শিল্পনিদর্শন। ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে শিল্পের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আর সেকথা ইউরোপের ক্ষেত্রেও কি বহুলাংশে সত্য নয়? গির্জাগুলির শিল্পনিদর্শন কোন সাক্ষ্য দেয়?

ধর্মের সঙ্গে শিল্পের যোগ বুঝতে বিবেকানন্দের পক্ষে ইতিহাসের মধ্যে পিছু হটার প্রয়োজন ছিল না। যাঁকে দেখে স্বামীজী সর্বোচ্চ ধর্ম কী শিখেছিলেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ কি সুগভীর শিল্পানুভূতিতে সর্বদা স্পন্দিত হতেন না?

স্বামীজী বলেছিলেন, "ওরে আমাদের আর্ট যে ধর্মের একটা অঙ্গ।.. ঠাকুর নিজে কত বড় আর্টিস্ট ছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যই আর্টিস্ট ছিলেন, যে-বিষয়ে আমরা আগে কিছু আলোচনা করেছি। [২য় খণ্ড, ২৫৬-৬৫]। তাঁর চিত্রাঙ্কন ও মূর্তিনির্মাণ সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দের রচনা উদ্ধৃত হয়েছে—সেইসঙ্গে রোমা রোলাঁ প্রভৃতির উৎকৃষ্ট মন্তব্যও। এখানে একই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করতে পারি 'শিল্প-দীপঙ্কর' নন্দলাল বসুর উক্তি :

"ঠাকুর নিজে একজন শিল্পী ছিলেন। ছবি ও মূর্তি তৈরী করতেন। শুধু idealist নয়, রসিক শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আঙ্গিকের বিষয়ও বেশ জানতেন। আর ছবি বা মূর্তি দেখে ভুল হলে তা ঠিক ক'রে দিতে পারতেন। মথুরবাবু একবার তাঁর করা শিবমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। [ঠাকুর] কালীমন্দিরে পরে মাকে সাজাবার ভার নিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পাথরের গোবিন্দজীর পা ভেঙ্গে গেলে অতি নিপুণতার সহিত তা জুড়ে দিয়েছিলেন।

"দক্ষিণেশ্বরে যে-ঘরে থাকতেন, তার বারান্দিকের উত্তর দেওয়ালে দরজার দুপাশে কাঠ-কয়লার রেখায় আঁকা দুটি ছবি ছিল—৪′×৫′ আন্দাজ বড়। আমি ও প্রিয়নাথ সিংহ উহা দেখেছি। ঢুকতে বাঁদিকে একটি জাহাজ, ডানদিকে একটি গাছ আর তাতে টিয়াপাখি সব বসে। ঐ ছবি দুটি কাঁচ দিয়ে দেওয়ালে ফ্রেম ক'রে দেবার জন্যে রামলাল দাদাকে কিছু টাকা দিয়েছিলাম। পরে গিয়ে দেখি, উহার উপর চূণকাম ক'রে ঢেকে ফেলা হয়েছে।১৮ তাঁহার ছেলেবেলায় কামারপুকুর থাকার সময় ঐরূপ বহু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময়ে পোটোদের সর্বদা গাইড করতেন। তিনি প্রতিমার উপরে চালচিত্র আঁকার ভারও কখনও কখনও নিতেন। প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তাঁহার ডাক পড়ত, চোখের তারা ঠিক জায়গায় দেওয়া কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে সংশোধন ক'রে

১৭খ Priyanath Sinha, *Swami Vivekananda and Art*, *P. B.* Nov. 1906.

১৮ ছবি দুটিকে স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা নন্দলাল করেছেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নিয়োগীর 'শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প-দীপঙ্কর নন্দলাল' গ্রন্থে নন্দলাল-কৃত উক্ত প্রতিলিপি দুটি রয়েছে।

দিতেন। তিনি একজন সহজ শিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন। ছবি দেখতে বড় ভালবাসতেন, কাহারও ভাল ছবি থাকলে দেখবার জন্য ব্যগ্র হতেন।১৯

"আর একটি বিশেষ উল্লেযোগ্য কথা হল, তাঁর প্রথম সমাধি হয়েছিল বর্ষায় কাজলকালো মেঘের কোলে সাদা বকের পাঁতি দেখে। তিনি ভাল অভিনেতাও ছিলেন। অপরের ভাবভঙ্গি হুবহু নকল করতে পারতেন। একজন শিল্পীর শিল্প-বিষয়ে যা জানা ও থাকা দরকার, তিনি সবই জানতেন। আমার মনে হয়, স্বামীজী তাঁর নিকট প্রথমে শিল্পের গূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, যদিও তাঁর প্রতিভার অন্ত ছিলনা। ঠাকুর প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। একবার স্বামীজীর *observation*-এ চাতক পাখি ও চামচিকের মধ্যে তফাত সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি রূপপ্রীত ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পরিণত হত।...স্বামীজী প্রথমে ঠাকুরের নিকট শিল্পবিষয়ে অনেক জেনেছেন। আর সিস্টার [নিবেদিতা] পরে স্বামীজীর কাছ থেকে সৌন্দর্যবোধ, রুচিবিজ্ঞানও শিখেছেন।"

বিবেকানন্দের সঙ্গে রামকৃষ্ণের শিল্পদৃষ্টির চমৎকার তুলনাও নন্দলাল করেছেন :

"শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর ideal শিল্পের backbone-এর মত, যার অভাবে শিল্প নিস্তেজ ও প্রাণহীন হয়। স্বামীজীর ছিল জ্ঞানের পথে চলে aesthetics-পথের সাধন ও পূর্ণতা। আর ঠাকুরের ছিল aesthetics-এর পথে চলে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ। দুজনারই ছিল aesthetics ও জ্ঞানের পূর্ণতা, কেবল পথ-চলার process ভিন্নরকম। আমার মনে হয়, ঠাকুরের অনুভবের পথ শিল্পীদের বেশী উপযোগী। শিল্পীরা সব সময়েই ঐ পথে চলেন। রূপের উপাসক সাকারবাদী, জ্ঞানের উপাসক নিরাকারবাদী। তবে অনুভবের পথে চলে, জ্ঞান না থাকলে শিল্পীর পতন হবার সম্ভাবনা। আবার জ্ঞানীর পক্ষে অনুভব রসের সাধনে পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে। তবে প্রফেটদের কথা আলাদা। তাঁদের সবই দুর্জ্ঞেয়।"২০

॥ ৬ ॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর কিছু মন্তব্য

শিল্পালোচনায় স্বামীজীর মূলে কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে আসার আগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পনিদর্শন সম্বন্ধে তাঁর কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্যের উল্লেখ করতে পারি।

ইউরোপীয় শিল্পকলার ব্যাপারে স্বামীজী স্বভাবতঃই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্পসৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ করেছেন। পরবর্তীকালের ক্ষেত্রে তিনি ফরাসি সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন, কিন্তু ডাচ শিল্প তাঁকে খুশি করতে পারেনি। শেষোক্ত বিষয়ে যথেষ্ট অবহেলার সঙ্গে একবার মন্তব্য করেছিলেন :

---

১৯ শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে নানা ছবি টাঙানো থাকত। ছবিগুলি অবশ্যই ভক্তিমূলক। বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে হিন্দু ধর্মাচার্য শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ছবি সেখানে ছিল, যীশুর ছবিও ছিল। ম্যাডোনামূর্তি তিনি ভালবাসতেন। ছবি দেখবার জন্য তিনি বাগবাজারে নন্দ বসুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। কথামৃতের পঞ্চম খণ্ডে পাই, ১৮৮৫, ২৮ জুলাই, শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর বাড়িতে গিয়ে আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন পৌরাণিক ছবি দেখেছেন। তিনি, 'ইংরেজি ছবি' না রেখে ঐ সব ছবি রাখার জন্য গৃহস্বামীর প্রশংসাও করেছিলেন। ঘরের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সুরেশ মিত্র যে সর্বধর্মসমন্বয় বিধানের ছবি করিয়েছিলেন, তা টাঙানো ছিল। ছবির বিষয়বস্তু : "পরমহংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন।"

২০ শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগী 'শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্প-দীপঙ্কর নন্দলাল' নামে একটি ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান বই লিখেছেন। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের শিল্পভাবনা সম্বন্ধে নন্দলালের অনেক বক্তব্য রয়েছে। সেখান থেকেই নন্দলালের কথাগুলি সংকলিত।

"ভিয়েনা শহরে...চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে রূপ বার করবার চেষ্টা বড়ই কম; জীবপ্রকৃতির অবিকল অনুকরণেই এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর-কতক ধরে এক ঝুড়ি মাছ এ'কেছে, না-হয় এক থান মাংস, না-হয় এক গ্লাস জল—সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল চমৎকারজনক! কিন্তু ওলন্দাজ সম্প্রদায়ের মেয়ে-চেহারা সব যেন কুস্তিগির পালোয়ান।" [৬-১৩২]

ডাচ-শিল্প এবং তার খ্যাতনাম্নী মাংসল মহিলাগণ সম্বন্ধে স্বামীজীর সাপট মন্তব্য অনেককেই ব্যস্ত করবে।

ইউরোপের শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপারে স্বামীজী, এককথায়, ফ্রান্সের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। কোনো নির্দিষ্ট শিল্পসৃষ্টি নয়—সর্বাঙ্গীণ ফরাসি শিল্পসংস্কৃতির অত্যুচ্চ প্রশংসাই তিনি করেছেন। উল্টোপক্ষে জার্মানী বা ইংলণ্ড এইক্ষেত্রে তাঁর উচ্চহাস্য-বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানীর তুলনা এইভাবে করেছেন :

"কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসির শিল্প-বিন্যাস—আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্নাগ জার্মানীর স্থূল হস্তাবলেপ। প্যারিসের মতো পাশ্চাত্ত্যজগতে আর নগরী নাই; সব প্যারিসের নকল, অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্মসৌন্দর্য—জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানীর রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসি প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান-প্রতিভার মধুর হাস্যবিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ংকর। ফরাসির সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত, কস্তূরীর মত, এক মুহূর্তে উড়ে ঘরদোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মত, পারার মত ভারী, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে।...জার্মান, ফরাসির নকলে বড়-বড় বাড়ি অট্টালিকা বানাচ্ছেন, বৃহৎ-বৃহৎ মূর্তি, অশ্বারোহী, রথী—সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন; কিন্তু জার্মানের দোতলাবাড়ি দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, এ-বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতী উটের 'তবেলা'? আর ফরাসির পাঁচতলা হাতী ঘোড়া রাখবার বাড়ি দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়িতে বুঝি পরীতে বাস করবে।" [৬-১২৬]

ফ্রান্সের সঙ্গে অন্যান্য পাশ্চাত্ত্যদেশের ভোগবিলাসের তুলনা ক'রে সালংকার তীব্র পরিহাসের সঙ্গে স্বামীজী একবার যা বলেছিলেন, তা শিল্পসংস্কৃতির প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য : "অন্যদেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ; প্যারিসের, সভ্য প্যারির—ময়লা সোনার পাতমোড়া। বুনো শোরের পাঁকে লোটা আর ময়ূরের পেখম-ধরা নাচে যে-তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর প্যারিস-বিলাসের সেই তফাত।" [৬-১১৪]

এই যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি—তাঁর কাছে ইংরেজী শিল্প—যা সমস্ত ইউরোপের উপহাসের বস্তু—কোন্ চোখে ধরা পড়বে, তা না বললেও চলে। বিলেতী কলাশিল্প সম্বন্ধে অতীব অশ্রদ্ধার মন্তব্য তিনি করেছেন। ইংরেজ—জীবজন্তু আর ল্যাণ্ডস্কেপ এ'কে-এ'কেই গেল—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাদের জীবনে যেটুকু সৌন্দর্যবোধ, তা এসেছে প্রাচ্যের সংস্রবে। ইংরেজ-জীবনের মূল কথা ইউটিলিটি, আর ভারতের আর্ট—স্বামীজী বলতে চেয়েছেন।

ভারতের শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তাতে মধ্যযুগের মুঘলশিল্পের প্রতি তাঁর সবিশেষ অনুরাগ দেখা গেছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কুড়ি বছর যিনি কার্যতঃ ভারতসম্রাজ্ঞী ছিলেন, সেই "জগতের আলো" নূরজাহানের অপূর্ব আকর্ষক বর্ণনা দেবার সময়ে, স্বামীজী তাঁর শিল্পপ্রীতির কথা জানাতে ভোলেন নি। "নূরজাহানের রূপকে ধারণ ক'রে সোনার মূল্য গেছে বেড়ে"—নূরজাহানের মুখাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার উপরে জাহাঙ্গীর কথাগুলি লেখার ব্যবস্থা করেছিলেন

—সেই নূরজাহানের ও জাহাঙ্গীরের শিল্পভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন :

"নূরজাহানের আধিপত্যকালের মধ্যেই স্থাপত্যের নব্যরীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। আকবরের লালপাথরের পুরুষোচিত বলিষ্ঠ সৌধের স্থান গ্রহণ করল রমণীয় স্থাপত্যরীতি—এলো শুভ্রমর্মর, তাতে খচিত হল নানামূল্যের প্রস্তর; অমসৃণ রক্ত-প্রস্তরের স্থানে বহুমূল্য মাণিক্য-অলংকৃত দেওয়াল; মধ্যএশিয়ার মালভূমির বলবীর্যের পরিবর্তে পারস্যের গালিচার সুচারুকোমল লাবণ্য। পরবর্তীকালে এই রীতির দান—তাজমহল; এবং আগ্রা দিল্লী ও লাহোরের মর্মর প্রাসাদগুলি। যমুনার অপর পারে ইতমদউদ্দৌলা নামে যে চমৎকার সমাধিসৌধটি রয়েছে, তা নূরজাহান তাঁর পিতার স্মৃতিতে নির্মাণ করেছিলেন। নূতন স্থাপত্যরীতির প্রথম সৃষ্টিগুলির এটি একটি। শোনা যায়, এর গায়ে পাথরগুলি বসিয়েছিল নূরজাহানের ক্রীতদাসেরা। এই প্রাথমিক অসম্পূর্ণ চেষ্টার সঙ্গে পরবর্তী তাজমহলের পূর্ণ নিখুঁতরূপের তুলনায় ব্যাপারটি চিত্তাকর্ষক হবে। তাজমহলে একটি গোলাপের পাপড়ির চারু বর্ণরূপ ফোটাতে চুয়াল্লিশটি বিভিন্ন ধরনের লালপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। নৈপুণ্যের বিস্ময়কর অগ্রগতি।

"আগ্রা প্রাসাদে সমনবুর্গ নামে নূরজাহানের নিজ মহলটি তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে সজ্জিত করা হয়েছিল। শিল্পকলার তিনি যথার্থ পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন।" [ভগিনী ক্রিষ্টিনের স্মৃতিকথা থেকে]

স্বামীজী স্বভাবতঃই মুঘলযুগে শিল্পপোষ্টারূপে অনতিক্রান্ত ভূমিকা যাঁর, সেই সাজাহানের মুগ্ধ অনুরাগী ছিলেন। মুঘল রাজাদের শিল্পপ্রীতির সম্বন্ধে স্বামীজীর আবেগপূর্ণ প্রশংসার কিছু বিবরণ নিবেদিতা দিয়েছেন তাঁর 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থের মধ্যে : "হয়ত-বা তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের বা মোগল বংশের ইতিহাসের সারসংকলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন। এই সারা গ্রীষ্ম-ঋতুটিতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে 'একটি ক্ষীণালোক স্থান—তারপর একটি ক্ষীণালোক স্থান—তারপর একটি সমাধি'—এইরূপে বর্ণনা করেন। আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে-বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, 'আহা তিনিই মোগলকুলের গৌরবস্বরূপ ছিলেন। অমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যচেতনা ইতিহাসে আর দেখা যায় না। তিনি নিজেও আবার শিল্পী। আমি নিজে তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একটি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি—সেটি ভারতের অন্যতম শিল্পসম্পদ। কী প্রতিভা।'"

তাজমহলের ভাবসত্যের কথা স্বামীজী অন্যত্রও বলেছেন, আমরা পরে উদ্ধৃত করব। আলোয়ারের স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধেও তাঁর সমাদরের পরিচয় পরে দেব।

॥ ৭ ॥ হিন্দু ও গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দ

হিন্দুশিল্প ও গ্রীকশিল্পের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রেই আমরা স্বামীজীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পাই। এক্ষেত্রেই স্বামীজী অংশতঃ পথিকৃতের মর্যাদা পাবার যোগ্য। স্বামীজীর নিজের চিন্তার মধ্যে কিছু বিবর্তনও ঘটেছিল। সাবধানে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

গোড়ায় হিন্দু ও গ্রীক—এই দুই শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজী কী বলেছেন দেখে নেওয়া উচিত। তারও আগে জানাতে পারি, স্বামীজী নানা প্রসঙ্গে বহুবার হিন্দু ও গ্রীক, এই দুই সভ্যতার তুলনা করেছেন। তাঁর কাছে এই দুই সভ্যতা দুটি ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্তর্মুখী অধ্যাত্মভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিন্দুসভ্যতায়, বহির্মুখী ঐহিক

ভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ গ্রীকসভ্যতায়। মাদ্রাজে ১৮৯৭, ফেব্রুয়ারি মাসে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' নামক বক্তৃতার সূচনায় হিন্দু ও গ্রীকসভ্যতার বিশেষ চরিত্রের পিছনে কোন্ নৈসর্গিক প্রভাব ছিল, তা তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন, সেইসঙ্গে কী ধরনের সৃষ্টি উভয় ভূমিতে ঘটেছিল তাও বলেছিলেন :

"পৃথিবীতে আশ্চর্য দুই জাতি দেখা গিয়েছে। তারা একই উৎস থেকে উত্থিত হয়েও ভিন্ন পরিবেশে স্থাপিত হয়ে, ভিন্ন ঘটনাচক্রে নিজেদের জীবনসমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে নিজস্ব বিভিন্ন পন্থায়। আমি এখানে প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীকজাতির কথাই বলছি। উত্তরে তুষারশীর্ষ হিমালয়ের দ্বারা আবদ্ধ, প্রবহমান তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মতো স্বচ্ছসলিল নদীধারার দ্বারা সমতলভূমিতে পরিবেষ্টিত, চারিদিকে অনন্ত অরণ্য, যেন পৃথিবীপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত—এই পরিবেশে অবস্থিত থেকে ভারতীয় আর্যগণের মন অন্তর্মুখ হয়েছে; তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা এবং অতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্ক এই সুমহান প্রাকৃতিক পরিবেশের অঙ্কভুক্ত হয়ে স্বতঃই আত্মানুসন্ধানপ্রিয় হয়েছিল। নিজ মনের বিশ্লেষণই ছিল ভারতীয় আর্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে গ্রীকরা পৃথিবীর যে-অংশে উপনীত হয়েছিল, সে-স্থানের নিসর্গপ্রকৃতি যতখানি না সুমহান সুগম্ভীর, ততোধিক সুন্দর—দ্বীপপুঞ্জের মনোরম ভূখণ্ডগুলির সহজ অথচ বদান্য রূপ—সেই পরিবেশে স্বভাবতঃই বহির্মুখ হয়েছিল তাদের মন। তারা বাহ্যজগতের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিল বিশেষভাবে।" [ইং গ্রন্থাবলী, তৃতীয়, ২৬৯-৭০]

হিন্দুর অন্তর্মুখ মনঃস্বভাবকে তার সর্ববিধ সাংস্কৃতিক প্রকাশের মধ্যে দেখা যায় এবং সমগ্র প্রাচ্যভূমে তার প্রভাব রয়েছে। অপরদিকে গ্রীসের প্রভাব সমগ্র ইউরোপে। পূর্বোক্ত বক্তৃতাতেই স্বামীজী বলেছেন :

"ইংলণ্ড, শুধু ইংলণ্ড কেন সমগ্র ইউরোপ, তার সভ্যতার জন্য গ্রীসের কাছে ঋণী। ইউরোপের সবকিছুর মধ্যেই গ্রীসের কণ্ঠস্বর। প্রতিটি সৌধ, তার আবসাবপত্র, সরঞ্জাম—সর্বত্রই গ্রীসের ছাপ। ইউরোপের কলাশিল্প ও বিজ্ঞান—সবই গ্রীসের ছায়ায় সৃষ্ট।" [ঐ, ২৭১]

গ্রীকশিল্প ও ভারতীয় শিল্পের তুলনা স্বামীজী নিম্নোক্ত প্রকারে করেছেন :

"গ্রীকআর্টের মূল কথা প্রকৃতির হুবহু অনুসরণ, অপরপক্ষে ভারতীয় আর্টের মূল উদ্দেশ্য—আদর্শকে প্রতিফলিত করা। গ্রীকশিল্পের শক্তি ব্যয়িত হয়, ধরা যাক, একখণ্ড মাংসের যথাযথ চিত্রণে; সে-কাজে তার এমনই সাফল্য যে, একটি কুকুর পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে সেটিকে আসল মাংস বলে মনে করে এবং কামড়াতে যায়। কিন্তু প্রকৃতির এই নিছক অনুকরণে গৌরব কোথায়! কুকুরের সামনে একখণ্ড আসল মাংসই ছবির বদলে ফেলে দাও না কেন!

"অপরদিকে আদর্শকে—অতীন্দ্রিয়কে—পরিস্ফুটন ভারতের অভিপ্রায়। তার পরিণতি বিকট সব মূর্তি রচনায়। খাঁটি শিল্পকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা মাটি থেকে ওঠে, সেখান থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, মাটির সঙ্গে শেষপর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকে, তবুও তার পাপড়ি খুলে ছড়িয়ে থাকে উপরের দিকে। সুতরাং শিল্পকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে। যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। আবার, প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও হবে শিল্পকে।" [ঐ, ৫ম, ২৫৮-৫৯]

শিল্পের ক্ষেত্রে স্বামীজী বস্তুবাদী নন, আবার বিশুদ্ধ রসবাদী বা কলাকৈবল্যবাদীও নন—তিনি ভাববাদী। জীবনে থাকবে মহৎ উদ্দেশ্য; জীবনের অন্যতম প্রকাশক্ষেত্র শিল্পেও থাকবে তাই—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। সুতরাং তাঁর মতে, "স্থাপত্য ও বাড়ির মধ্যে তফাত হল, প্রথমটি একটি ভাবকে প্রকাশ করে, পরেরটি নিছক একটি কাঠামো—প্রয়োজনসিদ্ধির

উদ্দেশ্যে তৈরী। কী পরিমাণে ভাবকে প্রকাশ করতে পেরেছে, তার উপরে কোনো [শিল্প-] বস্তুর মূল্য নির্ভর করে।" [ঐ, ২৫৯]

স্বামীজী গ্রীকশিল্পের সমঝদার ছিলেন আমরা জানি, এবং গ্রীকস্থাপত্য যে ক্ষেত্র-বিশেষে ভাবপ্রকাশক, এও তিনি নিশ্চয় স্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, ভারতীয় স্থাপত্যে ঐ ভাবপ্রকাশের চেষ্টা ও সাফল্য অধিকতর।২১

ভারতীয় শিল্প এবং গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল না। ভারতীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে সর্বব্যাপক পরিচয়ের অভাবে গোড়ার দিকে তাঁর ধারণা ছিল—মূর্তিশিল্পের দিক দিয়ে ভারতের চেয়ে গ্রীস অগ্রসর। আগেই বলেছি, তিনি ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের পীঠস্থান উড়িষ্যায় যান নি। প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবজাত পূর্বোক্ত ধারণাকে তিনি পরে সংশোধন করেন। ১৮৯৭, ৩ জানুয়ারি মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে ভারত ও ইউরোপের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজী কিছু মন্তব্য করেছিলেন, তার অংশবিশেষ আমাদের আলোচনার পক্ষে খুবই দরকারী :

"পাশ্চাত্যের অন্য সবকিছুর মধ্যে আমি রোমকে সর্বাধিক উপভোগ করেছি। পম্পেই দেখার পরে আমি তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার বিষয়ে শ্রদ্ধা একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। বাষ্পশক্তি ও বিদ্যুৎশক্তি বাদ দিলে বাকি সবকিছুই তাদের ছিল—আর, আধুনিকদের চেয়ে অনন্ত গুণ বেশি তাদের শিল্পবোধ এবং তাকে রূপায়িত করার ক্ষমতা।

---

২১ পাশ্চাত্যশিল্প ভাবপ্রকাশক নয়, এই ছিল স্বামীজীর বক্তব্য, এমন যেন কেউ মনে না করেন। নানাপ্রকার ভাব ও কল্পনা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যশিল্প প্রকাশ করেছে, এবং স্বামীজী তার কিছু-কিছু নমুনার সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন, তবে তিনি সর্বোচ্চ ভাব অর্থাৎ সুগভীর আধ্যাত্মি-কতাকে পাশ্চাত্যশিল্প যথেষ্টভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে, এমন মনে করতেন না। স্বামীজী, এল গ্রেকোর ছবির সঙ্গে কতখানি পরিচিত ছিলেন জানিনা। যদি থাকেনও, এল গ্রেকোর লৌকিক ছন্দ ভাঙা আধ্যাত্মিক ছাঁদকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শিল্প বলতে পারতেন না নিশ্চয়, কারণ, সেখানে মিস্টিক রহস্যময়তা থাকলেও স্পিরিচুয়্যাল প্রশান্তি ও লাবণ্য ছিলনা।

পাশ্চাত্য-ভাস্কর্যের কল্পনামুখিতার তারিফ স্বামীজী কিভাবে করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত প্রিয়নাথ সিংহের *Swami Vivekananda and Art* [P B Nov. 1906] নামক রচনার মধ্যে পেয়েছি। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস প্রদর্শনীতে বহু চিত্র ও ভাস্কর্যের সমাবেশ হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। প্রদর্শনীর সচিত্র রিপোর্টে মুদ্রিত একটি ভাস্কর্যের ছবি দেখিয়ে তার বিশেষ প্রশংসা স্বামীজী করেছিলেন। দুটি মূর্তি ছিল ঐ ভাস্কর্যে—একটি নারীর, অন্যটি পুরুষের। পুরুষটি হল শিল্পীর প্রতিভূ, তার ডান হাতে শিল্পযন্ত্র, সে হাতটি রমণীমূর্তির হাঁটুর ওপরে আলতোভাবে পড়ে আছে—অন্য হাতে সে রমণীর অবগুণ্ঠন মোচন করছে—তা করার কালে যেটুকু দেখতে পেয়েছে, তাতেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। ভাস্কর্যের তলায় নাম দেওয়া হয়েছে "শিল্প এবং প্রকৃতি" ('Art et Nature')।—"স্বামীজী মন্তব্য করলেন : ওখানে লেখা উচিত ছিল—'আর্ট উন্মোচন করছে প্রকৃতিকে'। শিল্পী, অদীক্ষিত দর্শকের চোখের সামনে প্রকৃতির সৌন্দর্য খুলে ধরে। মুখ একই—কিন্তু অন্তরের বিভিন্ন অনুভূতি যেমন তাতে বিভিন্ন আলোকসম্পাত করে, তেমনি একই নিসর্গপ্রকৃতি শিল্পীর কাছে নানা ভাবের আকর হয়, নানারূপে বিকশিত হয়। প্রকৃতি তার প্রিয় উপাসক শিল্পীর কাছে অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুলে দেয়। প্রকৃতির লজ্জাগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের দু'একটি ঝলক শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে—তাকেই স্থায়ীরূপ দেয় সে। এই হল শিল্পীর আসল কাজ। ঐ ভাস্কর্যটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে শিল্পীর নয়নের আবাধন-দৃষ্টি; তার শরীরের আনত-ভঙ্গি, মাথার হেলানো ছন্দ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশিষ্ট অবস্থানের রূপ—সবকিছুই শিল্পী ও তার দেবীর পবিত্র সম্পর্ককে প্রকাশ করছে। শিল্প ও প্রকৃতির সম্পর্কের পূর্ণরূপের ধারণা করবার পরেই ভাস্কর এই মাস্টারপিস্ সৃষ্টি করেছেন।"

রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বলার সময়েও প্যারিস প্রদর্শনীর ঐ ভাস্কর্যটির কথা স্বামীজী বলেছিলেন।

"মিস লককে বলো, আমি যে তাঁকে বলেছিলাম—'মানবমূর্তির ভাস্কর্যসৃষ্টির ক্ষমতা গ্রীকদের তুল্য ভারতীয়দের মধ্যে বিকশিত হয়নি'—আমার সে ধারণা ভ্রান্ত। ফার্গুসন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের যে-সব গ্রন্থ এখন পড়ছি তাতে দেখছি, উড়িষ্যায় (যেখানে আমার যাওয়া হয় নি) ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এমন মানবমূর্তি রয়েছে, সৌন্দর্যে এবং অবয়বসংস্থানের নৈপুণ্যে সেগুলি যে-কোনো গ্রীকমূর্তির সঙ্গে তুলনীয়। মৃত্যুর একটি বিশাল মূর্তি সেখানে আছে—লোলচর্ম প্রকাণ্ড নারী-কঙ্কাল—যার অবয়বসংস্থানের নিদারুণ বাস্তবতা ভয়ংকর ও পীড়াদায়ক। উক্ত গ্রন্থকার বলেছেন, অলিন্দের একটি নারীমূর্তি একেবারে ভেনাস ডি মেডিচির মত। এইরকম আরও। অবশ্যই মনে রেখো, মূর্তিবিদ্বেষী মুসলমানেরা প্রায় সবকিছু ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। তবু যা আছে তা সমগ্র ইউরোপের ধ্বংসস্তূপ জুড়লে যা হয়, তারও চেয়ে বেশি। আমি আটবছর ভারতে ঘুরেছি, তবু অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিই দেখা হয়নি।

"ভগিনী লককে বলো, ভারতের অরণ্যের মধ্যে একটি বিধ্বস্ত মন্দির আছে, ফার্গুসন সেটিকে এবং গ্রীসের পার্থিননকে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে স্থাপত্যশিল্পের চরম শিখর মনে করেন —একটি ভাবকল্পনার চরম প্রকাশ, অন্যটি ঐ কল্পনার সঙ্গে জড়িত খুঁটিনাটি রূপের প্রকাশক। পরবর্তী মুঘল সৌধাবলী প্রভৃতি ভারত-সারাসেন স্থাপত্যনিদর্শনগুলি প্রাচীন-কালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনায় দাঁড়াতে পারে না।" [৭-৩১৫-১৬]

এখানে সময়ের একটু হিসাব নেওয়া দরকার। ১৮৯৭, ৩ জানুয়ারিতে স্বামীজী যখন ঐ চিঠি লিখছেন, তখন তিনি প্রথমবার পাশ্চাত্যভ্রমণ শেষ ক'রে ভারতের পথে; এখনো দেশে পৌঁছন নি। সুতরাং নতুন ক'রে এদেশের শিল্পনিদর্শনগুলি পরীক্ষা করার সুযোগ তাঁর হয় নি। তবু ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁর মত বদলালো কি ক'রে—কি ক'রে সে-গুলিকে তিনি গ্রীকমূর্তির সমতুল মনে করলেন? তা কি ফার্গুসনের গ্রন্থের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়ের ফলে? ফার্গুসনের বই কি তিনি আগে পড়েন নি? ঐ চিঠিতে অন্য বিশেষজ্ঞদের কথাও তিনি বলেছেন—তাঁদের মধ্যে কি *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন? উড়িষ্যার শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে ঐ বিখ্যাত গ্রন্থও কি তিনি পড়েন নি? স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথায় কিন্তু দেখেছি, তিনি যুবক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে তাঁকে রাজেন্দ্রলালের 'বুদ্ধগয়া' গ্রন্থ পড়তে দেখেছিলেন। আমাদের কি ধরে নিতে হবে—বিদেশের মিউজিয়ামে বিদেশীয় নিদর্শনের পাশাপাশি এদেশীয় শিল্প নিদর্শন দেখে (এবং তার বিষয়ে আরও অবহিত হয়ে) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল? স্পষ্ট উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ।২২

---

২২ খুব বিস্ময়ের কথা, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' স্বামীজী শিল্পবিষয়ে আলোচনাকালে শিল্পভাস্কর্যে পাশ্চাত্যের তুলনায় ভারতবর্ষের ন্যূনতার কথা বলেছিলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' উদ্বোধনে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বেরিয়েছিল। কিন্তু বইটি কখন লেখা হয়? বইটির রচনাভঙ্গি দেখে মনে হয়, ধারাবাহিকভাবে বইয়ের সব অংশ লেখা হয়নি। যতদূর ধারণা, স্বামীজী এটি ১৮৯৭-১৮৯৯-এর মধ্যে লিখেছিলেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামীজীর নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্যের কালগত সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, যখন আমরা জানি, স্বামীজী ১৮৯৭-এর গোড়ায় মিস লককে লেখা চিঠিতে ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনায় গ্রীকভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব-ধারণা প্রত্যাহার করেছিলেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র পরিশিষ্টে স্বামীজী লিখেছেন : "ওদের মতো চিত্র বা ভাস্কর্যবিদ্যা হতে আমাদের এখনো ঢের দেরী। ওদুটো কাজে আমরা চিরকালই অপটু। আমাদের ঠাকুরদেবতা সব দেখ না—জগন্নাথেই মালুম।'

স্বামীজীর রচনার এই অংশ কি ১৮৯৭-এর আগে লেখা? সম্ভবতঃ তাই। ১৮৯৭-এর আগে পাশ্চাত্যদেশে থাকা কালেই মনে হয় তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা-বিচারের ঐ অংশ লিখেছিলেন।

॥ ৮ ॥ হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গ্রীক-প্রভাব নিয়ে বিতর্ক : ফার্গুসন ও কানিংহ্যামের সঙ্গে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতসংঘর্ষ

এইবার একটি প্রশ্ন করা চলে—ভারতীয় শিল্পে গ্রীকপ্রভাবের বিষয়ে অতিরঞ্জিত ইউরোপীয় থিয়োরীর বিরুদ্ধে স্বামীজীর অধুনাখ্যাত মনোভাব কখন গঠিত হয়েছিল? ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রীকভাস্কর্যের চেয়ে ন্যূন নয়, এই ধারণার উদ্ভবের কালেই কি তা জেগেছিল—যখন তিনি এ সম্পর্কে বিশেষ অনুশীলন করেছিলেন? এই প্রশ্ন মীমাংসার প্রয়োজন আছে, কারণ, আমরা দেখব, পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের তত্ত্বভিত্তি যাঁরা নির্মাণ করতে চেয়েছেন, তাঁরা সকলেই স্বামীজীর মতের অনুবর্তী হয়েছিলেন।

ভারতীয় পুরাকীর্তির আবিষ্কার এবং তার পরিচায়ক গ্রন্থাদি থেকেই শিক্ষিত সমাজে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়, একথা স্বীকার্য। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিত-দেব প্রাথমিক প্রয়াস শ্রদ্ধাযোগ্য। কিন্তু বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শিল্পনিদর্শন ইউরোপীয় সভ্যতার গর্বকে কিছু পরিমাণে আহত করেছিল এবং সাম্রাজ্যস্বার্থের ক্ষতির আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল সেইসঙ্গে। নিজ সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববুদ্ধি থেকে জাতীয়তার বৃদ্ধি ঘটে—পরাধীন ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সেই জাতীয় চেতনাকে সাম্রাজ্যবাদীরা পছন্দ করবেন, এমন আশা করা যায় না।২৩ তাই ভারতীয় পুরাকীর্তির পরিচয় দেবার সঙ্গে-সঙ্গে জানানোর প্রয়োজন হয়েছিল—এইসব সৃষ্টির মূলে রয়েছে পাশ্চাত্ত্যেরই দীর্ঘ বিস্তারিত হস্ত, অর্থাৎ —ভারতশিল্পে গ্রীকপ্রভাব। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু মিশ্র শিল্প, যার নাম গান্ধার শিল্প, এক্ষেত্রে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সুবিধা ক'রে দিয়েছিল। ইউরোপীয়রা একথা বলতে পেরে এবং ভারতীয়রা একথা মানতে পেরে পুলকিত হয়েছিল যে, ভারতের দর্শন, কাব্য, নাটক, শিল্প সবই গ্রীসের ছায়াশরীর। ইউরোপীয়দের আনন্দের কারণ সহজেই বোধগম্য। ভারতীয়দের উল্লাসের হেতুও একেবারে দুর্বোধ্য হবে না যদি একবার সেকালের মনের চেহারাটা ভেবে নিই—কী কাণ্ড! আমরা, ভারতীয়রা, ইউরোপের অন্যান্য অংশের মতোই গ্রীসের দুলালী!!

ভারতশিল্পে গ্রীকপ্রভাব খণ্ডনের চেষ্টাও ভারতীয়দের মধ্যে আরম্ভ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ নাম—অসাধারণ এক মনীষীর নাম—ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র।২৪ রাজেন্দ্রলালই বোধ-হয় সর্বপ্রথম ভারতশিল্পের উৎপত্তিতে গ্রীক প্রভাব-তত্ত্বকে খণ্ডনের চেষ্টা করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ নন (যেমন অনেকের ধারণা), এবং সে কাজ তিনি করেছিলেন—স্বামীজী যখন নিতান্তই বালক। এই কাজে নেমে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন

উপরের কথাগুলি যে ১৮৯৭-এর পূর্ববর্তী চিন্তার অংশ তার প্রমাণ পেয়েছি। "১৮৯২-৯৩ খ্রীস্টাব্দ মাদ্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে"-এর মধ্যে আছে : "আদর্শবাদী হিন্দুদের মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কথাই ধরো। হিন্দুর চিত্রকলায় কী দেখিতে পাও? সর্বপ্রকার হাস্যোদ্দীপক ও অস্বাভাবিক মূর্তি। হিন্দুমন্দিরে কী দেখিযা থাকো? চতুর্ভুজ নারায়ণ বা ঐ জাতীয় কোনো মূর্তি। কিন্তু কোনো ইতালীয় বা গ্রীসদেশীয় মূর্তি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখো—ইহার মধ্যে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের কি অপূর্ব প্রকাশ! প্রদীপ-হস্তে একটি নারীর চিত্র অংকনের জন্য হয়ত একজন বিশ বৎসর ধরিয়া নিজ হাতে প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়াছিল।" [১০-২১১-১২]

স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির সমূহ পরিবর্তন হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

২৩ ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'বিশ্ববিবেক' (১৯৬৩) গ্রন্থভুক্ত 'শিল্পান্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব' নামক রচনায় প্রাচ্যপুরাকীর্তির সমৃদ্ধি দেখে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব কি রকম চমকিত হয়েছিল, সে বিষয়ে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করেছেন।

২৪ প্রিয়নাথ সিংহ ১৯০৬, নভেম্বর, প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধে এই বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন।

তাঁকে হতে হয়েছিল, এবং সে সংগ্রামে বিস্ময়কর সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন—শেষে বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে তিনি জয়পত্র আদায় ক'রে নিতে পেরেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের দেশানুরাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লড়াইয়ের সময়ে ভাবাবেগ নয়, পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতাকেই অস্ত্র করেছিলেন। এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, মহেনজোদড়ো-হরপ্পা আবিষ্কৃত হবার অনেক আগেই, তৎকালে প্রাপ্ত নিদর্শনের উপর নির্ভর করেই, রাজেন্দ্রলাল হিন্দুস্থাপত্যের মূলে গ্রীকপ্রভাব-তত্ত্বের নিরাকরণে সফল হয়েছিলেন। মহেনজোদড়ো আবিষ্কারের পরে ভারতশিল্পের উপরে গ্রীকপ্রভাব সম্বন্ধে ফার্গুসন-প্রভৃতির একগুঁয়ে থিয়োরী চরম হাস্যকর বলে বাতিল হয়ে গেছে।

স্বামীজী এইক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের রচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। আগেই দেখেছি, স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, তিনি কুড়ি-একুশ বছরের নরেন্দ্রনাথকে রাজেন্দ্রলালের 'বুদ্ধ-গয়া' বইটি পড়তে দেখেছিলেন। এই বইয়ের মধ্যেও রাজেন্দ্রলাল তাঁর পূর্ববর্তী কয়েকটি বইয়ের মতোই গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খণ্ডনের চেষ্টা করেছিলেন।২৫

রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যের রেখাবিন্যাস এখানে করার দরকার আছে। প্রথম কারণ, গ্রীক-প্রভাবতত্ত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে স্বামীজী যেসব যুক্তি এনেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই না; রাজেন্দ্রলালের বক্তব্য সেই শূন্য পূরণের কাজে আমাদের সাহায্য করবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে প্রাথমিকভাবে নিশ্চয়ই উপস্থিত করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, আমরা এও দেখব, স্বামীজী রাজেন্দ্রলালের বক্তব্যকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন। কোথায় তা করেছিলেন, তাও জানা দরকার।

৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ তারিখে লিখিত "ইন্দো-আরিয়ান্স" গ্রন্থের ভূমিকায় ডাঃ রাজেন্দ্র-লাল মিত্র সংক্ষেপে হিন্দুস্থাপত্যের উৎস সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ও তাকে কেন্দ্র ক'রে বিতর্কের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার রচনাটি ১৮৭০ খ্রী. লিখিত হয়। পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরী করার কাজ হিন্দুরা গ্রীক-বিজেতাদের কাছ থেকেই প্রথম শিখেছিল, এই ধারণা তখন খুব প্রচলিত ছিল—তারই প্রতিবাদে ঐ রচনাটি লিখেছিলাম। মিঃ ফার্গুসন ১৮৭৯ সালের 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকুয়েরি'র পৃষ্ঠায় আমার বক্তব্যের সমালোচনা করেন। পরে আমার 'অ্যাণ্টিকুইটিস অব উড়িষ্যা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমার বক্তব্য আবার বেরোয়। তার বিরুদ্ধে মিঃ ফার্গুসনের দ্বিতীয় সমালোচনা বেরোয় তাঁর 'হিস্টরি অব ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন আর্কিটেক্চার' গ্রন্থের মধ্যে। আমার উত্তর বেরোয় আমার 'বুদ্ধ গয়া' গ্রন্থে।"

ইতিহাসের যুক্তিকে ইতিহাসের দ্বারা খণ্ডন করার চেষ্টা না ক'রে, ফার্গুসন কিরকম অযথা নিন্দাভাষণের মধ্যে নেমে পড়েছিলেন, সেকথা রাজেন্দ্রলাল অতঃপর জানিয়েছেন। "রাজেন্দ্রলাল মিত্র নামক 'বাবুটি' ইতিহাসকে অথরিটি না ক'রে নিজেকে অথরিটি করেছেন,

২৫ স্বামীজীর উপরে রাজেন্দ্রলালের রচনাবলীর প্রভাবের কথা নিবেদিতাও লিখেছেন :

"আমাদের আচার্যদেব যৌবনের প্রারম্ভে যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন, সেইসময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইসময়ে ইংরেজ-রাজের আদেশে বুদ্ধগয়ার বৃহৎ মন্দিরের পুনরুদ্ধারকার্য সাধিত হইতেছিল, এবং বাঙালী পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐ কার্যে যোগদান করায় সমগ্র ভারতবর্ষের লোক ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ মাতিয়া ওঠেন।...ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনাবলী এবং [এডউইন আর্নল্ডের] 'লাইট অব এশিয়া' পাঠ স্বামীজীর জীবনে ক্ষণস্থায়ী ঘটনামাত্র হয় নাই।" ['দি মাস্টার']

নিবেদিতা অবশ্য এখানে স্বামীজীর জীবনে বৌদ্ধপ্রভাবের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের রচনার সঙ্গে পরিচয় স্বামীজীকে শিল্পক্ষেত্রেও কম উৎসাহিত করেনি, তাও দেখা যায়।

সেজন্য তাঁর কথা মোটেই ধর্তব্যের নয়—ইত্যাদি কথা যথেষ্ট ঘৃণার সঙ্গে ফার্গুসন লিখে-ছিলেন। তাঁর ভাষাতেই তাঁর কথা কিছু শোনা যাক :

"By his [Rajendralal's] ambition to be considered an archaelogist of the European type, led him to neglect a task for which he was pre-eminently fitted, and to waste his time instead in inventing improbable myths to explain the sculptures in the caves."

এইসকল অভদ্র গালি-গালাজের প্রত্যেকটিকে প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে ফার্গুসনকে প্রত্যাহার ক'রে নিতে হয়, কারণ তিনি রাজেন্দ্রলালের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়ে-ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল নির্মম ভদ্রতার সঙ্গে ফার্গুসনের গোঁড়ামি এবং অসংলগ্ন যুক্তির ভ্রান্তিকে খুলে ধরেছিলেন।

গ্রীকপ্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে ফার্গুসন প্রভৃতি কয়েকজনের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক।

ফার্গুসন বলেছিলেন :

"The Indian first learnt this art from the Backtrain Greeks."

[*History of Architecture*]২৬

"We are not surprised to find wooden forms copied in stone in the early cave of the Buddhists about the Christian era, because we know that no stone architecture existed in India till the Greeks taught them the use of the more durable material." [*Architecture at Beejapoor*]২৭

"It may create a feeling of disappointment in some minds when they are told that there is no stone architecture in India older than two-and-a-half centuries before the Christian era." [*Eastern Architecture*]২৮

ফার্গুসনের এই ধরনের আরো অনেক মন্তব্য রয়েছে। মিসেস ম্যানিং একই কথা পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন :

"Alexander the Great left Greek and other foreign artists in India, about the year B. C. 326; and sculptures found in Kashmere, and coins struck in mints established on the Indus, give undoubted signs of Greek influence at dates somewhat earlier than our own era; while no Buddhist monument claims to be earlier than obout B. C. 247."

[*Ancient and Mediaeval India*]২৯

গ্রীকরা যদি ভারতীয়দের পাথরের বাড়ি তৈরী করতে শেখায়, তাহলে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ভারতের প্রাসাদগুলি কিসের তৈরী ছিল? সুস্পষ্ট সাহেবী উত্তর—সেগুলি খড়ের চালের প্রাসাদ ছাড়া কিছু নয়। হুইলার তাঁর 'হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া'তে বললেন—দশরথের প্রাসাদের চারধারে যে প্রাচীরের কথা বলা হয়েছে, তা কাঁটাগাছের বেড়া ছাড়া কিছু নয়। মহাভারতের কালেও একই অবস্থা; হস্তিনাপুরের প্রাসাদ-দুর্গ সবই কাদা-মাটি-বাঁশের তৈরী।

২৬ Quoted in *The Antiquities of Orissa*, Vol I.
২৭ Ibid.
২৮ Quoted in *Indo Aryans*.
২৯ Quoted in *The Antiquities of Orissa*, vol I.

ফার্গুসন প্রভৃতির খণ্ডনে রাজেন্দ্রলাল কী বলেছিলেন সংক্ষেপে দেখা যাক। যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ রাজেন্দ্রলাল নিজ বক্তব্যের সমর্থন করেছিলেন, স্বভাবতঃই আমার এই সারসংক্ষেপের মধ্যে তাদের উল্লেখ থাকবে না।

যে-কালের আলোচনার কথা বলছি, সেকালে তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম ভারতীয় স্থাপত্যনিদর্শন খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের অশোকস্তম্ভ। এই স্থাপত্যকালের সঙ্গে গ্রীকদের ভারত-আক্রমণের কাল প্রায় এক ছিল—সেকারণেই উক্ত গ্রীকপ্রভাব-বিষয়ক ইউরোপীয় ধারণার উৎপত্তি—একথা রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন। হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট রীতিও উক্ত মত-উৎপত্তির পেছনে আছে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম পারিবারিক—সামাজিক নয়, তাই ভারতবর্ষে বৃহৎ মন্দির নির্মাণ ক'রে সর্বজনীন ধর্মানুষ্ঠান করা হত না। হিন্দুরা মৃতের সম্মানে বৃহৎ সৌধ নির্মাণেও ইচ্ছুক ছিল না। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীন মানুষ প্রথম-পর্বে কুটীরবাসী, ক্রমে তারা কাঠ-পাথরের অধিক স্থায়ী গৃহনির্মাণে উদ্যোগী, তারপর ধর্মীয় ব্যাপারে বা বিখ্যাত মৃতের স্মৃতিতে সৌধনির্মাণে ব্রতী, ক্রমে সেই সৌধগুলিকে অলংকৃত করতে প্রয়াসী। ভারতবাসীর ক্ষেত্রে শেষোক্ত তাগিদটি না থাকায় তাদের স্থায়ী স্থাপত্য-উদ্ভব বিলম্বিত হয়েছিল—এই হল ইউরোপীয় মত।

তা যদি সত্যি হয়ও, ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছেই-বা ঋণী হবে কেন—প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে থেকেও তো নিতে পারত, বিশেষতঃ মিশরের সঙ্গে যখন তার যোগ ছিল। না, গ্রীকদের কাছেই ঋণী হতে হবে, কারণ, [রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন] ইউরোপীয়দের সদানন্দ ধারণা : স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্ব যে-হেতু গ্রীসে, সে-হেতু গ্রীকপ্রভাব অনিবার্য, বিশেষতঃ, যখন অশোকস্তম্ভের নির্মাণকালের কাছাকাছি সময়ে ভারতে গ্রীক-অভ্যুদয়! ইউরোপীয় পণ্ডিতরা জন্মসূত্রে একটি ধারণা পেয়ে আছেন—ভারতীয় আর্যরা পাথরের বাড়ী তৈরী করতে মোটেই জানত না!!

না, সকল ইউরোপীয় উক্তপ্রকার সহজাত প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং শেরিং প্রশ্ন করতে পারেন—যে-প্রাচীন ভারতীয়রা ভারতে গৌরবজনক সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল, এমন সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল যা এশিয়ার অপর কোনো অংশের সভ্যতার চেয়ে ন্যূন ছিল না, বরং তাদের অতিক্রম করেছিল—সেই ভারতীয়রা এই সমস্ত সময়ে তাদের মহিমার লিপি কেবল নশ্বর জিনিসেই লিখে গেল, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য স্থায়ীভাবে নিজেদের শক্তির প্রমাণ রেখে যেতে চাইল না, যখন তারা মিশরের বিশাল স্থাপত্যের, অ্যাসিরিয়ার অপূর্ব প্রাসাদ-স্তম্ভ-সোপানের কথা শুনেছিল? ভারতবাসীর আর যারই অভাব থাক, প্রতিভার অভাব তো ছিল না?৩০

৩০ শেরিং-এর নিম্নের মন্তব্য রাজেন্দ্রলাল তাঁর *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত করেছেন :

"Is it at all likely that the Aryan race existed in India for between one and two thousand years, that they attained to greatness and glory, wonderful progress in civilisation, equalling, if not surpassing, their contemporaries in other parts of Asia, and yet, that, during all this time, they were satisfied with only transitory symbols of greatness, and never conceived the idea of having behind them durable monuments of their power, which should hand down their name to many generations? They must have heard of the vast structures erected in Egypt, and of the splendid palaces, and stairs, and pillers, and other edifices, with which the Assyrian monarchs adorned their cities. They were not lacking in genius, or in the desire for knowledge; on the contrary, their mind investigated the highest subjects, and whatever was of interest to humanity in general, they regarded as of importance to themselves."

রাজেন্দ্রলাল খুশি হয়েই শেরিং-এর প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছেন।

এইসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল যুক্তিতথ্যের দ্বারা ফার্গুসনের মত খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, কোন্ প্রমাণে বলা যায় যে, ভারতীয় আর্যরা প্রস্তরস্থাপত্য জানত না? নিদর্শনের অভাব কি অস্তিত্বের অভাব? বিশেষতঃ সকলেরই যখন জানা আছে যে, মুসলমানেরা পরবর্তীকালে হিন্দু-বৌদ্ধ সংক্রান্ত সব-কিছু ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চেয়েছে! ভারতীয় স্থাপত্যের 'প্রথম' নিদর্শন অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করেই রাজেন্দ্রলাল সজোরে বলেছেন—এই স্তম্ভটিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ—ভারতীয়রা অনেক আগে থেকেই প্রস্তর-স্থাপত্যের কথা জানত। অশোক হিন্দুরূপে জন্মেছেন ও বর্ধিত হয়েছেন; একটি ভারতীয় ধর্মে তিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন (যদি বৌদ্ধধর্মকে না-হিন্দুধর্ম মনে করা হয়!); তিনি ভারতের বাইরে গেছেন, এমন প্রমাণ নেই; তাঁর আচার্যরা ভারতীয়ই ছিলেন। ভারতীয়রা ভ্রমণে মোটেই উৎসাহী নন, এবং স্বভাবে রক্ষণশীল। যদি তাঁরা ভারতের বাইরে কখনোও যানও, তবু তাঁদের পক্ষে অশোকস্তম্ভে যে-উচ্চ প্রস্তরশিল্পের নমুনা আছে, তা অবিলম্বে গড়ে তোলা সম্ভব ছিলনা। ৪২ ফুট উঁচু, যথেষ্ট বেড়যুক্ত ঐ স্তম্ভটি উচ্চশ্রেণীর স্থাপত্য-কৌশলের পরিচায়ক। স্তম্ভের পাথর বহুদূর থেকে বয়ে আনা হয়েছে, তাকে খাড়া করতে হয়েছে বিশেষ নৈপুণ্যে, অলঙ্করণ ও পালিশের অদ্ভুত কৃতিত্ব আছে সেখানে—সবকিছু হঠাৎ-লব্ধ কোনো শিক্ষকের নির্দেশে ঘটে গেল? রাজেন্দ্রলাল চমৎকার সমসাময়িক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ইংরেজ বহুদিন ধরে ভারত অধিকার ক'রে আছে, নিজের সংস্কৃতির যথেষ্ট বিস্তার করেছে—কিন্তু কটা বিলেতী স্থাপত্যনিদর্শন ভারতে তৈরী হয়েছে? আর অশোক পরাধীন ছিলেন না। তাঁর অবস্থা, ধরা যাক, নেপালের শাসক স্যার জংবাহাদুরের মতো। নেপালে বা সিকিমে বা ভুটানে একটিও পাশ্চাত্ত্যরীতির স্থাপত্য গড়ে ওঠেনি, যদিও স্যার জংবাহাদুর পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ করেছেন, অশোক যেখানে দেশের বাইরে পা দেননি। এবং কথাটা কী হাস্যকর ঠেকে, যখন শোনা যায়, যে-জাতির রাজারা মাটির কুটীরে বাস করত, কয়েকটা পাথরজুড়ে বসতবাড়ি পর্যন্ত তৈরী করতে পারত না, তারা আগে নিজেদের থাকার বাড়ি না বানিয়ে (যা সাধারণ বুদ্ধি বা ঐতিহাসিকের বুদ্ধিতে অসম্ভব ব্যাপার) বিদেশীর শিল্পীর প্রেরণায় এমন আশ্চর্য স্মারকস্তম্ভ বানিয়ে ফেলল, যা কোনো হিসেবেই এক-রাজত্বকালে অর্জিত বিদ্যায় করা সম্ভব নয়, যদি-না পিছনে দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকে। অশোক অবশ্য বাইরে থেকে শিল্পী আমদানী করতে পারতেন। কিন্তু পাতার কুটীরবাসী এক ব্যক্তি, জন্মে যিনি পাথরের বাড়ি দেখেন নি, তিনি পাথরের স্তম্ভ তৈরী করার ভাস্কর আনতে সুদূর বিদেশে লোক পাঠাবেন? কিন্তু, ভাগ্যান্বেষী ভাস্কর তো অর্থ ও সম্মানলোভে অশোকের কাছে স্বয়ং আসতে পারে! পারে কি, যখন সে জানে ঐ রাজাটি কুটীরবাসী? কোনো কুটীরবাসী রাজাকে পাথরের বাড়ির মহিমা বুঝিয়ে কাজে লাগানোর মতো ঝুঁকি অর্থলোভী বিদেশী ভাস্কর গ্রহণ করবে?

আর অশোক যদি শিল্পী এনেই থাকেন গ্রীস থেকে—সে শিল্পী কি তার পক্ষে সহজ যে-কাজ, তার চেনা-জানা স্থাপত্যরীতিকেই হুবহু বলবৎ করবার চেষ্টা করবে না? কিন্তু অশোকস্তম্ভের মৌলিক স্থাপত্যরীতির সঙ্গে গ্রীক-স্থাপত্যের ঐক্যই বা কোথায়?

ফার্গুসনের যুক্তিকে নানাদিক থেকে খণ্ড-খণ্ড করার পরে রাজেন্দ্রলাল মিসেস ম্যানিংকে চ্যালেঞ্জ করেছেন—তিনি কোথা থেকে পেলেন, আলেকজাণ্ডার গ্রীকশিল্পী ভারতে রেখে গিয়েছিলেন? দিগ্বিজয়ী রাজা অভিযানের সময়ে স্থপতি বা ভাস্কর সঙ্গে নিয়ে যান বিজিত দেশে ছেড়ে আসার জন্য—অভিনব সংবাদ বটে। আলেকজাণ্ডারের ভারতে অবস্থানকাল মাত্র কয়েকমাস। ঐ সময়ে তিনি কেবলই ঘুরেছেন, এবং নিজের সামরিক কীর্তি দেখাতেই ব্যস্ত ছিলেন। ঐ কয়েক মাসের মধ্যে তিনি রক্ষণশীল এবং গর্বিত হিন্দুদের সামনে গ্রীকসভ্যতার

এমন মহিমা খুলে দেখালেন যে, তারা অভিভূত হয়ে অনুকরণ করতে আরম্ভ করে দিল!! এবং আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারীরা এমন পদার্থের ছিলেন না যে, তাঁরা অশোককে প্রভাবিত করতে পারবেন।

রাজেন্দ্রলালের যুক্তিতে যেসব আঙ্গিকগত বিচার ছিল, অপ্রয়োজনে সেগুলির উল্লেখ করলাম না। ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তির মূলে মিশর ও অ্যাসীরীর প্রভাবের প্রসঙ্গ আলোচনা ক'রে, এবং অ্যাসীরীয় রীতির সঙ্গে ভারতীয় রীতির ঐক্য কিছুটা স্বীকার করেও, তিনি শেষপর্যন্ত উক্ত দুই প্রভাবের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করেছেন।

রাজেন্দ্রলালের যুক্তিতর্ক ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের প্রধান বিশেষজ্ঞ ফার্গুসনকে একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রে দিয়েছিল। ফার্গুসনের প্রত্যুত্তরে যুক্তির স্থান নিয়েছিল কটূক্তি—তার কিছু নিদর্শন আগেই দিয়েছি। রাগে গরগর করেও কিন্তু নানা প্যাঁচালো কথার ফাঁকে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল—রাজেন্দ্রলালের মতই ঠিক, গ্রীকঅভ্যুদয়ের আগেই ভারতে প্রস্তরস্থাপত্য ছিল। ১৮৭৫ সালে রাজেন্দ্রলালের *Antiquities of Orissa* বেরুবার পরের বছরে ফার্গুসনের *History of India and Eastern Architecture* বেরোয়। এর মধ্যে তিনি বেশ খানিক নরম হন। অশোকের আগে ভারতে কাষ্ঠস্থাপত্যের অতিরিক্ত প্রস্তরস্থাপত্যের অস্তিত্ব না মানলেও তিনি মেনে নেন যে, বাড়ির ভিত্তিতৈরীর কাজে, ইঞ্জিনীয়ারিং কাজে, প্রাচীর তোরণ সেতু প্রভৃতি তৈরীর কাজে, পাথর ব্যবহার করা হত। এবং সেই প্রাচীরের উচ্চতা কখনো-কখনো তিরিশ ফুটও হত—মেগাস্থিনিসের সাক্ষ্য থেকে তা জানা যায়। রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক তথ্যযুক্তির ভাষা অতঃপর বিদ্রুপের ধারলো ছুরির মতো হয়ে ফার্গুসনের অসংলগ্ন কথাগুলোকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিল।৩১

---

৩১ রাজেন্দ্রলালের উক্তি কিছু-কিছু উদ্ধার করা যাক :

"The Admission that the Indian did employ stone in building foundations of houses and in city walls, gates, bridges, and embankments from long before Asoka's time, goes a great deal further than what its author wished it to go. It throws on the author the onus of proving that men, who could, and did, build stone walls, confined their talent to city-walls and embankments, but could not, or did not, extend it to the superstructure of their houses; and having built a brick or stone foundation as high as the plinth, they encountered some obstacle, intellectual, material or artistic, to push it higher, and leaving it to the level of the ceiling, until taught to surmount it by Greek adventurers or their half-caste descendants. The admission drives the reader to the inference that the men who, according to Megasthenes, had build walls 30 feet high, round Palibothra, could not feel the advantage of having a masonery wall for their king's residence, or for the protection of his treasury. Such an inference is unjust to a nation whose inventive and intellectual faculties were second to those of no other race on earth, and which in the domain of philosophy attained an altitude which none has yet surpassed." [Indo-Aryans]

ফার্গুসনের করুণ অবস্থা ক্রমেই দেখা গেছে এ ব্যাপারে। তথ্যের ও যুক্তির চাপে তিনি ক্রমেই রাজেন্দ্রলালের মত স্বীকার করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে নিজের গোঁ-নামক দুরন্ত শিশুটিকে সস্নেহে লালন ক'রে গেছেন। ফার্গুসনের দ্বিধাবিভক্ত রচনার নমুনা :

"It may of course, be disputed whether or not it was, in consequence of hints received from the Greeks that the Indians first adopted for architectural purposes; but the concidence is certain, and in the present state of our knowledge may be looked upon as an established fact. At the same time though it is almost equally certain that stone was used in India as a building material for

ফার্গ্‌ুসন শেষপর্যন্ত রাজেন্দ্রলালের মত পুরোপুরিই মেনে নিয়েছিলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ 'ইনস্টিটিউট অব ব্রিটিশ আর্কিটেকটস্' নামক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রীসের ক্লাসিক্যাল স্টাইল আফগানিস্থানের সীমাকে অতিক্রম ক'রে পূর্বদিকে আর একটুও অগ্রসর হতে পারেনি—কারণ সেখানে ছিল ভারতের নিজস্ব স্টাইল। সে স্টাইল তারা আমদানী করেনি—ভারতেই তা আবিষ্কৃত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত—সেই স্টাইল ভারত থেকে ছড়িয়েছিল সারা ইন্দোচীনে।৩২

ফার্গুসনের ঐ স্বীকারোক্তি পাবার পরে রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন—আমি তো এতদিন ঐ কথাই বোঝাতে চেয়েছি—ভারতের স্থাপত্য 'self-evolved and self-sutsained.'

ভারতীয়রা গ্রীকদের কাছেই প্রস্তরস্থাপত্য শিখেছিল—ফার্গুসন-প্রভৃতির এই দাবী একেবারে নস্যাৎ হয়ে যাবার পরে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য ইউরোপের মর্যাদারক্ষার শেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করল ভাস্কর্যকে। সুতরাং ভাস্কর্য-ব্যাপারটি ভারতীয়রা অবশ্যই গ্রীকদের কাছ থেকে শিখেছিল, বিশেষতঃ যখন গান্ধারশিল্প নামক শিল্প-নমুনাগুলি রয়ে গেছে, যার মধ্যে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের কিছু স্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা যায়। আর গান্ধারক্ষেত্র যখন শিল্পে গ্রীক-বীজ নিয়েছে, ভারতের বাকি অংশ অসংযত না হয়ে পারে! জেনারেল কানিংহ্যাম স্থাপত্যের ব্যাপারে গ্রীকপ্রভাব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না, কিন্তু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে দাবিও ছাড়লেন না। তিনি লিখেছিলেন :

"I agree with Mr Fergusson in thinking that the Indians in all probability derived the art of sculpture from the Greeks. In the Punjab this would have been introduced as early as 300. B.C and in a few years it would have found its way to the great capital of Palibothra. I speak now only of the sculptor's art, not of the masons trade, for I do not suppose that building with stone was unknown to the Indians at the time of Alexander's invasion. [*Arch. Surv. Report III*]৩৩

কানিংহ্যাম আরও বেপরোয়া হয়ে বলেছেন : "অশোকের যুগেই বুদ্ধগয়ার ভাস্কর্যের আবির্ভাব হয়েছে—এই তথ্য, আমার মতে, অনুমাননির্ভর এই প্রবল প্রমাণের সৃষ্টি করেছে —ভারতীয়রা ভাস্কর্যশিল্প শিখেছে গ্রীকদের কাছ থেকেই। এই বিষয়টি প্রতিদিনই নূতন প্রমাণ লাভ করছে যে, ভাস্কর্য, উত্তম ভাস্কর্য তো নিশ্চয়ই, ঠিক সেইসময়ে অকস্মাৎ ভারতে আবির্ভূত হয়েছিল, যখন গ্রীকরা কাবুলের অধীশ্বর ছিল। এবং এও দেখা যাচ্ছে, ভারতের ভাস্কর্যশিল্প তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল ভারত-সিথিয়ান শাসনরূপ অর্ধ-গ্রীক শাসন-

engineering purposes and for foundations, yet it is quite certain that nothing that can properly be called architecture is to be found there till considerably after Alexander's time."

৩২ ফার্গুসন বলেছিলেন :

"It is quite certain that the classical style with which it [Afgan style] is mixed, never penetrated—except sparodically—beyond the Indus. It was there met by a style with which we are perfectly familiar in the third century before Christ and from that time onwards. It is perfectly Indian and original, and if never carried westward out of India, it certainly never was imported. In was invented and perfected in India and spread eastward through the whole Indo-Chinese countries." [Quoted in *The Indo-Aryans*]

৩৩ *Ibid.*

কালে। তারপর যতই তা গ্রীকযুগ থেকে সরে যেতে থাকে ততই তার পতন ঘটতে থাকে, এবং সেই পতন চরমে পেঁছিয় ব্রহ্মণ্য মন্দিরগুলির দারুময় তুচ্ছতা ও পাশবিক অশ্লীলতার মধ্যে।"

ভারতীয় ভাস্কর্য-বিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রে ফার্গুসন কিন্তু কানিংহ্যামের মতো নিরেট সাহসী ছিলেন না। গ্রীকপ্রভাব সম্বন্ধে হৃদয়দৌর্বল্যের কথা বাদ দিলে, তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যের নিজস্ব স্টাইলের অনুরাগীই ছিলেন। শিল্পরীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাস্কর্যকে তাঁর এতই মৌলিক ও স্থানীয় বর্ণ-রস-সমন্বিত মনে হয়েছিল যে, পাশ্চাত্ত্য শিল্পের সঙ্গে তার তুলনা করা কঠিন দেখেছিলেন। ভারতীয় ভাস্কর্য অবশ্যই গ্রীকভাস্কর্যের চেয়ে নিম্ন-স্তরের (গ্রীক আর্টের সর্বোচ্চতার ধারণা নিয়েই পাশ্চাত্ত্যবাসী ভূমিষ্ঠ হয়), কিন্তু ফার্গুসন তাকে মিশরীয় ভাস্কর্যের উপরে স্থাপন করেছিলেন, এবং অমরাবতীর ভাস্কর্যকে সমকালীন কনস্টানটাইনের অধীন রোমক ভাস্কর্যের সমতুল মনে করেছিলেন, কিংবা মনে করেছিলেন, তা ইতালীয় রেনেসাঁসের আদিপর্বের গিবার্টির (Ghiberti) সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয়। ভারতীয় ভাস্কর্যের কিছু নিদর্শনকে ফার্গুসন সর্বোচ্চ শিল্পসৃষ্টি মনে করতেন, একথা মিস লককে লেখা স্বামীজীর চিঠি থেকে আগেই দেখে এসেছি।

এখানে অধিকন্তু স্বীকার্য, ভাস্কর্যের শিল্পমূল্য বিচারের ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল অপেক্ষা ফার্গুসন অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। রাজেন্দ্রলালের প্রত্নতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্য যতখানি ছিল, শিল্পদৃষ্টি ততখানি উন্নত ছিল না, অন্ততঃ তাঁর লেখায় তার যথেষ্ট পরিচয় নেই। ভাস্কর্যের বিচার যখন করেছেন তখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি বিচারকে ছেড়ে সামগ্রিক সৃষ্টি-সৌন্দর্যের মূল্যায়নে তিনি উঠতে পারেন নি। ভারতীয় স্থাপত্যের মতো ভারতীয় ভাস্কর্যেও গ্রীকপ্রভাব নেই (যেমন উদয়গিরির বা ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্যে)—এই কথা প্রমাণের চেষ্টাতেই তাঁর শক্তি নিয়োজিত ছিল; উল্টোপক্ষে তিনি ভারতীয় শিল্পের তুলনায় গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কথা অগ্রিম মেনেই নিয়েছিলেন। উদয়গিরির ভাস্কর্যে গ্রীকপ্রভাব নেই, তা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি গ্রীকভাস্কর্যের উৎকর্ষের তুলনায় উদয়গিরিব ভাস্কর্যের আপেক্ষিক অপকর্ষকে অন্যতম কারণরূপে দাঁড় করিয়েছিলেন।৩৪

॥ ৯ ॥ স্বামীজী রাজেন্দ্রলালকে কোথায় গ্রহণ করেছেন এবং কোথায় আরও অগ্রসর হয়েছেন : স্বামীজী কর্তৃক হিন্দুশিল্প ও গ্রীকশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা

রাজেন্দ্রলাল যেখানে ভূমি ছেড়ে দিলেন, স্বামীজী সেখানেই এসে দাঁড়ালেন। হিন্দু-স্থাপত্যের উদ্ভবে গ্রীক-প্রভাবতত্ত্বকে সাফল্যের সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল দূর করেছিলেন, এবং সেই সিদ্ধান্তকে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গ্রীকভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে ইউরোপীয় ধারণাকে তিনি শেষপর্যন্ত মান্য করায় তাঁর পক্ষে শেষোক্ত ক্ষেত্রে বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে গ্রীসের আদি প্রভাবের কথা তখন বহু কণ্ঠে কথিত হচ্ছিলই। সেই সঙ্গে এও জানতে হবে, রাজেন্দ্রলালের ঐ বীরত্বপূর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংগ্রাম তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে প্রায় কোনো মূল্যই পায়নি, কারণ, প্রথমতঃ দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এইসব বিষয়ের চর্চা প্রায় ছিল না, দ্বিতীয়তঃ চর্চা যেখানে ছিল সেখানে শ্বেত পণ্ডিতমহাশয়দের প্রতি ভক্তিও অটুট ছিল।৩৫ এই পরি-স্থিতিতেই স্বামীজী ভারতীয় ভাস্কর্যে গ্রীক-প্রভাবতত্ত্বের খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছিলেন।

---

৩৪ *The Aniquities of Orissa,* Vol-II. Ch-1.

৩৫ যথা, রমেশ দত্তের মনে ভারতীয় শিল্পের তুলনায় গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিল না। প্রবাসীর শ্রাবণ, ১৩০৮ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের শিল্প'-এর মধ্যে

তাঁর সে-কাজ আদি কাজ না হলেও, এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে অতীব প্রয়োজনীয় কাজ হয়েছিল, এবং তারো বড় কথা, ঐ ধারণাটি তিনি এমন একজন মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়ে দিতে পেরেছিলেন যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পআন্দোলনের সময়ে উক্ত ধারণার পক্ষসমর্থনে নেতৃত্ব করবেন। আমি ভগিনী নিবেদিতার কথাই বলছি।

এবং স্বামীজী আরও এগিয়েছিলেন। তিনি একেবারে উল্টোপ্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি গ্রীকশিল্পে প্রাচ্যপ্রভাব পর্যন্ত কল্পনা করছিলেন, দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু-ভাস্কর্যকে গ্রীকভাস্কর্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলেছিলেন। এটা চাকার একেবারে উল্টোপাক, এবং যথেষ্ট বৈপ্লবিক বক্তব্য। প্রথমোক্ত বক্তব্যটি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা বলতে পারব না, কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্যের আংশিক স্বীকৃতি ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। স্বামীজী যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় ভাস্কর্যকে শ্রেষ্ঠতর বলেছেন, তাকে এখন অনেকেই মেনে নিচ্ছেন।

স্বামীজী তাঁর শেষোক্ত ধারণাগঠনের সময়ে অনেককেই ত্যাগ করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালও ছিলেন। গ্রীকপ্রভাবতত্ত্ব খণ্ডনযুদ্ধে ভারতপক্ষে মহারথ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কি ভাবতে পেরেছিলেন—উল্টো দাবি করাও সম্ভবপর—ভারতের কাছেই গ্রীস ঋণী? ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কৃপাপূর্ণ প্রশংসাজীবিত ভারতীয় ভাস্কর্য গ্রীকভাস্কর্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আসন দাবি করবে—এও কি তাঁর কল্পনায় এসেছিল? রাজেন্দ্রলাল নিজে অন্ততঃ শেষোক্ত দাবির পক্ষে ছিলেন না, এবং আমাদের অনুমান, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বামী বিবেকানন্দের উপরে কিছুদিনের জন্য ক্ষতিকর প্রভাবরূপে বর্তমান ছিল। আমরা আগে দেখেছি, গ্রীকভাস্কর্যের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা স্বামীজীর মনে বহুদিন বজায় ছিল, যে-কথা তিনি দুঃখের সঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত ৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ তারিখে মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে স্বীকার করেছিলেন।

পাই : "নানাপ্রকার গৃহ, মন্দির ও গুহানির্মাণে যে, প্রাচীন আর্যদিগের বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বৌদ্ধযুগেই ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নতি হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্করগণ নিজ নিজ নৈপুণ্যের অনেক স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। **কিন্তু তাহারা এ-বিষয়ে কখনও গ্রীকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। গ্রীকভাস্করেরা মানুষ ও দেবদেবীর মূর্তিতে সৌন্দর্যের যে-আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পিগণ তাহার নিকটে যাইতে পারেন না।**.. মন্দিরাদির গঠনপ্রণালী এবং তাহাদের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্বন্ধেও এইসকল কথা খাটে। ইহা ফার্গুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্পসমালোচকগণের মত। **শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তও এই মতে সায় দিয়াছেন।** তিনি বলেন, কপিল ও কালিদাসের দেশে প্রতিভার অভাব ছিল না। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরা ক্রমে ব্যবসায়ে বিমুখ হইয়া পড়ায়, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিতকলাগুলি নিম্নশ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় প্রতিভার পরিচয় কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? বার্ডবুড্ সাহেব আরও একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুদের পৌরাণিক অনেক দেবদেবী এবং তাঁহাদের অবতারগণের মূর্তি অস্বাভাবিক। হিন্দু-শিল্পিগণ ধর্মভাবের প্রেরণায় তাঁহাদের ভাস্কর্য ও চিত্রে অন্ধভাবে পুরাণোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করিয়াছেন, সৌন্দর্য সৃষ্টির চিন্তা তাঁহাদের মনে আসে নাই।" [স্থূললিপি লেখক নির্দেশে]

রমেশ দত্ত, তাঁর *Ancient India* : *B.C.* 2000 *to A.D.* 800 গ্রন্থে লিখেছিলেন :

"Architecture, sculpture and painting are almost forgotten arts in India. The Hindus, even in their best days, could never equal the Greeks in these arts The caste system of India divorced intellect and genius from manual labour, and permitted only low caste man to engage themselves in the arts. Displaying much ingenuity and industry and even elegance and beauty, Hindu art lacks the higher aesthetic quality of the Greek Art, and a Phidias or a Praxiteles was impossible among the low castes of India who were alone allowed to engage in architecture and sculpture." [Quoted in *Madras Mail,* Oct. 7, 1893]

স্বামীজীর সর্বশেষ ধারণার প্রথম প্রকাশ কবে দেখা যায়? এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তদনুযায়ী ১৮৯৬, ২৮ মে, ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে লণ্ডনে আলোচনাকালেই স্বামীজীকে তাঁর ঐ ধারণার কথা প্রথম বলতে দেখা গেছে। স্বামীজী তাঁর শিল্পীবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে এ-বিষয়ে যা বলেছিলেন, তার বিবরণ প্রিয়নাথ তাঁর 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র নভেম্বর, ১৯০৬ সংখ্যার প্রবন্ধে দিয়েছেন। তারই কিছু অংশ :

"ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে তাঁর [স্বামীজীর] কথোপকথনকালে ভারতীয় স্থাপত্য অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। অধ্যাপকের মত ছিল, বৌদ্ধস্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে গ্রীক-সৃষ্টির কিছু ঐক্য আছে, এবং গ্রীকদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল—তাই বলা যায়, হয়তো ভারতবর্ষ গ্রীকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্বামীজী তীক্ষ্ণ উত্তর দেন—'যদি গ্রীকদের ভারতে নিছক উপস্থিতিই ভারতীয় স্থাপত্যের উপর তাদের প্রভাবের একমাত্র প্রমাণ হয়, তাহলে সেই একই যুক্তি ফিরিয়ে দিয়ে বলা যায়, গ্রীকশিল্প ভারতের কাছে ঋণী। বৌদ্ধযুগের শিল্পের সঙ্গে গ্রীকশিল্পের কোনো সাদৃশ্য নেই। গ্রীকরা বহির্বস্তুর রূপায়ণে চরম পারদর্শী, আর ভারতীয় ভাস্কর্য অন্তঃপ্রকৃতির উদ্‌ঘাটনে ইচ্ছুক—তার জন্য বাস্তবতাকে বলি দিতেও প্রস্তুত। শারীরসংস্থানের খুঁটিনাটির রূপায়ণে গ্রীকরা অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন; অপরপক্ষে ভারতীয়রা তাকে প্রায় কোনো মূল্য না দিয়ে মানসিক অবস্থাকে উন্মোচন করতে ব্রতী। ভারতে প্রাচীনকালে প্রতি ভাস্করই নিপুণ মিস্ত্রী; গয়া জেলায় তার সাক্ষ্য এখনো মিলবে। গয়ার কিছু মন্দির নির্মাণের সময়ে অযোধ্যা থেকে ব্রাহ্মণজাতীয় ভাস্কর-মিস্ত্রী আনা হয়েছিল, যাদের বংশধরেরা এখনো সেই জেলার গ্রামে বাস করে এবং একই বৃত্তিধারী হয়ে আছে। যদি গ্রীকরা আমাদের স্থাপত্য শিখিয়ে থাকে, তাহলে তারা আমাদের ভাস্কর্যের দোষগুলি সংশোধন করল না কেন, যখন দেখলে ভারতীয় স্থাপত্য ঢাকা পড়ে আছে মূর্তিতে? গ্রীকরা আসলে ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই, শিল্প বা বিজ্ঞান শেখাতে নয়। **ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প গ্রীসের চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের, কারণ ভারতীয় সৃষ্টি সব সময়েই একটা ভাবকে প্রকাশ করতে ব্রতী, গ্রীকস্থাপত্য যা করেনি।**"

ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প কিভাবে ভাবপ্রকাশ ক'রে থাকে, সে-বিষয়ে স্বামীজী ঐসঙ্গে আরও যা বলেছিলেন প্রিয়নাথ সিংহের বিবরণে তার রূপ : "ভারতে স্থপতি, মুসলমান স্থপতিও, কোনোও একটি ভাবপ্রকাশে বিরত নয় কখনো। রাজপুতানায় ভ্রমণকালে স্বামীজী আলোয়ারের একটি মিনারের ভাবপ্রকাশক অনবদ্য সৌন্দর্যে মোহিত হয়েছিলেন। তাজমহল দেখে বলেছিলেন, এই মর্মরের যে-কোনো অংশ পেষণ করলেই রাজহৃদয়ের প্রেম ও যাতনা বিন্দু-বিন্দু ঝরে পড়বে। লোকে বলে, কলকাতা নাকি প্রাসাদনগরী। রাম কহো! বাড়িগুলো বাক্সের মতো—একের পর এক সাজানো—ভাব বলে একটুও কিছু নেই। রাজপুতানায় এখনো খাঁটি হিন্দুস্থাপত্যের স্বাক্ষর মেলে। কোনো ধর্মশালার দিকে তাকালে মনে হবে, তা যেন হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছে তার উদার আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য; মন্দিরের দিকে তাকালে মনে হবে, তার ভিতর-বাহির দেবভাবে পূর্ণ। গ্রামের কুটীর তার সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা বক্তব্য প্রকাশ করছে—গৃহস্বামীর মনটিকে সে যেন খুলে ধরেছে। এই ধরনের ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্য আর মাত্র দেখেছি ইতালিতে।"

প্রিয়নাথ সিংহ লিখেছেন, "ইতালীয় শিল্পের প্রতি স্বামীজীর গভীর অনুরাগ ছিল।"

প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে স্বামীজীর এই আলোচনা কবে হয়েছিল?—স্বামীজীর স্বদেশে প্রথম প্রত্যাবর্তনের পরে অর্থাৎ ১৮৯৭-৯৮-এর মধ্যে, কিংবা দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের পরে অর্থাৎ ১৯০১-১৯০২-এর মধ্যে কোনো সময়ে? আলোচনাকালের উল্লেখ প্রিয়নাথ করেননি। কিন্তু প্রথম পর্বেও হতে পারে, যদিও দ্বিতীয় পর্বেই হওয়া সম্ভব, কারণ দ্বিতীয়বার

বিদেশ-ভ্রমণের সময়েই তিনি গ্রীকস্থাপত্য-ভাস্কর্যকে কেবল মিউজিয়ামে নয়, একেবারে গ্রীসের ভূমিতে দাঁড়িয়েই দেখেছিলেন, কিন্তু তার আগেই যে, সে-শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বদলাতে আরম্ভ করেছে, তা ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আলোচনায়, এবং ১৮৯৭-এর জানুয়ারির গোড়ায় মিস লককে লেখা চিঠি থেকে দেখতে পাই।

ভারতশিল্প ও গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কিভাবে সর্বশেষ পরিণতি পেয়েছিল, তার কিছু পরিচয় ভগিনী নিবেদিতার রচনায় পাওয়া যায়। স্বামীজী ৫ নভেম্বর ১৮৯৭, লাহোরে পেঁছে দশ-বারো দিন ছিলেন। এইকালের মধ্যে তিনি লাহোর মিউজিয়াম দেখেন—সেখানে গান্ধারশিল্প-নমুনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎপরিচয় ঘটে, এবং তার ফলেই স্বামীজী তাঁর সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেন—ভারতের আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের পক্ষে যে-সিদ্ধান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ। নিবেদিতা ১৪ জুন ১৮৯৮-এর ডায়েরীতে পূর্ববৎসরে স্বামীজী পূর্বোক্ত বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে লিখেছেন :

"স্বামীজী আমাদের নিকট গান্ধার ভাস্কর্যের বর্ণনা করিলেন। সেগুলিকে তিনি নিশ্চয় পূর্ববৎসরে লাহোর মিউজিয়ামে দেখিয়াছিলেন। শিল্পবিষয়ে শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষ কোনোদিন গ্রীসের চরণতলে বসিয়াছিল—এই ইউরোপীয় থিয়োরী খণ্ডন করিতে তিনি ঘৃণাপূর্ণ উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেন।" ['স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে']

স্বামীজীর মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট কালনির্দেশ উপরে পেলাম। এর সওয়া দু'বছর পরে স্বামীজী প্রকাশ্যে পণ্ডিতদের সভায় তাঁর মনোভাব প্রকাশ করবেন। তা করেছিলেন ১৯০০ সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় 'প্যারিস ধর্মেতিহাস সভায়'।

প্যারিস ধর্মেতিহাস সভায় স্বামীজী কোনো রচনা পাঠ করেননি, মৌখিক বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতার যে-সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তিনি স্বয়ং লিখে পাঠিয়েছিলেন, তাই এতদিন আমাদের অবলম্বন ছিল। সম্প্রতি স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ 'প্যারিসে বিবেকানন্দ' পর্যায়ে কিছু গবেষণা করেছেন, এবং ধর্মেতিহাস সভার মুদ্রিত বিবরণী থেকে স্বামীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত কিছু উল্লেখ উদ্ধৃতও করেছেন, কিন্তু শিল্পপ্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের ক্ষেত্রে সেখান থেকেও নতুন কিছু পাই না। অথচ শিল্পবিষয়ে উক্ত সভায় কথিত স্বামীজীর বক্তব্য আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। এক্ষেত্রে উপায়ান্তরহীন হয়ে স্বামীজীর পাঠানো বিবরণীর প্রাসঙ্গিক অংশের উল্লেখ করতে হচ্ছে। স্বামীজী উক্ত সভায় কেবল শিল্পের উপরে নয়, ভারতীয় সকল বিদ্যার উপরেই গ্রীকপ্রভাব আছে—এই তত্ত্বের নিরাকরণ করতে চেয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, অনেক ভারততাত্ত্বিক ইউরোপীয় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, এবং স্বামীজী কার্যতঃ চ্যালেঞ্জের সুরে কথা বলেছিলেন। স্বামীজীর তীব্র মনোভাবের কারণ—তিনি ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের মধ্যে কোনো সংযমের লক্ষণ তো দেখেননি, উপরন্তু নূতন বিসদৃশ দাবি উপস্থিত করার প্রগল্‌ভতা দেখেছিলেন। যেমন, পূর্ববর্তী একটি সভায় ওপার্ট নামক জনৈক জার্মানপণ্ডিত শালগ্রাম সম্বন্ধে 'অশ্রুতপূর্ব ও অপ্রাসঙ্গিক' যৌনব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন, যার খণ্ডনও স্বামীজী করতে চেষ্টা করেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা কিভাবে ভারতের ঘাড়ে নির্বিচারে গ্রীসকে চাপাতে ব্যস্ত সে-সম্বন্ধে স্বামীজী উক্ত 'পারি প্রদর্শনী' নামক রচনায় লিখেছিলেন :

"কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভারতীয় জ্যোতিষের কয়েকটি সংজ্ঞা গ্রীকজ্যোতিষের সংজ্ঞার সদৃশ দেখিয়া এবং গ্রীকরা ভারতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল অবগত হইয়া, ভারতের যাবতীয় বিদ্যায়—সাহিত্যে, জ্যোতিষে, গণিতে—গ্রীকসহায়তা দেখিতে পান। শুধু তাহাই নহে, একজন অতিসাহসিক লিখিয়াছেন যে, ভারতের যাবতীয় বিদ্যা গ্রীকদের বিদ্যার ছায়া!!"

যেসব যুক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় বিদ্যার উপরে গ্রীকপ্রভাব কল্পনা করেন, সেইসব যুক্তির ফাঁকি দেখিয়ে দেবার পরে স্বামীজী লিখেছেন :

"ঐ প্রকার কালিদাসাদি কবি-প্রণীত নাটকে 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্য-নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি (আপতিত?) হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্যনাটক গ্রীকনাটকের সদৃশ কিনা? যাঁহারা উভয় ভাষার নাটক রচনা-প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে ঐ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনাজগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিনকালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্যনাটকে ঠিক তাহার বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্যনাটক আর এক।

"আর্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীকনাটক আদৌ তো নাই, বরং শেক্সপীয়র-প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি-ভূরি সৌসাদৃশ্য আছে। অতএব এমনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, শেক্সপীয়র সর্ববিষয়ে কালিদাসাদির নিকট ঋণী এবং সমগ্র পাশ্চাত্ত্যসাহিত্য ভারতের সাহিত্যের ছায়া।

"শেষ—পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের আপত্তি তাঁহারই উপর প্রয়োগ করিয়া ইহাও বলা যায় যে, যতক্ষণ ইহা না প্রমাণিত হয় যে, কোনো হিন্দু কোনোকালে গ্রীকভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, ততক্ষণ ঐ গ্রীকপ্রভাবের কথা মুখে আনাও উচিত নয়।

"তদ্বৎ আর্যভাস্কর্যে গ্রীকপ্রাদুর্ভাব-দর্শনও ভ্রম মাত্র।"

শিল্পপ্রসঙ্গে স্বামীজীর রিপোর্ট মাত্র একলাইন থাকলেও স্বামীজী নিশ্চয় ব্যাপারটি নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন—কী বলেছিলেন তা অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই, এবং অনুমানের ভিত্তি ইতিমধ্যেই আমরা রচনা ক'রে এসেছি—রাজেন্দ্রলালের যুক্তি ও স্বামীজীর অন্যত্র-প্রকাশিত মনোভাবের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে।

স্বামীজী যখন প্যারিসের ধর্মেতিহাস সভায় উপরিকথিত বিষয়ে বলছিলেন, ঠিক তারই কাছাকাছি সময়ে পুনশ্চ লুভারে গিয়ে গ্রীকশিল্পকলার নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করছিলেন। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ-সম্বন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোট দেওয়া আছে—খুবই দুঃখের বিষয়, ঐ নোটকে পূর্ণাঙ্গ রচনার আকার তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। এই ডায়েরী-নোটের মধ্যেই দেখা যায়, স্বামীজী গ্রীকশিল্পের প্রথমপর্যায়ে প্রাচ্যপ্রভাব অনুমান করেছেন।

স্বামীজী উক্ত নোটে লিখেছেন : "[লুভার] মিউজিয়াম দেখে গ্রীক-কলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম।" [৬-১৪২]। এই তিন অবস্থার প্রথম অবস্থার সময় হল প্রাচীন অজ্ঞাত-কাল থেকে খ্রীস্টপূর্ব ৭৭৬ পর্যন্ত; দ্বিতীয়পর্ব ৭৭৬ খ্রীস্টপূর্বকাল থেকে ১৪৬ খ্রীস্ট-পূর্বকাল পর্যন্ত; তৃতীয়পর্ব ১৪৬ খ্রীস্টপূর্ব থেকে পরবর্তীকাল। প্রথম পর্ব অর্থাৎ ৭৭৬ খ্রীস্টপূর্বকাল পর্যন্ত সময়ের গ্রীকশিল্পকে 'মিসেনি' শিল্পের কাল বলা হয়। স্বামীজী বলতে চান—এই প্রথম পর্ব অর্থাৎ মিসেনিপর্বে গ্রীকশিল্প প্রাচ্যপ্রভাবে গড়ে উঠেছিল। গ্রীসের "আচেনি রাজ্য—সন্নিহিত রাজ্যে অধিকার বিস্তার করেছিল, আর সেইসঙ্গে ঐ সকল দ্বীপে প্রচলিত, এশিয়া হতে গৃহীত সমস্ত কলাবিদ্যারও অধিকারী হয়েছিল। এইরূপেই প্রথম গ্রীসে কলাবিদ্যার আবির্ভাব।" স্বামীজী বলতে চেয়েছেন, "প্রধানতঃ এশিয়া-শিল্পের অনুকরণে ব্যাপৃত" ঐকালীন মিসেনিশিল্প খাঁটি গ্রীকশিল্প নয়।

খ্রীস্টপূর্ব ৭৭৬-১৪৬ পর্যন্ত সময়ের দ্বিতীয় পর্বকে স্বামীজী খাঁটি গ্রীকশিল্পের কাল বলেছেন। তা বলার কারণ, এইকালে গ্রীকশিল্প "এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ চেষ্টা" আরম্ভ করেছিল। এশিয়া-শিল্প বাস্তবের অনুকরণ চেষ্টা করে না, আর গ্রীকশিল্পের লক্ষণ—"প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যাথাতথ্য জীবন্ত ঘটনা-সমূহের বর্ণনা।"

এই দ্বিতীয় অর্থাৎ হেলেনিক পর্ব আবার তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম, 'আর্কেইক গ্রীকশিল্প', সময় ৭৭৬-৪৭৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। এই পর্বের শিল্প-সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য : "এখনো মূর্তিগুলি শক্ত (stiff), জীবন্ত নয়। ঠোঁট অল্প খোলা, যেন সদাই হাসছে। এ বিষয়ে ওগুলি ইজিপ্তের শিল্পীগঠিত মূর্তির ন্যায়। সব মূর্তিগুলি দু'পা সোজা ক'রে, খাড়া হয়ে (কাঠ হয়ে) দাঁড়িয়ে আছে। চুলদাড়ি সমস্ত সরলরেখাকারে (regular lines) খোদিত; বস্ত্র, সমস্ত মূর্তির গায়ে জড়ানো, তালপাকানো পতনশীল বস্ত্রের মত নয়।" দ্বিতীয় ভাগের নাম, "ক্লাসিক গ্রীকশিল্প"; সময় ৪৭৫-৩২৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দ অর্থাৎ "এথেন্সের প্রভুত্বকাল হতে আরম্ভ হয়ে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত।" গ্রীকশিল্পের এইটাই গৌরবযুগ। এই গৌরবের স্বরূপ বোঝাতে স্বামীজী জনৈক ফরাসী শিল্পবেত্তার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "ক্লাসিক গ্রীকশিল্প চরম উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোনোদেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই, বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে-কালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিষেধের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীকশিল্প সজীব হইয়া ওঠে।"

এই ক্লাসিক গ্রীকশিল্প গ্রীসের দুই রাজ্যে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম, আটিকা রাজ্যের সম্প্রদায় (এথেন্স যার প্রধান শহর), দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়ান রাজ্যের সম্প্রদায়। আটিকা সম্প্রদায়ের আবার দুই ভাব। একটি ভাব সৃষ্টি করেছিলেন "মহাশিল্পী ফিডিয়াস," যাঁর বিষয়ে স্বামীজী জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের অভিমত উদ্ধার করেছেন : "অপূর্ব সৌন্দর্য-মহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব যাহা কোনোকালে মানবমনে আপন অধিকার হারাইবে না।" দ্বিতীয় ভাবের প্রধান শিক্ষক স্কোপাস ও প্র্যাক্সিটেলেস। "এই সম্প্রদায়ের কার্য—শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত ক'রে কেবলমাত্র মানুষের জীবনবিবরণে নিযুক্ত রাখা।" ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের দ্বিতীয় সম্প্রদায়—পিলোপনেশিয়ান সম্প্রদায়ের প্রধান দু'জন পলিক্লেটাস (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) এবং লিসিপাস (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ)। "এঁদের প্রধান লক্ষ্য—মানবশরীরের গড়ন-পরিমাণের আন্দাজ (proportion) শিল্পে যথাযথ রাখার নিয়ম প্রবর্তিত করা।"

স্বামীজী বলেছেন, খ্রীঃ-পূঃ ৩২৩—১৪৬ পর্যন্ত সময় ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের অবনতি-কাল। এর আরম্ভে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু, শেষে রোমানদের দ্বারা আটিকা বিজয়। "জাঁক-জমকের বেশি চেষ্টা এবং মূর্তিসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করবার চেষ্টা, এই সময়ে গ্রীকশিল্পে দেখতে পাওয়া যায়।" গ্রীকশিল্পের তৃতীয় পর্যায় খ্রীঃ-পূঃ ১৪৬ থেকে পরবর্তীকাল। এই একেবারে পতনকাল সম্বন্ধে স্বামীজী অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন : "রোমানদের গ্রীস অধিকার সময়ে গ্রীকশিল্প তদ্দেশীয় পূর্ব-পূর্ব শিল্পীদের কার্যের নকলমাত্র করেই সন্তুষ্ট। আর নূতনের মধ্যে, হুবহু কোনো লোকের মুখ নকল করা।"

গ্রীকশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস যেভাবে স্বামীজীর ডায়েরী-নোটে পাচ্ছি, সন্দেহ নেই, তা করা হয়েছিল বিশেষজ্ঞরচিত শিল্পের ইতিহাসগ্রন্থেরই অনুসরণে। ঐ নোটের উপর নির্ভর করে স্বামীজী যদি প্রবন্ধ রচনা করতেন তাহলে বলাই বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিগত মতামত যথেষ্ট পেতাম। তাহলেও, ঐ সংক্ষিপ্ত ডায়েরী-নোটের ভিতর থেকেই, স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির চেহারা পাই। গ্রীকশিল্পের আদিতে তিনি প্রাচ্যপ্রভাবের কথা বলেছেন বটে কিন্তু কদাপি তাকে গ্রীকশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কারণরূপে দাঁড় করাননি, বরং বলেছেন, ঐ প্রভাব ত্যাগ করার ফলেই গ্রীকশিল্প নিজ মহিমা লাভ করেছিল। স্বামীজী সবসময়েই স্বাধীন আত্মপ্রকাশের পক্ষে; বাইরের প্রভাব গ্রহণের বিরোধী তিনি নন, কিন্তু সে প্রভাব যাতে

জাতীয় প্রবণতাকে উৎপাটিত না করে, সে-বিষয়ে সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন। সুতরাং তিনি গ্রীক-শিল্পের শ্রেষ্ঠ মহিমা তখনই দেখলেন যখন তা প্রাচ্যপ্রভাবমুক্ত। খ্রীঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীকশিল্প, "বিধিনিষেধের বহির্ভূত" হয়ে সগৌরবে বিকশিত হয়েছিল। এইকালের শিল্পের মধ্যেই তিনি ভাববিকাশের চেষ্টা ও তার সাফল্য দেখেছিলেন (যেমন ফিডিয়াসের রচনার মধ্যে)। অপরদিকে যে-সব গ্রীকশিল্পী-সম্প্রদায় নিছক প্রকৃতির অনুকরণ করাকেই লক্ষ্য বলে ধরেছিল, তাদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অধিক সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ অনুরাগহীন।

গ্রীকশিল্পের সামগ্রিক শক্তি ও সৌন্দর্যমহিমা স্বীকার করার পরেও আমরা দেখব, শেষপর্যন্ত স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টি ঐ শিল্পকে সর্বোচ্চ নমস্কার জানাতে পারেনি। তাঁর কাছে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ শিল্প, যা স্বাভাবিকতা বজায় রেখেও সর্বাধিক ভাবপ্রকাশ করতে সমর্থ, এবং যেহেতু আধ্যাত্মিকতাই তাঁর কাছে ভাবের শিখর, তাই—আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশে সমর্থ শিল্পই সর্বোচ্চ শিল্প। সুতরাং রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছিলেন :

"পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাহের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল, সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভ-রূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"মানুষ যে জিনিষটি তৈরী করে, তাতে কোনো একটা আইডিয়া এক্‌স্‌প্রেস্‌ করার নামই আর্ট। যাতে আইডিয়ার এক্‌স্‌প্রেসন্‌ নেই, তাতে রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাট্য থাকলেও তাকে প্রকৃত আর্ট বলা যায় না।...যে জাতটা বড় মেটিরিয়ালিস্‌টিক, তারা নেচারটাকেই আইডিয়াল বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের এক্‌স্‌প্রেসন্‌ই শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে-জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই আইডিয়াল বলে ধরে, সেটাকে সে নেচার-এর শক্তি সহায়ে শিল্পে এক্‌স্‌প্রেস্‌ করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতদের নেচারই হচ্ছে primary basis of art, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর আইডিয়ালিটি হচ্ছে শিল্প-বিকাশের মূল কারণ। এইরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীতে প্রায় একই দাঁড়িয়েছে—উভয়েই আপন-আপন ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ওসব দেশের এক একটা ছবি দেখে সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালের স্থাপত্যবিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক একটি মূর্তি এই জড়প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে।"

পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশে ভারতীয় শিল্পের সাফল্য সম্বন্ধে স্বামীজী প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন : "গ্রীকরা কখনই যীশুর অন্তর্জীবনের রহস্য অনুধাবন করেনি। তা যদি করত তাহলে কখনই তাঁকে অমন পেশীযুক্ত ক'রে দেখাতে পারত না। উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মানুষের শরীর কখনই পেশল হয় না। এক্ষেত্রে বুদ্ধমূর্তির বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। কোনো জাতির শিল্প পরীক্ষা করলেই তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকজাতি যে কখনো উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উঠেছিল, শিল্পে তার সামান্য পরিচয়ও নেই। অপরপক্ষে, ভারতীয় শিল্প শুধু আধ্যাত্মিক ভাবের অনুসরণ ক'রে বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে ক্রমে অধঃপতিত হয়েছে।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পসংস্কৃতির পার্থক্য বিচারে স্বামীজীর প্রতিভার ঝলক বারে-বারে দেখা গেছে। নিবেদিতার স্মৃতিকথা থেকে তেমনি একটি প্রদীপ্ত অথচ সুগভীর বিবরণ উদ্ধৃত করা যায়। নিবেদিতা লিখেছেন :

"আমাদের অর্থাৎ খ্রীস্টানদের মধ্যে প্রচলিত 'যন্ত্রণাপূজা'র সম্বন্ধে স্বামীজীর ঘৃণাপূর্ণ মনোভাবের ভিতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে ভারতীয়দের স্বচ্ছ চিন্তার রূপ। পাশ্চাত্ত্যে অনেকে

তাঁকে বলেছিলেন, বুদ্ধের মহিমার আবেদন অনেক বেশি হত যদি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হতেন। এটাকে 'রোমক পাশবিকতা' বলে চিহ্নিত করতে তাঁর কোনো দ্বিধাই ছিলনা। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, চমকপ্রদ ঘটনার বা কর্মচাঞ্চল্যের প্রতি ঐ হল সর্বনিম্নস্তরের অতিজান্তব পক্ষপাত। ঐ জন্যই পৃথিবীর মানুষ এপিক কাব্যকে সর্বদা অত ভালবাসে। ভারতের সৌভাগ্য, সে 'খাড়া গভীর অন্ধ গহ্বরে হেঁটমুণ্ডে নিক্ষিপ্ত'-বিষয়ের কবি মিলটনকে কদাপি সৃষ্টি করেনি। ঐ গোটা কাব্যটার বদলে ব্রাউনিংএর কয়েকটি লাইনও যথেষ্ট ক্ষতি-পূরণ। স্বামীজীর মতে, খ্রীস্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া-রূপ ঘটনার এপিক উগ্রশক্তিই রোমকদের মনকে নাড়া দিয়েছিল—রোমান জগতে খ্রীস্টধর্মকে ঐ ঘটনাই বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 'ঠিক! ঠিক!' তিনি যোগ করে দিলেন, 'পাশ্চাত্যের লোক, তোমরা চাও অ্যাকশন্—তোমরা জীবনের প্রতিটি সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে যে কবিত্ব রয়েছে, তাকে বুঝতে চাও না! তরুণী-মাতা, তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে এসেছিলেন সেই ঘটনার থেকে বেশি সৌন্দর্য আর কোন ঘটনায় সম্ভব? কিংবা বুদ্ধ-কর্তৃক ছাগশিশুর জীবনরক্ষার ঘটনাটি। দেখো, বুদ্ধের সংসারত্যাগের বিরাট ঘটনাটি ভারতের কাছে কিছু অভিনব নয়। গৌতম ছোট একটি রাজ্যের রাজার ছেলে—অমন সম্পদ আগে অনেকবার অনেকে ত্যাগ ক'রে গেছেন। কিন্তু নির্বাণের পর?—কী কবিত্ব তখন—

"'বর্ষণমুখর রাত্রি; এক গোপের কুটীরে এসে ছাঁচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেঁষে তিনি [বুদ্ধ] দাঁড়িয়েছেন; অবিরল জল পড়ছে, ক্রমেই প্রবল হচ্ছে বায়ু।

"'ভিতর থেকে গোপ জানালা দিয়ে চকিতে একটি মুখ দেখতে পেল; মনে মনে বলল, হাঃ হাঃ গেরুয়াধারী! বটে! ওখানেই থাকো তাহলে, তোমার পক্ষে ওটাই যথেষ্ট ভাল ঠাঁই। তারপর সেই গোপ গাইতে লাগল, 'আমার গোরু-বাছুর ঘরে উঠেছে; এখানে আগুন জ্বলছে ভালভাবে; আমার পত্নী নিরাপদ; সুখে-ঘুমোচ্ছে বাচ্ছারা। সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পারো।'

"'বুদ্ধ বাইরে থেকে উত্তর দিলেন, 'মন আমার সংযত, ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত, হৃদয় আমার দৃঢ়, সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পারো।'

"'গোপ আবার গাইল, ক্ষেতের ফসল কাটা হয়েছে, খড়গুলি খামারে ভালভাবে রাখা আছে, নদীতে ভরা জল, পথগুলি বেশ শক্ত। সুতরাং হে মেঘগণ, আজ রাত্রে স্বচ্ছন্দে তোমরা বর্ষণ করতে পারো।'

"এইভাবে চলতে লাগল। অবশেষে গোপ বিস্ময়ে ও অনুতাপে উঠে পড়ে বুদ্ধের কাছে গিয়ে শিষ্যত্ব নিল।" [দি মাস্টার]

।। ১০ ।। স্বামীজীর সমকালে ও কিছু পূর্বকালে ভারতের শিল্প-প্রয়াস : বিভিন্ন আর্ট স্কুল : হ্যাভেলের ভূমিকা

আলোচ্য পর্বে ভারতবর্ষের শিল্পচেষ্টার উপযুক্ত ইতিহাস, কিংবা তার সারসংক্ষেপ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। কেবল কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ এখানে পরিবেশন করতে পারি। ১৮৯৩-১৯০২ পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টে এ-বিষয়ে বেশ-কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি।

সাধারণভাবে বলতে পারি, এই সময়ের আগেই কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে ভারতে ও ইংলণ্ডে দু'একটি সংস্থা ভারতীয় শিল্পের, বিশেষতঃ কারুশিল্পের সংরক্ষণ ও সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছে।

কলকাতার আর্ট স্কুলের ইতিহাস লিখেছেন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল।৩৬ তার থেকে

৩৬ যোগেশচন্দ্র বাগল কলকাতার "গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট"-এর শত-

কিছু তথ্য এখানে সংকলন করে দিচ্ছি। অন্যান্য আর্ট স্কুলগুলি গোড়ার দিকে একই ধারায় চলেছিল, একথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি।

১৮৬৪ সালে কলকাতায় সরকারী আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা। তার আগে ১৮৩৯ সালে প্রধানতঃ ইউরেশিয়ান তরুণদের মেকানিক্যাল শিল্প শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'দি মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট।' স্বল্পায়ু এই প্রতিষ্ঠান। তারপর 'ইনডাসট্রিয়াল আর্ট'-এর উন্নতির জন্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি স্কুল অব ইনডাসট্রিয়াল আর্ট।' গরানহাটার এই বেসরকারী আর্ট স্কুলটিতে ক্লে মডেলিং ও এনগ্রেভিং-এর উপর বেশি জোর দেওয়া হত। এই প্রতিষ্ঠানই সরকারী আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয় ১৮৬৪ সালে—অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এইচ এইচ লক। লক-এর প্রেরণাপূর্ণ নেতৃত্বে বিদ্যালয়টির বিশেষ উন্নতি হয়। ছাত্ররা প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় নানা পুরস্কার পায়, বেসরকারী ও সরকারী প্রয়োজনে শিল্পকাজ করতে থাকে, যেমন এশিয়াটিক সোসাইটির কাজ, সরকারী ভবন ও গির্জার অলংকরণের কাজ, উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চিত্রাংকনের কাজ ইত্যাদি—সেইসংগে গ্রন্থ চিত্রণের কাজও। "বাঙালী শিল্পীরা উত্তম নকলকারী ভিন্ন আর কিছু নয়"—তৎকালীন ইউরোপীয় মহলে বলবৎ এই ধারণা লক পোষণ করেন নি বলেই তিনি ছাত্রদের উপযুক্ত পরিমাণে উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ, এবং বহুভাবে প্রশংসিত।৩৭

এই সমস্ত শিল্পসৃষ্টিতে কিন্তু ভারতীয়তা বা মৌলিকতা একেবারেই ছিল না। গোটা ব্যাপারটিই ছিল নকলনবিশি—হয় বিষয়ের, নয় রীতির। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যে-শিল্পচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল, তা ঐ প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে, এবং পরাধীনের হীনমন্যতাকে কাটিয়ে, সৃষ্টিশীলতার পথে অগ্রসর হতে পারেনি। ইউরোপীয় ছবির নকল করতে ছাত্রদের শেখানো হত, যাতে নাকি তারা স্বদেশীয় প্রকৃতি ও মানুষকে নিজস্বভাবে আঁকতে সমর্থ হবে। প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল—দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রায়শঃ নয়। ভারতীয় রীতি শেখানোর চেষ্টা যে আর্ট স্কুলে করা হয়নি তা নয়। কিন্তু ১৮৮৫-৮৬ খ্রীস্টাব্দে পাঠ্যসূচীতে খাঁটি ভারতীয়

বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে *History of the Govt. College of Art and Craft* নামে তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন।

৩৭ লক ১৮৭১-৭২ সালের রিপোর্টে বলেন, "বাবু অন্নদাপ্রসাদ বাগচী আমার জানা সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী শিল্পী।" তিনি তাঁর ১৮৭৮-৭৯ সালের রিপোর্টে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ও নবকুমার বিশ্বাস সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয় এঁরা এক্ষেত্রে যে-কোনো শিল্পীর পাশে নিজেদের মর্যাদার আসন রক্ষা করতে পারবেন। স্থাপত্যের লিথোগ্রাফের ব্যাপারে অন্নদাপ্রসাদের বিশেষ প্রশংসা তাতে ছিল। স্যার রিচার্ড টেম্পল ১৮৭৩ সালে অন্নদাপ্রসাদ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এই শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্য ও মৌলিকতা দেখিয়েছেন; এঁর কাজ বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির পক্ষে গৌরবজনক।" ইতালীয় শিল্পী ও শিল্পশিক্ষক ও'-গিলার্ডি এঁর বিষয়ে ১৮৮৫-৮৬-এর রিপোর্টে বলেন, "ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে এঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে আমার দ্বিধা নেই।... কলকাতা আর্ট স্কুলের গৌরব প্রধানতঃ এঁর বিভিন্ন শিল্পকাজের জন্যই বর্ধিত হয়েছে।" অন্নদাপ্রসাদ পোরট্রেট ও লাইফ স্টাডিতে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর দুটি অয়েল পেন্টিং আর্ট স্কুলের গ্যালারির জন্য কেনা হয়—ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে এ সম্মান সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংগে অন্নদাপ্রসাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল। অন্নদাপ্রসাদ ২৭ অক্টোবর, ১৮৮৫, শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন।—"বেলা দুইটা।...শিকদারপাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বাগচী আসিয়াছেন। কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন। ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। ষড়্ভুজ-মূর্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, 'দ্যাখো, কেমন হয়েছে।' ভক্তদের দেখাইবার জন্য 'অহল্যা পাষাণী'র পট আনিতে বলিলেন। পটে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাগচীর মেয়েদের মতো লম্বা চুল।" [কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, ২৯ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে ফ্রেস্কো আঁকানোর ব্যবস্থা করা হলে ভারতীয় ছাত্ররা এমন বিরোধিতা করে যে, কর্তৃপক্ষ ও-কাজ করা অসম্ভব বিবেচনা করেছিলেন। ছাত্রদের বিরূপতার কারণ, পাশ্চাত্ত্য মোহাচ্ছন্নতা, তৎসহ আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা। তাঁরা মনে করেছিলেন, ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রের ক্রেতা পাওয়া দুষ্কর হবে।৩৮

ভারতীয় ছাত্রদের ভারতীয় পদ্ধতি শেখানোর চেষ্টাকে যেখানে স্কামবার্গ ও ও'-গিলার্ডি অসম্ভব কাজ মনে করেছিলেন (এঁদের অভিপ্রায়ের এবং প্রাথমিক প্রয়াসের সাধুতা শ্রদ্ধেয়, তা স্বীকার করতে হবে)—তখন তাকে সম্ভব করতে অবশ্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুর্ধর্ষ সাহসের প্রয়োজন ছিল—তা দেখিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পশিক্ষা-ইতিহাসের ঐতিহাসিক পুরুষ ই বি হ্যাভেল। হ্যাভেলের ছিল সহজাত শিল্পবোধ; সন্ধান ও চর্চার ফলে তিনি লাভ করেছিলেন ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বাসনাময় ভালবাসা; আর উল্টোদিকে দেখেছিলেন—কলকাতার আর্ট স্কুলে অনুসৃত হচ্ছে "ইংরেজের প্রাদেশিক শিল্পের চল্লিশ বছরের পুরনো জঘন্য এক ঐতিহ্যরীতি।" পরাধীন দেশের মানুষকে তাদের আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে, এবং শিল্প যে জাতীয় সৌন্দর্যবোধের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি—এই স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু অস্বীকৃত সত্যকে শেখাতে, হ্যাভেলকে কঠিন হতে হয়েছিল—নির্মম হাতে পরিষ্কার করতে হয়েছিল ভ্রান্ত রীতি ও ভ্রান্ত নমুনার আবর্জনাকে—যে-ধরনের বৈদ্যুতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই হয় রোগীর মতিচ্ছন্নতার সময়ে।*৩৯

৩৮ ও'-গিলার্ডি তাঁর ১৮৮৫-৮৬-এর রিপোর্টে বলেছেন :

"The late Mr Schaumburg pointed out to me the necessity of reinstating Indian decorative art in its original brilliancy, but both he and myself were fully aware that we should have been undertaking a task beyond our power for this reason that we should have found in the native students themselves the chief and the strongest opposition to our efforts. It is for this reason that our newly established fresco-painting class numbers only eight students."

[Bagal]

৩৯ হ্যাভেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত ও তাঁর স্কুলের কথা আগে বলেছি। রণদাপ্রসাদের বাস্তবতা কি পরিমাণে ফটোচিত্রের আনুগত্য করছিল, তা বুঝতে পারি নিম্নের মন্তব্য থেকে :

"Those who are interested in the progress of Art will be interested to hear that an Indian Art School appears to have been established successfully in Bengal... [Now has come to us] the first annual report of...[the] successful Art School in Calcutta... Classes are held in elementary and advanced drawing, in engineering drawing and in art-engineering, in photography and in painting... It would probably be found an astonishing matter how far the development of photography has influenced Art... The principal native gentlemen who took part in the proceedings of the Art School anniversary at Calcutta were photographers confessed... The apparent identification of photography and art is not altogether encouraging... It does certainly look as if in India art were being confused with photography." [*Madras Times*, May 3, 1897, *An Indian Art School*]

এই নতুন আর্ট স্কুলের প্রথম বার্ষিক সভায় অভিনন্দন জানাতে অনেক রাজা, মহারাজা, বিচারপতি ইত্যাদি সমবেত হয়েছিলেন। এক পাদরী সভাপতিত্ব করেন। মহারাজকুমার টেগোর [যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র?] ঐ সভায় নিজেকে শিল্পের অনুগত শিষ্য বলে দাবি করে বলেন—তিনি বড়ই আনন্দে ফটোগ্রাফির জগতে প্রবেশ করেছেন।

মাদ্রাজ টাইমস এই সম্পাদকীয়তে নিখুঁত বস্তুদর্শনে অনিচ্ছুক ভারতীয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফি কোন্ স্বাস্থ্যকর শিক্ষা দিতে পারে তার উল্লেখ করেও ফটোগ্রাফিকে শিল্প বলে

১৮৯৭ সালে হ্যাভেল কলকাতার আর্ট স্কুলে প্রিন্সিপাল হয়ে আসেন। তার আগে তিনি মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে প্রিন্সিপাল ছিলেন। আমরা দেখি ১৮৯৭ সালের বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ভারতীয়দের পক্ষে ভারতীয় রীতি-পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতনতা দেখা গিয়েছিল। ভারতীয়দের অন্ধ অনুকরণবৃত্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা হচ্ছিল —এবং সে-সকল করা হয়েছিল প্রধানতঃ সাহেবী কাগজে। ভারতীয় শিল্পের অনুরাগী বিদেশীরা এইকালে প্রধানতঃ ভারতের আলঙ্কারিক কারুশিল্পের বিষয়েই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের দানের বিষয়ে অবহিত বা উৎসাহী ছিলেন না। ঐ ধরনের ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানও স্থাপিতও হয়েছিল।৪০

বিবেচনা করার মারাত্মক ফল সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল। দিল্লীর মিনিয়েচার শিল্পে বর্ণ-বিন্যাসের প্রভূত প্রশংসা করার পরে পুরাতন সমালোচনাটি পত্রিকাটি আবার তুলে ধরেছিল—আকারের দিক থেকে মূর্তিগুলি উদ্ভট। শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদের গায়ে শতবর্ষ পূর্বে অঙ্কিত যুদ্ধদৃশ্য-চিত্রের আশ্চর্যজনক বর্ণোজ্জ্বলতার কথা সে বলেছিল (সে চিত্রের বয়স এখন প্রায় দুইশত), কিন্তু আকারগুলি যে হাস্যকর, তাও না বলে পারেনি।

৪০ ইংলন্ডে স্থাপিত "সোসাইটি ফর দি এনকারেজমেন্ট অ্যান্ড প্রিজারভেশন অব ইন্ডিয়ান আর্ট"-এর কার্যকলাপের বিষয়ে বেশ কিছু সংবাদ পেয়িছি "দি ইন্ডিয়ান ম্যাগাজিন অ্যান্ড রিভিউ" পত্রিকার এপ্রিল, ১৮৯৪ সংখ্যায়। উক্ত সোসাইটির সভাপতি ছিলেন স্যার জর্জ বার্ডউড। এই সমিতির অবৈতনিক সম্পাদিকা সারা এম কারমাইকেলের কাছে, ১৮৯৪ জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত লাহোর আর্ট কনফারেন্সের সভাপতি লেফটন্যান্ট-কর্নেল-সার্জন-মেজর হেন্ডলি তাঁর দীর্ঘ মুদ্রিত ভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ অভিভাষণ থেকে অনেক সংবাদ পাই। ১৮৯৪ সালের পূর্ববর্তী আর্ট কনফারেন্স হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। এই দশ বছরের মধ্যে ভারতের "ইনডাসট্রিয়াল আর্টের" ক্ষেত্রে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোন্ ব্যবস্থা হয়েছে সে সম্বন্ধে তথ্য ঐ ভাষণে ছিল। ১৮৮৩ সালে সিদ্ধান্ত করা হয়—(১) প্রাদেশিক মিউজিয়ামগুলিতে সেই-সেই প্রদেশের নিজস্ব শিল্পের সংগ্রহ থাকবে; (২) প্রতিটি ইনডাসট্রির পরিবেশ ও চরিত্র সম্বন্ধে সযত্নে অনুসন্ধান করা হবে; (৩) একটি ইন্ডিয়ান আর্ট জার্নাল থাকবে, যাতে সন্ধানের ফলাফল প্রকাশিত হবে। মিউজিয়ামের মূল্য সম্বন্ধে, এবং ১৮৮৩ সালের প্রদর্শনীর পরে জয়পুরে শিল্পকার্যের ক্ষেত্রে কত অগ্রগতি হয়েছে, সে সম্বন্ধে উক্ত অভিভাষণে অনেক কিছু বলা হয়েছিল। ভাষণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল—ভারতীয় কারুশিল্পের বিশুদ্ধি রক্ষার প্রসঙ্গ। বিদেশের বাজারে সস্তায় মাল সরবরাহের জন্য বাজে ধরনের নকল রাশি রাশি প্রস্তুত করা হচ্ছিল, যাতে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে কেবল মন্দ ধারণার উদ্ভব হয়নি, তা একই সঙ্গে তখনো-অবশিষ্ট সামান্য সংখ্যক খাঁটি শিল্পীর দিন ঘনিয়ে আনছিল। খাঁটি হিন্দু ডিজাইনের নমুনা শিল্পরসিক এবং শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে প্রদর্শনীর বিরাট ভূমিকার কথা মেজর হেন্ডলি বলেছিলেন। শিল্প সম্বন্ধীয় সার্ভের কাজ অনেকটা সম্পন্ন হয়েছে, এও তিনি জানিয়েছিলেন। যেসব নতুন শিল্পী ডেকরেটিভ আর্ট শিক্ষা করতে চাইবেন, তাঁদের টেকনিক্যাল শিক্ষাদানের প্রসঙ্গও এসেছিল। শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে ভারতের জাতি-ভেদ প্রথা বাধাস্বরূপ, একথা যখন সর্বত্র শোনা যাচ্ছিল, তখন ইনি উল্টোদিকে জানান—ঐ জাতি-ভেদ প্রথার ফলে শিল্পী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বালকেরা বাল্যাবধি রঙ, তুলির ব্যবহার এবং মাপ-জোক শিখে যায়। শিল্প-বিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সংবাদও উনি দিয়েছিলেন। তার মধ্যে লন্ডনের মিঃ গ্রিগস্-প্রকাশিত মূল্যবান ত্রৈমাসিক পত্রিকা, (জার্নাল অব দি ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড ইনডাসট্রি) যা ১৮৮৪ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছিল, তার বিশেষ উল্লেখ ছিল। তাছাড়া সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিস থেকে প্রকাশিত টেকনিক্যাল আর্ট সিরিজ, কর্নেল জেকবের পোর্টফোলিওগুলি, বিভিন্ন প্রদর্শনীকালে প্রকাশিত বিবরণবহুল পুস্তক-পুস্তিকা, (মেজর হেন্ডলি জয়পুর-প্রদর্শনীর সময়ে এই জাতীয় বৃহৎ কতকগুলি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন), এবং গ্রিফিথের প্রকাশিত অজন্তা চিত্রাবলীর, সেইসঙ্গে ফরাক্কাবাদের পণ্ডিত কুন্দনলাল-প্রকাশিত দেশীয় ভাষার পত্রিকার উল্লেখ করেছিলেন।

এইকালের সাহেবী মনোযোগ বিশুদ্ধ ললিতকলা অপেক্ষা ব্যবহারিক কারুকলার দিকেই অধিক নিবদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে প্রধান উৎসাহী ব্যক্তিদের একজন জর্জ বার্ডউড। উচ্চাঙ্গের শিল্পের মর্মগ্রহণে

দক্ষিণভারতের দুই সাহেবী কাগজ মাদ্রাজ মেল ও মাদ্রাজ টাইমসে এইকালে শিল্প-বিষয়ে যেসব মন্তব্য করা হয়, তার মধ্যে সত্যই ভারতের নিজস্ব শিল্পরীতির অনুশীলনের সপক্ষতা করা হয়েছিল। মাদ্রাজ টাইমস, ১৮৯৪, ১ অগস্ট, পূর্বোক্ত শিল্প-সংরক্ষণ সমিতির সভাপতির সমর্থনে লিখেছিল,

"A Nation's Art must be national, or its Art ceases to be ; just as its Music must be national, or it ceases to have a music of its own."

ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মডেল হিসাবে দেওয়া হত ইংলন্ড বা স্কটলন্ডের নিসর্গচিত্র। তার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি করে এই পত্রিকা বলেছিল—ভারতের নিজস্ব শিল্পরীতি আছে; পাশ্চাত্যের চোখে প্রকরণগতভাবে তা ত্রুটিযুক্ত মনে হতে পারে, অথবা তার রুচিও প্রকৃষ্ট বিবেচিত না হতে পারে, কিন্তু দিশী-রীতির চিত্রে ভারতের নিজস্ব

তিনি কতদূর সমর্থ ছিলেন, সে-বিষয়ে অনেকে সন্দিগ্ধ ছিলেন (নিবেদিতা একবার আঁতকে উঠে বলেন—শিল্প সম্বন্ধে বার্ডউড-বচন! রাম কহো!)—কিন্তু প্রশংসনীয় ছিল তাঁর উদ্দীপনা। শিল্পী হবার পক্ষে "জাতীয় প্রবণতার" অনুসরণের দিকে তিনি জোর দিতেন, কিন্তু যেসব বিচিত্র যুক্তি তিনি দিতেন, সেগুলি তাঁর দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা কিংবা উদ্দেশ্যবদ্ধতা, কোন্‌টি প্রকাশ করত বলা শক্ত। শশিকুমার হেশের এক বক্তৃতাসভায় সভাপতিরূপে তিনি বলেন—হিন্দুশিল্পের বিশুদ্ধ রূপ সংরক্ষণের পক্ষপাতী তিনি, কারণ এই শিল্পের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, তাই শিল্প-ধারা নষ্ট হয়ে গেলে ব্রহ্মণ্য হিন্দুধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে যাবে। এই স্যার জর্জ বার্ডউড একই সঙ্গে কূটবুদ্ধি ইংরাজ প্রশাসক ছিলেন, যিনি নিরামিষাশী হিন্দুজাতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবজ্ঞা বোধ করতেন। হিন্দুদের পক্ষে পুরাতনী সভ্যতার জালে আবদ্ধ থাকা এঁর জাতির ভারত-শাসনের পক্ষে মঙ্গলকর হয়েছিল অবশ্যই। বার্ডউডের এইসব জাতিগত প্রবণতা-তত্ত্বের ভিতরের কথাটা সাহেবী কাগজও সব সময় বুঝতে পারেনি। মরাঠি ভাস্কর ম্হাত্রের ভাস্কর্যের আলোচনাকালে ইনি যখন শিল্পের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের মূল্য অপেক্ষা জাতি-প্রবণতার সম্পর্কে অধিক প্রীতি দেখিয়েছিলেন, তখন বম্বে গেজেট নামক সাহেবী কাগজ (৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬) তাঁর "আমেচারিজম্"-এর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে বস্তু-দর্শনের গুরুত্ব, এবং কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা এই কাগজটি জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছিল। গ্রীকরা যেমন মানবশরীর নির্মাণ করেছে, হিন্দুরা তেমন কদাপি পারেনি, ইত্যাদি বলার পরে, হিন্দুশিল্প সম্বন্ধে সার কথা সে জানিয়েছিল, যার মধ্যে সহানুভূতি ও সমালোচনা দু-ই ছিল : "হিন্দুশিল্প উত্তম হলে ইউরোপীয়রা তা পুরোপুরি তারিফ করতে পারে। আধুনিক ইউরোপের গহনার নক্সাকে হিন্দু অলঙ্করণ প্রভাবিত করছে। কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন হিন্দুর মধ্যে মানবপ্রকৃতি বা নিসর্গপ্রকৃতির সম্বন্ধে কোনো ভাবানুভূতি নেই। প্রশংসনীয় অলঙ্কারশিল্পী সে, কিন্তু এক্ষেত্রেও তার অধিকাংশ নক্সা পুরাতন—বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত। বিশালের মহিমার দিকে তার নজর নেই, সুচারু সূক্ষ্মতাতেই সে আকৃষ্ট। স্থপতি হিসাবে সে ব্যর্থ। পুরাতন মন্দিরে অনেক সুন্দর অলঙ্করণ আছে, কিন্তু আমদানীকৃত ভাবের সৃষ্টি মুসলমানী স্থাপত্যে, কিংবা আধুনিক ইউরোপীয় গথিক সৌধগুলিতে যে মহিমা আছে, তা হিন্দু স্থাপত্যে প্রাপ্তব্য নয়। শত-শত শতাব্দী ধরে হিন্দুরা যে-সুযোগ পেয়েছে তাতে মানবশরীর রূপায়ণে গ্রীকদের থেকে উন্নতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাদের 'আর্য প্রবণতা' শিল্পক্ষেত্রে অলঙ্করণের দিকেই তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছে, যে-ধরনের শিল্পের পক্ষে—কর্মশীলতা বা পর্যবেক্ষণক্ষমতা নয়—প্রয়োজনীয় হচ্ছে, ধৈর্য ও আত্মভাবুকতা।" এইসঙ্গে পত্রিকাটি ম্হাত্রের ভাস্কর্যের প্রশংসা করেও তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছিল।

ডন পত্রিকায় নভেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় বেরিয়েছিল—

Sir George Birdwood on the Mission of Indian Art Generally;

এবং ডিসেম্বর, ১৯০০ সংখ্যা থেকে কয়েক সংখ্যায় বেরিয়েছিল—

The Arts and Industries of India : Their Preservation and Development : The Economic Basis of the Indian Caste System, by S. J. Tellery.

পদ্ধতি রয়েছে, যার অনুসরণে যথার্থ ভারতীয় শিল্পরীতি ও শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে।৪১

একই কাগজে ১৩ অগস্ট, ১৮৯৫, "ইণ্ডিয়ান আর্ট" নামক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান নকলপ্রবণতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছিল। কারুশিল্পের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা বিশেষ ঘটছিল। দুঃখের সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশিয়া পত্রিকাটি লিখেছিল, "যাঁরা প্রাচ্যদেশে দীর্ঘসময় বাস ক'রে তার শিল্পকে সমাদর করার মতো রুচিলাভ করেছেন,...এবং ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে কিছুটা অধিকার পেয়েছেন, তাঁরা যখন দিল্লীর অলঙ্কারশিল্পীকে বণ্ডস্ট্রীটের প্যাটার্ন নকল করতে দেখবেন, কিংবা দেখবেন—কাশ্মীরী বয়নশিল্পীরা লিবার্টি গাউন তৈরী করছে, তখন নিতান্ত দুঃখবোধ না করে পারবেন না।" ইংরাজি কারুশিল্পে যন্ত্রের অনুপ্রবেশ এত ঘটে গেছে যে, ইংরাজদের পক্ষে ভারতীয় শিল্পীদের স্বহস্তে করা শিল্পদ্রব্যের সৌন্দর্য বোঝা সত্যই কঠিন—একথা বলার পরে, স্থূলবুদ্ধি ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ভারতীয় শিল্পের যে সর্বনাশের আয়োজন করছিল, তার কঠোর নিন্দা এই পত্রিকাটি করে। একটি ইংরেজ কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তারা ভারতীয় শিল্পকে ব্যবসায়িকভাবে সফল করার জন্য নেটিভ শিল্পীদের দিয়ে কাজ করাবে—তবে তাদের ফোরম্যান হবে ইংরেজ—"যে-ব্যক্তি ভারতীয় শিল্পের ছাঁদ মোটামুটি বজায় রাখার ব্যবস্থা করবে, কিন্তু দেখবে ডিজাইন-গুলি যেন ইউরোপীয় রুচির কাছে গর্হিত স্থূল ব্যাপার না হয়।" এই বর্বর প্রস্তাব শুনে প্রচণ্ড রাগে এই পত্রিকা লিখেছিল : "শিল্পের ক্ষেত্রে এই কোম্পানির চেয়ে শয়তানী ব্যাপার আর কিছু হতে পারে কি—যা একটি জাতির শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য গঠিত? ধারাবাহিক-ভাবে এই কাজ ভারতে আমরা করে এসেছি। এদেশের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে মৌলিকতা নষ্ট করেছি; তারপর ভেবেছি—এদের ইংরাজিজ্ঞানের অভাব নিয়ে তামাশা করার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে! নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এদের সঙ্গীতের মৌলিক রূপ নিয়ে ব্যঙ্গ করেছি, তারপর ভেবেছি—যখন নেটিভ ব্যাণ্ডে 'গড্ সে দি কুইন' বিচিত্রভাবে বাজে তখন আমরা অট্টহাস্য কররার অধিকারী! আর এখন আমরা তাদের শিল্পের মৌলিকতা ধ্বংস করতে উদ্যত—বৃটিশ ডাণ্ডা হাতে করে!"৪২

৪১ "India has had an Art of its own, though scarcely, perhaps more developed than its music. The old miniaturists of Delhi used to turn out very striking pictures of true Indian design, and though native pictures of Hindu mythology, with mysterious perspective and crude composition may be not at all to our taste, yet the style is at least national, and if it be tended rather than guided, it may develop at length into a genuine Indian *School.*" [*Madras Times*, Aug. 1. 1894, *Indian Art*]

৪২ মাদ্রাজে একটি কলাশিল্প প্রদর্শনীর সূত্রে মাদ্রাজ টাইমস কয়েক বছর পরে আবার একই ধরনের কথা লেখে :

"At our late Art Exhibition in Madras, there were exhibitors who had set themselves to copying cheap oleographs line by line and colour by colour; cheap machine-made imitations of Beneras brass-ware and of other Indian goods are coming into the market; and the nature of 'Orientalism' is being eaten up by the vulgar stiffness of Western art. It is not only in India that the thing is seen. but in all Asiatic countries. For instance, in the Malay States to the north of Singapore, needlework, as amongst most Mahomedan nations, is a national industry, and runs on lines of high art. But the vulgar printed cloths of Manchester have got amongst them, and have been adopted as ideals." [*Madras Times*, Aug. 18, 1899, *Art V. Nature*]

১৮৯৭ সালে কলকাতায় আর্ট স্কুলে যোগদানের আগেই, শিল্পে জাতীয় সত্তার আত্মকাশের পক্ষে হ্যাভেলের প্রচারকার্য অল্পবিস্তর আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, এবং সে-সম্বন্ধে ছু সংবাদ আমরা সমকালীন কাগজপত্র থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই কালে হ্যাভেল রুশিল্প অপেক্ষা কারুশিল্পের 'জাতীয়তা' নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। [ভারতীয় চারুশিল্পের ঙগ ও আত্মার বিষয়ে তাঁর সুগভীর রচনাগুলি ১৯০২ সালের পর থেকে প্রকাশিত হতে কে, এবং সেক্ষেত্রে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ও ভাববিনিময় ফলপ্রসূ হয়েছল, এমন মনে করবার কারণ আছে]। ১৮৯৪ সালের মধ্যেই, যখন তিনি মাদ্রাজ আর্ট কুলের সুপারিনটেনডেণ্ট, তাঁর এই সম্পর্কিত ভূমিকার গুরুত্ব উপযুক্ত স্থানে স্বীকৃত য়েছিল।৪৩ এবং, এখন যে-হ্যাভেল কেবল শিল্পশিক্ষক ও শিল্পতাত্ত্বিক বলেই পরিচিত, তনি যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীও ছিলেন, তার সমকালীন স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি।৪৪ সে ই হোক, এই পর্বে ভারতীয় কারুশিল্প সম্বন্ধে হ্যাভেলের রচনা বা ভাষণ যথেষ্ট চাঞ্চল্য ৃষ্টি করেছিল। ১৮৯৭ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় তিনি "ইণ্ডিয়ান ইনডাসট্রি"

৪৩ "সোসাইটি ফর দি এনকারেজমেণ্ট অ্যাণ্ড প্রিজারভেশন অব ইণ্ডিয়ান আর্ট"-এর পক্ষে ৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, "ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং তাতে উৎসাহদানের মূল্যবান যেজ মিঃ হ্যাভেল ভারত করছেন," তার স্বীকৃতিতিরূপে সার্টিফিকেট দান করা হয়। উক্ত সমিতির ম্পাদিকা সারা এস কারমাইকেল হ্যাভেলকে প্রেরিত পত্রমধ্যে বলেন :

"The certificate from our society...is presented to you, first, in recognition f your thorough knowledge of Art in all its branches, and of your great success n the superintendence of the Madras School of Art, where you have always niformly upheld the traditional patterns of the Indian workman, weeding out f their designs the Western influences, which,...have crept into their work. econdly, in recognition of your very clear and instructive memorandum on Technical Education in Madras."

এর পরে সারা কারমাইকেল হ্যাভেলের ভাবী কার্যাবলী সম্বন্ধে যে-আশা প্রকাশ করেছিলেন, া পরে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য হয়েছিল :

"May I add from myself, knowing so well the work which is carried on n Madras, and having for so many years helped native artisans to be true to heir perfect Oriental colouring and designs, that I trust you may have many ears of useful work before you in a country where such knowledge as you ossess is of the greatest importance to the several Art schools established in he Indian Empire." [*The Indian Magazine and Review*, March, 1894]

৪৪ টাইমস অব ইণ্ডিয়া ২৪ মার্চ, ১৮৯৮, বোম্বাই আর্ট সোসাইটি প্রদর্শনীর যে বিবরণ লখেছিল, তার প্রায় সবটাই হ্যাভেলের তৈলচিত্রের প্রশংসায় পূর্ণ। সেই দীর্ঘ প্রশস্তির কিছু অংশ :

"The principal attraction...is the set of paintings sent by Mr Havell, the Superintendent of the Calcutta School of Art. Mr Havell's work is of professional character, and is distinguished by its truth of tone, satisfactory balance and composition, certainty of drawing and handling, and fresh untroubled colour... Scarcely anyone, standing a little way from them, can fail to be struck by the bright open-air effect in the two fine landscapes 'Kinchinjunga and the Snowy Range of Sunrise,' and the river scene called 'Tallay's Nullah—Early Morning'... There is no other work in the room which occupies the same plane in respect to either pictorial or poetic quality. Whether we shall see much more of Mr Havell's work is doubtful. 'It all depends.' He does not paint altogether for his own entertainment or the entertainment of the Bombay people." [*Times of India*, March 24, 1898, *The Art Exhibition*]

সম্বন্ধে প্রবন্ধে বলেন : ভারতের প্রয়োজন নয় টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন ক'রে যাওয়া আসল প্রয়োজন নূতন ব্যবসা এবং ব্যবসার মূলধন; টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ইনডাসট্রি সৃষ্টি করে না। মাদ্রাজ টাইমস (এপ্রিল, ৬, ১৮৯৭) সে কথার আংশিক সত্যতা স্বীকার করেও বলে, ইনডাসট্রির অগ্রগতি হবে না যদি না তাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মী যায়। এইসঙ্গে পত্রিকাটি হ্যাভেলের ভূমিকার বিষয়ে কিছু জ্ঞাতব্য সংবাদ দিয়েছিল। পুরনো পদ্ধতিতে উৎকৃষ্ট কাঠখোদাইয়ের কাজ হত মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সিতে, সে শিল্প তখন বিলীয়মান। দক্ষিণ মাদুরার একটি ক্ষুদ্র শহরে হ্যাভেল ঐ ধারার একজন উচ্চাঙ্গের কারিগরকে আবিষ্কার করেন। তাঁকে, এবং অনুরূপভাবে আবিষ্কৃত কয়েকজন প্রতিভাবান অলংকারশিল্পী ও ধাতুশিল্পীকে হ্যাভেল নিয়ে আসেন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে শিক্ষাদানের জন্য। ধাতুশিল্পীটির বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেন, "এঁর কাজ সারা ভারতে সর্বোত্তম। ইতালীর বিখ্যাত চার্চ ও ক্যাথিড্রলসমূহের দ্বারে যে-সব সেরা বাঈজানস্টাইন কারুকর্ম আছে তাদের সঙ্গে এঁর কাজ তুলনীয়।" ক্যালকাটা রিভিউ-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে হ্যাভেল ভারতের ধনী ও অভিজাতদের শিল্পবিষয়ক কুরুচির কঠোর নিন্দা করেছিলেন। "অভিজাত ভারতীয়গণ ইউরোপ থেকে সরাসরি আমদানীকৃত নয় এমন যে-কোনো জিনিসকেই নিম্নশ্রেণীর বলে মনে করেন। জনগণের পুরাতন শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের রুচির পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে, অথচ আমাদের [ইউরোপীয়দের] জাতীয় শিল্প থেকে এমন কিছু দিতে পারিনি যাতে ক্ষতিপূরণ হতে পারে।" অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা দেশীয় রুচির ক্ষেত্রে বিকার ঘটিয়েছে বলে হ্যাভেল যে-সমালোচনা করেছেন, তাকে মেনে নিয়েও মাদ্রাজ টাইমস তার "আর্ট এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া" নামক ২২ নভেম্বর, ১৯০০ তারিখের সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন করেছিল—মিঃ হ্যাভেল যে, সরকারী ভবনসমূহে দেশীয় স্থাপত্যরীতি অবলম্বনের কথা বলছেন—তিনি কেন তাঁর সমালোচনার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য দেশীয় স্থাপত্যের নক্সা সরবরাহ করছেন না? সে যাই হোক, হ্যাভেল ১৮৯৭ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় রীতিতে কলাসৃষ্টির ব্যাপারে কতখানি আগ্রহ ও নৈপুণ্য দেখা গিয়েছিল—স্টেটসম্যান পত্রিকার সমকালীন মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায়; যদিও ওরই মধ্যে এমন উদ্ভট কথাও আছে : শিল্পে মৌলিকতা মানে কোনো জিনিস দেখে এঁকে ফেলার ক্ষমতা। ১৯০০ জানুয়ারি মাসে কেবল আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে কলকাতায় প্রদর্শনী হয়েছিল, সেইসূত্রেই স্টেটসম্যান উক্ত মন্তব্য করে।৪৫

৪৫ "It [the exclusive exhibition by the students of the Govt. School of Art] is...interesting as a visible proof of the very considerable capacity for original design inherent in the Bengali, and of the efficacy of the system of drawing adopted in the school within the past few years... In earlier days Government led its pupils along the ancient ways which in the old century had long been the only road to the honours of South Kensingtion. The Bengali youth was set to an eternal monotony of copying... Mr Havell, the present Superintendent, has at least tried to teach the lesson that copying is only the means to an end, and he puts it in the very beginning... The older method exactly suited the Bengali... Endlessly patient, essentially an imitator, his copies were marvels of accuracy, and showed an attention to and capacity for detail almost phenomenal; but there it ended. Set him to draw a chair, and the situation became pathetic. Mr Havell's idea has been to develop latent capacity for original work, and the result, specially in the direction of decorative design, has been eminently encouraging." [*Statesman*; quoted in *Madras Mail*, January 26, 1900]

॥ ১১ ॥ রবিবর্মা : চিত্রশিল্পে নূতন ধারা : রবিবর্মার তৈলচিত্রের অপরিসীম জনপ্রিয়তা : বাংলাদেশে চিত্রালোচনা : শ্যামাচরণ শ্রীমাণী : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হ্যাভেলের সংস্কারচেষ্টার কিছু বছর আগেই কিন্তু ভারতীয় শিল্পজগতে নূতন তরঙ্গের উদয় হয়েছিল—এবং তা এসেছিল ভারতীয় জাতীয়তার ছদ্মবেশ নিয়েই—ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ধন্য-ধন্য রব উঠেছিল—রবিবর্মা অচিরে স্বীকৃত হয়েছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বলে। হাঁ, রবিবর্মাই নূতন আন্দোলন এনেছিলেন।

রবিবর্মার পৌরাণিক ছবিগুলি একদিন ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের ঘরে ঝুলেছিল, এবং তিনি নবযুগের প্রবর্তক বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর ভূমিকা এবং সমকালীন স্বীকৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু জানানো উচিত।

রবিবর্মার জন্ম ১৮৪৮, মে মাসে। ত্রিবাংকুর রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়-সম্পর্ক। তাঁরা তিন ভাই ও এক বোন-সকলেই স্বভাবশিল্পী। তাঁদের মা ছিলেন কবি। রবিবর্মা বাল্যে সংস্কৃত পড়েছিলেন, রামায়ণ মহাভারতের ভাবে নিমগ্ন থাকতেন, এবং দেব-দেবীর ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। চিত্রাংকন তখনকার দৃষ্টিতে উচ্চশ্রেণীর মানুষের বৃত্তি না হলেও, রবিবর্মা তাঁর মামা রাজা রাজবর্মার উৎসাহে শিল্পশিক্ষার পথে এগিয়েছিলেন। গোড়ায় তিনি 'ওয়াটার কলার'-এ ছবি আঁকতে শেখেন। পরে ১৮৬৮ সালে ইংরাজ শিল্পী থিয়োডোর জানসেনের কাছে অয়েল পেন্টিং-এর পদ্ধতি শেখেন—এবং পথেই তাঁর সাফল্যের সূচনা হয়। ১৮৭৩ সালে মাদ্রাজে ললিতকলা প্রদর্শনীতে তাঁর একটি ছবি স্বর্ণ-পদক পায়, যার বিষয় ছিল "একটি নেয়ার মহিলা মল্লিকা-ফুলের মালা দিয়ে কবরীসজ্জা করছেন।" "এই চিত্রটি দর্শকগণের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, কিছুদিন ধরিয়া শহরের যেখানে-সেখানে ইহার সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিয়াছিল।" ১৮৭৬ সালে যখন রবিবর্মার "শকুন্তলার পত্রলিখন" ছবিটি মাদ্রাজে প্রদর্শিত হল, তখন চারদিকে উৎসাহের অবধি রইল না, কারণ "তৎকাল পর্যন্ত কোনো ভারতবর্ষীয় শিল্পী প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ণিত নায়ক, নায়িকা বা ঘটনাবলীর তৈলচিত্র প্রস্তুত করেন নাই।"

রবিবর্মার শিল্পপ্রয়াস অতঃপর প্রধানতঃ দুই ক্ষেত্রে নিবদ্ধ রইল—তিনি রাজা, মহারাজা ও ইংরেজ রাজপুরুষদের পোরট্রেট আঁকতে লাগলেন, যার ফলে প্রচুর অর্থ পেলেন, সেই-সঙ্গে পরিচিতিও; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত কাব্য-পুরাণের ছবি এঁকে চললেন, যা তাঁর খ্যাতিকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিল। প্রচুরসংখ্যায় এই জাতীয় ছবি তিনি এঁকেছিলেন, বিশেষতঃ দেশীয় রাজাদের ফরমায়েশে—এদের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল বরোদার মহারাজার অনুরোধে আঁকা ১৪টি রামায়ণ-মহাভারতের ছবি। "১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের শেষে বড়োদায় চিত্রগুলি কয়েকদিনের জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হয়। তাহা দেখিবার জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সকল দিক হইতে দলে দলে লোকের সমাগম হয়। কিছুদিন বড়োদায় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ, ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যদ্বয় হইতে বিষয় নির্বাচন করিয়া এই সর্বপ্রথম ক্যাম্বিসের উপর এরূপ জীবিতবৎ ও হৃদয়স্পর্শী তৈলচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল।"

উপরের বিবরণ প্রবাসী পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৯০১) অষ্টম-নবম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ-পৌষ) প্রকাশিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা রবিবর্মা' নামক রচনা থেকে সংকলিত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এইকালে রবিবর্মার বিশেষ অনুরাগী। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার প্রথম

হ্যাভেল যখন কপি করতে দেন—সেও ভারতীয় বস্তু। হ্যাভেল যে, ভিত্তিচিত্র অংকনপদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন করেছেন, এবং শিক্ষক হিসাবে জয়পুর থেকে শিল্পী আনিয়েছেন, যাঁদের শিক্ষার চমৎকার ফল হয়েছে—এসব কথাও আমরা ঐ রচনা থেকে জেনেছি।

বর্ষেও (১৯০৭) তিনি রবিবর্মার উপরে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং তাঁর লেখা রবিবর্মার জীবন ও শিল্পকথা গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল। প্রবাসীর প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, "রবিবর্মার রামায়ণ-মহাভারতের চিত্রের হাজার হাজার ফটোগ্রাফ" ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে বিক্রীত হয়েছিল। জনসাধারণের উৎসাহ দেখে রবিবর্মা বোম্বাইয়ে লিথোগ্রাফিক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ক'রে নিজের ছবিগুলির বহুবর্ণ অনুলিপি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, যার দ্বারা, "তিনি তাঁহার স্বজাতীয় লোকদিগের মনে শিল্পানুরাগ জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন।...আজ হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সর্বত্র গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রসকল সাদরে রক্ষিত হইতেছে এবং ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোকের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভারতের শিল্পজাগরণের ইতিহাসে রবিবর্মার স্থাননির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন এইভাবে :

"ভারতে মহাকবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, স্থপতি, ও সঙ্গীতবিশারদ অনেক জন্মিয়াছেন কিন্তু এই রত্নপ্রসূ পুণ্যভূমির উপযুক্ত একজন চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন নাই। রবিবর্মা এই অভাব পূরণ করিয়াছেন কিনা আমরা বলিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ অধুনাতন যুগে চিত্রবিদ্যারূপ মহতী কলার এরূপ অবনতি ও দুর্গতি হইয়াছিল যে, ইহার পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত মন্থরভাবে সম্পাদিত হইত, যদি রবিবর্মা স্বকীয় প্রতিভাবলে ইহাকে সাধারণের সমক্ষে গৌরবান্বিত করিয়া না তুলিতেন। ভারতীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাস যদি কখনো লিখিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আধুনিক যুগে ইহার জন্মদাতা বলিয়া পূজিত হইবেন।"

প্রবাসীর এই প্রবন্ধের সামান্য আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'কায়স্থ সমাচার' পত্রিকার এক রচনায় জাতীয় ঐক্যবিধানে শিল্পের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলেন। শিল্পের ভাষা সর্বজনীন; ভারতবর্ষের মতো বহুভাষার দেশে যেখানে প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত সাহিত্য অন্য ভাষাভাষীর কাছে পেঁছিতে অসমর্থ, সেখানে শিল্প তার নীরব অথচ অনস্বীকার্য আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়—এই সকল কথার সঙ্গে রামানন্দ কায়স্থ সমাচারের উক্ত রচনায় ভারতবর্ষে শিল্পের পুনরুত্থান-সম্ভাবনার অন্যতম কারণরূপে "রাজা রবিবর্মার চিত্রাবলীর ব্যাপক ব্যবহারের" উল্লেখ করেছিলেন। "পাঁচবছর আগেও ঐ চিত্রগুলি উত্তরভারতে প্রায় অপরিচিতই ছিল।" রবিবর্মার প্রতিদ্বন্দ্বী বা উপযুক্ত অনুকারীর অভাবের জন্য দুঃখপ্রকাশ ক'রে রামানন্দ মারাঠি ভাস্কর হ্মাত্রের শিল্পকর্মের সবিশেষ প্রশংসাও করেছিলেন।৪৬

রবিবর্মার দেহান্তের পরে ১৯০৭ সালে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় 'রবিবর্মা' নামক রচনাতেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উক্ত শিল্পীকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে অভিহিত করেছিলেন, যিনি ধর্মীয় ও পৌরাণিক চিত্রাবলীর অঙ্কনের ও বহুল প্রচারের দ্বারা "অসচেতনভাবেই সম্ভবতঃ হিন্দুজাতিগঠনে সাহায্য করেছিলেন।"

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, ১৯০৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশে শিল্পান্দোলন শুরু হয়ে গেছে, এবং তা হয়েছে জাতীয় ভাবভিত্তির উপর নির্ভর করেই। সুতরাং

---

৪৬ কায়স্থ সমাচার পত্রিকায়, ডিসেম্বর ১৯০২ সংখ্যার একটি লেখায় (*Ravi Varma, the Indian Artist*) এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান আর্ট প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ১৭টি চিত্রের প্রতিলিপির আলোচনায় বলা হয়—'কোন্ হিন্দু না তাঁর জন্য গর্বিত?' রবিবর্মার ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে বলা হয়,

"Should the time come for the history of the progress of art in India be writen his name will stand first as the father of modern Indian art."

রবিবর্মা সম্বন্ধে লর্ড কার্জনের মন্তব্যও উপস্থিত করা হয়। কার্জন বলেছিলেন,—

"...In it is to found happy blending of the Western method of painting with purely Oriental ideas and an entire freedom from stiffness."

৬ বছর আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেখানে রবিবর্মা সম্বন্ধে মুগ্ধ প্রশস্তি ভিন্ন আর কিছু করার কথা ভাবতে পারেননি, সেখানে বর্তমান প্রবন্ধে তাঁকে রবিবর্মার ছবিতে অনুসৃত বিদেশী রীতির কথা স্বীকার করতে হয়েছিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, রীতি বিদেশী হলেও রবিবর্মার ছবির বিষয় স্বদেশী। স্বদেশীয় কাব্যনাটকের "সবচেয়ে সুন্দর, সকরুণ বা প্রাণোন্মাদিনী দৃশ্যগুলি" নির্বাচনের কৃতিত্বের জন্য তাঁর অঢেল প্রশংসা করার পরে আরও এগিয়ে গিয়ে রামানন্দ ইঙ্গিতে বলেছিলেন, রবিবর্মা তাঁর বাস্তববাদের দ্বারা ভারতীয় শিল্পের অবাস্তবতার ত্রুটি অনেকাংশে দূর করেছেন।—

"This is not the place to enquire why the Greek gods and goddesses were given human and natural shapes, whereas India's' gods and goddesses had very often non-human and non-natural shapes. What we are here concerned with is to note that Ravi Varma's paintings represent to some extent, but not entirely, a return to nature in the creative function of art in the domain of mythology."

বাংলাদেশে রবিবর্মার প্রথম আলোচক কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নন—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবাসীর ১৩০৮, অগ্রহায়ণ-পৌষের পূর্বোক্ত আলোচনার প্রায় আট বছর আগে 'সাধনা' পত্রিকার ১৩০০ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় [১৮৯৩] 'রবিবর্মা' প্রবন্ধে ২৩ বছরের বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বোধহয় প্রথম বাংলাদেশে রবিবর্মার বিষয়ে আলোচনা করেন। বাংলা-সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের একটি গৌরব চিরদিন স্বীকৃত হবে—তিনি বাংলাভাষায় চিত্র-সমালোচনার প্রবর্তক।৪৭ বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন দীর্ঘায়ত হয়নি (মাত্র ২৯ বছর বয়সে

৪৭ বলেন্দ্রনাথ বাংলায় চিত্রসমালোচনার প্রবর্তক, এই কথার পক্ষে সুবিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকার সাক্ষ্যের উল্লেখ করা যায়। ১৩০০, অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাহিত্যে' 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'র মধ্যে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের 'রবিবর্মা'র উল্লেখ ক'রে লেখা হয় : "শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবিবর্মা' অতি সুন্দর এবং ভাবুকতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচায়ক প্রবন্ধ। চিত্র-সমালোচনা বাংলাসাহিত্যে এই প্রথম। বলেন্দ্রবাবুর ভাষার গুণে চিত্রগুলি যেন নয়নের সমক্ষে উপস্থিত হয়। বলাবাহুল্য এইরূপ মৌলিক প্রবন্ধ ভাষার গৌরব।"

বলেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'সাহিত্য' পত্রিকার মন্তব্যটি আক্ষরিকভাবে সত্য নাও হতে পারে। বলেন্দ্র-নাথের রচনার পূর্বেও হয়ত সাময়িক পত্রিকায় কোনো বিশেষ ছবি সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে যথার্থ সাহিত্যগুণান্বিত চিত্রালোচনা বলা যাবে কিনা সন্দেহ। বলেন্দ্রনাথ সচেতনভাবে প্রস্তুত হয়ে চিত্রালোচনায় নেমেছিলেন—রাস্কিন-পদ্ধতিতে। এইকালে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি রাস্কিনের ললিতকলাবিষয়ক রচনার ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। জন রাস্কিনের দেহত্যাগের পরে তাঁর বিষয়ে প্রিয়নাথ সেন 'প্রদীপ' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩০৭ থেকে কয়েক সংখ্যায় চমৎকার এক আলোচনা করেছিলেন, দেখতে পাই।

কলাশিল্প সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সাধারণ আলোচনা কিন্তু বাংলায় বলেন্দ্রনাথের আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। শ্যামাচরণ শ্রীমাণী ১৮৭৪ সালে "আর্যজাতির শিল্পচাতুরি" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক লেখেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই বইটির উপর বঙ্গদর্শনে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখেন (ভাদ্র, ১২৮১), যেটি সংক্ষেপিত আকারে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থে 'আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা'র বিষয়ে পরিচ্ছন্ন আলোচনা করেছিলেন। এবং সূক্ষ্মশিল্পের সঙ্গে 'ভাগ্যহীন বাঙালী'র 'বড়ই বিরোধ' নিয়ে খুব দুঃখ করেছিলেন। একদিকে অধিকাংশ বাঙালীর অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, যার জন্য শিল্পচর্চার কোনো সম্ভাবনাই তাদের জীবনে নেই, অন্যদিকে গ্রাম্য জমিদার ও ধনাঢ্য বাবুদের স্থূল রুচি এবং কদর্য অনুকরণস্পৃহা, যা স্ব-ভবনে বিলেতী চিত্র-ভাস্কর্যের শ্রীহীন স্তূপসৃষ্টিতে পরিতৃপ্ত। সৌন্দর্যহীনতার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের দোষও ধরেছেন, যেখানে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতপার্থক্য ঘটবে। তিনি লিখেছেন, "কতকটা হিন্দুধর্মের দোষ; যে ধর্মানুসারে

তাঁর দেহান্ত হয়), এবং তাঁর অধিকাংশ রচনায় রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি, তৎসহ ভাবোচ্ছ্বাসের বাহুল্য; তাহলেও একটি লক্ষণ বিশেষভাবে দেখা গেছে—তাঁর মন সহজেই রূপের ডাকে সাড়া দিত, এবং তিনি সাহিত্য-আলোচনা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পঠিত বস্তুকে রূপচিত্রের আকারে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যিকদের 'চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' তাঁর

উৎকৃষ্ট মর্মরপ্রস্তুত হর্ম্যও গোময়লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্ম শিল্পে দুর্দশারই সম্ভাবনা।" ব্যথিত বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধশেষে পুনশ্চ লিখেছেন : 'সৌন্দর্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্যরসাস্বাদনসুখ বুঝি বিধাতা বাঙালির কপালে লিখেন নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সীতা-রাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার ললিতগিরিতে ভগ্ন ও ভগ্নাবশিষ্ট স্থাপত্য-ভাস্কর্য স্বচক্ষে দর্শন করার অভিজ্ঞতা নিবেদন করেছেন : "চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু ছিল? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তিসকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকচিতচেলাঞ্চল-প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীরাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা...স্ত্রীমূর্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু?" তারা অবশ্যই হিন্দু, কিন্তু "অঙ্গহীন আধুনিক হিন্দু" নয়, যারা—বঙ্কিমচন্দ্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছেন—ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুলগড়া শিখতে যায়, কুমার সম্ভব ছেড়ে সুইনবার্ন, গীতা ছেড়ে মিল পড়ে, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছেড়ে সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করে দেখে।

যাই হোক, আমরা দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্যামাচরণের ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি, তৎকাল-প্রচলিত ইউরোপীয় ধারণার অনুসরণে অবশ্য মনে করে-ছিলেন, "অশোকের পূর্বকালিক স্থাপত্যবিদ্যার কোনো চিহ্ন এদেশে যে বর্তমান নাই, তাহা আপাতত স্বীকার করিতে হইবে" [যদিও অল্প আগে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল]। তদনুযায়ী তিনি বলেছিলেন, শ্যামাচরণ শ্রীমাণী ভারতীয় শিল্পের "যেরূপ প্রাচীনতা প্রতিজ্ঞাত করিয়াছেন, সেরূপ প্রাচীনতা প্রমাণিত করিতে পারেন নাই।" পাশ্চাত্ত্যমতের প্রতি আনু-গত্যের আরও পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। শ্যামাচরণ বলেছিলেন, "মথুরার বিখ্যাত পুত্তলিকা-সকল.. হিন্দু শিল্পকরের [দ্বারা] খোদিত"—গ্রীকদের রচনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যদি এই ভাস্কর্য হিন্দু-প্রণীত হয়, তবে সে হিন্দু গ্রীকদিগের নিকট শিল্পশিক্ষা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহার বিশেষ চিহ্ন আছে।" বঙ্কিমচন্দ্র এমন বিস্ময়কর কথাও বলেছিলেন—"ভারতীয় ভাস্কর্য-মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট।" চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের উৎকর্ষের পক্ষে শ্যামাচরণ অজন্তা ও বাগ গুহার উল্লেখ করেন। সেইসঙ্গে দৃষ্টান্তের অভাব পূরণ করার জন্য উত্তরচরিত ও শকুন্তলার চিত্রবিদ্যার প্রসঙ্গ তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুক্তিকে স্বীকার করেন নি, কারণ লেখকরা অতিরঞ্জনে পটু। এসব সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র শ্যামাচরণের ক্ষুদ্র পুস্তকের বেশ কিছু অংশকে "পাঠযোগ্য," এবং "উৎকৃষ্ট" বলেছেন। একথা স্বীকার করতে হবে, শ্যামাচরণের পুস্তক মৌলিক চিন্তায় ভূষিত কোনো গ্রন্থ নয়। তিনি প্রধানতঃ ফার্গুসন প্রমুখের ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্য বিষয়ে রচনাদির অংশানুবাদ ক'রে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। তবে মাঝে-মাঝে রাজেন্দ্রলাল প্রমুখের অনুসরণে ইউরোপীয় ধারণার বিরোধিতাও করেছেন। শ্যামাচরণ কর্তৃক গৃহীত ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের অনুকূল মত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনার মধ্যে বহুভাবে পুনরুদ্ধৃত করেছেন। শ্যামাচরণের প্রশংসা করে বলেছেন, "শ্রীমাণীবাবুর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এ-বিষয়ে বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। এই প্রথমোদ্যম। গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায় যে, শ্রীমাণীবাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত এবং শিল্প সমালোচনায় সুপটু এবং গ্রন্থ-প্রণয়নে বিশেষ পরিশ্রমও করিয়াছেন।"

বিশেষ অনুরাগের বিষয় ছিল, এবং তিনি সর্বদা 'রঙ ও ভাব' নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও তাঁর আগ্রহ ছিল, উড়িষ্যার উপরে লিখিত তাঁর প্রবন্ধগুলিতে (যথা 'কনারক', 'খণ্ডগিরি', 'প্রাচীন উড়িষ্যা,' 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র') তার পরিচয় রয়েছে, এবং তিনি মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলার অভিনিবিষ্ট দর্শক হতে পেরেছিলেন, 'দিল্লীর চিত্র-শালিকা' নামক প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ।

সেইসঙ্গে, বিস্ময়ের কথা, তিনি রবিবর্মার মুগ্ধ বন্দনাকারীও হতে পেরেছিলেন। *উড়িষ্যার প্রত্নমহিমায় যাঁর চিত্ত অভিভূত, মুঘল-রাজপুত চিত্রকলার সুদূর সৌন্দর্যে যিনি* রসাতুর, যিনি শিল্পের ক্ষেত্রে অযথা সংকীর্ণতায় আক্রান্ত নন (যেমন, তিনি চিত্রের ক্ষেত্রে তাঁর পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত কালী-বিদ্বেষের উত্তরাধিকার পাননি)—তিনি কি ক'রে রবিবর্মাকে মুগ্ধস্তুতিতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তা সত্যই বিচিত্র মনে হয়।

রবিবর্মা সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথ-লিখিত 'সাধনা'র পূর্বোক্ত প্রবন্ধে, এবং একই পত্রিকার মাঘ ১৩০০ সংখ্যায় তাঁর 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' প্রবন্ধে, তৎকালীন বাংলার চিত্রকলার দশার কিছু পরিচয় পাই। উভয় প্রবন্ধেই বলেন্দ্রনাথ কলকাতার আর্ট স্টুডিওগুলি থেকে যেসব পৌরাণিক চিত্র বেরিয়েছে, সেগুলির কঠোর সমালোচনা করেছেন। ঐসব ছবির মধ্যে তিনি কোথাও ভাবের বিকাশ বা শরীরের গঠনপরিপাট্য দেখতে পাননি : সরস্বতীর মুখে কোনো প্রতিভার পরিচয় নেই; আর্ট স্টুডিওর চিত্রকর বহু যত্নে সরস্বতীর মুখের সকল ভাব মুছে ফেলে "একটি অভিনির্বোধাৎ নিষ্প্রভ মুখমণ্ডল রচনা" করেছেন। চৈতন্যের "দারুণ পীতকান্তি" তাঁর যকৃতের পীড়ার সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং চোখের অবিরল জলধারার রূপ দেখলে মনে হয়, চোখ থেকে অবিরল ক্ষীর ঝরছে। কৃষ্ণ, সাহিত্যের বর্ণনায় বর্ণে কৃষ্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু বঙ্গীয় চিত্রকর-অঙ্কিত কৃষ্ণ-চিত্র দেখে মনে হয়, 'শ্রীকৃষ্ণ

গোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং সাধারণের মধ্যে শিল্পকলা বিষয়ে ধারণাবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। শিল্প বিষয়ে তাঁর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার প্রশংসা করা হয়েছিল ন্যাশনাল পেপারে, ২৩ নভেম্বর, ১৮৭০। হিন্দুমেলার শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যাপারে প্রধান সংগঠক তিনিই। ন্যাশন্যাল স্কুলে তিনি চিত্রবিদ্যা ও মূর্তিনির্মাণ শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, সে শিক্ষার সুফল হয়েছিল। শ্যামাচরণ তাঁর শিল্পবিষয়ক পূর্বোক্ত বইখানি হেনরি লক-কে উৎসর্গ করেন; লক সাহেব যেভাবে ভারতীয় শিল্পকলার গুণগৌরব প্রকাশ করেছেন তার জন্য উৎসর্গপত্রে তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ দেন। লক-ও অপরপক্ষে শ্যামাচরণকে সাধুবাদ দেন, কারণ তিনি নিজ মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে স্বদেশবাসীকে শিল্পজ্ঞান দিতে অগ্রসর। কমল সরকার মহাশয় শ্যামাচরণের গ্রন্থ সমকালে কিভাবে সমাদৃত হয়, সে-বিষয়ে কয়েকটি সাময়িকপত্রের উদ্ধৃতি উপস্থিত করেছেন। তাদের মধ্যে দেখি, শ্যামাচরণ যে ভারতীয়দের শিল্পজ্ঞান সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্যের খণ্ডনে অগ্রসর হয়েছেন তার জন্য তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল (যথা, 'সাময়িক পত্র', চৈত্র, সরকার মহাশয়কেও আমাদের ধন্যবাদ—তিনি শ্যামাচরণের রচনাংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, তিনি কিভাবে অন্ধ পাশ্চাত্ত্য চিত্রের অনুকরণের বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। শ্যামাচরণ বলেছিলেন :

"অধুনা কেহ-কেহ ইংরাজদিগের চিত্রবিদ্যার শিক্ষাতে যত্ন নিয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের চিত্ররচনার গুণের মধ্যে প্রায় অবিকল অনুকরণই দেখিতে পাওয়া যায়।..আমার মতে উক্তরূপ অনুকরণ যত দোষের তত গুণের নহে।..অনুকরণমাত্রকে প্রাধান্য দিলে (সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি-চিত্র ভিন্ন) আর সকল চিত্রেরই প্রকৃত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়। কাল্পনিক চিত্রেতেই চিত্রকরের বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে কল্পনাশক্তির যত স্ফূর্তি দেওয়া যায়, ততই তাহা হইতে অভীষ্ট ফল প্রসূত হয়।.. অতএব যাঁহারা চিত্রবিষয়ে নিপুণতা উপার্জন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কর্তব্য এই যে, কোনো স্বভাব-সুন্দর ভাববিশেষের প্রতি অনুরাগী হইয়া কিসে সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, কেবল তাহারই চিন্তায় লাগিয়া থাকেন এবং তাহারই জন্য উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে স্বভাবের অবারিত দ্বারে প্রবেশপূর্বক তাহার আয়োজন করেন—অনুকরণের পথ একেবারেই পরিত্যাগ করেন।"

যুগ-যুগ ধরিয়া সর্বাঙ্গে প্রাণপণে নীল পেন্সিল ঘষিয়াছেন।' মহাদেবকে ছবিতে দেখা যায় "পেশীবিহীন-গঠন, বাবু-মুখশ্রী, তাম্বুলরাগরক্ত-অধর" এক ব্যক্তি। মহাদেবের ললাট থেকে তৃতীয় নয়নের আগুন বেরিয়ে মদনকে ভস্ম করেছিল, সুতরাং ছবিতে দেখা যাচ্ছে, "মহা-দেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত ঝাঁটা" বেরিয়েছে। "করালী কালিকার ভীষণ গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া মন কোথায় ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে," না আর্ট স্টুডিওর ছবিতে "কুৎসিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকার" ছবি দেখা যাচ্ছে, যার বর্ণগভীরতা আনতে রাণীগঞ্জের কালিমার বা আলকাতরার আমদানী করা হয়েছে। "শ্যামার বর্ণ কালরাত্রির ন্যায় বলিলে সত্যসত্যই শ্যামা যে রাণীগঞ্জসম্ভবা, এমন বোঝায় না"—একথা বলার পরে লেখক প্রশ্ন করেছেন—"ভীষণতা তাঁহার কিসে ব্যক্ত হয় নাই! নারীহৃদয় কঠিন হইয়া গিয়া শুধু শোণিত-লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—এ-দৃশ্য ভীষণ নহে? যে-বক্ষে সন্তান স্নেহপান করিয়া পরিপুষ্ট হইত, সে বক্ষ জুড়িয়া সহস্র নুমুণ্ড হইতে তপ্ত রক্ত ঝরিতেছে—ইহাতে কি ভীষণতার অভাব আছে? সে কৃপাণহস্তা উলঙ্গিনী মূর্তিই কি যথেষ্ট নহে?" লেখকের বক্তব্য, "যে-চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করিয়া, জিহ্বাকে হস্তাধিক বিস্তৃত করিয়া দিয়া এবং সর্বাঙ্গে অদ্ভুত রঙ লেপন করিয়া তাঁহার ভীষণতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না।"

শিল্পরসিক বলেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, "একটি রাজনৈতিক অধিকারলাভ অপেক্ষা জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কার্য", এবং "এই গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রাচীন সৌন্দর্যসমূহকে যে-চিত্রকর অক্ষুণ্ণ বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাত্মা।"

এহেন বলেন্দ্রনাথের কাছে রবিবর্মা সেই মহাত্মা যিনি এদেশের চিত্রকলাকে "আদিম রঙলেপা বর্বরতার অবস্থা" থেকে উদ্ধার করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। বলেন্দ্রনাথ আরও চড়াও হয়ে বলেছেন, "বাংলাদেশের আর্ট স্টুডিও ও কালীঘাটের পটের চতুঃসীমার মধ্যে বর্ধিত" যাঁরা, তাঁদের রবিবর্মাকে সমালোচনা করবার অধিকার নেই। বলেন্দ্রনাথ-কৃত রবিবর্মার কিছু পরিচয়-স্তুতি উদ্ধৃত করা যাক :

"দাক্ষিণাত্য...বঙ্গদেশ অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। সেখানে ঠিক যাহা আবশ্যক তাহাই মিলিয়াছে—সভা নহে, সমিতি নহে, কোম্পানী নহে, কলিকাতার মত আর্ট স্টুডিও নহে—একটি যথার্থ চিত্রকরী প্রতিভা, যে কেবল কাপি না করিয়া সৌন্দর্য অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারে।...সেই প্রতিভা রবিবর্মা।...পৌরাণিক এবং অন্যান্য নানা বিষয়ক চিত্রে তাঁহার সৌন্দর্যবোধ ও রসগ্রাহিতার বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার সর্বায়বসম্পন্না নায়ার-রূপসীর চিত্র, শ্যামাঙ্গী গোপাঙ্গনার সুডোল নিটোল গঠন, নয়ন ও অধরের ভাব, লালা রুখ্, রামসীতার পরিণয় বা সুভদ্রার্জুনের প্রণয়দৃশ্য কাহার না চিত্তহরণ করে? তাঁহার শান্তনুর নিকট হইতে পুত্রসহ গঙ্গার পলায়ন, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গার্থে প্রেরিত মেনকা, শান্তনুর প্রণয়জিজ্ঞাসায় সরলা সত্যবতীর সলজ্জ অথচ মুক্ত অকপট ভাব, কোনটি না সুন্দর! যশোদার গোদোহন ও হৃষ্টপুষ্ট গোপালের চিত্র, পূতনাবধান্তে মঙ্গলাচরণকালে শিশু নন্দদুলালের ভাবমাধুর্য এবং কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ হইতে গিয়া রাধিকাকে প্রেমভরে আক্রমণ, কোন্‌টিতে না আমাদের অন্তরে একটি পৌরাণিক আনন্দ সঞ্চার করিয়া দেয়? চিত্রগুলির মধ্যে যে একটু মনোহর ভাব আছে, সেই ভাবটুকু ভারতবর্ষের অন্তরতম হৃদয় মথিত করিয়া উঠিয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। পৌরাণিক চিত্র এমন সুন্দরভাবে এদেশে ইতিপূর্বে কখনও অঙ্কিত হয় নাই। এবং খুঁটিনাটি ত্রুটি থাকিলেও রবিবর্মাই এদেশের প্রথম প্রতিভাশালী চিত্রকর।"

রবিবর্মার ছবি ধরে-ধরে বলেন্দ্রনাথ অতঃপর অনেক ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা লিখেছেন,

সমালোচকের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করবার জন্য দু'একটি ছবির ত্রুটিসন্ধানের চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু তাঁর লেখা থেকে বেশ বোঝা যায়, রবিবর্মা তখন শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে কিভাবে গৃহীত হয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তরুণ বলেন্দ্রনাথ যে-সকল কাঁচা কথা বলেছেন, যেমন ভারতবর্ষীয় প্রাচীন চিত্রের বর্ণাঢ্যতা সম্বন্ধে কটূক্তি ("আদিম রঙলেপা বর্বরতা")—সে-সব বিষয়ে মনে হয় তাঁর ধারণা পরে কিছু বদলেছিল, কিন্তু রবিবর্মার সম্বন্ধে তাঁর সামগ্রিক ভাবাবেগ অব্যাহতই ছিল। 'প্রদীপ' পত্রিকায় তাঁর দেহান্তের পরে ১৩০৬, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় 'রবিবর্মা' নামে যে অসমাপ্ত প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল, যার ভূমিকারূপে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, এইসব রচনার কালে বলেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন—তার মধ্যেও রবিবর্মার চিত্রগুলির রসনিবেদনের ভাবময় চেষ্টা রয়েছে, এবং বিস্ময়ের কথা, রবিবর্মার রচনার দেশী ভাবের উল্লেখও সেখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে যে, বিদেশীয় পটভূমিকা রয়েছে, তা স্বীকার করা হয়েছে যথা, "বিরহিণী যেখানে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া একান্তমনে ধ্যান করিতেছেন, সেখানে তাঁহার পার্শ্বের আলিসাটি হয়ত নিতান্ত আধুনিক স্থাপত্যানুযায়ী ইতালীয় কলস-সজ্জিত।" এই প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ পরিতৃপ্তির সঙ্গে বাংলাদেশে রবিবর্মার ব্যাপক প্রচারের উল্লেখও করেছিলেন।

রবিবর্মা সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের শেষ অসমাপ্ত রচনাটি প্রমাণ ক'রে দেয়, শিল্প-বিষয়ে ধ্রুব আদর্শবোধের অভাব সমালোচকের বিচারকে কতখানি দ্বিধান্বিত ক'রে রাখে। রবিবর্মা সম্বন্ধে ঐ শেষ প্রবন্ধ লেখার সময়েও বলেন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে অনুভব করতে এবং বলতে পারেন নি যে, শিল্পের ক্ষেত্রে রীতির সঙ্গে ভাবের যোগ অবিচ্ছেদ্য, এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতি-সম্পন্ন দেশের শিল্পরীতি তার জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিরূপেই গড়ে ওঠে। রবিবর্মার তৈলচিত্রগুলিতে যে, কল্পনার কোনো বিকাশ নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি যে, থিয়েটারের সুচিত্রিত দৃশ্যপট বা অভিনয়ের রঙিন স্থিরচিত্রের অতিরিক্ত কিছু নয়, একথা বলেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন নি, এবং রবিবর্মার উদ্দিষ্ট পৌরাণিক ভাবময়তাকে যে, পাশ্চাত্ত্য রীতিতে নয়, আমাদের ধারাবাহিক শিল্পরীতির উপর নির্ভর করেই (অবশ্যই কালোপযোগী পরিবর্তনসহ) ফোটাতে হবে, এ বোধও তাঁর জাগেনি।

অথচ, বিস্ময়ের কথা, বলেন্দ্রনাথ ঐ ধারণায় সমর্থ ছিলেন—তার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁর রচনাতেই আছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির প্রভাব তাঁকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, তিনি ভারতীয় শিল্পরীতির সপক্ষে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন নি।

রবিবর্মা সম্বন্ধে শেষ প্রবন্ধ প্রকাশের দেড়বছর আগে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ, ১৩০৫ সংখ্যায় বলেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ এবং আশ্চর্যজনক একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, যার নাম 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', যেটি আমার বিবেচনায় শিল্প-বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা তো বটেই, সমগ্র বাংলা শিল্প-সমালোচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। রচনাটিতে বলেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ সমাসবদ্ধ বাগ্‌বাহুল্য আছে, কিন্তু যেভাবে তাতে মুঘল চিত্রকলার রূপরীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেভাবে ঐ রীতির সঙ্গে ভারতীয় ভাবধর্মের যোগ দেখান হয়েছে. সেইসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জীবনবোধের ও আত্মপ্রকাশ-রীতির সঙ্গে তাব পার্থক্যকে—তা সবিশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারে। দিল্লীর চিত্রশালিকার ছবিগুলির বর্ণনা দেবার কালে বলেন্দ্রনাথ সতর্ক ক'রে বলেছেন, এইসব ছবি বাংলাদেশে নব্য শিক্ষাপ্রাপ্তদের কাছে প্রহেলিকা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যাঁরা তাঁর (বলেন্দ্রনাথের) মতো "কিছুদিন পশ্চিমদেশে যাপন করিয়াছেন, এবং দিল্লীর শ্রেষ্ঠীচত্বরে অথবা জয়পুরের কলাভবনে বিচিত্র দেশীয় শিল্প-কলার মধ্যে এই মনোহারিণী চিত্রবিদ্যার পরিচয় গ্রহণের অবসর পাইয়াছেন" তাঁরা ঐ ছবি বুঝতে পারবেন। একই সঙ্গে বলেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, এইসব চিত্র (মুঘল ও রাজপুত) কেবল পুরাতন বলেই মনোহর নয়, তার রঙ ও রেখার নিপুণ সূক্ষ্ম বিন্যাসের জন্য তা

শিল্পরূপে উৎকৃষ্ট। "ইহার বিচিত্র সূক্ষ্ম রেখাপাত ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রাচ্য বর্ণবিন্যাসে যে-সুন্দর কারুকার্য প্রকাশ পাইয়াছে, এমন রমণীয় কলানৈপুণ্য অন্যত্র কদাচ লক্ষিত হয়।"

বলেন্দ্রনাথ আলোচ্য লেখায় স্থির আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার ভাবধর্ম ও রূপধর্মের পার্থক্য উন্মোচন করেছেন। উৎকৃষ্ট সে রচনা। অনবদ্যভাবে তিনি ভারতবর্ষীয় শিল্পকলার "প্রায় নির্লিপ্তবৎ অনতিসচেতন রচনাকলার" উল্লেখ করেছেন, যা "সকল চেষ্টার ভাব অপসারিত" ক'রে প্রশান্ত স্থৈর্য সঞ্চারিত ক'রে দেয়। প্রাচ্য চিত্রশিল্পের "রঙের বর্বতার" কী অপূর্ব সমর্থন অতঃপর বলেন্দ্রনাথের রচনায় : "আমাদের নিকট ইহা স্বভাবতঃই রমণীয়—বিষয়গুণেও বটে, এবং আরো বিশেষতঃ ইহার রবিকরোদ্ভাসিত বর্ণাভাসে। সে ঔজ্জ্বল্য আমরা আর কোথাও দেখিতে পাইনা। প্রতীচ্য চিত্রে স্বভাবতঃই তদ্দেশেরই সূর্যালোক দীপ্তি পাইয়া থাকে, এবং প্রতীচ্য-বিদ্যাশিক্ষিত নব্য আর্টস্কুলের ছাত্রের রচনারও আলোকসন্নিবেশ প্রায়ই বিলাতী ছবির অনুরূপ হওয়ায় তদ্দেশীয় মৃদু আলোকেই এদেশীয় চিত্র উদ্ভাসিত হয়। আমাদের পুরাতন সূর্যালোক অবহেলালাঞ্ছিত তাহার সেই পুরাতন চিত্রপট আজিও পরিত্যাগ করে নাই।"

পাশ্চাত্ত্য রীতি কি মারাত্মক প্রভাব ভারতীয় চিত্রকরদের উপরে বিস্তৃত করেছে, বলেন্দ্রনাথ তা অভ্রান্ত শক্তিকে উদ্‌ঘাটন করবার সময়ে কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন, সম দোষে দোষী রবিবর্মার কী প্রচণ্ড প্রশংসা তিনি এরপরেও করেছেন। 'প্রয়োগবিজ্ঞানে' ভারতীয় শিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শিল্পকলার পার্থক্যের কথা বলেন্দ্রনাথ যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা অবশ্যই উদ্ধৃতিযোগ্য :

"এই প্রয়োগবিজ্ঞানে অমোঘ পটুত্বই আমাদের ভারতবর্ষীয় শিল্পীর প্রধান গৌরব। এমনকি এই অশিক্ষিত পটুত্বে (!) শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্য রুচি যেখানে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেখানেই তাহার বর্বর স্পর্শে শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অশিল্পী বর্বরেরা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দুইটা শব্দ ও তাহার আভিধানিক অর্থ শিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র, প্রয়োগবিষয়ে তাহাদের ধারণা বালকেরও অধম। তাহারা গালিচার কৃত্রিম পুষ্পকে সর্বতোভাবে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চাহে এবং আমাদের চিরন্তন শালের পাড়ে নেত্ররাগী বর্ণে বিলাতী আদর্শানুযায়ী স্বাভাবিক প্যাটার্ন সজ্জিত করিবার প্রয়াস পায়। ফলে প্যাটার্ন যতই স্বভাবানুরূপ হইয়া আসে, শিল্প মনোহারিতা ততই দূর হইতে থাকে।

"চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যে-কারণে গালিচার জমিতে ও শালের সূচীকার্যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি নিষ্ফল হয়, ঠিক সেই কারণেই আমাদের চিত্রশিল্পে নব্যতন্ত্রের স্বাভাবিকত্ব স্ফূর্তি পাইয়া উঠে না গুহাভিত্তিমূলে যে-চিত্র অংকিত হয়, ক্ষুদ্র গুহাকক্ষের প্রস্তরনিবদ্ধ চতুষ্পার্শ্বে এবং স্থাপত্যের কৃত্রিম গঠনপ্রণালী ও সহস্র কারুকার্যের সহিত তাহার সঙ্গতি সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। এবং এই সঙ্গতির স্বার্থেই খুঁটিনাটির প্রতি দেশীয় চিত্রকরের দৃষ্টি এরূপ তীক্ষ্ণ।...

"নব্য পাশ্চাত্ত্য চিত্রলেখার প্রণালীই কিছু স্বতন্ত্র। শিল্পী সেখানে উচ্চভূমিপরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের দৃশ্যপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে রেখাবর্ণের প্রত্যেক সূক্ষ্মবিভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বৃহৎ প্রকৃতি সেখান হইতে সমগ্রভাবে ভালোরূপ চোখে পড়ে। এই জন্য ঐ সকল ছবি দেখিতে গেলেও একটু তফাতে দাঁড়াইতে হয়, যাহাতে খুঁটিনাটি দৃষ্টিপথে না পড়িয়া সমস্ত চিত্রখানি একদৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। আমাদের চিত্রশিল্প দূর হইতে কেবল মনোহর বর্ণসঙ্গম মাত্র, এবং নিকটে কারুকার্যে চিত্তহারী। এত বিচিত্র সূক্ষ্ম বর্ণবিন্যাস, এত অসংখ্য রঙের সমাবেশ ও তাহার এরূপ মনোহর সামঞ্জস্যবিধান, অন্যত্র এরূপ সুলভ নহে।"

দিল্লীর চিত্রশালিকায় ছবি দেখার পরে বলেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, ভারতের সমগ্র

প্রাচীন সভ্যতার সজীব ঐক্যের পরিচয় তিনি পেয়েছেন। সেখানে কালিদাসের কাব্য, কাদম্বরীর বর্ণনা, তাজমহলের স্থাপত্য, হারেমের প্রসাধনবিলাস, কাশ্মীরী শাল, পারস্য গালিচা, ঢাকাই মসলিন, কটকী রুপার কাজ, দক্ষিণের চন্দনখোদাই শিল্প, সবকিছুর মনোহর মিলন—কিন্তু সেই ধারাকে বর্তমানকালে টেনে আনার কল্পনা যখন তিনি করেছেন, তখন, হায়, বলেন্দ্রনাথ রবিবর্মার স্থূল পৌরাণিক ছবিগুলির বেশী কিছু ভাবতে পারেননি।

বাংলাদেশের বাইরে রবিবর্মার বিপুল সমাদরের চেহারা একবার দেখে নেওয়া চলে। ১৮৯৩ সালে চিকাগোর বিশ্বমেলায় (ধর্মমহাসভা যার অংশবিশেষ) রবিবর্মা ছবি পাঠাচ্ছেন, এটা পর্যন্ত সংবাদপত্রে বহুল উল্লেখের কারণ হয়েছিল।৪৮ সুতরাং ঐ বিশ্বমেলায় রবিবর্মার পুরস্কারপ্রাপ্তি যে দেশের গৌরবকারণ বলে বিবেচিত হয়েছিল, তা না বললেও চলে।৪৯ ১৮৯৩, চিকাগো প্রদর্শনীর পরবর্তী বিরাট প্রদর্শনী হল—১৯০০, প্যারিস প্রদর্শনী। সেখানে রবিবর্মার "মন্দির পথে," "দময়ন্তী ও হংস" এবং "ত্রিবাঙ্কুরের নায়ার নারী" ছবিগুলি দৃষ্টি-আকর্ষক ছিল, একথা স্যার জর্জ বার্ডউড প্যারিস এগজিবিশন বিষয়ে প্রেরিত তাঁর বিবরণে জানিয়েছিলেন। (মাদ্রাজ মেল, মে ৮, ১৯০০)। আগেই

৪৮ মাদ্রাজ মেল, ২৫ মার্চ, ১৮৯৩, জানিয়েছিল, "ত্রিবাঙ্কুরের সুপরিচিত দেশজ-শিল্পী" রবিবর্মা ভারতীয় জীবন নিয়ে অঙ্কিত দশটি তৈলচিত্র চিকাগোর বিশ্বমেলায় পাঠাচ্ছেন। কর্ণাটক প্রকাশিকার ২০ মার্চ, ১৮৯৩ সংখ্যায় এই সংবাদ বেরিয়েছিল।

৪৯ চিকাগো বিশ্বমেলা শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যেই মাদ্রাজের হিন্দু কাগজ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪, টাইমস অব ইণ্ডিয়ার মন্তব্য উদ্ধৃত করে : "ত্রিবাঙ্কুরের সুপরিচিত শিল্পী রবিবর্মা দেশীয় জীবন সম্পর্কে প্রায় এক ডজন ছবি চিকাগো প্রদর্শনীতে গত বৎসর পাঠিয়েছিলেন। এখন শুনেছি, প্রদর্শনীর দর্শকেরা সেগুলির খুবই সমাদর করেছেন, এবং শিল্পী ঐ শ্রেণীর শিল্পের সর্বোচ্চ পুরস্কার ব্রোঞ্জ মেডাল পেয়েছেন। এই বুদ্ধিমান শিল্পী এখন আগামী বোম্বাই প্রদর্শনীর জন্য কয়েকটি ছবি আঁকছেন যা নাকি অসাধারণ [illegible]।" [illegible] প্রকাশিকার ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪, সংবাদে জানতে পারি, রবিবর্মা উক্ত প্রদর্শনীর [illegible] শিল্প বিভাগে তিনটি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার একটি—দেশীয় শিল্পের [illegible] চিত্রের জন্য। বাকি দুটি তৈলচিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য, যাদের বিষয় ছিল—এক, উনিশ শতকের [illegible] নারী; দুই, হিন্দু পুরাণ-কাহিনীর বিরহিণী নারী।]

মাদ্রাজ মেল ২০ মে, ১৮৯৭, জানায়,

"Mr Ravi Varma, the well-known artist of Travancore, whose paintings of Indian life attracted so much notice at the Chicago Exhibition, has received through Messrs Tillery and Co., of Bombay, the medals and diplomas awarded to him for merit. He is to be congratulated on having secured two prizes, one for the artistic excellence and the other for the ethnological value of his paintings, which represented various phases of native life and some of the principal races and castes of India."

একই সংবাদ কর্ণাটক প্রকাশিকায় ২৪ মে, ১৮৯৭ বেরিয়েছিল।

চিকাগো প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্প বহুভাবে পুরস্কৃত হয়। মাদ্রাজ মেলের ৪ জুলাই, ১৮৯৭, সংবাদে দেখি, সে ব্যাপারটি এলাহাবাদের দুঁদে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজের বিস্ময় ও বিদ্রূপের হেতু হয়েছিল :

"The awards gained by India at the Chicago Exhibition, which have been recently published in the *Gazette of India*, are so numerous, at least as regards some classes of exhibits, that they suggest somehow the recollection of a cartoon in a very old volume of *Punch*, in which Louis Philippe of France was depicted showering indiscriminately on mixed crowd hatful of Crosses of the Legion of Honour."

জেনেছি—রবিবর্মা তাঁর ছবি ছাপার জন্য বোম্বাইয়ে লিথোগ্রাফ প্রেস বসিয়েছিলেন। "দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিচালিত" সেই লিথোগ্রাফিক প্রেস থেকে রবিবর্মার "শকুন্তলার জন্ম," ছবিটি যখন বাজারে ছাড়ার আয়োজন হচ্ছে, তখন ঐ ছবির বিস্তারিত ব্যাখ্যা মাদ্রাজ মেলে ১৬ জুলাই, ১৮৯৪ বেরিয়েছিল। রবিবর্মা, চিত্র-সংবলিত তাস বাজারে ছাড়েন, তাও সংবাদ হয়ে ওঠে। (ঐ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০০)। মাদ্রাজ টাইমসে ১০ অগস্ট ১৮৯৪ তারিখে রবিবর্মার "শকুন্তলার জন্ম" চিত্রের সূত্রে উচ্ছ্বসিতভাবে বলা হয়, ভারতীয় চিত্রশিল্প সত্যই উচ্চ আদর্শকে স্পর্শ করতে পেরেছে, তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যাকে উন্নাসিক ইউরোপীয় রুচি পর্যন্ত তারিফ না করে পারবে না। একাধিকবার এ-ধরনের কথা লেখা হয়।৫০ লাহোর ট্রিবিউন রবিবর্মা সম্বন্ধে বিচারপতি জার্ডিনের উক্তি উদ্ধৃত করে : রবিবর্মা ইউরোপে না গিয়েও ইতালীয় মহাশিল্পীদের ভাবপ্রেরণা কিছুটা আত্মসাৎ করতে সমর্থ হয়েছেন।৫১ টাইমস অব ইণ্ডিয়া ১৮৯৬ সালে বোম্বাই-প্রদর্শনীতে রবিবর্মার পুরস্কারপ্রাপ্তির ["তৈলচিত্রে দেশীয় শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার"] প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ করার পরে বোম্বাইয়ের তরুণ ভাস্কর ম্হাত্রে-র "মন্দিরপথে হিন্দু বালিকা" নামক ভাস্কর্যের বিষয়ে বিস্ময়কর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মন্তব্য করেছিল।৫২ মোট সিদ্ধান্ত এই

৫০ "It is evident that Indian art is reaching a high ideal. Judging...from a ..specimen of the work of the Ravi Varma Fine Arts Lithographic Press [*The Birth of Sakuntala*]. [It can be said that]... Indian artists can produce pictures such as even our fastidious European taste will not fail...to admire." [*Madras Times*, Aug. 10, 1894, *An Indian School of Painting*]

কিছুদিনের মধ্যে একই কাগজ রবিবর্মার সরস্বতী চিত্রের উপর আলোচনার শুরুতে যদিচ সরস্বতীর চার হাত দিয়ে কিছু কৌতুক করে, এবং উক্ত চারি হস্তকে যথাস্থানে নিবেশিত করার সমস্যায় উৎপীড়িত শিল্পীর বিষয়ে সমবেদনা প্রকাশও করে, কিন্তু লেখাটির লক্ষ্য ছিল পরিহাস নয়, প্রশংসা—রীতিমতো প্রশংসা :

"These really admirable pictures give very great promise of a first rate future of Indian art. At present, however, Mr Ravi Varma is, like Elljah in Horeb the sole prophet of the Indian Israel... A nation's art is too much for one man's shoulders; and unless there are others to come forward and bear part of the burden it will assuredly topple to the ground." [*Ibid*, Oct. 19, 1894]

৫১ "Mr Ravi Varma, the Indian painter...has apparently, though never in Europe, felt some of the spirit of the Italian masters, says Mr Justice Jardine." [*Tribune*, June 19, 1897]

৫২ "Another chief feature of the Exhibition is... a surprisingly good piece of sculpture by a young Hindu, G. K. Mahtre, a student of the School of Art [of Bombay]. If anyone doubts whether a prophet can come out of Nazareth, let him go and see this figure of a Hindu girl going to the temple. It is probably the bare truth to say that this is the best piece of sculpture that has ever been done in India... It is a work of genius." [*Times of India*, quoted in *Madras Mail*, Feb. 17, 1896]

বম্বে গেজেটে (৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬) জনৈক পত্রলেখক অবশ্য 'জিনিয়াস' ইত্যাদি বলে তরুণ শিল্পী ম্হাত্রে-র মাথা না খেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ম্হাত্রে-র কাজ প্রশংসনীয় কিন্তু এমন কিছু দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেন নি যে অত হৈ-চৈ করতে হবে। চার-পাঁচ বছর প্যারিসে গিয়ে কোনো ভালো ভাস্করের অধীনে থেকে কঠোর পরিশ্রম করলে তবে মানবশরীর এবং তার গতিময় অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ম্হাত্রে-র পুরো ধারণা জন্মাতে পারে—এই ছিল উক্ত পত্রলেখকের বক্তব্য।

করেছিল, "এই প্রতিভাবান শিল্পীর [রবিবর্মার] সৃষ্টি, তৎসহ ম্হাত্রের ভাস্কর্য—এইসকল বস্তু অবিলম্বে চিরতরে ইউরোপীয়দের এই উদ্ধত ধারণা দূর করে দেবে—ভারতীয়রা ইউরোপের পক্ষে গ্রাহ্য মানের শিল্পসৃষ্টির জগতে উত্তরণে সমর্থ নয়। এই ভারতীয়রা যে-প্রকার সামান্য সুযোগ পান, তার দ্বারা কি ইউরোপের জিনিয়াসগণও আরও বড় কিছু করতে পারবেন?"৫৩

॥ ১২ ॥ বিবেকানন্দ কর্তৃক রবিবর্মার সমালোচনা

এমন যে রবিবর্মা—ভারতের শিল্পজগতে নবযুগ প্রবর্তক বলে ঘোষিত—ধন্যধ্বনিত—তাঁর বিরুদ্ধে স্বামীজী সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুকঠোর এক মন্তব্য করে বসলেন, যা সেকালীন পরিবেশে আকস্মিক, বিস্ময়কর, এবং বোধহয় বিরক্তিকর ঠেকেছিল। রবিবর্মাকে ব্যক্তিগত-ভাবে আক্রমণ করা অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—তিনি চাইছিলেন ভারতীয় শিল্পের ভ্রান্ত আদর্শকে নিবারণ করতে। ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর এ-কাজ অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ। রবিবর্মা প্রসঙ্গে তিনি সমালোচনার যে-সূত্র দান ক'রে গেলেন, আমরা দেখি, অতঃপর নিবেদিতা, হ্যাভেল, কুমারস্বামী, অরবিন্দ—সকলে তারই ব্যাখ্যা করে গেছেন।

স্বামীজী রবিবর্মার মূল ছবির সঙ্গে সাক্ষাতে পরিচিত ছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি অবশ্যই বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের সভায়, যেমন ত্রিবাঙ্কুরে বা মহীশূরে, রবিবর্মার ছবি দেখে থাকতে পারেন। আর বরোদায় থাকাকালে রবিবর্মার বিখ্যাত রামায়ণ-মহাভারত সিরিজ যে, দেখেছিলেন—তা জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাসকে বরোদা থেকে লেখা চিঠিতে (২৬ এপ্রিল, ১৮৯২) দেখা যায় : "আমি লাইব্রেরি ও রবিবর্মার ছবি দেখেছি। এখানে দেখবার তো এই আছে।"

রবিবর্মার ছবি "দেখবার যোগ্য"—এই কথার মানে নয় যে, তা সমর্থনের যোগ্য। ইতি-মধ্যেই তিনি রবিবর্মার ছবির সমালোচক হয়ে উঠেছেন—যে-বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাঃ দত্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের কাছ থেকে স্বয়ং শুনেছিলেন—মহারাষ্ট্রে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী যখন স্থানীয় এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে ছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে তিনি রবিবর্মার ছবির ত্রুটি দেখিয়ে দেন। সে ব্যক্তি তো অবাক—ভারতবিখ্যাত শিল্পীর সমালোচনা করছেন এক অপরিচিত সন্ন্যাসী! গৃহস্বামী অবশ্য উক্ত ব্যক্তিকে সমঝে জানিয়েছিলেন—সন্ন্যাসী শিল্পতত্ত্বে কতখানি পারঙ্গম।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল স্বয়ং আরও কিছু জানিয়েছেন। স্বামীজী নাকি সরাসরি রবি-বর্মাকে তাঁর ত্রুটির কথা বলেন :

"প্রসিদ্ধ রবিবর্মার চিত্রকলাকে তখন সকলেই প্রশংসা করে। কিন্তু [স্বামীজী] তাঁহার ত্রুটি দেখাইলে শিল্পী বলেন—এ-পর্যন্ত কেহই দোষ ধরিতে পারে নাই। বোধহয় আপনি একসময় ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাহাতে নরেন্দ্রনাথ কহেন—দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী, তেনাহং জানামি সর্বং ভানুমত্যাস্তিলং যথা।"৫৪

আর একটি সূত্রে রবিবর্মার সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ-পরিচয়ের কথা পেয়েছি। সে-বিবরণ অধিক বিস্তারিত, কিন্তু কতখানি বিশ্বাসযোগ্য জানি না। ডাঃ কে মার্তণ্ড বর্মা-লিখিত রবিবর্মা বিষয়ক একটি পুস্তকে ঐ বিবরণটি আছে যা সম্ভবতঃ রবিবর্মার পারি-বারিক সূত্র থেকে সংগৃহীত।৫৫ ঐ গ্রন্থে পাই :

৫৩ বম্বে গেজেট, রবিবর্মার "বীরাঙ্গনা কুসুমাবতী" চিত্র-প্রসঙ্গে বলে : "শিল্পী এমন একটি চিত্র সৃষ্টি করেছেন যা বর্ণে প্রাচ্য, পরিবেশে নাটকীয়, এবং চিত্রণে উৎকৃষ্ট।" [মাদ্রাজ মেলে, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬, উদ্ধৃত]।

৫৪ বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত," ২৯২

"স্বামীজী [১৮৯৩, চিকাগো বিশ্বমেলায়] বিভিন্ন প্রদর্শনীকক্ষে উৎসুকভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন—ভারতীয় দ্রব্য কোথায় প্রদর্শিত হচ্ছে তার সন্ধানে। কোনো ভারতীয় শিল্পী কি পুরস্কার পেয়েছেন? সহসা তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল রবিবর্মার দশটি তৈলচিত্রের উপর। তাদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, কারণ ছবিগুলিতে উচ্চবর্ণের নারীর রূপ অঙ্কিত হয়েছে বলে মানবজাতি-তত্ত্বের দিক দিয়ে সেগুলির বিশেষ মূল্য আছে। শিল্পী তৎকালীন সামাজিক জীবন ও উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পোষাক-পরিচ্ছদ এবং জিনিসপত্রের অঙ্কনে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। এই রবিবর্মা কে? স্বামীজীর মনে পড়ল, তিনি ১৮৯২ সালে এই শিল্পীর কিছু ছবি বরোদায় দেখেছিলেন।...হরিদাস বিহারীদাসকে তিনি সে-বিষয়ে লিখেছিলেন—২৬ এপ্রিল, ১৮৯২। **তার দু'মাস পরে ভারতে রবিবর্মার সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়।...**

"আমেরিকায় স্বামীজী উপস্থিত—রবিবর্মার দশটি ছবি তাঁর সামনে—কিন্তু শিল্পী নেই। স্বামীজী তাঁকে দেখতে এবং বুকে জড়িয়ে ধরতে উৎসুক। আমেরিকায় স্বামীজী ভারতীয় ভাব-চিন্তার প্রতিনিধি, আর রবিবর্মা ভারতীয় শিল্পের প্রতিনিধি। স্বামীজী শিল্পীর সন্ধান করলেন। না, তিনি আমেরিকায় আসেন নি।...

"চিকাগো থেকে ফিরে স্বামীজী বোম্বাই-এ [?] উপনীত। শিল্পীর নাম তাঁর ওষ্ঠে—তিনি তাঁকে দেখতে উদগ্রীব। যখন তিনি অবতরণ করলেন তখন দেখলেন—শিল্পী তাঁর পদে পতিত। আচার্য তাঁকে তুলে ধরলেন, এবং আশীর্বাদ করে বললেন—আমি ভাবতে আপনাকে মাত্র একবার দেখেছি, কিন্তু চিকাগোয় বহুবার আপনার দশটি ছবি দেখেছি। স্বামীজী একদিনের জন্য রবিবর্মার অতিথি হয়েছিলেন। রবিবর্মার পাচক জাতু আয়েন তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গর্ব করত—আমার এই দুই হাতই স্বামীজীর খাবার তৈরী করেছে এবং পরিবেশন করেছে।"৫৬

স্বামীজী চিকাগোয় অবশ্যই রবিবর্মার ছবি দেখে থাকতে পারেন, এবং ভারতীয়ের গৌরবে তিনি নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে আদর্শের ক্ষেত্রে কদাপি তিনি আপস করতে পারেন না—এক্ষেত্রেও করেন নি। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থের শেষভাগে তিনি রবিবর্মা সম্বন্ধে অবজ্ঞাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত এক উক্তি করেন, যার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে দশ বছরের মধ্যে ভারতের শিল্পালোচনা পূর্ণ হয়ে যাবে। সেকালের পক্ষে দুঃসাহসিক সেই উক্তি এই :

"ওদের [পাশ্চাত্ত্যের] নকল করে এক-আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্র-করা পটো ভালো---তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।৫৭ বরং জয়পুরের সোনালি চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভালো।" [৬-২১৫]

নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক উক্তি। তৎকালীন শিল্পধারণার একেবারে বিপরীত প্রান্তে

৫৫ Dr K. Martanda Varma, *Ravi Varma : A Sketch*, Trivandram (1964). বইটি ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ত্রিবেন্দ্রামে থাকাকালে আমাকে উপহার দেন শিল্পতাত্ত্বিক ও লেখক শ্রীযুক্ত কে পি পদ্মনাভন তম্পি। ইনি বইটির ভূমিকাও লিখেছেন।

৫৬ বর্ণনাটিতে প্রত্যক্ষদর্শনের ছাপ এত বেশি যে, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা কঠিন। তবে আমেরিকা থেকে ফেরার পরে বোম্বাইয়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হতেই পারে না। যদি তা হয়ে থাকে হয়েছিল দক্ষিণ-ভারতের কোনো স্থানে।

৫৭ মাদ্রাজ মেলে ৩ এপ্রিল, ১৯০২, রবিবর্মার এক বাঙালী প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা বলা হয়েছিল। কলকাতার আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক বাঙালী শিল্পী পৌরাণিক বিষয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন, যা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল।

দাঁড়িয়ে স্বামীজী কথা বলেছেন। ঐকালে স্বামীজী ভিন্ন আর কেউ রবিবর্মার ছবির স্থূল-তার কথা এইভাবে বলেছেন বলে আমরা জানি না। স্বামীজী এইসংগে আপেক্ষিকভাবে পটচিত্র ও রাজপুতচিত্রের বর্ণরাগের প্রশংসা পর্যন্ত করেছেন। বাংলার শিল্পান্দোলনের

এই শিল্পী কে? যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়? এ'রই কাদম্বরী-চিত্রের উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিখ্যাত 'কাদম্বরী চিত্র' লেখেন—প্রদীপ পত্রিকায় মাঘ ১৩০৬ সংখ্যায়। প্রদীপে উক্ত চিত্রের প্রতিলিপি ছিল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য চিত্রটির আলোচনা প্রায় না ক'রে, বাণভট্টের কাদম্বরী কিংবা অসামান্য চিত্রশালা, তারই অনবদ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন। রচনার শেষাংশে তিনি যামিনীপ্রকাশের চিত্র সম্বন্ধে এইটুকু বলেন, "কাদম্বরী-পাঠে আমাদের হৃদয়ে পদে-পদে যে একটি পরমানন্দকর চিত্রবেদনার উদ্রেক করে, তাহা চিত্রকরকে আহ্বান করিতে থাকে। সে আহ্বানে যে কিশোরশিল্পী অশিক্ষিতপটু প্রতিভাসহায়ে সাড়া দিয়াছেন তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি, এবং তাঁহার প্রতি যাঁহাদের আত্মীয়জনসুলভ পক্ষপাত থাকিবার সম্ভাবনা নাই [শিল্পী, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় ছিলেন] সেই চিত্রকলাভিজ্ঞ সুযোগ্য গুণী ব্যক্তিদিগকে এই চিত্র সমালোচনার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।"

শশিকুমার হেশ, (ইউরোপে যিনি নানা শিল্প নিদর্শন দেখেছেন বলে আগেই জানিয়েছি) এইকালে সংবাদপত্রে অল্পাধিক উল্লেখের বিষয় হয়েছিলেন। তার মূলে যত-না তাঁর শিল্পসৃষ্টি ততোধিক প্রচার-পারদর্শিতা। মাদ্রাজ টাইমস, ৩ এপ্রিল, ১৮৯৭ তারিখে "বেঙ্গলী আর্টিস্ট" নামক সম্পাদকীয় রচনায় বলে, বহুমুখী গুণসম্পন্ন বাঙালীরা এবার বোধহয় শিল্পের দিকেও হাত বাড়িয়েছে—প্রমাণ শশিকুমার হেশ, যিনি কিছুদিন আগে ময়মনসিংহের রাজার অর্থানুকূল্যে ইউরোপে শিল্পশিক্ষা করতে গিয়েছেন। ইতালিতে শিক্ষাকালে শশিকুমার তাঁর অভিজ্ঞতা-বিবরণ ব্যক্তিগত পত্রে এবং সংবাদপত্রে লিখে পাঠাচ্ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রকাশিত তেমন এক চিঠিতে তিনি যথেষ্ট আত্মশ্লাঘার সঙ্গে নিজের কঠোর পরিশ্রমের কথা বলেন, সেইসংগে মাত্র একজন ইংরাজ শিল্পী ভিন্ন তাঁর মতো গুণান্বিত শিক্ষার্থী যে কেউ নেই, তাও জানান। এই ছেলেমানুষি অহংকারকে খোঁচা দিয়ে মাদ্রাজ টাইমস বলে—শিল্পীরা স্বভাবে ঈর্ষালু; যদি হেশের এইসব কথা অন্য শিক্ষার্থীরা জানতে পারে তাহলে তাকে আগুনে ভাজা-ভাজা করে ছাড়বে। শশিকুমারের অন্য এক পত্রসূত্রে মাদ্রাজ টাইমস, তাঁর এবং বাঙালীদের সার্টিফিকেট-হ্যাংলামির বিষয়ে কটাক্ষ করে। যথার্থ শিল্পী হতে গেলে হেশকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, সেইসংগে কেবল অর্থকরী পোরট্রেট শিল্পী হবার প্রলোভনকে ত্যাগ করতে হবে—তাও সে বলেছিল।

শশিকুমারের পরবর্তী যে-কাজ ভারতে সংবাদপত্রে আলোচনা বিষয় হয়, তা আর কিছু নয়—লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে ৭ নভেম্বর, ১৮৯৯, নিজের শিল্পশিক্ষার অভিজ্ঞতার বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ। (প্রবন্ধটি অবশ্য তাঁর হয়ে অন্য একজন পড়েন)। প্রবন্ধ মধ্যে হেশ কন্টিনেন্টের বিভিন্ন জায়গায় যেসব শিল্প নিদর্শন দেখেছেন, উচ্ছ্বাসের সংগে সেগুলির বিবরণ দেন—সেই সংগে ছিল তাঁর আত্মকাহিনী। হেশের পুরো পেপারটি, এবং সভাপতি স্যার জর্জ বার্ডউড ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির বক্তৃতার বিবরণ, প্রকাশিত হয়েছিল "ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন অ্যাণ্ড রিভিউ" পত্রিকার ডিসেম্বর, ১৮৯৯ সংখ্যায়। বার্ডউড হেশকে পরিচায়িত করতে গিয়ে তাঁর পোরট্রেট-অংকনে দক্ষতার কথা বলেছিলেন। মাদ্রাজ টাইমস এইসূত্রে দুটি সম্পাদকীয় লেখে। তার দ্বিতীয়টিতে (১৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ : "অ্যান ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট") হেশের বিষয়ে স্যার জর্জ বার্ডউড কী বলেছিলেন, তার সারাংশ দিয়ে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়—হেশ যেন শেষ পর্যন্ত পোরট্রেট-পেন্টার হয়ে না দাঁড়ান, কারণ ঐ কাজই ভারতবর্ষে শিল্পীদের পক্ষে একমাত্র সহজে অর্থাগম ঘটায়। হেশ নিজের কবিস্বভাবের কথা যথেষ্ট বলেছিলেন, সুতরাং পয়সা করার সহজ পথে না গিয়ে তিনি সৃষ্টিশীল শিল্পের পথে গেলে দেশের মংগল করবেন। "পোরট্রেট-আঁকার শিল্পে ভারতের মংগল নেই। জীবনের আদর্শায়িত রূপের অংকন করবেন, এমন শিল্পীকে আমাদের চাই। চাই সেই শিল্পীকে যিনি ক্যানভাসের উপর নিজের মন ও চিন্তাকে আরোপ করবেন।" আর প্রথম সম্পাদকীয়তে (২৭ নভেম্বর, ১৮৯৯, "অ্যান ইণ্ডিয়ান অন আর্ট") হেশের বক্তব্যের পর্যালোচনা করা হয়। ভারতে চিত্রশিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়—ভাস্কর্য প্রভৃতির মতো উৎকর্ষ চিত্রশিল্পে এখানে ঘটেনি; এদেশে ঐতিহ্যানুসারী শিল্পীরা বিস্ময়কর পরিমাণবোধ, বর্ণজ্ঞান এবং অলংকরণের ক্ষমতা দেখালেও "বস্তুতঃপক্ষে ভারতে চিত্রশিল্প বলতে যা বোঝায় তা প্রায় নেই। ভারতের মিনিয়ে-

সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন—স্বামীজীর ধারণাকে কিছু পরিমাণে অঙ্গীকার করেই নূতন ধারার যাত্রা শুরু হয়েছিল।

চার চিত্রের কিছু-কিছু অংশে চাতুর্য অবশ্যই আছে কিন্তু তা উচ্চশ্রেণীর শিল্প নয়।" হেশ তাঁর লেখায় আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলায় ফটোগ্রাফিক বাস্তবতার আতিশয্য নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, সেইসঙ্গে চেয়েছিলেন শিল্পে যেন আদর্শ থাকে, যাকে ইউরোপ হারিয়ে ফেলেছে। হেশের এই কথার সমর্থন ক'রে মাদ্রাজ টাইমস বলে—ভদ্রলোকের অনেক কথা তো শুনছি—তাঁর ছবি কই? এবার কথা নয়—ছবি চাই।

হেশের বক্তৃতাসভায় বিপিনচন্দ্র পাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি হেশ-উত্থাপিত 'আদর্শের' প্রশ্নটিকে স্বয়ং বক্তৃতা করতে গিয়ে বিশেষভাবে তুলে ধরেন। আমরা আগেই দেখেছি, [এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০-১৩] এইকালে বিপিন পাল ইংলণ্ডে থিয়জফি এবং বিবেকানন্দের প্রবল প্রভাবের কথা লিখেছেন। বিপিন পালের বক্তৃতার রিপোর্ট : "তাঁর দেশ আধুনিক পৃথিবীতে শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করুক—এই তাঁর বিশেষ বাসনা। স্থাপত্য, খোদাই-কাজ, অপ্রাণীর আলঙ্কারিক চিত্র, এবং সম্ভবতঃ চিত্রশিল্প (যার নমুনা প্রাপ্তব্য নয়) ইত্যাদির কথা সংস্কৃত সাহিত্যে আছে—সেসব বিষয়ে কিছু উল্লেখের পরে মিঃ পাল বলেন, পরবর্তী হিন্দুশিল্পে বাস্তবতাবোধ হারিয়ে যায়, যা উচ্চশিল্পের আবশ্যিক ভিত্তি।...তিনি মনে করেন, মিঃ হেশ তাঁর প্রশংসনীয় রচনার শেষে যে-প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—'কে সেই আদর্শ দান করবে যার অভাবে ইউরোপীয় শিল্প ক্রমক্ষীয়মান?'—তদুত্তরে বলা যায়, একমাত্র ভারতই উপযুক্তভাবে সেই আদর্শ দান করতে সমর্থ। ঐ আদর্শকে হতে হবে আধ্যাত্মিক। গ্রীকদের ক্ষেত্রে, তৎসহ আদি খ্রীস্টীয় শিল্পের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল—এখানেও আদর্শকে ঘনিষ্ঠভাবে ধর্মের সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে। আধুনিক শিল্পের প্রয়োজন এমন আদর্শ যা মনস্বিতা এবং নৈতিকতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারবে। বৈদান্তিক ভাবসমন্বয়ই একমাত্র সেই আদর্শ বস্তু—তারই অভাবে আধুনিক শিল্প আর্ত। বৈদান্তিক থিয়জফিই বহির্গত বস্তুতথ্যের সঙ্গে অন্তর্গত নিত্যসত্যের সমন্বয়ে সচেষ্ট। বক্তা অনুমান করেন, তাঁর দেশ নতুন রেনেসাঁসের নেতা হবে, যা আধুনিক শিল্প এবং আধুনিক ধর্ম-সমূহের মৃতমজ্জায় নবজীবন সঞ্চার করবে।" [ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন অ্যাণ্ড রিভিউ, ডিসেম্বর, ১৮৯৯]।

বিপিনচন্দ্র পাল আশা করেছিলেন—শিল্পের ক্ষেত্রে শশিকুমার হেশ এই ভারতীয় আদর্শের বাহক হবেন। হায়! শশিকুমারের পক্ষে ইউরোপের ক্লাসিক শিল্পের মুগ্ধ স্তুতিগায়ক হওয়া, এবং পোরট্রেট-পেণ্টার হওয়া সম্ভব ছিল—কিন্তু একেবারেই সম্ভব ছিল না ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্ম উপলব্ধি করা। তিনি ভারতীয় পৌরাণিক বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রদীপ পত্রিকায় ১৩০৭-৮ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় "কর্ণকুন্তী সংবাদ" নামাঙ্কিত তাঁর একটি ছবি বেরিয়েছিল, যার পরিচয় লেখেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ছবিতে দেখা যায়—যমুনায় স্নানান্তে কর্ণ সূর্যবন্দনা করছেন, আর তাঁর দৃষ্টির বাইরে বসে অপেক্ষা করছেন কুন্তী—স্বকার্যসাধনের ইচ্ছা নিয়ে। উপেন্দ্রকিশোর উদ্দীপ্ত হয়ে এই ছবির বিবরণ লিখেছেন—যদিও প্রতিলিপি দেখে সে উৎসাহ আমরা একেবারেই বোধ করি না। ছবিতে পাই—কর্ণ দু'হাত স্ট্রেট বাড়িয়ে দিয়েছেন সূর্যের দিকে; মালকোঁচাবাঁধা; হাতের তলা দিয়ে ঘোরানো চাদরে বুকের খানিক ঢাকা; স্বাস্থ্য ভালো, বেশ মাসকুলার, রঘুডাকাতের উত্তম মডেল। তাঁর পিছনে বসে এক স্থূলাঙ্গিনী বিধবা মহিলা, আভাসে বোধহয় চোখে রিমলেশ চশমা আছে, বেশ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে গালে হাত, কর্ণকে নিরীক্ষণ করছেন কটাক্ষে—জাত লেডি সুপ্যারিনটেনডেণ্টের ভঙ্গিতে। ছবিটি দেখিয়ে দেয়—শশি-কুমার যতই বাস্তবতার সমালোচনা করুন, পুরো বাস্তববাদী শিল্পীই ছিলেন—এবং কর্ণকুন্তীকে স্বচক্ষে দেখে তবে তাঁদের ছবি এঁকেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য—রবীন্দ্রনাথ শশিকুমারের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আলোচ্য চিত্রের অল্প কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ" লিখিত হয়। এই ছবি যদি উক্ত কবিতার প্রেরণায় অঙ্কিত হয়, রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় কণ্টকিত হয়েছিলেন, তবে পুলকে নয়।

প্রদীপ পত্রিকায় ১৩০৬, মাঘ সংখ্যায় শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় "শ্রীযুক্ত শশিকুমার হেশ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, দেখেছি। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "অরবিন্দ প্রসঙ্গ"-এর মধ্যে হেশের চমৎকার কথাচিত্র আছে।

॥ ১৩ ॥ স্বামীজী কর্তৃক সমকালীন ভারতীয় শিল্পে পরানুকরণের সমালোচনা

শিল্পের ক্ষেত্রে "পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষার" কঠোর সমালোচনা স্বামীজী বহুভাবে করেছেন। বিশেষ ক'রে যখন তিনি দেখেছিলেন, শিল্পশিক্ষার্থী ভারতীয়রা সেই দেশের ছবির নকল করতে চাইছে, যে-দেশ ইউরোপের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিল্পের দেশ বলে অবজ্ঞাত। স্বামীজীর শিল্পীবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ যখন বলেছিলেন, "সাহেবদের [ইংরেজদের] তো art বেশ"—তখন স্বামীজী ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন—"দূর মূর্খ! আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ্, আর পরের রাঙ্‌টাকে সোনা দেখছে।" স্বামীজীর মতে, ইংরেজদের জীবনের মূল কথা ইউটিলিটি। তাদের বাড়িঘর, পোষাক, সব রূপহীন। তিনি বলেছিলেন, "সাহেবদের ইউটিলিটি আর আমাদের আর্ট।" ইংরেজদের স্থাপত্যের এবং পোষাকের উল্লেখ ক'রে প্রশ্ন করেছিলেন —"ওদের জলখাবার গ্লাস আর আমাদের ঘটি—কোনটায় আর্ট আছে?" দুঃখ করেছিলেন—"ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি-ঘটি ফেলে এনামেলের গ্লাস এসেছে ঘরে।" কিন্তু যেহেতু এযুগে ইউটিলিটিকে বর্জন করা সম্ভব নয়, তাই বলেছিলেন, "এখন চাই আর্ট এবং ইউটিলিটির সংযোগ, যেটা জাপান চট ক'রে করতে পেরেছে, এবং সেজন্যই দ্রুত উন্নতিলাভ করেছে।" [৯-৪০৭]

জীবজন্তু আর ল্যান্ডস্কেপ এঁকে-এঁকেই গেল যে-ইংরেজ, তাদের শিল্পবোধ সম্বন্ধে রীতিমত কঠিন ভাষাতেই স্বামীজী কথা বলেছেন, যদিও তাদের কাব্য নাটক সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল:

"The Anglo-Saxon people have always been badly fitted for art. They have good poetry, for instance. How wonderful is the blank verse of Shakespeare !' [CW. 4-196]

॥ ১৪ ॥ ভারতীয় গণজীবনের শিল্প সম্বন্ধে এবং প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য

শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্যের আর একটি মূল্যবান অংশের উল্লেখ এখানে করে নিতে হয়, যার কথা ইংরেজ ও ভারতীয়ের শিল্পবোধের তুলনাপ্রসঙ্গে এসে গিয়েছিল। শিল্পকে স্বামীজী যেহেতু কেবল কতকগুলি মানুষের ব্যক্তিগত আকৃতির প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি, সমগ্র জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঐ শিল্পবোধের সম্পর্ক দেখতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি ভারতবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রার রূপচ্ছন্দের দিকে তাকিয়ে যথার্থ গৌরবের কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। ভারতীয় বা এশিয়াবাসীর সভ্যতার এক বিশেষ মহিমা—শিল্প তাদের জীবনের অঙ্গাঙ্গি। জাপানের প্রশংসা করতে গিয়ে স্বামীজী একবার বলেছেন, "ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে এশিয়াটিক। আমাদের দেখছিস না সব গেছে তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কতবড় শিল্পী ছিলেন!"

গণশিল্পের প্রতি স্বামীজীর আকর্ষণের পিছনে রয়েছে তাঁর এই মৌলপ্রত্যয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-শিল্প, অর্থসম্পদ কোনোকিছুই বিশেষ গোষ্ঠীর ভোগের বস্তু হওয়া উচিত নয়। কোনো সভ্যতার মহিমা কিছু-সংখ্যক সর্বোচ্চ-শ্রেণীর মানুষকে সৃষ্টি করার উপরে নির্ভর করে না, বহুসংখ্যক উন্নত মানুষ সৃষ্টি করার উপরই তা নির্ভরশীল। শিক্ষার ক্ষেত্রে না পারুক, শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর অংশকে স্পর্শ করতে ভারতবর্ষ পেরে-

ছিল। ইংরাজ-আমলে স্বামীজী তথাকথিত গণতন্ত্রের আড়ম্বরের মধ্যে কিন্তু গোষ্ঠী-অধিকার কায়েম করার চেষ্টাই দেখেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে অনুস্যূত জাতীয় শিল্প-চেতনার পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যে-ধরনের স্থূল ভোগের স্বার্থপরতা এনেছিল, স্বামীজী তা দেখে শিউরে উঠেছিলেন। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন :

"বিশেষ দুর্দশা হয়েছে [বাংলাদেশের] শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোরে আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্র-বিচিত্র করত, বাহার ক'রে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত—সেসব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরনোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরনো কাঠের কাজ, ইঁটের কাজ দেখে এসো গো! কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়াতে পারে না! দোর কি আগড় বোঝবার জো নেই!!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতি যন্ত্র কেনা!!" ['প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য']

মিসেস ওলি বুলকে স্বামীজী ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২, এক চিঠিতে গ্রামবাংলার একটি শিল্পসৌন্দর্যময় খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। গ্রামটি নিঃসন্দেহে আঁটপুর, যা ইদানীন্তনকালে শিল্পরসিক বাঙালীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। স্বামীজী বলেছিলেন :

"আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলা-চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও নাম 'বাংলো।'

"প্রাচীনকালে কোনো ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিল্প বিলুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী ক'রে দিতে পারতাম! তবে এখনো যে-কটি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্ততঃ একটিও।"৫৮

---

৫৮ আঁটপুর স্বামী প্রেমানন্দের গ্রাম। স্বামীজী বহুবার এখানে এসেছেন এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন, এই গ্রামটির কতখানি ঐতিহাসিক মূল্য। এখানেই ১৮৮৬ ডিসেম্বর, বড়দিনের রাত্রে, নরেন্দ্রনাথ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস নেবার সিদ্ধান্ত করেন।

আঁটপুরের আটচালা এবং মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'দেখা হয় নাই' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। আঁটপুর নিয়ে আলোচনা আগে অনেক-বার হলেও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিশেষ মূল্য এইখানে—পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্বন্ধে এতখানি প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা খুব কম মানুষেরই আছে। "সরেজমিনে পশ্চিমবাংলার কয়েক হাজার মন্দির-মসজিদ ও অন্যান্য পুরাকীর্তি পর্যবেক্ষণ করার দুর্লভ সৌভাগ্য" তাঁর হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বলেছেন—আঁটপুরের "বিখ্যাত টেরাকোটা মন্দির ও বাঁশ-কাঠ-খড়ের চণ্ডীমণ্ডপটি...পোড়ামাটির অলংকরণ ও কাঠখোদাইয়ের উৎকর্ষের দিক দিয়ে..পশ্চিম-বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি তাতে সন্দেহমাত্র নেই।" মন্দিরের পোড়ামাটির কাজের বিস্তৃত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন—"টেরাকোটা ভাস্কর্যের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের এ-জাতীয় দেবা-লয়ের মধ্যে [এটি] সর্বোচ্চ।" চণ্ডীমণ্ডপটি সম্বন্ধে বক্তব্য : "চণ্ডীমণ্ডপটির কাঠের কারুকার্যও এত অপরূপ যে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কাঠ-খড় দিয়ে দেবগৃহ নির্মাণের এই বিশিষ্ট রীতিটির নিদর্শন এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে বলে আঁটপুর এ-বিষয়েও প্রায় অনন্য।" চণ্ডীমণ্ডপটির গঠনশৈলী আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "চালের ভারবাহী গোটা কাঠামোকে জোরদার করবার জন্য প্রধান জোড়গুলির মুখে আলাদা যেসব সহায়ক কাঠের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত। বরগা ও খুঁটিগুলির সর্বাঙ্গে ফুলকারি বা অনুরূপ

পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে স্বামীজীর সংযোগের বিষয়ে আর একটি সংবাদ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন এবং গোড়ায় বেলুড়মঠে স্বামীজীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ছিলেন। চীন, জাপান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওকাকুরা ঐসকলের উৎসভূমি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়েছিলেন, এবং সৌভাগ্যের বিষয়, একেবারে সূচনায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল উজ্জ্বল দৃষ্টির আলোকলাভ করেছিলেন। স্বামীজীর গুরুভাই নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে ওকাকুরা প্রথম ভারতের শিল্পতীর্থগুলি ঘুরে দেখেছিলেন। স্বামীজীর কাছ থেকে ওকাকুরা অবশ্যই ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্মের কথা জেনেছিলেন, উল্টোপক্ষে স্বামীজীও নিশ্চয় ওকাকুরার মতো বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জাপানের ও প্রাচ্যদেশের শিল্প কতখানি ভারতীয়, তা শুনে পুলকিত হয়েছিলেন। তার দ্বারা স্বামীজীর পুরাতন ধারণাই সমর্থিত হয়েছিল। শিল্পে এশিয়া এক—এই বক্তব্য যতখানি ওকাকুরার, ঠিক ততখানি বা ততোধিক পরিমাণে বিবেকানন্দের, সেইসঙ্গে নিবেদিতার। ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থের ভাষাতেই কেবল নয়, বক্তব্যেও যে নিবেদিতার প্রচুর হস্তক্ষেপ রয়েছে, তার পক্ষে বহু প্রমাণ আমরা প্রকাশিতব্য 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের এক খন্ডে দিয়েছি।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ওকাকুরা বাংলার শিল্প-আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, একথা সংশিলষ্ট সকলেই স্বীকার করেন।

ভারতশিল্প সম্বন্ধে ওকাকুরাকে স্বামীজী কতখানি অবহিত করেছিলেন, তার অতি সামান্য সংবাদ এখন আমরা পেতে পারি। মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজীর পূর্বে-উল্লিখিত ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০২-এর চিঠি দেখিয়ে দেয়—স্বামীজীর শিল্পশিক্ষা কতখানি ব্যাপক ছিল :

"ছোটখাট একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখার অভিপ্রায় নিয়ে।

"বারাণসীর এক সুশিক্ষিত ধনী যুবা—যার পিতার সঙ্গে আমার দীর্ঘ বন্ধুত্ব ছিল[৫৯]—গতকাল এই শহরে এসেছে। কলাশিল্প সম্বন্ধে সে বিশেষ আগ্রহী। লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার বিশেষ উদ্দেশ্যে সে অকাতরে অর্থব্যয় করছে। মিঃ ওকাকুরা চলে যাওয়ার মাত্র কয়েকঘণ্টা পরে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এই যুবকই ওকাকুরাকে শিল্পভারত (যতটুকু অবশিষ্ট আছে) দেখাবার একেবারে ঠিক লোক। আর আমার বিশ্বাস সে ওকাকুরার কথা শুনে খুবই উপকৃত হবে। ওকাকুরা সদ্য এখানে ভৃত্যরা ব্যবহার করে, এমন একটি পোড়ামাটির জল-পাত্র দেখেছেন। সেটির আকার এবং তার উপরে খোদাই কাজ দেখে তিনি একেবারে চমৎকৃত। কিন্তু এটি সাধারণ মৃৎপাত্র—পথের ধকল সহ্য ক'রে

নকাশি কাজ। এই উচ্চস্তরের কারুকৃতি যে অসংখ্য সুদক্ষ দারুশিল্পীর দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল, সেকথা বলাই বাহুল্য।...চণ্ডীমণ্ডপের দৃষ্টিকটু খড়ের চাল নীচ থেকে যাতে না দেখা যায়, সেজন্য ছাদের ভিতরের দিক ময়ূর-পালকের শাদা ডাঁটি অথবা রঙে ছাপানো শরকাটি বা বেতের চিলতে দিয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। রঙিন কাঠির টানা পোড়েনে নানারকম জ্যামিতিক বা ফুলকারি নকশার সৃষ্টি করা হত, যার নাম ছিল 'রূপসী কাজ।' এ-জাতীয় চারুশিল্পের অক্ষত নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কি না জানি না।" শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন, "বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সেকালের 'সূত্রধর' পদবীর শিল্পীরা...একাধারে কাঠখোদাই ও টেরাকোটা অলংকরণের কাজ করতেন।" আলোচ্য চণ্ডীমণ্ডপটির ইতিহাস আলোচনা করে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—চণ্ডীমণ্ডপটি ২৮৮ বৎসরের পুরাতন।

৫৯ ইনি সম্ভবতঃ প্রমদাদাস মিত্রের পুত্র কালিদাস মিত্র, যাঁর কথা ইতিমধ্যে বলেছি।

টিকে থাকতে পারবে না। ওকাকুরা তাই এর একটি পিতলের নকল তৈরী করিয়ে দেবার অনুরোধ ক'রে গেছেন। কী করি ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। তার কয়েকঘণ্টা পরে যুবক-বন্ধুটি এসে হাজির। এই কাজের ভার নিতে সে যে কেবল রাজি তাই নয়, সেই সঙ্গে বলেছে, ওকাকুরার পছন্দের ঐ পোড়ামাটির কাজের চেয়ে হাজারগুণ ভালো কারুকার্য-করা শত শত পোড়ামাটির পাত্র সে দেখাতে পারে।

"সেই পুরাতন অপূর্ব শৈলীতে আঁকা পুরাতন চিত্রাবলীও সে দেখাবে বলেছে। পুরানো শৈলীতে এখনো আঁকতে পারে, এমন একটিমাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে। *ঐ পরিবারের একজন একটি মটরদানার উপরে গোটা মৃগয়ার দৃশ্য এঁকেছে—খুঁটিনাটি* বিবরণ আর অ্যাকশনের নিখুঁত ছবি। আশা করি, ওকাকুরা ভ্রমণ শেষ ক'রে শহরে ফিরে এই ভদ্রলোকের অতিথি হবেন এবং অবশিষ্ট শিল্পনিদর্শনগুলির কিছু নমুনা দেখে নেবেন।

"নিরঞ্জন মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে গিয়েছে। ওকাকুরা জাপানী বলে তাঁর কোনো মন্দিরে ঢোকায় আপত্তি করা হয়নি। মনে হয়, তিব্বতী ও অন্য উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ বরাবরই শিবপূজার উদ্দেশ্যে এখানে আসছেন। মন্দিরে ওকাকুরাকে শিবপ্রতীক স্পর্শ করতে ও পূজা করতে পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।"

স্বামীজীর এই চিঠিটি কয়েকটি কারণে মূল্যবান। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর শিল্প-বিষয়ে বিনিময়ের সংবাদ তো এর মধ্যে আছেই, অধিকন্তু আছে, মুঘল ও রাজপুত চিত্র-কলা সম্বন্ধে স্বামীজীর মুগ্ধ মনোভাবের পরিচয়। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর যেসব বক্তব্য ইতিমধ্যে উপস্থিত করেছি, তার মধ্যে পাঠক লক্ষ্য করেছেন, চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বক্তব্য প্রায় নেই—সবই প্রায় স্থাপত্য, ভাস্কর্য নিয়ে। বিস্ময়ের কথা, অজন্তা-চিত্রাবলী সম্বন্ধে স্বামীজীর কোনো কথাই পাই না। তা কি অপরিচয়ের জন্য, তিনি কি গ্রিফিথের বই দেখেননি (লেডি হ্যারিংহামের বই অবশ্য আরও প্রায় দশ বছর পরে জন্ম নেবে), তিনি কি অজন্তার ছবি দেখে খুশী হননি (তাকি সম্ভব?), কিংবা অপরপক্ষে অজন্তা সম্বন্ধে অনেক-কিছু বলেছিলেন, লিখিত হয়নি বলেই তার কথা আমরা জানি না? শেষোক্ত ধারণাই ঠিক বলে মনে হয়। আলোচ্য চিঠিতে কিন্তু মুঘল-রাজপুত চিত্রাবলী সম্বন্ধে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত অথচ সমুচ্চ প্রশংসাবাণী পাচ্ছি।

॥ ১৫ ॥ ভারত-শিল্পের পতন সম্বন্ধে বিবেকানন্দ : রিয়ালিজম্ ও আইডিয়ালিজমের সমন্বয়ের প্রশ্ন : শিল্পের প্রাণধর্ম সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ বক্তব্য

শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর যেসকল বক্তব্য তুলে ধরেছি, এবং পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনে তাঁর পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে যা বলেছি, তার থেকে কেউ যেন একথা ধরে না নেন—বাংলাদেশের পরবর্তী শিল্পসৃষ্টির সবটুকু স্বামীজীর পছন্দের আকার ধরে গড়ে উঠেছিল। শিল্পে ভাবের প্রকাশ স্বামীজী চাইতেন, কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার ভাব নিশ্চয় নয়। ভারতীয় শিল্প তার ভাবপ্রকাশের চেষ্টা ও সাফল্যের জন্য পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, একথা তিনি বলেছেন দেখে এসেছি, কিন্তু ঐ প্রয়াসের অনভিপ্রেত পরিণতির রূপও নির্মমভাবে জানাতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। শিল্পের ক্ষেত্রে ভাব কখনো অশরীরী হতে পারে না, অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনরূপকে একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে সে বড় হয়ে উঠতে পারে না। স্বামীজী সবকিছুকে সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন, যদি মূল প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ভারতীয় শিল্পের প্রাণহীন আলংকারিকতার বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর সমালোচনার কিছু অংশ এখানে উপস্থিত করতে চাইছি। ১৮৯৭-এর গোড়ায় মাদ্রাজে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' নামক বক্তৃতায় হিন্দু ও গ্রীক শিল্পসংস্কৃতির তুলনা করার পরে তিনি বলেছিলেন, কোনো জিনিসকে বহির্মুখভাবে দেখার জন্য গ্রীসের মধ্যে "শ্রেণী বিভাগাত্মক বিজ্ঞান সমূহের (Sciences of Generalisa-

tion) এবং অন্তর্মুখভাবে দেখার জন্য ভারতে বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞান সমূহের" (Analytical Sciences) উদ্ভব হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির বাড়াবাড়িতে কি ফল হয়, তা স্বামীজী অতঃপর বলেছেন :

"তারপর যখন জাতীয় প্রাণশক্তি অবলুপ্ত হল—মুসলমানদের ভারতবিজয়ের দু'এক শতাব্দী আগেই সম্ভবতঃ তা হয়েছিল—তখন ভারতের ঐ জাতিগত প্রবণতার এমন বাড়াবাড়ি প্রকাশ হতে লাগল যে, অবনতির সর্বশেষ লক্ষণ দেখা গেল। ভারতের শিল্প, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সবকিছুতেই তার চিহ্ন দেখতে পাই। শিল্পের মধ্যে আর সেই ভাবের বিশালতা, উদারতা রইল না, রচনাশৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দও হারিয়ে গেল—তার বদলে নিদারুণ আলংকারিক বর্ণবহুল এক রীতির উদ্ভব হল। জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্ধান করল। গানের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতের হৃদয়োন্মাদী ভাব। আগে একটি সুর স্বতন্ত্রভাবে নিজের বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হত অথচ একই সঙ্গে অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করত—এখন কিন্তু সুরগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর বজায় রইল না। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীত নানাবিধ সুরের জগাখিচুড়ির মতো—মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টিমাত্র। সঙ্গীতের এই হল অধঃপতন। অন্যান্য ভাবধারণার ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সর্বত্র একই প্রকার আলংকারিকতা এবং মৌলিকতার হানি। ভারতের নিজস্ব ক্ষেত্র ধর্ম—সেখানেও দেখা গেল অধঃপতনের চিহ্ন।"

এই বক্তব্যই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তিনি 'বাংলা ভাষা' নামক প্রবন্ধে কিছুদিনের মধ্যে লিখবেন। উপযুক্ত ভাবহীন অলংকৃতি—তাঁর নিষ্ঠুর উপমায়—"হীরে-মোতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপরে বাঁদর-বসানো"র মতো কাণ্ড। দেশ উৎসন্ন গেলেই সমাস, শ্লেষ ও বিশেষণের বাড়াবাড়ি হয়। স্বামীজীর কথায়, ওসব মড়ার লক্ষণ। "যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু'একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।" স্বামীজী আরও বলেছেন :

"ওটি শুধু ভাষায় নয়। সকল শিল্পতেই এল। বাড়িটার না আছে ভাব, না আছে ভঙ্গি। থামগুলোকে কুঁদে-কুঁদে সারা ক'রে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে। সে গয়নার লতা-পাতা, চিত্র-বিচিত্রর কী ধুম। গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কী ধুম! সে কি আঁকা-বাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের ভিতর দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব।"

সুতরাং জীবনের বলিষ্ঠ প্রকাশ চাই-ই, যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক। স্বামীজীর একটি মৌখিক চিত্রসমালোচনার বিবরণ দিয়েছেন প্রিয়নাথ সিংহ। ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি পাশ্চাত্ত্য-যাত্রার ঠিক আগে স্বামীজী একদিন কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, তাঁর বন্ধু 'কৃষ্ণার্জুন সংবাদ'—এই বিষয়ের একটি ছবি আঁকিয়েছেন। ছবিতে কৃষ্ণ রথের ঘোড়ার লাগাম-হাতে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবির মালিক ছবির সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে চাইলে তিনি গোড়ায় এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত বন্ধু 'দোষগুণ বিচার করে' বলতে জিদ্ করলে স্বামীজীকে অগত্যা বলতে হয়েছিল, "কিছু হয়নি।" কেন কিছু হয়নি, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রথমতঃ বলেছিলেন, কৃষ্ণের রথ আজকালকার 'প্যাগোডা রথ' ছিলনা। প্রিয়নাথ সিংহও 'প্যাগোডা রথের' ধারণায় বাস করতেন। সুতরাং তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন সবিস্ময়ে—প্যাগোডা রথ নয় কেন? উত্তরে স্বামীজীকে বলতে হল : "ওরে, দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না। রাজপুতনায় আজও রথ আছে, অনেকটা

সেই সেকেলে রথের মতো। গ্রীসিয়ান মাইথোলজির ছবিতে যে-রথ আঁকা আছে—দু'চাকার, পিছন দিয়ে ওঠানামা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিষগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। ট্রুথ রিপ্রেজেণ্ট করা চাই, নইলে কিছুই হয় না। যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে, যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় পেণ্টিং শিখতে। তাদের দ্বারা কি কোনো ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা পারফেক্ট ড্রামা লেখা একই কথা।"৬০

স্বামীজী বলা বাহুল্য ছবিকে ড্রামাটিক শিল্প করবার কথা বলেননি, তিনি নাটকের সর্বাঙ্গীণ ভাববিকাশ চেষ্টার দিকে লক্ষ্য করেই ঐকথা বলেছিলেন। প্রিয়নাথ সিংহ প্রশ্ন করেন, কৃষ্ণকে কিভাবে আঁকা উচিত?—তাতে স্বামীজী বলেন, "শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস্? —সমস্ত গীতাটা personified। যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন—তখন তার central idea-টি—তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।" শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্বামীজী এইসঙ্গে ভঙ্গি ক'রে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "[শ্রীকৃষ্ণ] এমনি ক'রে সজোরে ঘোড়া-দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা দুটো প্রায় হাঁটু-গাড়া গোছ, আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ, ক'রে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় Action খেলছে। তাঁর সখা ভুবনবিখ্যাত বীর, দুপক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের উপর বসে পড়েছেন!! শ্রীকৃষ্ণ সেইরকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক-হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই

৬০ শিল্পে বাস্তবতাই যখন অভিপ্রেত, তখন সে সম্বন্ধে স্বামীজী কতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন, 'কাশীধামে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের মধ্যে তার একটি পরিচয় পাই। স্বামী সদাশিবানন্দ কথাসূত্রে জেনেছিলেন : "স্বামীজী একবার ফ্রান্সের এক প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ে আমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে যান। রঙ্গালয়ের পটগুলি বিশিষ্ট শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত। প্যারিস নগরীতে এই ফরাসী রঙ্গশালা ও এই চিত্রশিল্পী তখন সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বামীজী ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, সেইজন্য তিনি অভিনয় বেশ বুঝিতেছিলেন। সহসা যবনিকায় দৃষ্টিক্ষেপ হওয়ায় তত্রস্থ আলেখ্যে কিঞ্চিৎ ভ্রান্তি আছে, ইহা তাঁহার নেত্রে ঠেকিল। অভিনয়শেষে তিনি কার্যাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। শিল্পীও স্বয়ং তথায় থাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ স্বামীজী বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি হইয়া অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্যারিস নগরীতে স্বামীজীকে বহু লোক সম্মান করিত। যবনিকাতে অঙ্কিত আলেখ্যের যে অংশটি অপরিস্ফুট বলিয়া স্বামীজী নির্দেশ করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, বাস্তবিকই সেই স্থানটিতে দোষ আছে—স্বামীজী যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য।"

উল্লিখিত ঘটনার সন তারিখ দেওয়া না থাকলেও ধরে নিতে পারি, স্বামীজী যখন 'প্যারিস কংগ্রেস' উপলক্ষে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে গিয়েছিলেন, তখনই ঐ ব্যাপারটি ঘটেছিল। স্বামীজীকে রঙ্গালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে ধনাঢ্য ব্যক্তি, তিনি মিঃ লেগেট ছাড়া আর কেউ নন। এখানে আমাদের অনুমান করতে ইচ্ছা হয়, ঘটনাটি ঘটেছিল স্বামীজী যখন সারা বার্নহার্ড অভিনীত 'ইৎসীল' দেখতে গিয়েছিলেন তখনই। ইৎসীল বুদ্ধজীবনী অবলম্বনে রচিত; নিউইয়র্কে ১৮৯৬ সালে স্বামীজী এটি প্রথম দেখেন, এবং তখনই সারা বার্নহার্ডের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসেও সম্ভবতঃ একই অভিনয় দেখতে স্বামীজী গিয়েছিলেন। স্বামীজী 'পরিব্রাজকে' লিখেছেন : "বার্নহার্ডের অনুরাগ বিশেষ ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ ত্রেজাঁসিএন, ত্রেসিভিলিজে—অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে ছেলে পুরুষ সাধু নাগা বেলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন যে, 'আজি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে, ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা ঘাট, পরিচয় করেছি।' বার্নহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—সে মঁ ব্যাভ—সে আমার জীবনস্বপ্ন।"

অমানুষী প্রেম করুণামাখা বালকের মত মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে, স্থির-গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে, তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। সমস্ত শরীরে intense action, আর মুখ যেন নীল আকাশের মত ধীর গম্ভীর, প্রশান্ত।"

ছবি সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির অনেকখানি রূপই উপরের বিবরণের মধ্যে পেলাম। পৌরাণিক ছবির ক্ষেত্রে তিনি কল্পনার স্বাধীনতার নামে অযথা তথ্যবিচ্যুতি সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ তথ্যকে ভাব যদি ছাপিয়ে উঠতে না পারে, কোনো শিল্পই যে হয় না, সে বিষয়ে দ্বিধাহীন তাঁর বক্তব্য। স্বামীজী রণদাপ্রসাদকে নিজের অপরোক্ষ দর্শনজাত 'কালী দি মাদার' কবিতার বিষয়বস্তুকে চিত্রায়িত করতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি একই সঙ্গে জানতেন, কত কঠিন ঐ চেষ্টা। ভাব-বিষয়কে, বিশেষতঃ অধ্যাত্ম-বিষয়কে শিল্পায়িত করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্প কিভাবে অতি-প্রতীকী উদ্ভট রূপ নিয়েছে, সে বিষয়ে নিবেদিতাকে তিনি ১৫ জুলাই, ১৯০০, নিউইয়র্কে যেকথা বলেছিলেন, সেগুলি খুবই মূল্যবান। ঐ সম্বন্ধে নিবেদিতার সুদ্য-রিপোর্ট :

"And he [Swamiji] suggested that Hindu painting and sculpture had been rendered grotesque by the national tendency to infuse psychic into physical conception. He said that he himself knew of his own experience that most physical and material things had psychic symbols, which were often to the material eye grotesquely unlike their physical counterparts." [*Reminiscences*, 293]

স্বামীজীর কথাগুলির বিশেষ গুরুত্ব এইখানে—তিনি একেবারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বলেছেন যে, বহির্গত বস্তু অধিমানসলোকে যখন প্রতীক-রূপ ধারণ করে, তখন প্রায়শঃ তা তার বাইরের রূপের তুলনায় উদ্ভটভাবে পৃথক হয়। আক্ষেপের বিষয়, কিভাবে তা হয়, তা দৃষ্টান্তযোগে নিবেদিতার বিবরণে ব্যাখ্যাত পাইনি। তবে স্বামীজী জড়বস্তুর মধ্যে কিভাবে অন্তর্নিহিত ছন্দ অনুভব করতেন তার উল্লেখ তাঁর জীবনীতে ভূরি-ভূরি মেলে। গঙ্গাজলে স্বামীজী হর্ হর্ ধ্বনি শুনতেন, তা তাঁর লেখাতেই পাই। ১৮৯১ সালে পরিব্রাজক অবস্থায় একদিন তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলেছিলেন, আজ, গঙ্গা কেদার-রাগিণী গাইছে শুনেছি। পাখির কাকলি তিনি অনুধাবন করতেন এবং তাদের ঠিক সুরটি গেয়ে দেখাতেন। ঝর্ণার গান শুনেও তার সুর বলতেন। নিবেদিতাকে বলেছিলেন, দেবপ্রতিমা মিথ্যে নয়, সাধকের দৃষ্ট-বস্তু তারা। এক্ষেত্রে স্বামীজীর চরম কথাটি আমরা স্মরণ করতে পারি, নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে যা তিনি বলেছিলেন—যার থেকে গম্ভীর মহান প্রকাশ অল্পই সম্ভব। স্বামীজী তখন কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন হিমালয়কে সামনে রেখে, সেই সময়ে একজন ইউরোপীয় মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রতিমার সামনে ভক্তরা সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে কেন? "এই প্রশ্নে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল তিল ফুলটিকে ফেলিয়া দিলেন, তারপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই পর্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া আর সেই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া, একই কথা নয় কি।" ['স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে']

প্রতীকের ক্ষুদ্র আকার কোন্ বিরাট ভাবের প্রতিনিধিত্ব করে, তার অসাধারণ অভিব্যক্তি এখানে পাচ্ছি।

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য স্বামীজী দেহ-মন প্রাণের অখণ্ড একাগ্রতা একান্ত আবশ্যক মনে করতেন, যার দ্বারা অতিমানস চেতনায় উন্নীত হওয়া সম্ভব। একজন কুস্তিগীরও ভারতবর্ষে তার সাধনার ক্ষেত্রে ঐ একাগ্রতা অর্জনের প্রয়াসী। ঐ জিনিস, স্বামীজীর মতে, কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। "যে-মানুষ

স্বার্থসিদ্ধিতে বা মন্দকাজে নিজেকে ক্ষয় করেছে, সে কখনো কোনো মহান ম্যাডোনামূর্তি আঁকতে পারবে না, বা মাধ্যাকর্ষণ-নীতি আবিষ্কার করতে পারবে না।" নিবেদিতা স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গে আরও বলেছেন : "যে অল্পপ্রাণ সাহিত্য বা হীনদশাপ্রাপ্ত ললিতকলা মানুষকে প্রধানতঃ ভোগাধিকারযোগ্য শরীর বলে মনে করে এবং গৌণভাবে মাত্র তাকে সংযম ও স্বাধীনতার নিত্য লীলাভূমি-রূপ মন ও আত্মা বিবেচনা করে"—স্বামীজীর সমাদর ঐ ধরনের সাহিত্য বা ললিতকলার ধারে-কাছে কখনো এগোত না। আমাদের পাশ্চাত্ত্য আইডিয়ালিজমের সবটা না হলেও অনেকটাই তাঁর কাছে ঐ শরীরভাবের দ্বারা গভীররূপে মণ্ডিত মনে হত এবং তাকে তিনি 'ফুল ঢাকা মৃতদেহের' সঙ্গে তুলনা করতেন।" [দি মাস্টার: 'সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য' অধ্যায়]

একদিকে স্থূল শারীরিকতা, অন্যদিকে জীবনীশক্তিহীন আধ্যাত্মিকতার অভিনয়—স্বামীজীর শিল্পাদর্শ এই দুই অতিরেককে অগ্রাহ্য ক'রে সুস্থ সামঞ্জস্যের পথে চলেছিল। সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ে স্বামীজীর উক্তির উল্লেখ করে শিল্পাচার্য নন্দলাল—স্বামীজীর ভাবাদর্শের একালীন প্রধান শিল্পী—পরিষ্কার বলেছেন, "বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি... চলতি বলার ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়াতে যেমন তৎকালীন সাহিত্য সাধারণের সহজ-বোধ্য ও জোরালো হয়েছিল, স্বামীজীও ঐ পথে বাংলাভাষাকে চালিত করেছিলেন।... [তিনি] শিল্পে বহুদিনের জটিল ম্যানারিজম-কে কঠোর ভাষায় আঘাত করেছেন। আগত-কালের শিল্প তাঁর বাণী অনুসরণ ক'রে আবার সহজ, প্রাণবান ও দৃঢ় হবে। শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর আইডিয়াল শিল্পের backbone-এর মত।" ['শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্প-দীপঙ্কর নন্দলাল']।

স্বামীজীর আদর্শ অন্ততঃ নন্দলালের শিল্পের 'মেরুদণ্ড' হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং একথাও সত্য, নন্দলাল ভিন্ন স্বামীজীর সরল মহান অথচ বলিষ্ঠ ভাবাদর্শ গ্রহণ করবার মতো সামর্থ্য আর কোনো আধুনিক চিত্র-শিল্পীর নেই। প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী বলেছিলেন—কিভাবে গীতার কৃষ্ণকে আঁকতে হবে—সেই আদর্শে নন্দলাল অনেকগুলি 'পার্থসারথি' ছবি এঁকেছেন এবং বহুলাংশে সফল হয়েছেন। আলমোড়ায় একদিন ঊষাকালে দাঁড়িয়ে স্বামীজী হিমালয়ের চিরতুষারের উপরে অরুণোদয় দেখছিলেন; তারপর অরুণরঞ্জিত পর্বতশিখরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে বলেছিলেন—"ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি—ঐ হল শিব আর তাঁর উপরে যে-আলোকসম্পাত হয়েছে, তাই হল জগতের জননী।"

অরূপের সত্য কিভাবে রূপের সত্য হয়ে ওঠে, স্বামীজী মহান ভাষায় তারই কথা বলেছিলেন এবং মহান শিল্পীরা চিরদিন এই তত্ত্বেরই রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। নন্দলাল তেমন একজন সার্থক রূপকার।

একত্রিংশ অধ্যায়

বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ

॥ ১ ॥ বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকার যে-নানা পরিচয় ইতিমধ্যে উপস্থিত করেছি, তার সঙ্গে সগৌরবে আর একটি এখানে যোগ করছি—বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারায় তিনি উল্লেখযোগ্য লেখক—ততোধিক, তিনি এক নতুন সাহিত্যরীতির ক্ষেত্রে পথনির্দেশক।

স্বামীজী বাংলাসাহিত্যের জন্য কতখানি করে গেছেন, তার বিষয়ে সচেতনতা সবে দেখা যাচ্ছে। সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি কিছুদিন আগেও পদাতিকদের দলভুক্ত হয়ে কেবল নামোল্লেখের মহাগৌরব পাচ্ছিলেন! কিন্তু এখন বড় জাতের সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা বলতে শুরু করেছেন—না, আর পাঁচজনের মতো তিনি কিছু ধর্মসাহিত্য লিখেছেন, এটাই সব কথা নয় (বস্তুতঃ সাধারণভাবে ধর্মসাহিত্য বলতে যা বোঝা যায়, বিবেকানন্দ বাংলায় তা প্রায় লেখেন নি), বাংলা চলিত গদ্যের যে রীতি-নমুনা তিনি মাত্র কয়েক শো পৃষ্ঠা লেখার মধ্যে রেখে গেছেন, তাই হল বাংলাসাহিত্যে চলিত রীতির প্রথম আদর্শ রূপ। সাধুরীতির গদ্যও তিনি লিখেছেন—সেখানেও তাঁর রচনার গুরুত্ব অল্প নয়।

স্বামীজীর ভূমিকার মূল্য সম্বন্ধে ইদানীং অল্পবিস্তর যা লেখা হয়েছে, (বিশিষ্ট অধ্যাপক সমালোচকেরাও লেখকদের মধ্যে আছেন; এ-বিষয়ে একাধিক পুরো বই পর্যন্ত লেখা হয়ে গেছে) তাদের মধ্যে বিশেষ মূল্যবান, বাংলাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ,১ যেটি নিঃসন্দেহে স্বামীজীর গদ্য রচনার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন।

এই সকল প্রবন্ধ বা গ্রন্থের লেখকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তবু ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছে, যথা স্বামীজীর লেখার শব্দতাত্ত্বিক আলোচনা প্রায় হয়নি, অথচ ভাষাবিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সে আলোচনার আশু প্রয়োজনের কথা প্রায়শঃ বলে থাকেন। আমাদের আলোচনা অবশ্য সে পরিসরে প্রবেশ করবে না। আমি দুটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দেব—স্বামীজীর গদ্যের মধ্যে কোন্ বিবর্তন ঘটেছিল, এবং তাঁর গদ্যের বিষয়ে সমকালীন মনোভাব কী ছিল?

স্বামীজীর বাংলা রচনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে দশ খণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের "বাণী ও রচনা" বেরিয়েছে। অনেকে মনে করেন—ঐ প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা স্বামীজী বাংলাতে লিখেছিলেন। এহেন স্বাধীন উদাসীন ধারণা যাঁদের নয়, যাঁরা আর একটু সতর্ক, তাঁরাও একথা মনে না-করে পারেন না—"ভারতে বিবেকানন্দ," "কর্মযোগ," "ভক্তিযোগ" প্রভৃতি গ্রন্থ স্বামীজী বাংলাতেই লিখেছেন। স্বাধীনতা-পূর্বকালে ঐসব বই জাতীয়তাবাদী মহলে বহুল প্রচলিত ছিল। বইগুলি বাংলায় লেখা হয়েছে ধরে নিয়ে কেউ-কেউ পরবর্তীকালে তাদের ভাষার গুণদোষের জন্য স্বামীজীকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু পাঠক দেখেছেন, পূর্ব অধ্যায়ে আমরা জানিয়েছি যে, স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ বইগুলি অনুবাদ করেছিলেন।

স্বামীজীর মূল বাংলা রচনার পরিমাণ—এ পর্যন্ত যা পাওয়া গিয়েছে, পত্রাবলীসুদ্ধ—ডিমাই সাইজে স্মল পাইকায় ছাপলে শ'ছয়েক পৃষ্ঠার বেশি হবে না। অর্থাৎ 'বাণী ও রচনার' কিছু-বেশি এক খণ্ড। এই হিসাবের মধ্যে 'বাণী ও রচনা'র অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন দুটি লেখাকেও ধরেছি—হারবার্ট স্পেনসারের 'এডুকেশন' গ্রন্থের অনুবাদ এবং "সঙ্গীত কল্পতরু" গ্রন্থের ভূমিকা।

॥ ২ ॥ বিবেকানন্দের প্রথমজীবনের বিদ্যাচর্চা

বিবেকানন্দের লেখক-ভূমিকার ভূমিকা করতে হলে তাঁর পাঠ-পরিধির একটি হিসাব দেওয়া উচিত, যা কিন্তু কার্যতঃ অসম্ভব কাজ। দেশবিদেশে স্বীকৃত যাঁর পাণ্ডিত্য—যা সর্বদাই বহুমুখিতা ও বহুবিস্তৃতির প্রশংসা অর্জন করেছে—সেই তাঁর পঠিত বিষয়ের হিসাব পাওয়া বা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেব—আমরা যেন ভুলে না যাই, অগণিত লোক ছিলেন বা আছেন যাঁরা বিবেকানন্দের চেয়ে সংখ্যায় বেশি বই পড়েছেন; জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশেষ-বিশেষ ধারায় বহু বৎসরের অনুশীলনে এঁরা অনেকেই সমধিক বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিবেকানন্দের পাঠানুশীলনের বৈশিষ্ট্য অন্যত্র—তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা (দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কি নেই সেখানে), যা তাঁর বিশাল মনের ক্ষুধার খাদ্য হয়ে অসাধারণ মানসিক স্বাস্থ্য দিয়েছিল। সেইসঙ্গে অধীত বিষয়কে কেবল মস্তিষ্কের সঞ্চয়ে তিনি আবদ্ধ রাখতেন না (অনেক পণ্ডিতই 'আমি এত-এত বিষয় জানি গো' প্রমাণ করতে পারলেই আত্মতৃপ্ত)—উপযুক্ত প্রয়োগও করতে পারতেন। ঐ অর্জিত জ্ঞান একদিকে তাঁকে তর্কে অপরাজেয়, আলোচনায় ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছিল, অন্যদিকে দিয়েছিল বিরাট প্রজ্ঞা, যা জগৎ ও জীবনের সত্যচিত্র উদ্‌ঘাটনে সর্বদা নিয়োজিত ছিল। পাণ্ডিত্যের ভূমি থেকে উত্থিত, বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে ও রসে সঞ্জীবিত, সুমহান জ্ঞান-বনস্পতির মতো তিনি বিরাজমান ছিলেন।

স্বামীজীর জীবনীকারেরা বলেছেন, পরীক্ষার বই পড়ার চেয়ে বাইরের বই পড়ায় তাঁর আগ্রহ অধিকতর ছিল। নরেন্দ্রনাথের মতে, পরীক্ষার জন্য ততটুকু পড়াই ভাল যা পড়লে মোটামুটি পাস করা যায়; পাস করাটা অবশ্যই প্রয়োজন অর্থনৈতিক কারণে, কিন্তু জ্ঞানচর্চার সঙ্গে পরীক্ষার পড়ার বিশেষ সম্পর্ক নেই, এবং যারা পরীক্ষা পাসের পরে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে দেয়, তারা করুণার পাত্র।২ নরেন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কব, এবং আশ্চর্যরকম দ্রুত পঠনের শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন, বইয়ের পৃষ্ঠা ত্বরিতে উল্টে গেলেও গোটা বক্তব্য চিত্রাকারে তাঁর চোখের সামনে ভাসত, সে-বিষয়ে নানা ব্যক্তির সাক্ষ্যও পাওয়া যায়, যার ফলে তাঁর অর্জনের পরিমাণ হয়ে উঠেছিল বিপুলায়তন। এইজন্য যখন জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ রেভাঃ উইলিয়ম হেস্টি বলেছিলেন, (যে-বিষয়ে আগে উল্লেখ করেছি) বহুদেশ ভ্রমণ এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর ধারণা হয়েছে—নরেন্দ্রনাথ দত্ত সত্যই জিনিয়াস, তাঁর মতো ছাত্র জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও বিরল—তখন কথাটাকে বিরাট প্রশংসা বলেই ধরতে হবে, কারণ হেস্টি-সাহেব স্বয়ং দিকপাল পণ্ডিত, বহুভাষাবিদ, কবি, দার্শনিক, লেখক—সেকালে ভারতবর্ষে তাঁর তুল্য ইংরাজ পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না।৩ সর্বাত্মক পাণ্ডিত্যে গৌরবান্বিত অধ্যাপক রঙ্গাচার্য, কিংবা ভারততত্ত্বে

বিশেষজ্ঞ বালগঙ্গাধর তিলক বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যের বিষয়ে মুগ্ধ ছিলেন—সেকথা আমরা পুনশ্চ স্মরণ করতে পারি, এবং হার্ভার্ডের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক রাইটের কথাও, যিনি তিরিশ বছরের তরুণ সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্যকে হার্ভার্ডের সমবেত পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা অধিক ভাবতে প্ররোচিত হয়েছিলেন।

তবু কৌতূহল থাকে, তিনি কি-কি পড়েছিলেন, অন্ততঃ বিশেষভাবে তিনি কোন্ বিষয়কে ভালবাসতেন। এক্ষেত্রে একটা সহজ সন্ধানের পথ আছে—তাঁর সমাজবিজ্ঞানমূলক লেখাগুলির কিছু বিশ্লেষণ করে দেখা—তাদের মধ্যে পড়াশোনার ইঙ্গিত কী পরিমাণে পাওয়া যায়। সে চেষ্টাও আমি এখানে করব না, যদিচ ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতো মনস্বী ইতিহাস-লেখক ঈষৎ কৌতূহলে স্বামীজীর একটি-দুটি লেখা নাড়াচাড়া করে তাঁর "অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের ব্যাপকতায়" কিরূপ বিস্মিত হয়েছিলেন, সেকথা আগেই বলেছি। [৩য়, ৩৭২]।

সে যাইহোক, বিভিন্ন সাক্ষ্যসূত্র থেকে তাঁর বিশেষ আকর্ষণের বই সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিতে পারি, যার দ্বারা আংশিক আলোকপাত অন্ততঃ হবে।

স্বামীজীর জীবনী থেকে আমরা জেনেছি, বাল্যকালে গণিত ও ইংরাজি তাঁর অপছন্দের জিনিস ছিল। গণিত তখন তাঁর মতে, "মুদির দোকানের বিদ্যে,"৪ আর ইংরাজি ম্লেচ্ছ ভাষা, "ওটা পড়িতে নাই।"৫ আমরা সকৌতুকে লক্ষ্য করি, পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে ফলিত গণিত পড়েছেন, এবং এমন ইংরেজি শিখেছিলেন, যা অনেকের কাছে বিস্ময়যোগ্য মনে হয়েছিল। তদুপরি, স্বামী বিবেকানন্দের পরবর্তী জীবন তো "ম্লেচ্ছ" শব্দ এবং তার পশ্চাদ্বর্তী ঘৃণার ভাবের বিরুদ্ধে বিরাট যুদ্ধঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়।

নিতান্ত শৈশবেই নরেন্দ্রনাথ অনেক ভারতীয় বালকের মতো রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীতে মগ্ন ছিলেন, দেবদেবীর সংস্কৃতস্তোত্র আবৃত্তি করতেন, এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সকল সূত্র কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন।৬

স্কুল-কলেজের শিক্ষাজীবনে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহের বিষয়ের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, এবং ইতিহাস—তিন বস্তুই ছিল। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানপ্রীতি। আমরা জেনেছি, প্রবেশিকা পাসের আগেই তিনি "অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন।"৭ নিজ পিতার ইতিহাসপ্রীতি নরেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলেই মনে হয়। আর দর্শন তো ছিল তাঁর নিজ রাজ্য।

সম্বন্ধে বলেছেন, "উদারচেতা সুপণ্ডিত হেস্টি-সাহেব।" "সাহেবের বহুমুখী প্রতিভা, পবিত্র জীবন ও ছাত্রদিগের সহিত সরল সপ্রেম আচরণের" কথাও তিনি বলেছেন।

অধ্যাপক অলোক রায় হেস্টি সম্বন্ধে এক উৎকৃষ্ট রচনায় ("আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের তথ্যমূলক বিবরণ দিয়েছেন। আমরা তার থেকে জেনেছি : হেস্টি, স্কুল ও কলেজে অসাধারণ ছাত্র ছিলেন; গ্রীক ও লাতিন-সহ একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন; গণিত, পদার্থবিদ্যা, আইন ও চিকিৎসাবিদ্যাতে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। দর্শনের তো তিনি ছিলেন দিকপাল পণ্ডিত—খ্রীস্টীয় ধর্মশাস্ত্রেও। ১৮৯৪ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সর্বোচ্চ উপাধি 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' তাঁকে দান করে। সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় :

"... the Rev. William Hastie, M.A., and B.D. of this University, than whom few of its *alumni* during its history of over 300 years can have had a more distinguished University record."

৪ গম্ভীরানন্দ, ১ম, ৪৭।
৫ মহেন্দ্রনাথ দত্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী," ৫৮।
৬ সারদানন্দ, লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ৬০।
৭ ঐ — ৬৬।

নিবেদিতার মতো মনস্বিনী ইতিহাসজ্ঞ মনে করেছেন—ইতিহাস স্বামীজীর জয়ক্ষেত্র। দেখা যায়, যুক্তিপন্থী নরেন্দ্রনাথ যৌবনে বিজ্ঞানচেতনার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করেছেন —প্রমাণ ছাড়া কোনো বস্তুকে তিনি বিশ্বাস করতে রাজি নন। আবার তাঁর মতো অনুভূতি-লোকে নিত্য অবস্থিত মানুষ সাহিত্যকে কদাপি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তাই স্থির করা দুরূহ হয়ে ওঠে—কোন্ বিষয়ের প্রতি তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ। তবে তিনি যে-জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন, তার অনুসরণে দর্শনই ছিল তাঁর অধিক আলোচনার বিষয়। দ্বিতীয় গুরুত্ব পেয়েছে ইতিহাস।

নরেন্দ্রনাথ তৎকালীন অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতবাসীর অনুরূপভাবে অতীত ভারত-বর্ষকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ-লিখিত গ্রন্থের মধ্য দিয়ে জানতে চাননি। ঐসকল গ্রন্থের আংশিক মূল্য তিনি স্বীকার করতেন, কিন্তু যে-সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার দ্বারা উক্ত পণ্ডিতগণ চালিত হতেন (সংস্কৃতে অনভিজ্ঞতার জন্য তাঁদের অনেকের মধ্যে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এবং ভ্রান্তিও ছিল), তা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ভারতবিদ্যায় প্রবেশের জন্য সংস্কৃতজ্ঞানকে তিনি আবশ্যিক মনে করতেন। সজীব দেশীয় ভাষার পক্ষপাতী তিনি, কিন্তু একই সঙ্গে মনে করেছেন, ঐ উচ্ছল প্রাণপ্রবাহ যেন তার সংস্কৃত-উৎসের কথা স্মরণ রাখে। দেশীয় ভাষা দেবে জীবনের গতি, আর সংস্কৃত দেবে কৃষ্টির তটবন্ধন—এই ছিল তাঁর মত। অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার উৎস-স্বরূপ সংস্কৃতকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করলে ভাষাসমস্যার সমাধান হবে—এমন মতও তিনি পোষণ করতেন। [৫-৩৭০]

স্বামীজী বিশেষভাবে সংস্কৃতচর্চা করেছিলেন। কলেজে-জীবনে তিনি কতখানি সংস্কৃত-চর্চা করেছিলেন, সে-বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই, কিন্তু যখন ঐ পর্বেই তাঁকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে গভীরভাবে প্রবিষ্ট দেখা গেছে, তখন ধরে নিতে পারি, তিনি প্রধান হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন ও অনুশীলনের উপযোগী সংস্কৃত শিখেছিলেন। তারপরে যখন সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের সংকল্প করে বরাহনগর-মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তপস্যায় নিরত, এবং ভারতবর্ষের ধর্মোদ্ধারের বেগময় বাসনায় আলোড়িত—তখন তিনি বিশেষভাবে সংস্কৃতচর্চায় ব্যাপৃত হন, এবং কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) প্রমুখ দু'একজন গুরুভ্রাতাকে সেই সাধনায় সঙ্গী হিসাবে পান। বরাহনগর-মঠের বড় হলঘর, যেটি 'দানাদের ঘর' নামে চিহ্নিত ছিল—সেখানে চলত অবিরাম শাস্ত্রালোচনা। "সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত—এই ষড়্দর্শনে নরেন্দ্র অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইতেন।" তিনিই ছিলেন মধ্যমণি —মীমাংসা তাঁর কাছ থেকেই আসত। আবার উপনীত সিদ্ধান্তকে মহোল্লাসে তিনি কিছু পরেই লণ্ডভণ্ড করে দিতেন। কখনো তীক্ষ্ণ যুক্তিতে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা, কখনো তাঁর বিলয়; কখনো শঙ্করাচার্যের মতস্থাপনা, কখনো-বা তাঁর বিদায়। গীতা, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত—সকলই মূল ধরে আলোচনা হত।৮ এমনই এক পর্বে, বলরাম বসুর বাড়িতে কয়েকদিনের দীর্ঘ বেদান্ত আলোচনার কালে নব-নব ভাবে উন্মোচিত নরেন্দ্রনাথ মহান গর্বে বলেছিলেন : "আমার ভিতরটা যেন একটা বোরা—বোরা ঝেড়ে তোরা সমস্ত বার করে নে—যত চাবি তত পাবি। আমি নিজেই এ-ব্যাপারটা [কিভাবে ঘটছে তা] বুঝতে পারছি না।"৯ স্বামী গম্ভীরানন্দ সঙ্গতভাবেই বলেছেন, "বস্তুতঃ সে গৃহখানি যেন এক মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল।"

স্বামীজী স্বয়ং এইকালে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রকে (যাঁর বহু কথা পূর্ব-বর্তী খণ্ডগুলিতে বলে এসেছি) লেখা চিঠিতে বরাহনগর-মঠের সংস্কৃতচর্চার বিষয়ে

৮ প্রমথনাথ বসু, ১২৯-৩০। গম্ভীরানন্দ, ২২৯।
৯ মহেন্দ্রনাথ, ঘটনাবলী, ১ম, ১২১।

জানিয়েছিলেন। তিনি প্রমদাদাসের কাছে কিছু সংস্কৃত পুস্তক প্রার্থনা করেন—তার মধ্যে পাণিনি ছিল। তিনি লেখেন : "পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ-মঠে সংস্কৃতশাস্ত্রের বহুল চর্চা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকে সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাঁহাদিগের মত, যাহা করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ করিব। অতএব, পাণিনিকৃত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিক ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক। 'লঘু' অপেক্ষা আমাদের বাল্যাধীত 'মুগ্ধবোধ' অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।...আপনি বিবেচনা করিয়া যদি এ-বিষয়ে 'অষ্টাধ্যায়ী' সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহাই (যদি আপনার সুবিধা এবং ইচ্ছা হয়) দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। এ-মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন—ভরসা করি।" [৬-২৮২]।

স্বামীজী মোটামুটি সংস্কৃতজ্ঞানে পরিতৃপ্ত ছিলেন না। ঐ ভাষা ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিকাটি—শাস্ত্রসিদ্ধি বহুলাংশে ঐ ভাষাসিদ্ধির উপরে নির্ভরশীল। তিনি জানতেন, যদি ঐ ভাষাকে তিনি যথোপযুক্তভাবে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে ভারতধর্মের অন্তর্গহনে তিনি যথার্থ আলোকবর্ষণ করতে পারবেন, কারণ সে আলোকের বিপুল সঞ্চয় তিনি তাঁর স্বয়ং-জ্যোতি গুরুর কাছে লাভ করেছেন। স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের যে সব বিক্ষিপ্ত সংবাদ মেলে, তাদের মধ্যে পাই—তিনি জয়পুরে এক সুপণ্ডিত বৈয়াকরণের কাছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়েছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর সেই পাঠ-অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।১০ কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে বেলগাঁও-এ অবস্থানকালে পাণিনি ব্যাকরণে রীতি-মতো প্রবিষ্ট দেখা গেছে।১১

১০ "যখন জয়পুরে ছিলুম, তখন এক মহা বৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়বার ইচ্ছা হল। ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম সূত্রের ভাষ্য তিনদিন ধরে বোঝালেন, তবুও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা করতে পারলুম না। চারদিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'স্বামীজী! তিনদিনেও আপনাকে প্রথম সূত্রের মর্ম বোঝাতে পারলুম না—আমাদ্বারা আপনার অধ্যাপনায় কোনো ফল হবে না বোধ হয়।' ঐ কথা শুনে মনে তীব্র ভর্ৎসনা এল। খুব দৃঢ়সংকল্প হয়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্য নিজে-নিজে পড়তে লাগলুম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ সূত্রভাষ্যের অর্থ যেন করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য কথায়-কথায় বুঝিয়ে বললুম। অধ্যাপক শুনে বললেন, 'আমি তিনদিন বুঝিয়ে যা করতে পারলুম না, আপনি তিন ঘণ্টায় তার এমন চমৎকার ব্যাখ্যা কেমন করে উদ্ধার করলেন?' তারপর প্রতিদিন জোয়ারের জলের মতো অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে যেতে লাগলুম।" [৯-৯৭]

১১ বেলগাঁও-এর জি এস ভাটে তখন ছাত্র, যখন (১৮৯২) স্বামীজী তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : "স্বামীজীকে প্রাচীন রীতিতে সংস্কৃতচর্চায় রীতিমতো পারদর্শী মনে হয়েছিল। তিনি যখন আসেন তখন আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী মুখস্থ করতে ব্যস্ত—সবিস্ময়ে দেখলাম, অষ্টাধ্যায়ীর যে-সকল অংশ মুখস্থ করতে আমার কষ্টের সীমা ছিল না, সেই অংশগুলি তিনি উদ্ধৃত করে গেলেন, এবং সেক্ষেত্রে তাঁর স্মৃতিশক্তি আমার চেয়ে বহুগুণে অধিক। যতদূর মনে পড়ে, আমায় বাবা আমাকে অধীত বিষয়গুলি মুখস্থ বলতে আদেশ দিয়েছিলেন—তা করবার সময়ে কিছু-কিছু ভুল করছিলাম; হতভম্ব হয়ে দেখলাম, স্বামীজী সেগুলি সহাস্যে সংশোধন করে দিচ্ছেন। তারপর যখন অন্য একসময়ে অমরকোষের কিছু অংশ মুখস্থ বলতে আমাকে বাবা বললেন, তখন পূর্ব অভিজ্ঞতায় আমি বুঝে গেছি যে, তা করতে গেলে কিছু ভুল-ভাল হবেই,...সুতরাং আমাদের নবাগত অতিথির সামনে আর বেইজ্জতিতে পড়তে চাইলাম না, যদিও তাতে বাবা চটে গেলেন।" [রেমিনিসেনসেস, ৫৮]

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজী গভীর যত্নে পতঞ্জলির মহাভাষ্য পড়েছেন। পরবর্তীকালে স্বামীজীর বিখ্যাত রাজযোগ গ্রন্থ, ও পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের উপর উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যাত্মক অন্যান্য রচনাদির কথা মনে রাখলে, এই পাঠের গুরুত্ব বোঝা যাবে। খেতড়িতে অবস্থান-কালে তিনি 'সমগ্র রাজপুতনার মধ্যে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ' নারায়ণদাসের কাছে পতঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠ করার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথম দিনেই পণ্ডিত নারায়ণদাস তাঁর ছাত্রের প্রতিভায় মোহিত হয়ে পড়েন। সানন্দে তিনি অতিরিক্ত সময় দিয়ে পড়াতে থাকেন, এবং দীর্ঘ বিস্তারিত পাঠকে স্বামীজীর স্মরণে রাখবার ক্ষমতা দেখে উত্তরোত্তর চমৎকৃত হতে থাকেন। শেষে দেখলেন, স্বামীজীর বিভিন্ন কূট প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অসমর্থ।১২ উল্টোদিকে তিনি স্বামীজীর সাহায্যে জটিল বহু বিষয়ের মীমাংসা করে নিতে লাগলেন। ব্যাপারটা মোটেই অদ্ভুত কিছু নয়, কারণ স্বামীজীর মনীষা অবশ্যই বহু উচ্চস্তরের ছিল।

স্বামীজীর আর এক সংস্কৃত শিক্ষকের কথা আমরা জেনেছি—শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ। অখণ্ডা-নন্দের স্মৃতিকথা অনুযায়ী, ইনি তখন পোরবন্দরের (সুদামাপুরী) শাসনকর্তা ছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, এঁর মতো বেদের পণ্ডিত তিনি ভারতে দেখেন নি। এঁর সঙ্গে নিয়মিত সংস্কৃতে কথাবার্তা বলে স্বামীজী সংস্কৃতে পরিপক্ক হয়ে ওঠেন।১৩

শঙ্কর পাণ্ডুরঙের কাছে তিনি পতঞ্জলির মহাভাষ্য-পাঠ সমাপ্ত করেন। সংস্কৃতশাস্ত্রের বহু কূট বিষয়ও ঐকালে আয়ত্ত করেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি পণ্ডিতজীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। পণ্ডিত এইসময়ে অথর্ববেদের এক ভাষ্য রচনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে বেদের অনুবাদ "স্বামীজীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া ঐ কার্যে তিনি তাঁহার সাহায্য লইতে লাগিলেন, এবং এই কার্যেরই সহায়তাকল্পে বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে কয়েক মাস স্বগৃহে রাখিলেন।"১৪

কিছুদিনের মধ্যে স্বামীজীকে নানাস্থানে সংস্কৃতে কথাবার্তা বলতে দেখা গেছে।১৫ দক্ষিণভারতে বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃতেই তিনি আলাপ-আলোচনা করেছেন। ত্রিবান্দ্রামে ১৮৯২ ডিসেম্বর মাসে তাঁর সঙ্গে পণ্ডিত বণ্ডীশ্বর শাস্ত্রী নামে জনৈক "সংস্কৃতশিক্ষার কঠিনতম বিষয় ব্যাকরণে মহাপণ্ডিতের" যে অল্পসময়ের আলাপ হয়, সে-বিষয়ে উক্ত পণ্ডিত, অধ্যাপক সুন্দররাম আয়াবকে বলেছিলেন : "আলোচনার বিষয় ছিল ব্যাকরণের কিছু কূট বিতর্কিত বিষয়। স্বল্পকালীন আলোচনাতেও স্বামীজী দেখিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞানের অধিকারী এবং সংস্কৃতভাষায় পারদর্শী।"১৬

এর বেশ-কিছু বছর পরে, পাশ্চাত্যদেশে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে স্বামীজী যখন স্বদেশে ফিরেছেন এবং গোপাললাল শীলের বাগানে আছেন (মার্চ, ১৮৯৭), তখন কয়েকজন সংস্কৃত-পণ্ডিতের সঙ্গে স্বামীজীর বিচারের বিবরণ দিয়েছেন স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ('শিষ্য')। বড়বাজার-নিবাসী, মাড়োয়ারীদের দ্বারা প্রতিপালিত, ঐসকল পণ্ডিত স্বামীজীকে যাচাই করতে এসেছিলেন। পণ্ডিতগণ সকলেই অনর্গল সংস্কৃতে কথা বলতে পারতেন। তাঁরা এসেই সংস্কৃতে কথা শুরু করেন, এবং স্বামীজীও সংস্কৃতেই উত্তর দিতে

১২ প্রমথনাথ বসু, ১৯৫।
১৩ অখণ্ডানন্দ, 'স্মৃতিকথা', ৮১।
১৪ গম্ভীরানন্দ, ১ম, ৩৪০।
১৫ বেলগাঁওয়ে থাকাকালে দেখা গেছে, "স্বামীজী কাহাকেও ইংরাজিতে, কাহাকেও সংস্কৃতে, এবং কাহাকেও হিন্দুস্থানীতে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সেজন্য তাঁহাকে একবার একটুও চিন্তা করিতে হইতেছে না।" [হরিপদ মিত্রের স্মৃতিকথা : ৯-৩৬১]
১৬ রেমিনিসেনসেস, ৭৬-৭৭

থাকেন। "পণ্ডিতেরা সকলেই প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্বামীজীকে দার্শনিক কূট প্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন, এবং স্বামীজী প্রশান্ত গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ-বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে, স্বামীজীর সংস্কৃতভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতিমধুর ও সুললিত হইতেছিল। পণ্ডিতগণও ঐকথা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন। সংস্কৃতভাষায় স্বামীজীকে ঐরূপ অনর্গল কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণও সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, কারণ, গত ছয় বৎসরকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী যে, সংস্কৃত আলোচনায় তেমন সুবিধা পান নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল।" দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে একবার 'অস্তি' স্থলে 'স্বস্তি' শব্দ প্রয়োগ করায় পণ্ডিতরা একসঙ্গে হেসে উঠেছিলেন, স্বামীজী সবিনয়ে সেই স্খলনের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন (যদিও স্বামীজী পরে বলেছিলেন, পাশ্চাত্ত্যসমাজে বাদের মূল বিষয় ছেড়ে ভাষার সামান্য ভুল ধরা প্রতিপক্ষের প্রতি অসৌজন্য; এদেশে শস্য ছেড়ে খোসা নিয়ে মারামারি), কিন্তু শেষপর্যন্ত পণ্ডিতগণ অনেক বাদানুবাদের পরে স্বীকার করেছিলেন—সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্যাপ্ত। স্বামীজী নিয়েছিলেন সিদ্ধান্তপক্ষ, আর পণ্ডিতগণ নেন পূর্বপক্ষ। পণ্ডিতরা ছিলেন পূর্ব-মীমাংসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত—স্বামীজী উত্তরমীমাংসা পক্ষ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেছিলেন। আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করলে তাঁরা বলেছিলেন : "ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও ('অস্তি' স্থলে 'স্বস্তি' যদি একবার প্রয়োগও করা যায় সে অপরাধ অবশ্যই অক্ষমণীয়!) স্বামীজী শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয়, এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বাদখণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।" [৯-১৮-২০] পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের মতো নিষ্ঠাবান নিন্দুককেও স্বীকার করতে হয়েছিল—বিবেকানন্দ "সংস্কৃতেও সুশিক্ষিত ছিলেন।" [তৃতীয় খণ্ড, ১৫৮]।

যৌবনে স্বামীজীর অন্যবিধ জ্ঞানচর্চার বিষয়ে আরও কিছু-কিছু সংবাদ নানাসূত্রে পাই। সারদানন্দের রচনা থেকে জেনেছি : "প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরের আরম্ভ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসসমূহ পড়িবার তাঁহার বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মার্শম্যান, এলফিনস্টোন-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থসকল পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এফ-এ পড়িবার কালে ন্যায়শাস্ত্রের যতপ্রকারের ইংরাজি গ্রন্থ ছিল, যথা—হোয়ায়েটলি, জেভনস্‌, মিল-প্রমুখ গ্রন্থকারগণের পুস্তকসকল একে-একে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।" "এফ-এ পরীক্ষার পরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।...ডেকার্টের 'অহংবাদ', হিউম এবং বেনের 'নাস্তিকতা', স্পাইনোজার 'অদ্বৈত-চিদ্বস্তুবাদ,' ডারউইনের 'অভিব্যক্তিবাদ,' কোঁতে ও স্পেনসারের 'অজ্ঞেয়বাদ' প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মতসমূহ আয়ত্ত করিয়া সত্যবস্তু নির্ণয় করিবার বিষম উৎসাহ তাঁহার প্রাণে উপস্থিত হইয়াছিল। জার্মান দার্শনিকগণের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি দর্শনেতিহাস গ্রন্থসকলের সহায়ে কাণ্ট, ফিক্‌টে, হেগেল, শপেনহর প্রভৃতির মতবাদের যথাসম্ভব পরিচয় গ্রহণেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে-মধ্যে মেডিক্যাল কলেজে যাইয়া শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।"১৭

প্রমথনাথ বসু ও গম্ভীরানন্দের লেখা থেকে জেনেছি : এর উপর নরেন্দ্রনাথ গডফ্রে'র অ্যাস্ট্রনমি পড়েছিলেন; সেইসঙ্গে গ্রীনের ইংরাজ জাতির ইতিহাস, অ্যালিসনের ইউরোপের

ইতিহাস, টমাস কার্লাইলের ফরাসি-বিপ্লবের ইতিহাস, এডওয়ার্ড গিবনের রোম-সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের ইতিহাস—পাঠ্যসূত্রে বা স্বাধীনভাবে পড়েন। আমরা জেনেছি, তিনি অ্যারিস্টটল, প্লেটো, হ্যামিলটন, হাক্সলি ভালোভাবে পড়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নরেন্দ্রনাথের মিল, হিউম, স্পেনসার, হেগেল এবং নানা যুক্তিবাদীদের রচনাপাঠের কথা জানিয়েছেন। স্বামীজীর সকল জীবনীতেই (নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথাতেও) হারবার্ট স্পেনসারের দর্শনের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের গভীর প্রবেশের কথা বলা আছে। একসময়ে "স্পেনসারের দর্শনালোচনা তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল।" তিনি এমনকি ঐ বয়সেই স্পেনসারের কোনো মতের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে উক্ত দার্শনিককে পত্র দিয়েছিলেন—প্রশংসাপূর্ণ প্রত্যুত্তরও পেয়েছিলেন, যাতে উক্ত দার্শনিক নাকি আপত্তির কিছু যৌক্তিকতা স্বীকার করে পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করবেন বলেছিলেন।১৮ নরেন্দ্রনাথ স্পেনসারের চিন্তার দ্বারা এমনই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, স্পেনসারের 'এডুকেশন' বইটির অনুবাদ পর্যন্ত করেন, এবং তা প্রকাশিতও হয়।

আমরা আরও জেনেছি, স্বামীজী পরিব্রাজক-জীবনে মীরাটে থাকাকালে স্যার জন লবকের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন খণ্ড পাঠ করেন। স্বামীজীর সঙ্গে ফরাসি সঙ্গীতের বই থাকত। হাক্সলির গ্রন্থাবলী তাঁর বিশেষরূপে পড়া ছিল। ডারউইনও পড়েছিলেন। পেস্তালাৎসিকর শিক্ষাতত্ত্বও। তিনি খ্রীস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের চর্চা কম করেননি। তাঁর উপর টমাস আ কেম্পিসের "ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট" গ্রন্থের প্রভাবের কথা আমরা যথেষ্ট জানি। বরাহনগর-মঠে খ্রীস্টজীবন অবিরাম আলোচিত হত। নরেন্দ্রনাথ সেণ্ট ফ্রান্সিস, সেণ্ট ইগ্নেসিয়াস লয়োলার কাহিনী বলতেন। জুনাগড়ে থাকাকালে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে ইউরোপীয় ইতিহাসের সম্পর্ক-কথা বহুভাবে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে ইউরোপের মধ্যযুগ, গথিক গির্জা, র‍্যাফেলের চিত্র, ক্রুজেড—সবই এসেছে। অর্থাৎ এইসকল বিষয়ে তিনি সবিশেষ পড়াশোনা করেছেন।

আর বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি নরেন্দ্রনাথের অনুরাগ তো মজ্জাগত। বরাহনগর-মঠে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রালোচনার প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার সমকালীন স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করে লিখেছেন : "...কখনো-বা মনে হইতেছে [স্বামীজী] যেন নাগসেন অথবা মিলিন্দ-রাজের সহিত বৌদ্ধদর্শনের গভীর তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা সম্রাট অশোকের শিলালিপি-ক্ষোদন, কারলী, এলিফাণ্টা ও অজন্তার গিরিগুহার বিচিত্র কারুকার্য-বিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন, সারনাথের বিহার, নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রাধান্যকালের সর্বপ্রকার ভিন্ন-ভিন্ন ঘটনা ও কীর্তির সহিত আপনাকে একীভূত করিয়া ফেলিতেন। বৌদ্ধ কাহিনীর আলোচনায় তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী স্পন্দিত হইত। মহাযান, হীনযান প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ ও নবপ্রকাশিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা' পুস্তক প্রভৃতি পাঠে তাঁহারা যেন আপনাদিগকে কতকগুলি বৌদ্ধ শ্রমণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।"১৯

স্বামীজীর এইকালীন পড়াশোনা সম্বন্ধে চমৎকার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায়। তার মধ্য থেকে তাঁর ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি পড়াশোনার বিষয়ে জেনেছি। স্বামীজী বরাহনগর-মঠে উপনিষদ, পঞ্চদশী ইত্যাদির আলোচনা অবিরত করতেন, শঙ্করাচার্যের মতবাদের প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। মনোনিবেশের সঙ্গে বঙ্গবাসীর পুরাণ-গ্রন্থাবলী পড়েছেন। তাঁর গিবন-পাঠের একটি ছবি : "গিবন লইয়া পড়িতে বসিলেন। সকালে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, মধ্যে দুপুরবেলা আধঘণ্টা-তিন কোয়ার্টার আহারাদি করিয়া লইলেন—আবার পড়িতে বসিলেন, সন্ধ্যা হইয়া গেল, প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে লাগিলেন।

এইরূপে তিন দিনে চারখণ্ড গিবন...পড়িয়া লইলেন।" "ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, নেপোলিয়নের বিষয়ে গ্রন্থাদি, ও স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের Statistics-ও নরেন্দ্রনাথের খুব আয়ত্ত হইয়াছিল।" "এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ Physiology, Pathology প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের নানা গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। কি হিন্দু, কি খ্রীস্টান, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান—সকল প্রকার ধর্মগ্রন্থ, দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি অল্পদিনের মধ্যে পাঠ করিয়া লইলেন।" "বরাহনগর-মঠ যখন প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল তখন নরেন্দ্রনাথ অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। হরমোহন মিত্র কালীপ্রসন্ন ঘোষের মারফত এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি হইতে বইগুলি আনাইয়া দিতেন।"২০ মহেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, লক-এর দর্শন নরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে পড়েছিলেন, প্লেটো-চর্চাও করেছেন। "বর্তমান লেখককে [মহেন্দ্রনাথকে] ও কালী-বেদান্তীকে [অভেদানন্দকে] তিনি বলরামবাবুর বাড়িতে প্লেটোর 'ফিডন' পড়াইয়াছিলেন। উবেরওয়েগের হিস্টরি অব ফিলজফি, কাণ্ট ও ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রগুলি তিনি প্রথমেই পাঠ করিয়া লইয়াছিলেন।"২১ নরেন্দ্রনাথ একবার প্লেটো-দর্শনের কিছু জটিল বিষয় কি-ভাবে বুঝিয়েছিলেন, সে প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ বলেছেন : "নরেন্দ্রনাথ শুনিবামাত্র তৎসংক্রান্ত গ্রীক দর্শনশাস্ত্র, জার্মান দর্শনশাস্ত্রে কে কোথায় কি বলিয়াছেন, তাহা অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কালী-বেদান্তী তখন অহোরাত্র দর্শন পড়িতেছিলেন ও উবেরওয়েগের হিস্টরি অব ফিলজফিটা খুব দেখিতেছিলেন। কালী-বেদান্তী সুবিধা পাইয়া নানাবিধ দার্শনিক প্রশ্ন উঠাইতে লাগিল এবং তাহার পঠিত বিষয়ের বহু অস্পষ্ট স্থান প্রতিভাসিত হইতে লাগিল।"২২

পলিটিক্যাল ইকনমি, সোসিওলজি ইত্যাদি নরেন্দ্রনাথের প্রিয় বিষয় ছিল; সেইসঙ্গে ফরাসি বিপ্লববাদের বই, কার্লাইলের 'হীরো অ্যান্ড হীরো ওয়ারশিপ,' এমার্সনের 'রিপ্রেজেনটেটিভ ম্যান' নিয়ে তিনি তর্কালোচনা করতেন—মহেন্দ্রনাথ তাও জানিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথের পঠিত বইয়ের একটা অসম্পূর্ণ হিসাবদানের চেষ্টা করার পরে (সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থাদির কথাও তিনি বলছেন, যাদের উল্লেখ পরে করব) মহেন্দ্রনাথ হতাশ বিস্ময়ে লিখেছেন, "যে-সমস্ত বড়-বড় পুস্তকের নাম করা গেল, তাহা নরেন্দ্রনাথের বিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। যাঁহাকে সমুদ্র-বিশেষ পুস্তকরাজি পড়িতে হইয়াছিল, তাঁহার এক গণ্ডূষমাত্র পরিচয় দেওয়ায় তাঁহার বিদ্যাচর্চার বিশেষ-কিছু পরিচয় দেওয়া হইল না।" এই কথা কেবল মহেন্দ্রনাথের নয়, আরও অনেকেরই। প্রথম খণ্ডে আমি "অত্যুচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন" এক ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করেছি [পৃ. ১১১], যিনি স্বামীজীর মনের প্রসারে বিমূঢ় ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—যে-মনের মধ্যে ঋগ্‌বেদ থেকে রঘুবংশ, কাণ্ট ও হেগেল, তৎসহ প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত ও নীতিশাস্ত্রের সহাবস্থান। ত্রিবাংকুরের এস কে নায়ার লিখেছেন : "স্পেনসার হউক, কালিদাস হউক, ইহুদীদিগের ইতিহাস হউক, আর্য-সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কথা হউক, অথবা, বেদ-বেদান্ত, মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্র হউক, কোনো বিষয়ে তাঁহাকে পশ্চাৎপদ দেখা যাইত না।"২৩

॥ ৩ ॥ বিবেকানন্দের প্রথম জীবনের সাহিত্যপাঠ ও আলোচনা

কৈশোরে ও যৌবনে নরেন্দ্রনাথ অভিনিবিষ্ট সাহিত্য-পাঠক ছিলেন—সেকথা তাঁর সকল জীবনীতেই পাওয়া যায়। "[তাঁহার] অধ্যয়ন শুধু কলেজ-পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ ছিল

না; নভেল, নাটক, মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ ও সাময়িক রচনাদির প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল।"২৪ সারদানন্দ জানিয়েছেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার আগেই তিনি ইংরাজি ও বাংলার সমগ্র সাহিত্য পড়ে ফেলেছিলেন।২৫ বাংলার সাহিত্য-পরিমাণ তখন এমন বেশি-কিছু ছিল না যে, সেটা অসম্ভব কাজ, তবে ইংরাজি সাহিত্য বলতে তখন কলকাতায় প্রাপ্তব্য প্রধান সাহিত্যগ্রন্থগুলি বুঝতে হবে। নরেন্দ্রনাথের যখন ১৪ বৎসর বয়স, মেট্রোপলিটান স্কুলে পড়ছেন, তখন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গিয়েছিলেন, পিতার কর্মস্থলে। সেখানে "বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত একজন পিতৃবন্ধুর সহিত কথা বলিতে-বলিতে একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে খ্যাতনামা গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে বহু গদ্য ও পদ্যাংশ আবৃত্তি করিয়া... স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন।" বরাহনগর-মঠে অবস্থানকালে তাঁকে চৈতন্যচরিতামৃত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধচরিত আলোচনা করতে দেখা গেছে। পরিব্রাজক-জীবনে বেল-গাঁওয়ের ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র তাঁকে ডিকেন্সের পিকউইক পেপারস্ থেকে একটানা দু'তিন পাতা মুখস্থ বলতে শুনেছেন। হরিপদ মিত্র কেবল রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মিশ্র গণিত বিষয়েই তাঁকে ওয়াকিবহাল দেখেননি, তাঁর কাছ থেকে কেবল গীতার মর্মগ্রহণ করতে শেখেন নি, "আবার অন্যদিকে জুল ভার্ন-এর সায়েন্টিফিক নভেলস্ এবং কার্লাইলের Sartor Resartus" পড়তেও শেখেন। [৯-৩৭০]। এই পর্বে মীরাটে জনৈক শেঠজীর বাগানে অবস্থানকালে যখন স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই সেখানে উপস্থিত হয়ে নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন, স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেছেন, স্থানটি যেন দ্বিতীয় বরাহনগর-মঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "প্রতিদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর স্বামীজী সকলকে লইয়া সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠ করিতেন ও বুঝাইয়া দিতেন। এইরূপে একে-একে মৃচ্ছকটিকম্, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, কুমারসম্ভবম্, মেঘদূতম্ এবং বিষ্ণুপুরাণ পড়া হইয়া গেল।"২৬ মাদ্রাজের বিবরণে দেখি : "একদিন কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, শেক্সপীয়ার ও বায়রণ—অন্যদিন হেলেন ও ট্রয়বাসী, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ—এইভাবে দিন-দিন কত প্রসঙ্গই চলিতে লাগিল।"২৭

স্বামীজীর সাহিত্যানুরাগের সর্বাধিক পরিচয় মিলেছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথায়। তিনি নানা স্থানে সেসব কথা বলেছেন। তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক :

"ইংরাজি কাব্যের ভিতর মিল্টন নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহা হইতে মাঝে-মাঝে আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার মিল্টন আবৃত্তি-পদ্ধতি অতি সুন্দর ছিল। গম্ভীর ও তরঙ্গায়মান শব্দে তিনি মিল্টনের শ্লোকগুলি অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন।... শেক্সপীয়ারের গ্রন্থগুলির সহিত তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং আমেরিকায় বক্তৃতাকালে রোমিও জুলিয়েট ও মিড সামার নাইটস ড্রিম হইতে উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বায়রণ তিনি খুবই পড়িতেন এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।২৮ক

২৪ ঐ, ৫০।
২৫ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ৬৬।
২৬ গম্ভীরানন্দ, ১ম, ২৯৬।
২৭ প্রমথনাথ বসু, ২৭৮।
২৮ক মার্থা ব্রাউন ফিনকে তাঁর স্মৃতিকথায় স্বামীজী আমেরিকায় থাকাকালে বক্তৃতা বা কথা-বার্তার সময়ে কি ধরনের দর্শন ও সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার পরিচয় বিকীর্ণ করতেন, সে বিষয়ে বলেছেন :

"To our house came the College President, the Head of the Philosophy department and several other Professors, the ministers of the Northumpton churches and a well-known author... As his imposing presence faced the row of

"বাংলা পুস্তকের ভিতর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর এত মন দিয়া পড়িয়াছিলেন যে, মাঝে-মাঝে সেই পুস্তক হইতে স্থান উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। হীরা মালিনীর কথা লইয়া কৌতুক করিতেন এবং মানসিংহের যশোর-যাত্রা অতি সুন্দর-ভাবে আবৃত্তি করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলী২৮খ ও মাইকেলের কাব্যা-বলী বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। মেঘনাদ বধ কাব্যখানি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় বলিতেন, 'মাইকেলই বাংলাদেশে একটা বিশেষ কবি জন্মে-ছিল।' দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশীর কথা সর্বদাই তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। একটু হাসি-তামাশার কথা হইলেই তিনি সধবার একাদশীর কোনো না কোনো বোল্ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন।২৯ নীলদর্পণ হইতেও তিনি মাঝে-মাঝে আবৃত্তি করিতেন। একথা এখানে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বর গুপ্ত নরেন্দ্রনাথদের গৌরমোহন মুখার্জির গলির বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত ও ওঠাবসা করিতেন। নরেন্দ্রনাথের খুল্লপিতা-মহের সহিত ঈশ্বর গুপ্ত 'ভাই' পাতাইয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা তাঁহাকে খুল্লতাতের ন্যায় সম্মান করিতেন। যদিও ঈশ্বর গুপ্তের কথা নরেন্দ্রনাথ সর্বদা বাড়িতে শুনিতেন কিন্তু তাঁহাকে দেখেন নাই। দীনবন্ধু মিত্র পাড়া-প্রতিবেশী, সেইজন্য শৈশবে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সুদর্শন সবিতা' কাব্যখানি তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং ঐ ছন্দটি তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিত। রামদাস সেনের গ্রন্থগুলি, বিশেষতঃ 'ভারত রহস্য' খুব পছন্দ করিতেন।

"কালিদাসের গ্রন্থের ভিতর কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও মেঘদূত তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহাকে এফ-এ পড়িবার সময় ভট্টি পড়িতে হইয়াছিল। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র ও কাব্যের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। হরমোহন মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি আনিয়া

black-coated and somewhat austere gentlemen, one felt that he was being challanged. Surely these leaders of thought in our world had an unfair advantage. They knew their Bibles thoroughly and the European systems of philosophy, as well as the poets and commentators. How could one expect a Hindu from far-off India to hold his own with these, master though he might be of his own learning? The reaction to the surprising result that followed is my purely sub jective one, but I cannot exaggerate its intensity. To texts from the Bible, the Swami replied by other and more apposite ones from the same book. In up-holding his side of the argument he quoted English philosophers and writers on religious subjects. Even the poets he seemed to know thoroughly, quoting Words-worth and Thomas Grey (not from the well-known *Elegy*)... I felt triumphant with him." [*New Discoveries*, 358-59]

২৮খ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে জেনেছেন, নরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বই বিশেষভাবে পড়েছিলেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, যাঁর সাক্ষ্য পরে উদ্ধৃত হবে, লিখেছেন—স্বামীজী তাঁদের বঙ্কিমের বই পড়তে প্রণোদিত করেছিলেন। বিস্ময়ের কথা হল, অন্য কোনো সূত্র থেকে স্বামীজীর বঙ্কিম-প্রীতির সংবাদ পাই না।

২৯ বরাহনগর-মঠের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত : "একদিন এক ব্যক্তি, সামান্য শিক্ষিত, কিন্তু মৌখিক দু'চারটি বোল শিখিয়া বড় ফড়্ফড়্ করিতেছে, এবং সকলকেই বিরক্ত করিতেছে। লোকটি একটু চপল-স্বভাব। তাহার মুখ খানিকক্ষণ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ শুরু করিলেন, 'ঠিক বলেছিস—তোর বাপ পড়েছে দাতাকর্ণ, তুই পড়বি বোধোদয়'—এই বলিয়া সধবার একাদশী থেকে বোলচাল আরম্ভ করিলেন। কাটাকাটা বোল শুনিয়া লোকটি বড়ই চঞ্চল হইল। যে-ভাবেরই কথা তুলিতে চায় অমনি তার কাটাকাটা জবাব। তখন লোকটি বুঝিল শে, কামারশালের হাতুড়ি কেমন। নরেন্দ্রনাথের মুখে সধবার একাদশীর অভিনয় ও রঙবেরঙের বোলচাল শুনিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।" ['ঘটনাবলী', ১ম, ১২৮-২৯]

দিত আর নরেন্দ্রনাথ সেইগুলি পড়িয়া লইতেন। 'ললিতবিস্তর'খানি তাঁহার বিশেষ জানা ছিল।...রাজপুতনায় অবস্থানকালে জৈনদের পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া লইয়াছিলেন। বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃতশাস্ত্র তিনি যে জানিতেন তাহা বলা বাহুল্য।"৩০

মহেন্দ্রনাথের রচনার অন্যান্য স্থান থেকে আমরা আরও জেনেছি : স্বামীজী বুনিয়নের 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস' ভালভাবে পড়েছিলেন, টডের রাজস্থান প্রায় মুখস্থ ছিল৩১ এবং গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি নাটক খুবই পছন্দ করতেন।

স্বামীজী যে বাংলা, ইংরাজি ও অন্যান্য সাহিত্যের আলোচনা যথেষ্ট করেছেন, এবং আলোচনাকালে যে তাঁর সাহিত্যানুভূতি ও পাণ্ডিত্য উদ্ঘাটিত হত, একথা বহু সাক্ষ্যেই দেখা যায়। কিন্তু সাহিত্যের আলোচনা অবশ্যই পরবর্তীকালের স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া সম্ভব নয়, বড় জোর দু'একটা মোটা কথা বেরিয়ে আসতে পারে, লেখক যাতে তাঁর বিস্ময়-স্মৃতি নিবেদন করেছেন। বরাহনগর-মঠে একদিনের এহেন সাহিত্যালোচনার বিষয় জানিয়ে মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "ক্রমে-ক্রমে আলোচনাটা এত গম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়া উঠিল যে, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিল। ঘরেতে যেন ভাবতরঙ্গ দুলিতে লাগিল। এক গ্রন্থের একপ্রকার ভাব হইতে শ্রোতার মনকে অন্য গ্রন্থের অন্য ভাবে অতর্কিতভাবে লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক গ্রন্থের প্রত্যেক চরিত্রের ভাব-ভঙ্গি, আচার-পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বাংলাসাহিত্য তিনি কতদূর পাঠ করিয়া-ছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার কতদূর দখল ছিল, সেইদিন তিনি সকলকে দেখাইয়া দিয়া-ছিলেন। নোকা ধোপার যাত্রা (শ্রীমন্তর শ্মশান) হইতে গোবিন্দ অধিকারীর ছন্দ পর্যন্ত বিষয় তিনি সেইদিন বলিয়াছিলেন। বাংলাসাহিত্য বিষয়ক এইরূপ বক্তৃতা ও উপলব্ধি খুব কম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেক দিনের কথা—সমস্ত কথাগুলি ঠিক-ঠিক মনে নাই—কেবল আনন্দের একটি স্মৃতিমাত্র আছে।"৩২

মহেন্দ্রনাথের দুঃখের অংশ আমরাও গ্রহণ করতে পারি, কারণ মহেন্দ্রনাথ স্মৃতি থেকে উক্ত আলোচনার যে-বিবরণ দিয়েছেন, তা আলোচনার গভীরতার কোনো চরিত্রই দান করে না। ভারতচন্দ্রের কাব্যের কিছু প্রসঙ্গ তাতে আছে। ঝড়ের গম্ভীর বর্ণনার পরে ভারতচন্দ্র যেভাবে ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানির বর্ণনায় ইতর লঘুত্ব এনেছিলেন, নরেন্দ্রনাথ তার সমালোচনা করেন, পরে অত্যন্ত গভীর কণ্ঠে 'যশোর নগর ধাম' ইত্যাদি অংশ আবৃত্তি করেন, যার মধ্যে পুরনো বাংলাকাব্যের দেশপ্রেম ও বীরত্বের কিছু আভাস মেলে। হীরা মালিনীর বেসাতি অংশও তিনি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন, সেই লোভী ও অভিজ্ঞ বৃদ্ধার চতুরালির সম্বন্ধে বিতৃষ্ণাপূর্ণ কটাক্ষও করেছেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যদীপ্তি নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই স্বীকার করতেন, বিদ্যাসুন্দরের বয়েৎ তিনি সময়-সুযোগে আওড়াতেন (তাঁর প্রথম সন্ন্যাসী-শিষ্য সদানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের পরেই

৩০ ঘটনাবলী, ২য়, ১৬৩-৬৬।

৩১ টডের রাজস্থান স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে তিনি রাজপুত বীর ও বীরাঙ্গনাদের কাহিনী অজস্রমুখে বলতেন। বাংলাসাহিত্যে এই গ্রন্থের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি একবার উৎসাহে বলেছিলেন, "বাংলার ইদানীংকালের জাতীয়তা-ভাবের দুই-তৃতীয়াংশ এই বই থেকে গৃহীত।" ['স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে', ১৩০]। স্বামীজীর উৎসাহ—অত্যুৎসাহ বলে সমালোচিত হতে পারত কিন্তু ডঃ বরুণ চক্রবর্তী চমৎকার এক গবেষণাযোগে দেখিয়েছেন—স্বামীজীর কথা কত সত্য। পি-এইচ-ডি উপাধিপ্রাপ্ত এই গবেষণার নাম : "বাংলাসাহিত্যে টডের রাজস্থান গ্রন্থের প্রেরণা।"

৩২ ঘটনাবলী, ১ম, ১৭৫।

তিনি সকৌতুকে গেয়েছিলেন, 'বিদ্যা যদি লভিতে চাও, চাঁদমুখে ছাই মাখো'—তা আগেই দেখেছি), কিন্তু একইসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দুর্নৈতিকতার কঠোর সমালোচনাও করেছেন। [৯-২১১]। মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে (অবশ্যই আখ্যান কবিদের মধ্যে) তিনি কবিকঙ্কণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন।৩৩

সমকালীন বাংলার প্রধান নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ গভীর পরিচয়ের কথা তাঁর জীবনীপাঠকের জানা আছে। গিরিশচন্দ্রের অধ্যাত্ম নাটকগুলি, যা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে রচিত (স্বামীজীর প্রভাবও গিরিশের নাটকের উপর যথেষ্ট; এ-বিষয়ে অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থে উপযুক্ত আলোকপাত করেছেন)—অবশ্যই স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহের বস্তু ছিল। বরাহনগর-মঠে তিনি গিরিশের 'দক্ষযজ্ঞ', 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধচরিত' নাটকের গান প্রায়ই গাইতেন, তা আমরা জেনেছি।৩৪ নানাসূত্র থেকে জানা যায়—গিরিশের বিল্বমঙ্গল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ছিল, এবং তাঁর প্রভাবে নাটকটি সম্বন্ধে নিবেদিতা উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।৩৫

৩৩ *CW, V,* 259

৩৪ ঘটনাবলী, ১ম, ৭৬, ৮১-৮২, ৮৩-৮৪।

৩৫ নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে দেখা যায়, তিনি বিল্বমঙ্গলের অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। ৪ জানুয়ারি, ১৮৯৯, মিসেস এরিক হ্যামন্ডকে লিখেছিলেন :

"I am finding great riches in Bengali. If Mr Hammond would learn it he would make his fortune by translation. I have undertaken a play. I cannot understand why we have never heard of these things. From all accounts this play would stand comparison with Ibsen's Brand."

নিবেদিতার ৯ জানুয়ারি তারিখের চিঠি থেকে বোঝা যায়, তিনি যে-নাটকখানি অনুবাদের জন্য নিয়েছিলেন, তা বিল্বমঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়।

নিবেদিতা সম্ভবতঃ নাটকটির সম্পূর্ণ অনুবাদ করে উঠতে পারেন নি। তবে তিনি যে, অপরের করা অনুবাদ সংশোধন করেছিলেন তা দেখতে পাই "লুসিফার" পত্রিকার ৯ ডিসেম্বর, ১৯১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত এক চিঠিতে, যাতে উক্ত অনুবাদ প্রকাশের জন্য প্রকাশক চাওয়া হয়েছিল। পত্রটি এই :

"I shall deem it a great favour if you or any of your numerous readers kindly enlighten me...[with] the name and address of any publisher, Indian or foreign, willing to take up an English translation for publication of a five act religious drama of the highest class, composed by the late Grish Chandra Ghose... Babu Girish Chandra has written a large number of plays, religious, social, domestic, romantic, and historic, including a translation of Macbeth—a literary achievement of no mean order. Under the slender foundation of a story narrated in the Hindi work *Bhaktamal* or a garland of saints, he has raised a superstructure at once substantian and imposing and the composition forms an epoch in the history of the author's trend of religious thought. It is the first drama—a drama with a mission and the mission is the one with which the Ramkrishna Mission, established long after its composition, is associated—he wrote after having in contact with the master-spirit of the age—the late Paramahansa Ramkrishna, whose pithy and homely utterances have been seized upon and worked up with a skill that is entirely the author's own... No work of Babu Girish Chandra Ghose is invested with a greater charm and interest than the book in question, of which an able rendering into English by a veteran edu-

বিল্বমঙ্গল পাঠের পরে, নরেন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "দ্যাখ, আমি সংস্কৃত এবং ইংরাজিতে বহু কাব্য পড়েছি; মিল্টন, শেক্সপীয়ার, কালিদাস আমার কণ্ঠস্থ, কিন্তু বিল্বমঙ্গল-খানা কেমন আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে।" বলাবাহুল্য, একথার মানে নয় যে, নরেন্দ্রনাথ ঐ নাটকটিকে মিল্টন শেক্সপীয়ারের নাটকের সমতুল বা তুলনায় শ্রেষ্ঠতর মনে করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে তিনি অধ্যাত্ম ভাবপ্রকাশে বিল্বমঙ্গলের সাফল্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। সন্দেহ নেই—যে-অন্ধ একাগ্র উন্মত্ত প্রেম ঐ নাটকে উন্মোচিত, যা রূপান্তরে উন্মত্ত ঈশ্বরাভিসারে পর্যবসিত—সে প্রেমের রূপ ঐকালে ঈশ্বর-মত্ত নরেন্দ্রনাথের কাছে প্রাণহারী হওয়ারই কথা, বিশেষতঃ নরেন্দ্রনাথ যখন দেখেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরদাহ বিল্বমঙ্গলের অংশবিশেষকে অগ্নিস্নান করিয়েছে।

তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় স্বামীজী প্রশংসা ঢেলে দিয়েছিলেন মধুসূদনের মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে। প্রায়শঃই তিনি ঐ কাব্যের আলোচনা করতেন। বলরাম বসুর বাড়িতে বসে নরেন্দ্রনাথ একদিন কিভাবে মধুসূদনের আলোচনা করেছিলেন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের সংলাপ আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন, লক্ষ্মণের কাপুরুষতা, সেইসঙ্গে বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলবার সময়ে তাঁর মুখ ঘৃণা ও খেদে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল—সেসব কথা মহেন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন।৩৬ 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' স্বামীজীর মেঘনাদবধ আলোচনার কথা আছে :

"মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা তুলিয়া [স্বামীজী] বলিলেন—'ঐ একটা অদ্ভুত জিনিয়াস তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মতো দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।" [৯-২১১]

'শিষ্য' মধুসূদনের 'শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তার' কথা তোলেন। স্বামীজী সে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন : 'তোদের দেশে কেউ একটা-কিছু নূতন করলেই তোরা তাকে তাড়া করিস।... যাই কিছু আগেকার মতো না হল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধ কাব্য—যা তোদের বাংলা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কিনা 'ছুঁচোবধকাব্য' লেখা হল! তা, যত পারিস লেখ্ না—তাতে কি! সেই মেঘনাদবধ কাব্য এখনও হিমাচলের মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।...মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায়, যে-কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণে কি বুঝবে? এই যে জি-সি [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] কেমন নূতন ছন্দে কত চমৎকার-চমৎকার বই আজকাল লিখছে, তা নিয়েও তোদের অতিবুদ্ধি পণ্ডিতগণ কত Criticise করছে, দোষ ধরছে। জি-সি কি তাতে দ্রূক্ষেপ করে?"

স্বামীজী অতঃপর মেঘনাদবধের অংশবিশেষ আবৃত্তি করে শিষ্যকে শুনিয়েছিলেন—"সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠনভঙ্গি আজও শিষ্যের হৃদয়ে জ্বলন্ত—জাগরূক রহিয়াছে।" স্বামীজী, উক্ত কাব্যের যে-অংশকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করতেন, সেই অংশ আবৃত্তি করেন। তা কিন্ত প্রথম সর্গের অংশ-বিশেষ নয়। আমরা সানন্দ বিস্ময়ে লক্ষ্য করি—স্বামীজী মেঘনাদবধের বীররসের সর্বোত্তম প্রকাশ যেখানে ঘটেছে—সেই সপ্তম সর্গকেই নির্বাচন করেছিলেন। উক্ত অংশ পড়বার আগে স্বামীজী বলেছিলেন : "যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মুহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে—কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসংকল্প...সেই স্থান হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কবিকল্পনা।" [৯-২১২]

cationist, with a kind revision by the late Sister Nivedita, is intended for publication."

॥ ৪ ॥ বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ

সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনার সূচনাতেই বলে নেওয়া যায়—এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মূল জীবনধর্মেরই অনুযায়ী—তিনি আদর্শায়িত সাহিত্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন, যদিও আদর্শায়িত বলতে তিনি জীবন-বিরহিত কিছু মনে করতেন না। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংযোগ চাইই, সেখান থেকেই আহরণ করতে হবে প্রাণরস, কিন্তু জীবন মৃত্তিকাতেই আবদ্ধ—এমন নীচস্থ আধিভৌতিকতা তাঁর ছিল না। তিনি জীবনকে যতখানি বহির্গত ততোধিক অন্তর্নিহিত মনে করতেন। আর অন্তর ব্যাপারটিকে তিনি মনোবৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধিবেষ্টনীতে কারারুদ্ধও করতে রাজি হননি। তাঁর কাছে অন্তর্জগৎ সীমাহারা। বলা চলে, সীমার বন্ধনকে ভাঙাই গভীর মানুষের জীবনের সাধনা। সাহিত্যকে এই বিরাট ভূমিকায় তিনি দেখতে চেয়েছেন। তাই লৌকিক ইন্দ্রিয়-চেতনাকে সর্বাশ্রয় যাঁরা করতে চান, তাঁরা তাঁর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রচয়িতা নন। পূর্ণ একাগ্রতার দ্বারা সমাহিতচিত্তে যে-আলোকোদয় হয়, তাকেই মানুষ ঐশী প্রেরণা, দিব্যজ্ঞান বা অতীন্দ্রিয় প্রতিভা বলে থাকে—এইকথা বলার পরে স্বামীজী বলেছিলেন : "ধর্মের মতোই কলা-শিল্প ও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্যও ঐ প্রকার দিব্যজ্ঞান আবশ্যক! যে-মানুষ অন্যবিধ নীচ বা স্বার্থপর উপায়ে আত্মক্ষয় করে—সে কখনো [র্যাফেলের মতো] অপূর্ব মহিমময় মাতৃমূর্তি অঙ্কিত করতে পারেনা, কিংবা আবিষ্কার করতে পারেনা [নিউটনের মতো] মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মাবলী।"৩৭ স্বামীজী প্রসঙ্গে নিবেদিতার উক্তি পুনশ্চ তুলছি : "যে অল্পপ্রাণ সাহিত্য ও হীনতাপ্রাপ্ত ললিতকলা মানবকে মুখ্যতঃ ভোগ্য দেহ বলে মনে করে—এবং মাত্র গৌণভাবে আত্মজয় ও আন্তর স্বাধীনতায় চিরসমর্থ মন ও আত্মা বলে বিবেচনা করে—তেমন সাহিত্য ও ললিতকলাকে তিনি ভুলেও প্রশংসা করেননি। আমাদের পাশ্চাত্ত্য 'আইডিয়ালিজমে'র অনেকটাই, সবটা অবশ্য নয়, তাঁর মতে, পূর্বোক্ত দৈহিকতার চেতনায় রঞ্জিত, যার বিষয়ে তিনি সর্বদাই বলতেন--'পুষ্পাবৃত শবদেহ'।"৩৮ এখানেই এসে যায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যাত্মচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর সম্ভ্রমসূচক মনোভাবের কথা। তাঁর মতে : "ভারতে নাটক ও সঙ্গীত অতি পবিত্র বস্তু বলে বিবেচিত হয়। এগুলিকে লোকে ধর্মসাধনের অঙ্গ মনে করে। লোকের ধারণা : প্রেমসঙ্গীত হোক, বা অন্য যাই হোক—যদি কেউ সঙ্গীতে তন্ময় হয়ে যেতে পারে, তাহলে তার অবশ্যই মুক্তি-লাভ ঘটে। লোকের বিশ্বাস : ধ্যানের দ্বারা যে-ফললাভ হয়, সঙ্গীতেও তাই হয়ে থাকে।" [৮-২৪৩]।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উৎস গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি। আমি পূর্ব অধ্যায়ে গ্রীক ও ভারতীয়ের জীবনদৃষ্টির পার্থক্যের বিষয়ে স্বামীজীর উক্তি যথেষ্ট তুলেছি। উভয় ভূমির নিসর্গপ্রকৃতির পার্থক্য কিভাবে উভয় জাতির মনোধর্মের পার্থক্য ঘটিয়েছে, তা সেখানে দেখেছি। একই প্রসঙ্গে কথিত তাঁর আরও কিছু কথা এখানে উপস্থিত করা যায়। গ্রীসের সাফল্যের ও সীমাবদ্ধতার হেতু চমৎকারভাবে তিনি নির্দেশ করেছিলেন; গ্রীক-মনের আনুগত্য ক'রে ইউরোপীয় মন কিভাবে বস্তুবদ্ধ ও জাতীযতাবাদী হয়ে উঠেছে, সেকথাও। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রদত্ত "ঈশদূত যীশুখ্রীস্ট" বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :

"গ্রীক-মনের কাছে তার সন্নিহিত সমাজই সর্বস্ব। তার বাইরে যা-কিছু আছে সকলই বর্বর। গ্রীকের ধারণা : গ্রীক ছাড়া আর কারো বাঁচবার অধিকার নেই। সে যা করে তাই

৩৭ *Complete Works of Sister Nivedita*, Vol. I, 219
৩৮ *Ibid*, 220

সঠিক ও নির্ভুল; তার বাইরে পৃথিবীতে যা আছে তা ভ্রান্ত; সুতরাং তাদের বাঁচতে দেওয়া যায় না। এইভাবে গ্রীক-মনের সহানুভূতি একান্তই মানবিক ও প্রাকৃতিক, তদনুযায়ী শৈল্পিক হয়ে উঠেছে। গ্রীকরা একেবারে এই পৃথিবীরই নাগরিক; স্বপ্ন-কল্পনার জগৎ তার জন্য নয়। এমনকি তাদের কাব্যও ব্যবহারিক। তার দেবদেবীরা দেহরূপে কেবল মানব নয়, তাঁদের বাসনা ও অনুভূতি একেবারে সাধারণ মানুষের মতোই। গ্রীকরা সুন্দরের উপাসক, কিন্তু মনে রাখতে হবে—সে সবই বহিরঙ্গ সৌন্দর্য। তা হল—পর্বতের, তুষারের, পুষ্পের সৌন্দর্য; শারীরিক গঠন, মুখাবয়বের সৌন্দর্য। মানবশরীরই গ্রীকের অর্চনার বস্তু। আর গ্রীকরা পরবর্তী ইউরোপীয় সভ্যতার শিক্ষাগুরু বলে ইউরোপ গ্রীসেরই প্রতিধ্বনি।

"এশিয়ার মানুষ ভিন্নপ্রকৃতির। একবার সেই বিশাল মহাদেশের রূপকে কল্পনায় আনো : কোথাও সমুচ্চ শৈলশিখর যেন মেঘরাশি ভেদ করে ঘননীল গগন-চন্দ্রাতপকে স্পর্শ করছে; কোথাও ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপ্ত ঊষর মরুভূমি, বারিবিন্দুর চিহ্ন-মাত্র নেই, তৃণ পর্যন্ত উৎপন্ন হয়না যেখানে; কোথাও দীর্ঘবিস্তার নিবিড় অরণ্য, যার আদি অন্ত নেই যেন; কোথাও-বা প্রকাণ্ড নদী, দুর্দম বেগে সমুদ্রমুখে ধাবিত। এই ধরনের পরিবেশে বর্ধিত প্রাচ্যবাসীর সৌন্দর্যপ্রীতি ও গম্ভীর-মহীয়ানের প্রতি অনুরাগ, ভিন্নদিকে বিকশিত হয়েছে। অন্তর্মুখী হল তার মন—বহির্মুখ নয়। এখানেও আছে প্রকৃতিপ্রেম, শক্তির জন্য আকৃতি, শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাকুল বাসনা, গ্রীকদের অনুরূপ বর্বরজাতির বিষয়ে ঘৃণা—কিন্তু এই সকলই বিরাট পরিধির উপরে বিস্তৃত। এশিয়াতে অদ্যাবধি ধর্মের দ্বারাই জাতির সৃষ্টি হয়—জন্ম, বর্ণ, ভাষা নিয়ে জাতি হয় না।...ধর্মই এশিয়ার দৃষ্টিতে পরস্পরের বন্ধনসূত্র, মিলনভূমি। তাই প্রাচ্যবাসী কল্পনাপ্রবণ, জন্ম-স্বাপ্নিক। জলপ্রপাতের কলধ্বনি, পাখির কাকলি, চন্দ্র-তপন-তারকা, তৎসহ সমগ্র জগতের সৌন্দর্য—এ-সকলই মনোহারী, কিন্তু প্রাচ্যমনের কাছে পর্যাপ্ত নয়। সে চায় স্বপ্নেরও পরপারের স্বপ্ন—দৃশ্যেরও অতীত দৃশ্য।" [৮—৩৩৯-৩৪১]

একথা মনে করার কারণ নেই—স্বামীজী তাঁর সর্বাঙ্গীণ সমর্থন প্রাচ্যের উপরই অর্পণ করেছিলেন। না, তা সত্য নয়। তিনি হিন্দু ও গ্রীক উভয় পক্ষকেই একদেশদর্শী মনে করেছেন। [১০-২০২] গ্রীকরা "বহির্গত অসীমের" এবং হিন্দুরা "অন্তর্গত অসীমের" অনুশীলনে ব্যাপৃত—এই কথা বলার পরে স্বামীজী যোগ করেছেন, "পৃথিবীর সভ্যতা-মঞ্চে উভয় জাতির জন্য ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে আছে। কোনো একজনকে অপরের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করতেই হবে এমন কথা নেই, কিন্তু যদি তারা পরস্পরের রচনা মিলিয়ে নেয়, তাহলে তারা উভয়েই লাভবান হবে।" [৫—৩৪৩]।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিল্পাদর্শের তুলনাকালে স্বামীজীর কিছু সুগভীর উক্তি আমাদের চমকিত করে। অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার সম্বন্ধে স্বামীজী যে মোটেই উদাসীন ছিলেন না, তা দেখতে পাই ইউরোপীয়দের আঁকা ম্যাডোনা বা যীশুর ছবি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য থেকে। যীশু প্রাচ্যের মানুষ, তাঁর ধর্মকে পাশ্চাত্ত্য নিয়েছে, কিন্তু বাইবেলের জগতের মূল ভাব ও ইমেজ তাদের কাছে অপরিচিত ছিল বলে ইউরোপীয় শিল্পীরা ম্যাডোনা-ছবি এঁকেছে নিজেদের পূর্বাগত ধারণা ও সংস্কার অনুযায়ী।—"আমি যীশুখ্রীস্টের শেষ নৈশ-ভোজের শত-শত ছবি দেখেছি—প্রত্যেকটিতে তাঁকে টেবিলে বসানো হয়েছে। কিন্তু তিনি তো টেবিলে বসে খেতেন না! তিনি সকলের সঙ্গে আসনপিঁড়ি হয়ে বসতেন, আর বাটিতে রুটি ডুবিয়ে খেতেন—সে রুটি তোমাদের (পাশ্চাত্ত্যবাসীদের) রুটির মতো নয়।" [৩—১৯৮]। ঊর্ধ্বতর অভীপ্সার সম্মুখীন ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে অভিব্যক্তি-গত কোন্ পার্থক্য ঘটে—সে-সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি যে-কথা বলেছেন, তাতে শিল্পের মর্মসত্য সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি দেখা যায় : "আর্যগণ চিরদিনই অন্তরে

ঈশ্বর-সন্ধান করেছেন।...তাঁদের শিল্পচর্চায়, ও প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি আচরণে সেই বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। বর্তমান সময়েও ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উপাসনারত কোনো মানুষের চিত্র আঁকতে গেলে সেখানে শিল্পী চিত্রস্থ ব্যক্তির দৃষ্টিকে ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ দেখান; উপাসক সেখানে প্রকৃতির বাইরে ভগবানকে দেখবার চেষ্টা করছেন—তাঁকে দূরে মহাকাশে দেখতে চাইছেন। অপরপক্ষে ভারতে উপাসকের মূর্তি অন্যভাবে প্রস্তুত হয়। তিনি মুদিত নয়ন—দৃষ্টি অন্তর্মুখী।" [৩—২৭১-৭২]।

"সকল কাব্য, চিত্রকলা ও সংগীত—বাক্যে, বর্ণে ও শব্দে প্রকাশিত ভাব ছাড়া আর কিছু নয়" [৪-২৩৬]—১৮৯৫ সালে এই যে-কথা স্বামীজী বলেছেন, এক যুগেরও পূর্বে থেকে তা তাঁর মন অধিকার করে রেখেছিল, স্বামী সারদানন্দের সাক্ষ্যে তা দেখা যায়। রোমাঁ রোলাঁর গবেষণা-অনুযায়ী সারদানন্দ ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে প্রথম আসেন। তার কয়েক মাস আগে সারদানন্দ তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন, যদিও নরেন্দ্রের পরিচয় তাঁর জানা ছিল না। সারদানন্দের স্কুলের সহপাঠী উক্ত বন্ধু সচল চরিত্রের যুবক ছিলেন; প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার দু'বছর আগেই বিলাত যাবেন বলে বোম্বাই পর্যন্ত হাজির হয়েছিলেন (সেকালের পক্ষে সেটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চার), বিলাত যাওয়া অবশ্য হয়নি, কিন্তু ফিরে এসে "একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং মধ্যে-মধ্যে বাংলায় প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া পুস্তকসকল প্রণয়ন করিতেছিলেন।" বিবাহ নামক প্রচলিত কার্যটি সমাধা করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি, শোনা গিয়েছিল তাঁর "স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে।" সে সংবাদে ব্যথিত সারদানন্দ উক্ত বন্ধুর বিষয়ে সাক্ষাতে সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের জন্য সহসা তাঁর গৌরমোহন মুখার্জি লেনের ভাড়াবাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। বন্ধুর জন্য বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন, এমন সময় এক যুবক ঘরে ঢুকে, নিঃসংকোচে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে কৃষ্ণবিষয়ক একটি হিন্দী গীত গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে শুরু করেছিলেন; যুবকের কেশের পারিপাট্য ও উন্মনা দৃষ্টির সঙ্গে "কালার বাঁশরীর গান," তৎসহ উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি মিলে সারদানন্দের মনকে অত্যন্ত বিরূপ করে তুলেছিল। কিন্তু তারপরে যখন উক্ত যুবক সারদানন্দের বন্ধুর সঙ্গে সাহিত্যবিষয়ে আলাপ শুরু করেছিলেন, তখন সারদানন্দের ধারণায় আলোড়ন ঘটে গেল।

"সহসা বিদায়গ্রহণ করাটা ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া [আমার] সাহিত্যসেবী বন্ধু, [পূর্বোক্ত] যুবকের সহিত ইংরাজি ও বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে যে-বাক্যালাপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে লাগিলাম। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যথাযথ ভাবপ্রকাশক হইবে, এই বিষয়ে উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়া কথা আরম্ভ করিলেও, মনুষ্যজীবনের যে-কোনোপ্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য বলা উচিত কিনা, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, সকল প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত করিবার পক্ষ আমাদের বন্ধু অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং যুবক ঐ পক্ষ খণ্ডনপূর্বক তাঁহাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, সু বা কু, যে-কোনোপ্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি সুরুচিসম্পন্ন এবং কোনোপ্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে উহাকে কখনই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যশ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। আপনপক্ষ সমর্থনের জন্য যুবক চসার হইতে আরম্ভ করিয়া যত খ্যাতনামা ইংরাজি ও বাংলা সাহিত্যিকের পুস্তকসকলের উল্লেখ করিয়া একে-একে দেখাইতে লাগিলেন—তাঁহারা সকলেই ঐরূপ করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। উপসংহারে যুবক বলিয়াছিলেন—সু এবং কু, সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরে আদর্শবিশেষকে প্রকাশ করিতেই সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। আদর্শবিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি

ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—They idealise what is apparently real. পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর একশ্রেণীর মানব আছে যাহারা আপাতনিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া, উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া, বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—They want to realise the ideal. ঐরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে।"৩৯

নরেন্দ্রনাথের যৌবনের সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে তাঁর জীবনীতেও অনুরূপ কথা পাই : "তিনি ছন্দোঝঙ্কারপূর্ণ শব্দবিন্যাসকেই কবিতা মনে করিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল—প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায় একটি মনোরম শব্দময় চিত্রবিশেষ। ইহা যেন আদর্শকে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার শ্রেষ্ঠতম শিল্প—সত্যকে সাধারণ জগতের অঙ্গীভূত করিবার একমাত্র কৌশল।"৪০

এই ধরনের মনোভাবের জন্য এইকালে নরেন্দ্রনাথের কাছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ অত্যন্ত প্রিয় কবি। "ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থকেই তিনি কাব্যগগনের ধ্রুবতারা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং উক্ত কবির উচ্চভাবপূর্ণ কবিতার অধিকাংশ স্থলই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।"৪১ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাসূত্রেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পরম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংবাদ শুনেছিলেন। তখন তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এফ-এ পড়েন। একদিন ইংরেজির সাহেব-অধ্যাপক ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়াবার সময়ে ক্লাসের ছাত্রদের উপর যৎপরোনাস্তি চটে যান, কারণ ছাত্ররা কবিতা বুঝতে পারছিল না। অধ্যাপক মহাশয় টেবিল চাপড়ে, পা ঠুকে, চেঁচিয়ে রাগ দেখিয়ে, ক্লাস ছেড়ে চলে যান। তখন অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড হেস্টি সেদিকে আসছিলেন। গণ্ডগোল শুনে তিনি ক্লাসে ঢুকে ব্যাপার জেনে অধ্যাপকেরই উপর দোষারোপ করে বলেন—"উনি বলছেন, ছেলেরা নির্বোধ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বুঝতে পারে না। উনি নিজেই বোধহয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ বোঝেন না। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমাধি হত।" ঘটনার এই বিবরণ—প্রত্যক্ষদর্শী, নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী, হরমোহন মিত্রের কাছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত শুনেছেন। স্বামী সারদানন্দের বিবরণে উক্ত অধ্যাপকের রেগে ক্লাস ছেড়ে যাওয়ার পরিবর্তে অসুস্থতার জন্য ক্লাস না নেওয়ার কথা আছে। অধ্যক্ষ হেস্টি সেই ক্লাস নেন। তিনি "ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাবলীর আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বুঝিতে না পারায় তিনি তাহাদিগকে উক্ত অবস্থার কথা যথাবিধি বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, 'চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়বিশেষে একাগ্রতা হইতে উক্ত অবস্থার উদয় হইয়া থাকে। ঐ প্রকার অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেব আজকাল ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখিযাছি। তাঁহার উক্ত অবস্থা একদিন দর্শন করিয়া আসিলে তোমরা এ-বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে'।"৪২

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যিক ভাবসমাধির জগৎ থেকে রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসমাধির জগতে উপনীত হয়ে নরেন্দ্রনাথ অবশ্যই অনুভব করেছিলেন—কাব্যের রসাবস্থা 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'—কিন্ত তা ব্রহ্মাস্বাদ নয়। তথাপি ঐ সহোদরত্ব দান করে যে-সাহিত্য, তার বিষয়ে তিনি গভীর শ্রদ্ধাবোধ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ কি! এইসঙ্গে আমরা যোগ করে দেব, ওয়ার্ডস-

ওয়ার্থের বিরলবর্ণ আত্মমগ্নতার প্রতি আকর্ষণের মতোই শেলীর কল্পনার জ্বলন্ত-পক্ষে আকাশবিহার নরেন্দ্রনাথের কাছে কম সমাদরের বিষয় ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাক্ষ্য থেকে তা আমরা জেনেছি। কল্পনা প্রসঙ্গে স্বামীজী একবার বলেছেন : "ঠিকভাবে প্রযুক্ত হলে কল্পনা আমাদের সর্বোচ্চ বন্ধু। কল্পনা যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে যায়; একমাত্র কল্পনার আলোকই আমাদের সর্বত্র নিয়ে যায়।" [১-১৯৯]। এই কারণে মিল্টনের মহাঝঞ্ঝার ঝাপটের প্রতিও তাঁর মনোময় আকর্ষণ ছিল।

॥ ৫ ॥ স্বামীজীর সাহিত্যাদর্শের দৃষ্টান্তযুক্ত আলোচনা : অতীন্দ্রিয় রসসৃষ্টিতে সংস্কৃত সাহিত্যের সাফল্য

স্বামীজীর সাহিত্যাদর্শের কিছু দৃষ্টান্তযুক্ত আলোচনা এবার করা যেতে পারে। সুবিধার জন্য কয়েকটি রসের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির রূপ দেখাতে চেষ্টা করব।

(ক) **প্রেমরস**। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কি সত্যই সাহিত্যে প্রেমরসের সমজদার হতে সমর্থ ছিলেন?—যাঁর জীবনসাধনা এই প্রেমরস/মধুরবস/শৃঙ্গারবসের আপাততঃ প্রতিবাদ ছাড়া কিছু নয়! যদি লৌকিক ইন্দ্রিয়চেতনার দিক দিয়ে ভাবা যায়, কথাটা সত্য। ভারতচন্দ্রের প্রগল্ভ ইন্দ্রিযমুখিতার কঠোর সমালোচনা কবতে তাঁকে দেখেছি, নিবেদিতাব কাছে একবার ঠাকুরবাড়ির জনৈক কবির কিছু ইন্দ্রিয়রসাত্মক কবিতাব নিন্দা কবতেও তাঁকে দেখা গেছে, দেহসর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র মতামতের কথাও আমরা জানিয়ে এসেছি। তাঁর আপসহীন আদর্শবাদ এবং ইন্দ্রিয়োত্তর চেতনার জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠা অবশ্যই সাধারণ জীবনরসের সাহিত্য উপভোগের পক্ষে অনুকূল ছিল না। এ সকলই স্বীকার্য। অপরপক্ষে আধ্যাত্মমানুষ হিসাবে তাঁর থেকে প্রেমকে অধিক মূল্য দিতে কে সমর্থ? রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে লৌকিক ইন্দ্রিযানুভূতি চরিতার্থ করার জন্য যারা ব্যবহার করে, তাদের সমূহ ধিক্কার দিয়েও, তিনি মাদ্রাজে বক্তৃতাকালে ঐ প্রেমের গভীর তাৎপর্যের কথা বলেছেন—গীতাব কৃষ্ণকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থাপন ক'রে বৃন্দাবনের কৃষ্ণের স্থাননির্ধারণ করেছেন অনেক ঊর্ধ্বে। [৫-১৫৩-৫৪] আসল কথা, প্রেম কি দেহগত হয়েই উল্লসিত, নাকি অন্তর্গহনে অবতীর্ণ, অথবা ব্যাকুল ঊর্ধ্বাভিসারে মুক্তপক্ষ?৪৩ কথামৃতে দেখা যায়, কি পরিমাণে তিনি বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা গেযেছেন। মাতোয়ারা হয়ে গেয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের চৈতন্যলীলার গান।৪৪

৪৩ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের প্রসঙ্গে স্বামীজী বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন—মনে স্বার্থবাসনা থাকলে এই প্রেমের পরম প্রকৃতি উপলব্ধ হয় না। তিনি বলেছিলেন : "একখানি চিত্র কে বেশি উপভোগ করে—চিত্রবিক্রেতা, না চিত্রদ্রষ্টা? তিনিই চিত্র উপভোগ করতে পারেন যাঁর বেচা-কেনার মতলব নেই।" এইসূত্রে আবও বলেছিলেন : বাসনাশূন্য মানুষের কাছে "জগৎ একখানি সুন্দর চিত্রের মতো। বাসনাত্যাগ হলে আমরা ঈশ্বরের বিশ্বকবিতা পাঠ ক'রে উপভোগ করতে পারব।" ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বাধিক সুন্দর কথা, যা তিনি শুনেছেন তার বিষয়েও এখানেই বলেন : "ঈশ্বরই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ যাঁর কবিতা, অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত।" [২-১৭২]

৪৪ তেমনি একটি ছবি, মহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় :

"সেইসময় নরেন্দ্রনাথ চৈতন্যলীলার গান গাহিতেন :

রাধা বই আর নাইকো আমার রাধা বলে বাজাই বাঁশি;
মানের দায়ে সেজে যোগী মেখেছি গায় ভস্মরাশি।
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে—রাধা-নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে—তারে বড় ভালবাসি।

"রাত্রে বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ এই গানটি প্রাণের ভিতর থেকে—উহাতে নিজেদের অবস্থা প্রতি-বিম্বিত হইতেছে, সেই উল্লেখ করিয়া—অতি মধুর কণ্ঠস্বরে গাহিতেন। গানের প্রত্যেক ভাব, শব্দ, শ্রোতার গাত্র বিদ্ধ করিয়া অন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিত। যথার্থই তো গায়ে ভস্ম মেখে নগ্নপদে

বিল্বমঙ্গলের উন্মত্ত বাসনার্ত প্রেমের অপূর্ব রূপান্তরের কাহিনী বলে গেছেন গভীর ভাবাবেগে,৪৫ জয়দেবের গান গেয়ে বিগলিত করেছেন অন্যের হৃদয়কে৪৬ এবং পারসিক কবিতার বিস্তৃত আলোচনাকালে "প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের জন্য আমি সমরখন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত"—এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে-করতে বেপরোয়া উল্লাসে বলে উঠেছেন, "দ্যাখো, যে-মানুষ প্রেমসংগীতের সমাদর করতে প্রস্তুত নয়, তার মূল্য আমার কাছে কাণাকড়িও নয়।"৪৭

কিন্তু এইসংগে এইকথা বলে নেওয়া উচিত, যদি কোনো প্রেমসংগীত অনন্তের ইশারা না আনত, সে সংগীতের কাণাকড়ি মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। নিবেদিতা বলেছেন, আলোচনার বিষয়বস্তু যাইহোক না কেন, অনন্তের সুরে তার সমাপ্তি হত।৪৮ ঐ অনন্তের অর্থ

ভিক্ষুক হইয়া তিনি ভগবানলাভের জন্য পথে-পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন।...নরেন্দ্রনাথ আর একটি চৈতন্যবিষয়ক গান গাহিতেন এবং তাঁহার দুচক্ষে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইত :

তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছ!
কত পাষণ্ড-তনয় কত কথা কয়
তবু নাকি প্রেম যেচেছ।

"নরেন্দ্রনাথ এই ভাবটি জীবনের সাধনার অংগ করিয়া লইয়াছিলেন।...এইজন্য যখন এই দুই কলি গাহিতেন, নিজের অবস্থা ও জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন।" [ঘটনাবলী, ১ম, ৮১-৮৩]

৪৫ *NCW*, I, 361

৪৬ *Reminiscences*, 85

৪৭ NCW, I, 282

৪৮ NCW, I, 281

চমৎকৃত বিস্ময়ের দ্বারা স্বামীজী কিভাবে প্রেমের যথার্থ চরিত্র একবার উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন, তা কনস্টান্স টোনীর স্মৃতিকথা থেকে দেখতে পাই। এই আমেরিকান মেয়েটি সর্বোচ্চ অভিজাত পরিবারের দুহিতা, কেননা এঁর মায়ের দেহে ফরাসি রাজরক্ত প্রবাহিত (তার কম নয়!!), —একদিন স্বামীজীকে ধরে-বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন ফাউস্ট অপেরা দেখবার জন্য। শ্রেষ্ঠ তারকা-সম্মিলিত সেই অভিনয়কালে (অবশ্যই শ্রেষ্ঠ তারকা-খচিত মঞ্চ সেদিন, কেননা অভিনয় করছিলেন মেলবা, জ্যাঁ দ্য রেজ্কে, এদুয়ার্দ দ্য রেজ্কে, বয়্যারমেইস্টার, প্রভৃতিরা) কনস্টান্স টোনী স্বামীজীকে ফাউস্টের গল্প বোঝাতে চেয়েছিলেন। তা শুনে টোনীর গরীয়সী জননী আঁতকে উঠে বলেছিলেন, "হা ভগবান! তুমি অল্পবয়সী মেয়ে, তুমি ঐ বিকট কাহিনীটি একজন পুরুষ মানুষকে শোনাচ্ছ?" স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপারটা যদি ভালোই না হয়, তাহলে একে এখানে পাঠালেন কেন?"

মহিলা বললেন—"অ্যাঁ—হাঁ। অপেরায় আসতেই হয়। ওটা করণীয় কাজ। কিন্তু সব কাহিনীই বদ। তাই কাহিনী নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।"

মায়ের নির্বুদ্ধিতায় কনস্টান্স টোনী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হায়, এই জগৎ আর তার আত্ম-প্রবঞ্চনা!

অভিনয়ের মধ্যে স্বামীজী শুধোলেন—"আচ্ছা বোন, ঐ যে ভদ্রলোকটি সুন্দরী গায়িকার সংগে প্রেম করছে, ও কি সত্যই মেয়েটিকে ভালবাসে?"

"নিশ্চয় স্বামীজী"—টোনী উত্তর দেন।

"কিন্তু লোকটি কত অন্যায় করেছে, মেয়েটিকে কত দুঃখ দিয়েছে—"

"তা ঠিক"—নম্রভাবে স্বীকার করেন টোনী।

"হুম্। এখন বুঝতে পেরেছি"—স্বামীজী বললেন—"লোকটি ঐ সুন্দর মেয়েটির প্রেমে পড়েনি; সে আসলে প্রেমে পড়েছে ঐ লাল কাপড়-পরা লেজওয়ালা সুন্দর লোকটির সংগে—ওকে তোমরা কি যেন বলো—শয়তান—তাই না!"

কনস্টান্স টোনী লিখেছেন—"এইভাবে তাঁর শুদ্ধ সত্তা যুক্তিবিচার ক'রে, সবকিছুর মাপ ক'রে নিয়ে, অপেরা এবং তার দর্শকদের সীমাবদ্ধতাকে বুঝে নিয়েছিল।" [লেখককৃত "সুর নৃত্যের উর্বশী," ১২০-২১]

এখানে অদ্বৈত। প্রেমেও সমাধি হয়—তাতে ঘটে অভেদবোধ। বেদান্তের ইন্দ্রিয়নিগ্রহের পরিবর্তে "ইন্দ্রিয়গুলি দিয়েই ঈশ্বরের পূজা করো"—শ্রীচৈতন্যের মতাদর্শকে তিনি এই ভাবেই বুঝেছিলেন। কিন্তু সেই ঈশ্বর যখন অন্তরে অবতরণ করবেন, তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বার ভেঙে গিয়ে অনন্ত ঈশ্বর-সমুদ্রই বর্তমান থাকবে। স্বামীজী প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমিকার সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য বোঝাতে চৈতন্য-রামানন্দ সংবাদ উপস্থিত করেছিলেন—যেখানে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের কাছে এই অপূর্ব কথাগুলি বলেছিলেন : "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল, অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল: না সো রমণ ন হাম রমণী, দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।"৪৯ স্বামীজীর সংগীত ও উক্তি থেকে "ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে আত্মহারা হওয়া কাকে বলে তার আভাস" নিবেদিতারা পেয়েছিলেন—এবং কেবল কি আভাস?—প্রেমের মহানাটক তাঁরা চোখের সামনে উন্মোচিত দেখেছিলেন। তেমন এক স্মরণীয় দৃশ্যের স্মরণীয় বর্ণনা এই :

"সেইদিনটি (৯ মে, ১৮৯৮) ভুলিবার নয়। [বেলুড়ে, নদীতটে] তরুতলে বসিয়া আমরা কথাবার্তা বলিতেছিলাম। এমন সময়ে সহসা ঝড় আসিল। আমরা প্রথমে নদীর ধারে পোস্তায়, তারপরে বারান্দায় উঠিয়া আসিলাম। এক মুহূর্তও বিলম্ব করা চলিত না।... চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল—কেবল মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, বজ্রের কড়কড়, আর মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের ঝলসানো আলোক। তথাপি বাহ্য প্রকৃতির এইসকল আলোড়নের মধ্যে আমরা ছোট বারান্দাটিতে বসিয়া উহার চেয়েও গভীরতর এক নাটক তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একমাত্র অভিনেতা পায়চারি করিতেছিলেন। একই কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল সকল অভিনেতার কণ্ঠস্বর। আর অভিনীত নাটকের বিষয় ছিল—পরমাত্মার প্রতি মানবাত্মার প্রেম। আমরা দেখিতে লাগিলাম, সেই অগ্নি আমাদের স্পর্শ করিয়া জ্বালাইয়া তুলিল—যাহাকে প্রবল ঝঞ্ঝা বিচলিত করিতে বা প্রচণ্ড বেগবতী নদী ভাসাইয়া লইতে সমর্থ নয়। 'বিপুল জলরাশি কি প্রেমের নির্বাপণ করিতে পারে, বন্যা কি তাহাকে প্লাবিত করিতে পারে?' অগ্নি-আহরণকারী প্রমিথিউস যখন অতঃপর আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, আমরা তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম, তিনি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করিলেন।"৫০

স্বামীজী একদিন বুদ্ধ ও অম্বপালীর উপাখ্যান এমন প্রাণস্পর্শীভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, শ্রোতৃবৃন্দের মনে রসেটি-রচিত "মেরী মড্‌লীনের আকুল ক্রন্দনাত্মক বিখ্যাত অর্ধ-সনেটটির কথা স্বতঃই উদিত হয়েছিল" :

"ওগো, ছেড়ে দাও আমাকে! দেখছ না, আমার প্রিয় প্রভুর মুখকমল আমাকে নিকটে আকর্ষণ করছে! আজ প্রভু যে, তাঁর শ্রীচরণের জন্য আমার চুম্বন, আমার কেশপাশ, আমার অশ্রু কামনা করছেন! প্রভু চাইছেন—আমার প্রভু চাইছেন। ওগো, কে বলে দেবে—আবার কবে কোথায় তাঁর ঐ শোণিতলিপ্ত পদযুগল আমি ধারণ করতে পারব। ওগো, তিনি আমাকে ভালবেসেছেন—আমাকে চাইছেন—আমাকে ডাকছেন—আমাকে যেতে দাও!"৫১

স্বামীজী তাঁর "ভক্তিযোগ' গ্রন্থে প্রেমযোগে অদ্বৈতবোধ কিভাবে লব্ধ হয় সে-বিষয়ে বলেছেন : "দ্বৈতভাব নিয়েই প্রেমের ধর্ম আরম্ভ হয়। আমরা মনে করি, ঈশ্বর আমাদের থেকে পৃথক। তারপর প্রেম আসে মধ্যস্থ হয়ে—মানুষ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়—ঈশ্বরও এগিয়ে আসেন মানুষের দিকে।...তারপর মানুষ যখন উন্নতির শেষ পর্যায়ে পৌঁছায় তখন সে নিজের উপাস্য দেবতায় একেবারে মগ্ন হয়ে যায়।...তখন ঘটে পূর্ণ জ্যোতির বিকাশ;

৪৯ নিবেদিতা, 'হিমালয়ে', ২৯।
৫০ 'হিমালয়ে', ১০-১১।
৫১ 'হিমালয়ে', ২৮।

মানুষের ক্ষুদ্র অহং বিলুপ্ত হয়; সে হয়ে যায় অনন্তে অনন্ত। ঐ প্রেমের পরম জ্যোতির মধ্যে অবস্থিত সে—পরিণতিতে উপলব্ধি করে এই অপূর্ব উদ্দীপক সত্য—প্রেম, প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ এক ও অভেদ।" [৪-৮৬]।

"একত্বই প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি"—এই কথাটি বোঝাতে স্বামীজী অনেক সময়ই পারসিক সুফী কবিতার দৃষ্টান্ত দিতেন। তেমনি একটি কবিতা—যা পূর্বে-উদ্ধৃত রায় রামানন্দের 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল' কবিতার ভাবের অনুরূপ—তিনি থাউজ্যাণ্ড আইল্যান্ড পার্কে অবস্থানকালে শুনিয়েছিলেন :

"একদিন ছিল যখন আমি নারী—তিনি পুরুষ।
প্রেম স্ফুরিত হল ক্রমান্বয়ে—আরও আরও—
যে-পর্যন্ত না মুছে গেল আমি আর তুমির ব্যবধান,
কেবল আভাস রইল মনে—একদা আমরা ছিলাম দুই,
এল প্রেম—অভেদ—অভেদ।" [৪-২৩৪]

রাসলীলার মধ্যে কৃষ্ণ যখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন, তখন বিরহে বিলাপ করতে-করতে গোপীরা সুগভীর কৃষ্ণভাবনায় নিজেদের কৃষ্ণ বলে অনুভব ক'রে, কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই ভাবটি সুফী কবিতা উদ্ধৃত করে স্বামীজী বোঝাতে চেয়েছিলেন :

প্রিয়তমের কাছে গিয়ে দেখলাম—রুদ্ধ দ্বার। করাঘাত করলাম দ্বারে।
ভিতর থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর : কে তুমি?
আমি বললাম—আমি, আমি।
রুদ্ধ দ্বার।
আমি ফিরে এলাম—আবার গেলাম—দ্বারে করলাম আঘাত।
প্রশ্ন ভেসে এল পূর্ববৎ—কে তুমি?
আমি—আমি—এই যে—এই গো—
রুদ্ধ দ্বার।
তৃতীয়বার যখন আঘাত করলাম, তখনো একই প্রশ্ন।
এবার বললাম—আমি তুমিই—হে প্রিয়!
খুলে গেল দ্বার। [৪—২৩৪]

(খ) **বীররস**। প্রেমরসের সকল গভীরতা স্বীকার করেও, এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমে উক্ত রসের সর্বোৎকর্ষ ঘটেছে তা জানাবার পরেও, স্বামীজী মনে করেছেন—এই প্রেমভাবের অনুশীলন তৎকালে ভারতীয় জনজীবনে শ্রেয়ঃ বস্তু নয়। নিবেদিতাকে বলেছিলেন, কর্মীদের কাছে তিনি ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপনে ইচ্ছুক নন।৫২ বাঙালীর মেয়েলিপনা সম্বন্ধে তাঁর মন অত্যন্ত কঠোর ছিল।—"ঐ প্রেম প্রচার করেই তো সমস্ত জাতটা 'মেয়ে' হয়ে গিয়েছে।... চারশ' বছর ধরে রাধাপ্রেম করে কি দাঁড়িয়েছে দেখ!...লোকগুলো কেবল কাঁদতেই মজবুত হয়েছে। ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তা চারশ' বছর ধরে বাংলাভাষায় যা-কিছু লেখা হয়েছে, সে-সব এক কান্নার সুর। প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা বীরত্ব-সূচক কবিতারও জন্ম দিতে পারেনি।" [৯-৪২৮]।

কেবল বাংলাভাষায় নয়—সংস্কৃতেও যথার্থ সমরকবিতা যথেষ্ট নেই বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন : "আমাদের সামরিক সঙ্গীত বা সামরিক কবিতা, কোনোটাই নাই। ভবভূতিকে কিয়ৎপরিমাণে সমরপ্রিয় কবি বলা যেতে পারে।" [১০-২১৪]

পুরনো বাংলাসাহিত্যের বীর্যহীন কাব্যরূপের পটভূমিকাতে মধুসূদনের আবির্ভাব তাঁকে কতখানি উল্লসিত করেছিল, তা পূর্বকথিত তাঁর মধুসূদন-প্রশস্তি থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু একথা যেন মনে না করি, স্বামীজী কেবল বাংলা ও ভারতের সামাজিক প্রয়োজনেই বীররস-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। না। তাঁর নিজের মধ্যে যে-আগ্নেয়গিরি সদা-জ্বলন্ত ছিল, তা বাইরে ভাষারূপ কামনা করত। বীরত্ব তাঁর সহজাত। তাঁর গুরু তাঁর বিষয়ে বলতেন—"এ বীর"—তা তিনি সগৌরবে স্মরণ করেছেন। বীররস বিবেকানন্দের জীবনের স্থায়ী রস।

স্বামীজীর রচনার বীররসাত্মক অংশ আমরা পরে কিছু উপস্থিত করব, এখানে মধুসূদনের আদর্শ কবি মিল্টন স্বামীজীকে কতখানি উদ্বোধিত করেছিলেন, সে-বিষয়ে আরও কিছু তথ্য জানানো যেতে পারে। নিবেদিতা লিখেছেন : "একটা বিচিত্র কথা বলি—যখন সদানন্দ রামায়ণের কথা বলেন, তখন আমি পুরো বুঝে যাই যে, হনুমানই নায়ক। আর স্বামীজী কথা বললে, কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে রাবণ।" গীতা আলোচনাকালে স্বামীজী বলেছিলেন : "জগতে একটিমাত্র পাপ আছে—দুর্বলতা। বাল্যকালেই আমি মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' পড়েছি। তখন শয়তানকেই [স্যাটান] একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলে সম্ভ্রম করেছি। যিনি কখনো দুর্বল হন না, সকল বাধার সম্মুখীন হন, মৃত্যুখেলায় অকম্পিতচিত্তে নেমে পড়েন—তাকেই কেবল মহাপুরুষ বলে স্বীকার করি।" [৮-৪৫১]

(গ) **শান্তরস**। স্থিতি ও গতি একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ। বিবেকানন্দ যেহেতু প্রচণ্ডভাবে গতিশীল, তাই একান্তভাবে স্থির। যিনি সংহারের নটরাজ, তিনিই সংহরণের স্তম্ভিত শিব। নিবেদিতা, নটরাজের প্রলয়নৃত্যকে 'ডায়ন্যামিক সমাধি' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি। বীররসের বিবেকানন্দ, শান্তরসে অতলপ্রস্থান করেন প্রশান্ত আনন্দে।

মিল্টনের শয়তান তার শক্তিস্পন্দনে স্বামীজীকে নাড়া দিত—কিন্তু তাই বলে তিনি কি সাহিত্যবিচারে শয়তানকে সর্বোচ্চ সৃষ্টি মনে করতেন? কদাপি না। স্বামীজীর সাহিত্য-বিচারের কিছু দৃষ্টান্তযুক্ত পরিচয় নিবেদিতা দিয়েছেন—যার থেকে তাঁকে একেবারে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকরূপে দেখতে পাই। তেমন কিছু অংশ আমি পূর্ব অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি, যেখানে "খাড়া গভীর গহ্বরে হেঁটমুণ্ডে নিক্ষেপকারী"-বিষয়ের কবি মিল্টনের পরিবর্তে ব্রাউনিং-এর কয়েকটি মনস্বিতা-চিহ্নিত কাব্যছত্রকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। পাশ্চাত্যের উগ্র উত্তেজনাপ্রীতির পাশে তিনি বুদ্ধ-জীবনের অনন্ত গভীর কিন্তু সহজ ছন্দের ঘটনাকে তুলে ধরেছিলেন—বুদ্ধ ও গোপের সংলাপের মধ্য দিয়ে।

স্বামীজী এই প্রসঙ্গে আর একটি বুদ্ধ-কাহিনী বলেন, যার মধ্যে আছে অচঞ্চল জীবনের ধ্রুবকাব্য। ক্ষৌরকার উপালির সেই কাহিনী এই :

"পুণ্যপুরুষ আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন—আমি ক্ষৌরকার, আমারও বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

"আমি দৌড়ে গেলাম, কিন্তু তিনি নিজেই ফিরেছিলেন, আর অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য—আমি ক্ষৌরকার—আমার জন্যও!

"আমি বললাম, প্রভু! আপনার সঙ্গে আমি কথা বলব?

"তিনি বললেন—হাঁ।

"আমি ক্ষৌরকার—আমাকেও 'হাঁ' বললেন।

"আমি বললাম—আমাদের মতো মানুষও কি নির্বাণের অধিকারী?
"তিনি বললেন—হাঁ।
"আমি ক্ষৌরকার, আমাকেও 'হাঁ' বললেন।
"আমি বললাম—আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?
"তিনি বললেন—হাঁ, নিশ্চয়ই।
"আমি ক্ষৌরকার, আমাকেও বললেন, 'হাঁ নিশ্চয়ই।'
"আমি বললাম—হে প্রভু! আমি কি আপনার সান্নিধ্যে থাকতে পারি?
"তিনি বললেন—পারো।
"আমি দরিদ্র ক্ষৌরকার—আমাকেও বললেন, 'হাঁ পারো'।"৫৩

শান্তভাব বোঝাতে 'অশ্রুত শিশিরসম্পাত'ই স্বামীজীর প্রিয় উপমা। বিশ্বমনে ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের নিঃশব্দ প্রবেশের কথা বোঝাতে উপমাটি তিনি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন: "এই অসীম প্রভাব প্রায় অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে প্রসারিত হয়েছে। রাত্রির মৃদু শিশির-সম্পাতে যেমন শস্যক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, ঠিক তেমনি অতি ধীরগতিতে এবং অলক্ষে এই অধ্যাত্মদর্শন মানবকল্যাণে সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। এই ধর্মপ্রচারের জন্য সৈন্যবাহিনীর রণযাত্রার প্রয়োজন হয়নি।" [৩—৩২৭; এবং ৫—৯]। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের তুলনায় ভারতীয় কবিতায় অলঙ্কারের সুকুমারতার কথা তিনি বলেছেন,৫৪ কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের আসল শ্রেষ্ঠতা আধ্যাত্মিক ভাবশান্তির প্রকাশে। তুলনামুখে তিনি বলেছেন : "ভারতীয় চিন্তার একটি লক্ষণ তার শান্ত মৌন। তার পিছনে যে-প্রচণ্ড শক্তি আছে তা হিংস্রভাবে প্রকাশিত নয়। বলা চলে, তা হল, ভারতীয় চিন্তার নিঃশব্দ মোহিনীশক্তি। বিদেশী কেউ আমাদের সাহিত্য অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলে প্রথমে তার কাছে এই সাহিত্য অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকবে। যে-চাঞ্চল্য, উদ্দীপনা, আছড়ে-পড়া গতি তাকে মুহূর্তে মাতিয়ে তোলে—সে বস্তু এখানে মেলে না। ইউরোপের ট্রাজেডির সঙ্গে আমাদের ট্রাজেডির তুলনা করো। ইউরোপীয় ট্রাজেডি দারুণ ক্রিয়াশীলতা ও গতিশক্তির দ্বারা অবিলম্বে মানুষকে উদ্দীপিত করে, কিন্তু শেষ হওয়ার পরেই আসে প্রতিক্রিয়া, তখন সবই যেন মন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভারতীয় ট্রাজেডিগুলিতে আছে অপূর্ব মায়াশক্তি—আপাতভাবে নীরব শান্ত—কিন্তু তাদের অনুশীলনে মন যেন ভাবাচ্ছন্ন হয়ে যায়, সে বন্ধন থেকে মুক্তি থাকে না! যাঁরাই আমাদের সাহিত্যকে স্পর্শ করেছেন তাঁরাই তার চিরবন্ধনে বাঁধা পড়েছেন।" [৫—১৬৯]।

বিবেকানন্দ স্বয়ং শান্তরসের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ১৮ এপ্রিল, ১৯০০, ইংরাজিতে তিনি যে-পত্রটি লিখেছিলেন, সেটি সাহিত্যের সম্পদ। তার বাংলা অনুবাদও দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এবং বিখ্যাত। এই অনুবাদকে আমি স্বচ্ছন্দে বাংলা গদ্যে শান্তরসের সর্বোচ্চ প্রকাশ বলতে পারি, যার মধ্যে রয়েছে প্রত্যাহার ও নির্লিপ্তির প্রশান্ত মহিমা, অপার নির্বাণ-সমুদ্রকে সাক্ষাৎ-দর্শনের আলোকস্নান এবং অনন্ত শান্তির বিস্তার। এর অনুরূপতা একমাত্র দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের "সমুখে শান্তি পারাবার" গানে।

ঐ পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হল—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু!

"যতই যা হোক, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই—দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে যে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত।...

আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে, বন্ধন সব খসে যাচ্ছে,...রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই প্রভু যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, সংসারের ভালোমন্দ সংসারীরা দেখুক, তুই ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছু-পিছু চলে আয়!—যাই, প্রভু যাই!

"হাঁ, এইবার ঠিক যাচ্ছি। সামনে দেখছি অপার নির্বাণ-সমুদ্র।...অসীম অনন্ত শান্তির পারাবার—মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তিভঙ্গ করছে না।

"আমি যে জন্মেছিলুম—তাতে খুশি। এত যে কষ্ট পেয়েছি—তাতেও খুশি। জীবনে বড়-বড় ভুল করেছি—তাতেও খুশি। আবার এখন যে নির্বাণের শান্তিসমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি—তাতেও খুশি। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন কারো থেকে নিয়ে যাচ্ছি না।...শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে।...উপরে সূর্য নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন; পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন; দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থ নিস্তব্ধ, স্থির, শান্ত। আর আমিও ধীর-স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে-ভেসে চলেছি।...যাই মা যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ—সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে, কেবল দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমায় দ্বিধা নেই।

"আহা, কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলো পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতি দূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে।...মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায় কিন্তু ছায়ার মতো অবাস্তব বোধ হয়, ভয় থাকে না, তাদের প্রতি ভালবাসাও থাকে না, ভালো মন্দ কোনো ভাবই জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক তাই, কেবল শান্তি, শান্তি। চারপাশে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজানো রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না—এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। আমার প্রাণে শান্তিরও বিরাম নেই। ঐ—ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই প্রভু, যাই!" [৮—১৩১-৩৪]।

(ঘ) **অতীন্দ্রিয় রস এবং রহস্য।** বিবেকানন্দের মনোজগতে কিন্তু শান্ত-ই চরম রস নয়—যদিচ সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নবরসের ক্ষেত্রে শান্তকেই শেষ রস ধরেছেন। বৈষ্ণব রসতাত্ত্বিকেরা অপরপক্ষে শান্ত-কে প্রথম রস ধরে, মধুর-কে করেছেন শেষ রস। তাঁদের চাই লীলা—রসের সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ। বিবেকানন্দও আমরা দেখি, দুর্ধর্ষ শক্তিতে যেন নির্বাণ-সমুদ্রকে পর্যন্ত লঙ্ঘন ক'রে এমন এক লোকের বার্তা শুনতে চেয়েছেন যেখানে অনাহত ধ্বনিই একমাত্র ধ্বনি; তিনি এমন এক জগৎকে দেখতে চেয়েছেন, যেখানে রয়েছে রূপের অতীত রূপ। অবাঙ্মনসগোচর সেই জগতের সঙ্গীত তিনি লিখেছেন, ["নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর"] এবং সেই জগৎ যখন তার ব্যক্তরূপের আলোড়নক্ষণে প্রকাশিত হয়—তার রূপ দেখে লিখেছেন *Kali the Mother* কবিতা। সাক্ষাৎ উপলব্ধির এহেন কবিতা কদাচিৎ লেখা হয়েছে। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের আতঙ্ক-বিস্ফারিত কাব্যও এই প্রলয়-ভীষণ কবিতার কাছে যেন বর্ণহীন মনে হয়।৫৫

৫৫ নিবেদিতার লেখা থেকে জেনেছি : প্রেরণার অগ্নিদাহে জ্বলতে-জ্বলতে স্বামীজী কবিতাটি

বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষিত জগৎকে এবং তার বার্তাকে একমাত্র সংস্কৃতসাহিত্য, বিশেষতঃ তার উপনিষদ অংশ, কিছুটা দান করতে পেরেছে।

উপনিষদের কাব্যমহিমার কথা বিবেকানন্দ অজস্রকণ্ঠে বলেছেন।—"প্রাচীন উপনিষদগুলি অতি উচ্চস্তরের কবিত্বে পূর্ণ। এইসকল উপনিষদ্-বক্তা ঋষিগণ মহাকবি ছিলেন। প্লেটো বলিয়াছেন—কবিত্বের ভিতর দিয়া জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য বিধাতা যেন উপনিষদের ঋষিগণকে সাধারণ মানব হইতে বহু ঊর্ধ্বে কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রচার করিতেন না, দার্শনিক বিচার করিতেন না, বা লিখিতেন না। তাঁহাদের হৃদয় হইতে সঙ্গীতের উৎস প্রবাহিত হইত।" [২—১০৪]

উপনিষদের কাব্যত্বের ভিত্তি কোথায়? শব্দশরীর নির্মাণে? ঔপনিষদিক শব্দ ও ছন্দের অসামান্য শক্তি ও সৌন্দর্য স্বামীজী স্বীকার করেছেন, কিন্তু ঐ শব্দ যাকে উন্মোচিত করতে সচেষ্ট, সেই মহারহস্যের গুণ্ঠন ঈষৎ বিচলিত করার সাফল্যেই তার কাব্যত্ব নিহিত। বিবেকানন্দের সুগম্ভীর রচনা :

"তাই এই বিরাট প্রশ্ন উঠিতেছে : এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া আসিল, কিরূপেই-বা অবস্থান করিতেছে? এই প্রশ্নের সমাধানে বহু স্তোত্র রচিত হইয়াছে, তাহারা যথাযথ আকার গ্রহণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু নিম্নের স্তোত্রে যে অপূর্ব কাব্যত্বে উহা প্রকাশিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও নয় :

> নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমো পরো যৎ।
> কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥
> ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
> আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধন্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥

"[যখন অসৎ ছিল না, সৎ-ও ছিল না; যখন অন্তরীক্ষ ছিল না; যখন কিছুই ছিল না— কোন্ বস্তু সকলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, কিসে সব বিশ্রাম করিতেছিল? তখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, দিবারাত্রির বিভাগ ছিল না। ইত্যাদি।] অনুবাদে মূলের কাব্যসৌন্দর্য

লিখেছিলেন, এবং শেষ করার পরে আবেগে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই কবিতার অনুবাদ করেছেন—তেমন অসাধারণ অনুবাদ অল্পই দেখা যায়।—

> "নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
> স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য বায়ুবেগ।
> লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে,
> মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে।
> সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
> নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
> প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমামাখা গায়
> লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়।
> নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে—মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
> করালি! করাল নাম তোর, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
> তোর ভীম চরণ নিক্ষেপে প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
> কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো আয় মোর পাশে!
> সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে,
> কালনৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।"

স্বামীজীর এই কবিতার অনুসরণে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী উদ্বোধনের দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্দশ সংখ্যায় লিখেছিলেন "শ্মশানকালী" কবিতা।

নষ্ট হইয়া যায়—অথচ সংস্কৃত ভাষার শব্দধ্বনিমাত্রে কি সুরময়! 'তখন "এক" (অর্থাৎ ঈশ্বর) অবরুদ্ধ-প্রাণে নিজেতেই অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।' এই ভাবটি উত্তমরূপে ধারণা করা উচিত—ঈশ্বর অবরুদ্ধ-প্রাণ-রূপে (গতিহীন) অবস্থান করিতেছিলেন—কারণ অতঃপর আমরা দেখিব, কিভাবে পরবর্তীকালে এই ভাব হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব অংকুরিত হইয়াছে। হিন্দু দার্শনিকগণ সমগ্র বিশ্বকে একটি স্পন্দনসমষ্টি—একপ্রকার গতি—মনে করিতেন। সর্বত্রই শক্তিপ্রবাহ। এই গতিসমষ্টি একসময়ে স্থির হইতে থাকে, এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় গমন করে, এবং কিছুকালের জন্য সেই অবস্থায় স্থিতি করে। এই স্তোত্রে ঐ অবস্থার কথাই বর্ণিত হইয়াছে—এই জগৎ স্পন্দনহীন হইয়া নিশ্চল অবস্থায় ছিল। যখন সৃষ্টির সূচনা হইল, তখন উহা স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিল, এবং উহা হইতে জগৎ বাহির হইয়া আসিল। সেই পুরুষের নিঃশ্বাস—শান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ—ইহার বাহিরে কিছুই নাই।" [৩—২১৩-১৪]

স্বামীজী অনেকগুলি বৈদিক স্তোত্র উদ্ধৃত ক'রে তাদের রহস্যময় সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। ঋগ্‌বেদের 'নাসদীয় সূক্তে'র প্রলয়বর্ণনা স্বামীজীর কবি-হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। একাধিকবার তিনি ঐ বর্ণনার সঙ্গে কালিদাস, মিল্টনের অনুরূপ রচনাংশের তুলনা করেছেন।—

"ঋগ্‌বেদ-সংহিতার নাসদীয় সূক্তে প্রলয়ের গভীর অন্ধকার-বর্ণনাত্মক শ্লোক আছে—তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ইত্যাদি। 'যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল'—এটি পড়িলেই অনুভব হয়, ইহাতে কবিত্বের কোন্ অপূর্ব গাম্ভীর্য নিহিত। ভারতে এবং বহির্ভারতে গম্ভীর ভাবের চিত্র অঙ্কিত করার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। ভারতের বাহিরে এই চেষ্টা সর্বদাই জড় প্রকৃতির অনন্ত ভাব বর্ণনার আকার ধরিয়াছে—কেবল অনন্ত বহিঃপ্রকৃতি, অনন্ত জড়, অনন্ত দেশের বর্ণনা। মিল্টন, দান্তে বা অপর কোনো প্রাচীন বা আধুনিক বড় ইউরোপীয় কবি যখন অনন্তের চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা কবিত্বের পক্ষবিস্তার করিয়া জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনুরূপ চেষ্টা ভারতেও হইয়াছে। বেদ-সংহিতায় এই বহিঃপ্রকৃতির অনন্ত বিস্তার যেমন অপূর্বভাবে চিত্রিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও দেখা যাইবে না। সংহিতার এই—তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্—বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া তিনজন বিভিন্ন কবির অন্ধকারের বর্ণনা তুলনা করো। আমাদের কালিদাস বলিয়াছেন : 'সূচীভেদ্য অন্ধকার।' মিল্টন বলিতেছেন : 'আলোক নাই, পরন্তু অন্ধকারই দৃশ্যমান।' ['No light but rather darkness visible'.] কিন্তু ঋগ্‌বেদ-সংহিতা বলিতেছেন : 'অন্ধকার—অন্ধকারের দ্বারা আবৃত; অন্ধকার—অন্ধকারে লুক্কায়িত'।" [৫-২২৬]

এই অসাধারণ বর্ণনা কোন্ নিসর্গপ্রকৃতির দৃশ্যপটে রচিত তা স্বামীজী সানন্দে বর্ণনা করেছেন একাধিকবার, সে বর্ণনার নিজস্ব কাব্যমূল্য আছে :

"তোমরা যাহারা ভারতবর্ষে অথবা গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্য কোনো দেশে মৌসুমী বায়ুর সহসা-বিস্তার দেখিয়াছ, তাহারাই এই বাক্যের গাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবে।...সর্ববস্তু ঝলসিত, বিশুষ্ক, মর্মরিত—সমস্ত সৃষ্টি যেন অগ্নিদগ্ধ—দিনের পর দিন এই অবস্থাই চলিতেছে—এমন সময়ে এক অপরাহ্নে দিক্‌চক্রবালের একপ্রান্তে খণ্ড মেঘ আবির্ভূত, অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী যেন সেই মেঘে সমাচ্ছন্ন—মেঘের উপর মেঘ, তাহার উপর মেঘ, স্তরে-স্তরে মেঘ—তারপরেই মেঘপুঞ্জ বিদীর্ণ হইয়া বর্ষণ ও প্লাবন।" [৩—২১৪]

স্বামীজীর বক্তৃতার ভাষা কাব্যাকারে সাজানো যায় :

"Everything is parching and sizzling,
The whole creation seems to be burning away,

When one afternoon there is on corner of the horizon
a spec of cloud,
And in less than half an hour it has extended unto the whole earth,
Until, as it were, it is covered with cloud,
And then, it bursts into a tremendous deluge of rain." [*CW,I,* 351]৫৬

ঋগ্‌বেদের এই "প্রলয়-বর্ণনাত্মক অপূর্ব মন্ত্রটি," যার তুল্য "মহদ্ভাবদ্যোতক বর্ণনা এ-পর্যন্ত আর কেউ করতে চেষ্টা করেন নি"—সে বর্ণনাও, স্বামীজীর মতে, "স্থূলেরই বর্ণনা,...জড়ের ভাষায়, সীমার ভাষায়...জড় দেহেরই বিস্তারের বর্ণনা, মনের বর্ণনা নহে।" [৫-২৯৭]। ভারতীয় মন আরও অগ্রসর হয়েছে, বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশ করেছে—সে জগৎ উপনিষদের। উপনিষদ বাক্যমনাতীত রাজ্যের দ্বার উন্মোচনে প্রয়াসী হয়ে তার আভাসটুকু দান করতে পেরেই সর্বসাফল্য অর্জন করেছে—এবং সেই প্রয়াসে সে অস্তিবোধক ভাষা ত্যাগ করে প্রায়শঃ নাস্তিবোধক ভাষাকে অবলম্বন করেছে। সে সম্পর্কে স্বামীজীর বিশ্লেষণ এই :

"উপনিষদের ভাষা নূতন রূপ ধারণ করিল—তাহা প্রায় নেতিবাচক হইয়া উঠিল; তাহা স্থানে-স্থানে অস্ফুট-বিচলিত, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার প্রয়াসী; যাহাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা যায় না, অথচ যাহার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত, তাহারই দিকে নির্দেশ করিতে থাকে। পৃথিবীতে এমন কবিতা কোথায়, যাহার সহিত এই শ্লোকের তুলনা হইতে পারে—

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।'—

—সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকাও নহে, বিদ্যুৎও সেখানে আলোকিত করিতে পারে না—সামান্য অগ্নির আর কথা কি?

"পুনশ্চ : পৃথিবীর সমগ্র দার্শনিক ভাবের, হিন্দুজাতির সমগ্র চিন্তার, মানবজাতির মুক্তি-কল্পনার সারাংশের পূর্ণতর চিত্র আর কোথায় পাওয়া যাইবে যাহা নিম্নের অপূর্ব ভাষায় রচিত অপূর্ব রূপক-এ প্রকাশিত :

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥'

—একই বৃক্ষের উপর দুইটি সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী রহিয়াছে—উভয়েই পরস্পর সখ্য-ভাবাপন্ন। তন্মধ্যে একটি সেই বৃক্ষের ফল খাইতেছে, অপরটি না খাইয়া স্থিরভাবে নীরবে বসিয়া আছে। নিম্নশাখায় উপবিষ্ট পক্ষী কখনো মিষ্ট, কখনো-বা কটু ফল ভক্ষণ করিতেছে, সেই কারণে কখনো সুখী, কখনো-বা দুঃখী হইতেছে। কিন্তু উপর-শাখার পক্ষীটি স্থির-গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট, সে ভালোমন্দ কোনো ফলই খাইতেছে না, সে সুখ-দুঃখ উভয়েই

৫৬ মনস্বী লেখক সুমণি মিত্র বুদ্ধিদীপ্ত টীকা-সহ স্বামীজীর অনেক ইংরাজি গদ্য-লাইনকে কাব্যাকারে সাজিয়েছেন—তাঁর 'খাপখোলা তলোয়ার', 'সপ্তর্ষির ঋষি' ইত্যাদি গ্রন্থে।

উদাসীন, নিজ মহিমায় মগ্ন হইয়া আছে। এই পক্ষিদ্বয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।" [৫—১২৫-২৬]

স্বামীজী এই রূপকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছিলেন। সবশেষে দেখিয়েছেন—কিভাবে নিম্নের জীবাত্মা-পক্ষী নিজ স্বরূপের পূর্ণজ্ঞান লাভ ক'রে উপরের পরমাত্মা-পক্ষীর সঙ্গে অভেদরূপ লাভ করে। ব্যাখ্যার শেষে তিনি উপনিষদের ভাষার উচ্চ গুণগান করেছিলেন :

"উপনিষদের ভাষা, ভাব এবং সবকিছুই ঋজু, তাহারা তরবারি-ফলকের মতো বিদ্ধ করে, হাতুড়ির মতো প্রচণ্ড আঘাত করে। অভ্রান্ত তাহাদের অর্থ। ঐ সঙ্গীতের প্রতিটি সুর দৃঢ়, পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। কোনো ঘোরফের নাই, অসংবদ্ধ প্রলাপ নাই, মাথা গুলাইয়া দেয় এমন জটিলতা নাই। সেখানে পতনের চিহ্নমাত্র নাই। অন্যত্র যেমন অহেতুক রাশি-রাশি অলঙ্কার সাজাইয়া, বিশেষণের স্তূপ জমাইয়া, ভাবটিকে ক্রমেই জটিলতর করিয়া, এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হইল যে, মূল বিষয়টি হারাইয়া গেল, শাস্ত্রের গোলকধাঁধায় পড়িয়া মাথা গুলাইয়া গেল, বাহির হইবার উপায় রহিল না—উপনিষদে এই অধঃপতন নাই। যদি ইহাকে মানব-রচিত সাহিত্য মনে করা হয় তবে বলিতে হইবে—ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য যে-জাতি তখনো তাহাদের তেজ-বীর্য বিন্দুমাত্র হারায় নাই।" [৫—১২৮-২৯]।

এই প্রচণ্ড তেজ ও শক্তির জন্য উপনিষদের ঋষিগণ অন্তর্জগতের রহস্য সমাধানে "ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা জগতের কাছে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।" "উপনিষদ নির্ভীকভাবে বলিয়াছে : যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। —ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি।—মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। সেখানে চক্ষুও যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না।" এইজন্য উপনিষদকারগণ বহিঃপ্রকৃতিকে ছেড়ে জ্যোতির্ময় জীবাত্মার দিকে ফিরেছিলেন এবং সেখানেই সমস্যার সমাধান পেয়েছিলেন; তাঁরা যা রচনা করেছিলেন, "সেই আত্মতত্ত্বের মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ কবিতা জগতে আর নাই।" স্বামীজীর সর্বাধিক মনোহরণ করেছিল কঠোপনিষদ, যাতে অন্তর্নিহিত ভাবই কেবল নয়, কলানৈপুণ্যও বিস্ময়কর। "ইহার আরম্ভই অপূর্ব—সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইল, তাহার যমপুরীতে যাইবার ইচ্ছা হইল। ইহার শেষে—সেই আশ্চর্য তত্ত্ব-বক্তা স্বয়ং যম তাহাকে উপদেশ দিতেছেন আর বালক তাঁহার নিকট শুনিতে চাহিতেছে কিনা—মৃত্যুরহস্য !!" [৫-২২৮]

॥ ৬ ॥ সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আরও কথা : কয়েকটি সর্বজনীন প্রতীক : বিবেকানন্দ-রচিত সংস্কৃত স্তোত্র

হিন্দুদর্শনের আলোচনাকালে স্বামীজী স্বতঃই 'শব্দ' ও 'প্রতীকের' বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন। সেগুলি অবশ্যই ধর্ম ও দর্শন-পরিমণ্ডলের বস্তু। কিন্তু তার মধ্য থেকে সাহিত্য সম্পর্কিত সাধারণ সত্যকে লাভ করি।

শব্দ-প্রতীক নিয়ে আলোচনাকালে তিনি শব্দ থেকে সৃষ্টিসূচনা—এই মতটিকে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মদর্শন কিভাবে স্বীকার করেছে, তা বহুভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। [১—৯৮, ৩১৭, ৪—১৪৯-৫২, ৪—১৯৯, ৮—৪১৮-১৯]। দার্শনিক আলোচনার শেষে, সাধারণ জীবন থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে শব্দ-শক্তি বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন। "শব্দের উচ্চ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য ছেড়ে দিলেও আমরা দেখি—শব্দ-প্রতীক মানুষের জীবন-রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান অংশ অভিনয় করে থাকে। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তোমাকে স্পর্শ করছি না, কিন্তু আমার কথার দ্বারা বায়ুর যে-কম্পন হচ্ছে তা তোমার কানের স্নায়ুকে স্পর্শ ক'রে তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, যাকে তুমি প্রতিরোধ করতে পারো না।

এক ব্যক্তি অপরকে মূর্খ বলল—সে তখনি তার নাকে ঘুষি বসিয়ে দিল। নারী দুঃখে-কষ্টে কাঁদছে—অন্য এক নারী এসে তাকে মিষ্ট কথা শোনাল, অমনি রোদনরতা নারীর বক্রদেহ সোজা হয়ে উঠল, শোক-দুঃখ দূর হয়ে তার মুখে হাসি দেখা গেল।" [১—৯৮-৯৯]। শব্দের সঙ্গে ভাব ও চিন্তার অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাও স্বামীজী বলেছেন। "শব্দ ছাড়া চিন্তার অভিব্যক্তি হয় না।" [৮-৪১৯] "মনে করুন, মন সম্পূর্ণ স্থির এবং চিন্তাহীন। তারপরে যখনই চিন্তার আরম্ভ হবে, অমনই মন—নাম ও রূপকে আশ্রয় করবে। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবের একটি নির্দিষ্ট নাম ও নির্দিষ্ট রূপ আছে।" [৪—১৪৯] তবে, অবশ্যই একটি ভাবের সঙ্গে একটি শব্দই সকল দেশে চলিত থাকে না—দেশভেদ ও কালভেদে বিভিন্ন শব্দ ভাব-বিশেষকে প্রকাশ করে। [১—৩১৭]।

রূপ-প্রতীকের আলোচনাকালে স্বামীজী প্রাচীন পৃথিবীতে গৃহীত, পরবর্তীকালে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত, কতকগুলি প্রতীকের উল্লেখ করেছেন। যেমন পদ্ম, সূর্য। এইসব প্রতীকের বিষয়ে বলেছেন : "সভ্যতার জন্মভূমি নীল, সিন্ধু ও টাইগ্রিস নদীর উপত্যকায় অপূর্ব পদ্মফুলগুলির মুদিত পাপড়িতে প্রভাতী সূর্যকিরণের স্পর্শ লাগে, আর সেগুলি প্রস্ফুটিত হয়; আবার সেই পদ্ম অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে নিমীলিত হয়। আদিম মানুষ ভাবত—তাহলে সেখানে কেউ-না-কেউ ছিল, যে এসেছিল, তারপর চলে গিয়েছিল—এবং সমাধি থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবার এসেছে। এই হল প্রাচীন মানুষের প্রথম সমাধান। ...এইজন্য সূর্য ও পদ্ম ধর্মজগতে প্রথম প্রতীক।" [৩-২৩০]। অনুরূপভাবে স্বামীজী স্বর্গ-প্রতীক ও অগ্নি-প্রতীকের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করেছেন। ক্রুশ ও স্বস্তিক প্রতীক সম্বন্ধে বলেছেন : "কতকগুলি প্রতীক সর্বজনীনভাবে প্রচলিত। অনেকের ধারণা—খ্রীস্টধর্মের সংস্পর্শেই ক্রুশ-চিহ্ন প্রথম আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টধর্মের বহু পূর্ব থেকে, মুশা জন্মিবার পূর্ব থেকে, বেদের পূর্ব থেকে, এমন-কি মানুষের কার্যকলাপের কোনো-প্রকার ইতিহাস রচিত হবারও পূর্ব থেকে, ও-জিনিস বর্তমান ছিল। আজটেক ও ফিনিসীয় জাতির মধ্যেও যে ক্রুশ-প্রতীক প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।...ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রাতার—অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে রয়েছে এমন একটি মানুষের—প্রতীকও সকল জাতির মধ্যে ছিল বলে মনে হয়। আবার, সমগ্র জগতে বৃত্ত একটি উৎকৃষ্ট প্রতীক। তারপর সর্বাপেক্ষা সর্বজনীন প্রতীক স্বস্তিক। একসময়ে লোকে ভাবত—বৌদ্ধরা তাকে সমগ্র জগতে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন জানা গেছে যে, বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব থেকেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে তা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাবিলন ও মিশরে তা দেখা গেছে। এসবের দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে—এই প্রতীকগুলি শুধু অনুষ্ঠানরীতিগত বা কল্পনাপ্রসূত নয়— নিশ্চয় ওদের অন্তর্নিহিত কোনো উদ্ভব-কারণ আছে, এবং মানবমনের সঙ্গে কোনোরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ভাষাও তেমনি কোনো কৃত্রিম বস্তু নয়। কিছু লোক একত্র হয়ে কতকগুলি ভাবকে বিশেষ-বিশেষ শব্দদ্বারা প্রকাশ করতে সম্মত হওয়ার পরেই ভাষার উদ্ভব হয়েছে—একথাও ঠিক নয়।" [১—৯৭]

প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে স্বামীজী সংস্কৃতকে সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী মনে করেছিলেন। এই ভাষার গুণমহিমা বর্ণনায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। ভারতীয় মনের দুই রূপ। একদিকে তাতে প্রখর বিশ্লেষণের শক্তি, অন্যদিকে কোমল ভাবমাধুর্য।—"এই জাতির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তিব সম্মুখে ও পশ্চাতে যেন একটি কোমল ও মসৃণ আচ্ছাদন ছিল—এবং তাহারই মধ্যে সুরক্ষিত ছিল অপর একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য—যাহাকে কবির অন্তর্দৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি সব-কিছুই যেন কবি-কল্পনার পুষ্পবেদীতে স্থাপিত ছিল এবং সেগুলিকে অন্য যে-কোনো

ভাষা অপেক্ষা সুন্দরতররূপে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা—যাহার নাম সংস্কৃত বা পূর্ণাঙ্গ ভাষা। এমন-কি গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতেও ছন্দোবন্ধ শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছিল।...স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে তাহারা ছন্দ-গাথা উৎকীর্ণ করিয়াছিল। মণি মাণিক্যের ঐকতানে, মর্মরপ্রস্তরের বহু বিচিত্র স্থাপত্যে, বর্ণ-সুষমার সঙ্গীতে, এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের সৃষ্টিতে তাহাদের রচনা এই জগতের বহির্গত এক রূপকথার জগতের বলিয়া মনে হইত।...কলা-বিজ্ঞান, এমন-কি প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা পর্যন্ত সবকিছুই এমন ছন্দোময় ভাবদ্বারা মণ্ডিত ছিল যে, চরম ইন্দ্রিয়ানুভূতি অতীন্দ্রিয় স্তরে উত্তীর্ণ হইত, স্থূল বাস্তবতা সূক্ষ্ম অবাস্তবতার রঙিন আভায় অনুরঞ্জিত হইত।" [৫—৩৮৫-৮৬]।

উপনিষদের পরেই গীতার দর্শনগরিমা ও শক্তিমহিমায় স্বামীজী অভিভূত ছিলেন। তাঁর বাণী ও রচনায় গীতার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা যথেষ্টই আছে। "এই মহৎ কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্য-রত্নরাজির চূড়ামণিরূপে পরিগণিত।...গীতা উচ্চতর জীবন-সংগ্রামের রূপক বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রই গীতা-বর্ণনার স্থলরূপে নির্দিষ্ট। ইহাতে অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত।" [২—৪০৭]। উপনিষদ ও গীতার কাব্যসৌন্দর্যের তুলনা করে স্বামীজী বলেছেন : "উপনিষদে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে-চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ—শিকড়, কাঁটা, পাতা সমেত। আর গীতার মধ্যে ঐ সত্যগুলি অতি সুন্দররূপে সাজানো—যেন ফুলের মালা বা তোড়া।" [৫—২৫১]। গীতার ভাষার সরলতা ও প্রত্যক্ষতার উল্লেখ তিনি করেছেন [৮—৩২৪], এবং এই "অমর কাব্যের" প্রভাব কিভাবে পাশ্চাত্যদেশে ছড়িয়েছে, তাও বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে এমার্সনের উপরে গীতার প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উত্থাপন করেন। কার্লাইল এমার্সনকে গীতা উপহার দেন; এমার্সনের মধ্য দিয়ে গীতার উদার চিন্তারাশি আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

স্বামীজীর মতে : "রামায়ণ ও মহাভারত প্রাচীন আর্যগণের জীবনচরিত ও জ্ঞানরাশির সুবৃহৎ বিশ্বকোষ। ইহাতে সভ্যতার যে-আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লাভ করিবার জন্য সমগ্র মানবজাতিকে এখনও বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।" [৮—২৭৬] মহাভারত সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—হোমারের কাব্যের যে-প্রকার প্রভাব গ্রীসে, মহাভারতের তেমনি প্রভাব ভারতীয় জনজীবনে। [৮—২৪৮]

"জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়" রামায়ণের সীতা-চরিত্র স্বামীজীর কাছে সাহিত্যের সবচেয়ে মহীয়সী চরিত্র। সীতার প্রসঙ্গ এলেই তিনি ভাবাবেগে অভিভূত হতেন। রামচন্দ্রকে যথাপ্রাপ্য অর্পণ করার চেষ্টা তিনি করেননি তা নয়। রামচন্দ্র "প্রাচীন বীরযুগের আদর্শ—সত্যপরায়ণতা ও নীতির সাকার মূর্তি, আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ পিতা, আদর্শ রাজা।...মহাকবি যে-ভাষায় রামচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা শুদ্ধতর, মধুরতর অথচ সরলতর ভাষা আর হইতে পারে না।" রামচন্দ্র সম্বন্ধে এই পর্যন্ত। কিন্তু সীতা-প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভাবোচ্ছ্বাস বাধাবন্ধহারা।—"সীতার কথা কি বলিব! জগতের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারো, কিন্তু আমি তোমাদের নিঃসংশয়ে বলিতে পারি...আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতা অসাধারণ। ঐ চরিত্র একবার মাত্রই চিত্রিত হইয়াছে।...রাম হয়ত অনেক হইয়াছেন, কিন্তু সীতা হন নাই।...নারী-চরিত্রের যতপ্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে সবই এক সীতা হইতে উদ্ভূত। মহামহিমময়ী সীতা—পবিত্রতা হইতেও পবিত্র—সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ।...বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া মহাদুঃখের জীবন যিনি যাপন করিয়াছেন, সেই নিত্যসাধ্বী, নিত্যবিশুদ্ধা, আদর্শ পত্নী সীতা কেবল নরলোকের নয়, দেবলোকেরও আদর্শস্বরূপা।...আমাদের পুরাণ নষ্ট হইতে পারে, বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষা কালস্রোতে বিলীন হইতে পারে—কিন্তু যতদিন ভারতে নিতান্ত গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে ততদিন সীতার

উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায়-মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন,...আমরা সকলেই সীতার সন্তান।" [৮—১৪৮-৪৯; এবং ৮—২৪৫-৪৬]।

নিবেদিতা স্বামীজীর মুখে রামায়ণ কাহিনী শোনার গভীর অভিজ্ঞতার কথা একবার বলেছিলেন। স্বামীজী কেবল সীতাকে নয়, মন্দোদরীকে পর্যন্ত যেভাবে চিত্রিত করেছিলেন, তাতে অভিভূত নিবেদিতা লিখেছেন : "স্বামীজীর নারী-আদর্শ কি বিশাল! এমন প্রচণ্ড মহিমার বোধ শেক্সপীয়ারেও নেই—নেই অ্যাসকাইলাসের অ্যান্টিগোন কিংবা সফোক্লিসের অ্যালসেস্টিসেও।"৫৭

পুরাণ সম্বন্ধে স্বামীজীর মূল কথা : উপনিষদের ধর্ম-দর্শনকে জনসাধারণের কাছে গ্রাহ্য করার জন্য, তাদের সরল ও তরল ক'রে, লৌকিক-অলৌকিক কাহিনীর আশ্রয়ে পরিবেশন করা হয়েছে—এদেরই নাম পুরাণ। পুরাণের প্রামাণিকত্ব সন্দেহের লক্ষ্য, অবৈজ্ঞানিকতা সমালোচনার বিষয়, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই—পুরাণই প্রেম, ভক্তি ও নীতিকে হৃদয়গ্রাহী কাহিনীর দ্বারা জনজীবনে সঞ্চারিত করেছে। [৫—২৮৯-৯০]।

স্বামীজী কালিদাসের অনুরাগী, এবং নিয়মিত কালিদাসের সাহিত্যালোচনা করতেন। দুঃখের বিষয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্যমূলক বিবরণ আমরা পাই না। কেবল, কে এস রামস্বামী শাস্ত্রী তাঁর কৈশোরস্মৃতি থেকে উদ্ধার করে কিছু বিবরণ আমাদের দান করেছেন :

"একদিন সকালে আমি কালিদাসের কুমারসম্ভবম্ পড়ছিলাম। সেটি আমার পাঠ্যবই ছিল। স্বামীজী সেখানে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বই পড়ছ?' আমি বললাম, কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গ।' তিনি বললেন, 'মহাকবির হিমালয়-বর্ণনা শোনাও তো।' আমি দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত সুরময় রীতিতে কালিদাসের সুন্দর ছন্দোময় হিমালয়-বর্ণনা তাঁকে আবৃত্তি করে শোনালাম। স্বামীজী হাসলেন, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন মনে হল। বললেন, 'তুমি কি জানো যে, হিমালয়ের মহিমময় সৌন্দর্যের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটাবার পরে আমি এখানে এসেছি?' শুনে আমার দারুণ উৎসাহ লাগল। তিনি আবার আমাকে সূচনার শ্লোকগুলি পড়তে বললেন। তা করলে, তিনি বললেন, 'ওসবের অর্থ জানো?' আমি অর্থ বললে, তিনি বললেন, 'বেশ ভালো, কিন্তু যথেষ্ট নয়।' তারপর তিনি তাঁর অপূর্ব সংগীতময় সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে পড়লেন : অস্তুস্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ, পূর্বাপরৌ তোয়নিধাবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ। তারপর বললেন, 'শ্লোকের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ দুটি হল, দেবতাত্মা এবং মানদণ্ড। কবি বলতে চেয়েছেন, হিমালয় প্রকৃতি-রচিত নিছক একটা পর্বত-প্রাচীর নয়। হিমালয়ে দৈবী সত্তা বিরাজিত—তা ভারত ও তার সভ্যতাকে কেবল উত্তর-প্রবাহিত ভয়াবহ শৈত্যবায়ু থেকে রক্ষা করে না—বহিরাগত ভয়াল বিধ্বংসী শত্রুদের হাত থেকেও বাঁচায়। হিমালয় অধিকন্তু ভারতবর্ষকে প্রাণরসে পুষ্ট করে—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রকে ভারতভূমে প্রবাহিত করিয়ে। যখন মৌসুমীকাল নয় তখনো নদীগুলি হিমালয়ের চিরতুষার রাজ্যের বরফ-গলা জলে পুষ্ট থাকে। মানদণ্ড-এর তাৎপর্য—কবি দৃঢ়প্রত্যয়ে বলতে চেয়েছেন, ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর সকল সভ্যতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং এই সভ্যতার মানদণ্ডেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সভ্যতার মান নির্ণীত হবে। মহাকবির এমনই মহোচ্চ ভাব এবং দেশপ্রেম।' স্বামীজীর কথা শুনে আমি চমকিত এবং উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলম। কথাগুলি এখনো আমার অন্তর্লোকে যেন অফুরন্ত আলোকসম্পাত ক'রে পরমাশ্চর্য রত্নরাজির মতো বিরাজমান।"৫৮

৫৭ *Reminiscences*, 284-85
৫৮ *Reminiscences*, 109-10

সাহিত্যবিচার থেকে স্বামীজীর রচিত সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসতে পারি। দেখা যায়, মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও স্বামীজী সংস্কৃত, হিন্দী এবং ইংরাজিতে লিখেছেন। সংস্কৃতে লিখেছেন দু'একটি পত্র এবং শিবস্তোত্র, অম্বাস্তোত্র, ও শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র। স্তোত্রগুলি স্নিগ্ধ শব্দনির্ঘোষ, প্রবহমানতা এবং সরল গম্ভীর অর্থমহিমার কারণে অতীব হৃদয়গ্রাহী। শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর কিছু বক্তব্যের সূত্রনির্দেশ রয়েছে। রচনাগুণে, এবং তাঁর প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের প্রাণশক্তিতে, একটি রামকৃষ্ণ-স্তোত্র ("ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ...") বর্তমানে ভারত ও বহির্ভারতে সর্বাধিক উচ্চারিত সংস্কৃত স্তোত্রের অন্যতম—কারণ সেটি রামকৃষ্ণ-মন্দিরের আরাত্রিক স্তোত্র।৫৯

মার্গসঙ্গীতের এক সেরা গায়ক বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত মার্গসঙ্গীতের রীতি অনুযায়ী হিন্দীতে লিখেছেন। স্বামীজী হিন্দী ভাষা খুবই ভাল জানতেন, সে ভাষায় বক্তৃতাদি করে হিন্দীভাষীদের চমকিত করেছেন—সে সংবাদ আমরা আগেই দিয়েছি। [৩য়, ১৭-১৮]

॥ ৭ ॥ এক শ্রেষ্ঠ অনুবাদক—বিবেকানন্দ

ইংরেজি ভাষার বাগ্মী এবং লেখকরূপে বিবেকানন্দ সমকালে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালেও ইংরেজি লেখকরূপে তাঁর খ্যাতির স্বীকৃতি অল্পবিস্তর দেখা যায়। এ সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহের আগে তাঁর একটি প্রাসঙ্গিক বিশেষ পরিচয়ের উল্লেখ করতে পারি—তিনি ভারতীয় শাস্ত্র ও কাব্যের ইংরাজিতে এক শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। স্বামীজীর এই পরিচয়টি, বিস্ময়ের কথা, উপযুক্ত মনোযোগ লাভ করেনি। অবশ্য যখন তাঁকে পাশ্চাত্ত্যের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম প্রধান ব্যাখ্যাতা বলা হয়, তখন তারই মধ্যে ঐ 'অনুবাদক' শব্দটি প্রচ্ছন্ন থাকে, কারণ ঐ ভূমিকায় অনুবাদযোগে ভারতীয় শাস্ত্র ও কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের পরিবেশন অপরিহার্য। তথাপি নিজস্ব-ভাবে স্বামীজীর অনুবাদক ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার পৃথক উল্লেখ আমরা অবশ্যপ্রয়োজন মনে করি, যদিও বর্তমান পরিসরে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট-কিছু লিখে উঠতে পারব না। কেবল দুটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই : এক, তাঁর সমগ্র রচনাবলীর পৃষ্ঠা ওল্টালে যে-কেউ অনুবাদ-কৃত্যের বহুল পরিমাণ দেখে চমকিত হবেন; দুই, স্বামীজীর অনুবাদ অসাড় আক্ষরিক পেশাদারী ব্যাপার নয়—তা মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও স্বতন্ত্র সৃষ্টি। স্বামীজী অনেক সময়েই তাতে যুগচেতনার আলোকে নূতন জীবনস্পন্দন যুক্ত করেছেন· সেইসঙ্গে দিয়েছেন নিজস্ব ব্যাখ্যার দ্যুতি। স্বামীজীর বিরাট মনীষা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের নির্যাস ঐসকল অনুবাদে আছে—এবং আছে প্রাপ্ত (রামকৃষ্ণসূত্রে) ও অর্জিত (নিজ সাধনার দ্বারা) অনুভূতির উদ্ভাস। বিবেকানন্দের অনুবাদ—বস্তুতঃপক্ষে নবআবিষ্কার ও উন্মোচন।

স্বামীজী তাঁর ধর্ম-দর্শনকে উপনিষদের ভিত্তিতে স্থাপন করেছিলেন বলে উপনিষদের অজস্র শ্লোক বা শ্লোকাংশের অনুবাদ পাই। তিনি নানাস্থানে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের

৫৯ 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' থেকে পাই, স্বামীজী ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে 'আচণ্ডালা-প্রতিহতরবয়ঃ' ইত্যাদি শ্লোক দুটি এবং 'ওঁ হ্রীং ঋতং' স্তবটি রচনা করেছিলেন। শেষোক্ত স্তবটি তিনি শিষ্যকে দেন, ছন্দপতনাদি দোষ আছে কিনা দেখে দেবার জন্য; কারণ, তিনি বলেছিলেন, "তন্ময় হয়ে লিখতে-লিখতে সময়ে-সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়।" সংস্কৃতজ্ঞ 'শিষ্য' লিখেছেন : "স্বামীজী যেদিন ঐ স্তবটি রচনা করেন, সেদিন স্বামীজীর জিহ্বায় যেন সরস্বতী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। শিষ্যের সহিত অনর্গল সুললিত সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দু'ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। এমন সুললিত বাক্যবিন্যাস বড়-বড় পণ্ডিতের মুখেও সে কখনো শোনে নাই।" [৯-৯৩]

স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন (ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর অনুরোধে ঐ সূক্তের পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক অনুবাদও করেন)। গীতার বহুতর শ্লোকের অনুবাদও তিনি করেছেন। তাঁর পতঞ্জলির যোগসূত্রের অনুবাদ বিখ্যাত। নারদীয় ভক্তিসূত্রের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন, এবং ই টি স্টার্ডি যখন নারদীয় ভক্তিসূত্রের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন, তখন সে-কাজ স্বামীজীর তত্ত্বাবধানেই হয়েছিল। গ্রন্থটি স্টার্ডি স্বামীজীকেই উৎসর্গ করেন। নিবেদিতার "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে" গ্রন্থের যে-পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে, তার কিছু অপ্রকাশিত অংশে, (শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সে অংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছেন) দেখা যায়, স্বামীজী ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের পুরো অনুবাদ করেছেন, যেমন করেছেন শঙ্করাচার্যের নির্বাণ ষট্‌কম-এর অনুবাদ। অবধূত গীতা, ও মহানির্বাণ তন্ত্রের বেশ-কিছু অংশের, সেই-সঙ্গে চাণক্যের, কালিদাসের, ধম্মপদের এবং ভারতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের অল্পস্বল্প অনুবাদও তাঁর রচনাবলীতে আছে।

ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের কবিতা ও সঙ্গীতের অনুবাদ তিনি করেন নি তা নয়। সুরদাস, তুলসীদাস, তানসেন প্রভৃতির সঙ্গীতের অনুবাদ তাঁর রচনাবলীতে পাই। বাংলা বৈষ্ণব সঙ্গীতের অনুবাদও বাদ যায়নি—বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষের চৈতন্যলীলার বেশ কয়েকটি গানের। তাঁর করা বাউল গানের অনুবাদ আছে। কিন্তু সবচেয়ে আনন্দ ও উন্মাদনার সঙ্গে ভাষান্তরিত করেছেন রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গীত। অনবদ্য সেগুলি। বহু বছর ধরে স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য-মঞ্চে ভারতীয় বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন, এবং দীর্ঘদিন পাশ্চাত্ত্য ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ দিয়েছেন। সুতরাং ঐসমস্ত সময়ে তাঁকে অবিরাম অনুবাদের কাজ করে যেতে হয়েছে।৬০ এমনই একটি দিনের কথা নিবেদিতার রচনা থেকে উপস্থিত করা যায়। সময় ১২ জুন, ১৮৯৮—স্বামীজী সদলবলে আলমোড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেখানে এক স্থানীয় হোটেলে অবস্থানকালে অপরাহ্ণকালের এই ঘটনা। নিবেদিতা লিখেছেন :

"স্বামীজী আমাদের জন্য রুদ্রস্তুতি অনুবাদ করলেন :

> From the unreal lead us to the Real.
> From darkness lead us unto light.
> From death lead us to Immortality.

৬০ বক্তৃতাকালে স্বামীজী মুখে-মুখে ভারতীয় ধর্ম ও কাব্যাদি থেকে ইংরাজি অনুবাদ করতেন, সংবাদপত্রে তা প্রশংসিত হয়েছে। লস এঞ্জেলস হেরাল্ড ৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, মন্তব্য করেছিল :

"The lecturer said in Sanskrit numerous passages from the Vedas which he subsequently translated into English. The rhythm and beauty of the language as it fell from his lips could only be compared to the ripple in the poetry of Horace. It was a revelation to many to hear [that] the transcendental ideas which have only recently become known in the western world have been taught in the Vedas for thousands of years." [*Second Visit,* 160]

ক্রনিকল কাগজে তাঁর সম্বন্ধে আর একটি রচনার অংশ :

"It is weird and beautiful, like far-off echoes of some ancient oracle, to hear the deep and musical chant of the Sanskrit scriptures, in which to vary the intoning of one syllable is a deadly sin. It falls from the monk's lips as dear and lovely poetry rises from a Western heart, and chant and translation, chant and translation, ring out their alternate music and truth through all his talk and teaching." [*Ibid,* 358]

Reach us through and through our Self.
And evermore protect us—Oh Thou Terrible!—
From ignorance, by Thy sweet compassionate Face.

[অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্]

"আবিরাবির্ম এধি—এই অংশের অনুবাদকালে তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন, ভাবতে লাগলেন যে, অনুবাদ এইভাবে করবেন কি না: 'Embrace us in the heart of our heart.' কিন্তু অবশেষে আমাদের কাছে তাঁর দ্বিধা ও চিন্তার কারণ জানিয়ে সংকোচের সঙ্গে বললেন, ব্যাপার হচ্ছে, অংশটার আসল অর্থ হল: 'Reach us through and through our self.' তাঁর আশংকা হয়েছিল—এই সঘন স্বল্পাক্ষর সুগম্ভীর বাক্যটির ঠিক-ঠিক অর্থবোধ ইংরেজিতে হবে না। কিন্তু সেদিন অপরাহ্ণে আমরা যাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলাম, সেই অর্থটি পরে আমার কাছে অতীব প্রামাণিক বোধ হয়েছে, কেননা আমি বুঝেছি যে, ঐ অংশের আরও আক্ষরিক অনুবাদ হবে: 'O Thou who art manifest only unto Thyself, manifest Thyself also unto us!" স্বামীজীর অনুবাদটি এখন আমার কাছে তাঁর সমাধিকালীন অনুভূতির ক্ষিপ্র ও সাক্ষাৎ প্রতিরূপ। তা যেন সংস্কৃতের জীবন্ত হৃদয়টিকে পৃথক করে নিয়ে ইংরেজি ভাষার আশ্রয়ে স্থাপিত করা।

"বাস্তবিক সেই অপরাহ্ণটি যেন অনুবাদের জন্যই নির্ধারিত ক্ষণ। তিনি হিন্দু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি সুন্দর মন্ত্রগুলির অন্যতম ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রটির কয়েকটি স্থল অনুবাদ করে দিলেন:

"The blissful winds are sweet to us.
The seas are showering bliss on us.
May the corn in our fields bring bliss to us.
May the plants and herbs bring bliss to us.
May the cattle give us bliss.
O Father in Heaven be Thou blissful unto us!
The very dust of the earth is full of bliss.
(And then, the voice dying down into meditation)—
It is all bliss—all bliss—all bliss.

"[মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।]

"পুনশ্চ, [খেতড়ির] নর্তকীর নিকট সুরদাসের যে-গানটি শুনেছিলেন, তাই আমাদের আবার শোনালেন:

"O Lord, look not upon my evil qualities!
Thy name, O Lord, is Same-sightedness.
Make of us both the same Brahman!
One drop of water is in the sacred Jamuna.
And another is foul in the ditch by the roadside.
But, when they fall into the Ganges, both alike become holy.

So Lord, look not upon my evil qualities,
They name, O Lord, is Same-sightedness,
Make of us both the same Brahman!
One piece of iron is the image in the temple,
And another is the knife in the hand of the butcher,
But when they touch the philosopher's stone,
both alike turn to gold.
So Lord, look not upon my evil qualities,
Thy name, O Lord, is Same-sightedness.
Make of us both the same Brahman.৬১

"[প্রভু মেরা অবগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যয় নাম তিহারো, অব মোহি পার করো।
ইক লোহা পূজামে' রাখত, ইক ঘর বধিক পরো,
পরশ গুণ অবগুণ নহি' চিতবৈ কাঞ্চন করত খরো।
এক নদীয়া ইক নার কহাবত, মৈলো হি নীর ভরো,
যব দোউ মিলি এক বরণ ভয়ো সুরসরি নাম পরো।
যহ মায়া ভ্রম-জাল নিবারো, সুরদাস সগরো
অজ্ঞানসে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥]"

নমুনা হিসাবে নিবেদিতার পত্র থেকে রামপ্রসাদের গানের স্বামীজী-কৃত অনুবাদের কেবল একটি দিচ্ছি :

"From the land where there is no night
Has come unto me a man.
And night and day are now nothing to me,
Ritual worship is become for ever barren.

"My sleep is broken. Shall I sleep any more?
Call it what you will, I am awake.
Hush! I have given back sleep unto Him whose it was.
Sleep have I put to sleep for ever."

"The music has entered the instrument,
And of that mode I have learned a song.
And that music is always playing before me,
And concentration is the great teacher thereof.

"Prasad speaks--Understand O Mind, these words of science,
The secret of Her whom I call my Mother,
Shall I break the pot before the market?
Lo, the six philosophies could not find the Kali.

[যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা—সন্ধ্যারে বন্ধ্যা জেনেছি।
ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি,
যোগনিদ্রা তরে দিয়ে, মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
নূপুরে মিশিয়ে তাল—সেই তালের এক গীত শিখেছি,
তাধিম তাধিম বাজছে সে তাল—নিমিরে ওস্তাদ করেছি।
প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি—উভয়ে মাথায় রেখেছি,
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।]"৬২

বিশ্বপটে প্রথম আবির্ভাবে, বাল্মীকি-কণ্ঠে প্রথম শ্লোক-উৎসারের তুল্য তাঁর ধর্মমহাসভার প্রথম ভাষণে, স্বামী বিবেকানন্দ শিবমহিম্ন স্তোত্র এবং গীতা থেকে কিছু অংশ অনুবাদ ক'রে উদ্ধৃত করেছিলেন, যার দ্বারা ভারতীয় ধর্মসত্য ভাষান্তরে দিব্যবাণীর মহিমা লাভ করেছিল।—

As the different streams having their sources
in different places, all mingle their water
in the sea, so, O Lord, the different
paths which men take through different
tendencies, various though they appear,
crooked or straight, all lead to Thee.

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং, নৃণামেকো
গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

Whosoever comes to Me, through
Whatsoever form, I reach him;
all men are struggling through paths
Which in the end lead to me.

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্,
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।

শেষে স্মরণ করছি মানবজাতির জন্য বিবেকানন্দের মৌল বাণী, যা ঔপনিষদিক কাব্যছত্রের সৃষ্টিশীল অনুবাদ ছাড়া কিছু নয় :
"Arise! Awake! And stop not till the Goal is reached."
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

॥ ৮ ॥ ইংরাজি বক্তা ও লেখক বিবেকানন্দ : সমকালীন স্বীকৃতি ও পরবর্তী বিচার

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কালে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজিতে একজন প্রধান ধর্মবক্তা এবং লেখকরূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ১৯০৭, ৪ জুলাই, স্বামীজীর ইংরাজি রচনাবলীর ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন : ইংরেজি ভাষা ভারত থেকে বিলুপ্ত

হয়ে গেলেও সেই ভাষায় স্বামীজী এই যে-মহাদান রেখে গেলেন, তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় স্থানেই ফলপ্রসূ থাকবে।

"Long after the English language has disappeared from India, the gift that has here been made, through that language, to the world, will remain and bear its fruit in East and West alike." [C.W.I.,IX]

সুতরাং ইংরাজি লেখক হিসাবে স্বামীজীর দান দুই দিক থেকে বিবেচ্য—এক তাঁর রচনার বস্তুমূল্য, দুই, তার সাহিত্যমূল্য। প্রথমটি বিচারের ক্ষেত্র এ নয় (যদিও বলতে পারি, পূর্বেকার খণ্ডগুলিতে আমি মানবচিন্তার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের দানের কথা অনেকবারই বলেছি)—এখানে তাঁর রচনাশক্তির কথাই বিশেষভাবে আসবে।

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজী ভারতের নানাস্থানে ইংরাজিতে কথাবার্তা বলে বহু লোককে মোহিত করেছিলেন—কিন্তু সেইসময়ে তাঁর শ্রোতারা ছিলেন ভারতীয় এবং তাঁরা উক্ত ইংরাজির সঠিক গুণবিচারে সমর্থ ছিলেন কিনা প্রশ্ন তোলা যায়, বিশেষতঃ স্বামীজীর মুখের কথা তখন লিপিবদ্ধ হচ্ছিল না। কিন্তু অল্প পরেই, আমেরিকায় গিয়ে, ইংরাজি-ভাষী জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা শুরু করা মাত্র, সংবাদপত্রের বিবরণে তাঁর ভাষার ভূরি-ভূরি প্রশংসা প্রকাশিত হতে লাগল। সেইসব প্রশংসার বেশ-কিছু অংশ ইতিপূর্বে প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে সেই সকলের কিছু উল্লেখ এবং বাকিগুলির বিশেষ উল্লেখের আগে, বলে নিতে চাই—বিবেকানন্দের বাগ্মিতার যে-সমুচ্চ প্রশংসা অবিরাম করা হচ্ছিল—তার এক প্রধান অংশে ছিল ভাষার প্রশংসা—কারণ বাগ্মিতার সঙ্গে ভাষা, বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, চেহারা, ব্যক্তিত্ব, সমস্ত কিছুই জড়িত হলেও, ভাষাশক্তিই সাফল্যের প্রথম শর্ত, কারণ তা ছাড়া শ্রোতৃবৃন্দের মন ও হৃদয়ে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। যখন বলা হয়েছে—তিনি 'দিব্যাধিকারপ্রাপ্ত বাগ্মী,' কিংবা তাঁর ভাষণ 'মানবভাষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিখর'—তখন তাঁর অসাধারণ ভাষার স্বীকৃতিও ওরই মধ্যে আছে।

যাইহোক আমরা জেনেছি, সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে : তাঁর ছিল "কাল-সম্মানিত ধর্মমত উন্মোচনের অনবদ্য ইংরাজি ভাষা।" "সর্বোত্তম শিল্পকৌশলের সঙ্গে তিনি নিজ বক্তব্যকে উপস্থিত করেন ও সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেন।" "ইংরাজি বলেন অদ্ভুত ভালো—বস্তুতঃপক্ষে অধিকাংশ আমেরিকানের চেয়ে ভালো তাঁর ইংরেজি।" "তাঁর মধ্যে আছে বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও সরস বাকপটুতা।" "স্পন্দিত মুখ থেকে উৎসারিত গভীর সঙ্গীতময় স্বরে, প্রায় নিখুঁত ইংরাজিতে তিনি শোনালেন—প্রেম, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতার বাণী।" "শ্রোতাদের শ্রবণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল উচ্চ অধ্যাত্ম-ভাবময় বাক্যরাজিতে।" "তাঁর সুঠাম অঙ্গ, স্ফুরিত ওষ্ঠ, মুখনিঃসৃত বাণীতে সংস্কৃতির প্রবাহ।" "তাঁর উত্তরগুলো ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের মতো।...তাঁর মনের ক্রিয়াশক্তি এমনই সূক্ষ্ম ও দীপ্তিমান, এমনই সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত যে, তা কখনো-কখনো শ্রোতাদের ধাঁধিয়ে দেয়।" "অতুলনীয় তাঁর বাচনভঙ্গি, অধ্যাত্মরহস্যের মধ্যে প্রবেশসামর্থ্য এবং তর্ককালে বুদ্ধিবৈশল।" "তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলি ইংরাজি ভাষায় রত্নতুল্য;...ইংরাজি কেবল সুস্পষ্টভাবে নয়, স্বচ্ছন্দ-গতিতে বলে যান, এবং তাঁর ভাবরাজি যেমন নূতন তেমনি দ্যুতিময়; সে ভাব নির্গত হয়—বিস্ময়ে স্তম্ভিত ক'রে দেওয়ার মতো অলঙ্কৃত বাক্যপ্রবাহে; মানুষ মানুষের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি কোন্ উচ্চতর কর্তব্যে আবদ্ধ, তা চিত্রিত করবার কালে, ইংরাজি ভাষা অলঙ্কৃত হয়েছে এমন কতকগুলি অপরূপ দর্শনমাণিক্য তাঁর মুখাগ্র থেকে স্খলিত হয়েছে।" "কোনো চিরকুট হাতে না রেখেও নিখুঁত ইংরাজিতে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন।" "এই হীদেন যে-ধরনের সুচারু ইংরাজি বলেন, তেমন আমাদের বক্তৃতামঞ্চ, গির্জার মঞ্চ থেকে সচরাচর শোনা যায় না। বর্ণনীয় বিষয়কে তিনি যে-রকম মার্জিত বাক্‌নৈপুণ্য ও রসিকতায়

সুশোভন করে রাখেন, সে বস্তুর তুলনা পাওয়া যায় না আমাদের পরিচিত মঞ্চ-বক্তাদের মধ্যে।" "অত্যন্ত সুন্দর তাঁর যুক্তির বুনন, তাতে এমন উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ যে, মুগ্ধ মনে সেদিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়—তা ঠিক যেন তাঁর স্বদেশের বহুবর্ণালঙ্কৃত হস্তনির্মিত একটি সূচীশিল্প।...শিল্পী যেমন রঙ ব্যবহার করেন তেমনি এই শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক কাব্যিক চিত্রকল্প প্রয়োগ করেন; বর্ণসংস্থান যথাস্থানে, ফলে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় মনে, কিন্তু তা অদ্ভুত মোহজনক একই সঙ্গে।" "তাঁর ইংরাজি ভাষায় খুঁত ধরার জো নেই।" [সমকালীন, ১ম, ১২৭—১৪০]

লুই বার্কের 'নিউ ডিসকভারিজ' গ্রন্থ-মধ্যে এই ধরনের আরো উল্লেখ পাই। আমরা দেখি, সংবাদপত্রে বলা হয়েছে : "তাঁর ইংরাজি জ্ঞান এমন যে, যেন তা তাঁর মাতৃভাষা।" [৬০] "চমৎকার ইংরাজি বলেন।" [৬১] "ইংরাজি ভাষায় তাঁর নিখুঁত অধিকার।" [৬৪] "তাঁর ঐশ্বর্যপূর্ণ ছন্দোময় বাণীর ঐকান্তিক শব্দগুলি।" [৮৫] "অত্যন্ত সাবধানে ওজন-মাপা শব্দ ব্যবহার করেন এবং প্রতিটি শব্দ ঈপ্সিত অর্থে সরাসরি পৌঁছে দেয়।" [১২০] "তিনি হিন্দুধর্মের সত্যকে প্রকাশ করেছেন পরিচ্ছন্ন শক্তিশালী ভঙ্গিতে।" [১২০] "চমৎকার ইংরেজিতে তিনি কথা বলেছিলেন।" [১২২] "শব্দনির্বাচনে, বাক্যগঠনে, ব্যাকরণে একেবারেই কোনো ত্রুটি তাঁর বক্তব্যে ছিল না।" [১৫১] "গণিতের অধ্যাপক যে-বিচক্ষণতায় তাঁর ছাত্রদের কাছে বীজগণিত বুঝিয়ে থাকেন, সেই একইপ্রকার বিচক্ষণতায় তিনি তাঁর চিন্তাগুলিকে উপস্থিত করেন। তিনি এমন কোনো ভাব উপস্থিত করেন না যাকে যুক্তিপূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে দিতে না পারবেন।" [১৫৪] "তীক্ষ্ণ তাঁর মন, ভাবগুলি প্রশস্ত এবং দার্শনিকতায় পূর্ণ; এমন যুক্তিগ্রহণ করেন যে, তা বহুলাংশে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।" [১৬৭] "তিনি তাঁর বিষয়কে স্বচ্ছন্দ আধিপত্যের শক্তিতে নাড়াচাড়া করেন। তাঁর ভাষণ যুক্তি ও বাগ্মিতায় পূর্ণ।" [১৬৯] "তিনি নিখুঁত ইংরেজি বলেন।" [১৮১] "মার্জিত তাঁর ইংরেজি।" [১৮২] "এই কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণকেশ, মর্যাদাযুক্ত, ঘন হলুদবর্ণ পোষাকপরা মানুষটি আমেরিকানদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে, পরিচ্ছন্ন, ব্যাকরণশুদ্ধ ভাষায় অনর্গল বলে গেলেন।" [১৮৬] "ভারতীয় জনগণ সম্বন্ধে এক ভারতীয় শুদ্ধতম ইংরাজিতে বক্তৃতা করলেন।" [১৯৬] "একেবারে নিখুঁত ইংরাজিতে বক্তৃতা করলেন।" [১৯৭] "যখন বক্তৃতা করেন তখন তাঁর ভাষণের সাবলীলতা, সপ্রতিভ রূপ এবং অভিব্যক্তির সৌন্দর্যের পক্ষে কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।" [২২৫] "সুপণ্ডিত হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ; আমাদের ভাষায় অসাধারণ তাঁর অধিকার।" [২৪৭] "ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দুটি দাঁড়িয়ে উঠে উত্তম 'রাণীর ইংরাজিতে' আমাদের এই যুক্তির কথা শুনিয়েছিলেন যে, তাঁর দেশে প্রেরিত মিশনারিগণ তাঁর দেশের ধর্মের বিষয়ে সুবিচার করেছেন কিনা সন্দেহ।" [২৬৪] "তাঁর ছিল অপূর্ব বাগ্মিতা, নিখুঁত ইংরাজি, এবং চিন্তার গভীরতা।" [৩৪৪] "অসাধারণ ভালো ইংরাজি বলেন।" [৩৫১] "স্বচ্ছন্দে সাবলীলভাবে ইংরাজি বলে যান।" [৩৫১] "ইংরাজি ভাষায় অসাধারণ দখল।" [৩৫৮] "অনবদ্য ইংরাজি বলেন।" [৩৬১] "ধীর কোমল, শান্ত, নিরুদ্বেগ, সঙ্গীতময় তাঁর কণ্ঠস্বর—চিন্তাকে বহন করছিল প্রচণ্ডতম শারীরিক নির্ঘোষের শক্তিতে যেন—তিনি একেবারে সোজা লক্ষ্যভেদ করছিলেন—'ইনিই সেই নির্ধারিত পুরুষ'-সুলভ রীতিতে।" [৩৬৪] "তাঁর ভাষা সমালোচনার ঊর্ধ্বে।" [৪৫০] "অনর্গল ইংরাজি বলেন।" [৪৫২] "তাঁর শব্দব্যবহার নিখুঁত।" [৪৫৪]

লুই বার্কের নিউ ডিস্কভারিজের দ্বিতীয় খণ্ডে ['সেকেণ্ড ভিজিট'] এই ধরনের আরও কিছু সংবাদপত্রের উক্তি আছে, যাদের উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

স্বামীজীর ইংরাজি কেবল আমেরিকান সংবাদপত্রে নয়, ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহেও সমাদৃত হয়েছিল। সানডে টাইমসে লেখা হয় : "ইংরাজি ভাষায় তাঁর অস্বাভাবিক

অধিকার।"৬৩ ইণ্ডিয়া কাগজে : "সমুচ্চ তাঁর বাগ্মিতা; দেড় ঘণ্টা বলে যেতে পারেন কোনো চিরকুট হাতে না নিয়েই—শব্দসন্ধানের জন্য এতটুকু থামতে হয় না।"৬৪ ইকো কাগজে : "ইংরাজি ভাষায় তাঁর অধিকারকে ত্রুটিহীন ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।"৬৫ ডেইলি গ্রাফিক : "এই যোগী চমৎকার শাস্ত্রীয় ভাবময় ভাষায় কথা বলেন।...এঁর ইংরেজি সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ, অভিব্যক্তি ও প্রকাশভঙ্গি সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য।" [সমকালীন, ২য়, ২০] পেল মেল গেজেট : "এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তিনি নিখুঁত ইংরেজিতে তাঁর বিষয় আলোচনা করেছিলেন।" [ঐ, ২০] স্ট্যাণ্ডার্ড : "সওয়া এক ঘণ্টা ধরে নিখুঁত ইংরাজিতে...তাঁর মূল তত্ত্বগুলি উপস্থিত করলেন...তা অদ্বৈত বেদান্তের অত্যুৎকৃষ্ট উন্মোচন।...দ্বিধাহীন সুস্বর কণ্ঠে বলে গিয়েছিলেন।" [ঐ, ২১] কুইন : "নিখুঁত ইংরেজিতে এক ঘণ্টার উপর বলে গেছেন।" [ঐ, ২২] ডেইলি ক্রনিকল : "ইংরাজি ভাষার উপর তাঁর পূর্ণ আধিপত্য।" [ঐ, ২৩] কান্ট্রি হাউস : "তাঁর গ্রন্থগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে রচিত। ভাবরাজিকে সংযতভাবে প্রকাশ করা হলেও তা প্রভাবিত করার শক্তি ধরে। [ঐ, ২৩] এরিক হ্যামণ্ড "ইংরাজি ভাষার উপর তাঁর বিস্ময়কর অধিকারের" বিষয়ে যা বলেছেন, তা আগেই উপস্থিত করেছি। [২য়, ১৪]

আমেরিকান ও ইংরাজি সংবাদপত্রগুলিতে স্বামীজীর বাগ্মিতা প্রসঙ্গে বারবার একটি কথা বলা হয়েছে—অনন্যসাধারণ তাঁর যুক্তিগ্রন্থন ও সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ক্ষমতা। তাঁর ভাষায় কাব্যিক সৌন্দর্য ছিল—তার মানে নয় অযথা ভাবাবেগ। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গদ্যের গুণসম্পন্ন তাঁর গদ্য। নিবেদিতা স্বামীজীর রচনারীতি ও প্রকাশসামর্থ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা পুনশ্চ এখানে স্মরণ করতে পারি : তিনি যদি জন্মগ্রহণ না করতেন তথাপি তাঁর দ্বারা প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যরূপেই বর্তমান থাকত, এমনকি সমান প্রামাণ্যও থাকত, তবে এই পার্থক্য ঘটত...ঐগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা থাকত না, এবং অভাব ঘটত পারস্পরিক সঙ্গতি ও ঐক্যবোধের।" [১—ভূমিকা]

আমরা জানি, আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে কোনো ভারতীয়ের পক্ষে সেকালে উত্তম ইংরাজির জন্য প্রশংসা পাওয়া যদিবা সম্ভব—ভারতের উচ্চনাসা সাহেবী কাগজগুলি তাতে নিতান্তই গররাজি—কি-জানি, তার ফলে যদি ভারতীয়দের শক্তি বেড়ে যায়!! তথাপি প্রশংসা এসেছে—কিছুটা উদারনৈতিক ইংরাজ একেবারে দুর্লভ ছিলেন না। বোম্বাইয়ের টাইমস অব ইণ্ডিয়া ১৮৯৬ সালের ৬, ২৩ অগস্ট এবং ৯ সেপ্টেম্বর—তিনটি দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে স্বামীজীর যোগ-বিষয়ক রচনার আলোচনা করেছিল—এবং আলোচনার মধ্যে তাঁর রচনা থেকে প্রচুর অংশ প্রশংসভাবে উদ্ধৃত করে—যা কেবল তাঁর বক্তব্যের নয়, ভাষারও সমাদর বহন করেছিল। স্বামীজীর নানা যোগগ্রন্থের আলোচনা ভারতের অন্য সাহেবী কাগজেও হয়েছে, যেমন বম্বে গেজেট,৬৬ মাদ্রাজ মেল, বা মাদ্রাজ টাইমসে। শেষোক্ত কাগজটির ওভারল্যাণ্ড এডিশনে ৫ নভেম্বর, ১৮৯৬, স্বামীজীর ভক্তিযোগের উপর আলোচনাকালে তাঁর রচনা যে প্রায়শঃই গসপেলের তুল্য মনে হয়, একথা স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁর ভাষা এবং রচনাভঙ্গি নাকি পিলগ্রিম ফাদারদের তুল্য। [সমকালীন, ১ম, ১৫৩] ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি'র আলোচনাকালে "কবিরূপে স্বামী বিবেকানন্দ" নামক সম্পাদকীয়তে স্বামীজীর এই সাহিত্যসৃষ্টির কোন্ বিশেষ প্রশংসা কাগজটি করেছিল, তা আমরা আগেই জানিয়েছি। স্বামীজীর কাব্যের অংশবিশেষের "পরম গাম্ভীর্য-মহিমার"

৬৩ *CW*, V, 194
৬৪ *CW*, V, 201.
৬৫ *CW*, V, 204
৬৬ বম্বে গেজেট ১৮৯৬, ৫ সেপ্টেম্বর।

কথা বলার পরে, সে দেশনায়ক গ্যারিবলডির ব্যর্থ কাব্যচেষ্টার সঙ্গে অধ্যাত্মনায়ক বিবেকানন্দের সফল কাব্যসৃষ্টির তুলনাও করেছিল। [ঐ, ১৫৪-৫৫] অনুরূপভাবে সে প্রশংসা করেছিল খেতড়ির রাজাকে লেখা স্বামীজীর দীর্ঘপত্রের ভাব ও রীতির। [ঐ, ১৫৭] স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে এই পত্রিকা তার উপর ২ অগস্ট, ১৮৯৭, যে-দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখে, তা প্রধানতঃ যদিও স্বামীজীর প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনাতেই নিযুক্ত ছিল, কিন্তু শেষাংশে তাঁর চিন্তার মৌলিকতা এবং উক্ত চিন্তাকে অপরের মনে সঞ্চারিত করে দেবার ক্ষমতার উল্লেখ না করে পারেনি। মাদ্রাজ মেলে স্বামীজীর ভক্তিযোগের উপর ১৮ নভেম্বর, ১৮৯৬, দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়, যেমন হয়েছিল রাজযোগের উপর ১০ অগস্ট ১৮৯৬। পত্রিকাটি কর্মযোগের বিষয়েও আলোচনা করে ৪ মে, ১৮৯৭। এই কাগজ স্বামীজীর দেহান্তের পরে ৭ জুলাই, ১৯০২ তাঁর দানের হিসাব করতে গিয়ে অন্যান্য কথার সঙ্গে বলে : "হিন্দুধর্ম বিষয়ে তাঁর ইংরাজি বক্তৃতা কয়েক খণ্ড বই হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেগুলি আধুনিক হিন্দু ধর্মসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।" মাদ্রাজ টাইমস স্বামীজীর 'মাদ্রাজ উত্তরে'র ভাষা ও রচনারীতির সমূহ প্রশংসা ক'রে, সেন্ট পলের পত্রের সঙ্গে তার তুলনা করেছিল। স্বামীজীর ভাষার "অপরিসীম সৌন্দর্য"—যার মধ্যে আমেরিকার প্রাণচঞ্চল জীবনের গতি ও উত্তাপ "নূতন লাবণ্য" সঞ্চারিত করেছে—সেই ভাষার "সহজ প্রবহমান প্রত্যক্ষতা" এই পত্রিকার সম্পাদককে অভিভূত করে ফেলেছিল। তিনি ভেবেছিলেন—এই ভদ্রলোকের মাতৃভাষা ইংরাজি নয়, বাল্যে ইংরাজি শিক্ষাকালে অ্যাংলো-স্যাক্সনদের সুন্দরী ভাষাকে নিয়মিত খুন করেছেন—সেই ইনি এখন নিহতের পুনরুত্থান ঘটিয়ে তার অঙ্গে যোগ করে দিচ্ছেন নূতন সৌন্দর্য। [ঐ, ২৫৯-৬০]

ভারতীয় পত্র-পত্রিকাতেও স্বামীজীর ভাষা ও রচনারীতির শক্তি ও সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছিল। স্বামীজীর মূল ইংরাজি রচনা ও ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহে তাদের অনুবাদের উল্লেখ দেখা গেছে।৬৭ ইণ্ডিয়ান মিরার ২২ অগস্ট, ১৮৯৭, স্বামীজীর 'লেকচারস্ ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া'র উপর মন্তব্য করে। লাইট অব দি ইস্ট আলোচনা করেছিল কর্মযোগ সম্বন্ধে, মার্চ, ১৮৯৭। থিয়জফিস্ট এপ্রিল, ১৮৯৭, একই গ্রন্থের উপর মন্তব্য করে। থিয়জফিক থিংকারের ১৪ মার্চ, ১৮৯৬ সংখ্যায় কর্মযোগের রচনারীতির প্রশংসা ছিল। একই পত্রিকা ৭ নভেম্বর, ১৮৯৬ সংখ্যায়, স্বামীজীর ভক্তিযোগ, এবং 'আইডিয়াল অব ইউনিভার্সাল রিলিজন'-এর স্বচ্ছ ও সমর্থ রচনাভঙ্গি, এবং তাদের আদর্শের স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতা কিভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষের উপযোগী, তা সবিশেষ বলেছিল। স্বামীজীর হিন্দুধর্ম বিষয়ে "প্রাঞ্জল ও শক্তিশালী রীতিতে লিখিত রচনাটি" যে মহামূল্য সুবর্ণতুল্য, সেকথা "ভারত" পত্রিকা থেকে ইণ্ডিয়ান মিরার ২০ এপ্রিল, ১৮৯৪, সংকলন করে জানিয়েছিল।

স্বামীজীর "বিশ্বকল্যাণ" সম্বন্ধীয় একটি রচনার প্রশংসা মরাঠা করেছিল—১২ জুলাই, ১৮৯৬ সংখ্যায়। "স্বামীজী সবিশেষ দার্শনিক অথচ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে লেখেন; এবং যে-ধারালো যুক্তিতে প্রতিটি বিষয়কে মণ্ডিত করেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়।" স্বামীজীর

৬৭ যেমন, প্রবুদ্ধ ভারতে (মে, ১৯০২) শুদ্ধানন্দ-কৃত স্বামীজীর 'ভক্তিযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'কর্মযোগ', 'রাজযোগের' বঙ্গানুবাদ; ইণ্ডিয়ান মিরারে (১৭ মে, ১৮৯৬) স্বামীজীর বিভিন্ন রচনার বঙ্গানুবাদ; প্রবুদ্ধ ভারতে (জুলাই ১৯০১) তাঁর 'কর্মযোগ,' 'রাজযোগ' এবং 'হিন্দুধর্ম'-এর গুজরাটি অনুবাদের সংবাদ ছিল। স্বামীজীর রচনার তামিল, তেলেগু ও কানাড়ি ভাষায় অনুবাদের জন্য কমিটি গঠনের সংবাদ আছে মাদ্রাজ মেলের ২৫ জানুয়ারি, ১৮৯৮ সংখ্যায়।

"সর্বজনীন ধর্ম" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ মহাবোধি সোসাইটি পত্রিকার নভেম্বর, ১৮৯৬ সংখ্যায় সুদীর্ঘ সানুরাগ এক সম্পাদকীয়ের কারণ হয়; একই প্রবন্ধ বিষয়ে নরসংপ্রসাদ নামক গোরক্ষপুরের এক ব্যক্তি বিস্তারিত পত্রযোগে ইণ্ডিয়ান মিরারের ১৩ মে, ১৮৯৬, সংখ্যায় সাবিস্ময়ে লেখেন—স্বামীজী কিভাবে না হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র থেকে রত্নোদ্ধার করে বিশ্বসংসারে ছড়িয়ে দিচ্ছেন!

সমকালে ইংরাজির বিখ্যাত অধ্যাপক-লেখক, ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদক এন এন ঘোষ, স্বামীজীর ভাষার "প্রাঞ্জলতা, লাবণ্য ও যুক্তিশক্তির" কথা স্বীকার করেছিলেন। [সমকালীন, ১ম, ২৫২] কলকাতায় প্রদত্ত স্বামীজীর বেদান্ত বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—বিরাট শক্তিতে ও সৌন্দর্যে সেটি পূর্ণ [ঐ, ৩য়, ১২] (ইণ্ডিয়ান মিরারও ৭ মার্চ, ১৮৯৭, একই কথা বলে)। কয়েক বছর পরে তিনি কোনো এক প্রসঙ্গে বলেন, স্বামীজীর রচনা "ভাব-বস্তুতে যথাযথ, এবং তা সাহিত্যকর্ম হিসাবে রূপ-প্রকৃষ্ট।"৬৮

অনেক বছর বাদ দিয়ে নিকটকালে উপস্থিত হয়ে, আর এক ইংরেজির বিখ্যাত অধ্যাপক-লেখক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক প্রবন্ধে স্বামীজীর ইংরেজি বাণী ও রচনার আলোচনা করতে দেখি। ঐ লেখার গোড়ায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ঊনিশ ও বিশ শতকের ভারতীয় লেখকদের ইংরাজির বিশেষ প্রশংসা ক'রে, যাঁদের উল্লেখ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র আছেন। এক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় ভারতের বিখ্যাত বাগ্মীদের কথা স্বতঃই এসেছিল—রামগোপাল ঘোষ, ডবলিউ সি ব্যানার্জি, মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, লাজপত রায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি। বিখ্যাত ধর্মবক্তাদের প্রসঙ্গে স্বতঃই বলেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কথা। বক্তা হিসাবে বিবেকানন্দের মহিমার কথা উত্থাপন ক'রে তিনি কেশবচন্দ্র ও প্রতাপ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কেশব ও প্রতাপের বক্তৃতা অনেকটা পাদরীদের সারমনের আদলে গঠিত হয়েছিল—বিবেকানন্দের বক্তৃতা কদাপি সে জাতের নয়। চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতাপচন্দ্র ও বিবেকানন্দের ভাষণের দীর্ঘ তুলনার শেষে তিনি বলেন, মজুমদারের ভাষণে হিন্দুসমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার সমর্থনে কিছুটা কুণ্ঠিত আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গি ছিল, তাই সে-বস্তু সুগভীর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়নি, অপরপক্ষে বিবেকানন্দের ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের কাছে নব উন্মোচন ছাড়া কিছু নয়। এমন ঘটবার কারণ, বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর ছিল প্রত্যয়ের শক্তি, তদনুযায়ী প্রাঞ্জলতা। ভাবভঙ্গির প্রশান্ত নিশ্চয়তা, গাম্ভীর্য-মহিমা এবং অতীত গরিমার উজ্জ্বল ভূষণ, তাঁকে স্বচ্ছন্দে অন্য সকলের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেছিল। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যবোধ সর্বাধিক উল্লসিত হয়েছিল—ধর্মমহাসভায় পঠিত স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' রচনার আলোচনাকালে। তিনি না বলে পারেন নি—আর কখনো কোনো ধর্মমত এহেন আকারের একটি রচনার মধ্যে সকল দার্শনিক সূক্ষ্মতা, অধ্যাত্ম রহস্যময়তা, ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যসহ উপস্থাপিত হয়নি। এ-বস্তু তিনিই করতে পারেন যাঁর কাছে সবকিছু খোলা বইয়ের মতো পড়ে আছে।৬৯ ভারতীয় ধর্মসত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের

৬৮ মরাঠা, ১৯ জুন, ১৯০৪

৬৯ "Never was a religion with all its subtle intricacies, its mystic assumptions, its complex associations with past traditions and hoary legends, its range of ideas so alien to Western mind, presented with such a convincing brilliance of exposition and an air of infallibility that quailed not before the most obvious apparent impossibilities. Here was a master of the great mystery of religion expounding before people brought up in an alien culture and a different order of religious ideas all the inscrutable subtleties of his own

ব্যাপারে শংকরাচার্যের ভূমিকার সঙ্গে বিবেকানন্দের ভূমিকার তুলনা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন। শংকরাচার্য যেখানে স্বদেশে স্বজাতির মধ্যে কাজ করেছিলেন—সেখানে বিবেকানন্দকে প্রধানতঃ কাজ করতে হয়েছিল বিদেশে, বিজাতির মধ্যে—তদনুযায়ী জড়বাদী, সন্দিগ্ধ পাশ্চাত্ত্য মানুষদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তিরীতি গ্রহণ করেছিলেন—যে-ধরনের কাজ তাঁর পূর্বে কোনো ভারতীয়কে করতে হয়নি। কঠিন সে কাজ—একদিকে তাঁকে ভাববস্তুর সরলীকরণ করতে হয়েছে, অপরদিকে দেখতে হয়েছে শক্তি ও ঐশ্বর্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়। এই কাজে বিবেকানন্দের আশ্চর্যজনক সাফল্যের কথা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে জানিয়েছেন।৭০

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে আরও নানা প্রসঙ্গ তুলেছেন। স্বামীজী যেহেতু নানা ধরনের বিষয়ে লিখেছেন, তাই রচনারীতিতে বিষয়ানুরূপ পরিবর্তন ঘটেছে, একথা জানাতে ভোলেন নি। শেষে তিনি ইংরাজি সাহিত্য থেকে অনুরূপ একজন লেখকের নাম করেছেন—তিনি হলেন কার্ডিনাল নিউম্যান। স্বামীজীর রচনারীতি সম্বন্ধে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটি প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছেন—কেবল যুক্তিশৃঙ্খলা বা প্রাঞ্জলতা জীর রচনার শক্তিভিত্তি নয়—ঐ স্টাইলের ভিতরে আছে এক গোপন শক্তি, যা যুক্তি থেকে উদ্ভূত নয়—যা অতীন্দ্রিয় রহস্যের উৎসার। শান্ত, সুমিত বাক্যের পর বাক্য চলেছে তথ্যসম্ভারকে বহন ক'রে—অকস্মাৎ ঝলসিত হয়ে উঠল এমন-কিছু উক্তি যা অগ্নিময় আত্মারই অভিব্যক্তি, অথচ সে-কথাগুলি স্বাভাবিক সংযমকে পরিহার করেনি, তাই অধিকতর প্রভাবশালী।

অন্যের অসাধ্য যে-ভূমিকায় স্বামীজীকে সাফল্য অর্জন করতে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন—সে ভূমিকা যে, বিবেকানন্দের অতিমানবিক শক্তির পক্ষেও সুকঠিন ছিল, তা স্বয়ং স্বামীজীই স্বীকার করেছেন। আলাসিঙ্গাকে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬, এ-সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন, তা তাঁর আচার্য-ভূমিকার মহিমা উদ্ঘাটিত করে দেয় :

"হিন্দুভাবগুলিকে ইংরাজিতে ভাষান্তরিত করা; তারপর শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ, এবং বিচিত্র চমকপ্রদ মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম বের করে আনা, যা একদিকে হবে সহজ-সরল এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী, অন্যদিকে তা সর্বোচ্চ মনীষিগণের প্রয়োজন পূরণ করবে---এ যে কী কাজ, তা যাঁরাই চেষ্টা করেছেন তাঁরাই বুঝবেন। বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে অবশ্যই প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবন্ত ও কাব্যময় করে তুলতে হবে; অসম্ভব জটিলতায় দিশাহারা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য থেকে সুস্পষ্ট নৈতিক চরিত্র বের করে আনতে হবে; বিভ্রান্তিকর যোগশাস্ত্রের ভিতর থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে বিজ্ঞান-

spiritual intuitions as if he was reading from the pages of an open book which all could follow with the same ease." [Dr Srikumar Banerjee, *Swami Vivekananda as a Speaker and Writer of English*, in *Viswavivek*, 443]

৭০ "The very attempt to make himself intelligible to foreigners compelled him to be clear in his own thoughts and present his case with utmost lucidity and persuasiveness. Avoidance of all complex issues, close reasoning not too oppressive in its weight, simple presentation of elemental truths, the marshalling of homely images and illustrations which could easily go home and occasional flights of rhetoric and bursts of eloquence which would thrill his hearers and purify their mind of the last vestiges of doubt—these were the methods that made of his religious discourses such a splendid and unqualified success." [*Ibid*, 446]

সম্মত বাস্তব মনস্তত্ত্ব; সেগুলিকে এমনভাবে উপস্থিত করতে হবে যাতে শিশুরা পর্যন্ত বুঝতে পারে;—এই হল আমার জীবনব্রত।" [৭—২২৫]

এই অসম্ভব কাজে অসম্ভব সাফল্য স্বামীজী অর্জন করেছিলেন—নিবেদিতার ভাষায়, "হিন্দুবিশ্বাসের মহাসনদ" রচনার গৌরব তাঁরই—কিন্তু স্বামীজীর বাণী ও রচনায় আর একটি বিরাট দানের দিক আছে—মানবতার মহাবাণী এবং উত্থানের মহামন্ত্র। সে সম্বন্ধে সর্বোত্তম স্বীকৃতি এসেছে মানবতার পক্ষে এক মহান সংগ্রামী সাহিত্যিকের কাছ থেকে। রোমা রোলাঁ স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাসমূহ সম্বন্ধে বলেছেন : "এমন সুন্দর দৃপ্ত বক্তৃতা ভারত ইতিপূর্বে শোনে নাই। সমস্ত দেশ রোমাঞ্চিত হইল। এগুলিতেই তাঁহার প্রতিভা উচ্চতম শিখর স্পর্শ করিয়াছিল।...তাঁহার ঘোষণা ছিল শঙ্খধ্বনির মতো। সে শঙ্খধ্বনি রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে পুনরায় জাগ্রত হইতে আহ্বান করিল—তাহার শৌর্যশীল মানস-সত্তাকে, তাহার অমর আত্মাকে সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হইতে বলিল।" "দেশের উপর দিয়া বহিয়া গেল বারি ও বহ্নির প্লাবন। সেইসঙ্গে আসিল আত্মার শক্তির নিকটে—মানুষের মধ্যে যে-ভগবান নিদ্রিত আছেন তাঁহার নিকটে—মানুষের অসীম সম্ভাবনার নিকটে—দুর্জয় এক আবেদন। রেমব্রাণ্ট-অঙ্কিত চিত্রে বর্ণিত ল্যাজারাসের সমাধিপার্শ্বে দণ্ডায়মান যীশুর মতো প্রাচ্যের এই ঋষিকে ঊর্ধ্ববাহু অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। মৃতকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য তিনি যে দেহভঙ্গি করিয়াছেন তাহা হইতে শক্তি উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে।"৭১ স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলী যে-প্রপাতের সৃষ্টি করেছিল, "তার কলধ্বনি ও প্লাবনের গর্জনের" কথা রোলাঁ একাধিকবার বলেছেন; সকল ভারতীয় মনীষী ও নেতার মধ্যে "চূড়ান্ত তূর্যনিনাদ" বিবেকানন্দই করেছিলেন। স্বামীজীর সেই ভাষণগুলির চরিত্র সম্বন্ধে রোলাঁর অমর রচনায় পাই : মহাসঙ্গীতের মতো শব্দগুলি, বীঠোফেনের মতো রচনা, হ্যাণ্ডেলের একতানের মতো উদ্দীপ্ত ছন্দ। ১৯২৮ সালে রোলাঁ বলেছেন, ত্রিশ বৎসর আগে কথিত সেই বিক্ষিপ্ত উক্তিগুলিকে যেখানেই তিনি স্পর্শ করেছেন সেখানেই ইলেকট্রিক শক্ লেগেছে। স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে চেয়েছেন—তাহলে কী সে চমক, কী না উন্মাদনা পেয়েছিল তারা—যারা এই আগুনের মতো কথাগুলি বীরের নিজের মুখ থেকে শুনেছিল!

"His words are great music, phrases in the style of Beethoven, stirring rhythms like the march of Handel choruses. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages of books at thirty years' distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports must have been produced when in burning words they issued from the lips of the hero!"৭২

এইসকল অনবদ্য সমালোচনার পরে আর কিছু যোগ করা কঠিন। কেবল একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রসঙ্গ শেষ করব—যেকথা আগেও বলেছি—বিবেকানন্দের রচনার বড় অংশ রচনা নয়, বক্তৃতার মুদ্রিত লিপি। তাহলে আমাদের সবিস্ময়ে ভাবতে হয়, সে কোন্ অপূর্ব ঐশ্বর্যশালী প্রস্তুত মন, যার ভিতর থেকে ঐভাবে বাণীপ্রবাহ বেরিয়ে আসত। 'প্রেরণা' ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিবেকানন্দের সাহিত্যকে যেভাবেই বিচার করা হোক—প্রেরণা শব্দ বাদ দিয়ে তার কোনো হিসাবই হতে পারে না। বিবেকানন্দের

বক্তৃতার মুদ্রিত রূপ পাঠ করে সেইজন্য বিখ্যাত দার্শনিক-লেখক উইলিয়ম জেমস সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন : "লোকটি বাগ্মিতার ক্ষেত্রে মহাবিস্ময়।" [সমকালীন, ২য়, ৪৫] এবং নিবেদিতা স্বামীজীর এক বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলেছেন :

"অপরূপ বাক্যগুলি তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়তে লাগল। আমরা উত্থিত হলাম অনন্তে; সাধারণ মানুষ আমরা—হয়ে গেলাম আশ্চর্য শিশুর মতো—যে-শিশু আকাশের সূর্য-চন্দ্র-তারকার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে—সেগুলিকে শিশুর খেলনা ভেবে।"৭৩

॥ ৯ ॥ বিবেকানন্দের বাংলা কবিতা

বর্তমান অধ্যায় যে-প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে যাব—বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের দান। সত্যই উল্লেখযোগ্য সে দান—যদিও রচনার পরিমাণ মোটেই বেশি নয়।

বাংলায় স্বামীজীর যেসব রচনা পাওয়া গেছে তাতে বিষয় ও রীতিবৈচিত্র্য আছে। এমন-কি তিনি বাংলায় গল্প লেখার চেষ্টা করেছিলেন, যদিচ সেকাজ তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক বলেই বোধহয় প্রচেষ্টা অসমাপ্ত থেকে গেছে।৭৪ যাইহোক আমরা দেখি, তিনি বাংলায় গান, কবিতা, পত্র, প্রবন্ধ, নক্সা, ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন।

স্বামীজীর বাংলা কবিতা অবশ্য সংখ্যায় বেশি নয়। তাঁর "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর," এবং "একরূপ অরূপ-রূপ-বরণ"—এই দুই গানকে কবিতা ধরলে কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭টি।৭৫ কবিতাগুলির দীর্ঘ রসবিশ্লেষণ এখানে আমার অভিপ্রেত নয়। আর গোড়াতেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল—কবিতা তাঁর যথেষ্ট মনোযোগ পায়নি, এবং কবিতা লেখার সময়ে তিনি ভাবের প্রতি যতখানি মনোযোগ দিয়েছেন—ছন্দ বা অন্য আঙ্গিক বিষয়ে সেই পরিমাণে যত্নশীল হননি। তিনি আত্ম-উন্মোচন করতেই চেয়েছেন, প্রচলিত অর্থে কবি হবার বাসনা তাঁর ছিল না।

৭৩ নিবেদিতা লোকমাতা, ৯৫

৭৪ এই অসমাপ্ত গল্পের নাম 'শিবের ভূত।' [৬—৫৩-৫৪]।

৭৫ স্বামীজী অতিচমৎকার দুটি শিবসঙ্গীত লিখেছিলেন, যাদের মধ্যে মাতোয়ারা ছন্দে শিবের নটরাজ রূপ ফুটেছে, একই সঙ্গে দারুণ গাম্ভীর্যও বজায় আছে। পরবর্তীকালে নজরুলের কিছু শিবসঙ্গীতে এর প্রতিধ্বনি দেখা যায়। প্রথম গানটি এই :

"তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা; বম্ বব বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল।
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।"

অন্য গানটির দুই ছত্র :

"উর্ধ্ব জ্বলত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী।"

"তাথৈয়া তাথৈয়া" গানটি নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৭ ফেব্রুয়ারি মাসে বরাহনগর-মঠে রচনা করেছিলেন, তার প্রমাণ, মাস্টার মহাশয় ২১ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রির দিন স্বামী শিবানন্দের মুখে গানটি শোনেন। তিনি লিখেছেন, "এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।" এই কথাব সমর্থন স্বামী অভেদানন্দের "আমার জীবনকথা"তে পাওয়া যায়। গানটির উল্লেখ করে অভেদানন্দ লিখেছেন : "শিবরাত্রির সময় নরেন্দ্রনাথ শিববিষয়ক একটি গান রচনা করিয়া গাহিতে লাগিল।...নরেন্দ্রনাথ শিবের আবেশে তন্ময় হইয়া গানটি রচনা করিয়াছিল, এবং এমনই ভাবে বিভোর হইয়া গান করিয়াছিল যেন ভোলানাথ শিব নিজেই নিজের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। সে এক সুন্দর পরিবেশ। নরেন্দ্রনাথের কিন্নর কণ্ঠে ভাবগম্ভীর সেই গানের স্মৃতি আজিও আমার মনে জাগরূক আছে।" [প্রজ্ঞানানন্দ, 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'সঙ্গীত ভাবনায় বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ, ৫১৩-১৪]

স্বামীজীর পূর্বোক্ত দুটি সংগীত-কবিতাকে পাশাপাশি রেখে বিচার করা যায়। একটিতে আত্মসংহরণের "প্রলয় বা গভীর সমাধি", অন্যটিতে সেই প্রলয় থেকে সৃষ্টি-সূচনা। "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি" কবিতাটি ঐ প্রলয় বা সমাধির, আর অন্য কবিতার নাম "সৃষ্টি"—বিষয়ও তাই। দুটি কবিতাই দুর্জ্ঞেয় লোকের চরম উচ্চারণের মতো। মনে হয়, কাব্যের দিক দিয়ে "নাহি সূর্য" কবিতাটি শ্রেষ্ঠতর, যদিও সে সম্বন্ধে মতভেদ ঘটতে পারে। এ-ধরনের দিব্য সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ অনুভূতির উন্মোচনকে নিছক কাব্যহিসাবে বিচার করা যায় কিনা সন্দেহ। এদের আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বার ভেঙে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে মহাবেগে প্রবেশের পক্ষধ্বনি বলতে পারি।৭৬ "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি" গানটি সৃষ্টিকালেই বিদগ্ধজনদের কাছে, (যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাই অতুলচন্দ্র ঘোষ) উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি বলে প্রতিভাত হয়েছিল। অতুলবাবু বলেছিলেন, "এই গান যে বাঁধতে পারে সে একটা বড়লোক —এই গানের জন্য সে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।"৭৭

প্রকৃতি-বর্ণনাত্মক "সাগরবক্ষে" নামে একটি কবিতা স্বামীজী লিখেছেন, যার বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু "গাই গীত শুনাতে তোমায়" কবিতাটি বিশেষ কারণে মনোযোগ পেয়েছে—এই স্বগতোক্তির কবিতাটিতে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিচিত্র সম্পর্ককেই নাকি ফুটিয়েছেন। প্রায় গৈরিশ মুক্তচ্ছন্দে রচিত এই কবিতায় অনেক দার্শনিক বক্তব্য আছে; অন্তর্জগতে ব্যক্তি-সত্তার অভিযানের নানা সুগভীর উপলব্ধিময় কথা তাতে মেলে; অদ্বৈতসত্যের উদ্ভাসনও দেখা যায় ["আমি আদি কবি।...আমি করি খেলা শক্তি-রূপা মম মায়া সনে/একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ]; স্থান-বিশেষে গম্ভীর নিসর্গবর্ণনাও আছে ["মেরুতটে হিমানী-পর্বত/যোজন যোজন সে বিস্তার;/ অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে/ শত উঠে চূড়া তার।/ ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা/শত শত বিজলি প্রকাশ!/...শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর/গলে চূড়া শিখর গহ্বর];—কিন্তু কবিতার প্রাণ কাঁপছে একটি অন্তর্গত সত্যে : "যতই যা হোক, আমি সেই দক্ষিণেশ্বরের বালক বই আর কেউ নই।" স্বামীজী বলেছেন :

"গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভালো মন্দ নাহি গণি
নাহি গণি লোকনিন্দা যশ কথা।...
ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা 'পরে
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে;
শিয়রে দাঁড়াতে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি।"

৭৬ দুটি গানই চরম এক অধ্যাত্ম-উপলব্ধির পরে নরেন্দ্রনাথ রচনা করেন, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বামী অভেদানন্দ। "আমার জীবনকথায়" তিনি লিখেছেন : "এই [নির্বিকল্প সমাধির] উপলব্ধির পর নরেন দুটি গান রচনা করেন—'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ' ইত্যাদি এবং 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ' প্রভৃতি।...দুটি গান গাহিয়া আমাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন।" ['চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ', ৫১৩]

গান দুটির বিস্তারিত তত্ত্বব্যাখ্যা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ করেছেন উদ্বোধনের বিবেকানন্দ শত-বার্ষিকী সংখ্যায়। "নাহি সূর্য" গানটি সুপরিচিত। 'একরূপ' গানটির দুটি ছত্র তুলছি, তার থেকেই এর মহিমার আভাস পাওয়া যাবে :

"কোটি চন্দ্র, কোটি তপন লভয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক জ্যোতি-মগন।"

৭৭ ঘটনাবলী, ১ম, ৮৬-৮৭

এর পরেই সেই ব্যাকুল আত্মনিবেদন, স্বামীজীর হৃদয়-গভীরের গান :

"প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।...
বাণী তুমি বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।"

স্বামীজীর দুটি কবিতা বিখ্যাত—"সখার প্রতি" এবং "নাচুক তাহাতে শ্যামা।" এই দুটি কবিতার নিয়মিত আবৃত্তি হয়ে থাকে, এবং এদের কিছু-কিছু ছত্র ধ্রুববাণীর মর্যাদা লাভ করেছে। দুটি কবিতার কিছু অংশে বক্তব্যগত ঐক্য আছে, যদিচ উভয় কবিতার মৌল ভাব ভিন্ন। "সখার প্রতি" কবিতায় স্বার্থময় সংসারের ছবি আঁকা হয়েছে, এবং এই সংসারে যাঁরা নিঃস্বার্থ তাঁদের জন্য কোন্ দুঃখময় বাস্তবতা অপেক্ষা করে আছে, তা কিছুটা ট্রাজিক বিষাদের সঙ্গে বলা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে তিক্ত উন্মোচন : "হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল,/সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ—তবে পাবে এ-সংসারে স্থান।" আমরা জেনেছি : এই সংসারে অবিরাম দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে, পিতাও পুত্রকে স্থান ছেড়ে দিতে রাজি নয়। যাঁরা এই পৃথিবীর মানুষের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন—প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হয়ে তাঁদের বিদ্যাসাগরীয় দীর্ঘশ্বাস মোচন করতেই হয় : "সে আমার নিন্দা করছে? কই মনে তো পড়ে না আমি কখনো তার উপকার করেছি?" বিবেকানন্দের উদাত্ত বেদনানুভূতি এখানে আমরা পেয়েছি—যে-অংশ মানবপ্রেমিক সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বারে বারে আবৃত্তি করতেন :

"যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়,
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ-জগতে নাহি তব স্থান।"

কিন্তু নৈরাশ্যে কখনো সমাপ্ত নন বিবেকানন্দ। বিষাক্ত অভিজ্ঞতার উপরে উঠবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। সংসার প্রতারণা করে, করেই—তাকে অতিক্রম করার উপায় হয়ে দাঁড়ায়—উট-পাখির মতো সুখের বালিতে মুখ গুঁজে থাকা, কিংবা দুঃখকে ভালবাসার ছলনা। শেষোক্ত ধরনের দুঃখবিলাসের ফাঁকি বিবেকানন্দের চোখে ধরা পড়েছিল। ও-বস্তুও এক ধরনের সুখ ভোগেচ্ছা। তাতে তীব্র অনুভূতির আস্বাদন হয়। কিংবা আরও চতুর যারা, তারা দুঃখের অগ্রিম দাদন দেয় পরবর্তী সুখকে নিরঙ্কুশ করার জন্য। এই সুখ বা দুঃখের অর্চনা—দুইই পলায়নী প্রবৃত্তি। স্বামীজী কঠিন স্থির কণ্ঠে বললেন, এই সৃষ্টি থেকে পলায়নের কোনো উপায় নেই : "পক্ষহীন শোনো বিহঙ্গম—এ যে নহে পথ পালাবার।" তাহলে এই পৃথিবীতে দুঃখজয়ী, শোকজয়ী কোন্ অমৃত মানুষকে নিত্যজীবনের অধিকার দেবে? বিবেকানন্দের উত্তর একটিমাত্রই : "শোনো বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্যসার।...ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম—প্রেম, প্রেম, এই মাত্র ধন।" এরপরে 'সখার প্রতি' কবিতা শেষ হয়েছে এমন কয়েকটি ছত্র দিয়ে, যা মন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, এবং মন্ত্রের মতোই পবিত্র শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয় মানবপ্রেমিকদের কণ্ঠে। বিবেকানন্দের সেই ঔপনিষদিক উচ্চারণ :

"ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
দাও! দাও!—যেবা ফিরে চায় তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু—সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

"নাচুক তাহাতে শ্যামা" আর একটি কবিতা, যাতে বিবেকানন্দ-সত্য শব্দে-শব্দে ঘোষিত।৭৮ স্বামীজীর ইংরাজি কবিতা "কালী দি মাদার"-এর সঙ্গে এই কবিতার একাংশের ভাবসাম্য আছে, কিন্তু এই বাংলা কবিতাটিতে স্বামীজীর জীবনবোধের ব্যাপকতর প্রকাশ লক্ষণীয়। ইংরাজি কবিতাটি এক বিশেষ প্রেরণার ক্ষণে লিখিত, ঐকালে যে-ভাব তাঁকে অধিকার করেছিল তারই উন্মোচনে স্বামীজী আর্ত ছিলেন, তাতে অসাধারণ সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। সেখানে রয়েছে মহাকালীর প্রলয়সংহার রূপ এবং সেই ভয়ংকর রূপের সম্মুখীন নির্ভয় আত্মার উল্লাসধ্বনি। বাংলা কবিতাটিতেও কালীর প্রলয়ংকরী রূপের কথা আছে, কিন্তু সেই বর্ণনাই কবিতাটির উদ্দেশ্য নয়; ভীষণ মৃত্যু জীবনের পক্ষে কতখানি বাস্তব সত্য, তার মুখোমুখি হয়ে মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়, কিভাবে নানা ছলনায় ও আত্ম-প্রবঞ্চনায় মানুষ ভয়ংকরের উপরে আচ্ছাদন টানতে চায়, সেইসঙ্গে আতুর কামনায় স্নিগ্ধ সুন্দর-মধুরের আরতি করে—স্বামীজী এই কবিতায় তাই দেখিয়েছেন। পৃথিবীর বীরকুলের জন্য তিনি ভয়ংকরী কালীর মাধ্যমে ভয়ংকর সত্যের আবরণ উন্মোচন করেছেন। মৃত্যুরাজের ভূমিকায় এখানে তিনি অবতীর্ণ—পৃথিবীর নচিকেতাগণের জন্য। নব-নচিকেতাদের আর প্রশ্ন করে জানতে হয়নি মৃত্যুরহস্য—স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে বিবেকানন্দ তাদের সেই অমৃত দান করেছেন তাঁর এই কঠ-কঠোর উপনিষদে।

এই কবিতায় তাই দুটি চিত্র : একটি সর্বকাম্য মধুরের, দ্বিতীয় তার বিপরীত। প্রথম চিত্রের কিছু অংশ :

> "ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে-পাশে;
> শুভ্র শশী যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে।
> মৃদুমন্দ মলয় পবন—যার পরশন স্মৃতিপট দেয় খুলে,
> নদী, নদ, সরসী-হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কত-বা কমল দোলে।...
> শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ তাল মান লয়ে,
> কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী-তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে।
> বিম্বফল যুবতী-অধর, ভাবের সাগর—নীলোৎপল দুটি আঁখি,
> দুটি কর—বাঞ্ছা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখী।"

এর বিপরীত—ধ্বংসের ছবি। প্রচণ্ড শক্তিতে তা চিত্রিত। রুদ্রতাল বেজেছে শব্দে-শব্দে। মধুসূদনের অনুরাগী কবি মধুসূদনের শব্দধ্বনি এনেছেন সাফল্যের সঙ্গে, কিন্তু মধু-সূদনকে অতিক্রমও করেছেন। মধুসূদনের অনেক কিছুই ছিল—কিন্তু ছিল না গভীর জীবন-দার্শনিকতা। পশ্চিমী জীবনপ্রেমকে, তার কিছু ট্রাজিক বেদনা ও রক্ততরঙ্গিত উল্লাসকে, প্রতিফলিত করার চেষ্টার মধ্যেই তাঁর জীবনবোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে গেছে। বিবেকানন্দ, মধুসূদনের নির্ঘোষ এবং জীবনপ্রীতিকে মর্যাদা দিয়েছেন, মধুসূদনের কাব্যের নাট্য-শক্তিকে আবৃত্তি ক'রে উদ্ঘাটিত করেছেন—কিন্তু মধুসূদন যাতে বঞ্চিত সেই জীবন-সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞাঘন দার্শনিকতা তিনি নিজ কবিতায় যোগ করেছেন। চন্দ্র-চন্দন-মাল্য-বনিতার

৭৮ এই কবিতাটি স্বামীজী লেখেন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্য যাত্রাকালে, জাহাজে। ১৩ জুলাই, ১৮৯৯ তারিখের পত্রে নিবেদিতা লিখেছেন, "স্বামীজী জগন্মাতা সম্বন্ধে একটা দারুণ বাংলা কবিতা লিখেছেন।" ১৯ জুলাই-এর পত্রে জানিয়েছেন, স্বামীজী, কালী সম্বন্ধে সেই "বিরাট কবিতার" অংশবিশেষ নাটকীয় ঘনত্বে আবৃত্তি করেছেন, বিশেষতঃ এই লাইনটিকে : "মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।" সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, ১৩ জুলাই বা তার কিছু আগে কবিতাটির রচনা আরম্ভ এবং ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে তার সমাপ্তি। [নিবেদিতা লোকমাতা, ৬৮-৭০]

পৃথিবীর আকর্ষণ-চিত্র একদিকে—অন্যদিকে করাল বাস্তবের অগ্নিশয্যা—যাতে পুড়ছে সচন্দন সমাল্য সুন্দরী। তাই বলে, বিবেকানন্দে মোহমুদ্গরী ঘৃণার পলায়নী প্রবৃত্তি নয়। 'জীবনের মুখোমুখী হও'—এই তাঁর দর্শন—সে জীবন যত ভয়ঙ্করই হোক। স্বামীজীর কালে জীবনের এই দুই রূপের অনুভূতি উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। কিন্তু রসের সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর উপন্যাসে স্বতঃই রূপের, সুখের, সাধের ছবিই প্রধানতঃ দিয়েছেন; হয়ত কখনো-কখনো কমলাকান্তে ফুটিয়েছেন উভয় চিত্রই, কিন্তু শেষোক্ত করাল চিত্রকে আচ্ছন্ন করেছেন আহিফেনের নিবিড় আলস্যে কিংবা মধুর ঔদাস্যে। কমলাকান্তের পক্ষে নিষ্পত্র চোখে নির্মম সত্যদর্শন করা সম্ভব ছিল না—যা করতে সমর্থ ছিলেন নির্মোহ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের আঁকা ধ্বংসচ্ছবি এই :

"মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিঃস্বন, মহারণ, ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী;
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু।
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায় করাল বিজলী জ্বালা,
ফেনময় গর্জি মহাকায়, ঊর্মি ধায় লঙ্ঘিতে পর্বতচূড়া।
ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল রসাতল যায় ধরা,
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে।"

এরই সঙ্গে রয়েছে রণনির্ঘোষ—শব্দধ্বনিতে, রক্তাক্ত ছবিতে, তার এক দারুণ প্রকাশ :

"ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্‌ ঝর্‌র্‌ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে কাঁপে ধরা,
ঘোষে তোপ বব-বব-বম্‌ বব-বব-বম্‌—বন্দুকের কড়কড়া।
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল বমে শত জ্বালামুখী,
ফাটে গোলা, লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায় আসোয়ার ঘোড়া হাতি।
পৃথ্বীতল কাঁপে থর্‌থর্‌, লক্ষ অশ্ববর-পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে,
ভেদি ধূম গোলা-বরিষণ, গুলি সন্‌ সন্‌, শত্রুতোপ আনে ছিনে।
আগে যায় বীর্যপরিচয় পতাকানিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা,
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা।
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী—অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে,
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়—তবু পিছে নাহি টলে।"

পূর্বে চতুর্থ খণ্ডে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টির পার্থক্য প্রসঙ্গে এই কবিতার কিছু লাইন উদ্ধৃত করেছি। সেগুলি পুনঃ-উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। সেখানে দেখেছি--বিবেকানন্দ বলতে চেয়েছিলেন, সকলে সুখের জন্য কাতর—কে চায় দুঃখ? স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ ছেড়ে মধ্যাহ্নতপনের জন্য আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে দুর্লভ। সুখ-বনমালীর আরাধনায় যেখানে হৃদয়ের শান্তি, সেখানে মৃত্যুরূপা এলোকেশীর শ্মশান-জাগরণে অভিপ্রায় কেন হবে? কিন্তু এই পৃথিবীর নিষ্ঠুর সত্য যে, রোগ, মহামারী, বিষকুম্ভ, মৃত্যু—তাকে আত্ম-প্রবঞ্চক ভিন্ন অগ্রাহ্য করবে আর কে? শিয়রে যখন শমন তখনো স্বপ্নসঞ্চরণ! বিবেকানন্দ তাই আহ্বান করেছেন—প্রেতভূমি চিতামাঝে সত্যের মন্দির নির্মাণ করতে, অপার সংগ্রামের দ্বারা সেই ভয়াল সত্যের পূজা করতে।

বাংলা কবিতা যে-সত্যকে বহু শত বৎসর ধরে প্রবঞ্চনা করে এসেছে—বিবেকানন্দ তাকে আহ্বান করেছেন তাঁর রচনায়। একই ভাবের শক্তিদ্যুতি ছড়িয়ে আছে স্বামীজীর ইংরাজি রচনায়—তেমন কিছু গদ্যাংশ অনুবাদে উপস্থিত করা যায় :

"মৃত্যুকে উপাসনা করতে সাহস পায় ক'জন? এসো, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জেনেই আলিঙ্গন করি।

"সবাই সুখ চায়—একথা ভুল। প্রায় সমসংখ্যক লোক জন্মায় দুঃখকে বরণ করার জন্য। এসো, আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর হিসাবেই পূজা করি।

"আমি ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর বলে ভালবাসি; নৈরাশ্যকে নৈরাশ্য বলে ভালবাসি; দুঃখকে দুঃখ বলে ভালবাসি। সংগ্রাম করো—অবিরত সংগ্রাম করো! প্রতি পদে পরাজয়—তবু সংগ্রাম করো। এই হল আদর্শ—এ-ই আদর্শ।"৭৯

॥ ১০ ॥ বাংলা সাধুগদ্যে বিবেকানন্দের পূর্বাপর রচনার হিসাব

সাধু গদ্যরীতির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ গণ্য লেখক—একথা অবশ্যস্বীকার্য। তাঁর আগে বা পরে সাধুগদ্যের আশ্চর্যজনক সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিবেকানন্দ তাঁর সাধুগদ্যকে সূক্ষ্ম রসানুভূতি প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেননি। প্রধানতঃ তা সমাজ-দর্শনাত্মক রচনাতেই ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সেইদিক থেকেই বিষয়টির বিচার করতে হবে।

স্বামীজীর এই গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনার আগে কী পরিমাণে তিনি সাধুগদ্য লিখেছেন, তার একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে।

যতদূর পেরেছি—স্বামীজী তাঁর প্রকাশিত রচনার সূচনাপর্ব ১৮৮৪-৮৫ (কিংবা আরও পূর্বে?) থেকে ১৯০০-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সাধুগদ্য লিখে গেছেন। এই পর্বের মধ্যে তিনি চলিত গদ্যও লিখেছেন—কেবল চিঠিতে নয়—সাময়িকপত্রের রচনাতেও।

কালানুক্রমিকভাবে স্বামীজীর সাধুগদ্য রচনার হিসাব দিচ্ছি :

১৮৮৪ (?) : হারবার্ট স্পেনসারের "এডুকেশন" গ্রন্থের অনুবাদ : 'শিক্ষা';

১৮৮৪ (?) : গীতগোবিন্দের অনুবাদ;

১৮৮৬ : "সঙ্গীত কল্পতরু" গ্রন্থের ভূমিকা;

১৮৮৯ : "ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট" গ্রন্থের "ঈশা-অনুসরণ" নামে আংশিক অনুবাদ, এবং তার ভূমিকা;

১৮৯৭ (?) : উদ্বোধন পত্রিকার জন্য "প্রস্তাবনা" প্রবন্ধ;

১৮৯৭ : (?) "হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" প্রবন্ধ;

১৮৯৯ : "বর্তমান ভারত" পুস্তক;

১৮৯৯ : "জ্ঞানার্জন";

১৮৯৯ : "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি";

১৯০০ অগস্ট : "পারি প্রদর্শনী।"

১৮৮৮ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত সময়ে স্বামীজী তাঁর চিঠিতে সাধু ভাষা ব্যবহার করেছেন।

এই কালনির্ণয় সম্বন্ধে আর একটু বিচার করে নেওয়া যায়।

স্বামীজীর প্রথম বই সম্ভবতঃ "শিক্ষা"—যার সঠিক কালনির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কিছু আগেই নরেন্দ্রনাথের উপরে স্পেনসারের প্রভাবের কথা বলেছি। তাঁর সকল জীবনীতেই ঐ প্রসঙ্গ থাকলেও, কোথাও স্পষ্টভাবে বলা নেই তিনি ঠিক কখন এবং কেন হারবার্ট স্পেনসারের এডুকেশন বই অনুবাদ করেছিলেন, যদিও জীবনীগুলিতে এমন জায়গায় গ্রন্থ অনুবাদের কথা বলা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে—নরেন্দ্রনাথ বুঝি কলেজ-জীবনের মধ্যেই গ্রন্থটির অনুবাদ করেছিলেন। সেকথা সত্য হলে অনুবাদকাল হবে—১৮৮১-৮২। কিন্তু

৭৯ 'জনগণের অধিকার', ৪৬-৪৭

নিবেদিতার এক মন্তব্যসূত্রে মনে হয়, ঐ রচনাকাল—১৮৮৪-৮৫ সালের কোনো সময়ে। ১৮৮৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত্রিশেষে, স্বামীজীর পিতার দেহান্ত হয়—এবং অমিতব্যয়ী ঋণগ্রস্ত পিতার শূন্যভাণ্ড-সংসারের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ে তাঁর উপর। এর উপর যুক্ত হয়—পৈতৃক বাড়ি থেকে তাঁদের উৎখাত করার আত্মীয়-চক্রান্ত এবং সেইসূত্রে ব্যয়বহুল মামলা। সেই প্রায় অনাহারের দিনগুলিতে নরেন্দ্রনাথকে অর্থসংগ্রহের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়—গ্রন্থ অনুবাদও চেষ্টাসমূহের মধ্যে ছিল। প্রমথনাথ বসু এ-বিষয়ে লিখেছেন : "কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জন হওয়ায়" ইত্যাদি।৮০ এইরকম অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে গীতগোবিন্দ আছে বলে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন।৮১ "শিক্ষা"ও যে তেমনি একটি বই, নিবেদিতার লেখায় তা পাই : "স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, একসময়ে যখন কঠোর দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, এবং হারবার্ট স্পেনসারের 'এডুকেশন' গ্রন্থ অনুবাদের ভার নিয়েছিলেন—তখন বিষয়টি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তদনুযায়ী পেস্তালাৎসির [Pestalozzi বিখ্যাত শিক্ষাতাত্ত্বিক: সুইজারল্যান্ডের জুরিখ শহরে ১৭৪৬ সালে জন্ম, মৃত্যু ১৮২৭]* যা-কিছু লেখা আছে সবই পড়ে ফেলেছিলেন, যদিও সেসব তাঁর পড়াশোনার প্রয়োজনের মধ্যে ছিল না।"৮২

এইসব থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের কোনো সময়ে এডুকেশন ও গীতগোবিন্দের অনুবাদ করেন, এবং অনুমান করতে ইচ্ছা করি—এডুকেশনের অনুবাদই প্রথম করেছিলেন, কারণ হারবার্ট স্পেনস্যারের প্রতি তাঁর ছিল অত্যন্ত অনুরাগ। আরও একটি কারণ যোগ করতে পারি—সাংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ অল্প কিছু সময়ের জন্য অভিমানী নাস্তিকতার প্রকোপে পড়েছিলেন, বিশেষতঃ বিনা প্রমাণে ঈশ্বর-সত্যকে স্বীকার করতে একেবারেই অনিচ্ছাবোধ করেছিলেন—সেই সময়ে স্পেনসারের বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর পুস্তক অনুবাদ করাই স্বাভাবিক।৮৩

সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে স্বামীজীর নাম গ্রন্থকাররূপে একটি গ্রন্থের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে যুক্ত আছে। বইটির নাম "সঙ্গীত-কল্পতরু।" নাম-পত্রে আছে :

৮০ প্রমথনাথ বসু, ৯০

৮১ "১৮৮৪ সালে নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রনাথ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া যখন সংসার চালাইবার মনস্থ করিলেন, সেইসময় তিনি গীতগোবিন্দ গ্রন্থখানির মূল ও বঙ্গানুবাদ দিয়া মতিলাল বসুকে লিখিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহা মতিলাল বসু নিজ প্রেস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে পুস্তকখানি বাজারে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।" ['ঘটনাবলী', ১ম, ১৯১]

৮২ NCW, I, 216

৮৩ *পুস্তকটির প্রকাশক কে ছিলেন? ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'পেট্রিয়ট প্রফেট' বইয়ে লিখেছেন,* গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বইটির প্রকাশক। কিন্তু "শিক্ষা" বইয়ের যে সংস্করণ আমরা দেখেছি, সেটি বসুমতী কর্তৃক প্রকাশিত। ["শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। বসুমতী ইলেকট্রো মেসিন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা]। বইটিতে মুদ্রণকাল নেই। তবে আমেরিকায় মুদ্রিত স্বামীজীর 'সাইক্লোনিক হিন্দু মনক্' চিত্রটি আছে—সুতরাং ১৮৯৩-এর পরবর্তীকালে প্রকাশিত সংস্করণ। তাহলে প্রথম প্রকাশক কি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, না বসুমতী? কিংবা বইটি গুরুদাস থেকে পরে বসুমতীতে হস্তান্তরিত হয়?

* বইটির অনুবাদের অনুমতি নরেন্দ্রনাথই হারবার্ট স্পেনসারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন বলে বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল জানিয়েছেন :

"দার্শনিক মনীষী হারবার্ট স্পেনসারের কোনো গ্রন্থের অনুবাদ প্রার্থনা জানাইলে তিনি [স্পেনসার] লেখেন : 'আপনার মতো ইংরাজি রচনা আমি ইতিপূর্বে তো দেখি নাই [বলাবাহুল্য কোনো ভারতীয় যুবকের কাছ থেকে], সুতরাং আপনার অনুবাদে আনন্দিত হইব।" [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত, ২৯১]

"সংগীত-কল্পতরু/ অর্থাৎ/ নানাবিধ বাদ্যাদি শিক্ষা, স্বরলিপি ও সংগীত সম্বন্ধে/ বিস্তর শিক্ষাপ্রদ বিষয়সহ জাতীয়, ধর্ম-/বিষয়ক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক,/সামাজিক, প্রণয়, বিবিধ/এবং নানাবিষয়ক/গীত সংগ্রহ/ **শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ,/ও/ শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত।** ১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড, **কলিকাতা,**/'আর্যপুস্তকালয়' হইতে/ শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক কর্তৃক /প্রকাশিত।"

বইটির প্রকাশের তারিখ—ভাদ্র, ১২৯৪ সাল, অর্থাৎ অগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থে এই বইটি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। তিনি গ্রন্থ-মধ্যে প্রদত্ত বৈষ্ণবচরণ বসাকের বিবৃতির যে-অংশ উদ্ধৃত করেছেন তার থেকে দেখতে পাই—প্রকাশকালের এক বৎসরের বেশি আগে সংকলনকার্য আরম্ভ হয়েছিল, এবং "শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, মহাশয়ই ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন।" অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাজ শেষ করেন ১৮৮৬-এর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে। ঐ সময়ের পরে, বৈষ্ণবচরণ বলেছেন, নরেন্দ্রনাথ "নানা অলংঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই।" সেই অলঙ্ঘনীয় কারণ—শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ। ধরে নিতে হবে—ঐ কারণ যখন বর্তমান ছিল তখন তার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ নিশ্চয় গ্রন্থটির ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকাটি লেখেন নি। তদনুযায়ী, ১৮৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের আগেই নরেন্দ্রনাথ উক্ত ভূমিকা লিখেছিলেন।৮৪

৮৪ স্বামীজীর আদি জীবনীকারেরা তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের তথ্য সম্বন্ধে অনেক সময়ে অস্পষ্টতা রেখেছেন। "শিক্ষা" বই সম্বন্ধে সামান্য সংবাদই ঐসব সূত্র থেকে আমরা পেয়েছি। শিক্ষা বইটি নিছক অনুবাদের, আমরা যে-সংস্করণ দেখেছি তাতে কোনো ভূমিকা নেই, সুতরাং সেটিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা না যেতে পারে। গীতগোবিন্দের অনুবাদ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা—মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত সংবাদটুকু ছাড়া। কিন্তু "সংগীত কল্পতরু" রীতিমতো মূল্যবান পুস্তক এবং স্বল্পকালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। স্বামীজীর গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণ, যাঁরা তাঁর জীবনী রচনার উদ্যোক্তা, এই বইটির কথা যথেষ্টই জানতেন, এবং বেলুড় মঠ গ্রন্থাগারে বইটি ছিলও। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে বইটির বিষয়ে পরিষ্কার উল্লেখ আছে :

"Noren had...even written an elaborate preface on the science and philosophy of Indian music, to a big book of Bengali songs. And this he did, solely to help a poor, struggling publisher." (109)

প্রমথনাথ বসু একই কথা লিখেছেন। বৈকুণ্ঠ সান্ন্যালও লিখেছেন : "সংগীত-কলা বিষয়ে এমন এক তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করেন যাহা সকলেরই আদরণীয় হয়।" [২৯১]

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পেট্রিয়ট প্রফেট গ্রন্থে (১৫৫) বলেছেন : "নরেন্দ্রনাথ কিভাবে বাঁয়া ও তবলা বাজাতে হয়, তা শেখাবার জন্য একটি বাংলা বই লিখেছিলেন। বইটির প্রকাশক বটতলার বৈষ্ণবচরণ বসাক। বর্তমান লেখক [ডঃ দত্ত] বেলুড় মঠ গ্রন্থাগারে বইটির একটি কপি দেখেছেন।"

এতকিছু জানা সত্ত্বেও কেন বইটি ঠিকভাবে স্বামীজীর জীবনীতে উল্লিখিত হয়নি তার দুটি কারণ সম্ভবপর। প্রথমতঃ স্বামীজীর জীবনীকারেরা তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের গ্রন্থাদির উল্লেখে বেশি উৎসাহী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থটির স্বত্ব নিয়ে সম্ভবতঃ বিবাদ হয়েছিল, এবং সেইজন্যই উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক স্বামীজী ছিলেন একথা স্পষ্টভাবে বলা সম্ভব হয়নি। সংগীত কল্পতরুর সম্পাদক হিসাবে প্রথমেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম ছিল, তিনি যে অধিকাংশ সংগীত সংগ্রহ করেছিলেন, তাও বৈষ্ণবচরণ বলেছিলেন, কিন্তু খুব কৌশলে একটি কথা বৈষ্ণবচরণ এড়িয়ে গিয়েছিলেন—ভূমিকাটি কার লেখা। তারপরে যখন বইটি অদ্ভুত জনপ্রিয়তা লাভ করে, [বৈষ্ণবচরণ তৃতীয় সংস্করণের 'বিশেষ কথা'য় লেখেন : "ছয় মাসের মধ্যে দুই সংস্করণে দুই সহস্র সংগীত কল্পতরু . নিঃশেষিত হইয়াছে"], এবং বইটির স্বত্বাধিকার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন বৈষ্ণবচরণ বসাক বইটির নাম বদলে দিয়ে "বিশ্বসংগীত" নামে প্রকাশ ক'রে বলেন, এইটিই সংগীত কল্পতরুর চতুর্থ

নরেন্দ্রনাথ যে, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবর্তিত "সাহিত্য কল্পদ্রুম" নামক মাসিক পত্রিকায় ১২৯৬ সালে অর্থাৎ ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে, "ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট" গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন, তা "ভাববার কথা" গ্রন্থেই পাওয়া যায়। "উক্ত পত্রের ১ম বর্ষের ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা অবধি অনুবাদের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদটি পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।... সূচনাটি স্বামীজীর মৌলিক রচনা।" [৬-১৬]

"হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" প্রবন্ধটি—"হিন্দুধর্ম কী?" নামে ১৩০৪ সালে (১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে) শ্রীরামকৃষ্ণের ৬৫তম জন্মোৎসবের সময়ে প্রকাশিত হয়, একথা "ভাববার কথা" বইয়ে পেয়েছি। [৬-৩]। এটি কিছু পূর্বে লিখিতও হতে পারে—১৮৯৬ সালে, কিংবা আগে, কারণ, ১৮৯৫ সালে তিনি ব্রহ্মানন্দকে জানিয়েছিলেন, তিনি "পরমহংস মশায়ের জীবনচরিত" ইংরাজিতে লিখে পাঠাবেন, যেটি বঙ্গানুবাদ করে মহোৎসবে বিক্রয় করা যাবে। যাইহোক, মনে হয় না, ১৮৯৭ সালের একেবারে গোড়ায় সদ্য ভারতে প্রত্যাবৃত, অসম্ভব কর্মব্যস্ত, বিবেকানন্দ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৯৯-এর গোড়ায়। তার প্রস্তাবনা ঐকালে লিখিত ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু স্বামীজী ১১ অক্টোবর, ১৮৯৭ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন, "আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওর [ত্রিগুণাতীতের] article লিখেছি।" আমরা আগেই দেখেছি, স্বামীজী ১৮৯৭ সালের গোড়ার দিক থেকেই উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেজন্য অনুমান করতে ইচ্ছা হয়—উদ্বোধনের 'প্রস্তাবনা' ১৮৯৭ সালেই লিখিত।

"জ্ঞানার্জন" প্রবন্ধটিকে ১৮৯৯ সালে স্থাপন করার কারণ—এটি উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—১৩০৫, ফাল্গুন সংখ্যায়। "ম্যাক্সমুলার-কৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় উদ্বোধনে ১ম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায়। তদনুযায়ী এটিও ১৮৯৯ সালে রচিত ধরে নেওয়া হয়েছে।

সংস্করণ : "যাঁহারা এখন সঙ্গীত কল্পতরু লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত লইতে পারেন, যেহেতু সঙ্গীত কল্পতরুর ইহাই সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ এবং অতঃপর সঙ্গীত কল্পতরু আর মুদ্রিত হইবে না।" এই কথা বৈষ্ণবচরণ স্বামীজীর জীবনকালেই লেখেন।

এখন প্রশ্ন—নরেন্দ্রনাথ কার সাহায্যার্থে বইটি ভূমিকাসহ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ বলতে চেয়েছেন, সেকাজ স্বামীজী করেছিলেন তাঁর বন্ধু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থে, যিনি ঐকালে অত্যন্ত দরিদ্র এবং অপরের দোকানে কাজ করতেন। (৮০)। সেই দোকান হয়ত সঙ্গীত কল্পতরুর প্রকাশক, পূর্বোক্ত 'আর্যপুস্তকালয়।' কিংবা দরিদ্র উপেন্দ্রনাথ নিজে বইটি প্রকাশে অসমর্থ হয়ে আর্যপুস্তকালয় থেকে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। উপযুক্ত লেখাপড়া হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ নরেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবর্তিত জীবনের সূচনায় ঐ কাজে আগ্রহ বোধ করেননি। [স্বামী নির্লেপানন্দ তাঁর স্বামীজীর স্মৃতি-সঞ্চয়ন গ্রন্থে লিখেছেন : "শরৎ-মহারাজ আমাদের জানান, বি-এ পাসের পর বসুমতীকে একটি গানের বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়ে স্বামীজী ৫০ টাকা পান"]। পরে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণবচরণ বসাকের বিরোধ হলে, বৈষ্ণবচরণ কূটবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গীত কল্পতরুর প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে, "বিশ্বসঙ্গীত" নামে তারই নবকলেবর প্রকাশ করেন, কিন্তু ভূমিকাটি বাদ দেন। এর ফলে ভূমিকাটি আর কেউই ব্যবহার করার অধিকারী থাকেন না, যেহেতু ভূমিকার তলায় নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম ছিল না। বইয়ের নাম সঙ্গীত কল্পতরু থাকলে সেটির সম্পাদক হিসাবে নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম ছাপতে হত, এবং ভূমিকাও রাখতে হত; আর হয়ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর প্রাপ্যও দিতে হত।

তাই আমাদের ধারণা, স্বামীজীর আদি জীবনীকারেরা আইনের ঝঞ্ঝাটের ভয়ে স্পষ্টভাবায় লিখতে পারেন নি—স্বামীজী যে-গানের বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন সেই বইটির নাম—সঙ্গীত কল্পতরু।

স্বামীজীর "বর্তমান ভারত" গ্রন্থ উদ্বোধনের প্রথম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে; কিছুটা ছাড়া-ছাড়াভাবে অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ৮ম সংখ্যায় শেষ হয়। স্বামীজী এই লেখাটি ভারতে থাকতেই শুরু করেন। তাঁর দ্বিতীয় পাশ্চাত্ত্যযাত্রাকালে জাহাজেও যে ঐ লেখা চলছিল তা পরিব্রাজক গ্রন্থে নিজেই বলেছেন। [৬-৬৬]

সাধুগদ্যে লেখা স্বামীজীর সর্বশেষ রচনা "পারি প্রদর্শনী", ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের অগস্ট মাসে লিখিত। ওটি উদ্বোধনে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের ২০ সংখ্যায়। উদ্বোধনে কিন্তু এটি "প্রেরিত পত্রের অনুবাদ" বলে প্রকাশিত হয়েছিল, তাই এটি মৌলিক বাংলা রচনা কিনা সন্দেহ হতে পারে। তবে এটিকে যখন 'ভাববার কথা' গ্রন্থে স্বয়ং স্বামীজীর লেখা বলা হয়েছে, এবং ভাষাভঙ্গিও স্বামীজীর বলেই মনে হয়, তখন ধরে নিচ্ছি, উদ্বোধনে ভ্রমবশে এটিকে অনুবাদ বলা হয়েছিল।

॥ ১১ ॥ প্রথম পর্বে বিবেকানন্দের সাধুগদ্য : "শিক্ষা"—"সংগীত কল্পতরু"—"ঈশা-অনুসরণ"—"পত্রাবলী"

স্বামীজীর সাধুগদ্যের আলোচনা তিন দিক থেকে করা চলে : এক, তাঁর রচনামধ্যে সাধুগদ্যরীতির বিবর্তন; দুই, সাধুগদ্যরীতির বিশেষ চরিত্রনির্ণয় এবং সেই চরিত্র-রূপের হেতু; তিন, বিষয়গৌরব। বর্তমান ক্ষেত্রে আমি প্রথম দুটি দিকেই অধিক গুরুত্ব দেব। বিষয়গৌরব সম্বন্ধে আমি আগে যথেষ্ট বলে এসেছি, বিশেষতঃ তৃতীয় খণ্ডে, যেখানে স্বামীজীর সমাজদর্শনের বিস্তারিত আলোচনা আছে। স্বামীজীর বিরাট মনীষার প্রসঙ্গ সেখানে কিছুটা আলোচিত হয়েছে।

স্বামীজীর সাধুগদ্যকে দুই পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায় : প্রথমপর্ব ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, যখন তিনি ভারতেই আছেন; দ্বিতীয়পর্ব ১৮৯৪ থেকে ১৯০০।

শিক্ষা : প্রথমপর্বের লেখার মধ্যে আমরা "শিক্ষা"-কেই প্রথম লেখা ধরেছি। এটি অনুবাদগ্রন্থ বলে বিষয়ের গুণাগুণ তাঁর নয়। কিন্তু আগেই বলেছি, বিষয় নির্বাচনের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ অবশ্যই ঘটেছিল। গদ্যরীতিতে বিষয়ানুরূপ গাম্ভীর্য আছে। অনুবাদ বলে, মৌলিক রচনায় যে-স্বচ্ছন্দ গতি থাকে তা এখানে না থাকলেও যথেষ্ট প্রাঞ্জলতা বিদ্যমান। রচনায় যতখানি স্পষ্টতা এবং দৃঢ়তা, ততখানি লালিত্য নেই, যা ঐ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ দোষাবহ নয়।

"শিক্ষা" গ্রন্থ থেকে গদ্যনমুনা তোলার কালে আমি বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় অংশটিকে নির্বাচন করছি। বিষয়টি তাঁর বিশেষ মনঃপূত। পরবর্তীকালেও তিনি বিজ্ঞান ও ধর্মের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলেছেন, অবশ্য হারবার্ট স্পেনসার যে-অর্থে বলেছেন, তার থেকে গভীরতর অর্থে। "শিক্ষা" গ্রন্থের তেমন কিছু অংশ এই :

"সর্বশেষে আমরা বলি যে, বিজ্ঞানই যথার্থ ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। অবশ্য এ-স্থলে ধর্ম শব্দ অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইল। সত্য বটে, ধর্ম-নামের আবরণে যে-সকল কুসংস্কার মনুষ্যসমাজে প্রচলিত আছে, বিজ্ঞান তাহাদিগের বিপক্ষ, কিন্তু একবার বিজ্ঞানের গাম্ভীর্যে উপনীত হও অমনি দেখিবে : 'যথার্থ বিজ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম যমজ ভগিনী; তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করো, অমনি মরিবে। যে-পরিমাণে ধর্ম মিশ্রিত হইবে সেই পরিমাণে বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে, যে-পরিমাণে [ধর্ম] বিজ্ঞানভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে সেই পরিমাণে ধর্মও অটল হইবে। বিখ্যাত পণ্ডিতেরা যাহা-কিছু করিয়াছেন, তাহা কেবল বুদ্ধিবলে নহে, কিন্তু সেই বুদ্ধি ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদিগের যুক্তি এবং তর্ক অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধ্যবসায়, তাঁহাদিগের প্রেম, তাঁহাদিগের নিরপেক্ষতা এবং তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগে বশীভূত হইয়া সত্য তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছে'— প্রফেসার হক্সলি এইকথা

বলেন। বিজ্ঞান মানবের ধর্মভাব হ্রাস করে—এ সকল অতি অযৌক্তিক কথা।...বিশ্বপতির অনন্ত ঐশ্বর্যের এক কণামাত্রও যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদিগের প্রশংসা অধিক গ্রাহ্য—না, যাঁহারা বিজ্ঞান লইয়া দিবারাত্র তাঁহার মহিমা অন্বেষণে মস্তিষ্ক আলোচিত [আলোড়িত?] করিতেছেন তাঁহাদের প্রশংসা হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগ হইতে ওঠে? শুদ্ধ তাহাই নহে; বৈজ্ঞানিকই যে কেবল ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতে সক্ষম তাহা নহে—দিবানিশি নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়া, তাহাদের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য, অসীম দয়াভাব, অথচ অপ্রতিহত অবশ্যম্ভাবী ফল চিন্তা করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক সুকার্য অথবা কুকার্যের ফল অনিবার্য বলিয়া অপেক্ষা করে, অথচ সমস্তই যে মঙ্গলের নিমিত্ত ঘটিতেছে, তাহা মনে করিয়া আনন্দিত হয়। শেষতঃ, এই অনন্ত দুর্ভেদ্য জগতের মধ্যে আমরা কে—এবং অগণ্য সত্ত্বা-পূর্ণ জগতের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধই বা কি—বিজ্ঞান ইহাও স্থির করে।"

সংগীত কল্পতরু : এই গ্রন্থটি বিশেষ রকম আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে এইটিই স্বামীজীর প্রধান সাহিত্যকীর্তি। নিছক সাহিত্যকীর্তি অবশ্য বলা অনুচিত, কারণ এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের ব্যাপক সাংস্কৃতিক ভূমিকার এক উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন—যদিও এটির রচনাকালে তাঁর বয়স মাত্র ২৩। যুবক নরেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ও মনীষার সবিশেষ পরিচয় এই গ্রন্থে আছে।

এই গ্রন্থসূত্রে গায়ক এবং সংগীতজ্ঞ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা এসে যায়, কিন্তু সে-বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলার ইচ্ছা নেই, যেহেতু বিষয়টি সমকালীন সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা হয়ে ওঠেনি। এখানে অধিকন্তু জানানো যায়, এই বিষয়টি নিয়ে সংগীতশাস্ত্রের সম্মানিত বিশেষজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। সংগীত-বিষয়ে গবেষক-লেখক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ও একাধিক গ্রন্থে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।৮৫ স্বামীজীর জীবনী ও অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি—স্বামীজী প্রথম শ্রেণীর গায়ক ছিলেন। অশিক্ষিত পটুত্ব নয়—বাল্যকাল থেকে তিনি রীতিবদ্ধ সংগীতশিক্ষা করেছেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত সংগীতের সমজদার ও উৎসাহদাতা ছিলেন; ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেনও। তাঁর কাছেই নরেন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষার হাতেখড়ি। সংগীতপ্রিয় শ্রুতিধর নরেন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই নানা ধরনের গান গাইতে দেখা গেছে। বিদ্যালয়জীবনের শেষের দিক থেকে তিনি রীতিমতো ওস্তাদের শিক্ষাধীনে সংগীত ও বাদ্যশিক্ষা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম সতীর্থ ছিলেন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা হাবু দত্ত (এই বিখ্যাত বংশীবাদক একপর্বে আলাউদ্দিনের শিক্ষাগুরু ছিলেন)। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠসংগীতের প্রথম শিক্ষক বেণী উস্তাদ (বেণীমাধব অধিকারী? বেণী গুপ্ত?)। উস্তাদ আহম্মদ খাঁ, এবং ধ্রুপদী জোয়ালাপ্রসাদের কাছেও তিনি শিক্ষা নেন। কাশী ঘোষালের কাছে শিখেছেন তবলা, পাখোয়াজ। স্বামীজীর সংগীতশিক্ষার রীতি বিচার করে প্রজ্ঞানানন্দ সিদ্ধান্ত করেছেন, যেহেতু বিবেকানন্দ বেণী উস্তাদের কাছ থেকে আহম্মদ খাঁর ঘরানার গান শিক্ষা সংগীতের ধারা ও গায়কীপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ

৮৫ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের এই সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে পড়ে : 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে —"সংগীতসাধক স্বামী বিবেকানন্দ;" উদ্বোধনের বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যায়—"স্বামী বিবেকানন্দের সংগীতচিন্তা;" "চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে—"সংগীত ভাবনায় বিবেকানন্দ।" দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত "সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু" গ্রন্থ ছাড়াও "সংগীতে শ্রীরামকৃষ্ণ" গ্রন্থে এ-সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ" গ্রন্থে কিছু প্রাসঙ্গিক সংবাদ আছে। স্বামী শ্যামানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক রচনাও উল্লেখযোগ্য।

উত্তরভারতীয় হিন্দুস্থানী পদ্ধতির অনুযায়ী বিশুদ্ধ তথা খানদানী।" [বিশ্ববিবেক, ২৩৭] কলেজ-জীবনে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেছিলেন; তাঁর বন্ধুরা অবিরাম তাঁর গান শুনতে চাইতেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকালে কোরাসে তিনি মুখ্য গায়ক (নববিধানেও গান গেয়েছেন)। এবং গায়ক হিসাবেই তাঁকে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ডেকে নিয়ে যান তাঁর বাড়িতে, শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার জন্য। সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে তাঁর পুনঃপুনঃ অপূর্ব সংগীতের বহু কথা কথামৃতে পেয়েছি। বরাহনগর-মঠে তাঁর গান, ও পরিব্রাজক-জীবনে তাঁর গানের অনেক সংবাদ বিভিন্ন স্মৃতিকথায় মিলেছে (তেমন কিছু সংবাদ আমি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দিয়েছি)। ভারতে ও বহির্ভারতে বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের কাছে তিনি ভারতীয় গান গেয়েছেন, এবং মুগ্ধ করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব। পাশ্চাত্ত্যজগতের ঐকালে শ্রেষ্ঠ অপেরা গায়িকা মাদাম কালভের মতে, তাঁর স্বর ব্যারিটোন গায়কতুল্য, চীনা ঘণ্টাধ্বনির মতো অনুরণিত। মিস ম্যাকলাউড মনে করেছেন, তা ভায়োলেনেচেলুর অনুরূপ, যাতে তীব্র স্বর-বৈপরীত্য নেই কিন্তু গভীর অন্তঃস্পন্দনে সর্বদিক পরিপূরিত করে তোলে। কারো-কারো কাছে তা পিয়ানোর তীব্র ঝংকারের মতো, শ্রোতার কানে ও মনে ঢুকে গিয়ে কাঁপিয়ে দেয়। কিংবা তা শুরুতে ইয়োলিয়ান বীণার মৃদু বিষণ্ণ সুর, তারপরেই স্পন্দিত ধ্বনি-তরঙ্গ। তাঁর বক্তৃতার বক্তব্য যদি এক বর্ণও কেউ না বুঝত তবু কানে শুনলেই মনে হত, এ যেন একটা অখণ্ড সংগীত—পাশ্চাত্ত্য শ্রোতাদের এমনও মনে হয়েছে। হিমালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে একজন বলেছেন, শান্ত বায়ুমণ্ডল তাঁর কণ্ঠের আওয়াজে ভূরি-ভূরি কাঁপতে লাগল—দিকে-দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল অনবদ্য কণ্ঠধ্বনি। সারদানন্দের কাছে স্বামী নির্লেপানন্দ শুনেছেন, গলার জোয়ারী খুলে গেলে একটা অপূর্ব রেশ হয়, স্বামীজীর কণ্ঠে তাই ছিল; ধাতব পদার্থের উপর আঘাত করলে যে-ধরনের রেশ, যেন সেইরকম। ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ বলেছেন, "তাঁর voice একটা চমৎকার জিনিস, অমন কারুর শুনিনি। কথা একেবারে লোকের heart-এ পৌঁছত, ধাক্কা দিত; গঙ্গায় স্টিমারে যেমন ভক্-ভক্ স্টিম ছাড়ে সেইরকম এক-একটা impression দিয়ে যেত।"৮৬

স্বামীজীর গীত গান, এবং সংগীত কল্পতরুতে তাঁর দ্বারা সংকলিত গানের হিসাব করে, সংগীতজ্ঞরা একটি বিষয়ে চমৎকৃত হয়েছেন—তাঁর মহাসাগরীয় ঔদার্যে। উত্তরভারতীয় ঘরানার এই গায়ক—উচ্চাঙ্গ সংগীতের গায়কদের মধ্যে প্রচলিত উন্নাসিকতা ও অহমিকা ত্যাগ ক'রে, সর্বপ্রকারের সংগীতের সমাদর করেছেন এবং নিজের অনুশীলিত আশ্চর্য কণ্ঠে তাদের তুলে নিয়ে অপূর্ব সুরের আলোকে মুক্তি দিয়েছেন। প্রজ্ঞানানন্দ দেখিয়েছেন, বিবেকানন্দ ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল গাইছেন, গানের ভাষা কখনো সংস্কৃত, কখনো হিন্দী, কখনো উর্দু বা ফার্সি, কখনো বাংলা; গাইছেন টপ্পা, টপ্খেয়াল, নানা ধরনের ভজন; শিবসংগীত, শ্যামাসংগীত, কৃষ্ণসঙ্গীত; বিদ্যাপতি, কবীর, নানক, সুরদাস, তুলসীদাস, তানসেন, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের গান; গিরিশ ঘোষের গান তো আছেই, সেই সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সংগীতরচয়িতাদের অজস্র সঙ্গীত। এমন উদার বিশ্বতোমুখ গায়ক সচরাচর দেখা যায় না।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সংগীত কল্পতরুর "সংগীত সংগ্রহ" অংশের উপর তথ্য-মূলক আলোচনা ক'রে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত এই সংকলনটির গুরুত্ব দেখিয়েছেন। এর আগে যেসব সঙ্গীত সংগ্রহ বেরিয়ে গেছে তাদের মধ্যে আছে : ১৮৪২-এ কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের "সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম;" বিভিন্ন খণ্ডে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত সঞ্চয়ন; ১৮৮২-তে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের "ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী"; একই জনের ১৮৮৩-তে "সঙ্গীত

৮৬ "স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন", ৭০, ১০২।

সংগ্রহ।" দিলীপকুমার, স্বামীজীর পূর্ববর্তী সংকলকদের মধ্যে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংকলনের বিশেষ মূল্যের কথা বলেছেন। তাহলেও স্বামীজীর গানের সংকলন তাঁর কাছে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং "বাংলা গানের নানা ভাব ও বিষয়ের প্রতিনিধিত্বমূলক" বলে মনে হয়েছে। এই সংকলনে আছে "জাতীয় সংগীত, ধর্মবিষয়ক সংগীত, শ্যামাবিষয়ক সংগীত, কৃষ্ণবিষয়ক সংগীত, বৈষ্ণবদিগের গান, খ্রীস্টানী সংগীত, মুসলমানী গান, পৌরাণিক সংগীত, ঐতিহাসিক সংগীত, প্রণয়সংগীত, বিবিধ সংগীত।" স্বামীজী সংগীত সম্বন্ধে নিজের ব্যাপক অভিজ্ঞতার জন্যই এহেন বৈচিত্র্য তাঁর সংকলনে আনতে পেরেছিলেন। একটি চমৎকার তথ্য দিলীপকুমার জানিয়েছেন—স্বামীজী যে কেবল যৌবনে রবীন্দ্রনাথের অনেক-গুলি গান গাইতেন তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের নিজের গ্রন্থভুক্ত হবার আগেই তাঁর কয়েকটি গান স্বামীজী সংগীত কল্পতরুতে গ্রহণ করেছিলেন।

কোনো দ্বিধা না রেখে একটি কথা এখানে বলা যায়—বাংলার সাধারণ সাংস্কৃতিক জগতে তরুণ নরেন্দ্রনাথের স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পরিচয় ছিল গায়ক ও সংগীততত্ত্বজ্ঞ রূপেই। কুড়ি-বাইশ বছরের মধ্যেই তিনি বয়সের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে বিজ্ঞসমাজে সংগীতের অথরিটি হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে যেসব তথ্য দিয়েছি, এবং অতঃপর যে-তথ্য উপস্থিত করব, তার দ্বারা প্রমথনাথ বসুর এই মন্তব্য অবশ্যগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে : "যেখানে যাইতেন সেখানেই গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইতেন—সকলেই তাঁহাকে ওস্তাদের ন্যায় খাতির-যত্ন করিত, এবং সংগীত সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন অথরিটি বলিয়া গণ্য করিত। প্রাচ্য সংগীতের সহিত পাশ্চাত্ত্য সংগীতের তুলনাদ্বারা তিনি সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন [পরিব্রাজক বিবেকানন্দের থলিতে হরিপদ মিত্র ফরাসি সংগীত সম্বন্ধে বই দেখে-ছিলেন]—এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।" (৫৭)।

সংগীত কল্পতরু গ্রন্থ-মধ্যে সংগীততত্ত্ব সম্বন্ধে ২৩ বৎসর বয়স্ক নরেন্দ্রনাথের নব্বই পৃষ্ঠার ভূমিকা একালের বিশেষজ্ঞ মহলে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে।৮৭ আমরা এখানে

৮৭ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন : "সংগীতের ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও ঔপপত্তিক বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বিবেকানন্দের জ্ঞান ছিল গভীর..সংগীত কল্পতরু গ্রন্থ তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে।" "তিনি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পূর্ণ চেতনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে সংগীত কল্পতরু গ্রন্থের কলেবর সাজিয়েছেন ঔপপত্তিক আলোচনা দিয়ে।" "ঔপপত্তিক ও বৈজ্ঞানিক অংশের আলোচনারূপে প্রথমেই পরিচয় দিয়েছেন সংগীত ও বাদ্যের, কেননা সংগীতের সংগতি রক্ষা করে বাদ্য। তিনি সাংগীতিক শব্দ ও শব্দকম্পনের কারণের পরিচয় দিয়েছেন বিজ্ঞানদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন শব্দকে বা শব্দতরঙ্গকে তুলনা করেছেন বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সঙ্গে।" প্রাচীন সমাজবাসী মানুষ কিভাবে নিসর্গপ্রকৃতির শব্দধ্বনি থেকে সাঙ্গীতিক স্বরগুলির রূপ ও স্থান নির্ণয় করেছিল স্বামীজী তার বর্ণনা করেছেন, সেই অংশ উদ্ধৃত করার পরে প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন : "বিবেকানন্দের ভাষা এখানে রসপূর্ণ ও প্রাণময়ী; তিনি ছন্দ ও শব্দচয়নে বর্ণনার মধ্যে এক অপূর্ব সাহিত্যসম্পদ সৃষ্টি করে-ছেন। শব্দঝঙ্কার ও অলঙ্কারশোভায় বিবেকানন্দের সংগীতবর্ণনার ভাষা এখানে সচেতন ও সতেজ।" ['চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থ]

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথের এই রচনার পূর্ববর্তী সংগীততত্ত্ব বিষয়ক বাংলা রচনার পটভূমিকায় এটিকে স্থাপন ক'রে বিচার করেছেন। পূর্ববর্তী গ্রন্থের মধ্যে প্রথমে আসে রাধামোহন সেনের "সংগীত তরঙ্গ" (১৮১৮ খ্রী.), যার মৌলিকতা সন্দেহজনক। তার পঞ্চাশ বছর পরে এই জাতীয় গ্রন্থ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর "সংগীতসার" (১৮৬৯)। পরবর্তী গ্রন্থ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গীতসূত্রসার" (১৮৮৫), যাকে "গত শতকে প্রকাশিত সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ আলোচনা গ্রন্থ" বলে মনে করেছেন ইনি। এছাড়া শেষোক্ত দুই গ্রন্থকারের সমসাময়িক রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এই জাতীয় একাধিক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রনাথ, আমরা লক্ষ্য করি, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধানিবেদন করে বলেছেন :

নরেন্দ্রনাথের কিছু বক্তব্য এবং সেই বক্তব্যবাহী ভাষারীতি লক্ষ্য করব। দেখা যায়, পূর্ববর্তী "শিক্ষা" গ্রন্থ অপেক্ষা এখানে নরেন্দ্রনাথের ভাষা অধিক পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল। তার মূল কারণ অবশ্য "শিক্ষা" ছিল অনুবাদগ্রন্থ আর এটি মৌলিক রচনা।

সংগীত কল্পতরুর কিছু রচনা-নমুনা পরীক্ষা করা যাক। ভারতের নানাবিধ পতনের মধ্যেও ভারতীয় সংগীত কিছু পরিমাণে গৌরব রক্ষা করে চলেছে, সে-বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"হইতে পারে আজি পাশ্চাত্ত্যভূমি বিজ্ঞানচর্চায়, দর্শনচর্চায়, ন্যায়চর্চায়, জ্যোতিষচর্চায়, গণিতচর্চায়, ভৈষজ্যচর্চায় প্রাচীন ভারতকে দূরপরাহত করিয়াছে; কিন্তু ভারতের সংগীত, তুমি শত-সহস্র বিপ্লবের মধ্যে, লক্ষ পরিবর্তনের, ঘোর অবনতির, ঘোর দুর্গতির মধ্যে—আত্মজ্যোতি বিকাশ করিয়া ধীর-স্থির অথচ নিশ্চিত গতিতে, শত লাঞ্ছনা সহিয়া, শত বাধা বিঘ্ন উল্লংঘন করিয়া, আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছ।"

তারুণ্যের ঈষৎ অতিশয়িত আবেগ এখানে আছে, কিন্তু গদ্য ছন্দোময় ও গতিশীল। বিষয় অনুযায়ী এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের রচনায় ভঙ্গিপার্থক্য ঘটেছে। যখন ধ্রুপদ ও খেয়ালের রূপ বোঝাচ্ছেন তখন ভাষা উপরিউদ্ধৃত অংশ অপেক্ষা অনেক সহজ, বাক্য ক্ষুদ্র, এবং তীক্ষ্ন।—

"ধ্রুবপদ, এই নাম হইতে ধ্রুপদ হইয়াছে। ধ্রুবপদ অর্থাৎ জগদীশ্বরের গুণগান।...এই অঙ্গে অকম্পিত সুরই অধিকাংশ ব্যবহার হয়। গমক এবং মূর্চ্ছনাই অধিক থাকে।...ধ্রুপদ অতি গম্ভীর গান। যে-সকল তাল ধ্রুপদের তাল বলিয়া বিখ্যাত আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনো তালে ধ্রুপদ গীত হয় না।...ধ্রুপদ গায়কের রাগ-রাগিণীর শুদ্ধতার দিকে অত্যন্ত দৃষ্টি রাখা কর্তব্য; এবং ইহার তাল অত্যন্ত কঠিন।

"খেয়াল। খেয়াল শব্দের অর্থ ইচ্ছা অর্থাৎ স্বাধীনতা। ধ্রুপদের যে-সকল নিয়ম আছে... তাহা হইতে কোনোক্রমে বিচ্যুত হইবার উপায় নাই। খেয়ালে অনেক স্বাধীনতা ব্যবহার করা যায়।.. ধ্রুপদে চারি তুক ছাড়া আর নড়িবার উপায় নাই, খেয়ালে তান প্রভৃতির দ্বারা যথা-ইচ্ছা রাগিণীকে বিস্তার করা যাইতে পারে।...এইপ্রকার প্রসিদ্ধি আছে যে, আমীর খসরু নামক আলাউদ্দিন বাদশাহের কোনো সভাসদ বিখ্যাত সংগীতাচার্য গোপালের ধ্রুপদ হইতে

"এই সর্বলোকসুখপ্রদ সর্বসন্তাপহারী মোক্ষপ্রদ সংগীতশাস্ত্র কি এতই সহজ যে অবিজ্ঞ কুসংস্কারান্ধ 'ওস্তাদজী'দিগের হস্তে পড়িয়া থাকিবে? আমরা দেখিয়াছি যে, বীজগণিত এবং শব্দশাস্ত্রের অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। অলঙ্কার, ন্যায় এবং মনোবিজ্ঞানের সহিত ইহার প্রাণে-প্রাণে মিল, তাহা বাহুল্যভয়ে বিস্তার করিলাম না। এ-সম্বন্ধে মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সমস্ত হিন্দুজাতির অকপট কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার যত্নে, তাঁহার অধ্যবসায়ে এবং তাঁহার বিপুল অর্থসাহায্যে এই মুমূর্ষু সংগীতশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার হইতেছে।"

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন : "রাগ-সংগীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়া বিষয়ে এই [ভূমিকা] রচনাটি এমন সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, এটি একটি নাতিক্ষুদ্র পুস্তকরূপে প্রকাশিত হবার যোগ্য।" তিনি আরও বলেছেন, "শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হলেও রচনাসৌকর্যে এটি সংগীত-সাহিত্যের পর্যায়ে উঠেছে। ..[সংগীততত্ত্ব, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রাদির প্রয়োগবিধি প্রভৃতি] বিষয় যেভাবে বর্ণিত ও গ্রথিত হয়েছে তা দেখে মনে হয় যে, এটি কোনো প্রবীণ ও একান্তভাবে সংগীতব্যবসায়ীর রচনা।...রাগসংগীতের বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ের একত্র এমন সুনিপুণ সমাবেশ তৎকালীন সংগীত সাহিত্যে সুলভ ছিল না।...এই পুস্তকের পাঠকের একথা ধারণা করা কঠিন যে গ্রন্থকার ২৩ বছরের তরুণ এবং...সংগীত তাঁর বহুমুখী সাংস্কৃতিক চিন্তা ও কর্মের অন্যতম [অংশ] মাত্র এবং তাঁর প্রতিভা ও মনীষার এক খণ্ড রূপ।" "সেই যুগে সেই বয়সে ভারতীয় সংগীতের মূল তত্ত্ব এবং তার নানা বিষয়ের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে এমন একখানি গ্রন্থ...ভারতীয় সংগীতের ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে সেই বয়সেই কতখানি পূর্ণতা লাভ করেছিল—এ রচনা তার উজ্জ্বল নিদর্শন।" [১৪০-৪৩]

খেয়ালের সৃষ্টি করেন। ক্রমে সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ নামক গায়কদ্বয় হইতে ইহা বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।"

এরপরে নরেন্দ্রনাথের কিছু রচনাংশ উদ্ধৃত করব, যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রগতিশীলতার অভ্রান্ত নিদর্শন। স্বয়ং উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপন্থীদের সংকীর্ণতাকে আক্রমণ করে যেকথা বলেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা আজও হারায়নি :

"আমাদের দেশে সকল বিষয়েই চিন্তার স্রোত যে-প্রকারে বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়। যাহা হইয়া গিয়াছে তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না—এই বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। প্রাচীনেরা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ঐ সকল রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, লোকে সে বিষয়ের কোনো অনুসন্ধান করে না। কেবল তাঁহারা যেগুলি করিয়া গিয়াছেন তাহা শিক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচনা করেন। যদি কেহ ঐসকল পথ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অপরদিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সঙ্গীতের বহুল চর্চা থাকায় প্রায় সকল গীতই হিন্দী ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। গায়কমণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দী ভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না। অনেক গায়ক...বাংলা গীত লজ্জাকর মনে করেন। ইঁহারা সঙ্গীতের মূল সূত্রসকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন।...বাংলা গাহিলে লোকে আদর করিবে না, ওস্তাদমণ্ডলী অবজ্ঞা করিবেন, এই ভয়ে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন। কিন্তু এই কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকামালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেন বাংলা খেয়াল হইবে না? ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে-সকল বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোনো অংশে হিন্দী ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ? আবার এদেশে যদি সঙ্গীতের সমধিক চর্চা হয়, যদি বাংলা ভাষায় নূতন-নূতন রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গীত হয়, তাহা হইলে হিন্দী গানও বাংলা ভাষায় না গাহিলে চলিবে না।"

ঈশা-অনুসরণ : সঙ্গীত কল্পতরুর প্রায় তিন বৎসর পরে রচিত হয় ঈশা-অনুসরণ। টমাস আ কেম্পিসের রচনার যেটুকু অংশের অনুবাদ তিনি করেছিলেন, তারই মধ্যে স্বামীজীর প্রকাশক্ষমতার যথেষ্টই পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এই অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন; খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্বের অনুবাদের সময়ে ধর্মীয় অনুষঙ্গের কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হয়েছিল, এবং সতর্ক হতে হয়েছিল—জ্বলন্ত এক খ্রীস্টীয় সন্ন্যাসীর বক্তব্যের মর্যাদা পাছে নষ্ট হয়। স্বামীজী নিজেই বলেছেন, "অনুবাদ যতদূর সম্ভব অবিকল করিবার চেষ্টা করিয়াছি।" এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন। সামান্য নমুনা এই :

"তিনিই বাস্তবিক মহান, যাঁহার নিঃস্বার্থ সহানুভূতি আছে।...

"তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, যিনি খ্রীস্টকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সকল পার্থিব পদার্থকে বিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন।

"তিনিই যথার্থ পণ্ডিত যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হন, এবং আপনার ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করেন।"

এই অনুবাদ সম্বন্ধে এইটুকু বলে নেওয়া উচিত—এটি স্বামীজী তখন করেন যখন বৈরাগ্যের আগুনে জ্বলছেন। সেইকালে "ঈশা-অনুসরণ" তাঁর কাছে সহমর্মিতার সাহিত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। ভূমিকায় তিনি এই মহান খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যভাব থেকে বহু দূরে অবস্থিত মিশনারিদের সমূহ ধিক্কার দিয়েছিলেন : "মিশনারি মহাপুরুষেরা 'অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাবিও না' প্রচার করিয়া আসিয়াই আগামী দশ

বৎসরের হিসাব এবং সঞ্চয়ে ব্যস্ত। দেখিতেছি—'যাঁহার মাথা রাখিবার স্থান নাই' তাঁহার শিষ্যরা, প্রচারকেরা, বিলাসে মণ্ডিত হইয়া, বিবাহের বরটি সাজিয়া, এক পয়সার মা-বাপ হইয়া, ঈশাব জ্বলন্ত ত্যাগ, অদ্ভুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত!!" আলোচ্য গ্রন্থ-মহিমা স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন : "দীনতা, আর্তি এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে-ছত্রে মুদ্রিত, এবং পাঠ করিতে-করিতে জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে। যাঁহারা গোঁড়ামির বশবর্তী হইয়া খ্রীস্টীয়ানের লেখা বলিয়া এ পুস্তককে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ন্যায়দর্শনের একটি সূত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইব : আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ—সিদ্ধপুরুষদিগের উপদেশ প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্দপ্রমাণ। এস্থলে ভাষ্যকার ঋষি বাৎস্যায়ন বলিতেছেন যে, এই আপ্তপুরুষ আর্য এবং ম্লেচ্ছ উভয়ত্রই সম্ভব।" [৬—১৬-১৭]

পত্রাবলী। প্রথম পর্বে সাধুভাষায় লিখিত পত্রগুলিতে সত্যকার সতেজ শক্তি দেখা গেছে। প্রকাশ্য রচনার মধ্যে যে-ধরনের আত্মশাসন, তদনুযায়ী আড়ষ্টতা থাকে, ব্যক্তিগত পত্রে তা থাকে না—ছিলও না স্বামীজীর চিঠিতে। এই পর্বে আমরা প্রমদাদাস মিত্রের কাছে লেখা চিঠিই বেশি পেয়েছি। এই বয়োজ্যেষ্ঠ সুপণ্ডিত মহদাশয় ব্যক্তিকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী সর্বদাই সংযত ও প্রগাঢ়, কিন্তু ভিতরের আবেগতাপও সেগুলিতে বর্তমান। ওঁকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী প্রধানতঃ শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ এবং ধর্মসাধনার কথাই বলেছেন, কিন্তু কখনো-কখনো ব্যক্তিগত জ্বালা-যন্ত্রণার কথাও অনিবার্যভাবে এসে গেছে। তিনি সন্ন্যাসী, পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন, বৈরাগ্যের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছেন পূর্বতন আত্মীয়-সম্বন্ধের মমত্বকে, কিন্তু হায়, বিবেকানন্দ যে কদাপি হৃদয় আর প্রেমকে ভস্মসাৎ করতে পারেননি। নিজের যে-পরিবারকে তিনি ত্যাগ করে এসেছেন, সেই পরিবারে ছিলেন তাঁর মা, আর দুটি ছোট ভাই—তাঁদের দারিদ্র্যদুঃখের কাঁটার মুকুট তিনি অন্যের অলক্ষে নিজের মস্তকে বহন করেছেন। প্রমদাদাসকে লেখা একটি চিঠিতে সেই যাতনা অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পেয়েছে—নির্লিপ্তির আচ্ছাদনের নীচে ধিকি-ধিকি আগুন; পারিবারিক সম্পর্ককে ভুলে যাওয়ার মতো যে-আত্মপ্রবঞ্চনা করেছেন, তারই করুণ স্বীকারোক্তি :

"ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫/৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্ন-বাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোনো উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট। ইঁহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমনকি কখনো-কখনো উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা—দুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে-প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।

"কখনো-কখনো কলিকাতার নিকটে থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়—সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম—মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর।" [৬-২৮৮]

নিরুপায় পুরুষ-হৃদয়ের এই যন্ত্রণা একদিকে, অন্যদিকে পরিচিতজনদের মধ্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা-দর্শনে ক্ষোভ—যা তাঁর এক পত্রে ব্যঙ্গমুখে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজী পরি-

ব্রাজক অবস্থায় গাজিপুরের পওহারীবাবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিতে মোহিত হন। এই ব্যাপারটি তাঁর পরিচিতদের মধ্যে আশঙ্কাযুক্ত ক্ষোভের কারণ হয়। তেমনি একজন কেউ স্বাক্ষর না করে তাঁকে চিঠি পাঠান, যাতে পওহারীবাবার আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হয়েছিল। স্বামীজী লেখেন :

"কোনো ব্যক্তি আমাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে নাম নাই। উক্ত মহাত্মা কে জানিতে পারিলাম না। ইনি দর্শনযোগ্য বটেন। যিনি পওহারীবাবার ন্যায় মহাপুরুষকে গো-ক্ষুর বিবেচনা করেন—এবং পৃথিবীতে যাঁহার শিক্ষা করিবারও কিছু নাই—এবং শিক্ষা করা অতি অপমান বিবেচনা করেন—একপ্রকার নূতন পুরুষাবতার দর্শনযোগ্য বটেন। ভরসা করি গবর্নমেণ্ট জানিতে পারিলে তাঁহাকে অতি সমাদরে আলিপুরের উদ্যানে (পশুপতিনাথের বাগানে) স্থান দিবেন। তাঁহাকে আমাকে আশীর্বাদ করিতে বলিবেন—যেন কুক্কুর, শৃগাল পর্যন্ত আমার গুরু হয়—এইপ্রকার মহাপুরুষ কা কথা। আমার এক্ষণে শিখিবার সকলই আছে—আমার গুরু বলিতেন যে, 'যতকাল বাঁচি ততকাল শিখি'—তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি দুর্ভাগা, সাত সমুদ্র তের নদী অথবা লঙ্কা ডিঙাইয়া, নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবার অধিকার আমার কোথায়?" [বলরাম বসুকে লেখা চিঠি, ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০]৮৮

পরিচিতজনদের বুদ্ধি-বিবেচনার অভাব সম্বন্ধে বিরক্ত কৌতুক এই পর্বের চিঠিতে যথেষ্টই পাওয়া যায়। বলরাম বসু ধনী কিন্তু মিতব্যয়ী, তাঁর মিতব্যয়িতা যতটা না অপরের সম্বন্ধে ততোধিক নিজের বিষয়ে। তাঁকে ৫ জানুয়ারি ১৮৯০, স্বামীজী লিখেছিলেন :

"বৈদ্যনাথে 'চেঞ্জ' সম্বন্ধে আপনাকে যে-পত্র লিখি তাহার সার কথা এই যে, আপনার ন্যায় দুর্বল অথচ অত্যন্ত নরম-শরীর লোকের অধিক অর্থব্যয় না করিলে উক্ত স্থানে চলা অসম্ভব।...ইতিপূর্বে আপনাকে এক পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না বেয়ারিং দেখিয়া the devil take it করিয়াছেন? আমি বলি, চেঞ্জ করিতে হয় তো শুভস্য শীঘ্রং। রাগ করিবেন না—আপনার একটি স্বভাব এই যে, ক্রমাগত 'বামুনের গরু' খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না। আত্মানং সততং রক্ষেৎ। Lord have mercy—ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself. আপনি খালি টাকা বাঁচাতে যদি চান, Lord কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে চেঞ্জ করাইবেন?" [৬—৩০১]

এই পত্রের ক্রিয়া সাধু, কিন্তু ভঙ্গি চলিতেরও চলিত। আবার এই পর্বেই সাধুভাষার শক্তি তিনি আর একদিক দিয়ে উদ্ঘাটন করেছেন। নানা শাস্ত্রীয় প্রশ্ন ক'রে তিনি চিঠি লিখেছেন প্রমদাদাস মিত্রকে—বিষয় অত্যন্ত গুরুভার কিন্তু পত্রে লিখিত বলে, এবং প্রশ্নগুলি নিছক অ্যাকাডেমিক নয়, আন্তরিক জিজ্ঞাসাসূচক বলে—তাদের মধ্যে অগ্নিশরের চরিত্র এসে গেছে—সেগুলি ভেদ করে এবং দগ্ধ করে—দুইই। তেমন কিছু অংশ :

"আচার্যকে [শঙ্করাচার্যকে] তন্ত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক বৌদ্ধদের [মহাযান] গ্রন্থের মতের সহিত আচার্য-প্রচারিত বেদান্তমতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। 'পঞ্চদশী'কারও বলিতেছেন যে, বৌদ্ধ 'শূন্য' ও আমাদিগের 'ব্রহ্ম' একই ব্যাপার—ইহার অর্থ কি?

"বেদান্তসূত্রে বেদের কেন কোনো প্রমাণ দেওয়া হয় নাই? প্রথমেই বলা হইয়াছে—ঈশ্বরের প্রমাণ বেদ এবং বেদ প্রামাণ্য—'পুরুষ-নিঃশ্বসিতম্' বলিয়া। ইহা কি পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ে যাহাকে argument in a circle বলে, সেই দোষদুষ্ট নহে?

"বেদান্ত বলিলেন—বিশ্বাস করিতে হইবে, তর্কে নিষ্পত্তি হয় না। তবে যেখানে ন্যায়

অথবা সাংখ্যাদির অণুমাত্র ছিদ্র পাইয়াছেন, তখনই তর্কজালে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করা হইয়াছে কেন? আর, বিশ্বাসই বা করি কাকে? যে যার আপনার মতস্থাপনেই পাগল। এত বড় 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ'—তিনিই যদি ব্যাসের মতে অতি ভ্রান্ত, তখন ব্যাস যে আরও ভ্রান্ত নহেন, কে বলিল? কপিল কি বেদাদি বুঝিতেন না?

"ন্যায়-মতে 'আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ'—ঋষিরা আপ্ত এবং সর্বজ্ঞ। তাঁহারা তবে সূর্য-সিদ্ধান্তের দ্বারা সামান্য সামান্য জ্যোতিষিক তত্ত্বে অজ্ঞ বলিয়া আক্ষিপ্ত কেন হইতেছেন? যাঁহারা বলেন—পৃথিবী ত্রিকোণ, বাসুকি পৃথিবীর ধারয়িতা ইত্যাদি—তাঁহাদের বুদ্ধিকে ভবসাগরপারের একমাত্র আশ্রয় কি প্রকারে বলি?

"ঈশ্বর সৃষ্টিকার্যে যদি শুভাশুভ কর্মকে অপেক্ষা করেন, তবে তাঁহার উপাসনায় লাভ কি? নরেশচন্দ্রের একটি সুন্দর গীত আছে : 'কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে, জয় দুর্গা, শ্রীদুর্গা বলে কেন ডাকা তবে?'

"সত্য বটে, বহু বাক্য এক-আধটির দ্বারা নিহত হওয়া অন্যায্য। তাহা হইলে চির-প্রচলিত মধুপর্কাদি প্রথা [বৈদিক প্রথা, যাতে গো-বধের প্রয়োজন হত] 'অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্' ইত্যাদি [অশ্বমেধ, গোবধ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন, দেবের দ্বারা পুত্রোৎপাদন—কলিকালে এই পাঁচটি ক্রিয়া বর্জন করিবে] দু'একটি বাক্যের দ্বারা কেন নিহত হইল? বেদ যদি নিত্য হয়, তবে 'ইহা দ্বাপরের,' 'ইহা কলির ধর্ম', ইত্যাদি বচনের অর্থ এবং সাফল্য কি?

"যে-ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শুনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না আগের বিধি প্রবল?"

॥ ১২ ॥ স্বামীজীর সাধুগদ্যের দ্বিতীয় পর্ব : বাংলাগদ্যের নবরূপ দানে তাঁর সচেতন প্রয়াস : সৃষ্টির নমুনা

স্বামীজীর সাধুগদ্যের দ্বিতীয়পর্বের আলোচনা-সূচনায় গদ্যরীতি বিষয়ে স্বামীজীর কিছু উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। সাধুগদ্যের এই পর্বে তিনি অত্যন্ত সচেতন লেখক। উদ্বোধন পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা গদ্যরীতিতে গুরুতর কিছু পরিবর্তন আনতে ইচ্ছা করে-ছিলেন। তৎকাল-চলিত গদ্যরীতিকে তিনি সর্বাংশে উপযোগী মনে করেন নি, কতকগুলি অভাব তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল, দীর্ঘ পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে এক্ষেত্রে প্ররোচিত করেছিল—সেই ত্রুটিগুলিকে দূর করার চেষ্টা দরকার বলে মনে করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার মূল্য দুই দিক দিয়ে বিবেচ্য—এক, প্রচেষ্টার মূল্য, দুই, সাফল্যের মূল্য। আমাদের ধারণা, সাধুগদ্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের প্রয়াস যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে যেটুকু স্বীকৃতি পেয়েছেন তা চলিত ভাষার লেখক হিসাবেই।

বাংলা গদ্য বিষয়ে স্বামীজীর সচেতন অভিপ্রায়ের প্রমাণরূপে, ১৮৯৮ নভেম্বর মাসে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর আলাপের উল্লেখ করা যায়। স্বামীজী বলেছিলেন :

"এই সেদিন 'হিন্দুধর্ম কি?'—বলে একটা বাঙলায় [প্রবন্ধ] লিখলুম—তা তোদের ভেতরই কেউ-কেউ বলছে, কটমট বাংলা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিসের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধহয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।"

এই অভীপ্সিত নূতন সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্যও ছিল :

"এরপর বাংলাভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়ত তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাংলাভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার বাংলা-

লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশি verbs [ক্রিয়াপদ] use [ব্যবহার] করে। তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে ভার্ব-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশি জোর হয়।...ভাষার ভেতর ভার্ব-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস—ঐরূপে ভাবের pause [বিরতি] দেওয়া—সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্ন। ঐরূপ করলে মনে হয়, যেন ভাষার দম নেই। সেজন্যই বাংলাভাষায় ভালো লেকচার দেওয়া যায় না। ভাষার উপর যার কনট্রোল আছে, সে অত শীগগীর-শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডাল-ভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে—সর্বদিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে—যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।" [৯-৯৫]

বাংলাভাষার জাতিচরিত্র এবং মৌল দুর্বলতা সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু বক্তব্য এখানে পেলাম, যা দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি। যেসব ত্রুটির উল্লেখ স্বামীজী করেছেন, তা দূর করার চেষ্টা তাঁকেই করতে হয়েছিল। বাংলাভাষাকে নূতন ছাঁচে গড়তে গিয়ে ক্রিয়াপদ কমিয়ে, ভাষার দম রক্ষা করে, কিভাবে তিনি কখনো প্রবল বন্যাগতি, কখনো-বা বিস্ফোরণে-বিস্ফোরণে বাগ্মিতার শিখরোত্থান করেছেন, তার দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধার করতে পারি। স্ব-গোষ্ঠীতে সমালোচিত "হিন্দুধর্ম কি" (যা পরে "হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" নামে প্রকাশিত হয়েছে) প্রবন্ধ থেকে একটি পংক্তি উপস্থিত করা যাক :

"তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি, এবং সতত বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে আচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, হিন্দুধর্ম-নামক যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় [তাহা দেখাইতে] এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত কবিয়া, লোক-সমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে, লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" [৬—৪-৫]

এইবার স্বামীজীর সাধুগদ্য রচনার চূড়ান্ত নিদর্শন 'বর্তমান ভারত' থেকে (অনেকের মতে, কঠিনতার চূড়ান্ত নিদর্শনও বটে) আমি একটি দীর্ঘ বাক্য অংশভাগ ক'রে উপস্থিত করব, পূর্বকথিত বক্তব্যের আর এক প্রমাণরূপে :

যে পুরোহিতশক্তির সহিত রাজশক্তির সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল,
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভা স্বীয় জীবদ্দশায় যাহার ক্ষত্র-প্রতিবাদিতা
প্রায় ভঞ্জন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল,
যে ব্রহ্মণ্যশক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কর্মক্ষেত্র হইতে প্রায় অপসৃত হইয়াছিল,
অথবা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছিল,
যাহা মিহিরকুলাদির ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল প্রাণপণে পূর্বপ্রাধান্য স্থাপন করিতে
চেষ্টা করিয়াছিল,
এবং ঐ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মধ্য-এশিয়া হইতে সমাগত ক্রূরকর্মা বর্বরবাহিনীর
পদানত হইয়া,
তাহাদের বীভৎস রীতি-নীতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া,
বিদ্যাবিহীন বর্বর ভুলাইবার সোজা পথ মন্ত্র-তন্ত্র-মাত্র-আশ্রয় হইয়া,
এবং তজ্জন্য নিজে সর্বতোভাবে হতবিদ্য, হতবীর্য, হতাচার হইয়া,
আর্যাবর্তকে একটি প্রকাণ্ড বাম-বীভৎস ও বর্বরাচারের আবর্তে পরিণত করিয়াছিল,

এবং যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্বল
হইয়া পড়িয়াছিল—
পশ্চিম হইতে সমুত্থিত মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শমাত্রেই
তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইল—
পুনর্বার কখনো উঠিবে কি—কে জানে?

একটি গোটা ইতিহাস একটিমাত্র দীর্ঘ বাক্যে প্রকাশিত। বাগ্মিতার তরঙ্গোচ্ছ্বাস ক্রমান্বয়ে যেন আছড়ে পড়েছে। বিশেষণের প্রভূত ব্যবহার, বিশেষণের দ্বারা ক্রিয়াপদের কর্মসম্পাদন—স্বামীজী নিজ অভিপ্রেত কাজ নিজেই করে দেখিয়েছেন। এইসঙ্গে আরও কয়েকটি জিনিস উদ্ধৃত অংশে, ও 'বর্তমান ভারতের' অন্যত্র (অপরাপর সাধুগদ্য-রচনাতেও) দেখা যায়—স্বামীজী অনেক সময়েই অতীব ভাবসংহতি ঘটিয়ে বক্তব্যকে যেন সূত্রাকারে উপস্থিত করেছেন। এইসঙ্গে নৈয়ায়িকের যুক্তিপদ্ধতিও তিনি গদ্যরচনায় অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, এই সকলের দ্বারা তাঁর গদ্য ক্ষেত্রবিশেষে কঠিন ও গুরুভার হয়েছিল। সে-বস্তু স্বামীজীর ইচ্ছানুসারেই হয়েছিল। মধুসূদনের অনুরাগী তিনি—চেয়েছিলেন গদ্যে দার্ঢ্য ও ওজস্বিতা আনতে; মধুসূদনের অনায়ত্ত মনীষার অধিকারী তিনি—চেয়েছিলেন 'পচা নাটক নবেলে' ভর্তি বাংলাসাহিত্যে চিন্তাসম্পদ যুক্ত করতে। সেকাজে তাঁর সাফল্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। এখানে আমি এমন কিছু নমুনা চয়ন করব, যেগুলি শব্দসংক্ষিপ্ত ও ভাবঘনত্বে সূত্রচরিত্র লাভ করেছে, অথচ সেগুলিতে আছে প্রবাদ-বাক্যের তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষতা ও প্রখর শক্তিদ্যুতি। নিঃসন্দেহে সেগুলি প্রবচন—ধ্রুববচন।—

"প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়।" [৬—৫]

"মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না; গতরাত্রি পুনর্বার আসে না; বিগতোচ্ছ্বাস সে-রূপ আর প্রদর্শন করে না; জীব দুইবার একদেহ ধারণ করে না।" [৬—৬]

"হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি।" [৬—৬]

"সত্য সকল সময়ে মধুর হয় না।" [৬—১৪]

"বোঝার প্রমাণ কার্যে। মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে?" [৬—১৪]

"হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য মায়ের শক্তিসঞ্চার রোধ করো?" [৬—১৫]

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" [৬—৩১]

"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে?" [৬—৩২]

"[যেখানে] বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে, এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন-দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?" [৬—৩৩]

"ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?" [৬—৩৩]

"যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত—তাহা মরণশীল; তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ—তাহা অবিনশ্বর, তাহার নাশ কে করে?" [৬—৩৪]

"জ্ঞান মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধন—আত্মার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই অনন্ত জ্ঞানের আধার; তাহাকে আবার কে শিখাইবে? কুকর্মের দ্বারা ঐ জ্ঞানের উপরে যে একটা আবরণ পড়িয়াছে, তাহা কাটিয়া যায় মাত্র।" [৬—৩৮]

"লৌকিক ও অলৌকিক—কেবল প্রকাশের তারতম্যে।" [৬—৪১]

"একজন রামচন্দ্র শত-শত অগ্নিবর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান; ধর্মাশোকত্ব অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।" [৬—২২৩]

"সর্ববিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে তাহার আত্মরক্ষাশক্তির স্ফূর্তি কখনো হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজার দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখনো স্বায়ত্তশাসন শিখে না।...ঐ 'পালিত' 'রক্ষিতই' দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।" [৬—২২৪]

"প্রাণস্ফূর্তির সঙ্গে-সঙ্গেই মৃত্যুবীজ উপ্ত। অন্ধকার আলোর সঙ্গে চলে।" [৬-২৩২]

"প্রত্যেক অভিজাত জাতির স্বহস্তে নিজের চিতা নির্মাণ করাই প্রধান কর্তব্য।" [৬—২৩৪]

"শক্তিসঞ্চয় যে-প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু।" [৬—২৩৫]

"সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব।" [৬—২৩৮]

"প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না।" [৬—২৩৮]

"সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া ওঠেন, এবং সেই উদ্বোধনের বীর্যে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।" [৬—২৩৮]

"বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা-কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য—একথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।" [৬—২৩৮]

"অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত।" [৬—২৪০]

"এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের যেন-তেন-প্রকারেন সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহন। এখন তৃপ্তি—ঐশ্বর্য প্রদর্শনে, ভক্তি—স্বার্থসাধনে, জ্ঞান—অনিত্য বস্তুসংগ্রহে, যোগ—পৈশাচিক আচারে, কর্ম—পরের দাসত্বে, সভ্যতা—বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিত্ব—কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ—ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকিরণে।" [৬—২৪০-৪১]

"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।" [৬—২৪২]

"স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত।" [৬—২৪৩]

"সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক।" [৬—২৪৪]

"মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য—মনীষী—মুনি?" [৬—২৪৪]

"দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?" [৬—২৪৪]

"পাশ্চাত্ত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা; উপায়—রাষ্ট্রনীতি।

ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি; ভাষা—বেদ; উপায়—ত্যাগ।" [৬—২৪৬]

"বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ করো।" [৬—২৪৭]

"অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না; অর্জন না করিলে কোনো বস্তুই নিজের হয় না; সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?" [৬—২৪৭]

"বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।" [৬—২৪৭]

"শিখিবার অনেক আছে; যত্ন আমরণ করিতে হইবে; যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' যে-ব্যক্তি বা যে-সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।" [৬—২৪৭]

"বলবানের দিকে সকলে যায়। গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনোপ্রকারে একটুও লাগে—দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা।" [৬—২৪৮]

এরপরে সাধুভাষায় লেখা পত্রাবলী থেকে অনুরূপ কিছু অংশ উৎকলন করছি। ইংরাজি বা সংস্কৃত থেকে অনূদিত পত্রে অজস্র সংখ্যায় ঐ প্রকার বস্তু আছে, কিন্তু সেগুলি এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।—

"চাকে খোঁচা না মারিলে মধু পড়ে না।" [৬—২৯২]

"ঐ প্রকার তেজ মিথ্যাবাদিনী ব্যভিচারিণীতে সম্ভবে না।" [৬—২৯৮]

"কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনো পাপ করে না।" [৬—৩০২]

"সংসারে কথা লইয়াই কাজ। কথার ছাল ছাড়াইয়া [লইবার] অন্তর্দৃষ্টি সকলের হয় না।" [৬—৩১০]

"সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনো বেলাবন্ধ থাকিতে পারে না।" [৬—৩১৯]

"জীবাত্মার বাসভূমি এই শরীর, কর্মের সাধনস্বরূপ—ইহাকে যিনি নরককুণ্ড করেন তিনি অপরাধী; এবং যিনি অযত্ন করেন তিনিও দোষী।" [৬—৩২২]

"বালবুদ্ধি জীবে কে বা কি বলিতেছে, তাহার খবরমাত্র লইবে না। উপেক্ষা উপেক্ষা উপেক্ষা ইতি।" [৭—৪০]

"মহা উদ্যম, মহা সাহস, মহা বীর্য, এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা—এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়।" [৭—১৭৬]

"প্রিয় হিতবচন মহাশত্রুরও প্রতি প্রয়োগ করিবে।" [৭—৪২]

"পক্ষপাতই সকল অনিষ্টের মূল কারণ জানিবে।" [৭—১৯৩]

"কেহ তোমার নিকট অপর কোনো ভাইয়ের নিন্দা করিতে আসিলে তাহা বিলকুল শুনিবে না। শুনাও মহাপাপ। ভবিষ্যৎ বিবাদের সূত্রপাত তাহাতে।" [৭—১৯৩]

"ধীরে ধীরে—মহাকার্য ধীরে ধীরে হয়। ধীরে ধীরে বারুদের স্তর পুঁতিতে হয়। তারপর একদিন এক কণা অগ্নি—আর সমস্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।" [৭—১৯৪]

"যে কর্মের দ্বারা এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম। যদ্দ্বারা অনাত্মভাবের বিকাশ—তাহাই অকর্ম।" [৭—১৯৮]

"জগতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।" [৭—১৯৮]

"এইকথা সদা মনে রাখিবে যে, আমরা এক্ষণে জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান।" [৭-২০০]

"পরকে মারিতে গেলে ঢাল খাঁড়া চাই।" [৭—২০৯]

"হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ।" [৭—২১৯]

"দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম—একথা ভুলিবে না।" [৭-২০৭]

"নিয়মবন্ধ হওয়া ভালো নয় বটে কিন্তু অপক্ক অবস্থায় নিয়মের বশে চলা আবশ্যক।" [৭—২৩৯]

"নিষ্ঠা ভিন্ন তেজ হয় না।" [৭—২৪৩]

"পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।" [৭—২৭৫]

"আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার।" [৭—২৭৫]

"আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি।" [৭—৩২৩]

"তিনিই বীর যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাদপদ না হইয়া, এক হস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন।" [৭—৩২৩]

"জীবাত্মাতেই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে; পিপীলিকা হইতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'আত্মা'—তফাৎ কেবল প্রকাশের তারতম্যে।" [৭—২৮]

"নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভালো হয়, পূর্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতি-নীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম হয়—বলো, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্মিক কে? রেলগাড়ির চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গো-মহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?" [৮—১৬৮]

"যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।" [৮—১৬৯]

"চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভালো হওয়ার চেয়ে, স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্যশক্তির প্রেরণায়, মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর।" [৮—১৬৯]

"বর্তমান ভারত" গ্রন্থের একেবারে শেষে এমন কিছু গদ্য-নমুনা মেলে যার কোনো তুলনা বাংলাসাহিত্যে আছে বলে জানিনা। এমনকি শ্রেষ্ঠ বাংলা গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তেও নয়। ভারত-প্রসঙ্গে কমলাকান্তের উক্তিতে যেখানে ব্যথিত হৃদয়ের আর্তি প্রাধান্য পেয়েছে, কিংবা সুগভীর দার্শনিক বিষাদ, সেখানে বিবেকানন্দের রচনায় মেলে স্বরের উদারতা, উদাত্ততা ও আত্মার সুমহিম ধ্বনি। অংশটি সুপরিচিত, ভারতমন্ত্র-রূপে স্বীকৃত। একালে ভারতবর্ষকে যিনি নিজের জীবনে ও বাণীতে সর্বাধিক উন্মোচন করেছেন—ভারত-মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার তাঁরই। নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দের ছিল অধিকারের কণ্ঠ। এই গদ্য সত্যই বাণী—ঔপনিষদিক।

"হে ভারত ভুলিও না!"—মহাকাব্যের মতো এই রচনাকে বলতে পারি মহাগদ্য। "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—এর সঙ্গে ঐ অংশের আত্মিক সাদৃশ্য সবিশেষ। প্রথমটি সর্বের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত, দ্বিতীয়টি ভারতের উদ্দেশ্যে—কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সে আহ্বান না শুনলে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। ভাবগরিমা ও সুরমহিমার দিক দিয়ে বিবেকানন্দের এই রচনার একমাত্র তুলনা রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" কবিতা। উভয়ের বক্তব্য প্রায় এক—প্রভেদটুকু গদ্য ও কবিতার। 'ভারততীর্থ' কবিতা, তাই তাতে আবেগের প্রাধান্য; 'ভারতমন্ত্রে' চিন্তার রূপটি স্পষ্টতর। তবু, শেষপর্যন্ত 'ভারতমন্ত্র' আমাদের যেভাবে প্রবুদ্ধ করে তোলে এমন আর কিছুতে নয়। এ শক্তি দেখেছি একমাত্র বন্দেমাতরম সঙ্গীতে।

বিপুল প্রাণের প্রবাহ নির্গলিত হয়েছে যেখানে, সে বস্তু সুপরিচিত হলেও কিছু অংশ উদ্ধৃত না করে পারছি না:

"হে ভারত!...ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই! বলো—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই! তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী! বলো ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ! আর বলো দিনরাত—হে গৌরীনাথ! হে জগদম্বে! আমায় মনুষ্যত্ব দাও! মা, আমার কাপুরুষতা দুর্বলতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।"

॥ ১৩ ॥ স্বামীজীর সাধুগদ্যের প্রশংসা ও নিন্দা

স্বামীজীর সাধুগদ্যের উপর আঙ্গিকগত কোনো আলোচনাই সমকালে প্রায় হয়নি। এইপ্রকার রচনার পিছনে কোন্ উদ্দেশ্য ছিল সে-সম্পর্কে সচেতন আগ্রহ প্রায় কোনো মহলেই দেখা যায়নি। কেবল একটি সমালোচনাই নানামুখে শোনা গিয়েছিল—এ বড় দুর্বোধ্য কঠিন ভাষা, অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে গলাধঃকরণ করবার মতো সরল তরল নয়। ভাবগাম্ভীর্যের কিছু-কিছু প্রশংসা অনুরাগী-মহল থেকে আসেনি তা নয়। কিন্তু এই ধরনের ভাষার অভিনবত্ব কোথায়, বাংলাভাষার কোন্ প্রয়োজনসাধন এ-বস্তু করবে, সে-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ছিল না। আর স্বামীজী কিছু করার আগে সে-বিষয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার করাও দরকার মনে করেন নি, বিশেষতঃ যখন সাহিত্যসৃষ্টিতে ধারাবাহিকভাবে লিপ্ত থাকতে পারবেন এমন সম্ভাবনা কম ছিল। পথপ্রদর্শনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

'সাহিত্য' পত্রিকার বিজ্ঞ বিখ্যাত সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি খুশি হয়েছিলেন। বৈশাখ, ১৩০৬, 'সাহিত্যে' "নূতন পাক্ষিক পত্র" উদ্বোধনের বিবেকানন্দ-লিখিত "প্রস্তাবনা"র সেই অংশ সমাজপতি উদ্ধৃত করেন, যার মধ্যে উদ্বোধনের উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল। তারপর তিনি লেখেন :

"ইহা অপেক্ষা আর কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য আছে কিনা জানিনা। উদ্বোধনের আহ্বানে এই চিরনিদ্রিত জাতি উদ্বুদ্ধ হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। **আমরা আর কখনও বিবেকানন্দ-স্বামীর বাংলা রচনা দেখি নাই। শুনিলাম, ইহা তাঁহার প্রথম রচনা। স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাষার নূতন ভঙ্গি ও লীলাগতি দেখিয়া মনে হয়---সত্যই প্রতিভা সর্বতোমুখী!**"

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সংখ্যার সাহিত্য পত্রিকায় 'বর্তমান ভারত' সম্বন্ধে লেখা হয়, "চিন্তাপূর্ণ সুপ্রবন্ধ।"

এই ধরনের প্রশংসার পরিমাণ নিন্দার তুলনায় অল্পই ছিল। ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ (১৩০৬) মাসে, 'বর্তমান ভারত' যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সারদানন্দ তখন ভূমিকায় পূর্ববর্তী সমালোচনার উল্লেখ করেছিলেন, সেইসঙ্গে বইটির বিষয়ানরূপ রীতির পক্ষে যথাযোগ্য কিছু মন্তব্য করেন। গোড়াতে তিনি ভারত-ইতিহাসের অর্ধাবৃত ভূখণ্ডে স্বামীজী অসাধারণ প্রতিভাবলে কোন্ আলোকপাত করেছেন তা বলেছিলেন। তারপর—

"'বর্তমান ভারত' প্রথমে প্রবন্ধাকারে পাক্ষিক পত্র উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়। অনেকের মুখে ঐ সময়ে শুনিয়াছিলাম যে, উহার ভাষা অতি জটিল ও দুর্বোধ্য। এখনও হয়ত অনেকে ঐ কথা বলিবেন। কিন্তু অদ্য আমরা সেই মতের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভাষার দোষ স্বীকার-পূর্বক 'বর্তমান ভারত' উপহারহস্তে সলজ্জভাবে পাঠক-সমীপে সমাগত নহি। আমরা উহাতে ভাব ও ভাষার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। বঙ্গভাষা যে অত অল্পায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দেখি

নাই। পদলালিত্যও অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত। অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোধহয় যেন লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্যকমতো প্রয়োগ করিয়াছেন।

"অধিকন্তু...গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতের' আলোচ্য বিষয়। ইহার ভাষা কেমন করিয়া আদি বা করুণরস-সংঘটিত নভেল-নাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে এখন যথার্থ রসজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব। গভীর চিন্তা-প্রসূত বিজ্ঞানেতিহাসদর্শনাদির অথবা আদি ও করুণ ভিন্ন বীর-রসাদির লেখক ও পাঠক অতীব বিরল।" [৬—২২০-২১]

সারদানন্দ আরও বলেছিলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে মার্জিত ও বিশুদ্ধ রুচিসম্পন্ন হয়ে এই ধরনের চিন্তাপূর্ণ রচনার স্বাদগ্রহণ সম্ভব নয়। সাধারণ লোক অবশ্যই সারদানন্দের কথার প্রতিবাদ করবার অবস্থায় ছিলেন না—কিন্তু এগিয়ে এলেন অসাধারণ এক ব্যক্তি, "শ্রীসমালোচক" নাম ধরে, প্রবাসীর পৃষ্ঠায় (শ্রাবণ ১৩১২) 'বর্তমান ভারতের' সমালোচনা করতে, যাঁর বক্তব্যের কিছু উল্লেখ আগে করেছি, [তৃতীয়, ৫১৫-১৬], দেখিয়েছি, 'বর্তমান ভারত'কে সারদানন্দ দর্শনগ্রন্থ আখ্যা দিয়ে এঁর কাছে কোন্ অপরাধ করে ফেলেছিলেন। বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রবাসী-আশ্রিত এই শ্রীসমালোচকের অন্তঃকরণে ঘৃণার বাষ্প সত্যই দারুণ উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল। তারই চাপে ইনি স্বামীজীর গদ্যভাষার দোষ ধরতে বিশেষ পরিশ্রম করেছিলেন। কিছু-কিছু শব্দব্যবহারে ব্যাকরণ-দোষ অনুমান করে ইনি বড়ই মনঃপীড়া পেয়েছিলেন, ক্ষেত্রবিশেষে স্বচ্ছন্দে অর্থবোধ করতে না পাবার কষ্টও পান। স্বামীজীর ভাষা সম্বন্ধে শ্রীসমালোচকের আধিকারিক সিদ্ধান্ত ছিল এই :

"স্বামীজী হয়ত ইংরাজিতে খুব সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ ভাষায় মনোহর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া বুঝিলাম যে, তিনি কখনো বাংলাভাষার চর্চা করেন নাই। বীজ 'বপিত', পরিবর্তন 'প্রসাধিত', 'চলমান' প্রভৃতি ভুরি-ভুরি পদ প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিলাম তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় কিছুমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান ছিল না। বাঙালীর ছেলে যদি সহজ বাংলায় কিছু লেখেন, কোনোপ্রকার ভুলভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সংস্কৃতের ছটা দেখাইবার জন্য সাধিত কথাটার পূর্বে আবার একটা 'প্র' জুড়িয়া দিলে যে অলঙ্কৃত অর্থ হইয়া যায়, সেটা স্বামীজী জানিতেন না। তাঁহার ফটোটিতে দেখিতেছি, 'প্রসাধন' সন্ন্যাসী সাধুদিগেরই অনুরূপ, কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানটা নহে। স্বামীজী বিখ্যাত ব্যক্তি; কেহ-বা মনে করিতে পারেন যে, বৃথাই দু'একটা ক্ষুদ্র দোষ ধরিয়া আমরা নিন্দা করিতে বসিয়াছি। সেজন্য তাঁহার ভাষা, ব্যাকরণ এবং ভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিয়েছি।" [অতঃপর উদাহরণসহ ভাষা-দোষের আলোচনা।]

স্বামী প্রকাশানন্দ আশ্বিন ১৩১২ সংখ্যায় ঐ সমালোচনার উত্তর দেন। উত্তর যথোপযুক্ত হয়েছিল। তিনি স্বামীজীর প্রয়োগের ব্যাকরণগত সমর্থন করেন। শ্রীসমালোচক তার যে-উত্তর দেন তাতে ভাষা সম্বন্ধে আক্রমণ আর বেশি চালানো হয়নি, নিজ গোঁ-এর অল্প-কিছু পৃষ্ঠচুলকায়ন ক'রে বলেন, "সম্ভবতঃ অভিধান দেখিয়া শব্দ বাছিতে গিয়াই এত গোল হইয়াছে।" এক্ষেত্রে আমরা মনে করতে পারি, শ্রীসমালোচক 'সমালোচনার জন্য সমালোচনা' —এই তত্ত্বে উৎসাহী হয়ে, নিজ নামকে সার্থক করার প্রয়োজনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েও বটে, ঐসব কথা লিখেছিলেন, নচেৎ যিনি "খুব সুপণ্ডিত" লিখতে পারেন, কিংবা লিখতে পারেন —"তাঁহার ভাষা, ব্যাকরণ এবং ভাবের," ইত্যাদি—যার দ্বারা মনে হতে পারে স্বামীজী বুঝি তাঁর লেখায় ব্যাকরণ রচনাও করেছিলেন (এই ধরনের ভুল আমরা সকলেই অবিরাম করি) —তেমন লেখকের ভাষাজ্ঞান নয়, ব্যক্তি-স্বভাবই লক্ষণীয় হওয়া উচিত—সে-স্বভাব যে, ঈর্ষাকাতর একটি মনুষ্যের তাতে সন্দেহ থাকে না। প্রকাশানন্দ সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করে-

ছিলেন : "সমালোচক মহাশয় ভ্রমপ্রণোদিত হইয়া স্বামীজী সম্বন্ধে কতকগুলি অযথা ও অসংযত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।" এবং "স্বামীজীর কর্মসকল অলোকসামান্য ছিল কিনা, ভাগ্যবশতঃ সে নির্ধারণের ভার সমালোচক মহাশয়ের হস্তে নাই।...'বর্তমান ভারত' পুস্তকে কোনো মৌলিকতা বা নূতনত্ব আছে কিনা, এবং সাধারণ কথা ছাড়া ভারতীয় বিশেষ-বিশেষ তত্ত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে কিনা, সে সিদ্ধান্তের ভার বুধমণ্ডলীর উপর দিয়া সমালোচক মহাশয়ের আক্ষেপগুলি সংক্ষেপে বিচার করিতে চেষ্টা করিব।"৮৯

প্রকাশানন্দ বুধমণ্ডলীর কাছ থেকে যে ন্যায়বিচার আশা করেছিলেন, তা সত্যই মিলেছিল। সমসাময়িক সমাজপতির সমাদরের কথা বাদ দিচ্ছি—আরও প্রায় ষাট বছর পরে বাংলাসাহিত্যের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্ছ্বসিত মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। স্বামীজীর 'বর্তমান ভারতের' গদ্যপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সাধুরীতিকেও স্বামীজী ধ্বনিগম্ভীর চিন্তাঋদ্ধ ক্লাসিকধর্মী রূপ দিয়েছেন।" ঐ গ্রন্থের ভাষারীতি বিশ্লেষণ করে অসিতকুমার দেখিয়েছেন, এর মধ্যে দু'ধরনের বাক্‌রীতি বর্তমান—"একটি —তৎসম শব্দবহুল, সমাস-সন্ধি-সমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত ছাঁদের বাক্যপরম্পরা; আর একটি—খণ্ড-খণ্ড উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালকা বাক্‌রীতি।" উভয় বাক্‌রীতির নমুনা উপস্থিত করার পরে, প্রথম ও দ্বিতীয় রীতির যথোপযুক্ততা বিষয়ে তিনি বলেছেন : "প্রথমটিতে বিরাট ইতিহাসের পটভূমিকায় সমাজবিবর্তনের চিত্র স্থান পেয়েছে। ফলে, স্থান-কালের বিশালতা বাক্যগঠনকেও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও জটিল করে তুলেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধিগ্রাহ্য মন্তব্যগুলি ছোট-ছোট বাক্যে এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, চিন্তার মধ্যে সহজ চলমানতা [হায় সেই 'চলমান!'] লক্ষ্য করা যাবে। প্রথমটিতে বাক্যধারা যেন অবারিতবেগে এবং দ্বিতীয়টিতে উপলখণ্ডের উপর দিয়ে মৃদু উল্লম্ফনে বয়ে চলেছে।"

'ভারতমন্ত্র' প্রসঙ্গে অসিতকুমারের রচনা অনবদ্য :

"এই অগ্নিস্রাবী বাক্‌পুঞ্জ কখনো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনো ঋক্‌মন্ত্রের

৮৯ শ্রীসমালোচক প্রবাসীর পৃষ্ঠায় আর একবার কৃপা করে বিবেকানন্দের জন্য কয়েক লাইন ব্যয় করেন। প্রবাসীর কার্তিক, ১৩১৪ সংখ্যায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থপ্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য। স্বদেশহিতৈষণা ভালো, কিন্তু যাহা বিদেশের তাহাই অপবিত্র, এ ভাব বড় অনিষ্টকর। আজকালও উহার বিপরীত ভাবের অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের কাছে বিদেশের কুকুর স্বদেশের ঠাকুর অপেক্ষা পূজ্য। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রায় কথা কহিবার মতো ভাষায় এই উভয়পক্ষের দোষগুণ সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই সমালোচনা এখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ায় ভালো হইয়াছে।"

প্রবাসী-আশ্রিত এই শ্রীসমালোচক প্রবাসীর সাহিত্যবুদ্ধির মানদণ্ড, একথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। প্রবাসীকে সম্ভবতঃ তার এই সম্মানিত ছদ্মনামা সমালোচকের বিবেকানন্দ-অ্যালার্জির গাত্রজ্বালার ভাগ নিতে হয়েছিল। প্রবাসীর ভাদ্র, ১৩১৩ সংখ্যায় 'পরিব্রাজকে'র আলোচনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, যার মধ্যে স্বামীজীর রচনার বেশ-কিছু উদ্ধৃতি আছে। প্রবাসীর বিমর্ষ গাম্ভীর্যের পক্ষে অবশ্য বিবেকানন্দের সবকিছু সহ্য করা সম্ভব ছিল না : "পুস্তকখানির ভাষায় দুটি দোষ দেখিলাম। স্থানে-স্থানে ইয়ারকির হালকা সুরটার মাত্রা কিছু বেশি বোধ হইল। দু'এক জায়গায় 'স্ত্রী' শব্দের গ্রাম্য ইতর প্রতিশব্দ [অর্থাৎ 'মাগী'] অকারণ ব্যবহৃত হইয়াছে।" কিন্তু একইসঙ্গে প্রবাসী লিখেছিল : "ইহা স্বামী বিবেকানন্দের একবার বিলাতযাত্রার পথের বৃত্তান্ত। কিন্তু কেবল ভ্রমণবৃত্তান্ত নহে। ইহা যেমন সুখে আগ্রহের সহিত পড়া যায়, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। ইহার পত্রে-পত্রে লেখকের স্বদেশহিতৈষণার ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সকল মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা সকলকে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।"

ভাষাভঙ্গিতে মনে হয় লেখাটি স্বয়ং প্রবাসী-সম্পাদকের।

মতো কাণে বাজতে থাকে, কখনো ফরাসি বিপ্লবের *Egalite Liberte Fraternite*-এর অশনিনির্ঘোষ প্রতি ছত্রে ধ্বনিত হয়। ভাষা বাঙ্‌ময় হলেও আসলে তা হৃৎস্পন্দন ছাড়া কিছু নয়।...এ রচনা একটা দিব্য মুহূর্তের সৃষ্টি, আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, সর্বতন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ—যা শ্রোতার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মনঃপ্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।"৯০

॥ ১৪ ॥ সর্বাত্মক চলিত গদ্য ব্যবহারে স্বামীজীর ভূমিকা পথিকৃতের

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু সাধুগদ্যের ক্ষেত্রে নয়, চলিত গদ্যের ক্ষেত্রেই দিক্‌পুরুষ। তাঁর এই ভূমিকা সম্বন্ধে দীর্ঘদিন অবহেলা দেখিয়েও ইদানীং আর অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর পথিকৃতের ভূমিকা স্বীকৃতি পাচ্ছে নানা গণ্য লেখকের লেখায়।

সাহিত্যের ইতিহাসে চলিত গদ্য প্রবর্তনের ব্যাপারে স্বামীজীর স্থাননির্ণয়ে বিলম্বের কতকগুলি কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। (ক) তখনকার অধিকাংশ সাহিত্যপত্রিকা ব্রাহ্ম-কবলিত, যারা বিবেকানন্দকে পাবলিশিটি দিতে প্রস্তুত ছিল না; (খ) রক্ষণশীল সমাজও তাই; রক্ষণশীল পত্র-পত্রপত্রিকাগুলি অধিকন্তু তাঁর চলিত বাংলাকে রক্ষণশীলতার শত্রু মনে ক'রে, খোলাখুলি গালমন্দ ক'রে, দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল; (গ) বিবেকানন্দের অন্য ভূমিকা বৃহৎ হয়ে তাঁর বাংলা-লেখক ভূমিকাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল; তাঁর বিষয়ে ধারণা ছিল, তিনি সন্ন্যাসী, দেশাত্মবোধ এবং বিশ্ববোধে উদ্দীপিত, কিন্তু সাহিত্যের মানুষ নন; এবং স্বামীজী দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে চলিত রীতির পক্ষে নবনব পরীক্ষাকাজও ক'রে যেতে পারেন নি; (ঘ) সর্বোপরি, তাঁর ভাষাদর্শ গ্রহণ করবার জন্য দেশ প্রস্তুত ছিল না—যার বিশেষ কারণ, বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকেরা ঐকালে সাধুগদ্যেই প্রতিভা-বিকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ সাধুগদ্যের ঐশ্বর্য এমন অসাধারণভাবে উন্মোচন করেছিলেন যে, চলিত গদ্য তার পাশে তুচ্ছতার উপেক্ষা ছাড়া আর কিছু পায়নি।

॥ ১৫ ॥ স্বামীজীর চলিত গদ্যের পূর্বাপর হিসাব

অন্য প্রসঙ্গ বিবেচনার পূর্বে স্বামীজীর চলিত গদ্য রচনার আদি-অন্তের একটা হিসাব নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে একটি বিস্ময়কর তথ্য মেলে—যেখানে চলিত গদ্য প্রথম ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক সেই পত্রাবলীতে দীর্ঘদিন স্বামীজী সাধুগদ্য ব্যবহার করে গেছেন। পত্রাবলীর সাধুগদ্য অবশ্যই অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল, তাতে সাধুর সঙ্গে চলিতের মিশ্রণও আছে, অনেক সময়ে বোঝা দুষ্কর যে তা সাধুগদ্য, তবু ক্রিয়া ব্যবহারে স্বামীজী বহুদিন সাধুরীতি বজায় রেখেছিলেন, তাও লক্ষণীয়। আবার পত্রাবলীতেই তিনি প্রথম চলিত ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, একথাও ঠিক। আমরা লক্ষ্য করি, পত্রাবলীর ভাষায় সচেতন রীতিরক্ষা তিনি করতে পারেননি বা করেন নি। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটেছিল, অর্থাৎ একই চিঠিতে সাধু ও চলিত উভয় ক্রিয়াই ব্যবহৃত হয়েছে। দেখা যায়, স্বামীজী যখন গাম্ভীর্যপূর্ণ কিছু বলতে চেয়েছেন তখন ক্রিয়া সাধু, আর যখন উত্তেজিত, উদ্দীপ্ত,

ও ক্রিয়াচঞ্চল, তখন চলিত ক্রিয়া। হয়ত তিনি প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধুরীতিতে পত্র আরম্ভ করেছেন, তার পরেই কলম ছুটেছে বেগে—উন্মাদনার লাগাম ধরে। এমনও হতে পারে, তিনি মনে করেছিলেন—ভাব অনুযায়ী ভাষা হওয়া দরকার, এই নীতি কেবল শব্দচয়ন বা পদবন্ধে নয়, ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; তাই একই রচনার মধ্যে ক্রিয়াভেদ হওয়া দোষের নয়। এই নীতি যদি তিনি প্রথমদিকে সচেতনভাবে গ্রহণ করেও থাকেন (মনে হয় না তা তিনি করেছিলেন), কিছুদিনের মধ্যে বুঝেছিলেন যে, তা স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং হওয়া উচিতও নয়। তাই পরে যখন চলিত ভাষাকে সাহিত্যে প্রবর্তন করতে চাইলেন তখন থেকে পত্রে আদ্যন্ত চলিত ভাষা ব্যবহার করে গেছেন, যার ব্যতিক্রম কদাচিৎ ঘটেছে।

আমরা যতদূর দেখেছি—প্রকাশিত রচনায় স্বামীজী প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন উদ্বোধনে, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ (মে-জুন ১৮৯৯) সংখ্যায় "ভাববার কথা"য়। সেটি অবশ্যই কিছুদিন আগে লেখা হয়।

১৮৯৯-এর মাঝামাঝি সময়ের আগেকার পত্রাবলী এক নজরে দেখে নিতে পারি। আমরা দেখি যে, ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সালের প্রায় শেষপর্যন্ত সময়ের চিঠিতে পুরো সাধু-ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮৯৩ সালের একেবারে শেষে, ২৮ ডিসেম্বর, হরিপদ মিত্রকে লেখা একটি চিঠিতে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ আছে। বস্তুতঃপক্ষে চিঠি শুরু হয়েছিল সাধু দিয়ে কিন্তু অল্প পরেই চলিতের ফোয়ারা।৯১ লক্ষ্য করার বিষয়, এই চিঠি আমেরিকা থেকে লেখা। অর্থাৎ স্বামীজীর পত্রে চলিত ভাষার প্রথম প্রয়োগ বিদেশ থেকেই ঘটেছে।

১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত সময়ে বিদেশ থেকে স্বামীজী বাংলায় যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন, তার বেশির ভাগ চলিতে লেখা কিন্তু সাধুরীতিও আছে। একই চিঠিতে সাধু ও চলিত উভয়ই আছে; পুরো সাধুভাষার চিঠি আছে; পুরো চলিত ভাষার চিঠিও আছে। ধীর-স্থির ভাবে যখন নির্দেশ-উপদেশ দিয়েছেন তখন চিঠির ভাষা সাধু, কিন্তু যখন তেতে উঠেছেন অনর্গল মুখ ছুটেছে চলিতে।

আমাদের সন্ধানমতো, ১৮৯৬ জানুয়ারি মাসে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে লেখা একটি চিঠিতেই স্বামীজী পুরো চলিত বাংলা লিখেছেন, [উল্লেখযোগ্য, এঁকেই কয়েক মাস পরে, ১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬, একটি চিঠি পুরো সাধু বাংলায় লেখেন], যার মধ্যে বাংলা ইডিয়মের মুঠো-মুঠো বর্ষণ। কালগত গুরুত্বের জন্য এই পত্রের কিছু অংশ পুনশ্চ উদ্ধৃত করছি :

"চালাও কাগজ, কুছ্ পরোয়া নেই।...গুজ্‌গুজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ করে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব এমন মাচাবি যে দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন, কিন্তু কাজের বেলা 'খোঁজ খবর নহি পাওয়ে'।" [৬-২১০]

পত্রাবলীতে ভাষার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯-এর মাঝা-মাঝি—এই আড়াই বছরের চিঠিতে। পূর্ববর্তী ক্রমবর্ধিত চলিত রীতিকে পরিহার করে যেন, এই পর্বে স্বামীজী যথেষ্ট সংখ্যায় পুরো সাধুভাষায় চিঠি লিখেছেন—সাধু ও চলিতের

৯১ যেমন সূচনায় ছিল : "বাবাজি, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ" ইত্যাদি। কিছু পরেই : "বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জানো? শাক্ত মানে মদ-ভাঙ্ নয়; শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।" [৬-৩৮৪]

মিশ্রণ তো আছেই। পুরো চলিত চিঠির সংখ্যা অপেক্ষিকভাবে অল্প। একটা মোটামুটি হিসাব নিলে দেখা যায়, এই পর্বের ৪২টি বাংলা চিঠির ভাষানুপাত হচ্ছে—

পুরো সাধুভাষায়	—	২২
প্রধানতঃ সাধুভাষায়	—	৫
পুরো চলিতভাষায়	—	৩
প্রধানতঃ চলিতভাষায়	—	৭
সমপরিমাণ সাধু ও চলিতভাষায়	—	৫
		৪২

অকস্মাৎ ব্যক্তিগত পত্রেও স্বামীজীর সাধুভাষাপ্রীতির বাহুল্য কেন? ইতিপূর্বে পরিবেশিত তথ্য থেকে সে কারণ অনুমান করা যায়। স্বামীজী এইকালে সাধুভাষাকে নবরূপ দানের বাসনা বোধ করেছিলেন, সেই অভিপ্রায় তাঁকে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে পত্রেও সাধুভাষা প্রয়োগে প্রণোদিত করেছিল। তাছাড়া এই পর্বে তিনি ভারতে আছেন, সুতরাং অগ্নিময় ভাষায় পরিচিতজনদের উদ্দীপিত করার কাজটা প্রধানতঃ সাক্ষাতেই করছেন—চিঠিতে নির্দেশাদি যাচ্ছে, কখনো-বা চিন্তাপূর্ণ সমাজদর্শনাত্মক বক্তব্য, তাই ভাষা প্রায়শঃ সাধুরূপ নিয়েছিল। ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি সময় থেকে এই মনোভাবের সম্পূর্ণ বদল হয়ে যায়, তার প্রভাব পড়ে ভাষার উপর। তার রূপ কী—কিছু পরেই দেখব।

॥ ১৬ ॥ সাধু ও চলিত রীতি নিয়ে স্বামীজীর মনে দ্বন্দ্ব? তাঁর মধ্যে স্বতোবিরোধ?

একটি তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক প্রশ্ন এখানে উঠবে—১৮৯৭-১৮৯৯ সালে যখন স্বামীজী সাধুগদ্যরীতির চর্চায় ব্যস্ত, তখন কি তিনি স্বতোবিরোধিতার মধ্যে ছিলেন না? অবশ্যই কিছুটা ছিলেন, এবং তা তাঁর থেকে বেশি কেউ জানতেন না। পরিস্থিতি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সাহিত্যের ভাষারীতি বিষয়ে বিবেকানন্দের চিন্তার বিবর্তনের রূপটি আমরা দেখতে পাব, যার সবিশেষ গুরুত্ব আছে।

স্বতোবিরোধিতার কথা বলেছি এইজন্য যে, স্বামীজী বাংলায় গুরুভার সাধুগদ্য লেখার বহু আগে—

(ক) ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, ধর্মমহাসভায় "বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ" বক্তৃতায় বুদ্ধ-মহিমার অন্যতম হেতুরূপে বুদ্ধ-কর্তৃক জনগণের ভাষায় প্রচারের কথা বলেছিলেন :

"সকলের প্রতি, বিশেষতঃ অজ্ঞ ও দরিদ্রের প্রতি, অপূর্ব সহানুভূতিতে এই আচার্যের মহাগৌরব প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কিছু শিষ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধের শিক্ষাদানকালে সংস্কৃত আর ভারতের কথ্যভাষা ছিল না। সে ভাষা পণ্ডিতগণের পুস্তকেই আবদ্ধ ছিল। বুদ্ধের কিছু ব্রাহ্মণ শিষ্য তাঁর উপদেশাবলী সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করতে চান। কিন্তু তিনি স্পষ্ট দৃঢ়ভাবে তাঁদের বলেন—আমি এসেছি জনগণের জন্য, দরিদ্রদের জন্য। জনগণের ভাষাতেই আমি কথা বলব। তাই তাঁর অধিকাংশ উপদেশ পাওয়া যায় সেই সময়কার চলিত ভাষায়।"[১-৩১]

১৮৯৬, ২৪ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে স্বামীজী যে-বক্তৃতা করেন (অনুরূপ বক্তৃতা করেন ঐ বৎসরের শেষের দিকে লণ্ডনে) তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিতান্ত সহজ ভাষা কিভাবে সকলের হৃদয় বিদ্ধ করত, সে বিষয়ে বলেছিলেন :

"এই অপূর্ব লোকটিকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে হাজার-হাজার লোক আসত।

তিনি সরল গ্রাম্য ভাষায় কথা বলতেন, যার প্রতিটি শব্দ ছিল শক্তিপূর্ণ এবং আলোকপূর্ণ। কারণ, কী বলা হয়েছিল, বা কোন্ ভাষায় বলা হয়েছিল—সেটা মুখ্য ব্যাপার ছিল না—আসল কথা, ঐ ভাষার পিছনে ছিল কথকের ব্যক্তিত্ব, তার দ্বারা তাঁর উক্তিতে শক্তিসঞ্চার হত। এ জিনিসটা আমরা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে অনুভব করি। সময় বিশেষে আমরা অসাধারণ বক্তৃতা শুনি, অপূর্ব যুক্তিগ্রথিত আলোচনা শুনি—তারপর বাড়ি গিয়েই সবকিছু ভুলে যাই। আবার কোনো সময়ে হয়ত সহজতম ভাষায় কিছু শব্দ শুনলাম—সে-গুলি কিন্তু আমাদের জীবনে প্রবেশ করে গেল, আমাদের অস্তিত্বের অংগীভূত হয়ে গেল, যা স্থায়ী ফল প্রসব করতে লাগল।" [৮—৩৯৯]৯২

(খ) নিজের আচার্যভূমিকায় সাফল্যের অন্যতম হেতুরূপে তিনি স্ব-ব্যবহৃত ইংরাজির সহজতার কথা বলেছিলেন। ১৮৯৬, ১৭ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে সহজতম ইংরাজিতে গভীরতম সত্যকে পরিবেশন করাকে নিজের অন্যতম জীবনব্রত বলেছিলেন, তা আগেই দেখিয়েছি।

(গ) সাম্যবাদী বিবেকানন্দ গণমানুষের কাছে উপস্থিত হবার কথা অনেকদিন আগে থেকেই বলেছেন। জ্ঞানকে অধিকারভোগীরা তাদের সুকঠিন ভাষার আবরণে বেঁধে রেখেছে—তাকে সহজ ভাষায় ছড়িয়ে দিতে হবে হবে জনসাধারণের মধ্যে—একথা তাঁর সাধারণ প্রচারের বিষয় ছিল।

এখন প্রশ্ন—এসব সত্ত্বেও স্বামীজী গুরুভার সাধুভাষায় লিখলেন কেন? কারণগুলির মধ্যে থাকতে পারে :

(ক) পুরাতন অভ্যাসবশে। আযৌবন তিনি সাধুভাষায় লিখেছেন, এবং তৎকালীন বাংলাসাহিত্যের ভাষাও ছিল সাধু—তাকে অনুসরণ করেছিলেন।

(খ) সংস্কৃতজ্ঞ তিনি, ঐ ভাষারীতির গাম্ভীর্য সম্বন্ধে সচেতন; নিজের মনেও ছিল ক্লাসিক্যাল বাঁধুনি—এইসব জড়িয়ে সাধুরীতিই গ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল।

(গ) সাধুরীতিই যখন আপাততঃ একমাত্র গ্রাহ্য রীতি, তার পরিবর্তনের কথা ওঠে না, তখন ঐ রীতিকে নানাশক্তিতে ভূষিত ক'রে, সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী ক'রে, গড়তে হবে—এই চিন্তাতে তিনি সাধুরীতিকে গ্রহণ করেছিলেন। (এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পূর্বে বহুভাবে আলোচিত হয়েছে)।

৯২ আচার্যদের ভাষার বিরাট শক্তির কথা তিনি পরবর্তীকালেও বলেছেন। ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০, আমেরিকায়, "জগতের মহত্তম আচার্যগণ" বক্তৃতায় বলেছিলেন : "আচার্যগণ যখন কথা বলেছেন, সমগ্র জগৎ সেকথা শুনতে বাধ্য হয়েছে। তাঁদের প্রতিটি শব্দ প্রত্যক্ষ তীক্ষ্ণ, ভিতরে ঢুকে বোমার মতো ফেটে পড়ে। কথার পিছনে যদি শক্তি না থাকে তার মূল্য কি? কোন্ ভাষায় বলছ, কিভাবে ভাষাবিন্যাস করছ, তাতে কি এসে যায়; শুদ্ধ ব্যাকরণে কিংবা সুন্দর অলংকারের সংগে বলছ কিনা, তাতেই বা কি? আসল কথা—তোমার কিছু দেবার আছে কি না?...তা যদি থাকে, দাও। শব্দগুলি তো বাহন মাত্র।" ৮—২৯২-৯৩]

১০ মার্চ, ১৯০০ সানফ্রানসিসকোয় প্রদত্ত "বুদ্ধের বাণী" বক্তৃতায় আচার্যদের সহজ ভাষার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেছিলেন : "যীশুর 'সারমন্ অন দি মাউন্ট' এবং কৃষ্ণের গীতার কথাই ধরো না কেন—কী সহজ! পথচারী পর্যন্ত তাদের বুঝতে পারে। কি মহান! তাদের মধ্যে সত্য অতি সহজভাবে এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কিন্তু উঁহু, পুরোহিতরা কখনো এত সহজে প্রকাশিত সত্যকে স্বীকার করে? তাদের যে দু'হাজার স্বর্গ এবং দু'হাজার নরকের কথা শোনাতে হবে।" [৮-৩২৪]

স্বামীজী অবশ্যই জানতেন, পৃথিবীতে লেখকমাত্রে আচার্য নন, সুতরাং সহজ ভাষার ঐ শক্তি তাঁদের থাকতেও পারে না। সাহিত্যের শিল্পরূপের কথাও যে তাঁর জানা ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এখানে তিনি আদর্শের একটি রূপের কথাই উত্থাপন করেছেন—প্রাণহীন আলংকারিকতার বিরুদ্ধে।

স্বামীজী এই সময়ে কিছু ধাক্কা খেলেন। তাঁর ভাষার দুরূহতার বিরুদ্ধে নিজ মহলেই সমালোচনা হল। বাইরে তো হলই। হয়ত বুঝলেন, পরীক্ষার ঝোঁকে এমন-কিছু দুষ্পাচ্য শব্দ গ্রহণ করেছেন, সেইসঙ্গে অতিকঠিন রীতি নিয়েছেন, তা বাঙালীর ধাতু সহ্য করতে সমর্থ নয়। তদুপরি নিশ্চয় সচেতন হয়ে উঠেছিলেন—আচার্যের কথায় ও কাজে ব্যবধান সম্বন্ধে। তিনি নিজে জনসাধারণের ভাষায় জ্ঞানবিস্তারের কথা এত বলেন—সেই তিনিই সে-পথ ছেড়ে দিয়েছেন—কিংবা গ্রহণই করেন নি!! কোথায় গেল তাঁর "ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে"—এই আদর্শ?

আর একটি গভীর সত্য তিনি অবশ্যই আগে কেন বোঝেন নি বলে আত্মধিক্কারও দিতে পারেন। বিস্ময়কর হল—স্বয়ং প্রফেট যিনি, কালপ্রয়োজন পূরণের জন্য যাঁর আবির্ভাব—তিনি কালগতির বিষয়ে অনবহিত ছিলেন! স্বামীজী যেন অকস্মাৎ বুঝলেন—তিনি বা অন্যে চান বা না-চান, তবু মৌখিক, বাগ্‌ভঙ্গি সাহিত্যে প্রবেশ করবেই। যা অনিবার্য তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, জীবনগতির উপযোগী ক'রে, তার প্রবর্তন করাই হল প্রগতিশীলতা। কালসত্যের মধ্যে নিত্যসত্যের সঞ্চার করাই তো প্রবর্তক পুরুষদের কর্তব্য।

এই রকম একটা মানসিক অবস্থায় স্বামীজী চলিত ভাষা লিখতে শুরু করলেন। বিশেষতঃ তাঁর গুরুর ভাষা তাঁর কাছে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কাজ করল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ উপদেশ সংকলন করছিলেন। উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যা থেকে ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত "পরমহংস-দেবের উপদেশ" প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল। ধরে নিতে পারি, ব্রহ্মানন্দ সেগুলি স্বামীজীকে দেখিয়ে যাচাই করে নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের উপদেশের সেই ভাষায় কী সহজতা, তীক্ষ্ণতা এবং গভীরতা।৯৩ শ্রীমও এই সময়ে বাংলায় কথামৃত প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। সে রচনাও তিনি স্বামীজীকে প্রকাশের পূর্বে দেখাতে পারেন। কিছুদিন আগেই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব সরল ভাষার কথা পাশ্চাত্ত্যে বলে এসেছেন; যৌবনে রামকৃষ্ণ-উক্তির কিছু-কিছু তিনি ব্রাহ্ম পত্রপত্রিকায় সংকলিত দেখেছেন; সুরেশ দত্তের বইয়ে রামকৃষ্ণ উপদেশের সংকলন আমেরিকায় থাকাকালে তাঁর হাতে পৌঁছেছে; পাশ্চাত্ত্যে থাকাকালেই ম্যাক্সমুলারকে পাঠাবার জন্য রামকৃষ্ণ-বাণীর অনুবাদে তাঁকে সাহায্য করতে হয়েছে—এখন তার সুষ্ঠুতম প্রকাশ দেখলেন ব্রহ্মানন্দের সংকলনে এবং শ্রীম'র সংগ্রহে। বরেণ্য এই ভাষা—তিনি অবশ্যই মনে করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্ন ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরু-গম্ভীর বিষয়কে ভাষারূপ দেবার সমস্যাও ছিল, চলিত ভাষা শিষ্ট সাহিত্যরূপে গৃহীত হতে পারে কিনা, সে দ্বিধাও ছিল—সুতরাং স্বামীজী একই সঙ্গে সাধু ও চলিত দুই ভাষাতেই লিখতে লাগলেন এবং উদ্বোধন পত্রিকায় একত্রে তা প্রকাশিত হতে লাগলও।

পাক্ষিক উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যায় (মাঘ ১৩০৫) স্বামীজীর "প্রস্তাবনা", তৃতীয় সংখ্যায় "জ্ঞানার্জন," পঞ্চম সংখ্যায় "রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি"—সবই সাধুভাষার প্রবন্ধ।

---

৯৩ উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যায় "স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত" "পরমহংসদেবের উপদেশ"-এর নিম্নে উদ্ধৃত অংশ পড়লেই বোঝা যাবে—বাংলা চলিত ভাষার শক্তি ও সামর্থ্য কতখানি। এই উপদেশ উদ্বোধনে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়ে গেছে :

"রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে। তুমি এক ডুবে পেলে না বলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করো না। সেইরূপ একটু সাধন-ভজন করে ঈশ্বরদর্শন হল না বলে হতাশ হয়ো না। ধৈর্য ধরে সাধন কত্তে থাকো, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপর হইবে।

"তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই? যেমন সতীর পতিতে—কৃপণের ধনেতে—বিষয়ীর বিষয়েতে। এই রূপ টান যখন ভগবানের প্রতি হয়, তখন ভগবান লাভ হয়।

"মৌমাছি যতক্ষণ ফুলের চারিদিকে গুন্‌গুন্ করে, ততক্ষণ সে মধু পায় নাই। মধু পেলে সে আর গুন্‌গুন্ করে না, চুপ করে মধু পান করে। মানুষ যতক্ষণ ধর্ম লয়ে গোল করে, ততক্ষণ সে ধর্মের আস্বাদ পায় নাই—পেলে চুপ করে যায়।"

ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক বেরুতে থাকে সাধুভাষায় "বর্তমান ভারত।" পর পর তিন সংখ্যায় তা বেরোয়। নবম সংখ্যায় "বর্তমান ভারত" বেরোয়নি। কিন্তু ঐ সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল শ্রীম-সংকলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—বিদ্যাসাগর-সংবাদ। এর মধ্যে শ্রীম'র বর্ণনার ভাষা সাধু, বিদ্যাসাগরের উক্তিও সাধুতে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি একেবারে চলিত ভাষায়। দশম সংখ্যায় আবার বেরুল "বর্তমান ভারত"—সেই সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল নিতান্ত চলিত ভাষায় স্বামীজীর লেখা নক্সা—"ভাববার কথা" (তখন লেখকের নাম লেখার সঙ্গে ছিল না, পরে বাৎসরিক সূচীপত্রে স্বামীজীর নাম দেওয়া হয়)। "বর্তমান ভারত" ছাড় দিয়ে-দিয়ে বেরুতে থাকে। প্রথম বর্ষের ১৪শ সংখ্যায় আর এক দফা চলিত ভাষায় "ভাববার কথা"র নক্সা-রচনা বেরোয়। তারপর ১৫শ সংখ্যা থেকে বেরুতে থাকে সাহিত্যের ইতিহাসে ক্রান্তি-কারী স্বামীজীর রচনা "বিলাতযাত্রীর পত্র" (পরে যার নাম পরিবর্তিত হয়ে "পরিব্রাজক" হয়)। অতঃপর চলিত ভাষায় "বিলাতযাত্রীর পত্র" ও সাধুভাষায় "বর্তমান ভারত" ক্রমান্বয়ে বেরুতে থাকে। দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় "বর্তমান ভারত" সমাপ্ত হয়। তার আগে স্বামীজীর "বাংলা ভাষা" নামক পত্র-প্রবন্ধ ২য় বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় বেরিয়ে গেছে। তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে চলিত ভাষায় স্বামীজীর আর এক অসাধারণ রচনা "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য" বেরুতে থাকে। অতঃপর "পরিব্রাজক" ও "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য" বেরিয়ে যায় ক্রমান্বয়ে।

॥ ১৭ ॥ বিবেকানন্দের চলিত গদ্য সম্বন্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া

চলিত ভাষায় স্বামীজীর নামাঙ্কিত লেখা বেরুনা-মাত্র সমালোচনার ঝড় উঠল। প্রশংসা প্রায় নেই, কেবলই নিন্দা আর নিন্দা। নিন্দা প্রায় আক্রোশের রূপ ধরেছিল। বিবেকানন্দ-স্বামী ধর্মনেতা—গুরুগম্ভীর শাস্ত্রবচন আউড়ে যাবেন, এবং দেশকে প্রাচীনের বন্ধনে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধবার জন্য আপ্রাণ করবেন—সেই তিনি কিনা ইতর ভাষাকে ছাপার অক্ষরের রাজবেশ দিয়ে দিলেন—সর্বনাশ!! বিবেকানন্দের অনেক আচার-আচরণ ইতিমধ্যেই অনুচিত ঠেকেছে, তার সঙ্গে আবার এই সংস্কৃতি-নাশক কেলেঙ্কারি! ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিনকার অবস্থার কিছু বিবরণ দিয়েছেন :

"প্রাচীনপন্থী, সংস্কৃত-ধারার অনুগামী সমালোচকেরা সাধারণ কথ্যভাষায় রচিত তাঁর লেখা সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। এসব গুরুচণ্ডালী ইত্যাদি দোষে দুষ্ট বলে তাঁরা মুখর হয়ে উঠলেন।...হিতবাদীর সহ-সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মীদের কাছে এই দুই লেখকের [রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ] বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁদের দল 'উদ্বোধন'কে 'উদ্বন্ধন'-রূপ উচ্চারণ ক'রে, সাহিত্যের উদ্বন্ধন হচ্ছে) বলে ঠাট্টা করতে শুরু করলেন। এমনকি 'বঙ্গহিতৈষী'র মতো ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পর্যন্ত হিতৈষীর সুরে, স্বামীজীকে বাংলা রচনার সম্পর্কে তাঁর গুরুভাই সারদানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্য পরামর্শ দিলেন। রক্ষণশীল সাহিত্যিক মহল হতে তাঁর রচনাশৈলী সম্বন্ধে এল উন্নাসিক সমালোচনা এবং তাঁর বাংলা জ্ঞানের অভাবের জন্য পরোক্ষ পিঠ-চাপড়ানোর মনোভাব।"৯৪

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিবেকানন্দের অনুরাগী ছিলেন। 'বর্তমান ভারতের' কোন প্রশংসা তিনি করেছেন, তা আমি দেখেছি। তিনিও বিচলিত হলেন, কটাক্ষ করলেন, যদিও তাতে সম্ভ্রমের চিহ্ন ছিল। সাহিত্য পত্রিকায় কার্তিক ১৩০৬ সংখ্যায় তিনি লিখলেন :

"উদ্বোধন। আশ্বিন। 'বিলাতযাত্রীর পত্র' স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত। স্বামীজীর পত্র-সমূহ চিত্তাকর্ষক এবং তাঁহার বহুদিন সঞ্চিত বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যে পরিপূর্ণ

কিন্তু পত্রের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এই সকল পত্রে অসংযত চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কি উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। বিশুদ্ধ ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল ও সর্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে।"

সাহিত্য পত্রিকার বৈশাখ ১৩০৮ সংখ্যায় সমাজপতির মন্তব্যে ছিল "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের" জ্ঞানবস্তুর সমূহ প্রশংসা, তৎসহ ভাষারীতির বিষয়ে মনোরম কটাক্ষ :

"উদ্বোধন। চৈত্র—পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা।...পঞ্চম সংখ্যার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' প্রবন্ধ উপাদেয়। লেখক স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এই সন্দর্ভে বিবিধ রত্ন ঢালিয়া দিতেছেন। আমরা স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যিনি না পড়িবেন, তিনি বঞ্চিত হইবেন। স্বামীজী ইচ্ছা করিয়া রচনাটিকে গ্রাম্যভাষার পরিচ্ছদ দিয়াছেন। চলিত গ্রাম্যভাষা নহিলে যে সাধারণ বাঙালী বুঝিত না, এমন মনে হয় না। যে-সকল পাঠক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন, প্রাঞ্জল সাধুভাষা তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিত না। 'রাখাল বেশে' এই জ্ঞানগর্ভ রচনাটির সৌন্দর্যহানি হইতেছে।"

তৎকালীন বাংলা সাহিত্যজগতের এক নায়কের লেখায় এই-যে সুবিহিত সমালোচনা—এ বস্তু উৎসাহী ক্ষুদ্র পত্রিকাতে পাওয়া সম্ভব নয়।৯৫ বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি, নানা পত্র-পত্রিকায় স্বামীজীর ভাষার সমালোচনা হয়েছিল। 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩০৭ সংখ্যায় লেখা হয় :

"রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যবৃন্দ যে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ছেব্‌লামি ভালো দেখায় না। 'বিলাতযাত্রীর পত্র' আবার স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রেরিত' শ্লীপদের উপর বিস্ফোটক! 'কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন করে সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র, ভিন্ন-দেহ, ছিন্ন-হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগলো...সব জিনিষেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো।' বেদান্ত আজ পেটের দায়ের কাছে 'প্রায়' মাটি। ধন্য বিবেক। একটা গল্প বলিব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় একজন পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তিনি সকল ভাষাই জানিতেন। কথা হইল তিনি কোন্ দেশের লোক ধরিয়া দিতে হইবে। কেহই সক্ষম হইলেন না। শেষে রাজা নিরুপায় হইয়া গোপাল ভাঁড়কে বলিলেন। পণ্ডিত যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন গোপাল গিয়া পৃষ্ঠে এক সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করেন। পুঙ্গির পুৎ 'কেডা' বলিয়া একেবারে পণ্ডিত চটিয়া উঠিয়া পড়িলেন। রহস্য বাহির হইল।"

জাতীয় চরিত্রের নির্ভেজাল নমুনা! একই পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০৮ সংখ্যায় তেমন আর একটি মন্তব্য, যাতে করুণা ও মুরুব্বিয়ানার রসান আছে :

"উদ্বোধন।...ইহারা একটি নূতন সন্ধান পাইয়াছেন। বড় অক্ষরে লেখা—'স্বামী বিবেকানন্দ প্রধান লেখক।' তার নীচে ছোট অক্ষরে—'সম্পাদক—স্বামী ত্রিগুণাতীত।' অর্থাৎ প্রধান

৯৫ মাসিক 'নবপ্রভা' অবশ্য স্বামীজীর অনুরাগীই ছিল। সে ফাল্গুন ১৩০৭ সংখ্যায়—উদ্বোধনে প্রকাশিত, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে'র অন্তর্গত স্বামীজীর আহার বিষয়ক রচনা উদ্ধৃত করে। 'পুণ্য' পত্রিকা আবার নবপ্রভার দ্বারা উৎকলিত ঐ অংশের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে স্বামীজীর মতের আংশিক সমর্থন ও আংশিক সমালোচনা করে।

• উদ্বোধন সম্পর্কে সমাদরের মনোভাব 'নবপ্রভা' পরেও বজায় রেখেছিল। অগ্রহায়ণ, ১৩১০ সংখ্যায় উদ্বোধন-প্রসঙ্গে সে মন্তব্য করে : "ইহা সেবাব্রতী কর্মিগণের পত্র। যেখানে কর্ম বিদ্যমান, যেখানে চিন্তা তেজস্বিনী—সেখানে সাহিত্যের সামগ্রীর অভাব নাই। কর্ম চিন্তাতে পরিণত, কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডে পরিণত। আবার কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই, ভক্তিকাণ্ডে বিকশিত। বিশুদ্ধ কর্ম—উপাসনা; জ্ঞানও—উপাসনা।...বিহিত কর্ম যে-পরিমাণে জাতীয় জীবনকে অধিকার করিবে, সেই পরিমাণে জাতীয় সাহিত্য উন্নতিলাভ করিবে।"

লেখক সম্পাদক হইতে বড়। এ কথাটা ঠিক, এবং সকল সম্পাদকও জানেন আর সকল লেখকও জানেন কিন্তু এরূপভাবে কেহ কথাটা প্রকাশ করেন নাই, এখন বেশ হইল। প্রধান লেখকেরা এক্ষণে আশ্বস্ত হইবেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, নাম প্রকাশ করিতে দিবেন কি? উদ্বোধনের কথা ছাড়িয়া দিন। উঁহারা সব ত্যাগীর দল। যাহা হউক চৈত্র মাসের উদ্বোধন পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রথম প্রথম যে খোঁচা দিতাম, তাহার ফল এতদিনে ফলিয়াছে।...'প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য' সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না—প্রবন্ধ শেষ হয় নাই। কিন্তু শুরু—History of civilization যেরূপ গড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাল কাটিয়া যাইবারই কথা। আমরা এরূপ ভাষার পক্ষপাতী নহি। এরূপ ভাষা আখ্যানবস্তুর উপর অনাদর আনে। ভাষা সরল সারিতে হইবে বলিয়া গ্রাম্য সারিতে হইবে এমন কিছু কথা নাই।"৯৬

উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত এইসব সমালোচনায় নাড়া খেয়েছিলেন। তথাপি শক্তিশালী পুরুষ তিনি, নিন্দা-কোলাহলের মধ্যে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর চলিত গদ্যের চরিত্র এবং কার্যকারিতা প্রমাণে অগ্রসর হয়েছিলেন। স্বামীজীর "বিলাতযাত্রীর পত্রের" প্রকাশ আরম্ভ হবার চার মাসের মাথায়, ১ পৌষ, ১৩০৬, থেকে তিনি কয়েক সংখ্যায় "সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সমালোচনা" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, যার মধ্যে চলিত ভাষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিষদের বার্ষিক সভায় এক দীর্ঘ ভাষণ দেন, যা পরিষৎ-পত্রিকার দুই সংখ্যায় বেরোয়। সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিবরণের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ উক্ত ভাষণে বাংলা ভাষা ও তার ব্যাকরণ নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই ত্রিগুণাতীত প্রবন্ধটি লেখেন। বিশেষ মূল্যবান এই প্রবন্ধ, দৃঢ় ও তীক্ষ্ন চিন্তায় পূর্ণ। বাংলা ভাষা-তাত্ত্বিক আলোচনার ইতিহাস যদি কেউ লিখতে চান, তাঁর পক্ষে এটি অবশ্যপাঠ্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের মধ্যে ত্রিগুণাতীত চলিত ভাষার পক্ষে যুক্তিবিস্তার করেছিলেন এবং স্বামীজীর চলিত ভাষারূপের উপর মন্তব্যও করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতাটিকে "যথার্থই সভাপতি-সমুপযোগী" বলে চিহ্নিত করার পরে, বক্তৃতাটির ভাষার বিষয়ে স্বামী ত্রিগুণাতীত যা বলেন, তার মধ্যে বিবেকানন্দের চলিত ভাষা-বিষয়ক বক্তব্যের প্রতিধ্বনি ও সমর্থন ছিল :

"[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের] বক্তৃতাটির ভাষা অতি স্বাভাবিক, সুললিত, মধুর এবং নূতন ধরনের। এরূপ ধরন বাংলাগদ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিবে। ভাষা যতই স্বাভাবিক হইবে ততই মিষ্ট ও প্রশংসনীয়। যে-ভাষায় মন ও মুখ এক করিয়া বলা বা লেখা যায়না, সে ভাষা ভাষাই নয়। সে ভাষা সরল ভাষা নয়—কপট। মনে ভাবছি এক—হয়ত মুখে কইছি এক—আর লেখবার সময় লিখছি আর এক। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, সভ্য ক'রে, হয়ত এমন এক লিখতে হল যে, যাকে লিখছি সে মূর্খতাবশতঃ বুঝতেই পারিল না। হয়ত এমনও হইতে পারে—ভাবছি যা, লেখবার সময়ে আর তা বেরুচ্ছে না। কেমন করে বেরুবে বলুন—বলবার ভাষা একরকম, আর লেখবার ভাষা আর একরকম কিনা।...অথবা সে ভাবের ভাল শুদ্ধ কথা আপনাদের বাংলা ভাষাতেই নেই—হয় কটমট সংস্কৃত কথা, না-হয় অন্য বিদেশীয় কথা; না হয়ত-বা আমার সেই গাঁওয়ারী কথাই ব্যবহার করিতে হয়। এরূপ স্থলে ভাষাকে অথবা লেখককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক, তা না-হলে ভাষার উন্নতি হয় না, ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ পায় না, বিশেষ, ভাষার শৈশব অবস্থায়। আগে ইহাকে গা ঝাড়িয়া উঠিতে দিন, তারপর

৯৬ অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় 'পূর্ণিমা'র লেখাগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এইসঙ্গে 'বিক্রমপুর' পত্রিকার কিছু সংবাদ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

ডালপালা বা অদরকারী অথবা অনিষ্টকারী পদার্থগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে চলিতে পারে।

"আর এক কথা—আমাদের হচ্ছে মাতৃভাষা, আমাদের নিজের ভাষা—আমরা যেমন করে পারি বলব কইব ও লিখব। যাঁহাকে লিখিব তিনি বুঝিতে পারিলেই হইল—ভাষার আদত কার্য সেইখানেই হইয়া গেল। তারপর, শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিয়া, অলঙ্কারাদি প্রয়োগ করিয়া, অলকা তিলকাদি দিয়া, ভাষাকে সাজানো যায়—সে খুব ভালো কথা—অধিকন্তু ন দোষায়, বরং সেটা গৌরববৃদ্ধিরই কারণ হইবে।"

ত্রিগুণাতীত এই প্রবন্ধে ভাষার প্রধানতঃ চার শ্রেণীবিভাগ করেছেন : (১) উচ্চ ধরনের, (২) মধ্যম ধরনের, (৩) চলিত, এবং (৪) গ্রাম্য বা গাঁওয়ারী। এদের দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েছেন। এ ছাড়াও ভাষার অন্যান্য ধরনের উল্লেখ করেছেন : (১) উচ্চ-মিশ্র, (২) মধ্যম-মিশ্র, (৩) চলিত-মিশ্র, (৪) উচ্চ-বিমিশ্র। ত্রিগুণাতীত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাষাকে শেষোক্ত উচ্চ-বিমিশ্র শ্রেণীতে স্থাপন করেছেন, যাতে "সর্বপ্রকার ধরনই ব্যবহার হয়—উচ্চ, মধ্যম, চলিত এবং এমন-কি স্থলবিশেষে গাঁওয়ারী পর্যন্ত।" তারপর লিখেছেন :

"উচ্চ-বিমিশ্র ধরনের লেখায় সর্বপ্রকার রসেরই আস্বাদ পাওয়া যায় এবং অতি সুমধুর লাগে। উহারই মধ্যে যাঁহারা একটু বিশেষ প্রতিভাশালী লেখক তাঁহারা প্রায়ই এই উচ্চ-বিমিশ্র ধরনে লিখিয়া ভাষার শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি করেন।...তাঁহারা উচ্চচেতা, তাঁহাদিগের প্রশস্ত হৃদয়; সকলকেই তাঁহারা স্থান দিয়া থাকেন।...যিনি বাজাতে জানেন, তিনি মাটির হাঁড়িই এমন বাজাইবেন যে, তাক্ লাগাইয়া দিবেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলিতেছেন, 'ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতে হয়—একদিকে সার্বভৌমিক ব্যাকরণ, আর একদিকে দেশীয় চাষাভূষা এবং অন্তঃপুরমহলের ব্যাকরণ—সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রকৃত ব্যাকরণ; আর একদিকে খাস সংস্কৃত ব্যাকরণ। এই তিন ব্যাকরণের ত্রিবেণী সঙ্গমকে আদর্শ করিয়া একখানি সুপাঠ্য ও সমীচীন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলা হইলে ভাল হয়।' আর একস্থলে বলিতেছেন, 'আর তাহার [ব্যাকরণের] মহৎ দোষ হচ্ছে—চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী দীন-হীন শব্দগুলির প্রতি হতশ্রদ্ধা।' আরও একস্থলে বলিতেছেন, 'বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে বর্বর ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞ লোকের কার্য, যেহেতু সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই সংস্কৃতের সন্তানসন্ততি।' আরও বলিতেছেন, 'স্থলবিশেষে সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশি কার্যকরী হয়। কেহ যদি বলে—অমুক কথাটার বন্ধন শিথিল—তবে সে বাক্যটির অর্থ উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে যদি বলে যে—অমুক কথাটার বাঁধুনি আলগা—তবে তাহার অর্থ বুঝিতে শ্রোতার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না।' কথাগুলি যাহা বলিয়াছেন—অতি সমীচীন।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের ভাষারূপ, শব্দপ্রয়োগ নিয়ে ত্রিগুণাতীত বেশ-কিছু খুঁটিনাটি আলোচনা করেছিলেন। "হচ্চে, যাচ্চে" ইত্যাদি ঘরোয়া প্রয়োগ "সুশিক্ষিত পণ্ডিতগণের রুচিবিরুদ্ধ হইবে"—তা স্বীকার করার পরে তিনি বলেন (স্বামীজীর যুক্তির অনুসরণেই)—ঐ প্রকার প্রয়োগ যেহেতু কলকাতায় প্রচলিত তাই সাহিত্যে স্বীকার্য—যেমন ঘটেছে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে। "ইংরাজরাজ্যের সর্বত্রই লণ্ডনের উচ্চারণ ও ব্যবহারাদিই প্রচলিত হয়।" তিনি এইসঙ্গে "প্রসিদ্ধ গভীর চিন্তাশীল লেখকদের" প্রয়োগ যদি আপাততঃ আপত্তিকর মনে হয়, তথাপি কালক্রমে তা চলে যায়—তাও বলেছিলেন। সংস্কৃতেও এ-ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। সেখানে এমন অনেক প্রয়োগ আছে যা ব্যাকরণ-সিদ্ধ নয়, তবু প্রচলিত, কারণ সেগুলি "শিষ্টপ্রয়োগসিদ্ধ।" ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বলেছেন : "সুশাসিত বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ হিন্দুসমাজে যখন 'যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে জীবাস্থি-বিশোধিত শর্করা পর্যন্ত' ব্যবহার হইল,

তখন সামান্য বঙ্গভাষায়, 'হইতেছে, যাইতেছে'র পরিবর্তে স্থানে-স্থানে যে 'হচ্চে যাচ্চে' চলিয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য কি?"

স্বামীজীর চলিত গদ্যের চমৎকার কিছু নমুনা ত্রিগুণাতীত সংকলন করে দিয়েছিলেন (ঐ সুপরিকল্পিত নির্বাচনের প্রশংসা করতে হয়)। তারপর সংকলন করেছিলেন কিছু বাগ্‌রীতি, ও চলিত শব্দ। তার মধ্যে দিব্যি ঢুকে আছে সদ্যগৃহীত ইংরেজি শব্দও। যথা: "খুশির সওদা; নাম নিশানা; বেজায় জেদ; খোঁজখবর; ওলটপালট; চোর-ছ্যাঁচড়; মাপ-জোপ; হারজিৎ; তাড়াহুড়া; চাষাভুষো; আশেপাশে; ছেঁটেছুটে; ছুঁতে না ছুঁতেই; ছোরার চকচকানি; হিঁদুর হিঁদুয়ানি; প্রাণ থরহরি; বাগে পেলেই; তোপের তালিম; ময়দানি জঙ্গ; দরিয়াই জঙ্গ; ফেটে ফুটে চৌচাকলা; তিগ্ করে ছাড়া; কিস্তি বানচাল; বাঁশের পাটাতন; হালে পানি পায় না; ধুলোয় কালোয় মেশামেশি; এক ছুটে চোঁচা দেশের দিকে; হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা; সিভিল ওয়ারের সময়; দেওয়ালগুলিতে আইভরি পেণ্ট লাগানো; রবার টায়ারের দিনে; বেলকুল; গারদ; রকমারি; একদম্; তফাৎ; পয়দা; বড় আরাম; বড় খারাপ; ফি (প্রতি অর্থে); ঢঙ; ক'রে নিও; কারবার; রোজই যাহক্; খানিক; বেচারা।"

ত্রিগুণাতীত তাঁর লেখায় সাহিত্য পরিষদের সংগঠন সম্বন্ধে যা প্রস্তাব করেছিলেন, তা যে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার অনুসরণে, তাতেও সন্দেহ নেই। গণশিক্ষা বিস্তারের পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যকেই ত্রিগুণাতীত বাংলাসাহিত্য প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। সাহিত্যকে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির আস্বাদনের বস্তুতে আবদ্ধ না রেখে তার রসের প্রবাহ ছড়িয়ে দিতে হবে সমস্ত দেশের শিরায়-উপশিরায়, এবং সেকাজ গ্রহণ করতে হবে সাহিত্য পরিষদকেই। "তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্যকে কি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা সাহিত্য পরিষদের শোভা পায়?"—ত্রিগুণাতীত প্রশ্ন করেছিলেন। "দু-একটি বাক্য-সর্বস্ব বঙ্গীয় বৃদ্ধ কর্তৃক...বিশ মাসে বৎসরান্তে, পরিষদে ঊর্ধ্বসংখ্যা অর্ধঘণ্টার জন্য কষ্টে-সৃষ্টে বাতিজ্বালার" কাজে পরিষদ যাতে পরিসমাপ্ত না হয়—সেই আশা প্রকাশ ক'রে, ত্রিগুণাতীত প্রস্তাব করেছিলেন—বাংলার প্রতি জেলায় "জেলা-সভা" স্থাপিত হোক, সেই জেলা-সভার অধীনে "উপনগর সভা" হোক। সুযোগ্য সাহিত্য-প্রচারকেরা নানাস্থানে পরিভ্রমণ করুন। তাঁরা "দুই হস্তে চতুর্দিকে দূরে-দূরে সাহিত্যবীজ ছড়াইয়া দিন।...বঙ্গের ঘরে-ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে যাহাতে স্বদেশীয় সাহিতচর্চা হইতে থাকে তাহারই চেষ্টা আবশ্যক। অসীম সাহিত্যজগতে তবেই যদি বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রাধান্যলাভ সম্ভবপর হয়। সাহিত্যের তারতম্যেই অনেকে সভ্যতার তারতম্য বিচার করিয়া থাকেন।" ত্রিগুণাতীতের আরও প্রস্তাব ছিল, "সাহিত্যানুরাগী চাষাভুষাগণের ভিতর যথেষ্ট পারিতোষিক বিতরণ হউক।" তিনি এইসঙ্গে বিভিন্ন জেলা-সভা ও উপনগর-সভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে স্থানীয় কথোপকথনের ভাষারূপের সংকলন, সেইসঙ্গে বাংলার নানাস্থানে প্রচলিত যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধীয় শব্দাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত—তাও বলেছিলেন।

১৭ ত্রিগুণাতীত তাঁর এই প্রবন্ধে বিস্ময়কর মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সকল চিন্তাকে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, সেকথা বলছি না, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির প্রগতিশীলতা স্বামীজীর কাছ থেকেই পাওয়া, তাতে কে সন্দেহ করবে? দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-সকল প্রস্তাব তাঁর ভাষণে করেছিলেন, তাদেরই সূত্রে ত্রিগুণাতীত তাঁর নিজের সংশোধনী কথাগুলি বলেন। যাতে ছাত্রদের প্রাণবধ না হয়—এমন একটা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা দ্বিজেন্দ্রনাথের মতোই ইনিও স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণকে যুক্ত রাখলে (যা ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রস্তাব) ছাত্রবধ ঘটবেই—সেকথাও সতর্ক করে বলেন। মারাত্মক রকম প্রগতিশীলতা দেখিয়ে বলে-ছিলেন: "যেরূপ লাটীন ও ইংরাজি, তদ্রূপ সংস্কৃত ও বাংলা সম্পূর্ণ পৃথব হইয়া গেলে এমন কি ক্ষতি হইবে? বরং স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দরুন বাংলাভাষার কি বিশেষ উন্নতি হইবে না?" এমন বিপজ্জনক আধুনিকতা যাঁর, তাঁর পক্ষে বাংলার দুটি 'ব', 'ন', 'জ', 'ই' 'উ' এবং তিনটি 'শ'-এর

॥ ১৮ ॥ স্বামীজীর দিগ্‌-নির্ণায়ক রচনা—"বাংলা ভাষা" : চলিত ভাষার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা

ত্রিগুণাতীত এইসঙ্গে স্বামীজীকে নানা মহলে তাঁর চলিত গদ্যের বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা হচ্ছিল, তা জানিয়ে চিঠি লেখেন। উত্তরে ছুটে এসেছিল পত্রের অগ্নিবাণ। সেটিই ইদানীং-খ্যাত স্বামীজীর "বাংলা ভাষা" প্রবন্ধ—উদ্বোধনের ১৫ চৈত্র, ১৩০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত। ["স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।...২০শে ফেব্রুয়ারি লস্‌ এঞ্জেলস্‌ থেকে লিখিত।"]

সংখ্যা কমিয়ে একটি রাখার প্রস্তাব এমন-কিছু ব্যাপার নয়—এবং সত্যই সে প্রস্তাব তিনি করেছিলেন, কারণ, "বাংলা ব্যাকরণ রীতিমতো বাংলা চলিত প্রথা অনুযায়ী প্রণয়ন করিতে হইলে, আগাগোড়া সংস্কার করিতে হয; ইহার আলফা বিটা অর্থাৎ ক খ হইতে সেই পংকচিউএশন (যতি-চিহ্ন পর্যাধ্যায়) পর্যন্ত পঙ্কোদ্ধার করিতে হয়। ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়—বর্ণমালা সম্বন্ধীয়। সেই বর্ণমালার সংশুদ্ধিই তো প্রথমে আবশ্যক।" ত্রিগুণাতীত, "পঙ্কোদ্ধার" প্রয়াসে বর্ণসংখ্যা কমানো, ও যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করার প্রস্তাব করেন—"উদ্বোধন"-কে "উদ্‌বোধন" করাতেও তাঁর আপত্তি ছিল না, তাতে অন্ততঃ "উদ্দোধন" উচ্চারণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এইসকল সরলীকরণের ফলে ছাপাখানার কোন্‌ সুবিধা হবে তাও তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন—যে-বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তারপর তিনি উৎকৃষ্ট আলোচনা করেছিলেন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রসঙ্গে। চলিত বাংলার পক্ষপাতী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরিভাষা তৈরি করতে গিয়ে রীতিমতো অপ্রচলিত জটিল শব্দ হাজির করেন। ধারালো যুক্তিতে তাঁর অনেক পরিভাষাকে অগ্রাহ্য ক'রে, প্রচলিত ইংরাজি-বাংলা শব্দগুলিকে গ্রহণের পক্ষে ইনি বলেন। এর মতে, যন্ত্রবিজ্ঞানের পরিভাষা প্রস্তুত করতে হলে—"অনেক বিদেশীয় কথা প্রবেশ করাতেই হইবে; যদি সৃষ্টি-করা সংস্কৃত কথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করা যায়—শ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হইবে না।" ত্রিগুণাতীত ছাপাখানার কথা তুলেছিলেন, যেখানে "পনরআনা ঊনিশ গণ্ডা কথা ইংরাজি"—নিরক্ষর কম্পোজিটরগণ "ঝুড়ি-ঝুড়ি ইংরাজি পরিভাষাই চলিত সরল বাংলার ন্যায় ব্যবহার করে," সেখানে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ এগিয়ে দিলেও কম্পোজিটররা কদাপি "নিজেদের পূর্ব বুলি" বদলাবে না। "যাঁহারা হাতে-কলমে কর্ম করেন [তাঁহারা] চলিত কথাই ব্যবহার করিবেন, তা ইংরাজিই হউক আর ফার্সিই হউক।" দ্বিজেন্দ্রনাথ "স্ক্রু"=আবর্তক, "স্প্রিং"=প্রস্থাপক, "লিভর্‌"=তোলক, "পেণ্ডুলম"=দোলক ইত্যাদি অনুবাদ প্রস্তাব করেন। উত্তরে ত্রিগুণাতীত বলেন—"অনুবাদগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কি চলিত বাংলার পক্ষে সুবিধা হইবে? . যতসব বাক্স-সাবা-ওয়ালারা ...বলে, 'দুই লিবারের চাবি, তিন লিবারের চাবি' ইত্যাদি। ছোটলোক ভদ্রলোক ছেলেমেয়ে বুড়ো—সকলেই তো আমরা ইস্‌ক্রু বা ইস্ক্রুপ, ইস্প্রিং, পেণ্ডুলম ইত্যাদি কথার ব্যবহার করি।...সেলেট্‌ পেনসিল, উট পেনসিল, ফাইল প্রভৃতির বাংলা রচনা করিয়া চলিত ভাষায় চালানো সম্ভব কি?" ত্রিগুণাতীতের বক্তব্য, তার প্রয়োজনই বা কি যখন দেবভাষা সংস্কৃতেই বেশ-কিছু বিদেশী শব্দ ঢুকে আছে। "বাংলাভাষার ত্রিসীমার মধ্যে একটিও সাঁওতাল ভাষার বা অন্য কোনো জংলী ভাষার শব্দ নাই"—দ্বিজেন্দ্রনাথের এই উক্তির সত্যতাতেও ত্রিগুণাতীত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তারপর যথেষ্ট সংস্কৃতজ্ঞান এবং বস্তুবোধ দেখিয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের আরও কিছু পরিভাষা বা অনুবাদের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। যেমন "Division of labour"-এর বাংলা দ্বিজেন্দ্রনাথ করেন "শ্রমের বিভাজন," ইনি করেন "শ্রম-বিভাগ।" দ্বিজেন্দ্রনাথ করেন : "Centripetal and Centrifugal forces=কেন্দ্রানুগা এবং কেন্দ্রাতিগা শক্তি"; ত্রিগুণাতীত পূর্বপ্রচলিত শব্দ "কেন্দ্রাভিকর্ষিণী ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি" রাখার পক্ষে বলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ করেন : "Organised labour=যন্ত্রবদ্ধ পরিশ্রম;" ত্রিগুণাতীত : "ধারাবদ্ধ/প্রণালীবদ্ধ/দলবদ্ধ সুবিভক্ত/দলবদ্ধ সুশৃঙ্খল পরিশ্রম।" দ্বিজেন্দ্রনাথ : "Organic Chemistry=শারীরিক রসায়ন; Inorganic Chemistry=ভৌতিক রসায়ন।" ত্রিগুণাতীত এই অনুবাদের অর্থভ্রান্তি দেখিয়ে ("বেদান্তসারের টীকাকার 'শারীরক' মানে করিতেছেন 'জীবাত্মা' ইত্যাদি) বলেন, যেমন 'শারীর বিজ্ঞান' চলে গেছে তেমনি "শারীর রসায়ন" চালালে ক্ষতি কি? রসায়নবিৎ ডাঃ চুনিলাল বসু ঐ দুটি জিনিসের অনুবাদ করেছিলেন, "অঙ্গারক ও অনঙ্গারক রসায়ন।" ত্রিগুণাতীত সকৌতুকে বলেছেন, ঐ দুইটিকে "রাশ্যাশ্রিত নাম (রাশ-নাম) রাখিয়া ডাক-নাম 'শারীর রসায়ন ও অশারীর রসায়ন' রাখিলেও তবু যাহা হউক এক

রচনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝা যাবে যদি পূর্ববর্তীকালে সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্বের কথা আমরা স্মরণে আনি। একথা সত্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন দেখিয়েছেন, সাধুভাষা কৃত্রিম বা ভুঁইফোড় নয়, টুলো পণ্ডিত বা মিশনারিদের দ্বারা তা গঠিত হয়ে ওঠেনি, তিন-চারশ' বছর আগেকার দলিল-দস্তাবেজে সাধুরীতিই ব্যবহৃত হত। কিন্তু সাধুরীতির ভঙ্গি যে, মৌখিক কথাবার্তার সময়ে ব্যবহৃত হত না, সে কথাও সত্য। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সাময়িকপত্রে রঙ্গরসাত্মক রচনায় কলকাতার মুখ-চলতি ভাষা প্রযুক্ত হচ্ছিল—নাটকের সংলাপেও তাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সাধুরীতিই সাহিত্যের গ্রাহ্য রীতি ছিল। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল—বিদ্যাসাগরের ছন্দ-স্পন্দে বা অক্ষয়কুমারের দার্ঢ্যে অসমর্থ কিন্তু পণ্ডিতিয়ানায় পটু লেখকেরা, প্রাণহীন শব্দের বোঝা চাপিয়ে সাহিত্যকে অনড় অচল পদার্থ করে তুলেছিলেন। প্রথম সচেতন বিদ্রোহ প্যারীচাঁদ মিত্রের। আলালের ঘরের দুলালের মধ্য দিয়ে তিনি যে-চলিত রীতির প্রবর্তন করেছিলেন তা 'আলালী রীতি' নামে অবিলম্বে পরিচিত হয়ে উঠল। প্যারীচাঁদ কিন্তু পুরো চলিত ভাষা আলালের ঘরের দুলালে ব্যবহার করেননি, তাঁর অন্য গ্রন্থগুলিতে তো সাধু রীতিই প্রধানাংশে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর এই দ্বিধা অবশ্য কালীপ্রসন্ন সিংহের ছিল না। কালীপ্রসন্নর হুতোম প্যাঁচার নক্সা (১৮৬২) পুরো কলকাতার কথ্যবুলিতে লেখা। (কালীপ্রসন্নর রীতি বহু সময়েই ভাল্‌গার কিন্তু তাতে ছিল প্রচণ্ড প্রাণশক্তি; বিবেকানন্দ এই রীতির দ্বারাই সবচেয়ে প্রভাবিত; সেইসঙ্গে দীনবন্ধুর প্রভাবও থাকতে পারে, যাঁর সধবার একাদশীর সংলাপ তাঁর মুখে ফুটত; এবং গিরিশ ঘোষের সামাজিক নাটকের সংলাপও, যা বাগবাজারী বুলিতে পূর্ণ ছিল)। কিন্তু কালীপ্রসন্নও তাঁর মননধর্মী লেখায় সাধুরীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় বিশুদ্ধ "চলিত ভাষার বৈয়াকরণ ও ব্যবহারিক যৌক্তিকতা" নিয়ে তীব্র প্রচারধর্মী এক ইংবাজি প্রবন্ধ লিখেছিলেন —তাঁর বক্তব্য, ভাষারীতির ক্ষেত্রে মধ্য পথাবলম্বী বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে স্বীকার্য মনে হয়নি,৯৮ যে-বঙ্কিম অপরপক্ষে সৎসাহসের সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখককে কিছুটা পথ প্রদর্শকের সম্মান দান করেছিলেন।

রকম মন্দ হয় না।" এই ধরনের আরও কিছু দৃষ্টান্তযুক্ত সংশোধনী আলোচনা ত্রিগুণাতীত করেছিলেন। এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন Nervous system-এর বাংলা করেন, "সূক্ষ্মশরীরের সামিল," তখন ত্রিগুণাতীতের সূক্ষ্মশরীর আনন্দে নড়ে-চড়ে উঠেছিল। "Moral courage"-কে দ্বিজেন্দ্রনাথ যেখানে "সাত্ত্বিক সাহস" দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, সেখানে ত্রিগুণাতীত "চরিত্রবল বা মনের তেজ" নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ যেখানে "Conscience satisfied, Conscience clear" ইত্যাদির জন্য "অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট" প্রভৃতি শব্দ-বিধান দিয়েছিলেন, সেখানে ত্রিগুণাতীত "মন সন্তুষ্ট, মন সাচ্চা, মনে গলদ না থাকা" ইত্যাদিতে থেমে ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, বাংলায় কেন "ব্যবহারিক" লেখা হয়, যেখানে উচিত শব্দ "ব্যাবহারিক"—তা নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন। ত্রিগুণাতীত সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, সাধারণভাবে "ব্যবহারিক" হওয়াই উচিত, যদিচ সংস্কৃত অভিধানে মাঝে-মধ্যে "ব্যাবহারিক" প্রয়োগও আছে। এই ধরনের আরও অনেক আলোচনা ত্রিগুণাতীত করেছেন।

ত্রিগুণাতীতের বক্তব্য একটু বেশি জায়গা নিয়ে উপস্থিত করার কারণ—প্রথমতঃ এইসব কথার মধ্যে স্বামীজীর চিন্তার ছায়া কোথাও-কোথাও ছিল; দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা প্রমাণিত হয়—স্বামীজীর আন্দোলনের যাঁরা সহায়ক ছিলেন তাঁরা অনেকেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুপণ্ডিত এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন।

ত্রিগুণাতীত সাধারণভাবে তাঁর লেখায় সাধুক্রিয়া ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাতে চলিতের মিশ্রণও আছে। আবার এইকালে দেখা যায়, ইনি পুরো চলিত বাংলাতেও পুরো প্রবন্ধ উদ্বোধনে লিখেছেন, যথা, ১৫ আশ্বিন ১৩০৬ সংখ্যায় "আনন্দময়ীর আগমন", ১ কার্ত্তিক সংখ্যায় "বিজয়া।"

৯৮ অসিতকুমার, ৩৪৮-৪৯।

বিবেকানন্দের গৌরব এইখানে—তিনি কুণ্ঠিতভাবে সাহিত্যে চলিত ভাষার আংশিক প্রবর্তনের কথা বলেন নি, পরন্তু সর্ববিধ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, উচ্চতম জ্ঞানবিজ্ঞান প্রকাশের ক্ষেত্রেও, চলিত ভাষা প্রবর্তনের পক্ষে প্রচণ্ড শক্তিশালী যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন। এমন একটা অজ্ঞ ধারণা কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল যে, সাহিত্যের সকল প্রয়োজনে চলিত ভাষা প্রয়োগের পক্ষে প্রমথ চৌধুরীই প্রথম প্রচারক। সেকথা একেবারেই সত্য নয়। বিবেকানন্দই এখানে পথিকৃৎ। তিনি 'বাংলা ভাষা' নামক ক্ষুদ্র রচনায় যা বলেছেন, প্রমথ চৌধুরী বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করেও সে কথাগুলি ঐ অব্যর্থতায় প্রকাশ করতে পারেন নি। ক্ষেত্রবিশেষে প্রমথ চৌধুরীর চেয়েও প্রগতিশীলতা বিবেকানন্দের বক্তব্যে আছে।

স্বামীজী যখন চলতি গদ্য লিখছিলেন তখন নিজ কার্যের চরিত্র বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। ১৮৯৯ সালের মধ্যভাগে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্ত্যযাত্রাকালে স্বামীজী জাহাজে বিলাত যাত্রীর পত্র লেখায় নিযুক্ত ছিলেন, এবং তিনি কী করছিলেন তা নিবেদিতারা তাঁর কাছ থেকে কিছুটা জেনেছিলেন। সেইসূত্রে নিবেদিতা তাঁর ১৯ জুলাই, ১৮৯৯, চিঠিতে যা লিখেছেন, তাকেই স্বামীজীর চলিত গদ্যের প্রথম সমালোচনা বলতে পারি :

"রাজা [স্বামীজী] তাঁর বাংলা পত্রিকার জন্য ঘাড় গুঁজে দাসের মতো খাটছেন ক্যাবিনে বসে।...বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী না আশীর্বাদের মতো হয়েছে, তোমাকে তা জানানো দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর জন্য একটি দীর্ঘ পত্র রচনা করে চলেছেন, মজাদার রসিকতায় তা পূর্ণ, সেইসঙ্গে টিপ্পনী, মন্তব্য এবং আর্ত ভবিষ্যৎবাণী। সমস্ত মনপ্রাণ ওতে ঢেলে দিয়েছেন। বিদেশীয়ানা, ব্রাহ্মপদ্ধতি, প্রভৃতির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত রোষ, জনগণ সম্বন্ধে নিবিড় আশা ও ভালবাসা, গুরুর প্রতি দীপ্ত ভক্তি, চারিপাশের জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক সন্ধানী দৃষ্টি---সর্বোপরি বাংলা ভাষার উপরে কিছুটা ইচ্ছাকৃত উৎপীড়ন, যার ফলে তাঁর লেখা বোঝা দুরূহ হয়ে উঠেছে, [বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয় তাঁদের পক্ষে কক্‌নি সব সময়েই দুরূহ], যেমন ছিল কার্লাইলের প্রথম আবির্ভাবকালের রচনা, যা সৃষ্ট হয়েছিল দারুণ কোনো লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে!!!"৯৯

নিবেদিতার চমকপ্রদ মন্তব্যের পক্ষে তথ্য আমরা ক্রমে দেব। কিন্তু চলিত রীতির জীবনমুখিতা সাহিত্যে আনার প্রয়োজন যে, স্বামীজী অনুভব করছিলেন, তার অন্য প্রমাণও আছে। অক্ষয়কুমার সেন, রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে শাঁকচুন্নি নামে পরিচিত [বিবেকানন্দ-প্রদত্ত এই নামটি তিনি সগৌরবে নিজ গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন]—সরল পয়ারে লেখা এঁর রামকৃষ্ণ-পুঁথি সম্বন্ধে স্বামীজী কোন্ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, তা অন্যত্র বলেছি। [২য়, ১৭০-৭১]। স্বামীজী অবশ্যই অক্ষয় সেনের বইটিকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য মনে করেন নি; যা তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল তা হল—এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে পেঁছানো যাবে। অক্ষয় সেনের সেই গণ-বার্তাবহের ভূমিকাকেই তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন।১০০ ভাষা-সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজী পরিষ্কার বলেছিলেন :

৯৯ নিবেদিতা লোকমাতা, ১ম, ৬৯।

১০০ অপণ্ডিত অক্ষয় সেনকে নরেন্দ্রনাথ কিভাবে উদ্দীপিত করে রামকৃষ্ণ-পুঁথি রচনায় প্রণোদিত করেছিলেন, তার বিবরণ দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত :

"১৮৮৭ সালে সময় পাইলেই শাঁকচুন্নি-মাস্টার রামতনু বসুর গলির বাটীতে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ ও বর্তমান লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, কে যেন ভিতর হইতে মাঝে-মাঝে ঠেলা মারিতেছে ও তাঁহাকে অস্থির করিতেছে; তাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয়ে কিছু লিখিবার জন্য কে যেন ভিতর হইতে বড় ব্যস্ত করিতেছে। তিনি বিষাদভাবে বলিতেন, 'আমি তো লেখাপড়া জানিনা ভাই, তা কি করব?' তাঁহার কিছুদিন সেইরূপ আগ্রহ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ইংরাজির আদিকবি ক্যাডমুস-এর উপাখ্যানটি বলিয়াছিলেন। গ্রীন-এর ইতিহাসের প্রথম অংশে ক্যাডমুস নামক জনৈক সহিসের উপাখ্যান আছে। স্বপ্নাবস্থায় ক্যাডমুসের দেবদূত-দর্শন

"সহজতাই সাফল্যের রহস্য। আমার আচার্যদেবের ভাষাই আমার আদর্শ। তাঁর ভাষা একেবারে চলতি কিন্তু চূড়ান্ত অর্থবহ। ভাষা যেন অভিপ্রেত অর্থকে সহজে স্বচ্ছন্দে প্রকাশে সমর্থ হয়।

"এত অল্প সময়ে বাংলা ভাষাকে উপযুক্ত করার চেষ্টা করলে সেটা কাটা-ছেঁড়ার কাজ হয়ে দাঁড়াবে। ঠিকভাবে বলতে গেলে উপযুক্ত ক্রিয়া এই ভাষায় নেই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই দোষ তাঁর কাব্যে দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। বাংলার সেরা কবি—কবিকঙ্কণ। সংস্কৃতে সেরা গদ্য—পতঞ্জলির মহাভাষ্য। ভাষা সেখানে ওজস্বিতায় পূর্ণ। হিতোপদেশের ভাষা মন্দ নয়, কিন্তু কাদম্বরীর ভাষায় আছে পতনের চিহ্ন॥

"বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের ছাঁচে নয়—পালির ছাঁচে সংস্কার করতে হবে। বাংলা ও পালির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য আছে। অবশ্য পরিভাষা রচনার কালে সংস্কৃতের সাহায্য নিতে হবে। নতুন শব্দ আমদানী করার চেষ্টা করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে যদি সংস্কৃত থেকে পারিভাষিক শব্দাবলী সংগ্রহ করা হয়—তাতে বাংলা ভাষার অবয়ব গঠনে খুবই সহায়ক হবে।"১০১

ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের নানা দিক দীর্ঘদিন ধরে গতিহারা। সাহিত্যে, সঙ্গীতে কেবলই আত্মপ্রদক্ষিণের ঘূর্ণীপাক। অসার অলঙ্কারের পুঞ্জ সাহিত্যে, স্বামীজী যাকে শবদেহের উপর পুষ্পবর্ষণ বলতেন। আমরা একটু অগ্রসর হয়ে বলতে পারি—সে ফুল রঙিন কাগজের ফুল ছাড়া কিছু নয়। স্বামীজী "আমাদের উপস্থিত কর্তব্য" নামক বক্তৃতায় বলেছিলেন : "মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের এক বা দুই শতাব্দী আগেই...ভারতের সব-কিছুতে—শিল্পে, সঙ্গীতে বিজ্ঞানে—অবনতির চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। শিল্পের মধ্যে ভাবের উদারতা আর রইল না, গঠনসৌষম্য বা কল্পনার মহিমা নষ্ট হয়ে গেল—পরিবর্তে এল অতি আলঙ্কারিক এক রীতি। মৌলিকতার বিলয় ঘটল। সঙ্গীতে প্রাচীন সংস্কৃতের হৃদয়োন্মাদী ভাব হারিয়ে গেল, সুরগুলি পূর্বে যেমন নিজস্ব আকার বজায় রেখেও অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি করত, তা নষ্ট হয়ে গিয়ে, নানা প্যাঁচানো সুরের খেলা আরম্ভ হল। আধুনিক সঙ্গীত তেমনি খিচুড়ি-জাতীয় বিশৃঙ্খল ব্যাপার, একেবারে অধঃপতিত। ভাবরাজ্যের অন্য বিষয়-গুলিতেও একই ধরনের অলঙ্কারবহুলতা ও মৌলিকতার অভাব।" [৫-১৬৪]

স্বামীজীর "বাংলা ভাষা" প্রবন্ধের বক্তব্যের বিচারে এলে দেখি, মাত্র দু'পৃষ্ঠার মধ্যে স্বামীজী চরম কতকগুলি কথা বলেছেন। চলিত গদ্যের সমর্থনে তাঁর যুক্তিগুলি খাঁটি চলিত গদ্যের তাজা প্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গোড়াতেই বলেছেন তাঁর পুরনো কথাটা —এদেশের বিদ্যা কিছুসংখ্যক মানুষের কুক্ষিগত থাকায় বিদ্বান ও সাধারণ মানুষে অপার ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেছে। চলিত ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান বিতরণ করে সেই পার্থক্য দূর করতে

হইয়াছিল এবং তদ্দর্শনে তাঁহার কবিত্বশক্তি প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু ক্যাডমুস অক্ষর জানিত না। মুখে-মুখে স্তব রচনা করিয়া সে সেতু ও চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া সকলকে শুনাইত। ক্যাডমুসের উপাখ্যান শুনিয়া শাঁকচুন্নি মাস্টারের বুকে সাহস আসিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি অনবরত স্মরণ করিতেন ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেন। ক্রমে-ক্রমে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইল। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলেন এবং আসিয়া প্রথম অংশটি নরেন্দ্রনাথকে শুনাইয়া যাইতেন। তাহার পর প্রতি বৎসর দক্ষিণেশ্বরের উৎসবকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহের উত্তর দিকে লম্বা দালানে বসিয়া তিনি হস্তলিখিত পুঁথিখানি পড়িতেন।" [ঘটনাবলী, ১ম, ১৬১-৬২]

স্বামীজী অক্ষয়কুমার সেনের "পুঁথির" প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তার সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতনও ছিলেন। বলেছিলেন, "শাঁকচুন্নির নাকী সুর ভালো বটে, কিন্তু কিছু উঁচুদরের চাই, that will appeal to the intellect of the learned." [৭—১০০]

১০১ CW, V, 259

হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল—সত্যই কি চলিত ভাষায় সবকিছু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব? স্বামীজী দুই দিক থেকে তার উত্তর দিয়েছেন। এক, বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত 'লোকহিতায়' আগত পুরুষেরা চলিত ভাষাতেই উপদেশ দিয়ে প্রমাণ করেছেন কত গভীর বস্তু তাতে দেওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ চলিত ভাষাতে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবস্তুও দান করা চলে। ধারালোভাবে তিনি বলেছেন : "যে-ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য মনে-মনে করো--তবে লেখবার বেলা ও-একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত করো? যে-ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা করো, দশজনে বিচার করো—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখার ভাষা নয়?" শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীর সঙ্গে দার্শনিক আলোচনার যে-বিবরণ লিখেছেন, তাতে চলিত ভাষায় জ্ঞানচর্চার শক্তি যথেষ্টই প্রকাশিত হয়েছে।১০২ স্বামীজী পাণ্ডিত্যের মূল্য স্বীকার করেছেন, চলিত ভাষার সঙ্গে যদি সংস্কৃতের কৃষ্টি যুক্ত না হয় তাহলে কোন বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা—সে সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন।১০৩ কিন্তু একথা যেন ভুলে না যাই—তাঁর চলিত ভাষায় কেবল হালকা চালই ছিল না, প্রয়োজনে তাতে রীতিমতো

১০২ 'স্বামী শিষ্য সংবাদে' চলতি ভাষায় শাস্ত্রালোচনার অনেক চমৎকার নমুনা আছে। সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি ছাড়া ব্যাপারটা দেখানো সম্ভব নয় বলে সে লোভ সংবরণ করছি। উদাহরণ হিসাবে পাঠক 'বাণী ও রচনা', নবম খণ্ডের ৪০-৪২, ৫৮-৬০, ৯৯-১০২, ১১৯-২৩, ১৩০-৩২, ১৬১-৬৩ পৃষ্ঠাগুলি দেখে নিতে পারেন।

১০৩ মাদ্রাজে প্রদত্ত "ভারতের ভবিষ্যৎ" বক্তৃতার অতি মূল্যবান কিছু কথা এই :

"আমার সংকল্প এই : প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা। ঐ শাস্ত্র-নিবদ্ধ তত্ত্বগুলি উহা অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য পেটিকায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত। সেই সংস্কৃত শব্দের বহু শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে উহাদিগকে বাহির করিতে হইবে। আমি চাই ঐ ভাব-গুলি সর্বসাধারণের সম্পত্তি হউক, তা সে সংস্কৃত জানুক বা না জানুক। আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যই এইসকল ভাবপ্রচারের এক বিরাট অন্তরায়। আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিখিতেছে ততদিন ঐ অন্তরায় দূরীভূত হইবার নহে। সংস্কৃত ভাষা কত কঠিন, তাহা তোমরা এই কথা বলিলেই বুঝিবে যে, আমি সারাজীবন ধরিয়া ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, তথাপি প্রত্যেক নূতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার কাছে নূতন ঠেকে। যাহাদের ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিখিবার অবসর হয় নাই তাহাদের...অবশ্যই চলিত ভাষায় এইসকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে। কারণ সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণমাত্রে, জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। মহানুভব রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা নিজেদের জীবৎকালে অদ্ভুত ফললাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্যের শোচনীয় পরিণাম হইল কেন, নিশ্চয় তাহার কারণ আছে।..ইহার উত্তর এই : তাঁহারা নিম্ন জাতিগুলিকে উন্নত করিয়াছিলেন বটে...কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ করেন নাই। এমনকি মহান বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্যের আশু ফললাভ চাহিয়া, সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ ভাবসমূহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলেন। ভালই করিয়াছিলেন, লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্ব-সাধারণের ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন।...তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইল। ...কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে-সঙ্গে 'গৌরববোধ' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া কৃষ্টিতে পরিণত হইলে তবে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। ...জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিক কালের অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের অনেক বিষয়ের জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাতে কি? সে-সকল জাতি ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস, অসভ্য, কারণ তাহাদের কৃষ্টির অভাব।" [৫—১৮৬-৮৮]

১০৪ "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের" একেবারে সূচনার বাক্যটিই চরম উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করা যায় :

গুরুভার শব্দযোজনাও দেখা গেছে।১০৪ কিন্তু গোটা ব্যাপারটিকে সংস্কৃতের গদাইলস্করি চালে ঢালাই করতে তাঁর কোনো অভিপ্রায় ছিল না। ভাষা ও সাহিত্যের পতনের চেহারা কি নির্মম তীব্রতার সঙ্গেই না তিনি খুলে ধরেছিলেন। তাঁর ঐ রচনাই একটা সাহিত্য : "ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান—ভাষা পরে। হীরে-মতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায়? ব্রাহ্মণের [অর্থাৎ বেদের উপসংহারভাগের] সংস্কৃত দেখ, শবর-স্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ—আর [অপরদিকে] অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ। এখনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জ্যান্ত-কথা কয়—মরে গেলে মরা ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু'একটা পচা ভাব রাশিকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।" বিতৃষ্ণায় ব্যঙ্গে রি-রি ক'রে ওঠে তাঁর কণ্ঠ।—এদেশের বহুমানিত আলঙ্কারিকতার আবরণকে এইভাবে টেনে খুলে বেআব্রু করা হয়েছে কিনা সন্দেহ :

"বাপ্ রে, সে কি ধুম! দশপাতা লম্বা-লম্বা বিশেষণের পরে দুম্ করে—'রাজা আসীৎ'!!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ—কি বাহাদুর সমাস—কি শ্লেষ!! ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন ওসব চিহ্ন উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়িটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে-কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে—সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম!! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য—তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব।"

জীবন চাই জীবন—স্বামীজীর দাবি। সেই দাবি দারুণ জীবনময় ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন : "যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন-যেমন বল আসবে, তেমন-তেমন ভাষা-শিল্প-সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে-ভাবরাশি আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে—আর বাড়ি-ঘর-দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।"

চলিত ভাষায় শিল্পনৈপুণ্য হয় না—তৎকালীন এই অভিযোগকে স্বামীজী অবহেলায় অগ্রাহ্য ক'রে, ভাষার আদর্শ রূপ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তেমন করে আর কেউ বলতে পারেন নি : "ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত—মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে করো—আবার যে-কে-সেই—এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।" এই ইস্পাতের ভাষা স্বামীজী সত্যিই তৈরি করতে পেরেছিলেন।

এই রচনায় চলিত ভাষা সম্পর্কে স্বামীজীর একটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরীর মতের পার্থক্য আছে। আমরা স্বামীজীর মতকেই অধিকতর প্রগতিশীল বলে মনে করি। প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষা সম্পর্কে স্বামীজীর মত জানতেন, এবং তিনি

"সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্বকারুকার্য-মণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্নমৃন্ময়প্রাচীর জীর্ণছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা; মধ্যে-মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো-মহিষ-বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।" [৬—১৪৯]

স্বামীজীর মতের উল্লেখও করেছেন ১০৫ কিন্তু এই বিশেষ জায়গাটিতে স্বামীজীর নীতিকে গ্রহণ করেন নি। কৃষ্ণনাগরিক প্রমথ চৌধুরীর কাছে চলিত ভাষার আদর্শ রূপ—কৃষ্ণনগরের ভাষা। সেখানে স্বামীজী কলকাতার ভাষাকে গ্রহণ করতে বলেছেন। বাংলাদেশে যেহেতু রকমারি উপভাষা প্রচলিত আছে—তাদের কোন্‌টিকে গ্রহণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে বিতর্ক উঠবে, স্বামীজী জানতেন। এক্ষেত্রে 'কলকেতার ভাষাই' গ্রাহ্য, কারণ "প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেটিই নিতে হবে।" যাতায়াতের আরও সুবিধা হলে কলকাতার ভাষা চট্টগ্রাম থেকে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত চলবে, [হায়, এখনকার খণ্ডিত পশ্চিম-বঙ্গ আর স্বামীজীর কালের বৃহৎ বঙ্গ!!] —এমন ধারণা তাঁর হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর এক দশক আগেই প্রমথ চৌধুরীর কথা খণ্ডন ক'রে তিনি বলেন : "কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট, সেকথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাংলাদেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায়•গ্রাম্য ঈর্ষাটিকে জলে ভাসান দিতে হবে।"

কৃষ্ণনগরের ভাষা, যাকে প্রমথ চৌধুরী গ্রহণ করতে বলেছিলেন, তার বিষয়ে বলা যায়, সে হল শিষ্ট চলিত। অপরপক্ষে কলকাতার ভাষা স্ল্যাং-এ ভর্তি। তবু বিবেকানন্দ কলকাতার পক্ষেই রায় দিয়েছেন, যেহেতু কৃষ্ণনগর তখন সচল শহর নয়। সেখানে পুরনো কালচারের অবশেষ স্থানীয় রসবুদ্ধির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে উপাদেয় আকারে বর্তমান ছিল—কিন্তু তাতে গতি ছিল না। অথচ সাহিত্য চলতি জীবনের সঙ্গে যুক্ত। চলতি জীবনের চলতি ভাষাকেই সাহিত্যে নিতে হবে। কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী, সেখানে সর্ব-ভারতের মানুষ আসে, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হয়, বহিরাগতের প্রভাব পড়ে। সে কলকাতায় বাইরের কত শব্দ অবিরত ব্যবহৃত হচ্ছে। সে সকলই নিতে হবে—নেওয়া হচ্ছিলও। কলকাতার ভাষায় শুচিবায়ুতা ছিল না—ছিল গ্রহিষ্ণুতা—তাই স্বামীজী কলকাতার ভাষার পক্ষে।

বিবেকানন্দের প্রবন্ধটি প্রচণ্ড হলেও ঐ সময়ে উপযুক্ত ফলপ্রসব করতে পারেনি। সমালোচক মহলে বিরক্তি অবশ্যই সৃষ্টি করেছিল। যেমন পূর্বোক্ত পূর্ণিমা পত্রিকা শ্রাবণ ১৩০৭ সংখ্যায় লিখে ফেলল :

---

১০৫ প্রমথ চৌধুরী যখন চলিত ভাষা আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন তার বিরুদ্ধে সাধু-পন্থীরা যথারীতি প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেন। "বিক্রমপুর" পত্রিকার পৌষ, ১৩২৩ সংখ্যায় লেখা হয় :

"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণ-কাহিনীর তুলনা করিয়াছেন। কাহার সহিত কাহার তুলনা? একজন তেজঃপূর্ণ, বলদৃপ্ত, পুরুষ-কারের পূর্ণদীপ্তিতে বিমণ্ডিত, প্রতি কণা হইতে যেন অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হইতেছে, আর একজনের ঘ্যানঘ্যানানি, মিহি মেয়েলি সুর।"

"বিক্রমপুর" পত্রিকার সম্পাদক সঙ্গতভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বী লেখার অনুরাগী, এবং অসঙ্গতভাবে রবীন্দ্রনাথের মার্জিত রীতির অননুরাগী। কিন্তু ইনি সাহিত্যে চলিতরীতির পক্ষপাতী নন, স্বামীজী বললেও নন। 'বিক্রমপুর' পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছিলেন : "পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই কথিত ভাষা সম্পূর্ণরূপে লিখিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিতেছি না। কোন্ ইংরাজি পুস্তক আগাগোড়া চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে? চৌধুরী সাহেব যে-ভাষায় লিখিতেছেন, ঠিক সেইপ্রকার সমাস তদ্ধিত প্রত্যয়াদি সমন্বিত ভাষাতেই কি তিনি আলাপ করেন? বাক্যের পশ্চাতে মাঝে-মাঝে 'খেলুম, গেলুম' ব্যবহার করিলেই কথিত ভাষা হয় না। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা স্বামী বিবেকানন্দ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাহাই কি তাঁহাদের কথিত ভাষা?"

"বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বোধহয় তাঁহার বিলাতযাত্রীর পত্রের ভাষার নানা সাময়িকপত্রে যে-সমালোচন হইয়াছিল, ইহা তাহারই জবাব। বলিতেছেন, সাধারণ লোকের ভাষাই ভাষা, আর কল্‌কেতার ভাষাই গ্রহণ করিতে হইবে। 'যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে করো, তবে লেখবার বেলায় একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত করো?' জিজ্ঞাসা করি, কোটেশনের মধ্যের ভাষাটা কিরূপ? 'কিম্ভূতকিমাকার'—এটা 'পাণ্ডিত্যে' না সাধারণের ভাষা? স্বামীজি যে রাত্রিতে বহির্বাস ফেলিয়া দিয়া কেবল রাত্রিবাসের কপ্‌নী পরে, নিউইয়র্ক শহরের টাউনহলে আমেরিকার মাগী মিন্সেদের সামনে বক্তৃমা (গ্রাম্য কিনা?) ঝাড়্‌বেন, আমরা সেদিন চাঁদি ডোবে-ডোবে দেখে ঝুরো লুসেকুপোকাৎ কর্‌বো আর ঝুঁজ্‌কো বেলায় উঠে ঐরূপ বুলিটা কায়দা কর্‌বো। উদ্বোধনের কাগজ ও ছাপাটাও ভাষার মতো না কি?"

যাইহোক, দেখা যায়, সাহিত্যে চলিত ভাষার অবতরণ তখনি ঘটেনি, যার অন্যতম কারণ অবশ্যই সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সাধুভাষার গরিমা। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রথমপর্বের রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাধুভাষার অপরিসীম শক্তি উন্মোচন করেছিলেন, সেখানে বিবেকানন্দের রীতির পক্ষে দাঁড়াবার মতো সৃষ্টিশীল কোনো বড় সাহিত্যিক ছিলেন না। রক্ষণশীল পত্রিকায় তাঁর বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ, প্রগতিশীল বলে কথিত পত্রিকাগুলিতেও তিনি বা তাঁর মত বহুলাংশে অবাঞ্ছিত। শেষোক্ত মহলের গ্রাহ্য লেখক প্রমথ চৌধুরী যতদিন না চলিত ভাষার পক্ষে কলম ধরেছিলেন, ততদিন ঐ শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা বা ঐ ধরনের লেখকেরা চলিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হননি। আর প্রমথ চৌধুরী কি অবিলম্বে জয়ী হতে পারতেন যদিনা তিনি তাঁর মহাকবি শ্বশুর রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করতেন? এমন শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের চলিত গদ্য রচনার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন।১০৬ কিন্তু প্রকাশ্যে সে-বিষয়ে কোনো সমর্থন তিনি তখনি জানান নি। সে যাই

---

১০৬ কুমুদবন্ধু সেন উদ্বোধন সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় (মাঘ, ১৩৫৪) "উদ্বোধনের জয়যাত্রা" প্রবন্ধে লেখেন :

"আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হইয়াছে—তাহার প্রেরণা জোগাইয়াছে স্বামীজীর বাংলা রচনা। উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' 'ভাববার কথা,' ও 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার-হাজার শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গ-সাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন তাহা পড়িয়া দেখুন বলিয়া বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই--আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল? দীনেশচন্দ্র বলিলেন : আমি এইমাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন—'আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি, আর পূর্ব-পশ্চিমের আদর্শ। দেখে অবাক হতে হয়।' এ ছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।"

রবীন্দ্রনাথ সত্যই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বইটিকে পছন্দ করতেন। তিনি শান্তিনিকেতনের পাঠ্য-সূচীতে বইটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

হোক. **ঐতিহাসিকভাবে একথা অবশ্য স্বীকার্য—প্রমথ চৌধুরীর প্রচারের পূর্বে, এক দশকের অধিককাল ধরে, বিবেকানন্দের চলিত ভাষার লেখাগুলি বহুল প্রচারিত থেকে, চলিত গদ্যের পরবর্তী স্বীকৃতিকে সহজসাধ্য করে তুলেছিল।**

বস্তুতঃপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই সাহিত্যে চলিত গদ্যের স্বীকৃতির পথে ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। বঙ্কিম সাধু-ক্রিয়া ব্যবহার করে গেলেও, জীবনের বাস্তব উত্তাপ প্রচুর পরিমাণে দিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যে। সেই রীতির ভারবাহিতার শক্তি ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁর অসাধারণ প্রতিভায় বাস্তব বিষয়ের উপর অপূর্ব রমণীয়তার আলোকপাত ক'রে, তার মোহরসে আচ্ছন্ন করে রাখলেন সাহিত্যপিপাসু বাঙালীকে। বিবেকানন্দ যে-রীতি চাইছিলেন, তা কেবল ক্রিয়ায় চলিত নয়—তা জীবনের সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি—সুন্দর হয় তো হোক—না-হয় হোক না রূঢ় কর্কশ—জীবন তো প্রায়শঃই ভয়ংকর—রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে একপর্বে বাঙালী যেন এই কথাটা ভুলেই গিয়েছিল।

প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে গদ্যের ক্রিয়ারীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটল। কিন্তু ক্রিয়াতেই তা সমাপ্ত থেকে গেল। প্রমথ চৌধুরী যতই মাতৃভাষার (অর্থাৎ মুখের ভাষার) পক্ষে দাবি জানান—তাঁর ভাষা অবশ্যই বাঙালীর মাতৃভাষা নয়—ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কিংবা তাঁর মতো আর কিছু মানুষের মাতৃভাষা হলেও হতে পারে। ও-ভাষাকে একবার আমি প্রমথ চৌধুরীর ভঙ্গির অনুকরণে 'অচলিত চলিত গদ্য' বলেছিলুম। প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবের ফল কিন্তু মারাত্মক হয়েছিল বাংলা গদ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত সজীব, গতিশীল, মাত্র ক্রিয়াপদে সাধু, গদ্যরীতির পরিবর্তে অত্যন্ত বাঁকানো কিংবা অত্যন্ত লতানো এক গদ্যরীতি অতঃপর কয়েক দশক ধরে বাংলাসাহিত্যে চলেছিল। সে বস্তু যে ড্রইংরুমের পুষ্পিত বাক্য, তা এখন অনেকেই স্বীকার করেন।

প্রমথ চৌধুরীর ছিল ক্রিয়ার বিদ্রোহ—শরৎচন্দ্র ক্রিয়াকে সাধু রেখেও বিষয়ের বিদ্রোহ আনতে চেয়েছিলেন সাহিত্যে। কিন্তু তিনি সবকিছুই করলেন মাঝারিভাবে। সহজ স্বাচ্ছন্দ্য এল কিন্তু এল না কর্মের ঘর্ম। অবশ্য তাঁকে ঘিরে যে-আন্দোলন হল, তা বাঙালীকে অধিকতর সমাজসচেতন ক'রে, তার কাছে জীবনমুখিতার প্রয়োজন উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল। বিস্ময়ের কথা, সমাজসংস্কারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যাপক সংস্কার-আন্দোলনের মনোভাব তাঁর গদ্যসাহিত্যের দ্বারা সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাঁর ভূমিকা প্রধানতঃ সতর্কীকরণের। সঙ্গীত ও কাব্যের ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি জাতীয় চিত্তকে ত্যাগে ও সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছেন।

কল্লোল যুগ রবীন্দ্রনাথের 'সুন্দরের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল—কিন্তু তার আগেই এই গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা চলতি গদ্যরীতি পেয়ে গেছেন। তাঁদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত প্রধানাংশে অতি রোমান্টিক হয়ে উঠে, স্বপ্নময় নোংরামি সৃষ্টিতে শক্তিক্ষয় করেছিল।

এই অগ্রপশ্চাৎ প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর রচনা বিবেচ্য। গল্প-উপন্যাসের সাহিত্যিক তিনি নন, সুতরাং ঐসব বস্তুর দান তাঁর থেকে আশা করা যায় না, কিন্তু তিনি এমন-কিছু বস্তু চলিত গদ্যের দ্বারা আমাদের দিয়েছেন, যার অনুরূপ বাংলাসাহিত্যে কোথাও মেলেনা।

আমরা আগেই বলেছি, ১৮৯৯ সালে সাধু ও চলিত উভয় ভাষাতেই স্বামীজী লিখছিলেন। তারপর যখন তাঁর কাছে তাঁর চলিত ভাষার বিরুদ্ধে কটুকাটব্যের কথা গিয়ে পৌঁছল, তখন তিনি লিখে পাঠালেন 'বাংলা ভাষা' পত্র-প্রবন্ধটি, আর তারপর সদর্পে বেছে নিলেন নিন্দিত চলিত ভাষাকে। এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল—বিদ্রোহী সন্ন্যাসী সাধুভাষা প্রায় বর্জন করলেন। "প্যারি প্রদর্শনী" নামক লেখাটি, (যেটি উদ্বোধনে কিন্তু অনুবাদ বলেই প্রকাশিত হয়েছিল), এবং কাছাকাছি কালে (২৩ ডিসেম্বর, ১৯০০) মৃণালিনী বসুকে

লেখা পত্রটি বাদ দিলে (মহিলাকে লেখা পত্র বলে বোধহয় স্বামীজী শিষ্ট সাধুরীতি রাখতে চেয়েছিলেন) অতঃপর স্বামীজীর সকল প্রবন্ধ বা পত্র চলিতেই লেখা। সত্যই জেদে ও তেজে তিনি অসামান্য ছিলেন।

বিবেকানন্দের গদ্যধারা পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যে প্রবলভাবে বয়ে গেছে, এমন আমরা বলতে পারি না, কিন্তু অনুসরণ একেবারে হয়নি, তাও সত্য নয়। এই রীতিকে কিছুটা ব্যবহার করে ব্রহ্মবান্ধব একদিন বাংলায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সতেজ অবহেলায় সমাজ-বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ছড়িয়ে দিয়েছেন এই ভাষারই পথে, বিনয় সরকার। এরই অনুসরণে মুজতবা আলী অপূর্ব মজলিশী সাহিত্য লিখেছেন; তাঁর "দেশে বিদেশের" পৃষ্ঠা ওল্টালেই স্বামীজীর "পরিব্রাজক" ও "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের" কথা মনে আসে। এখনকার কথাশিল্পী শঙ্কর তো বিবেকানন্দকে গুরুপ্রণাম জানিয়ে তাঁর "যেখানে যেমন" বই শুরু করেছেন।"১০৭ সাহিত্যসমালোচকরাও স্বামীজীর গদ্যকে বহুমান দিতে আর দ্বিধা করছেন না।১০৮

১০৭ শঙ্কর তাঁর বিদেশভ্রমণ-কথা লিখেছেন "যেখানে যেমন" বইয়ে। দেশ বিদেশকে কোন্ উদার আনন্দময় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে হয়, তা গোড়াতেই স্বামীজীর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। গ্রন্থসূচনায় মন্তব্য করেছেন :

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে। এই বই শুরু করার আগে যে কবিগুরুটিকে যথাবিহিত প্রণাম জানাতে চাই, তাঁর নাম—স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি নবভারতের অন্যতম স্রষ্টা; অধ্যাত্মজগতে রামানুজ ও শঙ্করাচার্যের সঙ্গে একই নিশ্বাসে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়; আমাদের এই যুগে ক্লেদাক্ত হিন্দুধর্মকে কলুষমুক্ত করে তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—এইসব কারণে তাঁর চরণচর্চা করছি না। করছি সাহিত্যরচয়িতা হিসেবে—বাংলার শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-সাহিত্যকার হিসেবে।

"বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক? হাঁ,...আমি তাঁকে নির্দ্বিধায় সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। সেই যে ১৮৯৯ সালে কলকাতা থেকে গোলকোণ্ডা জাহাজযোগে পাশ্চাত্যদেশ যাত্রাপথে গঙ্গাবক্ষে তিনি 'পরিব্রাজকের' প্রথম লাইন রচনা করলেন—তারপর থেকে, বাংলা ভ্রমণসাহিত্য আর এক রইল না। 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' লিখিত হবার পর সমগ্র এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রান্ত হল, কত প্রচণ্ড প্রতিভাধর এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ আজও অদ্বিতীয়। কী স্টাইলে, কী সরসতায়, কী অন্তর্দৃষ্টিতে, কী গভীর মানবপ্রেমে, কী আত্মবিশ্বাসে—পরিব্রাজকের লেখক আজও বাংলাসাহিত্যের সেরা হয়ে রইলেন।"

১০৮ পুনশ্চ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎকৃষ্ট লেখাটির দ্বারস্থ হচ্ছি। তিনি বলতে চেয়েছেন, সাধারণতঃ যেখানে ধর্মদর্শনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা যুধিষ্ঠিরের রথের মতো ঊর্ধ্ব-লোক দিয়ে যাতায়াত করেন, সেখানে "বিবেকানন্দের বাংলা রচনা কর্ণের রথের মতো মন ও প্রাণের মাটি বিদীর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে।" তাঁর মোট সিদ্ধান্ত : "সর্ব কর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের আগে কোনো বাঙালী সাহিত্যিক বলেন নি।" এবং "সর্বক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহারের গৌরব সর্বাগ্রে বিবেকানন্দের প্রাপ্য।" বিবেকানন্দের বিচিত্রমুখী চলিত গদ্যরীতির সঙ্গে "সহস্রমুখী বজ্রমাণিকের" তুলনা ইনি করেছেন। স্বামীজী যেভাবে "চলিত ভাষার অন্বয়ের মধ্যে তৎসম শব্দঝঙ্কারকে চমৎকার মিশিয়ে" দিয়েছিলেন, তা যে ইদানীং কালের দুঃসাহসী লেখক-দের পক্ষেও দুঃসাহসিক, তাও তিনি বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর উক্তি, "বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়"—এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে ইনি প্রমথ চৌধুরীর চলিত গদ্যরীতির সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন : "সাধুভাষার ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ছোট করে ছেঁটে দিলেই কিছু চলতি ভাষা হয় না।" ছুৎমার্গের শত্রু বিবেকানন্দ—শব্দব্যবহারেও। বিবেকানন্দের ব্যবহৃত নানা দেশজ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়ে অসিতকুমার বলেছেন, "প্রমথ চৌধুরী এরকম খিড়কি দরজার শব্দকে কখনও সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ঢুকতে দিতেন না।" "প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কৃত্রিম ও ড্রইংরুম-বিলাসী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদগ্ধ্যপূর্ণ।" সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারকারী সাহিত্যিকদের মধ্যে তুলনামুখে বিবেকা-নন্দকে স্থাপন করে ইনি লিখেছেন : "হুতোমের স্ল্যাং-বাক্‌রীতি বা পৌগণ্ডোচিত ধৃষ্টতা স্বামীজীর চলিত রীতিতে নেই, অথচ খোলামেলা বৈঠকী রসিকতার প্রাচুর্য তাঁর গেরুয়া বস্ত্রা

॥ ১৯ ॥ বিবেকানন্দের চলিত গদ্যের রূপ ও রস

'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক' বা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের' পৃষ্ঠা-পরিমাণ যথেষ্ট না হলেও গুণ-পরিমাণ এতই যে, সে সম্বন্ধে আলোচনা দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা, যে-প্রলোভন আমি এখানে দমন করব। ঐসব রচনার মধ্যে দুটি জিনিস সহজেই চোখে পড়ে, গভীর রসিকতা এবং দারুণ তেজ। প্রথমটির কথা গোড়াতেই বলব, দ্বিতীয়টির কথা সব শেষে।

স্বামীজীর রসিকতা নিয়ে আমি একটা গোটা বই লিখেছি, "সহাস্য বিবেকানন্দ।" সেই লেখায় অবশ্য আমি প্রধানতঃ বিবেকানন্দের রসিক ব্যক্তিস্বরূপের কথাই অধিক বলেছি, এবং প্রয়োজনবোধে তাঁর ইংরাজি ও বাংলা রচনার সাহায্য নিয়েছি। বিবেকানন্দের স্বভাবে যে সুগভীর রসিকতার ক্ষমতা ছিল তা তাঁর বাংলা রচনাতে যথেষ্টই প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই ঐ বইয়ে স্বামীজীর বহুবিচিত্র রসিকতা-বিষয়ে যে-কথা বলেছি, তার কিছু অংশ এখানে উত্থাপন করি :

"বিবেকানন্দের রসিকতার হিসেব নিতে গিয়ে মনে হয়েছে—এ এক বিচিত্র অপূর্ব সংগ্রহশালা। হেন রসিকতা নেই যা তিনি করেন নি। ঠাট্টা-তামাশা, মজা-মশকরা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাসি-হুল্লোড়, গাল-গল্প, ফিচলেমি-ফাজলামি, স্ফূর্তি-ইয়ার্কি, আমোদ-কৌতুক, শ্লেষ-বিদ্রূপ, উপহাস-পরিহাস, রস-রহস্য—কী নেই সেখানে? ইংরেজি হাস্যরসের আওতায় যা-কিছু এসে যায়—উইট, স্যাটায়ার, আয়রনি, ফান, হিউমার—প্রায় সবই তাঁতে পাওয়া যায়। উইট বা বাক-চাতুরীতে তিনি পারদর্শী; কথার পিঠে কথা বলতে, দ্রুত চোখা উত্তরে প্রতি-পক্ষকে ঘায়েল করতে, তাঁর তুল্য ক্ষমতা অল্পই দেখা যায়। কিন্তু উইটের তরবারি-ঝলক দেখানোর চেয়ে তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল স্যাটায়ারের কোপ বসাতে—অনাচারের বুকে যা কেটে বসবে। কিন্তু আঘাত নয়, প্রেমই বিবেকানন্দের প্রধান অস্ত্র। মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের অসঙ্গতির রূপ দেখতেন, কঠিন হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠত, কিন্তু অবিলম্বে সে হাসি কোমল হয়ে যেত, যখন এই মানব-প্রেমিক দেখতেন—ব্যক্তিজীবনের অসঙ্গতি আসলে সামগ্রিক মানবজীবনের অসঙ্গতির অংশ। তখন জন্ম নিত গভীর হিউমার। তখন যে-হাসি হাসতেন, তার লক্ষ্য অন্যের মতো তিনিও। আত্মপরিহাসের উদারতা সর্বদাই তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। কিন্তু কিছু পরেই তিনি সেই গভীর হাসির জগৎ ছেড়ে মজার হাসিতে ছটফট করতেন, যেহেতু আদি দুষ্ট বালকটি এই মহাপুরুষকে কখনো ত্যাগ করেনি।"

ব্যঙ্গকৌতুকে স্বামীজীর রচনা আকীর্ণ, যথেচ্ছ দৃষ্টান্ত তোলা যায়। আমি আগে সে কাজ নানা প্রসঙ্গে করেছি। বিশেষতঃ হিন্দু রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রখর ব্যঙ্গের অনেক রূপই দেখিয়েছি। গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্যের নক্সাটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, অনুরূপ অন্য অংশও। [তৃতীয়, ১২৩-২৬]। এই ধরনের বেশ কয়েকটি নক্সা স্বামীজী "ভাববার কথা" নাম দিয়ে লিখেছিলেন, এবং এগুলি তাঁর প্রথম প্রকাশিত চলিত গদ্যরচনা বলে তাঁর গদ্য-বিবর্তনে এদের মূল্য যথেষ্ট। ধর্মীয় ও সামাজিক অসঙ্গতি, কুসংস্কার, আচারসর্বস্বতা

গুলের অন্তরালে অবস্থিত সদাহাস্যময় মনটাকেই উদ্ঘাটিত করেছে। বীরবলের বুদ্ধির মারপ্যাঁচ ও কৃত্রিম কলাকৌশলও তাঁর ভাষায় স্থান পায়নি—যদিও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'পরিব্রাজকে' দর্শন-ইতিহাস-সমাজ সম্বন্ধে বহু মননশীল আলোচনা আছে।...হুতোমের ভাষা একেবারে পথের ভাষা, বীরবলের ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্রম্ভালাপের বাঙ্ময় পায়চারি। এর কোনোটাই যথার্থ চলিত ভাষা নয়—স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের' গদ্যই চলিত ভাষার আদর্শ।" সার কথা এই : "স্বামীজীর ভাষা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের জন্য নয়, বারোয়ারিতলার ইতরভদ্রের জন্যই তাঁর ভাষাপ্রবাহে রয়েছে স্নানপানের উদার আহ্বান!"

নক্সাগুলির বিষয়বস্তু; আকারে ছোট ও সংখ্যায় অল্প হলেও এগুলি আগুনে বোমার মতো জ্বালাবার, পোড়াবার শক্তিসম্পন্ন। নক্সাগুলির বিশেষ গুণ—নক্সা-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ যে-সাময়িকতা, তার থেকে এগুলি বহুলাংশে মুক্ত, তাই এখনো উপভোগ্য। এদের একটিতে স্বামীজী ভাষা নিয়ে কিছু পরীক্ষা-কাজ করেন, যা মনোযোগের বিষয় হওয়া উচিত। উত্তর ভারতের জীবনের এবং ভাষার সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—হিন্দী ও উর্দু তিনি খুব ভাল জানতেন—বিষয়ের প্রয়োজনে হিন্দী-ফার্সি শব্দ বাংলায় আমদানী করার পক্ষেই তাঁর মত ছিল। বিশুদ্ধির নামে অংগপ্রত্যংগ ছেঁটে রক্তহীন একটা কাণ্ড ঘটানোকে তিনি সৎসাহিত্যকর্ম মনে করেন নি। তাঁর উদার সাহিত্যনীতির দৃষ্টান্ত-হিসাবে লখনউ-বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ-কৌতুকের নক্সাটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

"লখনৌ শহরে মহরমের ভারী ধুম! বড় মসজেদ ইমামবারায় জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে! বে-সুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, কেরানি, য়াহুদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজার জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লখনৌ সিয়াদের রাজধানী, আজ হজরত ইমাম হাসেন হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতিফাটানো মর্সিয়ার কাতরানি কার-বা হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠছে। এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হতে দুই ভদ্র রাজপুত তামাশা দেখতে হাজির। ঠাকুর-সাহেবদের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হয়ে থাকে—'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ।' সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ্-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ-সমেত লস্‌করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা-কাবা চুস্ত-পায়জামা তাজ-মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ শহরপসন্দ ঢঙ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল-সিধে, সর্বদা শিকার করে জমামরদ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল্।

"ঠাকুরদ্বয় তো ফটক পার হয়ে মসজেদ-মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময়ে সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতো মারো, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এল—ও মহাপাপী ইয়েজিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরৎ হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে—তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ-মূর্তি পাঁচ জুতোর জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কিন্তু কর্মের বিচিত্র গতি। উল্টা সমঝ্‌লি রাম। ঠাকুরদ্বয় গললগ্নিকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ্-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদ্‌গদস্বরে স্তুতি—'ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভল্ বাবা অজিদ্, দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্ মারো শারোকো কি অভি তক্ রোবত!' ধন্য বাবা ইয়েজিদ্, এমনি মেরেছো শালাদের—কি আজও কাঁদছে!!" [৬—৪৪-৪৫]

নক্সাটিতে, পাঠক লক্ষ্য করবেন, রঙ্গকৌতুকের মধ্যে চরিত্রচিত্রণ হয়ে গেছে। স্বামীজীর অনেক লেখাতেই এই ধরনে কথার তুলিতে ছবি আঁকা আছে, যার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পরিব্রাজকে জাহাজে হাঙর শিকারের বর্ণনা। ঐ বর্ণনা যে বাংলা সাহিত্যের এক সেরা চলচ্চিত্র, তাতে সন্দেহ নেই। বাস্তবরস, কৌতুকরস, গতিশীলতা, প্রাণোচ্ছলতা—সব জড়িতে অনবদ্য রচনা। স্বামীজী যে অনেকটা খোশগল্পের মেজাজে পরিব্রাজক ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য লিখেছিলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন,[১০৮খ] কিন্তু ঐসব লেখাতে ততোধিক করেছেন—সেরা

১০৮খ স্বামীজী ১৮৯৯, সেপ্টেম্বর মাসে, নিউইয়র্কের নিকটবর্তী লেগেট-ভবন 'রিজলি ম্যানর' থেকে লেখেন : "ভারত ও ভারতবাসী সম্বন্ধে একটা বই লিখছি—ছোট্ট, সহজ, খোশগল্পে ভরা একটা-কিছু।" [৮-৬৮]

অনুমান করি, এই রচনা 'বিলাতযাত্রীর পত্র।'

গায়কের ভঙ্গিতে নানা পর্দায় স্বচ্ছন্দ যাতায়াত, দারুণ চড়া থেকে নিতান্ত খাদে অবতরণ, সেখান থেকে অনায়াস আনন্দে ঊর্ধ্বাকাশে পাখা মেলে দেওয়া। একটামাত্র দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে নেব, যাতে কেবল ক্ষণে-ক্ষণে অবলীলায় ভাব-পরিবর্তন নেই—চলিত ক্রিয়াপদ পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য 'সাধু' ভূমিকা নিয়ে অবিলম্বে তাকে সকৌতুকে কিভাবে ত্যাগ করেছিল, তা দেখিয়ে দেবার জন্যও বটে। প্রসঙ্গ : স্বামীজী জাহাজে ক'রে পাশ্চাত্ত্য যাচ্ছেন—ভাগীরথী পেরিয়ে জাহাজ সাগরে পড়ল—তারপর :

"কি সুন্দর। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়—ঘন নীল জল তরঙ্গায়িত, ফেনিল বায়ুর সঙ্গে তালে-তালে নাচছে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল—সেই বিভূতিভূষণা, 'সেই গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।' সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের উপর, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ—সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে—খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গআভা, নীল পট্টবাস-পরিধান। কোটি-কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল। আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জন, বিকট হুংকার, ফেনময় অট্টহাস; দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত। পোতমধ্যে যে-জাতি সসাগরা ধরাপতি, সেই জাতির নর-নারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফঝম্প, গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রজল-উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুংকার—সে এক বিরাট সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি। সহসা এ-সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রী-পুরুষ কণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার সম্মিলিত 'রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্' মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। চমকিয়া চাহিয়া দেখি—

"জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দু'হাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্ন পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।" [৬—৬৫-৬৬]

অংশটিতে লক্ষ্য করলে দেখব—যেখানে 'নীল নীল নীল জল,' সেখানে কোমল স্বাদুতা, তারপরেই নির্ঘোষ—'মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র।' তারপর আত্মপ্রত্যয়ী অহংকারী ইংরেজদের বর্ণনা গুরু গম্ভীর সাধু-ক্রিয়ায়—তারপরেই গাম্ভীর্যকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ফাজিল হাসি। অর্থাৎ বিহারীলাল, মধুসূদন এবং কালীপ্রসন্নকে হাত-ধরাধরি করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া।

সমাজপতি বলেছেন, স্বামীজী জ্ঞানের ভাণ্ডার ঢেলে দিয়েছেন তাঁর চলিত ভাষার সাহিত্যে। এখানে যোগ করা উচিত—জ্ঞানের রচনাকে এক কলমের খোঁচায় তিনি রসের সাহিত্য করে তুলতে পারতেন, যেমন, ধরা যাক করেছেন আদিম সমাজের ছবি আঁকার কালে:

"অনেক পুরাণ-কালের মানুষ, অর্থাৎ সত্যযুগের...এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখান ও বাহিরে আর একখান হয় বলে, কাপড় পর্যন্ত পরতেন না। পাছে স্বার্থ-পরতা আসে বলে বিবাহ করতেন না। এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে, কোৎকা লোড়া-লুড়ির সহায়ে, সর্বদাই 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' বোধ করতেন।" [৬-৭০] "সে প্রাতঃস্মরণীয়াদের কালের মেয়ে এ-জন্মে তো একসঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা।" [৬—২০৪]

'উৎপাদক' যেখানে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকদের দ্বারা নিত্য শোষিত হয়—তার বেদনাময় রূপ স্বামীজী নিরুপায় হাসি মিশিয়ে বর্ণনা করেছেন, যার ভিতরে ছটফট

করছিল ছিন্ন আর্ত কান্না। সে ধরনের রচনা-নমুনা আগে অনেক উদ্ধৃত করেছি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এইক্ষেত্রে এবং গণমানুষের বন্দনায় ও আবাহনে, তাঁর চলিত গদ্য প্রাণময় সাহিত্যের শিখরস্পর্শ করেছিল। [যথা তৃতীয় খণ্ডে ৪৫০-৫৫, ৪৬০ পৃষ্ঠায়—"ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত...;" "বৈশ্য বলিতেছেন উন্মাদ...;" "আর্য-বাবাগণের জাঁকই করো...;" "নতুন ভারত বেরুক...;" "ঐ যারা চাষাভূষা, তাঁতি-জোলা...;" "একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল..."]। দ্বিধা না রেখে বলতে পারি, বাংলা-সাহিত্য ধন্য হয়েছে এইসব রচনার জন্য—এখানে গণ-মহাকবির আখ্যা তাঁর প্রাপ্য। এই বিরাট মানবপ্রেমের সঙ্গে প্রবল দেশপ্রেমও তাঁর সাহিত্যে জীবনীশক্তি দিয়েছে। দেশপ্রেমকে একদা ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর "কাব্যালোক" গ্রন্থে স্থায়ী রসের অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন—মানবহৃদয়ে ঐ ভাবের এমনই ক্রমবর্ধমান প্রভাব। বিবেকানন্দের সাহিত্যে দেশ-প্রেম অবশ্যই আছে কিন্তু 'বিশ্ববিবেক' তিনি—তাই সর্বোপরি ছিল তাঁর উদার বিশ্বদৃষ্টি। এখানে লক্ষ্য করতে হবে—কিছু দুর্বলচিত্ত মানুষের কাছে বিশ্বপ্রেম মানে নির্বিচারে সকলের উপর সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট বর্ষণ, কিংবা হীনমন্যতার ক্ষেত্রে, বিদেশের কুকুরে সিংহদর্শন। বিবেকানন্দের ধারে-কাছে ও-বস্তু ছিল না। যদি কান ধরে থাবড়া দিতে হয়, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল মানুষকেই তা দিয়েছেন। যদি আলিঙ্গন করতে হয়, কালা-ধলার বিচার সেখানে নেই। তাঁর আঘাতের হস্ত এবং আশীর্বাদের হস্ত সমভাবে সকলের জন্য উদ্যত ছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে তাঁর সেই উদার বিশ্বমানবিকতা অপূর্ব প্রভায় প্রকাশিত।

বিবেকানন্দের চলিত সাহিত্যের আঙ্গিক বিচারে পুনশ্চ প্রবেশ করলে দেখি, স্বামীজী প্রমাণ করেছেন—চলিত মানে কেবল ক্রিয়াপদে চলিত আর বাকি সব অংশে সাধুর চেয়ে অধিক সাধু নয়। তাঁর চলিত ভাষা জাতে-ধাতে চলিত। সেই জ্যান্ত চলিত ভাষায় ক্ষুধার মতোই হজমশক্তি। ভারী সংস্কৃত শব্দ থেকে একেবারে হাট-মাঠের দেশী শব্দকে তা গ্রাস করত—হাত বাড়িয়ে থাকত বিদেশী শব্দের দিকে। গভীরতার সঙ্গে তরলতা, গাম্ভীর্যের সঙ্গে উৎফুল্ল লঘুতা তিনি মেলাতে পারতেন। শব্দে-শব্দে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিস্ফোরণ। তাঁর রচনায় তিনিই সাক্ষাতে ব্যক্ত। তাই 'মানুষটাই স্টাইল' রীতির শ্রেষ্ঠ নমুনা তাঁতে মেলে। যেকথা আমি অন্যত্র বলেছি, এখানেও তাই বলছি : তাঁর রচনা কখনো চাবুকের মতো কেটে বসেছে, কখনো খড়্গের মতো ছিন্ন করেছে, কখনো গুঁড়িয়ে দিয়েছে মুগুরের মতো, আবার কখনো-বা গড়গড় ক'রে গড়িয়ে নেমেছে পাথরের মতো—ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পাহাড়ে বন্যার বেগে। তাঁর গদ্যে কখনো হাসির বিদ্যুৎচমক, কখনো-বা সমুদ্রস্তনিত স্বর। একই সঙ্গে দাবড়ানি, থাবড়ানি, পিঠচাপড়ানি। বয়স্যের মতো রহস্য করেছেন, চ্যাংড়ার মতো ফাজলামি, আবার বিশ্বরসিকের উদার হাসি হেসেছেন—একই ভাষায়।১০৯

এরপরে কিছু উদাহরণ যোজনা করেই এই দীর্ঘ অধ্যায় শেষ করব।

বাংলা প্রবাদ ও বাগ্‌রীতির অজস্র বর্ষণ স্বামীজীর চলিত গদ্যে আছে। সাধুগদ্যের মতোই এখানেও তাঁর বেশ-কিছু উক্তি নব প্রবাদ বা প্রবচন সৃষ্টি করেছে। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

পরিব্রাজক : "ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ্ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথায় পাই বলো!" "'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' নহি—সেটা প্রমাণ করবার জন্য শ্রীদুর্গা স্মরণ করে আরম্ভ করি। তোমরাও খোঁটাখুঁটি ছেড়ে দিয়ে শোনো।" "গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি।" "নিজের খ্যাঁদা-বোঁচা ভাই বোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না।" "বলি, রঙের নেশা

১০৯ "সহাস্য বিবেকানন্দ।"

ধরেছে কখনো কি?—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে!" "যুদ্ধজাহাজ...এক-একটি ছোট-বড় ভাসন্ত কেল্লা।" "তবে এই 'লুয়ার বাসর ঘর' যা নকিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবেনি।" "মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপাপত্তি করে জড়পিণ্ড তৈয়ার করে।" "বিশেষ, কায়স্থকুলে এ-শরীরের পয়দা হওয়ায় আমি তো চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।" "দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজরাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ্! পালা পালা! সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কব্‌লা।" "নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ-পো আর্য-রক্ত, উনি চার-পো, উনি দেড়-ছটাক কম, ইনি আধ-ছটাক, আধ-কাঁচ্চা বেশি ইত্যাদি। বলে, 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে'।" "নেটিভ পা-চাটা ভাব।" "'শিরদার তো সরদার।' মাথা দিতে পারো তো নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই। তাইতে কিছুই হয় না, কেউ মানে না।" "এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা।" "এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন।" "আমাদের দেশে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোঁসাই দেখে মাতাল চিতাবাঘ ঠাওরেছিল—এ মাদ্রাজী তিলক দেখে চিতে-বাঘ গাছে চড়ে।" "জাহাজ বেজায় দুলতে লাগল, যাত্রীরা মাথা ধরে, ন্যাকার করে অস্থির।" "ঐ যে বাঙাল-মাঝির নৌকা...একটু হাওয়া উঠলেই হালে পানি পায় না এবং যাত্রীদের আপন-আপন 'দ্যাব্‌তার' নাম নিতে বলে।" "বলি হ্যাঁ গা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সী-সিকনেস্ হয়েছিল কিনা—সে-বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ?" "বৌদ্ধ প্রচারকেরা আমাদের কলকেতায় এসে রঙ-বেরঙের গাল ঝাড়ে।" "টিবেটিগুলো আসল শিবের ভূত।...ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভেঁপু বাজায়, মদ-মাংসের যম।" "অনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হত, তার কি!" "সাত-শ বৎসরের পর পরপদদলিত ইতালি কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হল, হয়েই ভাবল—কি হলুম রে! এখন দিগ্বিজয় করতে হবে।" "আ মরি! —ওঁদের আবার মন! ছটাকও নয় আবার মণ!" "শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্য মানুষ ঐ প্রকার ধড়্ফড়্ করে, সে চিরকাল যা করে তাই হতে লাগল—অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'।" "আসল ইংরাজি শুয়ারের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে।" "বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশহাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়।" "যদি পারো তো করে দেখাও। কাজ কথা কউক, মুখকে বিরাম দাও।" "কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, এক মুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে।" "বাধা যত পাবে ততই ভালো। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়?...বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ।" "পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়।" "তাঁর কণ্ঠে রুপোর তার বাজে!" "দুঃখ-দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই।" "ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড় ডেয়োদের চেয়ে অনেক অধিক।" "যন্ত্রে 'না' বলে না, 'হাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' —সেদিকে চলে যায়, তারপর পচে মরে যায়।" "স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা, ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই।" "দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি-দুর্বল সবল হয়, অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।"

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" : "শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছবিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে-বগলে ধেই-ধেই নাচ।" "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষামাত্র।" "এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন,

মা কালী পাঁটা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশি বাজাচ্ছেন।" "চরে খাওগে না কেন—এত বড় দুনিয়াটা তো পড়ে আছে!" "ধর্ম কি?—যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগে প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক।" "মোক্ষ কি?—যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই।" "ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না।" "এক হাত লাফাতে পারো না, লঙ্কা পার হবে!" "তুমি গেরস্থ—তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদিনা ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।" "ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহলোকেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই।" "অন্যায় সহ্য করা পাপ—গৃহস্থের পক্ষে।" "লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে এবং পাচ্ছে—ঘোড়ার ডিম।" "গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেওয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেওয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার মানুষই দেবতা হয়।" "ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোক গিলে-গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়—ও পচা দুর্গন্ধ।" "ঘষে-মেজে রূপ আর ধরে-বেঁধে পিরীত্ কি হয়?" "তোমাদের আহাম্মকিগুলিকে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে?" "যে-নদীটা পাহাড় থেকে হাজার ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে?" "শক্তিমান পুরুষেরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।" "রাজনীতির নামে চোরেব দল দেশের লোকের রক্ত চুষে...খাচ্ছে।" "যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।" "যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে। যে জাতটা বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট।" "বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পড়ে?...আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।" "আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয়।" "ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়।" "হিঁদু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি—সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে।" "হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।" "ভাজা জিনিসগুলো আসল বিষ; ময়রার দোকান যমের বাড়ি।" "ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না; ওরা অধিকাংশ—'ভালো করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা বল্'।" "রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনর আনা।" "যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগী, সেটা তো হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে গেছে।" "আমেরিকা এখন কুবেরের প্রধান আড্ডা।" "চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার অর্থাৎ ভোগবিলাসের, সুখস্বচ্ছন্দতার আদগুরু।" "যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাশান বদলায়, এদের [পাশ্চাত্ত্যবাসীদের] তেমনি ঘড়ি-ঘড়ি বদলাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাশান।" "[পাশ্চাত্ত্যে] ভদ্রসমাজে থুতু ফেলা, বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি করলে তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি।" "জাপান আশিয়ার নতুন জাত।" "পারি নগরী ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ।" "মেছোবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে—সেটা কেমন আহাম্মকি!" "ইংরেজ ওলবাটা-মুখ।" "জ্ঞান মানে কি, না বহুর মধ্যে এক দেখা।" "বর্তমান বিবাহের সূত্রপাত হল—মেয়েমানুষ পুরুষের ঘটি বাটি গোলাম প্রভৃতি অধিকারের ন্যায় হল।" "[ইউরোপী] সভ্যতার উপায়—তলোয়ার, সহায়—বীরত্ব, উদ্দেশ্য—ইহপারলৌকিক ভোগ।" "ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।"

পত্রাবলী : "লাসা না দেখিলে আমাদের গঙ্গাধরের রক্ত শীতল হইবে না।" "আত্মঘাতীর গতি ভগবানও করিতে পারেন না।" "'পাগড়ি বেঁধেই ভগবান্' যে দেখে, তাহার

ঐখানেই খতম।" "কান দুটো কিন্তু মুখ একটা।" "কর্তাত্ব সকলেই পারে, দাস হওয়া বড় শক্ত।" "জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ জিনিস নয় যে তাকে 'ওঠ্ ছুঁড়ী, তোর বে', বলে জাগিয়ে দিলেই হল।" "তখন...ভায়ার মনে আগুন জ্বলল।...দাদা, আমি দেখেশুনে অবাক। বল্ বাবা, আমি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি?" "ভায়া, সব যায়, ঐ পোড়া হিংসেটা যায় না।" "এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম।" "আমাদের বারো বৎসরের বেটা-বিউ-নিরা।" "তিনি জানছেন, তাঁর চক্ষে কে ধুলো দেয় বাবা।" "'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না?" "পাজি বেটারা চার যুগ ধরে ওদের [গরিবদের] রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু'পা দিয়ে দলেছে।" "'আমাদের মতো দুনিয়ার কেউ নেই—আর্য বংশ!!!' কোথায় বংশ তা জানি না!...এক লাখ লোকের দাবানিতে তিনশো মিলিয়ান কুকুরের মতো ঘোরে, আর তারা আর্য-বংশ!!!" "মহাপুরুষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি করে—এই তো পৃথিবীর ইতিহাস!" "পুঁথি-পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে-মুখে শিক্ষা দাও।" উঠে-পড়ে লেগে যাও দিকি। গল্প-মারা, ঘণ্টা-নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য করিতে হইবেক।" "তোদের নিজের বুদ্ধি বড়-একটা খেলাতে হবে না—সাদা বাংলা কয়ে যা দিকি!" "রাজাকে [ব্রহ্মানন্দকে] আমার বহুত-বহুত দণ্ডবৎ, লাট্টুবৎ, ইস্টিকবৎ, ছতরীবৎ দিবে।" "[নিজের কাণ্ড দেখে] আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে-সময়ে, মধো, তোর পেটে এতও ছিল?" "কোনো চিঠি বাজার-গুজব করিস্নি, খবরদার। চ্যাংড়ামো নাকি? যা করতে বলছি পারো তো করো, না পারো তো মিছে ফ্যাচাং করো না।" "সমাজকে, জগৎকে ইলেক্‌ট্রিফাই করতে হবে। বসে-বসে গপ্পবাজির আর ঘণ্টানাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম।" "আরে দাদা, 'শ্রেয়াংশি বহুবিঘ্নানি।' ভালো কাজে অনেক বিঘ্ন হয়। ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড় লোক তৈরি হয়ে যায়।" "বলি মোহন, মিশনারি-ফিশনারির কর্ম কি এ-ধাক্কা সামলায়? এখন মিশনারির ঘরে বাঘ সেঁধিয়েছে।" "এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধেই সম্বন্ধ—ছেলে বে করে পর হয়ে যায়—মেয়ের স্বামী ঘন-ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ি যায়।" "ছোঁড়া ব্যাটারা ইয়ার্কি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার।" "আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে-আগুন ধরে গেছে তা নিববার নয়। কালে গোঁড়াদের দম নিকলে যাবে। কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, বাছাধনেরা টের পাচ্ছেন।" "ঐ যে ভোগ—ঐ ওদের ভগবান—টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যার ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।" "হরে হরে! আরে বাবা, কি মহাপাপী—দশ বৎসরের মেয়ের বর জুগিয়ে দেয়।" "মেয়ে-পুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়ব।" "ঐ যে ছুঁচোগিরি, দীনা-হীনা ভাব—ও হল ব্যারাম।" "ওরে বাপ, এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান্ যাবে?" "ত্যাগী না হলে তেজ হবে না।" "হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষা একেবারে জন্মের মতো বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্বংসহ হইতে হইবে। এইটি যদি পারো, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে।" "ইংলণ্ডে যাব কি যমল্যাণ্ডে যাব প্রভুই জানেন।" "চুপে যেও, কালে-কালে সব বেরুবে।" "দাদা, কুকুর বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুষ কি দুঃখ করে?" "পর্দা উঠছে—উঠছে—ধীরে-ধীরে।" "হাল ছেড়ো না, টিপ ধরে থেকো, পাকড় ঠিক বটে, তাতে ভুল নেই—তবে পারে যাওয়া আজ আর কাল।" "লীডার কি বনাতে পারা যায়? লীডার জন্মায়। লীডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন জোগানো। জেলাসি, সেল্‌ফিস্‌নেস আদপে থাকবে না—তবে লীডার।" "পূর্ণ ভক্তি—গোঁড়ামি ছাড়া—এইটি দেখাতে হবে।" "শেমফুল!—আমরা ইউনিভার্সাল রিলিজন করছি দলাদলি করে।" "গোলাম কীটগুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নেই, স্ত্রীর আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে—আর যদি কেউ ওগুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে।" "আমাদের ভিতর যিনি পরস্পরের গুজুগুজু নিন্দা করবেন বা

শুনবেন, তাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। ঐ গুজগুজ সকল নষ্টের গোড়া।" "পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভালো।" "গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান।" "একটা কথা মনে রেখো—দুটো চোখ, দুটো কান, কিন্তু একটা মুখ। উপেক্ষা উপেক্ষা উপেক্ষা।" "বিমূঢ়মতি অনাত্মদর্শী তমসাচ্ছন্নবুদ্ধি জীবকে বালচেষ্টা করিতে দাও। গরম ঠেকলেই আপনি পালিয়ে যাবে। চাঁদে থুতু ফেলবার চেষ্টা করুক।" "যদি তাদের ভিতর মাল থাকে—সিদ্ধি কে বারণ করতে পারে?" "ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা, তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই।" "শশী প্রভৃতি যে ধুমখেত মাচাচ্ছে, এতে আমি বড়ই খুশি। ধুমক্ষেত্র মাচাতে হবে। দুনিয়ামত ধুমক্ষেত্র মেচে যাবে, বাহ্ গুরুকা ফতে।" "ভায়া, পরের ভরসা করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। আপনার পায়ে জোর বেঁধে চলাই বুদ্ধিমানের কার্য।" "দু'চারটে মানুষের মতো এককাট্টা কর্ দিকি। একটা মিউও যে শুনতে পাইনি।" "হেঁজিপেঁজিদের সঙ্গে মেশবারও আবশ্যক নাই; ওদের কাছে ভিক্ষাও করতে হবে না—ঠাকুর সব জোটাচ্ছেন, জোটাবেন।" "আমাদের দেশ সকলের অধম কেন—শক্তিহীন বলে—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে।" "দাদা, দুনিয়াময় তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি।" "মার হুকুম হলেই বীরভদ্র, ভূতপ্রেত সব করতে পারে।" "আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ করে এই পগার পার।" "দাদা, বিশ্বাস বড় ধন।" "আমাদের জাতের কোনো ভরসা নাই; কোনো একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পড়ে টানাটানি।" "কুঁড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।" "এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন-বিনা বিদ্যা-বিনা মরে যাচ্ছে।" "চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া রোগ-বিশেষ।" "লোকহিত, জগতের কল্যাণ করো—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ।" "তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজি? সব ত্যাগ করেছ; এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা!" "আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়; আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়।" "জগতের কল্যাণ করা—আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।" "দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র! সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে।" "এই প্রকারে বিমলা এক্ষণে সনাতন ধর্মের যাহা আসল সার তাহা খিঁচিয়া লইয়াছেন।" "দাদা, একবার গর্জে-গর্জে মধুপানে লেগে যাও দিকি।" "তোরা এক-একটা মানুষ হ দিকিরে বাবা।" "তুমি ইদিক-উদিক যাওয়াটা বড় একটা ত্যাগ করো। ঘর জাগিয়ে বসে থাকো।" "তৈয়ার রান্নায় একটু নুন তেল দিতে যদি না পারো, তাহলে কেমন করে বিশ্বাস হয় যে, সকল জোগাড় হবে?" "তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে বোকারাম?" "চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কাজ হয়।" "যখন তোমরা বলো, রামকৃষ্ণ অবতার—আবার তার-পরেই বলো, আমরা কিছুই জানি না—তখনই আমি বলি, liar, চোর, ঝুট বিলকুল।" "তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম।" "আমি বাংলা দেশ জানি, ইণ্ডিয়া জানি—লম্বা কথা কইবার এক-একজন—কাজের বেলায়—শূন্য।" "অবতারের বাচ্চারা কোথায়—ছোট-ছোট অবতারেরা—ওহে অবতারের পিলেগণ!" "মনে অনেক জিনিস আসে—তা ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়—গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়।" "রামকৃষ্ণ পরমহংসের উদারভাব প্রচার করে আবার দল বাঁধা কেমন করে হয়? দলের বীজ হচ্ছে ঐ ঘণ্টা-পত্র। আমি হাজারবার ঠকেছি, এবারও ঠকলাম।" "যদি দেখতুম যে, কোনো কাজ করিনি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, তাহলে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।" "একটা জন্ম না হয় বাজেই

গেল। মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়?" "আসছে জন্মে না হয় বড় গরু দেখা যাবে—এ-জন্ম এ-শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।" "ওরে পাগল, পরীর মতো সব মেয়ে, লাখ-লাখ টাকা—এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে—একি আমার জোরে, না তিনি রক্ষা করছেন?" "ছেলেমানুষি হুড়দঙ্গুলের কাজ নয়।" "হুটকোর দেনা শোধ হয়ে গেছে, এখন মাথা মুড়িয়ে নিতে বলবে। আমি আধা স্থলে-জলে লোক চাই না।" "বাঙালীরা কি বলে, না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়।" "বাঙালী!...লণ্ডনে কতকগুলো কাফ্রির মতো—আবার টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেখতে পাই। কালো হাতে খানা ছুঁলে ইংরেজরা খায় না—এই আদর! ঝি-চাকরের দলে ইয়ার্কি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম! রাম! আহার—গেঁড়ি-গুগলি; পান—প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল; ভোজনপাত্র—ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্র-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে; বিহার—পেত্নী শাঁকচুন্নির সঙ্গে; বেশ—দিগম্বর, কৌপীন ইত্যাদি; মুখে যত জোর।" "নিধে পেলা সকলেই কি রামকৃষ্ণ পরমহংস হয় রে ভাই!" "মধো, যা বলি করে যা—ওস্তাদি চালাস না আমার উপর।" "হরমোহনটা তো আধপাগলা বই নয়—ও একটা কি 'লর্ড রামকৃষ্ণ' লেখে বল তো? লর্ড, ডিউক আবার কি হে? খ্যাপাগুলোর জ্বালায় অস্থির।" "ঐ টুপিপরা হতভাগাদের দেখলে গা জ্বলে। ভূত-কালো—আবার সাহেব। ভদ্রলোকের মতো দেশি কাপড়-চোপড় পর্ বাবা, তা না হয়ে ঐ জানোয়ারী রূপ।" "ইংরেজবাচ্ছা কোনো কাজে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকানরা চটপটে, কিন্তু অনেকটা খড়ের আগুনের মতো।" "বড়মান্‌ষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড়-বড় কাজ গরিবেরা করে।" "ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে ক'রে-ক'রে খরচ হয়ে গেছে।" "'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' 'তুই আবার কি করবি?'—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি—ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূল সূত্র।" "চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য হয় না।" "কথা কানে হাঁটে, মনে রাখিবে।" "সকল বড় কাজ ধীরে-ধীরে হয়।" "কিছুতেই ভয় খেয়ো না। যতদিন তিনি আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর দাবাবার জো আছে?" "সাণ্ডেল কাঁসারীপাড়ায় বাস করুক গে, যদি ঘণ্টানাড়া তার এতই ভালো লাগে।" "যেমনটি বলি দাগা বুলিয়ে যাক, নইলে উল্টো উৎপত্তি করে বসবে।" "আবোল-তাবোল কে কি বললে, হরমোহনী ঢোলে লেখবার দরকার নেই।" "ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা।" "নিরুদ্যম হতভাগার দল—দশ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধান করতে কেবল জানে, আর জানে কি?" "একজন আর একজনের দোষ দেখতে খুব মজবুত—আপনার দোষগুলি কেউ সারাবেন না।" "প্রভু তোমাদের সৎবুদ্ধি দিন! দু'জন জগন্নাথ দেখতে গেল—একজন দেখলে ঠাকুর আর একজন দেখলে পুঁই গাছ!!!" "যে সকলের দাস, সেই সকলের প্রভু। যার ভালবাসায় ছোট-বড় আছে সে কখনও অগ্রণী হয় না। যার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চনীচ নাই, তার প্রেম জগৎ জয় করে।" "মিষ্ট কথা অনেক দূর যায়।" "তুমি ভয় খাও কেন? ঝট্ করে কি দানা মরে? এই তো বাতি জ্বলল, এখনো সারারাত্রি গাওনা আছে।" "পুঁথি-পাতড়া বিদ্যে-সিদ্যে, যোগ-ধ্যান-জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান। প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি।" "দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়।" "শুধু নেগেটিভ ধর্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি-ডাকাতি করে না—তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি করো না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার করো না, চার ঘণ্টা ধ্যান করো, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—মধু, তাতে কার কি?" "দুই কান হইলেই কাজ খারাপ হয়।" "যারা ভাবে যে, সহায়তা এলে তারপর কার্য করব, তাদের দ্বারা কোনো কার্য হয় না। যারা ভাবে যে, কার্যক্ষেত্রে নামলেই সহায় আসবে, তারাই কার্য করে।" "সিদ্ধি হউক,

না হউক—একটা বিষম গোলমাল করো।...রামকৃষ্ণ-সভা একদম জে'কে যাক। হুজ্জুকের উপর হুজ্জুক—বিরাম যেন না হয়—এই হল সিক্রেট।" "শীত আসছে—ভয় কি? খুব খাও দাও, মৌজ ওড়াও।" "লোক না পোক।" "যে সর্বদা আত্ম-সাবধান করে, সে পদে-পদে বিপদে পড়ে। যে মানের ভয়ে মরে, সে অপমানই পায়। যে সদা লোকসানের ভয় করে, সে সর্বদা খোয়ায়!" "তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক সি'টকানো? কে জানে কার কি মতিগতি?" "টাকাকড়ি, বিদ্যেবুদ্ধি সমস্ত 'দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি!" "সব খামকা মহাপুরুষ!" "আমি কাজ চাই, ভিগার্ চাই—যে মরে, যে বাঁচে—সন্ন্যাসীর আবার মরা-বাঁচা কি?" "দেশে তো 'পিলগ্ হইছন্তি'—কে আছে কে নেইরে রাম!" "বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ, উপরের চাকচিক্য মাত্র—সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়।" "খ্যাঁদা-বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্বসহিষ্ণু মহত্ত্ব—ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়।" "চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয় সংযমে কি পুণ্য?" "যে বীর, সেই ত্যাগ করতে পারে। যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে একহাতে চোখ মুচছে, আর একহাতে দান করছে—তার দানে কি ফল?" "যখন প্রধান কাজ হয়, ভিত্তিস্থাপন হয়, রাস্তা তৈরী হয়, যখন অমানুষ বলের আবশ্যক হয়—তখন নিঃশব্দে দু'একজন অসাধারণ পুরুষ নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে নিঃসাড়ে কাজ করে। যখন হাজার-হাজার লোকের উপকার হয়, ঢাক-ঢোল বেজে ওঠে, দেশসুদ্ধ বাহবা দেয়—তখন কল চলে গেছে, তখন বালকেও কাজ করতে পারে।...এখন দু'দশটা সিংহের প্রয়োজন—তখন শত-শত শৃগালেও উত্তম কাজ করতে পারবে।" "বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশি জ্বলে। সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহা যাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধহয় যেন এ-যাত্রা আলো দেখতে পাবো না, যখন আশাভরসা প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে—তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়।" "ক্ষীর-ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, একফোঁটা চোখের জল কখনো না ফেলে, কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন?—কাঁদো। কে'দে-কে'দে তবে চোখ সাফ হয়—তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়।"

॥ ২০ ॥ বাংলা গদ্যে বীররসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিবেকানন্দ

স্বামীজীর চলিত গদ্যে বাংলা বাগ্‌রীতির মুহুর্মুহু বর্ষণ এবং তাঁর নিজ শক্তিতে নতুন বাগ্‌রীতি সৃষ্টির কিছু নমুনা দেবার পরে, সাহিত্যরসিক ও সমালোচকদের কাছে স্বামীজীর আর একটি দানের কথা তুলে ধরতে চাই। বিদগ্ধজনেরা শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত—এই নবরসের বিষয়ে অবহিত আছেন। সম্ভবতঃ তাঁরা বাংলাসাহিত্যে বীররসের বিকাশ যথেষ্ট নয়, সে বিষয়ে সচেতন। কাব্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়, এবং নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উদ্যমে বীররস কিছু প্রকাশিত, বঙ্কিমের উপন্যাসেও ও-বস্তু অল্পবিস্তর আছে—কিন্তু সাধারণ গদ্যে, কমলাকান্তের দু'চার লাইন বাদ দিলে—প্রায় তা নেই—ব্যতিক্রম বিবেকানন্দ। বাংলা গদ্যসাহিত্যের এই বিশেষ দুর্বলতা বিবেকানন্দ তাঁর কলমের বাহুবলে একাই যেন বহুলাংশে দূর করেছেন। নির্দ্বিধায় বলা যায়, বিবেকানন্দই বাংলা গদ্যে বীররসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর রচনার ওজস্বিতা সম্বন্ধে অরবিন্দ একদা বলেছিলেন, "স্বামীজীর ভাষা। প্রাণের স[illegible] যা[illegible] ভাষায় ভাবের এরূপ ঝঙ্কার শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।" ১১০ আমরা [illegible] এ[illegible] স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা

বিবেকানন্দের পত্রাবলী ও অন্যান্য রচনাকে নিজেদের গীতা করে তুলেছিলেন, কারণ ও-সবের মধ্যে তাঁরা বীররসের যা স্থায়ী ভাব সে-বস্তু প্রচুর পেতেন—'উৎসাহ'।

স্বামীজীর রচনাবলীর নিবিষ্ট পাঠকের কাছে একটি জিনিস ধরা পড়বে—তিনি তাঁর বক্তৃতায় ও রচনায় প্রচুর যুদ্ধের ইমেজ ব্যবহার করেছেন।১১১ জীবনকে তিনি সংগ্রাম বলেই ধরেছিলেন। "নিয়ত প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মবিকাশ ও আত্ম-প্রসারের চেষ্টাকে" যিনি জীবনের লক্ষণ মনে করেছেন, তিনি যে, যুদ্ধের ভাষায় কথা বলবেন, তাতে বিস্ময়ের কি আছে। খোল করতাল বাঁশি বন্ধ রেখে তিনি রণদুন্দুভি বাজাতে বলেছেন, অন্ততঃ ভারতের ক্লৈব্যের কালে—এতো সকলেরই জানা আছে। কেবল বাংলা রচনায় নয়—ইংরাজিতেও তিনি যখন তাঁর শিষ্যদের কাছে কাজের জন্য কিছু লিখেছেন, তখন অনিবার্যভাবে যুদ্ধের ছবি ফুটে উঠেছে। অনুবাদেও মূলের শক্তি পুরো নষ্ট হয় না—এমনই ছিল সেইসব রচনার মৌল তেজ :

"যুদ্ধে নেমে পড়ো। পিছু হটো না। আকাশ থেকে নক্ষত্র খসে পড়তে পারে, জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, তবু যুদ্ধ করতে হবে। পশ্চাৎ-অপসরণ করে বিপদ এড়ানো যায় না।"

"যদি সমগ্র জগৎ তরবারি-হাতে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলেও যাকে সত্য বলে বুঝেছ, তাই করে যেতে পারবে কি? যদি স্ত্রী-পুত্র তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি ধন-মান সব যায়—তবু কি সত্যকে ধরে থাকতে পারবে?"

"সংগ্রাম—সংগ্রাম! যতক্ষণ না আলো দেখছ ততক্ষণ সংগ্রাম। এগিয়ে যাও।"

"যুদ্ধে যদি লক্ষ-লক্ষ লোকের পতন হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি—যদি জয়ী হয়ে দু'একজনও ফিরে আসে।"

"যে লক্ষ-লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হল তারা ধন্য—কারণ, তাদের রক্তমূল্যেই জয় হয়েছে।"

"আমি চাই এমন মানুষ যাদের লোহার মতো পেশী, ইস্পাতের মতো স্নায়ু, এবং একটি মন যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।"

"সেনাপতি যদি সৈন্যদলকে কামানের মুখে যেতে বলেন তাতে অভিযোগ করা চলবে না—আদেশ পালনে এতটুকু ইতস্ততঃ করবার অধিকার নেই।"

"সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করো। জীবন তো ক্ষণস্থায়ী। একটা মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন সমর্পণ করো।"

"পিছনে চেয়ো না। অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক। সামনে এগিয়ে যাও।"

"ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান।"

"আমার ভিতর যে-আগুন জ্বলছে—তোমাদের ভিতর সেই আগুন জ্বলে উঠুক। তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পারো।"

"আমরা সিদ্ধিলাভ করবই করব। শত-শত লোক এই প্রচেষ্টায় প্রাণত্যাগ করবে, আবার শত-শত লোক উঠবে। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি। অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। এগিয়ে যাও—প্রভু আমাদের নেতা। কে পড়ল—ফিরে দেখো না। একজন পড়বে, আর একজন তার স্থান গ্রহণ করবে।"১১২

সমকালীন বাঙালী লেখকদের প্রাণশক্তি সম্বন্ধে ভরসাহীন বিবেকানন্দ ভাষায় তূর্যধ্বনি করেছিলেন—সেই দীপ্র, ক্ষিপ্র, জ্বলন্ত বজ্রতুল্য ভাষা সত্যই দুর্লভ। তাঁর একটি চিঠির

কিছু অংশ অতঃপর উদ্ধৃত করছি—যা প্রেরণার দিব্যমুহূর্তেই লেখা সম্ভব (স্বামীজী নিজেও এই চিঠি লেখার কালে প্রেরণার উন্মাদনার কথা স্বীকার করেছেন)। এখানে চলিত ভাষায় যে প্রাণদ্যুতি দেখা গেছে তা সাহিত্যপ্রতিভা থেকে আসেনি—এসেছিল প্রবল জীবনী-শক্তি থেকে :

"কতকগুলো চেলা চাই—fiery young men—বুঝতে পারলে?—intelligent and brave—যমের মুখে যেতে পারে—সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত—বুঝলে? Hundreds ঐরকম চাই—মেয়ে মদ্দ both...যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা spiritual tidal wave আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়।...Life is ever expanding, contraction is death. যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নেই। যে আপনি নরক পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়—সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘরে-ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে।...ওঠো ওঠো, মহাতরঙ্গ আসছে, Onward! Onward! মেয়েমদ্দ আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—Onward! Onward! নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই—দেখা যাবে পরে। এখন এ-জন্মে অনন্ত বিস্তার—তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার।... যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে—দেখেও দেখছ না? একি ছেলেখেলা, একি জ্যাঠামি, একি চ্যাংড়ামি? উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। হরে হরে!... Onward! হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত—তাদের সেবার জন্য যে-যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া, মহাশক্তি বসবেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী—তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক। আমি আর লিখতে পারছি না—বাকি তিনি নিজে বলুন গে।"

বিবেকানন্দের ভিতরে যজ্ঞকুণ্ড জ্বলছিল—তার স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ত সর্বদা। মরা মানুষকে জাগাবার ভাষা তাঁর—যে ভাষা মহাভারতে কৃষ্ণের—মোহগ্রস্তকে জাগাবার জন্য। সেনাপতির মতো যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুর গহ্বরে মশাল হাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্য আহ্বান করেছেন—এবং তা কোমল বাংলা ভাষাতেই!!—

"বলো, অস্তি অস্তি! নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল! সোঽহং সোঽহং শিবোঽহম্। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে। ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই বলে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহম্। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে।...ঐ যে ছুঁচোগিরি, 'দীনাহীনা' ভাব—ও হল ব্যারাম। ওকি বিনয়, ও গুপ্ত অহঙ্কার। ন লিঙ্গং ধর্মকারণং, সমতা সর্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্। অস্তি অস্তি অস্তি, সোঽহং সোঽহং, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্। 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।'...অ্যাভালেঞ্চের মতো দুনিয়ার উপর পড়্—দুনিয়া ফেটে যাক চড়্‌চড়্ করে। হর হর মহাদেব।...দাঁড়িয়ে জান্ দে।...ওরে হতভাগারা, এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়। বড় লোক তাঁরা—যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন। এই হয়ে আসছে চিরকাল। একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার-হাজার লোক তার উপর দিয়ে নদী পার হয়।.. যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস করো, ওকে বিশ্বাস করো। বলি প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস করো দিকি।...বল্, আমি সব করতে পারি।

'নেই নেই' বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়। খবরদার—No নেই নেই—বল্—হাঁ হাঁ—সোঽহং সোঽহম্।...মহা হুহুঙ্কারের সহিত কার্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়। কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্। ব্যাম-ফ্যাম সব ঝেড়ে ফেলে দিতে বলো—এক ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যাম-ফ্যাম সেরে যাবে। আত্মাতে কি ব্যাম ধরে নাকি?...'দীনাহীনা!' কিসের 'দীনাহীনা?' আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা! কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? 'দীনাহীনা' ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করো দিকি।...No negative, all positive, affirmative. I am, God is, and everything is in me. I will manifest health, purity, knowleage, and whatever I want...'দীনাহীনা' কি এইসি তেইসি—নেই মাঙতা 'দীনাক্ষীণা!' 'বীর্যমসি বীর্যং, বলমসি বলম্, ওজোঽসি ওজঃ, সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি'।" "রৈ রৈ হয়ে যাক। ওয়া বাহাদুর! সাবাস! নিধে-পেলার দল প্রেমের তরঙ্গে ভেসে চলে যাবে।" "হাজার-হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যা-কুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।...ছড়াও, ছড়াও—আগুনের মতো যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখো না। আমি মরি বাঁচি—তোমরা ছড়াও, ছড়াও।" "'হে ভগবান! হে ভগবান!—আরে ভগবান হেন করবেন, তেন করবেন—আর তুমি বসে-বসে করবে কি?...তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব করছে—আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন?" "ও কোন্ দিশী বিনয়—'আমি কিছু জানি না, আমি কিছুই নই!'...আমি জানিনি তো কোন্ শালা জানে?...আমি সব করতে পারি, সব করব। যার ভাগ্যে আছে সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষ্মীছাড়া-গুলো বেড়ালের মতো কোণে বসে মেউ-মেউ করবে।...মার কৃপায় আমি এক লাখ আছি, দশ লাখ হব।" "আমার পুরনো বোল্—struggle, struggle up to light. Onward." "পেছু দেখতে হবে না—forward!...দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।" "তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা দেখি—হুহুঙ্কারে দুনিয়া তোলপাড় করে দেব। এই তো সবে সন্ধ্যে রে ভাই।...ভয় কি? কার ভয়? ছাতি বজ্র করে লেগে যাও।" "লোহার দিল চাই—তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মতো হতে হবে—পাহাড় পর্বত যাতে ভেদ হয়ে যায়।" "কর্ম কর্ম কর্ম—হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গ্তে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম even unto death...ভ্যালা মোর ভাইরে, অ্যাইসাই চলো।" "শরীর তো যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায়? It is better to wear out than rust out. মরে গেলেও হাড়ে-হাড়ে ভেল্কি খেলবে। দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেলতে হবে—এর কমে হবেই না। তাল ঠুকে লেগে যাও। ওয়া গুরুকী ফতে!" "কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই। কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত।...এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে—তবে মানুষ।...তোমাদের এক-একজনের দাপটে ধরা কাঁপবে।" "আমি চাই, তোমরা কাজ করতে-করতে মরেও যাও—তবু তোমাদের লড়তে হবে।"

সবশেষে দেখা যাক স্বামীজীর বজ্ররবে আত্মবিদারণ :

"বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব। এখানে মেয়েমানুষের মতো বসে থাকা কি আমার সাজে?" "তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্ দুনিয়া। কি বলব, আপশোষ—যদি আমার মতো দুটো-তিনটে তোদের মধ্যে থাকত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম।..তোলপাড় কর্, তোলপাড় কর্!" "আমি চিরকাল বীরের মতো চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মতো শীঘ্র আর বজ্রের মতো অটল চাই। আমি ঐ রকমই মরব।...আমি লড়ায়ে কখনো পেছপাও হইনি।...হার-জিত সকল কাজেই আছে। তবে আমার বিশ্বাস যে, কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কৃমিকীট হয়ে জন্মায়।...আমার চোখে এ-জীবনটা এমন-কিছু মিষ্টি নয় যে, অত ভয়-ডর করে,

হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচতে হবে।...লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি। যে বলে, 'কুছ্‌পরোয়া নেই, ওয়া বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি'—তাকে বুঝি—সে বীরকে বুঝি—সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি-কোটি নমস্কার।...যত বীর এ-জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখনো কোনো কাজ থেকে হঠেন নি, যে-সকল বীর ভয় আর অহংকারবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেন নি—তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিনমিনে, ভিনভিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে! হে গুরুদেব!—তুমি চিরকাল বলতে—'এ বীর!'—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়।...জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন—শিয়রে শমন—তাহা না ডরাক তোমা। যা কখনো করিনি—রণে পৃষ্ঠ দিইনি—আজ কি তাই হবে? হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ—কিন্তু না লড়ে হারব?"

রোমা রোলাঁ যে বলেছেন—বিবেকানন্দের কথাকে ছুঁলে বিদ্যুৎ-শক্ লাগে—কে অস্বীকার করবে?

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট : ভারতে যন্ত্রশিল্পায়ন প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

॥ ১ ॥ বিবেকানন্দের সঙ্গে জামসেদজী টাটার পরিচয়ের সূচনা

চিরন্তনের উপর অবস্থিত ছিলেন বলে বিবেকানন্দের পক্ষে স্বচ্ছন্দে মডার্ন হওয়া সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একবার "শাশ্বতভাবে আধুনিক" কথাগুলো ব্যবহার করেছিলেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সহজেই তাদের প্রয়োগ করা চলে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তার ক্ষেত্রে সমকালীন ভারতবর্ষে অন্যান্য মনীষীদের তুলনায় বিবেকানন্দের অগ্রবর্তিতার কথা বহুভাবে বলেছি। সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র, গণশিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, কলাশিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার রূপ আমরা দেখেছি। এই অধ্যায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যন্ত্রশিল্পায়ন প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব লক্ষ্য করব। গোড়াতেই সমকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ইতিহাস কিছুটা উদ্‌ঘাটিত করতে চাই।

স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী জামসেদজী টাটার একটি পত্র মুদ্রিত আছে। কিন্তু কোন্ পটভূমিকায় সেটি লিখিত হয়েছিল তার কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। অথচ পটভূমিকা ছিল বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক ভারতবর্ষে বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত একটি বিষয়ের সঙ্গে তা যুক্ত।

জামসেদজী টাটার সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে—যখন তিনি অখ্যাত সন্ন্যাসী—বিনা পরিচয়পত্রে আমেরিকা যাচ্ছেন চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে। স্বামীজীর জীবনীগুলি পড়ে মনে হয়, স্বামীজী বুঝি বোম্বাই থেকে ৩১ মে, ১৮৯৩ তারিখে 'পেনিনসুলার' নামক জাহাজে উঠে, সেই জাহাজে করেই আমেরিকা পৌঁছে গিয়েছিলেন, যদিও স্বামীজী স্বয়ং ১০ জুলাই, ১৮৯৩-এর চিঠিতে জাপানের কোবি বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। স্বামী চেতনানন্দ আশ্বিন, ১৩৮০, উদ্বোধনে, এক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে ("বিবেকানন্দ : বম্বে থেকে বঙ্কুবর")—"ডেইলি নিউজ অ্যাডভারটাইজার, ভ্যাংকুবর" পত্রিকার ২৬ জুলাই, ১৮৯৩-এর সংবাদ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, স্বামীজী ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় ভ্যাংকুবরে পৌঁছান "এমপ্রেস অব ইণ্ডিয়া" জাহাজ-যোগে। ঐ সংবাদপত্র থেকেই দেখা যায়, জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে "মিঃ এস বিবস্‌কানন্দ্র" ও স-ভৃত্য মিঃ টাটাও ছিলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা যাত্রাপথেই যে, টাটার পরিচয় হয়েছিল, সে-সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

"ইয়াকোহামা হইতে স্বামীজী পুনরায় জাহাজে উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া একেবারে ভ্যাংকুবরে চলিয়া যান।...সুপ্রসিদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি টাটাকে বলিয়াছিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র। এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতি-পালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।' কিন্তু টাটা সে-প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া

নানারূপ আপত্তি দর্শাইতে লাগিলেন। সে সময়ে টাটার জাপানি দেশলাই একচেটিয়া ছিল।"১

তিরিশ বৎসর বয়স্ক এক অখ্যাত ছোকরা সাধু, টাটার মতো বিখ্যাত ব্যবসায়ীকে উপদেশ দিচ্ছেন, এ-ব্যাপারটা ঈষৎ বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু অন্যত্রও যেমন, এখানেও তাই —বিবেকানন্দের পরিচয়পত্রের প্রয়োজন কদাপি হয়নি। পরবর্তীকালে নিবেদিতাকে টাটা বলেছিলেন, (নিবেদিতার ৩ অক্টোবর, ১৯০১-এর চিঠি), "স্বামীজী যখন জাপানে ছিলেন তখন যে-কেউ তাঁকে দেখেছে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে বুদ্ধের সাদৃশ্য দেখে চমকিত হয়ে উঠেছে।"

এই পর্বে স্বামীজীর সঙ্গে টাটার পরিচয় ঠিক কখন হয়—এবং তার বিস্তৃতি কত-দিনের? স্বামী চেতনানন্দ অনুমান করেছেন, স্বামীজী যখন জাপানের দেশলাই-কারখানা দেখতে গিয়েছিলেন—সেখানেই তাঁর সঙ্গে টাটার প্রথম পরিচয় হয়। হতে পারে। জাপানের ইয়াকোহামার "ওরিয়েণ্টাল হোটেল রেস্টুরাণ্ট"-এ থাকার সময়েও তাঁদের প্রথম আলাপ হতে পারে—যেমন স্বামী বলরামানন্দ অনুমান করেছেন। [প্রবুদ্ধ ভারত, অক্টোবর, ১৯৭৮]। কিন্তু কোনো সন্দেহই নেই, সে পরিচয় গাঢ়তর হয়েছিল ইয়াকোহামা থেকে ভ্যাংকুবর পর্যন্ত জাহাজে যাত্রাকালে। ভালো আবহাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় বারো দিন লাগত ঐ জাহাজযাত্রায়।

॥ ২ ॥ ভারতে বিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য টাটার বিরাট দান : বেসরকারী মহলে উল্লাস ও সরকারী মহলে বিরূপতা

১৮৯৩ সালে, অখ্যাত তবু বুদ্ধসদৃশ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় জ্বলে উঠলেন, যার ফলে ভারতবর্ষে ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়ে গেল—তখন বলাবাহুল্য জামসেদ টাটার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীজী ভারতীয় জনমনে কোন্ সমুচ্চ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন—তাও টাটা লক্ষ্য করলেন। এর অল্পদিন পরে তিনি নিজেও চাঞ্চল্যকর একটি কাণ্ড ঘটালেন, যাতে দারুণ নাড়া খেল সরকারী ও বেসরকারী মহল। সে সম্বন্ধে ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদটি অংশত এই :

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহদান
মিঃ জে এন টাটার বদান্য প্রস্তাব

বোম্বাইয়ের সুপরিচিত লক্ষপতি ব্যবসায়ী মিঃ জে এন টাটা উপযুক্তভাবে সংগঠিত একটি কমিটির হাতে শর্তাধীনে কিছু ভূসম্পত্তি দিতে চান, যার থেকে বাৎসরিক আয় হবে সওয়া লক্ষ টাকা। [সম্পত্তি—তিরিশ লক্ষ টাকার]। দানের উদ্দেশ্য স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন। শিল্প ও বাণিজ্যের বৃত্তি গ্রহণের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষা মূল্যে সবিশেষ—মিঃ টাটার এই ধারণার কথা সকলেরই জানা আছে। তিনি প্রায়শঃই কিছুসংখ্যক গ্রাজুয়েটকে নির্বাচন ক'রে তাঁর কোনো না কোনো মিলে তিন বৎসরের শিক্ষানবিশীরূপে নিয়োগ করেন, এবং প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে এই গ্রাজুয়েটদের ঐকালে ভাতা দেন।...মিঃ টাটা অধিকন্তু কিছুকাল ধরে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার অগ্রগতির প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। ...তিনি অনুভব করেছেন—যেখানে জাপানের পক্ষে পৃথিবী-খ্যাত গবেষণা করা সম্ভব হয়েছে, এবং দুজন জাপানী এমনকি চিকাগোয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, সেখানে ভারতীয়

১ 'ঘটনাবলী,' ৩য়, ৩।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনুরূপ কোনো সাফল্যের নিদর্শন দেখাতে পারেনি। মিঃ টাটা না ভেবে পারেন নি—দেশের প্রাকৃতিক ও অন্য সম্পদসমূহের উদ্ধার ও সদ্‌ব্যবহার করতে পারে প্রতিভাবান তরুণেরাই, যারা শিল্প-বাণিজ্যগত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করবে।...এদেশের ছাত্রদের গবেষণাকার্যে প্রণোদিত করবার জন্য...গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা প্রয়োজন, যেখানে ছাত্ররা প্রখ্যাত শিক্ষকদের অধীনে কাজে নিযুক্ত থাকবে।

"মিঃ টাটা জেনেছেন, এজন্য দরকার—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্নাতকোত্তর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির (যথা জন হপকিনস্‌ বা ক্লার্ক) আদর্শে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা আমাদের কোনো একটি ইতিমধ্যে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন। তাই হবে ভারতবর্ষে গবেষণার মনোভাব-সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। মিঃ টাটা ইউরোপে প্রাথমিক খোঁজখবর নিয়ে, এবং ইংলণ্ড ও পাশ্চাত্ত্যের অন্যত্র সর্বোচ্চ শিক্ষাবিজ্ঞানীদের উপদেশ গ্রহণ ক'রে, উপরিউক্ত প্রস্তাব করেছেন।"২

সংবাদটি যে ভারতবর্ষের শিক্ষিতসমাজে অপরিসীম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে, তা সহজেই অনুমেয়। তি-রি-শ ল-ক্ষ টাকা দান!! হৃতসর্বস্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার তখন। সে টাকা দিচ্ছেন একজন ব্যবসায়ী—কিন্তু কোনো সরকারী প্রসাদকামনায় নয়—শিক্ষাবিস্তারের জন্য!!! প্রস্তাবটি তখনই এল যখন ভারতে শিক্ষাসংকোচের জন্য সরকারী আয়োজন চলেছে। দারুণ সাহস টাটার—তিনি তাঁর এই আপাতনিরীহ দানের মধ্য দিয়ে সরকারকে কঠোর আঘাত হানলেন। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য পুঁথিপড়া বিদ্যার যেটুকু বিস্তার ইংরেজ এদেশে করেছিল—তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমলাতন্ত্রের মসীভৃত্য তৈরী করা। মৌলিকতার সঙ্গে যে এই শিক্ষার কোনো সম্পর্কই ছিল না, তা মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর চিঠি (৩০ অক্টোবর, ১৮৯৯) থেকে আগেই দেখে এসেছি। দেশের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গেও ঐ শিক্ষার যোগ বিশেষ ছিল না, কারণ ফলিত বা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানশিক্ষা অবহেলিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতেই জামসেদজী টাটা এগিয়ে এলেন বিপুল অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। শিক্ষিত ভারতবর্ষ টাটার জয়ধ্বনি দিল সমস্বরে।৩

কলকাতার বেঙ্গলী কাগজ কয়েকদিনের মধ্যে টাটা-পরিকল্পনার কিছু বিস্তারিত বিবরণ হাজির করে বলল, শেষ পর্যন্ত অবশ্য সঠিক পরিকল্পনা নির্ধারণ করবে একটি কমিটি, যথোপযুক্ত অনুসন্ধানাদির পরে। বেঙ্গলীর ৮ অক্টোবরের সংবাদে পাই : এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের জন্য উদ্দিষ্ট—পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নয়। উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্তরাই

২ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ ও মন্তব্য, সেইসঙ্গে নথিপত্র মূল ইংরাজিতে দেওয়া হয়েছে বর্তমান লেখকের "বিবেকানন্দ, নিবেদিতা অ্যান্ড টাটাস্‌ রিসার্চ স্কীম' নামক প্রবন্ধ ভারতের অক্টোবর ও নভেম্বর, ১৯৭৮, দুই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে।

৩ নমুনা হিসাবে অমৃতবাজারের মন্তব্য কিছু তুলছি, যে-জাতীয় কথা ভারতের প্রায় সকল দেশীয় কাগজই বলেছিল :

"Mr J. N. Tata's gift of thirty lakhs of rupees...is an event which ought to be published in golden letters by every newspaper in India. Such princely munificence has never been heard of in this country... It is impossible for the nation to discharge the debt of obligation under which they have been laid by Mr Tata. Even if they were to vote a golden statue for him, it would be nothing, compared with the welfare which he seeks to confer on them by his donation. It is God alone Who can give him proper reward for his noble work, not here, but in a better world." [*Amrita Bazar*, Oct. 5, 1898]

এখানে প্রবেশ করতে পারবে। এখানে অনুসৃত হবে ইউরোপের 'জার্মান সেমিনারিয়া,' 'ফ্রেঞ্চ কনফারেনসেস,' আমেরিকা ও ইংলণ্ডের রিসার্চ ক্লাসসমূহে অনুসৃত পদ্ধতি। ভারতের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সংঘর্ষেরও কারণ নেই, কারণ ঐসব বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা যেখানে সমাপ্ত হবে, সেখানে শুরু হবে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষাদানই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। তাই বলে বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানো বন্ধ করাও এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য নয়—এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অবশ্যই বিদেশে পরবর্তী শিক্ষার জন্য পাঠানো হবে, ইত্যাদি।

টাটার এই বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে সরকার কি করল? বলাবাহুল্য স্বাভাবিক কর্মই করল। ভারতবর্ষে যে-জিনিসকে শাসকশ্রেণী ঠেকাতে চেষ্টা করেছে স্বদেশের স্বার্থে, (ভারত-বর্ষের বিজ্ঞান-জ্ঞান ও কারিগরি-দক্ষতা অবশ্যই বিলেতি শিল্পবাণিজ্যের অবাধ শোষণের সহায়ক হবে না)—সে-বস্তুর অবাধ প্রসার সে ঘটতে দিতে পারে না, যত কৌশলেই তার পক্ষে চেষ্টা করা হোক। টাটা-প্রস্তাব ঠেকাতে সরকার চতুর ও নিম্নশ্রেণীর কৌশল দেখাতে লাগল যৎপরোনাস্তি। ভাইসরয় লর্ড কার্জন টাটা-পরিকল্পনার সমালোচনা করলেন প্রকাশ্যে, যদিও সহানুভূতি প্রদর্শনের পরিশীলিত ভঙ্গিটি ঠিকই বজায় রাখলেন। বেঙ্গলী ১৪ জানুয়ারি, ১৮৯৯, লিখল :

"লর্ড কার্জন মিঃ টাটার পরিকল্পনার বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েও, কতকগুলি ব্যাপারে সুগভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যথেষ্টসংখ্যক ছাত্র পাওয়া যাবে কিনা সে-সম্বন্ধে লর্ড-বাহাদুর সুনিশ্চিত নন। শূন্য বেঞ্চের সামনে উচ্চ-মাহিনার অধ্যাপকদের বক্তৃতা করতে নিয়োগ করা সঙ্গত নয়। লর্ড-বাহাদুরের আরও সন্দেহ, সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষা সমাপ্ত করে যে-সমস্ত ছাত্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরুবে, তারা অবিলম্বে চাকুরি পাবে না, কেননা বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত ভারতীয় উপযুক্ত চাকরি, এমনকি কোনো চাকরিই তো এখন পাচ্ছে না!"

ঐ মন্তব্যেই দেখি, লর্ড কার্জন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে মিঃ জাস্টিস ক্যান্ডি বলেছিলেন—এখন কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, ক্রমে সময়-সুযোগমতো পরিকল্পনার প্রসার ঘটানো যাবে। মহীশূরের দেওয়ান তাঁর রাজ্যের পক্ষে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব করে-ছিলেন, তাও বেঙ্গলী বলেছিল।

অতঃপর সরকারী প্ররোচনায় টাটা-কর্তৃক নিয়োজিত অধ্যাপক রামজে, অনুসন্ধানাদির পরে যে-রিপোর্ট দিলেন, তাতে অধিকতর অর্থের প্রয়োজনের কথা বলা হল; এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহির্গত ছাত্রদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়, সেই কার্জনী-ভাষ্যের সমর্থনও রইল—কিন্তু একইসঙ্গে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানশিক্ষার শোচনীয় অবস্থার কথা উনি না বলে পারলেন না!! এবং বলতে ভুলে গেলেন—উক্ত অবস্থার উন্নতির জন্যই টাটা-পরিকল্পনা!!!৪

সরকারী বিরোধিতায় টাটা ধাক্কা খেলেন। আরও অর্থের প্রয়োজন যেখানে, গুটিয়ে গেল সেখানে দানের বেসরকারী হস্ত, যেহেতু পরাধীন ধনীগণ সরকারের শক্ত চোয়াল দেখতে ভালবাসে না। অতঃপর শোনা গেল, টাটা গত্যন্তরহীন হয়ে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহারের কথা চিন্তা করছেন। সারা দেশের বুদ্ধিজীবী-মহল তখন আর্তনাদ করে উঠল, কারণ, "একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, এই প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউট অপূর্বভাবে ভারতের শিল্প-জাগরণের দিনসূচনাকে ত্বরান্বিত করতে উদ্দিষ্ট। শিল্প-জাগরণের উপরই নির্ভর করছে ভারতের লক্ষ-লক্ষ মানুষের পরিত্রাণ।...ভারতের পুরাতন শিল্প অতীতের বস্তু এখন। নবযুগের প্রয়োজন নতুন শিল্প, অব্যবহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার, এদেশে সর্বত্র ছড়ানো কাঁচামালের পূর্ণ ব্যবহার।

ও-সবই অপেক্ষা করে আছে সন্ধানী প্রতিভার যাদুস্পর্শের জন্য।" [বেঙ্গলী, ৫.৩. '৯৯]।

বেঙ্গলী ৬ এপ্রিল ভাবাবেগে লিখল : "মিঃ টাটার ইনস্টিটিউট ভাবীকালে সমুচ্চ মনন-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠার জন্য নির্ধারিত। সেই প্রতিযোগিতা-ভূমিতে আমাদের সর্বোত্তম ও মহত্তম যুবকগণ মৌলিক গবেষণার দিব্য উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়ে, পরস্পর প্রতিস্বন্দ্বিতা করে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার ক'রে যাবে, যাতে বস্তুর উপর মানব-মনের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এইসকল বিরাট আশা মিঃ টাটার প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে। তিনিই জাগিয়েছেন আশা। এখন তিনি সরে যেতে পারেন না। না—তাঁর সমাজবোধ—তাঁর জনকল্যাণেচ্ছা—তাঁকে সরে যেতে দেবে না।"

॥ ৩ ॥ যন্ত্রশিল্পায়নে বিবেকানন্দের প্রথমাবধি আগ্রহ

পাঠকগণ অবশ্যই বুঝবেন—টাটা-পরিকল্পনায় স্বামীজী কতখানি আগ্রহবোধ করেছিলেন। 'আগ্রহ' কথাটিও যথেষ্ট নয়—বলা উচিত, স্বামীজী এ-সম্বন্ধে ব্যাকুলতা বোধ করেছিলেন। এ যেন তাঁর একটি জীবনস্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের সম্ভাবনা। ফেলে-আসা ইতিহাসের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি ফেরাই দেখতে পাব—স্বামীজীর আমেরিকাগমনের অন্যতম কারণ—দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করার উপায়সন্ধান। পরিব্রাজক-জীবনে ভারতভ্রমণকালে তিনি ভারতের বিধ্বস্ত নিঃস্ব অবস্থা দেখে যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন, ভেবেছেন, কেবল কৃষিতে এই দেশের দারিদ্র্য দূর হবে না, পরিপূরক শিল্প চাই। সেই শিল্পায়নের পদ্ধতি শিখে আসার প্রয়োজন আছে, শিল্পসমৃদ্ধ পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে। স্বামীজী তাঁর সেই উদ্দেশ্যের কথা নানা স্থানে নানা ভাবে বলেছেন। সে-সকলের উল্লেখ না ক'রে, আমেরিকায় পেঁৗছবার পরে কিন্তু ধর্মমহাসভায় আবির্ভূত হবার আগে, তিনি এ-সম্পর্কে যা বলেছেন, তার কিছু অংশ উপস্থিত করা যায়। লুই বার্ক তাঁর 'ডিসকভারিজে' আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে নিম্নের সংবাদগুলি সংকলন করে দিয়েছেন :

"বক্তা তাঁর দেশবাসীদের জন্য তাঁর কর্মোদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন : তিনি দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য সন্ন্যাসীদের সংগঠিত করতে চান—যাতে এই সন্ন্যাসীরা জনগণকে তাঁদের শিল্প-জ্ঞানের ফলদান করতে পারেন। তার দ্বারা ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।" [ডেইলি গেজেট', ২৯ অগস্ট, ১৮৯৩]।

"বক্তা তীব্রভাবে ভারতের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কথা বলেন।...সেখানে অর্ধেক মানুষ দিনে কেবল একবার খাবার জোটাতে সমর্থ; বাকি অর্ধেক জানেনা, এক আহারের পরবর্তী আহার কিভাবে জুটবে।...বক্তা বলেন, ভারতের লক্ষ-লক্ষ ক্ষুধার্ত, পীড়িত মানুষের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমেরিকান জনগণকে অবহিত করবার জন্য তিনি এসেছেন।...আমেরিকানরা ভারতে ধর্মশিক্ষাদানের জন্য মিশনারি না পাঠিয়ে, জনগণকে শিল্পশিক্ষা দিতে পারবে, এমন লোক পাঠালেই ভালো করবে।" ['সালেম ইভনিং নিউজ', ২৯ অগস্ট, ১৮৯৩]

"আধুনিক ভারতবর্ষে ..মিশনারিরা জনগণকে ধর্মশিক্ষা না দিয়ে সামাজিক ব্যাপারে এবং শিল্পসম্বন্ধীয় বিষয়ে শিক্ষিত করলেই ভালো করবেন।" ['ডেইলি গেজেট, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩]৫

আমেরিকায় পদার্পণ করেই যখন স্বামীজী এইসব কথা বলেছেন, তখন ধরে নিতে

৫ 'ক্রিটিক' পত্রিকায় কিছু পরে (১১ নভেম্বর, ১৮৯৩) লুসি মনরো লিখেছিলেন, "তাঁর [স্বামীজীর] আমেরিকায় আসার আদি উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দুদের মধ্যে নতুন শিল্পোদ্যোগে আমেরিকানদের আগ্রহী করা।" ['ডিসকভারিজ,' ৯৮]

পারি, তার সামান্য আগে আমেরিকার পথে জামসেদজী টাটার মতো দেশহিতব্রতী বদান্য ব্যবসায়ীকে কাছে পেয়ে, এই বিষয়ে আরও বহু কথা বলেছিলেন। নিশ্চয় তিনি টাটাকে ভারতে শিল্প-শিক্ষাদানের জন্য সন্ন্যাসীদের সংঘবদ্ধ করার নিজস্ব পরিকল্পনার কথা সবিশেষ বলেছিলেন। কে জানে, টাটার মনে সেই কথাগুলি বীজাকারে বর্তমান থেকে রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিকল্পনায় অঙ্কুরিত হয়েছিল কিনা।৬

৬ এইসূত্রে বিবেকানন্দ-রকফেলার কাহিনীটি স্মরণ করতে পারি। লুই বার্ক, বিখ্যাত অপেরা গায়িকা মাদাম কালভের বান্ধবী মাদাম ভার্দিএ-র নোট থেকে কাহিনীটি পেয়েছেন। মাদাম কালভে মাদাম ভার্দিএ-কে ঘটনাটি বলেছিলেন। যেহেতু রকফেলারের [আমেরিকার প্রখ্যাত ধনকুবের, বিরাট দানশীল ব্যক্তি] কোনো জীবনীতে এই কাহিনী নেই, তাই একে বিশ্বাস করা বা না-করার স্বাধীনতা তিনি পাঠককে দিয়েছেন। কাহিনীটি এই :

"স্বামীজী তখন চিকাগোর মিঃ 'এক্স'-এর বাড়িতে ছিলেন। মিঃ 'এক্স', জন ডি রকফেলারের কোনো এক ব্যবসায়ে পার্টনার বা সহযোগী ছিলেন। রকফেলার অনেক সময়েই তাঁর বন্ধুকে, তাঁর বাড়িতে অবস্থানকারী অপূর্ব অত্যাশ্চর্য হিন্দুসন্ন্যাসীর বিষয়ে কথা বলতে শুনেছেন। অনেকবারই তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বন্ধুকর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু এটা-ওটা কারণ দেখিয়ে তা সর্বদা অগ্রাহ্যও করেছেন। সে সময়ে রকফেলার তাঁর সমৃদ্ধির শিখরে না উঠলেও—তারই মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী পুরুষ, কঠোর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, যাঁকে নাড়ানো কঠিন, যিনি কারো বচনে চলবার পাত্র নন।

"কিন্তু একদিন, যদিচ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে কোনোই অভিপ্রায় ছিল না, তথাপি ভিতর থেকে কোনো এক তাগিদে চালিত হয়ে নিজের বন্ধুর বাড়িতে রকফেলার হাজির হলেন; দরজা খুলল বাটলার; তাকে ঠেলে ঢুকে পড়ে বললেন—হিন্দুসন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। বাটলার তাঁকে, স্বামীজীর অবস্থানকক্ষে নিয়ে গেলে, বিনা ঘোষণায় তিনি সংলগ্ন পাঠকক্ষে ঢুকে পড়লেন, এবং অবশ্যই বিস্মিত হলেন যখন দেখলেন—লেখার টেবিলের ওদিকে উপবিষ্ট স্বামীজী চোখ তুলেও দেখলেন না—কে ঢুকেছে।

"কিছু পরে স্বামীজী, কালভের ক্ষেত্রে যেমন করেছিলেন এখানেও তাই করলেন—রকফেলারকে তাঁর অতীতের অনেক কথা বলে গেলেন যা স্বয়ং রকফেলার ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। স্বামীজী তাঁকে অনুভব করালেন : যে-অর্থ তিনি জমিয়েছেন, তার মালিক তিনি নন—তিনি নিমিত্ত মাত্র—পৃথিবীর মঙ্গল করাই তাঁর কর্তব্য, ঈশ্বর অর্থ দিয়েছেন যাতে তিনি মানুষের সেবা ও সাহায্য করতে পারেন।

"রকফেলার বিরক্তি ও অস্বস্তিতে পড়লেন—তাঁর সঙ্গে এইভাবে কেউ কথা বলতে বা উচিত-অনুচিত শোনাতে পারে—এমন সাহস! তিক্ত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে বিদায়সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু প্রায় সপ্তাহখানেক পরে, পূর্ববৎ জানান না দিয়ে স্বামীজীর পাঠকক্ষে ঢুকে, তাঁকে পুনশ্চ একইভাবে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি স্বামীজীর ডেস্কের উপর একটি কাগজ ছুঁড়ে দিলেন, যাতে জনহিতকর একটি প্রতিষ্ঠানে বিরাট অর্থদানের পরিকল্পনার কথা লেখা আছে। 'এই যে মহাশয়!' রকফেলার বললেন, 'মনে হয় এখন আপনি খুশি। আশা করি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন।'

"স্বামীজী চোখও তুললেন না, নড়লেনও না। কাগজটি তুলে নিয়ে নীরবে পড়লেন। বললেন 'আপনারই আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।' এই শেষ। এই হল রকফেলারের জনকল্যাণে প্রথম বৃহৎ দান।"

মাদাম ভার্দিএ-র দেওয়া উপরের কাহিনীটি উপস্থিত করবার পরে লুই বার্ক রকফেলারের বি এফ উইংকলম্যান-প্রণীত জীবনী থেকে রকফেলারের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "টাকা উপার্জন করা ছাড়া জীবনের আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে। টাকা যেন মানুষের হাতে গচ্ছিত বস্তুর মতো। তার অসদ্ব্যবহার করা পাপ। মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সেরা উপায় হল—অপরের জন্য বাঁচা। আমি সেই চেষ্টাই করছি।"

আমরা দেখি, স্বামীজী তাঁর জীবনের এক পর্বে শক্তিশালী ও অর্থশালী মানুষদের জনকল্যাণে প্রণোদিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তার মানে নয় তিনি ঐ উপায়কেই জনমুক্তির উপায় ভেবেছিলেন।

॥ ৪ ॥ স্বামীজীর সমর্থন চেয়ে টাটার পত্র ও তার উত্তর

জামসেদজী টাটা যে স্বামীজীর সঙ্গে পাঁচ বছর আগেকার প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা স্মরণ করেছিলেন, তা ২৩ নভেম্বর, ১৮৯৮, তারিখে স্বামীজীকে লেখা তাঁর পত্র থেকে দেখা যায়। পত্রটি এই :

"প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ, আমার বিশ্বাস আপনি জাপান থেকে চিকাগোর পথে জাহাজে সহযাত্রীরূপে আমাকে মনে রেখেছেন। ভারতে সন্ন্যাসীসুলভ ত্যাগের আদর্শের পুনর্জাগরণ, ঐ আদর্শকে ধ্বংস করার পরিবর্তে যথাযোগ্য পথে চালিত করার কর্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত বর্তমান মুহূর্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

"ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনার কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন বা পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাববাজির কথা আমি স্মরণ করছি। মনে হয়, যদি ত্যাগব্রতী মানুষেরা আশ্রমজাতীয় আবাসিক স্থানে অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রে প্রাকৃতিক ও মানবিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে—তাহলে তার অপেক্ষা ত্যাগাদর্শের শ্রেষ্ঠতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে না। আমার ধারণা, এই জাতীয় ধর্মযুদ্ধের দায়িত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ করলে তার দ্বারা ধর্মের ও বিজ্ঞানের উন্নতি হবে, এবং দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর, এই অভিযানে বিবেকানন্দের তুল্য মহানায়ক কে হতে পারেন! আপনি কি এই পথে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে নবজীবন দান করবার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন? বোধহয় শুরুতে এ-ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করবার জন্য অগ্নিময় বাণী সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রচার করলেই ভালো করবেন। প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার আমি সানন্দে বহন করব। শ্রদ্ধানত, হে প্রিয় স্বামীজী, আপনার বিশ্বস্ত, জামসেদজী এন টাটা।"

টাটা বুঝেছিলেন তাঁর পরিকল্পনা সফল করতে শুধু টাকাই যথেষ্ট নয়—মানুষ চাই—আর মানুষকে আহ্বান করে জাগাতে তাঁর কাছে বিবেকানন্দের চেয়ে বড় সেনাপতি কেউ ছিলেন না। স্বামীজী, টাটার প্রস্তাবিত প্যামফ্লেট প্রচার করেছিলেন কিনা জানা যায় নি,[১] সম্ভবত করেন নি, কিন্তু টাটার আবেদনের উত্তরে, তাঁর দ্বারা বা তাঁর নির্দেশে প্রবুদ্ধ ভারতে এপ্রিল, ১৮৯৯ সংখ্যায় যে-লেখা বেরিয়েছিল আমরা নীচে তা উপস্থিত করছি :

মিঃ টাটার পরিকল্পনা

"ভারতের মঙ্গলের জন্য এ-পর্যন্ত যত পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে মিঃ টাটার পোস্ট গ্রাজুয়েট ইউনিভার্সিটি পরিকল্পনার অপেক্ষা সময়োচিত ও সুদূরপ্রসারী ফলপ্রদ আর কিছু হয়েছে কিনা সন্দেহ। পরিকল্পনাটি আমাদের জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে ঠিক দুর্বল জায়গাটি কোথায় তা পরিষ্কার অনুধাবন ক'রে, তার দূরীকরণে যে-প্রকার স্বচ্ছদৃষ্টি, সুনির্দিষ্ট বুদ্ধি দেখিয়েছে, তার অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র দেখা গেছে ঐ পরিকল্পনার সহগামী বিপুল বদান্যতার মধ্যে।

"মিঃ টাটার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে এখানে প্রবেশ করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের পাঠকগণের সকলে নিশ্চয়ই এ-সম্বন্ধে মিঃ পাদ্শার প্রাঞ্জল রচনা পড়েছেন। এখানে কেবল আমরা এর পশ্চাদ্বর্তী নীতির রূপটিই তুলে ধরব।

---

[১] তিনি ধনীদের জনগণের অছি ভাবতে প্রস্তুত ছিলেন না। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই সেই উপায়। তবে স্বামীজী সাধারণ মানুষদের জন্য যে-কোনো সাহায্যই গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

"যদি ভারতকে বাঁচতে ও উন্নতি করতে হয়, যদি পৃথিবীর মহান জাতিসমূহের মধ্যে ভারতীয় জাতিকে স্থানলাভ করতে হয়, তাহলে প্রথমেই খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে হবে। আর এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে ঐ সমস্যার সমাধান একমাত্র হতে পারে—মানবজাতির প্রধান দুই অন্নদাতা—কৃষি ও বাণিজ্যের অন্ধিসন্ধিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের দ্বারা।

"এখন প্রতিদিন আধুনিক মানুষ যে-হারে চতুর কলাকৌশল বাড়িয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরাতন পদ্ধতি কদাপি টিকতে পারবে না। যারা সবচেয়ে কম শক্তি ও অর্থব্যয় ক'রে প্রকৃতির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি আদায় ক'রে নিতে না-পারবে—তাদের পক্ষে দ্বার রুদ্ধ—পতন ও বিনাশই তাদের নিয়তি—কোনোই অব্যাহতি নেই।

"কারো-কারো কাছে পরিকল্পনাটি কল্পনাবিলাসে পূর্ণ, কারণ এর জন্য বিপুল অর্থ প্রয়োজন, অন্ততঃ ৭৪ লক্ষ টাকা। এই আশঙ্কার উপযুক্ত উত্তর : যদি একজন মানুষ, যিনি আবার দেশের সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি নন, একলা ৩০ লক্ষ টাকা দিতে পারেন, তাহলে অবশিষ্ট দেশ কি বাকি অর্থ জোটাতে পারে না? ওহেন চিন্তা করা কি বিসদৃশ ব্যাপার হবে না—যখন আমরা এই পরিকল্পনার বিশাল গুরুত্বের কথা জানি।

"পুনর্বার বলছি : আধুনিক ভারতে সমগ্র জাতির মঙ্গল-সম্ভাবনায় আকীর্ণ এই ধরনের আর কোনো পরিকল্পনা উপস্থিত করা হয়নি। সুতরাং সমস্ত জাতি যেন শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে উঠে পরিকল্পনাটিকে সফল করবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন।"

প্রবুদ্ধ ভারতের এই সময়ের সম্পাদকীয় রচনারীতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই বুঝবেন, পত্রিকাটি মন্তব্য করার সময়ে কতখানি কঠোরভাবে সংযত ছিল। সেই 'সংযম' সে একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল টাটা-পরিকল্পনার সমর্থনের কালে! ক্ষুদ্রাকার এই সম্পাদকীয়ের মধ্যে দুবার বলা হয়েছিল—আধুনিক ভারতের মঙ্গলের জন্য এর অনুরূপ কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি। বলাবাহুল্য, এই মন্তব্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব অনেকখানি প্রকাশিত।

স্বামীজীর জীবনকালে আরও দুবার এই পরিকল্পনার বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারত মন্তব্য করে। ১৯০১, মার্চ, প্রবুদ্ধ ভারত রাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষা-প্রসঙ্গে বলেছিল—টাটা-পরিকল্পনাকে সমর্থন করলেই ও-কাজ সর্বোত্তমভাবে করা হবে। এ-বিষয়ে কিছু উল্লেখ আগেই করেছি। [৪র্থ, ৫৪-৫৫] "দেশপ্রেমিক পার্শী" মিঃ টাটার পরিকল্পনাকে সরকার সমর্থন ও সাহায্য করলে যে "ভারতের জন্য সমৃদ্ধির নবযুগ, নবজীবন ও নবসুখের পথ খুলে যাবে"—সেকথা ঐ সম্পাদকীয়তে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছিল। পর বৎসর মার্চ মাসে প্রবুদ্ধ ভারত সংবাদ দিয়েছিল—সরকার কোন্ আকারে পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করেছেন।—বাঙ্গালোরে এটি প্রতিষ্ঠিত হবে; "ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ"-এর পরিবর্তে এর নাম হবে—"ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স"; এতে তিনটি প্রধান ধারায় শিক্ষা ও গবেষণা চলবে : রসায়ন, ফলিত পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা (কীট-বিদ্যার চর্চাও শেষোক্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত); প্রতিটি বিভাগে তিনজন প্রফেসার ও তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার থাকবেন, ইত্যাদি।

স্বামীজীর দেহত্যাগের প্রায় দু'বৎসর পরে টাটা মারা যান। তখন টাটা সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে প্রবুদ্ধ ভারত জুন, ১৯০৪ সংখ্যায় লিখেছিল :

"ভারতের শিল্পক্ষেত্রে প্রথম বিরাট নেতা মিঃ জে এন টাটা পরলোকগমন করেছেন। ভারতের এই যথার্থ উত্তম দেশপ্রেমিক সন্তানের মৃত্যুতে ক্ষতি হল অপূরণীয়। পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জন্য তাঁর বিপুল দানের কথা আমরা সকলেই জানি।

সমৃদ্ধিশালী ভারতীয় জাতিগঠনের জন্য মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সমন্বয় প্রয়োজন—যে-বস্তু মিঃ টাটার ছিল। কয়েকজন টাটা ভারতের আকার বদলে দিতে পারেন। এই পার্শী দেশপ্রেমিক যে-ধারায় বদান্যতা দেখিয়েছেন—সেই পথ যেন আমাদের অন্যান্য ধনী দেশবাসী গ্রহণ করতে পারেন।"

॥ ৫ ॥ টাটা-পরিকল্পনার সমর্থনে নিবেদিতার প্রকাশ্য ও অন্তরালের ব্যাপক প্রয়াস

টাটা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহ কেবল প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশ্য সমর্থনের পথেই প্রবাহিত হয়নি—অন্তরালের প্রচেষ্টাতেও তাঁর হাত ছিল। স্বামীজীর ইচ্ছাকে ফলবতী করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর শিষ্য ও বন্ধুরা। এক্ষেত্রে নিবেদিতা ও মিসেস বুলের নাম বিশেষভাবে করতে হয়। স্বামীজীর নানা কাজে সহায়িকা মিস ম্যাকলাউড টাটার সঙ্গে পরিচিত হবার পরে সে-সম্বন্ধে স্বামীজীকে জানালে তিনি উত্তরে লেখেন (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯০১) : "মিঃ টাটার সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ করেছ, এবং তাঁকে উত্তম ও দৃঢ়চেতা মানুষ বলে জেনেছ, এতে আমি খুবই খুশি। শরীরে যদি কুলোয় আমি অবশ্যই তাঁর আমন্ত্রণ স্বীকার করে বোম্বাই যাব।"

টাটা-পরিকল্পনার পক্ষে আন্দোলনে নিবেদিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনি দেখলেন, এই পরিকল্পনার সাফল্যের মধ্যে স্বামীজীর দীর্ঘপোষিত একটি আকাঙ্ক্ষার পূর্তি ঘটবার সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি এর পক্ষে সংগ্রামে নেমে পড়েছিলেন।

জামসেদজী টাটার জীবনের শেষপর্যায়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেছিলেন বারজোরজি পাদশা, একথা টাটার জীবনীতে বলা হয়েছে। পাদশাই টাটার শিক্ষা-পরিকল্পনার সংগঠন-কর্তা।৭ নিবেদিতার চিঠি থেকে দেখতে পাই, পাদ্‌শা ও তাঁর বোন স্বামীজীর কাছে ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি সময়ে এসেছিলেন, এবং গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্বামীজীর পাদমূলে বসে শিক্ষা নিয়েছিলেন। ঐকালে নিবেদিতা পাদ্‌শার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। (মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ৩০ জানুয়ারি, ৭ ফেব্রুয়ারির চিঠি দ্রষ্টব্য)। অনুমান করতে বাধা নেই—পাদ্‌শা টাটা-পরিকল্পনার বিষয়ে স্বামীজী সঙ্গে বিশেষরকম আলোচনা করেছিলেন। এর কিছুদিনের মধ্যে প্রবুদ্ধ ভারতে টাটা-পরিকল্পনার সমর্থনে পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য করা হয়।

অন্তরাল থেকে নিবেদিতা টাটা-পরিকল্পনার জন্য কতখানি করেছেন, তার কিছু পরিচয় আমরা তাঁর চিঠিপত্র থেকে পাই। ভারতের সরকারী মহলে প্রচণ্ড বাধা পেয়ে টাটা ইংলণ্ডে যান—সেখানকার কর্তাদের স্বমতে আনবার চেষ্টায়। এই আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেন নিবেদিতা। শিক্ষাবিভাগের কর্তা স্যার জর্জ বার্ডউডকে প্রভাবিত করার জন্য, কিংবা তাঁদের আসল মতলব কী, তা আঁচ করার জন্য, মিসেস বুলের দ্বারা নিবেদিতা এক ভোজসভার আয়োজন করালেন—যাতে উপস্থিত থাকলেন বার্ডউড, টাটা, মিসেস বুল ও নিবেদিতা। ভোজসভায় কী ঘটেছিল তা নিবেদিতা অব্যবহিত পরে এক

৭ F. R. Harris, *Jamsetji Nusserwanji Tata : A Chronicle of His Life* (second edition, 1958).

টাটার শিক্ষামূলক প্রচেষ্টায় পাদ্‌শার ভূমিকা সম্বন্ধে হ্যারিস তাঁর গ্রন্থের 'ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স' অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। হ্যারিসের বইটি আমি শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সৌজন্যে পেয়েছি।

দীর্ঘ পত্রে (৫ নভেম্বর, ১৯০০) ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীমতী অবলা বসুকে লিখে পাঠান। টাটা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিবেদিতার অতিরিক্ত এক আগ্রহ ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যদি সত্যই এই পোস্টগ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়, তাহলে তার সঙ্গে ডাঃ বসুকে যুক্ত করে দেওয়া যাবে, যাঁর কর্মজীবনকে অবিচারে ও অপমানে দুঃসহ করে তুলছিল শিক্ষাবিভাগের কতকগুলি নীচ সাহেব কর্মচারী।

নিবেদিতার সংশিলষ্ট পত্র৮ থেকে দেখা যায়, স্যার জর্জ বার্ডউড এ-ব্যাপারে একেবারেই ঘাড় পাততে চাননি। নির্ভেজাল মানুষ তিনি, পরিষ্কার বলেছিলেন, ভারতবাসীর হিতের জন্য নয়—ইংলণ্ডের হিতের জন্যই ইংলণ্ডের ভারতশাসন। তিনি আরও বলেন, কোনো ব্যাপারে ভারতবাসীর ইচ্ছাপূরণ না হলে তারা রেগে গিয়ে কিছু কাণ্ড করে বসবে, এমন সম্ভাবনা নেই, কারণ লোকগুলি নিরামিষাশী। এলোমেলো নানা কথার মধ্যে নিবেদিতা অনেক কষ্টে টাটা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গটি তুলতে পারেন। সেখানে যাতে ভারতীয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হন, সেই প্রস্তাব তিনি করেন। তৎক্ষণাৎ বার্ডউড উদার বিশ্বমানবিকতায় আক্রান্ত হয়ে বলেন, বিজ্ঞান তো ভারতীয় কিছু নয়, ওটি বিশ্বব্যাপার, সুতরাং পৃথিবীর দরজা ওখানে খোলা রাখতেই হবে। আর তা ঘটতে পারবে সরকারের কাছে টাটার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে। (অর্থাৎ ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ব্যাপার তাতে থাকবে না)। অসতর্কভাবে বার্ডউড বলে ফেলেন—কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা জঘন্য ("কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়"), তখন নিবেদিতা বিঁধিয়ে বলেন—কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো পুরো সরকারের কব্জায়। সরকারী পরিচালনার মানে যদি এই ধরনের দুর্গতি বোঝায় তাহলে মিঃ টাটা কি করে সরকারের হাতে টাকা তুলে দেবেন? বিপাকে পড়ে বার্ডউড কথা ঘোরাবার চেষ্টা করেন। রেগে গিয়ে বলেন, গত ৫০ বছরে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিল্পে, সাহিত্য বা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কেউ বেরোয়নি। (জ্বলজ্যান্ত জগদীশ বসু তখন ইংলণ্ডে, তবু বার্ডউড ওকথাটা নির্বিকারে বলতে পেরেছিলেন!)। নিবেদিতা ধারালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, "ইতিহাসে এই প্রথম রয়াল সোসাইটি এক্সমাস ছুটির শুরু থেকে শেষ অবধি তার দরজা খোলা রেখেছিল পদার্থবিদ্যার এক হিন্দু অধ্যাপকের জন্য।" ভারতে দেশীয় অধ্যাপকরা ইংরাজ অধ্যাপকদের তুলনায় কম মাইনে পান, এই অসুবিধাজনক কথাও নিবেদিতা শোনান। ভারতের বিজ্ঞানের উন্নতি না হবার কারণ যে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপারে সরকারের অবহেলার শৈথিল্য, সেকথা বলতেও তিনি ছাড়েন নি। অপরপক্ষে বার্ডউডের ধরতাই-বাক্য ছিল : "মিঃ টাটা, আপনি আর কারো সঙ্গে পরামর্শ করবেন না ; আপনি আপনার ঐ তিরিশ লক্ষ টাকা এবং কর্মদায়িত্ব প্রাণখুলে সঁপে দিন প্রফেসার রাম্‌জের হাতে।"

বার্ডউডের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলেও নিবেদিতা থামেন নি। ভারতীয় বিষয়ে আগ্রহী, এমন পৃথিবীর বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে তিনি টাটা-পরিকল্পনার সম্বন্ধে মতামত চেয়ে পত্র পাঠাতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, ঐসকল মত উপস্থিত করে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করা। রেম-সংগ্রহে এই বিষয়ে মূল্যবান কিছু দলিল আছে। তার মধ্যে পেয়েছি—নিবেদিতার স্বহস্ত-লিখিত আবেদনপত্রটি এবং দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের স্বাক্ষরিত উত্তরপত্র। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ধর্মযাজক রেভারেণ্ড হাউইস (ইনি স্বামীজীর গুণমুগ্ধ ছিলেন, আগেই জেনেছি) নিবেদিতার আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। আমেরিকার বীচউড কোহাসেট বেদান্ত সেণ্টারের দ্বারা আমার কাছে প্রেরিত নিবেদিতার চিঠিপত্রের মধ্যে তা দেখেছি। নিবেদিতা তাঁর উক্ত আবেদন-পত্রে টাটা-পরিকল্পনার সুন্দর সারসংক্ষেপ ক'রে বলেন, সরকারের নির্দেশ-

৮ চিঠিটি উদ্ধৃত আছে বর্তমান লেখকের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ভারতের প্রবন্ধে।

ক্রমে এই পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য মিঃ টাটা যে-অ্যাডভাইসারি কমিটি গঠন করেছেন, তাতে "ইউরোপীয় সদস্যসংখ্যা অহেতুক বেশি। যদি শিক্ষিত দেশীয় মানুষদের মতামত ও উপদেশের দ্বারা ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হয় তবেই এর ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা বর্ধিত হবে।" "ভারতীয় ধারায় ভারতীয়দের শিক্ষাবিস্তার" যাতে হয়, সেজন্য নিবেদিতা প্রস্তাব করেছিলেন : "এই প্রতিষ্ঠানে সকল ধারার কার্যকরী সমিতিতে যেন পার্শী, মুসলমান, হিন্দু ও ইউরোপীয়—এই চার সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যার সমানুপাত বর্তমান থাকে।...এখানকার শিক্ষা পরিচালিত হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় ধারায়। দেশীয় ছাত্ররা যাতে সর্বসময়ে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপারে সর্ববিধ সুযোগলাভ করে, তার গ্যারাণ্টি থাকুক—সেইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের উচ্চতর পদের গ্যারাণ্টিও।"৯

নিবেদিতা এখনো অদম্য। টাটা-পরিকল্পনা নিয়ে প্রবন্ধাদিও তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। ২৫ জানুয়ারি, ১৯০১ তারিখের পত্রে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে জানান : "পরের সপ্তাহে তোমাকে ও রাজাকে [স্বামীজীকে] টাটা-পরিকল্পনার উপরে প্রবন্ধটি পাঠাব, যা সদ্য মিঃ ম্যাকনীলের কাগজে বেরিয়েছে। প্রিয় মিঃ ম্যাকনীল! কিভাবে যে তাঁকে আমার আনন্দ বোঝাব জানিনা।" নিবেদিতা এইকালে ভারতীয় ব্যাপারে সুবিধা আদায়ের জন্য লণ্ডনের প্রভাবশালী মহলে ঘোরাফেরা করেছেন। ইংরাজ মহিলা হিসাবে তাঁর এ-ব্যাপারে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ছিল। পরবর্তীকালেও টাটা-পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সম্পূর্ণ হ্রাস পায়নি। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে রক্ষিত নিবেদিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহে টাটা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত সংবাদপত্রের কিছু বিবরণ আছে। বৃটিশ ব্যুরোক্র্যাটদের মুখপত্র এলাহাবাদের "পায়োনীয়ার" যখন কটু সন্দেহ প্রকাশ করে লেখে—টাটার ঐ দানের আসল উদ্দেশ্য সরকারের সাহায্যে "ফ্যামিলি ট্রাস্ট" তৈরি করে নেওয়া—তখন নিবেদিতা জামসেদজীর মর্যাদারক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় তিনি লেখেন :

"কয়েক বছর আগে লণ্ডনে যখন টাটা-পরিকল্পনা সম্পর্কে ইণ্ডিয়া অফিসের সদস্য ও অন্যান্যদের নিয়ে কনফারেন্স হচ্ছিল—তখন তাদের অনেকগুলিতে আমি ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলাম। মিঃ টাটা জাতির উদ্দেশ্যে তিরিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করেন...যা থেকে সেইকালে বাৎসরিক সওয়া লক্ষ টাকা আয় হওয়ার কথা। সরকার তৎক্ষণাৎ আপত্তি করে বলেন—টাটার প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্য ভবিষ্যতে হ্রাস পেতে পারে। টাটা বলেন, উল্টোটাই হবার সম্ভাবনা। কিন্তু সরকারকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে, নিজ পুত্রদের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে, তিনি স্থির করেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পূর্বোক্ত অর্থসাহায্য অব্যাহত রাখার জন্য তিনি আরও তিরিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যাবেন, অন্যথায় যা পেতেন তাঁর পরিবারবর্গ। অর্থাৎ দাঁড়াল—টাটা নিজ পুত্রদের 'লাভের' জন্য সরকারকে এমন একটি পরিকল্পনায় জড়াতে চাইছেন, যার পরিণাম নিজ পুত্রদের অনাহারে পর্যন্ত গড়াতে পারে!!"১০

নিবেদিতা, টাটাকে এবং তাঁর মহৎ অভিপ্রায়কে কতখানি সমাদর করতেন, শ্রীমতী টাটার মৃত্যুর পরে লেখা তাঁর পত্রে (১৪ এপ্রিল, ১৯০৪) তা প্রকাশ পেয়েছে :

"এস কে র‍্যাটক্লিফ গতরাত্রে আমাকে বলেছেন—ইণ্ডিয়ান মিরার জানিয়েছে যে, ভারত সরকার শেষপর্যন্ত মিঃ টাটার দান-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে!!!!

"মিসেস টাটারও সদ্য মৃত্যু হয়েছে। বিচ্ছেদের পালা বোধহয় এসে গেছে—পৃথিবী-মঞ্চে বৃদ্ধ ভূমিকা বোধহয় শেষ! আমি যথার্থই দুঃখিত।

৯ প্রবুদ্ধ ভারতে লেখকের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে মূল দলিলগুলি মুদ্রিত আছে।
১০ NCW, V, 352.
নিবেদিতা পায়োনীয়ারের দুষ্ট প্রচারের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ পত্র স্টেটসম্যানে লেখেন, যা নিবেদিতা-রচনাবলীতে আছে।

"বস্তুতঃ দেখা যায়, যাদের বাঁচা উচিত নয় তারাই বাঁচে, খাঁটি লোকেরা মরে যায়। আমাদের মনোজগৎ ছাড়া পৃথিবীর নীতিবিধানের নিশ্চয়-ভূমি বোধহয় অন্যত্র নেই।"

॥ ৬ ॥ সরকার কেন টাটা-পরিকল্পনার বিরোধী ছিল?

নিবেদিতার পত্রাদি থেকে বোঝা যায়, সরকার ভারতীয় পরিচালনাধীনে কোনো উচ্চতর শিক্ষাসংস্থা রাখতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। টাটা অপরপক্ষে গোটা ব্যাপারটির উপরে ভারতীয় কর্তৃত্ব চাইছিলেন। সরকার যে, টাটা-পরিকল্পনাকে স্বীকৃতি দিতে গড়িমসি করছিলেন, তার মূল এই কর্তৃত্বের প্রশ্নেই নিহিত ছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার হল—ফ্রাঙ্ক হ্যারিস-লিখিত টাটার বিস্তারিত জীবনী (যে-জীবনী টাটা-পরিবারের সহায়তায় লিখিত হয়; সুতরাং বলা যায়, 'সরকারী' জীবনী) পড়লে মনে হবে, টাকার অভাবের জন্যই বুঝি সরকার এই পরিকল্পনা সমর্থনে অনিচ্ছুক ছিল। সত্যের এমন ব্যত্যয় অল্পই দেখা যায়। নিবেদিতার পূর্বে-উল্লিখিত পত্র থেকে ভিতরের কথাটা পরিষ্কার হয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকার তৎকালীন লণ্ডন-সংবাদদাতা ছিলেন কোনো ভারত-সমর্থক ইংরাজ; তিনি টাটা-পরিকল্পনার সমর্থনে একাধিকবার লিখেছেন। অমৃতবাজারে ইংলণ্ড থেকে ১৯ নভেম্বর, ১৯০০ তারিখে প্রেরিত পত্রে তিনি কৌশলে এই ভারতীয় কর্তৃত্বের প্রশ্নটিকে বড় করে তুলেছিলেন। টাটার লণ্ডনে গমন, পরিকল্পনা নিয়ে সরকারী মহলের সঙ্গে তাঁর নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির বিবরণ দেবার পরে, এই ইংরাজ সংবাদদাতা আসল কথাটি পেড়েছিলেন—কর্তৃত্ব ভারতীয়দের হাতেই থাক। ঐ ব্যাপারে সরকারী আপত্তি ছিল বলেই তিনি বিষয়টি নিয়ে বিশেষ নাড়াচাড়া করেন। শেষে তিনি বলেন : "আমি এই আশা অন্ততঃ পোষণ করতে পারি, জনৈক ভারতীয় ব্যক্তির বৃহৎ হৃদয় এবং দূরদর্শিতা থেকে এই-যে মহান পরিকল্পনার আবির্ভাব হয়েছে—তা যেন প্রধানতঃ ভারতীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ভারতের যা পরিস্থিতি তাতে না বললেও চলে যে, কার্যকরী সমিতিতে নির্দিষ্ট সরকারী প্রতিনিধিত্ব থাকবে; কিন্তু সেই প্রতিনিধিত্ব যেন গৌণ ব্যাপার হয়, কেবল উপদেষ্টারূপেই তাঁরা যেন থাকেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বব্যাপারে যত বেশি ভারতীয়করণ ঘটবে তত বেশি সাফল্য ঘটবে তার। মুখ্যতঃ এটি ভারতীয় ব্যাপার হওয়া চাই।"১১

১১ *Amrita Bazar Patrika*, Nov. 19, 1900, *The Greatest Thing of the Week in London,* (From our own correspondent).

অন্য এক লেখায় লণ্ডনের এই ইংরাজ সংবাদদাতা ইংরাজ সরকারের কথায় ও কাজে ফারাককে ব্যঙ্গভরে উদ্ঘাটন করেছিলেন অমৃতবাজারে :

Lord Curzon and Mr. Tata's Scheme. [ABP, Feb. 7, 1899]

তার গোড়ায় ইনি রয়টারের পরিচিত মিথ্যাবাদী চেহারা সম্বন্ধে লেখেন :

"I have learned to distrust everything that Reuter cables from India, as biased to the last degree."

এর পরে পূর্বোক্ত প্রসঙ্গ :

"If this last munificent propozal, [of Tata] for the extension of scientific research in India is frozen to death from official coldness, there are influential education leaders in this country that will demand a stern reconing from Lord Curzon and his advisers. All this tall talk which always goes on about 'developing the resources of India,' and 'attracting British capital' is worth very little beside Mr. Tata's practical proposal for enabling the sons of India to develop their own resources with their own brains."

বুঝতে অসুবিধা হয় না—এই লেখার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, সরকারের আসল আপত্তির মোকাবিলা করা—যে কাজ নিবেদিতা যথেষ্ট করেছেন। নিবেদিতা যেমন উইলিয়ম জেমসকে টাটা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন—তেমনি লেখেন শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেসকেও। গেডেস উত্তর হিসাবে যা লেখেন, তা সমকালে "জনৈক ভারতীয় বন্ধুকে লিখিত পত্ররূপে" ভারতের সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হয়েছিল। (প্রবুদ্ধ ভারতে এপ্রিল, ১৯৪৮ সংখ্যায় অনুরূপ বিষয়ে নিবেদিতাকে লেখা গেডেসের একটি দীর্ঘ পত্র বেরিয়েছিল, A New University for India, যেটি নিবেদিতার কাগজপত্রের মধ্যে প্রবুদ্ধ ভারত কর্তৃপক্ষ খুঁজে পান; সেখানেও নাম : "জনৈক ভারতীয় বন্ধুকে লেখা পত্র")। গেডেস তাঁর পত্রে শিক্ষানীতির ভারতীয়করণের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে আমন্ত্রণ করতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। সমন্বয়মূলক সেই ধরনের উচ্চাঙ্গের ভাবী সভ্যতার কল্পনা তিনি করেছিলেন।১২

পটভূমিকা যখন এই—তখন ফ্রাঙ্ক হ্যারিস নিতান্ত নিরীহভাবে লিখেছেন : ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে টাটা তাঁর অভ্যাসমতো ইউরোপভ্রমণ করবার কালে লণ্ডনে হাজির হয়ে, রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে সরকারী মহলে আলোচনাদি করেছিলেন (১৩৪ পৃষ্ঠা)। টাটা যে সরকারী বাধা দূর করার জন্যই লণ্ডনে আলোচনার পর আলোচনা করেছেন, সে-বিষয়ে এই ইংরাজ জীবনীকার মনোযোগী হতে পারেননি। অথচ, মিঃ হ্যারিস ইংরাজ শাসকদের যতই চূণকাম করার চেষ্টা করুন, তাঁর লেখা থেকেই ফুটে বেরিয়েছে ওনারা কি পদার্থ ছিলেন। তিনি লিখেছেন : "ভাইসরয়ের বিবৃতিতে যখন প্রকাশ পেল, টাটার এই দানের ফলে খুব

---

১২ "Professor Patric Geddes has sent two very remarkable letters to 'An Indian Friend' on 'The Best University for India'... He is Professor of Botany at University College, Dunbee. He was educated at Perth Academy, the Royal School of Mines, University College, London, the Sorbonne in Paris and the Universities of Edinburg and Montopellier... His career as a Professor and teacher has been no less remarkable... He has also had some considerable share in University-making, for he founded and organised University Hall in Edinburg, 'as a beginning of collegiate life.' He is, besides, a prolific writer on Botany, biology, evolution, etc. His claim to speak on the type of University best suited to India is therefore not to be lightly set aside. His knowledge of, and sympathy with, Oriental character are plainly discernible in the second letter. It will be seen that in his opinion 'the best university for India' is not the one that will completely westernise the Indian mind and character, but the one that will, in the Professor's botanical metaphor, teach the Indian 'to fertilise his ancient world, e.g., his lotus-seedlet, without far-blown and strangely active Western pollen.' 'Utilise all that is best in Europe ; but do so by help of all that is best of India, not by abandoning it. Your new school of science would thus acquire an individuality and an interest of its own, as indeed here and there an isolated Indian investigator has personally proved already ; and in half a generation it might be your turn to stimulate Western thought, and so richly repay the substantial draft on us with which you will begin. Here would be the real gain to our European learning.' " [*Professor Geddes on Indian Universities, Madras Mail*, Aug. 17, 1901]

গেডেসের এই পত্রগুলি টাটা-পরিকল্পনা বিষয়ে মতামত জানাতে যে আবেদন-পত্র নিবেদিতা পাঠিয়েছিলেন, তারই উত্তরে লিখিত, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

অল্পসংখ্যক মানুষই উপকৃত হবে...তখন সাধারণের উৎসাহ বেশ ঠাণ্ডা মেরে গেল।" কার্জনের মন্দ অভিপ্রায় সম্বন্ধে সর্বদাই সহৃদয় সহিষ্ণুতা ইনি দেখিয়েছেন, কিন্তু এঁর লেখা থেকেই পাওয়া গেছে—যে-কার্জন অপ্রচুর অর্থের কারণে টাটা-পরিকল্পনায় অধিক লোকের উপকৃত হবার সম্ভাবনা নেই বলে সমালোচনা করেছিলেন—সেই কার্জনের পরামর্শেই মহীশূর সরকার তাঁদের প্রতিশ্রুত বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা কমিয়ে তিরিশ হাজার করে দিয়েছিলেন!!

জামসেদজী টাটার মুখ্য জীবনীকাররূপে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের ব্যর্থতা এইখানে—তাঁর গ্রন্থে টাটার এই বিষয়ক সংকল্প, এবং তাকে সিদ্ধ করার জন্য দীর্ঘ গৌরবময় সংগ্রামের মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। এখানে স্মরণ করিয়ে দেব—ব্যবসায়িক জীবনে সাফল্যশিখরে উঠেও জামসেদজী তাঁর দেশহিতৈষণার সর্ববৃহৎ পরিকল্পনার সাফল্য দেখে যেতে পারেননি—যে-আশাভঙ্গ তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলির উপরে ধূসর ছায়াপাত করেছিল।

॥ ৭ ॥ যন্ত্রশিল্পায়ন সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা ও চেষ্টার বিবরণ : রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত—টেকনিক্যাল স্কুল

ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস তাঁর জীবনীতে স্বামীজীকে লেখা টাটার চিঠির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেখানেও ভুল ব্যাখ্যা। স্বামীজীর পত্রটির বিষয়ে তিনি একটি ফুটনোট ব্যয় করেছেন, যাতে লেখা আছে:

"Sir Dorabji Tata is of opinion that his father at that time had little hope of getting the Government of India interested in his scheme. *In Nov. 1898, Mr Tata wrote a letter to the Swami Vivekananda, adjuring him to rouse the country by a pamphlet relating to educational reform on a ascetic lines, and offering to defray the expense of publication.* [Italics mine]

এই চিঠির পটভূমিকা যথেষ্ট জানা থাকা সত্ত্বেও মিঃ হ্যারিস সে প্রসঙ্গ উত্থাপনই করেন নি। টাটা "সন্ন্যাসী-ধারায় শিক্ষা সংস্কারের" জন্য ব্যস্ত হয়ে স্বামীজীকে হঠাৎ পত্রাঘাত করে বসেন নি—তিনি নিজের মূল পরিকল্পনাতেই স্বামীজীর সাহায্য চেয়েছিলেন। স্যার ডোরাবজি যখন মিঃ হ্যারিসকে বলেছিলেন : জামসেদজীর ভয় ছিল যে, ভারত সরকার তাঁর পরিকল্পনা সমর্থন করবেন না—তখন নিশ্চয়ই তিনি ঐ অসমর্থনের কারণও জানিয়েছিলেন—সেই আসল কারণটি মিঃ হ্যারিস চেপে গেছেন। তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়নি—বিবেকানন্দের প্রভাবকে টাটা নিজ পরিকল্পনার সমর্থনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ এবং জামসেদজী টাটা—এই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের দুই মানুষের ভাবনার ঐক্যের বিষয়টিও বিবেচ্য। বিবেকানন্দ ত্যাগী হিন্দুসন্ন্যাসী—যিনি আধুনিক ভারতবর্ষে সুসংগঠিত সন্ন্যাসীসংঘ স্থাপন করেছেন। টাটা অপরদিকে পাকা ব্যবসায়ী, বিপুল বিত্তের অধিকারী, এবং ভারতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রনেতা। এঁরা উভয়েই কিন্তু এক জায়গায় মিলিত ছিলেন—সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে এঁরা চাইতেন—বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যিনি নিজ সম্পত্তির একটা বড় অংশ দান করেছিলেন—সেই জামসেদজী বিশ্বাস করতেন না, কেবল বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে মানুষের চিত্তের চরম উৎকর্ষ ঘটতে পারে। সেইজন্যই তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনচর্চার বিভাগ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—যা লর্ড কার্জনের কাছে অতীব অনুচিত

বলে মনে হয়েছিল,১৩ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছেও।১৪

শিক্ষা সম্বন্ধে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সন্ন্যাসী ও শিল্পপতি উভয়েরই। উভয়েই ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশিক্ষা এবং শিল্পায়নের প্রয়োজন সম্বন্ধে একমত ছিলেন—উভয়েই বুঝেছিলেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ভারতবর্ষকে যদি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে বিজ্ঞানশিক্ষাকে সাধনার স্তরে তুলতে হবে, আর ব্রতধারী পুরুষেরাই তা করতে সমর্থ।

সন্ন্যাসীদের দ্বারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শেখানোর ব্যাপারে স্বামীজীর মনোভাব সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য এখানে দেওয়া যায়। আগেই দেখেছি, আমেরিকায় পৌঁছেই স্বামীজী সন্ন্যাসীদের দ্বারা ভারতে ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুল চালাবার পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। তারপর কয়েক বৎসরে তাঁর জীবনে কল্পনাতীত পরিবর্তন এসেছিল। ১৮৯৭ সালে ভারতে ফিরে তিনি সত্যই সন্ন্যাসী-সংঘ গঠন করতে পেরেছিলেন—তখন কি তাঁর পূর্বতন ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন? কদাপি নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মাদর্শের যে-খসড়া তিনি প্রস্তুত করেন, তার দুটি ধারা এই :

"এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে-ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্মচর্চার সঙ্গে-সঙ্গে একটি পূর্ণ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট করিতে হইবে। এইটি প্রথম কর্তব্য, পরে অন্য অবয়ব ক্রমে-ক্রমে যুক্ত হইবে।"

"মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়—যে-স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজশাসন হইতে দূরে থাকিয়া নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে।... মধ্যভারতে হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর একটি বৃহৎ শিল্প-বিদ্যালয় ও ধীরে-ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমনই আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে, লোক তেমনই উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে।"১৫

১৮৯৭ সালে বলরাম বসুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রস্তাবনা-সভায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজী যা বলেন, তার একাংশে আছে :

"মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন, এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ-জীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।" [৯—৬১]

দেখা যাচ্ছে, ১৮৯৩ সালের বিবেকানন্দ—১৮৯৭ সালেও, সন্ন্যাসীদের দ্বারা শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে একটুও বদলাননি। সুতরাং তাঁর পক্ষে সহজেই অল্পদিন পরে প্রস্তাবিত টাটা-পরিকল্পনাকে ওহেন সাগ্রহ সমর্থন জানানো সম্ভব হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মাদর্শ সম্বন্ধে উপরিউদ্ধৃত দ্বিতীয় ধারায় একটি চমকপ্রদ তথ্য মেলে। স্বামীজী মধ্যপ্রদেশে হাজারিবাগ ইত্যাদি অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন ক'রে, সেখানে টেকনিক্যাল স্কুল, কলকারখানা ইত্যাদি স্থাপন করতে বলেছেন। প্রথমেই বলে নেওয়া যায়, প্রফেটের ইচ্ছাপূরণ হয়েছিল—জামসেদপুরে টাটা-কারখানা ও উপনিবেশই তার প্রমাণ।

১৩ "He [Ld. Curzon] also expressed some misgivings as to the value of an educational and philosophical side, involving a considerable expenditure upon subjects such as ethics, psychology, archaeology, history and methods of education." [Harris, 126]

১৪ *Mahratta,* May 14, 1899, *Dr Mahendra Lal Sirkar.*

১৫ সরলাবালা সরকার, "স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ।"

কিন্তু এখানে আমরা ঋষিদৃষ্টির উপরে জোর দিতে চাই না। স্বামীজী পাকা পর্যটক, পূর্ব-মধ্যভারতের খনিজসমৃদ্ধ অঞ্চল সম্বন্ধে সাক্ষাতে অবহিত। তবু ঠিক সংবাদটি কোথা থেকে পেলেন, সে সম্বন্ধে জানতে কৌতূহল হয়। টাটার জীবনীতে পাই—টাটা যখন আকরিক লৌহের সন্ধান করছিলেন, এবং মধ্যভারতের চন্দা অঞ্চল সম্বন্ধেই বেশি আগ্রহ বোধ করেছিলেন, তখন প্রমথনাথ বসু-কৃত একটি সার্ভে-ম্যাপের প্রতি তাঁর পুত্র স্যার ডোরাবজি ও অন্য সহকর্মিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, যাতে মধ্যপ্রদেশের 'দুরগ্' অঞ্চল আকরিক লৌহ-সমৃদ্ধ বলে চিহ্নিত ছিল। এই অঞ্চলটিতে আরও সন্ধানের পরে প্রচুর লৌহের সন্ধান পেয়ে যখন সেখানেই টাটা-কোম্পানীর স্থাপন স্থিরীকৃত হয়, তখন পূর্বোক্ত প্রমথনাথ বসুই আবার এঁদের ময়ূরভঞ্জের অঞ্চলবিশেষে নূতন খনির সন্ধান দেন—যার উপরে নির্ভর করে টাটার কারখানার সূত্রপাত হয়।

স্বামীজী মধ্যভারত বা হাজারিবাগ অঞ্চলের খনিজ সমৃদ্ধি, ও সেখানে কারখানা স্থাপনের উপযোগিতার কথা বলতে পেরেছিলেন অবশ্যই নির্দিষ্ট তথ্যসূত্রের উপর নির্ভর করে। সমসাময়িক সংবাদপত্র, সার্ভে-বিবরণ ইত্যাদি থেকেও তিনি সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন। সম্ভবতঃ প্রমথনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল। আমরা আগে [১—১৭১, ১৭৯ ; ২—১৮৯-৯২] প্রমথনাথ বসুর ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান সিভিলাই-জেশন আণ্ডার ব্রিটিশ রুল" বইটির কথা বলেছি, যার মধ্যে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের উল্লেখ ছিল? সে-কাজ বসু করেছিলেন রামকৃষ্ণ-গোষ্ঠীর সঙ্গে চেনাশোনা থাকার জন্যই হয়ত।১৬

যাই হোক, আমরা যে-কথাটায় জোর দিতে চাইছি তা হল—বিবেকানন্দ অবশ্যই টাটা নন, ভারতের শিল্পায়ন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনোদ্দেশ্য নয়—তথাপি তিনি ভারতের ঐহিক সমৃদ্ধির পথগুলির সন্ধান রেখেছিলেন, যা সেইসময়ে, তাঁর মতো ক'রে, রাজনৈতিকরাও রাখতেন কিনা সন্দেহ।

তত্ত্বগ্রাহী বিবেকানন্দ অবশ্যই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা চাইতেন, সে-বিষয়ে তাঁর উৎসাহের যথেষ্ট প্রমাণ আছে—কিন্তু দেশের ভয়াবহ দারিদ্র্যের জন্য কারিগরি বিজ্ঞানে বিশেষ জোর দিয়েছেন, যদিও জানতেন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অগ্রগতি না ঘটলে কারিগরি বিজ্ঞানের উন্নতিও হবে না। তাঁর পরিব্রাজক-জীবন সম্পর্কে স্মৃতিকথায় অনেকেই তাঁর বিজ্ঞানপ্রিয়তার কথা বলেছেন। খেতড়ির মহারাজকে তিনি কিভাবে বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ দিতেন, তা বেণী-শঙ্কর শর্মার গ্রন্থে ["স্বামী বিবেকানন্দ : এ ফরগটন্ চ্যাপটার অব হিজ লাইফ"] পেয়েছি। পরবর্তীকালে অধ্যাত্মবিষয়ক বক্তৃতাদির মধ্যেও বিজ্ঞান-সত্যকে সমর্থক প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ধর্মকে তিনি কখনো বিজ্ঞানবিরোধী মনে করেন নি; তাঁর ছিল বৈজ্ঞানিক ধর্ম। হিরাম ম্যাক্সিম, নিকোলা টেসলা প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির জন্যই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানপ্রীতির কথা ছেড়ে দিয়ে

প্রয়োগ বিজ্ঞানে তাঁর আকর্ষণ সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া যায়। স্বামীজী নিউইয়র্ক থেকে মিসেস বুলের কাছে এক ভারতীয়কে পাঠিয়ে ১৪ এপ্রিল, ১৮৯৬ তারিখে লিখেছেন : "এই অদ্ভুত লোকটি বোম্বাই থেকে পাঠানো একটা চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসেছে। লোকটি হাতে-কলমে কাজ জানা মেকানিক; এদেশের ছুরি কাঁচি ও অন্যান্য লোহার জিনিস তৈরির কারখানা দেখাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।...এর বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু লোকটি যদি পাক্কা বদমাশও হয়, তবু আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এই ধরনের বেপরোয়া ভাব দেখলে উৎসাহ দিতে চাই।" [৭-২৩৪]। একই বছরে ৫ জুন লিখেছেন : "আমার বাবা যদিও উকিল ছিলেন, তবু আমি চাই না আমার প্রিয়পাত্র কেউ উকিল হয়।...আমাদের দেশ উকিলে ছেয়ে গেছে—প্রত্যেক বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ'য়ে-শ'যে উকিল বেরুচ্ছে। আমাদের জাতের দরকার তাগদ, আর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। মহিম [মহেন্দ্রনাথ দত্ত] ইলেক-ট্রিসিয়ান হোক, তাই আমি চাই।...নিজের ও স্বজাতির জন্য সে একটা নতুন পথ বার কর-বার চেষ্টা করুক। যদি সে ব্যর্থও হয় তবু জানবো সে বড় হবার, স্বদেশের পক্ষে সত্যই উপযোগী হবার, চেষ্টা করেছিল। একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার ভারতে অনায়াসে ক'রে খেতে পারে।" [৭—২৫০]। ভারতী-সম্পাদিকা সরলা ঘোষালকে স্বামীজী ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৭ দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন্ শিক্ষা প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে লেখেন : "দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির সময় এখনও আসে নাই। ক্রমশঃ [রামকৃষ্ণ মিশনের] ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয় তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে। ঐ কর্মশালার মালবিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয় তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুশকিল এক—যে-প্রকার পুরুষদের জন্য হইবে, ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্য চাই। কিন্তু এদেশে তাহা অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন।" [৭—৩২৮]। নারীর অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও অধিকারকে স্বামীজী কিভাবে স্বীকার করতেন, শেষোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে দেখা গেছে।

বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীদের মধ্যে কি-জাতীয় বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া উচিত, সে-বিষয়ে ১৮৯৭, ২৪ জুন, স্বামীজী লিখেছেন : "শুদ্ধানন্দ লিখেছে—কি Ruddock's Practice of Medicine পাঠ হচ্ছে। ওসব কি ননসেন্স ক্লাসে পড়ানো? একসেট ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির সাধারণ যন্ত্র ও একটা সাধারণ টেলিস্কোপ ও একটা মাইক্রোসকোপ ১৫০-২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শশীবাবু সপ্তাহে একদিন এসে কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যাল-এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হরিপ্রসন্ন [বিজ্ঞানানন্দ] ফিজিক্স ইত্যাদির উপর। আর বাংলা ভাষায় যে-সকল উত্তম সায়েন্টিফিক পুস্তক আছে, তা সব কিনবে ও পাঠ করাবে।" [৭—৩৫৬]। তাঁর এই সংক্রান্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায় খোঁচা দিয়ে ১১ জুলাই লিখলেন; "রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার যন্ত্রপাতি কিনে ঐসব বিষয়ে, বিশেষতঃ শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে, প্রাথমিক ও প্রয়োগমূলক শিক্ষা আরম্ভ করে দেবার কথা তোমাদের বলেছিলুম—কই সেসব বিষয়ে তো উচ্চবাচ্য নেই! তাছাড়া বাংলায় অনুবাদ-করা সবরকম বিজ্ঞানের বই কিনতে বলেছিলুম—তারই বা কি হল?" [৭—৩৭০]

নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকে দেখা যায়, তিনি মঠে বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয়ে কিছুদিন শিক্ষা দিয়েছিলেন। স্বামীজীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কিছু-কিছু সংবাদও একই সূত্র থেকে মেলে। নিবেদিতা ৬ মার্চ, ১৮৯৯, মিসেস বুলকে লিখেছিলেন : "স্বামীজী...ভারত-বর্ষ ও তার জনগণ সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। তাঁর মন এত দ্রুত সঞ্চরণ করছিল যে, আমার পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন হচ্ছিল। জনসাধারণের জন্য রুটি জোগাড় করার কোন্ নতুন উপায় বার করা যাবে? কি করে কলোনি তৈরি করা যাবে? মানুষ তৈরির প্রয়োজনে

খাদ্যশস্য উৎপাদন কিভাবে করা যাবে? পুরাতন পদ্ধতিতে প্রস্তুত শিল্পসামগ্রীর জন্য ইউরোপ আমেরিকায় কিভাবে বাজার তৈরি করা যাবে? সেখানকার ট্রেড-সিক্রেট কেনবার জন্য টাকা জোগাড় করা যাবে কেমন করে?—এবং কিভাবেই বা তাকে ব্যাপকভাবে [এদেশে] জানিয়ে দেওয়া যাবে?" হ্যামণ্ড-দম্পতি ভারতে এসে স্বামীজীর অভিপ্রেত কৃষিখামার স্থাপন করবেন—নিবেদিতা, মিসেস হ্যামণ্ডকে লেখা তাঁর ৯ মার্চের চিঠিতে সেই আশা প্রকাশ করেছিলেন। "স্বামীজী মঠের খরচপত্র চালাবার জন্য শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার কথা ভাবছেন; আমাদের [বিদ্যালয়ের] মেয়েদের জন্য জ্যাম তৈরির কথা বলেছেন";—নিবেদিতা ৭ জুনের চিঠিতে লিখেছেন। এই ধরনের কথা নিবেদিতার চিঠিতে ছড়িয়ে আছে।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে স্বামীজীর ঝোঁক কুটীরশিল্প অপেক্ষা যন্ত্রশিল্পের দিকেই বেশি ছিল। দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়ে তিনি যন্ত্রশিল্প শেখানোর প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বিশেষ খোঁজখবর নিয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে শিল্পবিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহেও সচেষ্ট ছিলেন। ১৪ জানুয়ারি, ১৯০০, লস এঞ্জেলস টাইমস পত্রিকা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক পুরুষ হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ গুণগান করার পরে লেখে : "যাঁরা তাঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতাসমূহে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁরা জেনে আগ্রহ বোধ করবেন যে, এদেশে স্বামীজীর কর্মোদ্দেশ্য কেবল দর্শন শেখানো নয়, একই সঙ্গে তা ভারতের সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে এখানে আগ্রহ সৃষ্টি করাও। এই স্কুলগুলি আমাদের প্র্যাট ইনস্টিটিউটের ধাঁচে গঠিত।"১৭ ১৬ জানুয়ারি, ১৯০০, "প্যাসাডেনা ডেইলি স্টার" লেখে : "পরের সপ্তাহে স্বামীজী সানন্দে আরও বক্তৃতা করতে রাজি যদি এখানকার লোকজন...ভারতে তাঁর ইনডাস্ট্রিয়াল স্কুলে সাহায্য করতে রাজি হয়। স্বামীজী ভারতে ঐ প্রয়াসে নিয়োজিত আছেন।"১৮ একই পত্রিকার ৮ ফেব্রুয়ারির সংবাদে দেখা যায় : "স্বামী বিবেকানন্দ [থ্রুপ পলিটেকনিক] ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছেন। বিদ্যালয়টি, বিশেষতঃ তার ম্যানুয়াল ট্রেনিং বিভাগটি, দেখে বিশেষ খুশি হন। তিনি সম্ভবতঃ শীঘ্রই আবার এই ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করবেন। তিনি তাঁর ভারতীয় বিদ্যালয়গুলিতে এখানকার মতো কাঠখোদাইয়ের পদ্ধতি চালু করতে পারেন।"১৯

"থ্রুপ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট" সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহের কারণ ছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত উদ্দেশ্য : মাথা ও হাতের সমব্যবহারের সুযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া। নানাধরনের স্থাপত্যবিদ্যা, কাঠখোদাই, মডেল নির্মাণ, যন্ত্রনির্মাণ, সীবনকার্য ইত্যাদি সেখানে শেখানো হত এবং জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, তড়িৎ ইত্যাদির ল্যাবরেটরিতে প্রতিষ্ঠানটি সুসজ্জিত ছিল। তৎকালীন আমেরিকায় এই প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য, এর প্রভাব অল্পদিনে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা পরে প্রখ্যাত "ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি'-তে রূপান্তরলাভ করে।২০

১৭ "ডিসকভারিজ সেকেণ্ড ভিজিট", ২০৬।
১৮ ঐ, ২৪৩।
১৯ ঐ ২৫২।
২০ ঐ, ২৫২-৫৩।

॥ ৮ ॥ দ্রুত শিল্পায়নে জাপানের সাফল্য : সে-বিষয়ে ভারতে গভীর ঔৎসুক্য

আলোচ্য বিষয়ে সমকালীন ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য দেওয়া যায়। টাটা-পরিকল্পনার প্রথম প্রতিবেদনে জাপানের বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিষয়ে সশ্রদ্ধ উল্লেখ ছিল। জাপানের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে ভারতের পশ্চাদ্বর্তিতা টাটার মনোবেদনার কারণ হয়। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে টাটা স্বামীজীর সঙ্গে জাপানের কারখানা ঘুরে দেখেছেন, সে সম্পর্কে উভয়ের আলোচনাও হয়েছে। স্বামীজী ঐকালে ইয়াকোহামা থেকে তাঁর জাপান-দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা লিখে পাঠিয়েছেন ঃ

"দেখে বোধহয়—জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তা বুঝেছে; তারা সম্পূর্ণরূপে জেগেছে। ওদের পুরো শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থল-সৈন্য আছে। ওদের কামান ওদেরই এক অফিসারের আবিষ্কার; সেটা অন্য কোনো জাতের কামানের চেয়ে কম নয়। তারপর তারা ক্রমাগত নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। প্রায় এক মাইল লম্বা একটি সুড়ঙ্গপথ দেখেছি, যেটি জাপানেরই একজন স্থপতি নির্মাণ করেছেন।

"এদের দেশলাই-কারখানা দেখবার জিনিস বটে। এদের যে-বস্তুরই অভাব হোক, তা নিজেরাই তৈরি করে নিতে সচেষ্ট। জাপানীদের নিজস্ব স্টিমারলাইনের জাহাজ চীন ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত করে; তাকে শীঘ্রই ইয়াকোহামা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে চালাবার মতলব করছে।...

"জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে যত কথা উঠছে তা একটা ছোট চিঠির মধ্যে বলে উঠতে পারব না। এইটুকু বলতে পারি, আমাদের যুবকরা দলে-দলে প্রতি বছর জাপান ও চীনে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার।...তোমরা কি করছ? সারাজীবন কেবল বাজে বকছ। এসো, এদের দেখে যাও।...আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছ। ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো তত্ত্বের কণামাত্র, তাও খাঁটি জিনিস নয়, সেই চিন্তার বদহজম ক্রমাগত আওড়াচ্ছ—আর তোমাদের প্রাণমন সেই তিরিশ টাকার কেরানি-গিরির দিকে পড়ে আছে; না-হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ।...বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তা বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাসহ তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?...এসো, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়ে দেখো, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে।" [৬—৩৫৭-৫৯]

এর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দেখা যায়, জাপান সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এশিয়ার দেশ জাপান, তবু ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, এটা এশিয়াবাসীর কাছে অদ্ভুত ও উত্তেজনাকর ঠেকেছিল, সেইসঙ্গে আশাজনক। সচেতন ভারতবাসী চমৎকৃত হয়ে জাপানের অস্বাভাবিক দ্রুত আধুনিকীকরণের রূপ দেখেছে। তাকে অনুসরণের ইচ্ছা জেগেছিল পরাধীন দেশসমূহে, বিশেষতঃ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহলে। মাদ্রাজ মেলের মতো কিছুটা উদারনৈতিক সাহেবী কাগজে, ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৯, সম্পাদকীয় রচনায়, প্রস্তাবিত টাটা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপদ্ধতি কি হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মতের উল্লেখ করা হয়। পত্রিকাটির অভিমত—বাস্তব জীবনসমস্যার সমাধানের সঙ্গে এই পরিকল্পনার যোগ থাকা উচিত। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্-ব্যবহারের উপযুক্ত শিক্ষা যেন এই বিশ্ববিদ্যালয় দান করে। এই সাহেবী পত্রিকাটি শিল্পায়নের ব্যাপারে ভারতের সাহেব-প্রশাসকেরা প্রায় কিছুই করেনি, এই সমালোচনা পর্যন্ত করতে পশ্চাদ্‌পদ হয়নি। সে বলেছিল, ভারতের প্রয়োজন—দক্ষ যন্ত্রশিল্পী, ভূতাত্ত্বিক ও খনিতত্ত্ব-বিদ্। জাপান মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অর্ধবর্বর অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর

এক প্রধান উৎপাদক-দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে—সে সম্বন্ধেও সে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।২১

কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক, 'হিন্দু'র বিখ্যাত সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় জুন ১৯০১ সংখ্যায় "ইনডাসট্রিয়াল রিজেনারেশন অব ইণ্ডিয়া" নামে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে তিনি দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত দেশে কৃষি ও শিল্পের কোন্ দুর্দশা হয়েছে, বিদেশী মূলধন কিভাবে দেশীয় শিল্পের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে, ইংরাজ প্রশাসকদের সঙ্গে সহযোগে ঐ বিদেশী মূলধন এদেশের সম্পদ কিভাবে লুণ্ঠন করছে, তার বিশদ আলোচনা করেন; বিদেশী মূলধন ভারতে শিল্পপ্রসারের দ্বারা অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটাবে, এই যুক্তি মানতে তিনি অস্বীকার করেন; কেবল সেইসব দেশেই বিদেশী মূলধন উন্নতির হেতু হয়েছে যেখানে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তারিত, ইংলণ্ডের মতো দেশও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়েছে বলে ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে ইংলণ্ড বর্তমানে শিল্পে পশ্চাদ্‌পদ, এবং তা নিয়ে ইংলণ্ডে বিশেষজ্ঞ মহলে বিশেষ দুশ্চিন্তা; ভারতের প্রয়োজন—অবিলম্বে স্বদেশে ব্যাপক শিল্পশিক্ষা এবং প্রয়োজনে বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ;—এইসকল প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে তিনি জাপানের উচ্চ প্রশংসা ক'রে বলেন, জাপানের দৃষ্টান্ত ভারতের পক্ষে অবশ্যই অনুকরণযোগ্য।২২

কলকাতার বেঙ্গলী পত্রিকায় ১৯০১ সালের ২৭ জুলাই, ১০ অগস্ট, ১৫ অগস্ট—এই তিন সংখ্যায় *Can We Successfully Imitate Japan* নামে তিনটি চিন্তাপূর্ণ সম্পাদকীয় নিবন্ধ বেরোয়। প্রথম নিবন্ধে বলা হয়, জাপানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেই ভারতের পরিত্রাণ ঘটবে—এমন ধারণা ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান। "জাপান পঞ্চাশ বছর আগে বর্বরতা থেকে একধাপ মাত্র দূরে ছিল"—এই ধরনের উন্নাসিক মন্তব্য সম্পাদক অবশ্যই করেছিলেন; সেই জাপানীরা, তিনিই লেখেন, "এখন পৃথিবীর মহাবিস্ময়।" জাপান মাথা

২১ "It is extraordinary that whilst it is recognised that so much of affluence of England has depended upon her manufactures, and these again upon her stores of coal and iron, the British administration in this country should have made such absolutely feeble and inadequate efforts to ascertain the indigeneous sources of both. The tendency has too often been to trammel private effort by endless red-tape... Let us, if possible, have trained mineralogists and geologists who can localise and appraise our mineral wealth ; let us have trained mechanical engineers,... Let us have experts in manufactures of glass, paper, rope, iron, china and stroreware... Wakened from a torpor of exclusiveness and semi-barbarism only thirty-five years back, Japan has in a single generation entered the markets of the world as a large producer." [*Madras Mail,* October 28, 1899, *Mr. Tata's Scheme*]

২২ "There is no country in the world whose modern history furnishes such valuable and extremely interesting object-lessons to India as Japan, which, within the last thirty years, has revolutionised her industrial conditions with an aptitude, courage, foresight, as marvellous as have characterised her political revolution. Before the Restoration of 1868, Japan was industrially in the same mediaeval and backward state as India is at the present moment, but along with the political revolution an era of industrial revolution also was inaugurated, which upset her old indigenous system of industries. Japan's emergence from her isolation and her contact with the progressive nations of Europe, were accompanied by radical changes in the habits and tastes of the people." [G. Subramania Iyer, *Industrial Regeneration of India, The Indian Review,* June, 1901]

হলেছে তার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের শক্তিতে—সেকথা প্রথম প্রবন্ধে সম্পাদক বিশদভাবে বলেছিলেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে জাপান কিভাবে রাতারাতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে যেন তুলে নিয়ে এসে স্বদেশের বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিল, তারই বর্ণনা ছিল। জাপানের রাষ্ট্রতন্ত্রের মডেল ইংরেজি, স্থলসৈন্যের মডেল ফরাসি, নৌবাহিনীর মডেল ইংরেজি, বিজ্ঞানের আদর্শ আমেরিকা, জার্মানী। "পঁচিশ বছরে কোনো প্রাচ্যদেশ কিভাবে পুরো ইউরোপীয়তায় আকণ্ঠ হতে পারে, তার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত জাপান।" সম্পাদকের মতে, জাপান দ্রুত রূপান্তরিত হতে পেরেছে যেহেতু সেখানে ভারতের মতো জাতিপ্রথার বজ্রবন্ধন নেই; তার কনফুসীয় মতে আছে ব্যাপক ঔদার্য; সেখানে সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশী সংসর্গ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা নেই; এবং যেহেতু জাপানীরা আধ্যাত্মিকভাবে খুব নিম্নপর্যায়ে অবস্থিত, তাই বিদেশী প্রজ্ঞাকে আমদানী করার বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে কোনো আত্মিক প্রতিরোধও নেই।

এই পর্যায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য তৃতীয় প্রবন্ধটিতে ভারত ও জাপানের অবস্থার তুলনা ক'রে, ভারতের পক্ষে জাপানের পন্থানুসরণ করা সম্ভব কিনা, সেই উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়। দুঃখের বিষয়, সে উত্তর অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ ও স্ববিরোধী চিন্তায় পূর্ণ। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসভ্যতার বিষয়ে সম্পাদক যা বলেছেন, তাতে, কাছাকাছি সময়ে ইংরাজি ও বাংলায় প্রকাশিত স্বামীজীর চিন্তার প্রতিধ্বনি আছে। ভারতীয় বেদান্তভাব বর্তমানে কিভাবে পাশ্চাত্যজগতে অনুপ্রবেশ করছে, তা বলার সময়ে পরোক্ষে কিন্তু নিঃসংশয়ে তিনি স্বামীজীর উল্লেখ করেছেন।২৩ সম্পাদকের মত এইসব অংশে স্বীকার্য, তা অধিকন্তু স্বীকার্য যেখানে বলেছেন, স্থিতিশীল অথচ সক্রিয় পুরাতনী সভ্যতার প্রতিরোধের জন্য ভারতের পক্ষে পুরোপুরি ইউরোপ হয়ে ওঠা সম্ভব নয়, যা জাপান বহুলাংশে হতে পেরেছে। কিন্তু তাঁর অন্য অনেক কথাই যুক্তিসিদ্ধ নয়। তার সবগুলির আলোচনার দরকার নেই। তাঁর সবিশেষ বৃটিশ-ভক্তিও বিরক্তিকর। কিন্তু অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ছিল জাতীয়তা সৃষ্টিতে অধ্যাত্মবাদের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। তাঁর একথা স্বীকার্য, ভারতে পাশ্চাত্যজাতির আগমনকালে অখণ্ড জাতীয় ভাব সৃষ্টিকারী কোনো শক্তিশালী অধ্যাত্মনেতা ছিলেন না। কিন্তু যখন সম্পাদক বলেন, "বুদ্ধ বা শংকরের মতো বিরাট ধর্মনেতার প্রয়োজন ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য"—তখন তিনি যে ভারতীয় ধর্মনেতাদের ভূমিকা সম্বন্ধে অতিশয় অনুচিত চিন্তা করেছেন, তাও প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধ ও শংকরের মতো ধর্মনেতারা নিঃসন্দেহে ব্যাপক জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না রাজনৈতিক মুক্তিসাধন। প্রথমতঃ ঐ দুই নেতার কালে এদেশ রাজনৈতিকভাবে পরাধীন নয়। তারপর উল্টোদিকে এও বলা যায়, বুদ্ধ-পরবর্তীকালে ভারত যখন বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হল তখন বুদ্ধের অহিংসা সে আক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করেনি। এবং, শংকরের আবির্ভাবের পরে মুসলমান আক্রমণ ঘটে, ফলে ভারতবর্ষ ক্রমে বৈদেশিক শক্তির কাছে পরাভূত হয়।

---

২৩ "The nations of India were not inferior in civilization to the nations of Europe; and that civilization, [is] cast in the mould of lofty spirituality... The archaic civilization of the Rishis of old is just as much alive at the beginning of the twentieth century as it was three thousand years ago... The tide of progressive thought is being slowly, though unobtrusively, rolled back from the East towards the West, and the Vedanta Philosophy is day by day influencing the thought of Europe more and more. If was the Hellenism of conquered Greece which subjugated the intellect of the Roman conqueror. It is the Hinduism of conquered India which is destined to subjugate the European conqueror in no very distant future." [*Can We Successfully Imitate Japan III, Bengalee,* Aug. 15, 1901]

আসলে ধর্মনেতাদের দায়িত্ব ভাবসংক্রমণের। স্বাধীন বা পরাধীন—যে-দেশেই তাঁরা আবির্ভূত হোন, ভাববিস্তারের ক্ষেত্রেই তাঁরা বিজয়ী। এ-তথ্য যে সম্পাদকের অজানা তা নয়। ইতিপূর্বেই দেখেছি, তিনি পরাভূত গ্রীসের ভাববিজয়ের সঙ্গে পরাভূত ভারতের ভাব-বিস্তারের তুলনা করেছেন।

যে-বিবেকানন্দের কাছ থেকে সম্পাদক শেষোক্ত ধারণাটি লাভ করেছেন, সেই বিবেকানন্দই যে, ধর্মচেতনার পথে ভারতে নবউত্থানের স্রষ্টা—সেকথা বছরখানেক পরেই সম্পাদক স্বীকার করবেন, স্বামীজীর শোকবার্তা লিখতে গিয়ে। বিবেকানন্দের দ্বারা সৃষ্ট এই নবজাগরণই যে ভারতবর্ষে কিছুকাল পরে রাজনৈতিক মুক্তিসাধনায় প্রবল বেগসঞ্চার করবে—সেকথা স্বীকৃত হবে নানামুখে, এবং এই গ্রন্থের শেষাংশে সে-বিষয়ে তথ্যও আমরা দেব। কিন্তু শেষপর্যন্ত সম্পাদক নিছক রাজনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তার কারণও বোধগম্য —তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সংগঠক।

বেঙ্গলীর প্রবন্ধগুলির এই কিছু আলোচনার উদ্দেশ্য—সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার স্ববিরোধিতা দেখানো। সম্পাদক ভেবেছেন—যাঁরা জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলেছেন, তাঁরা বুঝি পুরোপুরি অনুসরণের প্রয়োজন বোঝাচ্ছিলেন। তাই ভেবে নিয়ে সম্পাদক ফলাও করে বোঝাতে চেয়েছেন—কেন ভারতের পক্ষে জাপানের অনুসরণ সম্ভব নয়। বস্তুতঃপক্ষে যাঁরা ঐ অনুসরণের কথা বলেছেন, তাঁরা আংশিক অনুসরণের অতিরিক্ত কিছু চাননি। যেমন, স্বামীজী জাপানের দ্রুত শিল্পায়নের পথ নিতেই বলেছিলেন, কিংবা জাতীয়তা বজায় রেখেও জাপান যেভাবে ইউরোপের বিজ্ঞানকে নিয়েছে—তারই অনুসরণের প্রয়োজন বুঝিয়েছিলেন। স্বামীজী জাপানীর দেশপ্রেম সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই দেশপ্রেম এলে, তারই তাগিদে ভারতবাসী স্বদেশের উন্নতির জন্য বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করবে—এই ছিল তাঁর ধারণা। অপরদিকে বেঙ্গলীর সম্পাদক তখনকার অনেকের মতো জাতিপ্রথাকে যতখানি অনড় ব্যবস্থা ধরেছেন, স্বামীজী তা করেন নি। বিস্ময়ের কথা—বিবেকানন্দ বা টাটা, বিজ্ঞানচর্চায় ও শিল্পায়নে জাপানের সাফল্যকে ভারতের পক্ষে যেখানে অনুকরণযোগ্য মনে করেছেন—সেখানে কিন্তু বেঙ্গলীর সম্পাদক, রাজনৈতিক নেতা হয়েও বিশেষ নজর দেননি; জাতির ঐহিক উন্নতির পক্ষে ঐ গুরুতর প্রয়োজন তাঁর রচনায় উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। এবং জাতিভেদ ও গভীর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও ভারতে কেন যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি হবে না—তার কারণও আমরা তাঁর রচনার মধ্যে খুঁজে পাই না।

॥ ৯ ॥ সমকালীন ভারতবর্ষে শিল্পায়ন-চিন্তা

সমকালীন ভারতবর্ষে শিল্পায়নের চিন্তা ক্রমেই প্রাধান্য পাচ্ছিল। দেশের দারুণ দারিদ্র্য, ক্রমান্বয়ে কয়েকটি দুর্ভিক্ষ, প্রশ্নটিকে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে বড় করে তুলেছিল। এমনকি সুবিবেচক কোনো-কোনো ইংরাজ প্রশাসক পর্যন্ত বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। মরাঠা'র ১৩ মে, ১৯০০ তারিখের সম্পাদকীয় শুরু হয়েছিল এই বলে : "পরপর দুটি দুর্ভিক্ষ দেশের সকল চিন্তাশীল মানুষকে ভারতীয় জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হতে বাধ্য করেছে।" কিছু পরে সম্পাদক লেখেন : "তিরিশ বছরের আন্দোলন যা করতে পারে নি, ক্রমান্বয়ে-ঘটিত দুটি দুর্ভিক্ষ তা করতে পেরেছে। বোম্বাইয়ের মহামান্য গভর্নর এবং বরোদার মহামান্য গায়কোয়াড় কেবল তাঁদের মতামত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁদের বিবেচনামতো প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ উপায়ও নির্ধারণ করেছেন।...[সে উপায়] কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহদান।"২৪

২৪ *Mahratta*, May 13, 1900, *Commercial and Industrial Education.*

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রে, বিশেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলের পত্র-পত্রিকায়, প্রসঙ্গটি বারবার উত্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিদেশী মূলধন বেশি সক্রিয় ছিল, আর বোম্বাই-অঞ্চলে দেশীয় মূলধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, জামসেদজী টাটা বোম্বাইয়েরই লোক। এর কাছাকাছি সময় থেকে ভারতের নানাস্থানে 'ইনডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স' হতে থাকে। ১৯০১, মে মাসে মেদিনীপুরে 'প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে' প্রস্তাব নেওয়া হয়—কংগ্রেসের পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে 'ইনডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশন' সংগঠিত হোক। প্রস্তাবটি দেশের নানাস্থানে সাদর অভ্যর্থনা পায়। ভারতীয় ও ইংরাজ, উভয় মহলই এ-সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হয়।২৫ এই সকল আলোচনা থেকে দেখা যায়, ইংরাজ ও ভারতীয় উভয় মহলের বড়ো অংশের সাধারণ মত হল—ভারতের বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনই কাম্য। এর বেশি কিছু ভাবতে এঁরা উৎসাহী ছিলেন না।

এর পরে কলকাতায় যখন ১৯০১ ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের মূল অধিবেশন হল, তখন সেখানে সত্যই 'ইনডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশন' অনুষ্ঠিত হয়, যা নানাদিকে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। পুনার 'মরাঠা' ২৯ ডিসেম্বর, ১৯০১, এক্ষেত্রে কলকাতার অগ্রবর্তিতাকে অভিনন্দিত করে।২৬ বিদেশী দ্রব্য বয়কট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাশিমবাজারের মহারাজা আপত্তি করেন—এই সম্পাদকীয়তে তার বিরোধিতা করা হয়। উক্ত মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজার অনুপস্থিতিতে 'ইনডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশন'-এর উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি ইংরাজ প্রশাসকদের স্বার্থপ্রণোদিত উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলেন : বয়কট ক'রে বিদেশী দ্রব্যের বিতাড়ন বাঞ্ছনীয় নয়; ভারতীয় দ্রব্য যেন উৎকর্ষের দ্বারা বিলেতী দ্রব্যকে পরাভূত ক'রে বিতাড়িত করে; উত্তম বিলাতী দ্রব্যের বদলে নিম্নশ্রেণীর দেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে বলা "ভ্রান্ত দেশপ্রেম।" মরাঠা উত্তরে বলে : বিলেতী দ্রব্য বয়কটের অর্থ—দেশীয় শিল্পের পক্ষে এক-জাতীয় বেসরকারী 'প্রোটেকশন।' "এই প্রোটেকশনই, এখনো যে সামান্য পরিমাণ শিল্প আমাদের হাতে আছে, তার রক্ষায় বা উন্নয়নে সমর্থ।.. ল্যাঙ্কাশায়ার-বস্ত্রকে বয়কট করা আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ন্যায়সঙ্গত উপায়ের একটি।"২৭

এইসকল আলোচনাকালে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি স্বভাবতঃই প্রাচীন ভারতের শিল্পসমৃদ্ধির উল্লেখ করে। বেঙ্গলী এবং অন্যান্য কাগজে এই ধরনের অনেক কথা লেখা হয়। ঐতিহাসিকদের গবেষণার কল্যাণে তখন এইসব তথ্য শিক্ষিত সচেতন মানুষদের গোচর

২৫ এ ব্যাপারে টাইমস অব ইণ্ডিয়া সম্পাদকীয় লিখেছিল। দেশীয় পত্রিকাগুলি উৎসাহে সমর্থন জানায়।

২৬ "If Bombay has the credit of convening the first political Congress, Calcutta will have the equally enviable credit of inaugurating an Industrial Congress for all India." [*Mahratta*, Dec. 29, 1901, *The Calcutta Industrial Exhibition*]

২৭ বিদেশী দ্রব্যের বয়কট-প্রস্তাব আরও পুরাতন।

"About five years ago this question [of boycotting] was discussed in the Bombay Presidency with reference to the Swadeshi cloth movement, and it may be remembered with interest that after some fight Mr. Wacha, the President of this year's Congress at Calcutta, was persuaded to admit that boycotting Lancashire for instance, would be one of the legitimate means of achieving the end we all have in view. For he said, 'by all means make a beginning. Boycotting may be taken as a means to an end.'" [*Ibid*]

হয়েছিল।২৮ ইতিহাসজ্ঞ বিবেকানন্দ এর দু'বৎসর আগে নানা রচনায়, বিশেষতঃ 'বিলাত-যাত্রীর পত্রে' ('পরিব্রাজক'), প্রাচীন ভারতের শিল্পসমৃদ্ধির আবেগময় বিবরণ দিয়েছেন।

শিক্ষিত মহলে ঐকালে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কী ধরনের সচেতনতা দেখা গিয়েছিল, তা পাঠকদের গোচর করার জন্যই এইসকল তথ্যের উল্লেখ করছি। কিন্তু সচেতনতা যদি কিছু পরিমাণে এসেও থাকে, দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং তাকে কর্মপরিণত করার যোগ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়নি। এইখানে পুনশ্চ আমরা বিবেকানন্দ ও টাটাকে কাছাকাছি পাচ্ছি। টাটা-জীবনীর ভূমিকায় জে আর ডি টাটা লিখেছেন : জামসেদজী বুঝেছিলেন—ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিন মৌল প্রয়োজন : ইস্পাত, বিদ্যুৎ, এবং গবেষণাসহ কারিগরি শিক্ষা। এই সচেতনতা ৭০ বছর আগে ভারতবর্ষে অসাধারণ ব্যাপার ছিল, যখন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল কিছুকেই উপেক্ষা বা অবজ্ঞার চোখে দেখা হত।২৯

জামসেদজী টাটার সক্রিয় প্রজ্ঞার পক্ষে জে আর ডি টাটার দাবি সর্বথা গ্রাহ্য। কিন্তু আমরা এইসঙ্গে যোগ করে দেব—সমকালের ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও তার পূরণের উপায় সম্বন্ধে আর একজনের ধারণা অন্ততঃ অনুরূপভাবে "অদ্ভুত স্বচ্ছ ও সর্বাঙ্গীণ বাস্তবতাসম্পন্ন" ছিল। বলাবাহুল্য সে ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি টাটাকে

২৮ ময়মনসিংহের মহারাজা কলকাতা ইনডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশনে প্রেরিত উদ্বোধনী ভাষণে বলেন :

"Even in the most ancient times this country was famous for its arts and fabrics. We read in history that Greek and Phoenician fleets used to sail into our ports and go back laden with rich cargoes of silk and muslin of gold and silver filigree work and thus spread the fame of Indian wealth among the most distant nations of the West... Even about two hundred years ago, the Dutch, the Portuguese, the Italians and the East India Company istelf, used to carry on a brisk trade in goods of the various kinds indigeneously manufactured in this country." [*Ibid*]

বেঙ্গলী ১১ অগস্ট, ১৯০১ তারিখের সম্পাদকীয় রচনায় [*The Industrial Development of India*] হ্যাভেলের আলোচ্য বিষয়ের একটি বক্তৃতার সূত্রে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের শিল্পসমৃদ্ধির বিবরণ দিয়েছিল।

২৯ জামসেদজী টাটার সমকালীন ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞানশিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধিদৈন্য অবশ্য যথেষ্টই ছিল। নচেৎ বিখ্যাত পণ্ডিত-লেখক অধ্যাপক এন এন ঘোষ কিভাবে ১৯০১, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে বলতে পেরেছিলেন—ইনডাস্ট্রির উন্নতির জন্য বিজ্ঞানশিক্ষার দরকার নেই, কারণ বিজ্ঞান ছাড়াই ভারতে কাগজশিল্প, বয়নশিল্প, চর্মশিল্প ইত্যাদির প্রসার হয়েছে। বেঙ্গলী পত্রিকায় ২২ মে, ১৯০১ তারিখে এক পত্রলেখকের দীর্ঘ পত্রে [*Scientific Studies and Industrial Progress : A Reply to Mr N. N. Ghose*] ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়। বলাবাহুল্য অত্যন্ত সহজ কতকগুলি কথাই পত্রলেখক বলেছিলেন: যেমন, বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল; ছোটখাট শিল্প আপাততঃ বিজ্ঞান ছাড়াও শুরু হতে পারে, কিন্তু তাদের অগ্রগতি ঘটবে না; বড় শিল্প তো পুরো বিজ্ঞাননির্ভর; ভারতে যেটুকু শিল্পপ্রসার হয়েছে, তাদের জন্য এদেশীয় না হলেও বিদেশীয় বিজ্ঞানীদের সাহায্য তো রয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু বিস্ময় লাগে, এই অত্যন্ত সাধারণ কথাগুলি একদিন বলতে হয়েছিল—সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় তা ছাপাও হয়েছিল। পত্রলেখক, বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন--"ভারতে উল্লেখযোগ্য একটিমাত্রই রাসায়নিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে—বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল—সে প্রতিষ্ঠানের পিছনে আছে পি সি রায়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।"

নিজ মতে কিভাবে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, আগেই দেখেছি। জে আর ডি টাটা আলোচ্য ব্যাপারে উৎসাহী শ্রেষ্ঠ ভারতীয়গণের নামের এক লম্বা তালিকা পেশ ক'রে, দুটি নাম তাতে যোগ করতে ভুলে গিয়েছেন, যাঁদের নাম সর্বাগ্রে থাকা উচিত ছিল—তাঁদের একজন স্বামী বিবেকানন্দ—আধুনিক ভারতবর্ষকে যিনি বিশ্বের মানচিত্রে প্রথম সগৌরবে স্থাপন করেন, এবং ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে ঐহিক উন্নতির প্রয়োজনের ঘোষণায় অক্লান্ত ছিলেন। অন্যজন সুভাষচন্দ্র বসু, যিনি ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, ইংরাজ লেখকদের মতে পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার চরম কারণ, একই সঙ্গে ভারতে সুসংগঠিত ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের প্রবর্তক। তবে স্বীকার্য, জে আর ডি টাটা ঐতিহাসিক নন, তাই তিনি ভুল ক'রে বলতে পারেন, কেবল জামসেদজী টাটাই তাঁর কালে "পাশ্চাত্ত্যের শিল্প-বিপ্লবের পূর্ণ তাৎপর্য, ও সে-বস্তুর কোন্ প্রয়োগ-সম্ভাবনা স্বদেশে আছে, তা বুঝতে পেরেছিলেন।" আমরা যোগ করব, স্বামীজী যখন ছিলেন তখন ঐ "কেবল" শব্দটি অবশ্যই উঠিয়ে দিতে হবে।

॥ ১০ ॥ স্বামীজী ভারতের জন্য কী চেয়েছেন—ক্ষুদ্র না বৃহৎ শিল্প?

স্বামীজী কারিগরি শিক্ষা এবং শিল্পায়নের প্রয়োজনের কথা বলেছেন, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত যন্ত্রশিল্প কোন্ আকারের—ক্ষুদ্র না বৃহৎ শিল্প? এ-বিষয়ে স্বামীজীর বিক্ষিপ্ত উক্তিগুলিকে যদি একত্রে সুশৃঙ্খলভাবে বিচার করা না যায় তাহলে মত-বৈপরীত্য ঘটতে পারে। স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তার এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকটির উপরে একবার আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিলেন প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক, উক্ত পত্রিকার ১৯৩০ সালের নভেম্বর সংখ্যায়। ঐ তথ্যবহুল যুক্তিসিদ্ধ প্রবন্ধটির বক্তব্য অতীব আকর্ষক, কম আকর্ষক নয় প্রবন্ধটির পটভূমিকা। এটি লেখা হয়েছিল যখন মহাত্মা গান্ধীর লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ভারতবর্ষ তোলপাড় করছে। গান্ধীজী চরকাকে তাঁর যুদ্ধের অস্ত্র করেছিলেন। অহিংস সত্যাগ্রহী তিনি, কুটীরশিল্পবাদী, বৃহৎ শিল্পের বিরোধী। তিনি তাঁর এই মতকে তাঁর অনুবর্তীদের কাছে ধর্মমতের তুল্য করে তুলেছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর আপসহীন মনোভাবের কথা সুবিদিত। তিনি ও তাঁর ভক্তদের এই বিষয়ক অনমনীয়তার একটি বেদনাদায়ক দৃষ্টান্তের কথা আমরা জানি। এইকালের আট বছর পরে, ১৯৩৮ সালে, সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেন। জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে তার সভাপতি হতে রাজি হন। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় ভারতের বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার বিশ্বেশ্বরায়া বা বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, এবং অর্থ-নীতিবিদ্ কে টি শাহ্ এই প্ল্যানিং কমিটির সঙ্গে যুক্ত হন। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে, সেইসঙ্গে প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধনী সভায়, ও অন্যত্র, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র যেসব কথা বলেন তাতে কুটীরশিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বৃহৎ শিল্প যে অপরিহার্য তা জোরের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছিল—এবং সেটা সুভাষচন্দ্রের অন্যতম বৃহৎ অপরাধ হয়ে দাঁড়ায় কুটীরশিল্পবাদী গোঁড়া গান্ধীপন্থীদের কাছে। কংগ্রেস-সভাপতিপদ থেকে তাঁর বিতাড়নের অন্যতম কারণও হয় এই 'অপরাধ।'[৩০]

৩০ এ-বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যমূলক আলোচনা আছে লেখকের "সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং" গ্রন্থে।

ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তায় কত দীর্ঘদিন ধরে অস্বচ্ছতা বর্তমান ছিল তা দেখিয়ে দেবার জন্য স্বামীজীর বহু পরবর্তীকালের এইসব ঘটনার উল্লেখ করছি। এর বিপরীত দিকে ছিল বিবেকানন্দের অগ্রসর চিন্তা, যা তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রবুদ্ধ ভারতের পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি তার প্রমাণ। এর মধ্যে গান্ধী-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল বিরোধিতা করা হয়। এই বৎসরের গোড়ার দিকে প্রবুদ্ধ ভারতে কয়েক সংখ্যায় স্বামীজীর অর্থনৈতিক চিন্তার সারসংকলন করা হয়েছিল--তারই উপর নির্ভর করে সম্পাদক প্রবন্ধটি লেখেন। গান্ধী-নীতির বিরোধিতা করে ঐ প্রবন্ধসূচনায় বলা হয়, স্বামীজী সর্বাবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে অহিংসাকে সমর্থন করেন নি। গোটা ভারতবর্ষ যখন প্রতিযোগিতা ক'রে রাজনৈতিক অহিংসার গুণকীর্তনে আত্মহারা, সেইসময়ে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকের ঐ রচনা রীতিমতো দুঃসাহসিক।

সম্পাদক এর পরে স্বামীজীর 'সেকুলার' দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নমুনা উদ্ধৃত করেছেন। জনসাধারণের জন্য কেবল ত্যাগ নয়—ভোগ চাই—চাই প্রচণ্ড ক্রিয়াশীল রজোগুণ। স্বধর্ম পালন করতে হবে গৃহীদের। সন্ন্যাসীর আদর্শ গৃহীর আদর্শ নয়। ভোগ না হলে ত্যাগ আসবে না। নির্বোধের মতো ভারতে বস্তু-সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করা হয়। জনসাধারণের জন্য এমনকি বিলাসসামগ্রী পর্যন্ত চাই। পেটপুরে খেতে পরতে পাক তারা, ভোগ করে নিক যথেচ্ছভাবে—তবে তো বৈরাগ্য আসবে।

স্বামীজীর এই ধরনের বহু কথা উদ্ধৃত করার পরে সম্পাদক প্রশ্ন তুলেছেন—ঐ ভোগ্য-বস্তু, ঐহিক সম্পদ, আসবে কোথা থেকে? এক্ষেত্রে স্বামীজীর উত্তর কী? সম্পাদকের মতে, স্বামীজীর ধারণা ছিল—তা আসবে যন্ত্রশিল্পায়ন থেকে, এবং সে শিল্প বৃহৎশিল্প। স্বামীজীর রচনায় যন্ত্রশিল্পবিরোধী যে-সামান্য দু'একটি উক্তি আছে, সতর্কভাবে তাদের বিচার সম্পাদক করেছেন। একটি ক্ষেত্রে স্বামীজী বলেছিলেন, অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতি ভালো, কিন্তু বেশি যন্ত্র মানুষকে যান্ত্রিক করে ফেলে। আর একটি ক্ষেত্রে স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেন—তিনি যদিচ পূর্বে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের পক্ষপাতী ছিলেন (ট্রাক্টর দিয়ে একসঙ্গে বৃহৎ ভূমি চাষ ইত্যাদি), কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে অন্ততঃ সে পদ্ধতির ঔচিত্যে তাঁর সন্দেহ জেগেছে। তা করলে ছোট-ছোট চাষীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

এই দুটি উক্তির কোনোটিতে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পূর্ণ বিরোধিতা নেই। সর্বদা যন্ত্রের অধীন থাকলে মানুষ যে যন্ত্রবৎ হয়ে যায়, তাতে সন্দেহ কী? সে সমস্যা যে-কোনো অনড় পদ্ধতির মধ্যেই আছে। জাতিভেদ নামক সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে স্বামীজী কি বলেন নি—এই প্রথার এমনই বন্ধন যে, যে-মানুষ জল তোলে সে পুরুষানুক্রমে জল তুলেই যায়, যে কাঠ কাটে সে শত-শত বৎসর কাঠই কেটে যায়? যন্ত্রসভ্যতার দোষ আছেই, স্বামীজীর মতো আধ্যাত্মিক মানুষ অপেক্ষা সে সম্বন্ধে অধিক সচেতন আর কে? কিন্তু তার প্রধান গুণ, তা জনসাধারণের অন্নসংস্থান করে। সমষ্টির জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নামক দোষের তুলনায় অন্য সকল দোষকেই বিবেকানন্দ অল্প ক্ষতিকর বলে মনে করেছেন। আর যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কার অত্যন্ত ন্যায়সংগত ভিত্তি সেকালে ছিল। ভারতবর্ষ পরাধীন—সুতরাং সাধারণ কৃষকের ভূমির উপর যেটুকু অধিকার আছে, যৌথ-খামারের নামে যদি তা কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে ভূমিহীন কৃষকের পর্যায়ে তারা চলে যাবে—হয়ে পড়বে নিছক ক্ষেতমজুর। তাদের অন্ন ও আত্মা—দুয়েরই মৃত্যু তখন। পরাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিকাতেই বিষয়টিকে বিচার করতে হবে।

১৯৩০ সালের লেখায় প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক যৌথ কৃষির প্রশ্নে ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতার কথা উত্থাপন করেন নি। তিনি কেবল বলতে চেয়েছিলেন—কৃষির ক্ষেত্রে স্বামীজীর বৃহৎ যন্ত্রবিরোধী মনোভাবকে শিল্পের ক্ষেত্রে টেনে আনা সংগত হবে না।

সম্পাদক অখণ্ডনীয় প্রমাণসহ দেখিয়েছেন—স্বামীজী শিল্পায়ন বলতে প্রধানতঃ বৃহৎ শিল্পায়নই বুঝতেন। স্বামীজীর কালে পাশ্চাত্ত্যদেশে শিল্প মানে বৃহৎ শিল্প। তাই স্বামীজী যখন পাশ্চাত্ত্যের কাছে শিল্পশিক্ষা নেবার কথা বলেছেন তখন নিঃসন্দেহে বৃহৎ শিল্পায়নের দিকেই তাঁর নজর ছিল। সম্পাদক কর্তৃক উদ্ধৃত স্বামীজীর উক্তির কয়েকটি এই : "তোমাদের [ভারতবাসীদের] অবশ্যই ইউরোপীয়দের তুল্য সংগঠনী শক্তি আয়ত্ত করতে হবে।" "হিন্দুদের পাশ্চাত্ত্য থেকে কিছু বস্তুবাদ শিখতে হবে, এবং তাদের দিতে হবে কিছু আধ্যাত্মিকতা।" "পাশ্চাত্ত্যবাসীদের কাছ থেকে বস্তুজীবনের উপর প্রভাব-বিস্তারকারী বিজ্ঞান শিখতে হবে যাতে আমরা জীবনসংগ্রামের অধিক উপযুক্ত হয়ে উঠি।... তারা ঐহিক বিষয়ে আমাদের গুরু হয়ে থাকবে।" "আমাদের বস্তুজ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে আমরা [বিদ্যুৎ ও অন্যান্য] শক্তিকে সংগঠিত করে ব্যবহার করতে সমর্থ হই।...এ-জিনিস কিছুটা আমাদের পাশ্চাত্ত্য থেকে শিখতেই হবে।" "পাশ্চাত্ত্যের সংগঠনী শক্তি ও বস্তুসভ্যতা যেমন আমাদের দেশের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, তেমনি ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও দর্শন পাশ্চাত্ত্যভূমিকে প্লাবিত করছে। তারা যেমন তাকে রুখতে পারবে না—তেমনি আমরাও তাদের বস্তুসভ্যতাকে ঠেকাতে পারব না।" "ভারতকে ইউরোপের কাছ থেকে বহিঃপ্রকৃতিকে কিভাবে জয় করতে হয় তা শিখতে হবে, আর ইউরোপকে ভারতের কাছ থেকে শিখতে হবে অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের রহস্য।" "তোরা একটা ছুঁচ পর্যন্ত তৈরী করতে পারিস না, তবু ইংরেজদের সমালোচনা করিস! ওরে নির্বোধ, আগে তাদের পায়ের কাছে বসে যন্ত্রশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কার্যকরী বুদ্ধি শিখে নে, যাতে জীবনযুদ্ধে জিততে পারিস।" "পাশ্চাত্ত্যবাসীরা অবশ্যই বস্তুবিজ্ঞানে, ঐহিক অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে, তোমাদের গুরু হবে।" "প্রতি শহরে প্রতি গ্রামে একটা করে মঠ করতে হবে। সেখানে একজন সুশিক্ষিত সাধু মোহন্ত হয়ে থাকবেন। তাঁর অধীনে কার্যকরী বিজ্ঞান ও শিল্প শেখানোর বিভিন্ন বিভাগ থাকবে। সেই বিভাগগুলির পরিচালনা করবেন এক-একজন বিশেষজ্ঞ সন্ন্যাসী।" "আমাদের দরকার কারিগরি শিক্ষা এবং অনুরূপ বস্তু, যা ইনডাস্ট্রি-এর উন্নতিতে সাহায্য করবে।" "যদি বাঁচতে হয় তাহলে আমাদের বৈজ্ঞানিক জাতি হতে হবে।" "মাড়োয়ারিরা ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে। যদি তারা ইউরোপীয়দের পকেট ভরাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কতকগুলি ফ্যাক্টরি ও ওয়ার্কশপ তৈরি করত, তাহলে তাদেরও লাভ হত, আর দেশেরও দূরপ্রসারী মঙ্গল হত।"

স্বামীজী যখন কারিগরি শিক্ষার দ্বারা কলকারখানা করার কথা বলছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই প্রাচীন কুটীরশিল্পের কথা ভাবছিলেন না। যখন তিনি বিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক শক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহারে লাগাতে স্বল্পতম ব্যয়ে বৃহত্তম সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে বলেছেন, তখন কোনো সন্দেহই না রেখে বলা যায়—স্বামীজী বৃহৎ শিল্পায়নের পক্ষ-সমর্থনই করছিলেন।

প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক তাঁর প্রবন্ধে টাটা-পরিকল্পনার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের সমর্থনের কথা যুক্ত করতে পারেননি, বিষয়টি তাঁর জানা না-থাকার জন্যই। যাইহোক, যন্ত্র-শিল্পায়ন অবশ্যই বহু 'পাপ' সৃষ্টি করবে—কিন্তু এক্ষেত্রে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ স্বামীজী দেননি। তাঁর বক্তব্য—ঐ দোষ-অংশকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তারের দ্বারা। মানুষ তার দেহের প্রয়োজন মিটিয়ে নিক—কিন্তু তাকে সচেতন করে দেওয়া হোক আত্মার ক্ষুধা-নিবারণের উপায় সম্বন্ধে। স্বামীজীর এইসকল চিন্তার দিকে সম্পাদক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু তিনি স্বামীজীর চিন্তার আর একটি দিক এখানে উত্থাপন করতে পারতেন। সমাজতন্ত্রও শিল্পায়নের দোষ অনেকাংশে হ্রাস করতে সমর্থ।

উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার উপরে সমষ্টির যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে জনসাধারণ সচেতন মন নিয়ে, প্রয়োজন-ভিত্তিক পরিমাণে, যন্ত্র-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হবে, তার দ্বারা শ্রমিকের মানসিক জড়ত্বের আশংকা কিছুটা দূরীভূত হবে। সেইসঙ্গে অবসরের স্বাচ্ছন্দ্যও বৃহত্তর জনগণ লাভ করতে পারবে, যা চিত্তোৎকর্ষের সহায়ক। আগেই দেখেছি, দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের কালে স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশে ধনিকদের জোটবন্ধ একনায়কতন্ত্রকে কোন্ দারুণ বিপজ্জনক ব্যাপার বলে মনে করেছিলেন। তাঁর সুনিশ্চিত বক্তব্য—ধনীদের কর্তৃত্বে জনগণের মুক্তি নেই--তা আছে সাধারণ মানুষের অধিকারলাভে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সুযোগ সংকুচিত হবার আশংকা আছে। অথচ স্বামীজী ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের পক্ষে জোরালো প্রচারক। তাঁর সমাজতন্ত্রে থাকবে স্ফুরিত-ব্যক্তিত্ব সমষ্টির সমানাধিকার। অর্থাৎ মানুষ যেন নিজ কেন্দ্র-দণ্ডের উপর আবর্তিত হতে-হতে সূর্য-প্রদক্ষিণ করে। এই ছিল স্বামীজীর সিদ্ধান্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

প্যারিস কংগ্রেস : পূর্বাপর ঘটনা

॥ ১ ॥ স্বামীজীর দ্বিতীয় পাশ্চাত্ত্যযাত্রা—কেন?

এই অধ্যায়ের নাম 'প্যারিস কংগ্রেস' হওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্ন উঠবে। স্বামীজীর জীবনের ইতিহাসে বা অন্য কোনো ইতিহাসে প্যারিস কংগ্রেস বড় ব্যাপার নয়। তবু 'প্যারিস কংগ্রেস' ঘটনাটি যেহেতু সমকালীন ভারতবর্ষে কিছু গুরুত্বলাভ করেছিল—এবং স্বামীজী তাতে যোগদান করতে যাচ্ছেন, ফলে চিকাগো ধর্মমহাসভার তুল্য চমকপ্রদ কাণ্ড পুনশ্চ ঘটতে পারে, এমন সম্ভাবনায় উচ্চকিত হয়েছিল জনচিত্ত—তাই "প্যারিস কংগ্রেস"-কে অধ্যায়ের শিরোনামা করেছি, যদিও জানি, অধিকতর সঙ্গত নাম হয়, "দ্বিতীয় ও শেষ পাশ্চাত্ত্যভ্রমণ এবং বিশ্বের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর চরম বার্তা।" স্বামীজীর জীবনী গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখব—তাঁর এই দ্বিতীয় পাশ্চাত্ত্যবাস সায়াহ্নকিরণের মধুরোজ্জ্বল বিভায়, ও পরবর্তী রহস্যধূসর গভীর সৌন্দর্যে পূর্ণ ছিল।

১৮৯৯, ২০ জুন, স্বামীজী কলকাতা থেকে 'এস এস গোলকোণ্ডা' নামক জাহাজে ক'রে পাশ্চাত্ত্যযাত্রা করেন। এই যাত্রা অপ্রত্যাশিত কোনো ব্যাপার নয়। নানা কারণে এই গমন অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। প্রথম কারণ, স্বামীজী কয়েক বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা পাশ্চাত্ত্যে বেদান্তধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের যে-সূচনা ক'রে এসেছেন, তার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার জন্য তাঁর পুনশ্চ সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাঁর অবর্তমানে ইংলণ্ডের কাজ প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। স্টার্ডি প্রমুখ ইংরাজ সহায়কেরা তাঁর আগমন কিভাবে চেয়েছিলেন, এবং তিনি না যাওয়ায় কি রকম হতাশ ও রুষ্ট হয়েছিলেন, তার বিবরণ আগে দিয়েছি। [২য়, ১০৫-৬]। আমেরিকার কাজে-কর্মেও নানা অসুবিধা হচ্ছিল। সেইসঙ্গে সেসব জায়গায় কর্মপরিধি বিস্তারের প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছিল। শেষোক্ত উদ্দেশ্যে তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বলেছিলেন, আমার মধ্যে আমেরিকা ইতিমধ্যে 'ক্ষত্রিয়কে' দেখেছে, তুরীয়ানন্দের মধ্যে দেখবে 'ব্রাহ্মণকে'। তুরীয়ানন্দ কঠোর তপস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। [স্বামীজী এক্ষেত্রে জাতিভেদ না দেখালেও পারতেন। যদি কাউকে পূর্ণ মানব বলা যায়, সে তিনি—অবশ্যই তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল।]

পাশ্চাত্ত্যযাত্রার দ্বিতীয় কারণ, অর্থসংগ্রহের বাসনা। ইতিমধ্যে যা-কিছু সংগ্রহ করে এনেছিলেন, তা মঠ-প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা-প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হয়ে গেছে। অত্যন্ত টানাটানি চলছিল, টাকার অভাবে কাজ প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। স্বামীজী ভেবেছিলেন, যদি সম্ভব হয়, কিছু 'উপার্জন' করে আনবেন পাশ্চাত্ত্যদেশ থেকে।

তৃতীয় কারণ, স্বাস্থ্য। পাশ্চাত্ত্য থেকে প্রথম প্রত্যাবর্তনের পরে, প্রচণ্ড কাজের চাপে স্বামীজীর স্বাস্থ্য চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কয়েকবার পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসে কাটিয়ে তিনি হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তাঁর অনুরাগী ও বন্ধুরা ভেবেছিলেন, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় হয়ত স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটতে পারে। ভারতে নানাপ্রকার আঘাত আক্রমণ (যার দীর্ঘ ইতিহাস ইতিপূর্বে দিয়েছি)—তৎসহ আকাঙ্ক্ষিত গতিতে ভারতীয় কর্মধারা প্রবাহিত না হওয়া—ইত্যাদি মিলে তাঁর মনকে এমনই বিচলিত করছিল যে, এই পরিবেশে স্বাস্থ্যোদ্ধার হওয়া কঠিন হচ্ছিল। সেইজন্যও তাঁর পাশ্চাত্ত্যগমনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। স্বামীজী

তাঁর এই সময়ের পূর্ববর্তী ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে বলেছেন (বাহ্যতঃ যে-জীবন অকল্পনীয় গৌরবের বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত ছিল)—"দুই বৎসরের দুঃসহ যন্ত্রণা।"

১৮৯৭ সালের মার্চ মাস থেকে স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্যযাত্রার কথা উঠছিল, এমনকি সংবাদপত্রেও সেসব কথা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যের সংকট অবস্থা পাশ্চাত্ত্যযাত্রার পরিপন্থী হয়ে ওঠে। ১৮৯৭-৯৮ সালে লেখা স্বামীজীর চিঠিপত্র ও অন্যান্য সূত্র থেকে—এই পাশ্চাত্ত্যযাত্রার পরিকল্পনা ও তা বাতিলের সংবাদ মেলে। স্বামীজীর স্বাস্থ্য কোন্ বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল, এমনকি তাঁর দেহত্যাগের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল—সে সম্বন্ধে বিবরণ মেলে, নিবেদিতার পত্রাবলীতে। 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে (১ম খণ্ড) সেইসকল বিবরণের কিছু অংশ আমরা সংকলন করে দিয়েছি, যার মধ্যে "ঈশ্বরের বিনাশের তুল্য" ঐ মহা বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনায় নিবেদিতার ভয়ার্ত যন্ত্রণার অনেক বর্ণনা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বদলের নানা ঘটনার পরে, ১৮৯৯ সালের মে মাসের গোড়ায় পাশ্চাত্ত্যযাত্রা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়। নিবেদিতার পাশ্চাত্ত্যযাত্রাও এই সময়ে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। স্বামীজী অনুভব করেছিলেন, অনুভূতিগত কারণে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য নিবেদিতার স্বদেশে ফেরা উচিত, যেখানে তাঁর মা ও ভাই বোন আছেন। বিশেষতঃ এই সময়ে নিবেদিতার বোনের বিয়ে স্থির হয়েছিল। সেই পারিবারিক উৎসবে নিবেদিতার যোগদান তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন—তা যেন নিজের পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার সাংসারিক দেনাপাওনা মিটিয়ে দেবার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, নিবেদিতার পাশ্চাত্ত্যযাত্রার আরও কারণ উপস্থিত হয়েছিল। কলকাতায় নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় তখন অর্থাভাবে অচল। টাকার দায় আর স্বামীজীর পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বিদ্যালয়ের টাকা নিবেদিতা-কেই জোগাড় করে আনতে হবে। সে কাজ তিনি করবেন আমেরিকায় বক্তৃতাদির দ্বারা উপার্জন করে। স্বামীজী আরও ভাবতে পারেন—আমেরিকায় ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর প্রচারের প্রতিরোধের জন্য খ্রীস্টান মিশনারিদের প্ররোচনায় রমাবাঈ সেখানে গিয়ে ভারত-বিরোধী কুৎসার যে-ঢেউ তুলেছেন, তার খণ্ডন করাও দরকার। একাজ ভারতীয় নারী করলেই ভাল হত, সে উদ্দেশ্যে তিনি সরলা ঘোষালকে আমেরিকায় যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন (সেকথা চতুর্থ খণ্ডে বলেছি), কিন্তু সরলা সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি। এক্ষেত্রে নিবেদিতা যতটুকু পারেন ততটুকু করুন। নিবেদিতা ১৮৯৯-১৯০০-তে আমেরিকায় কার্যকালে তা যথেষ্টই করেছিলেন। সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নেই।

স্বামীজীর দ্বিতীয় পাশ্চাত্ত্যযাত্রার যেসব কারণের উল্লেখ করলাম সেগুলি ছিলই, কিন্তু যে-রকম স্পষ্টভাবে তাদের উল্লেখ করেছি, সেই আকারে ছিল কিনা সন্দেহ করা যায়। আরও বলা যায়, ঐ সকল কারণের চেয়ে অনেক গভীর ও দুর্জ্ঞেয় কারণে এই দ্বিতীয় পাশ্চাত্ত্যযাত্রা ঘটেছিল। অন্ততঃ মিসেস বার্ক তাঁর "সেকেণ্ড ভিজিট" [পৃ. ১] গ্রন্থে তাই বলতে চেয়েছেন। স্বামীজী তাঁর চরম বাণী এই পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণেই উচ্চারণ করেছিলেন। সে যেন তাঁর সচেতন মনের প্রয়াস নয়—অসজ্ঞান উৎসারণ। "বৃহৎ এবং উর্বর একটি কার্যক্ষেত্র তাঁর জন্য পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রস্তুত হয়ে আছে—তিনি মহা গুরুত্বপূর্ণ বাণী সেখানে উচ্চারণ করবেন—এই ভ্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম সমুদ্রসীমায় বেদান্তকে স্থাপন করবেন—এ সকল যেন তাঁর মনের মধ্যে ছিলই না।" আমরা দেখি, এই ভ্রমণেই স্বামীজী তাঁর "নব ধর্ম"—মহান মানব দর্শন—পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ঘাটন করেছিলেন। সে মানব-দর্শনের কিছু সূত্র ইতিপূর্বে উপস্থিত করেছি। [তৃতীয় খণ্ড, ৫০১-০৭।]

॥ ২ ॥ কলকাতা থেকে যাত্রা : মাদ্রাজে ও কলম্বোয় সংবর্ধনা

গোলকোণ্ডা জাহাজে স্বামীজীর সহযাত্রী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা। স্বামী সারদানন্দের এক ভ্রাতাও সঙ্গে যাচ্ছিলেন। যাত্রার আগের দিন রাত্রে মঠে বিদায়সভা হয়েছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দ "যুগনায়ক বিবেকানন্দ" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মঠের ডায়েরি থেকে এই সভার বিবরণ দিয়েছেন (২৩৭-৩৯); তাতে দেখা যায়, মঠের পক্ষ থেকে স্বামীজীকে অভিনন্দনপত্র ও গোলাপ ফুলের তোড়া দেওয়া হয়; সারদানন্দ ও অখণ্ডানন্দ কিছু বলেন। উত্তরে স্বামীজী যা বলেন, "তা শুনিয়া," প্রত্যক্ষদর্শী শচীন্দ্রনাথ বসু পত্রে লিখেছিলেন, "সকলের ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইল। সকলেরই অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য মনে হইল যে, আমরা মানুষ। স্বামীজী খুব এনথুসিয়েস্টিক ভাবে বলিলেন, 'বাবা সব, তোরা মানুষ হ—এই আমি চাই'।" স্বামীজী ঐ সময়েই বলেছিলেন, "সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা। সংসারী লোক বাঁচতে ভালবাসে, সন্ন্যাসীকে ভালবাসতে হবে মৃত্যুকে। আমাদের যখন মরতেই হবে, মৃত্যুর চেয়ে ধ্রুব সত্য আর কিছু নেই, তখন আমরা সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দেহপাত করি না কেন?...সমগ্র জগৎ অখণ্ড সত্তাস্বরূপ, তুমি তার নগণ্য অংশমাত্র. সুতরাং ক্ষুদ্র আমিত্বকে বাড়িয়ে কোটি-কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তো স্বাভাবিক কাজ।...তোমাদের গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, আবার পর মুহূর্তে তৈরী থাকতে হবে মঠের জমিতে চাষ করতে।...অতি সামান্য কাজ, যেমন ধরা যাক পায়খানা পরিষ্কার করা—তাও করতে হবে, শুধু এখানে নয়, অন্যত্রও।...এই মঠের উদ্দেশ্য, মানুষ তৈরী করা।...সেই হল মানুষ যার সম্বন্ধে বলা যাবে, সে হচ্ছে শক্তির অবতার; অপরদিকে তাঁর মধ্যে থাকবে রমণী-কোমলতা, রমণীর দুর্বলতা কিন্তু নয়।...স্বাধীনচিত্ততা যেমন দরকার, তেমনি দরকার আজ্ঞাবহতা।...বায়ুর ন্যায় মুক্ত ও অবাধগতি হও, লতা ও কুক্কুরের ন্যায় হও নম্র ও আজ্ঞাবহ।"

শচীন্দ্রনাথ বসুর বিবরণ থেকে আরও জানতে পারি, ২০ জুন অপরাহ্ণে স্বামীজী প্রিন্সেপ ঘাটে পৌঁছেছিলেন। "ঘাটে প্লেগের এগজামিনেশন হইয়াছিল—খুব স্ট্রিক্‌ট্ এগজামিনেশন। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক সমবেত ছিলেন। বেলা পাঁচটার সময় লঞ্চ আসিল; আমাদের নয়নাভিরাম স্বামীজী তাহাতে উঠিলেন; সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরি-মহারাজের [তুরীয়ানন্দ] মুখের অ্যাসপেক্ট খুব সিরিয়াস হইয়াছিল। মঠের সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। গঙ্গাধর-মহারাজ [অখণ্ডানন্দ] মহুলা হইতে আসিয়া-ছিলেন। লঞ্চ ছাড়িবার সময় সকলেরই চোখ ছল্-ছল্ করিতে লাগিল—কাহারও কাহারও-বা চোখ জলে ভরিয়া গেল। তৎপর সেই পঞ্চাশ জন লোক সিমালটেনিয়াস্‌লি [একযোগে] স্বামীজীর উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। সেই গঙ্গাতীরে সেই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইয়াছিল। অপরাপর সাহেবরা অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল।...ক্রমে লঞ্চ ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল সকলে রুমাল প্রভৃতি ঘুরাইতে লাগিল। ক্রমে যখন অদৃশ্য হইয়া গেল. সকলে গাড়িতে উঠিলেন, সকলেরই মুখ বিষণ্ণ—বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে।"

জাহাজ ডায়মণ্ডহারবার অতিক্রম ক'রে, বঙ্গোপসাগর ধরে, মাদ্রাজে পৌঁছেছিল ২৪ জুন রাত্রে, এবং বন্দরের স্থির জলে নোঙর বেঁধে অপেক্ষা করছিল। মধ্যবর্তী কয়েকদিনের যাত্রাকথা স্বামীজী অনবদ্য ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে। সাহিত্যের সম্পদ সেই বর্ণনা সুপরিচিত। এখানে মাদ্রাজ বন্দরে স্বামীজীর সংবর্ধনার বিষয়ে কিছু নূতন সংবাদ পরিবেশন করতে পারি। স্বামীজীর জীবনী গ্রন্থগুলিতে প্রধানতঃ পরিব্রাজক গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশই উদ্ধৃত আছে। ইংরাজি জীবনীর তৃতীয় খণ্ডে (১৯১৫ সংস্করণ) মাদ্রাজ সংবর্ধনা সম্বন্ধে 'হিন্দু' পত্রিকার একটি বিবরণের অংশ উদ্ধৃত আছে। আমরা 'হিন্দু,'

'মাদ্রাজ মেল' এবং 'মাদ্রাজ টাইমস' থেকে কিছু বেশি সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেগুলি উপস্থিত করার আগে, ১৮৯৭ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ ভারত স্বামীজীকে কোন্ কল্পনাতীত সংবর্ধনা দিয়েছিল, পাঠকদের সে-বিষয়টি স্মরণ করতে বলব। তাঁরা জেনেছেন, স্বামীজীর বিরুদ্ধে খ্রীস্টান মিশনারি, হিন্দু রক্ষণশীল, সংস্কারপন্থী, থিয়জফিস্ট, বৈষ্ণব প্রভৃতি প্রায় সকল সম্প্রদায়ের আক্রমণ কিভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা নাশ করতে সচেষ্ট ছিল। বেদনাদায়ক সেই কাহিনীর সঙ্গে পাঠকের কিছুটা পরিচয় হয়েছে। এইসব কারণে রক্ষণশীল মাদ্রাজে স্বামীজীর সংবর্ধনার সম্ভাবনা সংশয়াচ্ছন্ন ছিল, বিশেষতঃ যখন পূর্বোক্ত সম্প্রদায়-গুলি তাঁর গোমাংসাহার, শূদ্রত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সত্য-মিথ্যা ঝুড়ি-ঝুড়ি খবর ছড়াচ্ছিল। সেই সকল আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ ক'রে মাদ্রাজ কিভাবে তাঁর সংবর্ধনায় এগিয়ে এসেছিল, তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত সংবাদগুলি থেকে মিলবে। পাঠকরা স্মরণ রাখবেন, এই যাত্রায় স্বামীজীর মাদ্রাজে অবস্থানের কথা ছিল না—হয়ত অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্য অবতরণমাত্র করতে পারতেন—তাতেই সেখানে আবেগ ও উন্মাদনার অন্ত ছিল না।

সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের বিবরণগুলি অনুবাদে উপস্থিত করছি :

প্রবুদ্ধ ভারত (মে, ১৮৯৯)

"চিকিৎসকদেব চাপে এবং ইংরাজ বন্ধুগণের জরুরী আহ্বানে স্বামী বিবেকানন্দ আগামী ২০ জুন ইংলণ্ড যাত্রা করবেন। পাঠকদের আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, স্বামীজীর শরীর পূর্বাপেক্ষা এখন অনেক ভালো; তিনি আরও বল পেয়েছেন। আমাদের একান্ত বিশ্বাস, সমুদ্রযাত্রা তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করাবে। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁর সঙ্গে যাবেন।"

ইণ্ডিয়ান মিরার (২ জুন, ১৮৯৯)

"হিন্দু পত্রিকার বঙ্গীয় সংবাদদাতা লিখেছেন : স্বামী বিবেকানন্দের রোগলক্ষণ সম্পূর্ণ দূর হয়নি। তথাপি তিনি ইউরোপযাত্রা স্থির করেছেন। জুন মাসের গোড়ার দিকে সম্ভবতঃ জাহাজে চড়বেন। আমরা যতদূর জেনেছি, তাঁর দ্বিবিধ উদ্দেশ্য : এই যাত্রার দ্বারা স্বাস্থ্যোদ্ধার করবেন, এবং সম্পূর্ণ নিরাময়ের পরে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কার্যারম্ভ করবেন। আমরা সানন্দ অন্তরে স্বামীজীর সুখময় সমুদ্রযাত্রা এবং স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও শক্তির পুনরুদ্ধার প্রার্থনা করছি—সেইসঙ্গে আশা করছি, তিনি যেন পাশ্চাত্যে উচ্চতর হিন্দুধর্মের প্রচারে তাঁর সক্রিয় জীবন পুনর্বার আরম্ভ করতে পারেন।"

হিন্দু (১২ জুন, ১৮৯৯)

"স্বামী বিবেকানন্দ, মিস নোবল এবং পুরীয়ানন্দ [তুরীয়ানন্দ]-সহ ২০ তারিখে এস এস গোলকোণ্ডা জাহাজে ক'রে কলকাতা ত্যাগ করবেন। ইংলণ্ডের পথে মাদ্রাজে তিনি ২৪ তারিখে পৌঁছবেন আশা করা যায়।"

[হিন্দু পত্রিকায় এবং ইণ্ডিয়ান মিরারে ১৫ জুন তারিখে প্রায় একই সংবাদ বেরোয়।]

মাদ্রাজ মেল (২০ জুন, ১৮৯৯)

"**স্বামী বিবেকানন্দ** : আগামী কাল অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময়ে সাউথ বীচ রোডের 'ক্যাসল্ কার্নানে' স্বামী বিবেকানন্দের মাদ্রাজের বন্ধু ও অনুরাগীদের এক সভা হবে; উদ্দেশ্য : ইংলণ্ড যাত্রাপথে তিনি যখন শনিবার সকালে মাদ্রাজে পৌঁছবেন তখন তাঁকে কিভাবে উপযুক্ত সংবর্ধনা দেওয়া যায় তাই নির্ধারণ করা। স্বামীজী আজ এস এস গোল-কোণ্ডা জাহাজে ক'রে কলকাতা থেকে যাত্রা করছেন, সঙ্গে থাকছেন মিস নোবল, ভারতে যিনি নিবেদিতা নামে পরিচিত, আর স্বামী তুরীয়ানন্দ।"

[মাদ্রাজ টাইমসে ২১ জুন তারিখে প্রায় একই সংবাদ বেরোয়]

হিন্দু (২২ জুন, ১৮৯৯)

"গত সন্ধ্যায় ক্যাসল্ কার্নানে স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু ও অনুরাগীদের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল—আগামী শনিবার তিনি এখানে পৌঁছলে কোন্ যোগ্য সংবর্ধনা তাঁকে দেওয়া যাবে তাই স্থির করার জন্য। মাননীয় রায়বাহাদুর পি আনন্দ চার্লু, সি-আই-ই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নের ব্যক্তিদের নিয়ে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়েছে :

"মিঃ পি আনন্দ চার্লু (সভাপতি), স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, মেসার্স ভি সি শেষাচারিয়ার, এম সি আলাসিংগা পেরুমল, এস বিলিগিরি আয়েংগার, মুন্নিস্বামী নাইডু, সাব্র, এম সি নানজুণ্ডা রাও, জি বেংকটরঙ্গ রাও, ভি ভি শ্রীনিবাসন, দেশিক চারিয়ার, সিংগারাভেলু মুদালিয়র, এবং অধ্যাপক রঙ্গাচার্য।

"এই কমিটিকে বলা হয়েছে, তাঁরা যেন উতাকামণ্ডে স্থানীয় সরকারকে লিখে স্বামীজী ও তাঁর দলের অবতরণের জন্য প্লেগ রেগুলেশন-মাফিক ছাড়পত্র সংগ্রহ করেন, কারণ ওঁরা প্লেগাক্রান্ত কলকাতা থেকে আসছেন। প্রস্তাবে বলা হয়, স্বামীজীকে জাহাজঘাটায় অভ্যর্থনা জানিয়ে মানপত্র দেওয়া হবে। সভাপতিকে ধন্যবাদ দানের পরে সভাভঙ্গ হয়।"

স্বামীজীকে জাহাজঘাটায় সংবর্ধনা দেবার উপায় নির্ধারণের জন্য যে-সভা হয়েছিল, তার আকার ও গুরুত্ব আমাদের বিস্মিত করে। মাদ্রাজের বহু সেরা মানুষ ঐ সংগঠন-সভাতেই উপস্থিত ছিলেন। উপরে হিন্দু কাগজের যে-বিবরণ দিয়েছি, তার থেকে অধিক বিস্তারিত রিপোর্ট বেরিয়েছিল মাদ্রাজ মেলে।

মাদ্রাজ মেল (২২ জুন, ১৮৯৯)

"**স্বামী বিবেকানন্দ** : গত সন্ধ্যায় সাউথ বীচ রোডে, মিঃ এস বিলিগিরি আয়েংগারের বাসভবন ক্যাসল কার্নানে স্বামীজীর বন্ধু ও অনুরাগীদের এক সভা হয়। মাননীয় রায়-বাহাদুর পি আনন্দ চার্লু সি-আই-ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শনিবার এস এস গোলকোণ্ডা জাহাজে কলকাতা থেকে মাদ্রাজ এসে পৌঁছচ্ছেন, তাঁকে উপযুক্ত সংবর্ধনা দান করতে হবে। মিঃ আনন্দ চার্লু বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন; তিনি সর্বাধিক সম্মানিত পুরুষ; যদি কেউ দেশবাসীর নিকট থেকে জনসংবর্ধনা লাভের যোগ্য হন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ—বিপুল পরিমাণে তিনি তা লাভ করতে পারেন। সুতরাং কর্তব্য হল, স্বামীজী যে-কয়েক ঘণ্টা মাদ্রাজে থাকবেন সেই সময়ে তাঁকে সাদর ও যথাযোগ্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন। সভায় এই প্রস্তাব নেওয়া হয় : জাহাজঘাটায় সামিয়ানা টাঙিয়ে সভাস্থল নির্মাণ করা হবে —সেখানে স্বামীজীকে মানপত্র দেওয়া হবে। মাননীয় মিঃ আনন্দ চার্লুকে সভাপতি ক'রে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাঁরা স্বামীজীর অবতরণের পরে তাঁকে সংবর্ধনা-জ্ঞাপনের ব্যবস্থাদি করবেন। জাহাজঘাটা থেকে শোভাযাত্রা ক'রে তাঁকে ক্যাসল কার্নানে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে তাঁকে বন্ধু ও অনুরাগীরা আপ্যায়ন করবেন। গতরাত্রে সভায় চাঁদার খাতা খোলা হয়, এবং কিছু-কিছু চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের এক সুপরিচিত শিষ্য—স্বামী তুরীয়ানন্দ। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার 'যথার্থ মহাত্মা' অভিধায় ভূষিত করেছেন। স্বামী অভেদানন্দ ও অন্যান্য যেসব ভারতীয় সন্ন্যাসী ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বেদান্তসত্য প্রচারে নিয়োজিত আছেন, এই দুইজন সন্ন্যাসী ইংলণ্ডে পৌঁছে তাঁদের কর্মভার থেকে মুক্ত করবেন।"

একদিকে স্বামীজীর দর্শন-প্রত্যাশায় চঞ্চল মাদ্রাজ, যদিচ মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁর অবস্থিতি তবু অভ্যর্থনার জন্য ব্যাপক আয়োজন, অন্যদিকে প্লেগ-আইনের কড়াকড়ির জন্য

তাঁর অবতরণ-বিষয়ে অনিশ্চয়তা। শেষোক্ত বিষয়টি মাদ্রাজ টাইমসের রিপোর্টে দেখা যায়।

মাদ্রাজ টাইমস (২৪ জুন, ১৮৯৯)

"**স্বামী বিবেকানন্দ** : আগামীকাল এখানে গোলকোণ্ডা জাহাজ পৌঁছবার কথা, যাতে থাকবেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থাদি করার জন্য ক্যাসল কার্নানে একটি অভ্যর্থনা সমিতির সভা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে কেবল ঘণ্টা পাঁচেক থাকবেন। কিন্তু তাঁর অবতরণের ব্যাপারটি সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। প্লেগাক্রান্ত শহর কলকাতা থেকে আগত গোলকোণ্ডা জাহাজ কোয়ারাণ্টিন নিয়মের অধীন; সেই আইন অনুযায়ী স্বামীজী অবতরণ করতে পারেন না। তাই যাতে তাঁকে নামতে দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ জানিয়ে সরকারের কাছে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে—উত্তরের অপেক্ষা করা হচ্ছে।"

কিন্তু সকলি বিফল ভেল। আইন ও শৃঙ্খলার জন্য সুবিখ্যাত সরকার জনগণের তুচ্ছ ভাবানুভূতির খাতিরে আইনের নাগপাশ অবশ্যই ছেদন করতে পারেন না। স্বামীজীকে নামতে দেওয়া হল না। সে সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

মাদ্রাজ টাইমস (২৬ জুন, ১৮৯৯)

"**স্বামী বিবেকানন্দ** : গতকাল প্রত্যূষে গোলকোণ্ডা মাদ্রাজ বন্দরে প্রবেশ করে। স্বামী বিবেকানন্দ সে জাহাজে ছিলেন। কিছু হিন্দু ভদ্রলোক, যাঁরা অতীব আগ্রহে তাঁর আগমন প্রত্যাশা করছিলেন, নৌকা ক'রে জাহাজের সন্নিধানে উপস্থিত হন। জাহাজটি কোয়ারাণ্টিন নিয়মের অধীন বলে তাতে উঠবার অনুমতি মেলেনি। সেজন্য স্বামীজীর ভক্তবৃন্দকে নৌকা থেকে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। স্বামীজী জাহাজের ডেকে দণ্ডায়মান ছিলেন। স্বামীজীর স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল। আশা করা হচ্ছে, বর্তমান সমুদ্রযাত্রা এবং ইংলণ্ডে অবস্থান, তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাবে। নিবিদিতা নামক একজন আমেরিকান সন্ন্যাসিনী তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন; তুরীয়ানন্দ নামক ভারতীয় সন্ন্যাসীও আছেন। স্বামী সারদা-নন্দের এক সম্পর্কের ভাই এই দলের সঙ্গে যাচ্ছেন। তিনি ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করবেন।"

[মাদ্রাজ টাইমসের এই রিপোর্ট লাহোর ট্রিবিউনে ৯ জুলাই, এবং ইণ্ডিয়ান মিরারে ১৮ জুলাই উদ্ধৃত হয়।]

মাদ্রাজ মেল (২৬ জুন, ১৮৯৯)

"বি আই এস এন-এর স্টিমার গোলকোণ্ডা কলকাতা থেকে গতকাল প্রত্যূষে এসে পৌঁছেছে, তাতে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড যাচ্ছেন। স্বামীজীকে প্লেগ-আইনের জন্য যেহেতু অবতরণ করতে দেওয়া হয়নি, তাই শত-শত দেশীয় ভদ্রলোক ও মহিলা নৌকা ক'রে স্টিমারের দিকে অগ্রসর হন—স্বামীজীকে ফল ও ফুল উপহার দেবার জন্য। গত সন্ধ্যায় গোলকোণ্ডা লণ্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।"

মাদ্রাজ টাইমস ও মাদ্রাজ মেল সাহেবী কাগজ, সুতরাং সরকারের প্লেগ-আইনের বিরুদ্ধে কিছু বলার কথা ভাবতে পারেনি, বরং তাদের রিপোর্ট থেকে মনে হয়—সমগ্র দেশীয় সমাজের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে স্বামীজীকে নামতে না-দেওয়া আর এমনকি ব্যাপার! [মাদ্রাজ টাইমসের অবহেলার রিপোর্টে—জাহাজঘাটায় উপস্থিত 'কিছু হিন্দু ভদ্রলোক'—অবশ্য মাদ্রাজ মেলে 'শত শত দেশীয় ভদ্রলোক ও মহিলা'র দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল।] দেশীয় অনুভূতি সম্পর্কে সাহেবদের মতোই উপেক্ষাপরায়ণ ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার ২ জুলাই কিঞ্চিৎ দুঃখ ও অধিক ব্যঙ্গের সঙ্গে লিখেছিল :

"কী না বিরাট দুঃখের ব্যাপার, স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে যাবার পথে মাদ্রাজে অবতরণ

করতে পারলেন না। এখন আশা করা যাক, তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর বন্ধুগণ উক্ত নৈরাশ্যের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করতে সমর্থ হবেন, কারণ, হুগলি নদীর মুখ-নির্গত পথে যাত্রার তুলনায় সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে যাত্রা সর্বদাই অধিক গৌরবময়।"

সোস্যাল রিফর্মারের ব্যঙ্গের অনেকটাই মাঠে মারা যাবার কথা, কারণ, যদি মাদ্রাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে সর্বনাশা কালাপানি-যাত্রাকে অধিক গৌরবময় মনে করেন, তাহলে সে-কাজ তো সোস্যাল রিফর্মারদের পালের বাতাস কেড়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজসংস্কারকেরা রসিকতা করার সময়ে পরিষ্কার দেখিয়ে দিতেন—তাঁদের তোরিয়া স্বভাবে আর যাই থাক, রসবোধ নেই।

দেশীয় মনোভাব, তার আক্ষেপ হতাশা ও ক্রোধ, হিন্দু পত্রিকার পরবর্তী এক রিপোর্টে কিছুটা পাওয়া যায়। ২৬ জুনের রিপোর্টে হিন্দু একই তারিখের মাদ্রাজ মেলের অনুরূপ সংবাদই দেয়। কিন্তু পরদিন, ২৭ জুন, তার জনৈক সংবাদদাতা-প্রেরিত রচনায় দেশীয় মানুষের নিরুপায়তা এবং সরকারী আইনের পক্ষপাতিত্বের নগ্ন চেহারা একেবারে খুলে যায়।

হিন্দু (২৭ জুন, ১৮৯৯)

"প্লেগ নিয়মাবলী ও স্বামী বিবেকানন্দ : জনৈক সংবাদদাতা লিখে পাঠিয়েছেন : রবিবার প্রভাতে জাহাজঘাটা ব্যগ্র দর্শকদের বিপুল ভিড়ে পূর্ণ ছিল, যারা স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভের জন্য সমবেত হয়েছিল। স্বামীজী এস এস গোলকোণ্ডা জাহাজে ইংলণ্ড যাচ্ছেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে গভীর হতাশার সৃষ্টি হয় যখন তাদের জানানো হল—প্লেগাক্রান্ত কলকাতা থেকে আগত জাহাজটি কোয়ারাণ্টিন নিয়মের অধীন, তাই স্বামীজীকে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হবে না। ফলে, সকল শ্রেণী ও বয়সের যে-অগণিত মানুষ সমবেত হয়েছিল, তাদের অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ফিরে যেতে হয়।

"কিছুসংখ্যক মানুষ এক নজরে অন্ততঃ স্বামীজীকে দেখে নেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা নৌকা ক'রে জাহাজের কাছাকাছি পৌঁছান। স্বামীজী ডেকে এসে দাঁড়ালে, তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীরা দূরে থেকেও সমাদরপূর্ণ অভিনন্দন জানান। কয়েকদিন আগে মাননীয় মিঃ আনন্দ চার্লুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় স্থির হয়—স্বামীজীকে মাদ্রাজে অবতরণের এবং পুনর্বার জাহাজে ওঠার পূর্বে কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের অনুমতি দেবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হবে। নভোলোকে বার্তার পর বার্তা পাঠানো হতে লাগল, স্বামীজীর বন্ধু ও অনুরাগীরা কিছু অস্পষ্ট উত্তর মাত্র পেলেন, কিন্তু বন্দরের হেলথ্ অফিসারের কাছে তারযোগে কোনো সম্মতি এল না, যার ফলে হেলথ্ অফিসার স্বামীজীকে নামতে দিলেন না। প্লেগ-নিয়মাবলী সতর্কভাবে পড়ার পরে আমার কিন্তু মনে হয়নি যে, ওঁরা কোনো সম্পূর্ণ সুস্থ যাত্রীকে অসংক্রামিত বন্দরে নেমে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করতে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারেন। যদি কোনো যাত্রী ইস্ট কোস্ট রেলপথে কলকাতা থেকে আসেন এবং একই সন্ধ্যায় লণ্ডনের জাহাজে উঠতে চান, তাহলে আমাদের বিশ্বাস, তাঁকে বাধা দেবার কোনো উপায় নেই, অবশ্য যদি তিনি স্বাস্থ্যবান হন এবং পোর্ট হেলথ্ অফিসারের কাছে স্বাস্থ্যপরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হন। গত রবিবার পোর্ট হেলথ্ অফিসার স্বামী বিবেকানন্দকে মাদ্রাজে অবতরণ করতে দেননি। কিন্তু শোনা গেছে, জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তীরে নামতে দেওয়া হয়েছিল, এবং তাঁকে শহরের কয়েকটি জায়গায় দেখা গিয়েছিল। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমি জানতে ইচ্ছুক, উক্ত ক্যাপ্টেন কি অপর মানুষকে কদাপি সংক্রামিত করবেন না, এমন অদ্ভুতরকম কোনো পদ্ধতির দ্বারা ধোলাই হয়েছিলেন!! আশা করা যায়, সরকার পোর্ট সার্জনের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাবেন, ক্যাপ্টেন কিভাবে, কোন্ অধিকারে, শহরে গমনের অনুমতি পেয়েছিলেন?"

হিন্দুর এই লেখাটি বেঙ্গলী কাগজে ৮ জুলাই সম্পূর্ণতঃ, এবং প্রবুদ্ধ ভারতে অগস্ট

সংখ্যায় অল্প বর্জিত আকারে প্রকাশিত হয়। প্রবুদ্ধ ভারত একই সংখ্যায় লখনৌ অ্যাড-ভোকেট-এর মন্তব্য সংকলন করে—যার মধ্যে স্বামী তুরীয়ানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাসূচক উল্লেখ ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ হিমালয়ে তপস্যা ক'রে কোন্ বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করেছিলেন, উত্তর ভারতীয় এই পত্রিকাটির মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায় :

"স্বামী তুরীয়ানন্দ ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন জেনে আমরা আনন্দিত। তিনি উচ্চ সংস্কৃতি-সম্পন্ন এবং উচ্চ অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী। উত্তর ভারতের প্রায় সমগ্র ভূমি পরিভ্রমণ ক'রে তিনি ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বেদান্তদর্শনে গভীর ব্যুৎপন্ন, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতার অধিকারী, উত্তম কথক ও লেখক, স্বামী তুরীয়ানন্দ—বক্তৃতামঞ্চে যথেষ্ট সফল যদি নাও হন, বিপুলসংখ্যক শিষ্যসংগ্রহে যে সমর্থ হবেন তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৯৬ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দ কয়েক মাসের জন্য লখনৌ-এ ছিলেন; সেইসময়ে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসেন তাঁরা তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতায় চমকিত হয়েছিলেন।"

মরাঠা ৯ জুলাই, ১৮৯৯, সম্পাদকীয় মন্তব্যে, স্বামীজীকে মাদ্রাজে নামতে দেওয়া হয়নি ইত্যাদি বলার পরে, স্বামীজীর এই পাশ্চাত্যগমন আর একটি দিক থেকে কেন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল, তা ব্যাখ্যা ক'রে বলে :

"স্বামীজীর বর্তমান ইংলণ্ড যাত্রা হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য তিনি যে-ব্রত নিয়েছেন তার অনুসৃতি। 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় মিঃ অ্যালফ্রেড ওয়েব সম্প্রতি যে-পত্র লিখেছেন তার থেকে দেখা যায়, মিশনারিরা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসার আক্রমণ নবোদ্যমে শুরু করেছেন। এ-ক্ষেত্রে স্বামীজীর ইংলণ্ড-গমন খুবই সময়োচিত। স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে, সেই জড়বাদের দেশে স্বামীজীর পরিশ্রমের ফলোৎপাদন হতে আরম্ভ করেছে—মিশনারিদের ঘৃণা ও ঈর্ষার বিস্ফোরণ তারই সুনিশ্চিত প্রমাণ।"

নিবেদিতার ২৮ জুন, ১৮৯৯ তারিখের পত্রে "উদ্দীপনাময় মাদ্রাজ ব্যাপারের" উল্লেখ আছে।১ দলে-দলে লোক গভর্নরের কাছে স্বামীজীকে অবতরণের জন্য অনুমতি দেবার আবেদন জানালেও, প্লেগ-আইনের কারণে তাঁকে নামতে দেওয়া হয়নি—এই ঘটনার উল্লেখ করার পরে, নিবেদিতা কিন্তু উক্ত "অবিচারে" রাগে ফেটে পড়েননি (অন্য সময়ে যা তিনি করতেনই) বরং "স্বস্তির নিশ্বাস" ফেলেছিলেন, কারণ, "সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি আকাশছোঁয়া। উল্টোদিকে, একদিনের জনসংঘট্ট ও বক্তৃতাদি তাঁকে তাঁর বর্তমান দারুণ ভালো অবস্থা থেকে শ্রান্তির নিম্নতম গহ্বরে টেনে নামাত। নৌকা বোঝাই ক'রে যারা জাহাজের ধারে হাজির হয়েছিল, তাদের থেকে উপহার নেওয়া, তাদের সঙ্গে সারাদিন কথা বলাতেই যথেষ্ট মন্দ ঘটেছিল।"

স্বামীজীর সংকটজনক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিবেদিতার সঙ্গত উদ্বেগ, সেইসঙ্গে নিজের বিপুল ভাগ্যকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়ত করার স্বাভাবিক স্বার্থপরতা, নিবেদিতার এইকালীন চিঠিপত্র থেকে দেখতে পাই। এই সমুদ্রযাত্রা তাঁর কাছে "স্বর্গীয়।" আবহাওয়া মন্দ থাকায় যাত্রা অনেক সময়ে কণ্টকর হয়েছিল, কিন্তু "অসুবিধা সত্ত্বেও এমন সব মহাগৌরবের মুহূর্ত আবির্ভূত হয়েছিল সে-জন্য যে-কেউ পঞ্চাশটি সমুদ্রঝড়ের মধ্য দিয়ে যেতে রাজি হবে।" স্বামীজীও চিন্তা ও চেতনার ঐশ্বর্য উজাড় ক'রে দিচ্ছিলেন। জাহাজে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করার ইচ্ছা আগে তিনি প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনায় তিনি এমনই তন্ময় হয়ে থাকতেন যে, তাতে প্রায়শঃই ছেদ পড়ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ সে সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে দিলে তিনি বলেন, "হরি-ভাই, আজ থাক;

জাহাজে বেশ ভালই আছি। আর দেখ, নিবেদিতার সঙ্গে একটু কথা বলছি। ও বিদেশী মেয়ে, সব ছেড়ে-ছুড়ে আমার কাছে এসেছে এইসব কথা শুনবার জন্য। বেশ ভাল মেয়ে, খুব সমজদার, এর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই।"২

এই সমুদ্রযাত্রাকালে স্বামীজীর আলোচনার কিছু বিবরণ নিবেদিতা তাঁর 'দি মাস্টার' গ্রন্থে দিয়েছেন। তাঁর পত্রাবলী থেকে আরও কিছু সংবাদ সংকলন ক'রে আমরা 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে দিয়েছি। সেই আলোচনা উপস্থিত করার ক্ষেত্র এ নয়, কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, শব্দে ও বাক্যে ওহেন আলোকবিচ্ছুরণ কদাচিৎ দেখা গেছে।

পরিব্রাজক গ্রন্থে স্বামীজী মাদ্রাজ-ঘটনার চিত্রবৎ বর্ণনা করেছেন :

"চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে-নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে স্থির জল, আর বাইরে উত্তাল তরঙ্গ গর্জাচ্ছে, আর এক-একবার বন্দরের দ্যালে লেগে দশ-বার হাত লাফিয়ে উঠছে, আর ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সামনে সুপরিচিত মান্দ্রাজের স্ট্র্যান্ড রোড। দুজন ইংরেজ পুলিশ ইনস্‌পেকটর, একজন মান্দ্রাজী জমাদার, এক ডজন পাহারাওয়ালা জাহাজে উঠল। অতি ভদ্রতা সহকারে আমায় জানালে যে, কালা আদমীর কিনারায় যাবার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হোক না কেন, সে যে-রকম নোংরা থাকে, তাতে তার প্লেগবীজ নিয়ে বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা, তবে আমার জন্য মান্দ্রাজীরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেছে, বোধহয় পাবে। ক্রমে দু'চারিটি করে মান্দ্রাজী বন্ধুরা নৌকায় চড়ে জাহাজের কাছে আসতে লাগল। ছোঁয়াছুঁয়ি হবার জো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিংহাচার্য, ডাক্তার নঞ্জন রাও, কিডি প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখতে পেলুম। আঁব, কলা, নারিকেল, রাঁধা দধ্যোদন, রাশীকৃত গজা, নিমকি, ইত্যাদির বোঝা আসতে লাগল। ক্রমে ভিড় বাড়তে লাগল—ছেলে, মেয়ে, বুড়ো—নৌকায় নৌকা। আমার বিলাতী বন্ধু মিঃ শ্যামিএর, ব্যারিস্টার হয়ে মান্দ্রাজে এসেছেন, তাঁকেও দেখতে পেলাম। রামকৃষ্ণানন্দ আর নির্ভয় [স্বামীজীর শিষ্য নির্ভয়ানন্দ] বারকতক আনাগোনা করলে। তারা সারাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায় থাকবে—শেষে ধমকাতে তবে যায়। ক্রমে যত খবর হল যে, আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকার ভিড় আরও বাড়তে লাগল। শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারান্ডায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। তখন মান্দ্রাজী বন্ধুদের কাছে বিদায় চাইলাম, ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আলাসিঙ্গা 'ব্রহ্মবাদিন্‌' ও মান্দ্রাজী কাজকর্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করবার অবসর পায় না; কাজেই কলম্বো পর্যন্ত জাহাজে চলল। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়ল। তখন একটা রোল উঠল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজারখানেক মান্দ্রাজী স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল—জাহাজ ছাড়তেই তাদের এই বিদায়সূচক রব! মান্দ্রাজীরা আনন্দ হলে বঙ্গদেশের মতো হুলু দেয়।" [৬—৮৫-৮৬]

এই বর্ণনায় কেবল দুটি পরিহাসতিক্ত বাক্যের মধ্যে স্বামীজী তাঁর অন্তর্জ্বালাকে ধরে দিয়েছেন—কালা আদমীদের দেশেও তাদের প্রধান ধর্মাচার্যকে যেখানে মিছে অজুহাতে আটকে রাখা হল, সেখানে যে-কোনো গোরা স্বচ্ছন্দে যত্রতত্র বিচরণের অধিকারী! এই অপমান এবং পরাধীনতার গ্লানি স্বামীজীকে মর্মান্তিক বেজেছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ তার প্রত্যক্ষদর্শী।

"স্বামীজী ইংলণ্ডে যাচ্ছিলেন, [তুরীয়ানন্দ বলেছেন], আমি সঙ্গে ছিলাম। মাদ্রাজে তাঁকে নামতে দিলনা, যদিও ইউরোপীয়দের জন্য কোনোই বিধিনিষেধ ছিল না। আমি দেখলাম, তিনি ডেকের এধার থেকে ওধারে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন আর

২ গম্ভীরানন্দ, 'যুগনায়ক' (৩য়), ২৪৩-৪৪।

নিজের মনে বলছেন, 'ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করে না কেন? ওরা আমাকে মেরে ফেলে না কেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি? যদি আপনাকে গ্রেপ্তার করে, বা মেরে ফেলে, তাতে ফল কি?' স্বামীজী বললেন, 'দেখছ না, সারা দেশ আমার দিকে তাকিয়ে আছে! যদি তারা আমার বিরুদ্ধে ঐ ধরনের কিছু করে তাহলে দেশ রকেটের মতো উঠে পড়বে'।"৩

সিংহল রাজনৈতিকভাবে না হলেও আত্মিকভাবে ভারতবর্ষের অংশ। পাশ্চাত্ত্য থেকে প্রথম প্রত্যাবর্তনকালে সিংহলে স্বামীজীকে বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, তার বর্ণনা আগে দিয়েছি। [২য়, ৩৪৪-৫০]। এইবারও, সমুদ্রযাত্রায় বন্দর-বিরতির মধ্যে, কলম্বোয় প্রচুর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়। কলম্বোয় স্বামীজীর অবতরণের অনুমতি কিন্তু মিলেছিল।

২৮ জুন, ১৮৯৯, সকালে গোলকোণ্ডা কলম্বোয় পৌঁছয়। ঐদিন সন্ধ্যায় পুনশ্চ যাত্রা শুরু হয়। দুপুর নাগাদ স্বামীজী জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিলেন। মধ্যের কয়েক ঘণ্টা কিভাবে কেটেছিল সে সম্বন্ধে স্বামীজী 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে লিখেছেন :

"কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙায় নেবে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-শুনা হল। স্যার কুমারস্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটি শুধু-পায়ে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্ প্রমুখ বন্ধু-বান্ধবেরা এলেন। অনেক দিনের পর মুড়গতন্নি খাওয়া হল, আর কিং-কোকোনাট। ডাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল, তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল দেখলাম। কাউণ্টেসের [কাউণ্টেস কাননাভারো, ইনি সিংহলে অনেকগুলি বিদ্যালয় আরম্ভ করেছিলেন।] বাড়িটি মিসেস হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজানো। কাউণ্টেস ঘর থেকে টাকা এনেছেন, আর মিসেস হিগিন্স ভিক্ষে করে করেছেন।"

স্বামীজীর লেখায় কলম্বো-সংবর্ধনার কোনো উল্লেখই নেই। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতেও বিস্ময়ের কথা সংবর্ধনার ভালো বিবরণ নেই। জীবনীকারেরা প্রবুদ্ধ ভারতের অগস্ট, ১৮৯৯ সংখ্যার একটি ক্ষুদ্র বিবরণ মাত্র উদ্ধৃত করেছেন, যা ছিল ব্যক্তিগত পত্রের অংশ :

"উদ্ভট প্লেগ-আইন সত্ত্বেও, যার জন্য স্বামীজীকে মাদ্রাজে অবতরণ করতে দেওয়া হয়নি—তিনি কলম্বোয় নামবার অনুমতি পেয়েছিলেন। বহু সহৃদয় বন্ধু বহুভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা ও আতিথ্য দান করেছিলেন। সন্ধ্যায় একটি বাড়িতে ও সংলগ্ন পথে রীতিমতো উৎসবানুষ্ঠান হয়েছিল—জয়ধ্বনিতে কানে তালা লাগার জোগাড়। ইউরোপীয় পরিচ্ছদ সত্ত্বেও তিনি তাদের কাছে অবতার, এবং তাদের প্রিয় মুখগুলি দেখে বোঝা যায়—ওটা সত্যি বলে তারা জানত।"

স্বামীজীর কলম্বো-সংবর্ধনার সঠিক রূপ আমরা জানতেই পারতাম না নিবেদিতার পত্রের বিবরণ না পেলে। [প্রবুদ্ধ ভারতে উপরে উদ্ধৃত বিবরণ নিবেদিতারই পত্রের অংশ বলে মনে হয়]। ৫ জুলাই, ১৮৯৯, জাহাজ থেকে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন :

"কলম্বো সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলা উচিত। যথেষ্ট দেরীতে এবং ঝঞ্ঝাটের অন্তে আমরা দুপুরের পরে স্টিমার থেকে নামলাম। তারপর ক্রমান্বয়ে চলল সমাদর, সংবর্ধনা। সবশেষে, জেটি থেকে গাড়ি ক'রে নেমে গিয়ে আমাদের একটি বাড়িতে প্রবেশ করতে হল, যার বাইরে ঢাক ঢোল, বাঁশি, বাজনাবাদ্যির আয়োজন। ভিতরে ঠাসা ভিড়, টেবিল ভর্তি ফলমূল। কত লোক! আর কী চোখে না তারা স্বামীজীকে দেখছিল! কালো-কালো মানুষ, প্রায় নগ্ন, ঝক্‌ঝকে। দারুণ গরম। কিন্তু তাদের যে-কারো জন্য আমি সবকিছু করতে পার-

তাম—স্বামীজীকে তারা যেভাবে দেখছিল—সেইজন্য। তিনি নিজের ইউরোপীয় পোষাকের দিকে দেখালেন—ভাবের ব্যত্যয় হল না একটুকু। যে-কোনো রূপেই তিনি তাদের অবতার। তারপর তিনি একটি ছোট ফল নিলেন, গ্লাসের দুধে চুমুক দিলেন (সেই একই গ্লাস থেকে তারপর আমাকে দুধ খেতে দিতে ভুললেন না), যা তাঁর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ হিসাবে থেকে যাবে। তারপর যখন তিনি যাবার জন্য পা বাড়ালেন তখনকার চীৎকার যদি শুনতে!—'পার্বতীপতি শিব কি জয়!' কান ফেটে যাবার জোগাড়। যখন বেরিয়ে এলাম, তখন পথে, তারপরে গাড়ি থেকে অবতরণের কালে, সে কি বিরাট জনতা। ঐ সময়ে প্রথমে এগিয়ে এলেন বিদায় দিতে আমাদের প্রথম আতিথ্যদানকারী দম্পতি, অগণ্য উপহারসহ। গৃহস্বামিনী লেডি কুমারস্বামী ইংরাজ মহিলা—তাঁর স্বামী মাদ্রাজী হিন্দু—চমৎকার মানুষ!৪ বেশবাসে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন,

৪ পূর্বে উদ্ধৃত স্বামীজীর রচনায় পেয়েছি, স্যার কুমারস্বামী এবং তাঁর ইংরাজ পত্নী স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। স্বামীজী, কুমারস্বামীদের 'শুধু-পা, কপালে বিভূতি ছেলেটির' কথাও বলেছেন। আনন্দ কুমারস্বামীর বিষয়ে বিখ্যাত গবেষক এস দুরাই রাজা সিংগম তাঁর "আনন্দ কুমারস্বামী ইন সিলোন" (১৯৭৩) গ্রন্থে স্বামীজী-প্রদত্ত উক্ত ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে কিছু সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, স্বামীজী যাঁকে "স্যার কুমারস্বামী" বলেছেন তিনি বস্তুতঃ "মিঃ পি [পুণ্যবলম] কুমারস্বামী," কারণ আনন্দ কুমারস্বামীর পিতা স্যার মুথু কুমারস্বামী [১৮৩৩-৭৯] [এশিয়ার প্রথম নাইটহুড প্রাপ্ত ব্যক্তি, ডিজরেলির বন্ধু এবং তাঁর উপন্যাসের বেনামা চরিত্র: পামার্স্টনেরও বন্ধু] এই ঘটনার অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। স্যার মুথু ইংরাজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন—এঁদেরই একমাত্র পুত্র বিখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী [১৮৭৭-১৯৪৭]। দুরাই রাজার উক্তির সত্যতা যাচাই করার আগে, তিনি সিংহলের সবচেয়ে গুণী এই কুমারস্বামী পরিবারের যে-পরিচয় দিয়েছেন, তার কিছু উল্লেখ এখানে করে নিতে পারি, কারণ এই পরিবারের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলি স্বামীজীর অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে [২য়, ৩৪৪—৫০] ১৮৯৭ সালে প্রথম প্রত্যাবর্তনকালে সিংহলে স্বামীজীকে সংবর্ধনাদানের নেতারূপে যাঁদের পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন এই পরিবারের মানুষেরা। এক্ষেত্রে আমরা তিনজনের নাম পেয়েছি, যাঁরা স্যার মুথু কুমারস্বামীর বোনের ছেলে—লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য মাননীয় পুণ্যবলম কুমারস্বামী (১৮৪৮—১৯০৬), সলিসিটর জেনারেল পুণ্যবলম রামনাথন (১৮৫১—১৯৩০), এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল পুণ্যবলম অরুণাচলম (১৮৫৩—১৯২৪)। শেষোক্ত দুজনও আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন, এবং স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু পুণ্যবলম কুমারস্বামী 'স্যার' হননি। রামনাথন এবং অরুণাচলম সিংহলের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; সিংহলের স্বাধীনতার পরে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সরকারীভাবে বিশেষ শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। অরুণাচলম "সিংহল জাতীয় কংগ্রেসের পিতা"-রূপে সম্মানিত। জাফনার 'হিন্দু অর্গান' পত্রিকা একবার লিখেছিল, "সিংহলে তামিল বা অ তামিল, কোনো পরিবারই এত সংখ্যক বিশিষ্ট সন্তান দানের গৌরব দাবি করতে সমর্থ নয়।"

এহেন এক পরিবারে স্বামী বিবেকানন্দ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

দুরাই রাজার পূর্বোক্ত সংশয় সম্বন্ধে বলা চলে, তিনি ঠিকই বলেছেন, স্বামীজী-উল্লিখিত 'কুমারস্বামী' হলেন 'পি কুমারস্বামী', এবং তিনি 'স্যার' ছিলেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে 'লেডী কুমার-স্বামী' কে, যাঁর কথা স্বামীজী বলেছেন? ইনি যে ইংরাজ মহিলা তা নিবেদিতার চিঠিতেও পাচ্ছি, এবং সেখানেও এঁকে 'লেডী' বলা হয়েছে। তাহলে কি ধরতে হবে—ঐ পরিবারে আরও কেউ ইংরাজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন? এবং তিনি স্বামীজীর এই ভ্রমণের আগেই 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন? দুরাই রাজা বলেছেন, স্যার মুথু কুমারস্বামীর ইংরাজ পত্নী ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে সিংহলে প্রত্যাবর্তন করেননি। এখন যদি এই পরিবারে আর কেউ ইংরাজ মহিলাকে বিয়ে করে না থাকেন, তাহলে দুরাই রাজা প্রদত্ত তথ্য ঠিক নয়। নিবেদিতা লিখেছেন, কুমারস্বামী পরিবারের এই ইংরাজ গৃহস্বামিনী তাঁকে সিংহলে মেয়েদের স্কুল খোলার জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দুরাই রাজা একটি ক্ষেত্রে কিন্তু মস্ত ভুল করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন, কলম্বোর এই সংবর্ধনা হয়েছিল ১৮৯৭ সালে, স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনকালে। না তা সত্য নয়। এটি ১৮৯৯

ধীরস্থির, সরকারের শাসন-পরিষদের এই মাননীয় সদস্য সকলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনবার উচ্চকণ্ঠে শিবের জয় দিলেন, তারপর তিনবার স্বামীজীর জয়—'স্বামী বিবেকানন্দজী কি নমস্কার!' জনতার জয়ধ্বনি ও উল্লাসধ্বনির মধ্যে গোলকোণ্ডায় উঠে পড়লাম। সেখানে পুনশ্চ অভ্যর্থিত হয়ে নিজের ক্যাবিনে যখন ফিরে গেলাম—পরমানন্দে দেখলাম—আমার কপালে তখনো পুজোর টিপ।"৫

এই পর্বে স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থান, নিউইয়র্কের নিকটবর্তী লেগেটদের রিজলি ম্যানরে বাসকালে অপূর্ব আধ্যাত্মিক উন্মাদনার প্রহরগুলি, তারপরে ক্যালিফোর্নিয়ার নানা স্থানে বক্তৃতায় ও কথোপকথনে পরম সত্যের উন্মোচনের কাহিনী এখানে উপস্থিত করব না। স্বামীজীর ইংলণ্ডে অবস্থানকালের কিছু কথা আমরা আগে বলেছি [২য় খণ্ড, ১০৬-১০। এবং নিবেদিতা লোকমাতা, (১ম খণ্ড) গ্রন্থ]। শেষোক্ত গ্রন্থেই রিজলি ম্যানরে স্বামীজীর অবস্থানকালের খণ্ড আলোকিত চিত্র মিলবে। ১৩৮৬ যুগান্তর পুজাসংখ্যায় "অসামান্যা এক নারী, একটি পরিবার এবং স্বামী বিবেকানন্দ" রচনায় একই প্রসঙ্গ বলেছি। লুই বার্ক 'সেকেণ্ড ভিজিট' গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বামীজীর অবস্থান ও 'নব বাণী' প্রচারের কথাও। আমরা অতঃপর প্যারিস কংগ্রেস এবং তাতে স্বামীজীর ভূমিকা গ্রহণের কাহিনীতে প্রবেশ করব। তার আগে, স্বামীজীর সান্নিধ্যে অপরূপ দিনগুলির প্রসঙ্গে আইডা অ্যানসেল যে-কথা বলেছিলেন, তা স্মরণ করব : "সময় বয়ে গেল দ্রুত—অতি দ্রুত—সুগভীর প্রভাত, আনন্দোচ্ছল অপরাহ্ণ এবং সুমহিম সন্ধ্যাগুলিকে বহন ক'রে।" প্রথম আলাপে স্বামীজীর স্বর, সুর, চাহনি, অন্তর্লোকে যেন প্রথম চেতনার

সালের দ্বিতীয় পাশ্চাত্ত্য যাত্রাকালের কথা। সে যাই হোক, ডঃ রাই রাজা এইসূত্রে ১৮৯৭ সালে কলম্বোয় স্বামীজীর সংবর্ধনা সম্বন্ধে একটি সংবাদপত্রের বিবরণ উধৃত করেছেন, সেটি আমরা আগে পাইনি বলে এখানে উপস্থিত করছি :

Arrival Of A Hindu Sage

Swami Vivekananda, the Hindu delegate, who proceeded to Chicago to represent the Hindus at the Parliament of Religions, and who had spent his time since in America and Europe, arrived here last evening by the 'Prinz Regent Luitpold'. He was accompanied by three American and European converts. The Hindus of Colombo mustered in strong numbers at the jetty to give him a welcome. Several leading Hindus went on board and brought him ashore in a steam launch and on landing at the jetty was received by the Hindus headed by the Hon. P. Coomaraswamy and Mr. P. Arunachalam. The Swami and his companions were driven then to the Cinnamon Gardens, the Hindus following in carriages. At the turn to Barnes Street a pandal had been put up. Here the Swami alighted down and was taken in procession with Hindu flags, music and torch lights along Barnes Street to the residence of Mr. Ratnasabapathy which has been placed at his disposal, during his stay here. On arrival here, after the singing of a Hindu song, said to be 3,000 years old, the Hon. P. Coomarswamy read and presented an address from the Hindu community, according him a hearty welcome. The Swami replied at length extolling the principles of their religion and how it had flourished from days immemorial." [*Overland Ceylon Observer*, January 16, 1897]

বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই কাগজটি ছিল ইংরাজ-পরিচালিত।

কুমারস্বামী-সংক্রান্ত ডঃ রাই রাজার গ্রন্থাদি আমি শ্রীযুক্ত গৌতম হালদারের সৌজন্যে পেয়েছি।

আলোকপাত করত—ঘটাত নবজন্ম—অগণিত ক্ষেত্রে তা ঘটেছে—তেমনি এক বিবরণ দিয়েছেন এডিথ অ্যালান। সানফ্রান্সিসকোয় ইউনিয়ন স্কোয়ারে রেডমেনস্ হল-এ স্বামীজী ভারতীয় নারী-আদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার শেষে এই মহিলা স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। স্বামীজী তাঁকে পরদিন সকালে আসতে বলেন। তারপর :

"পরদিন সকালে তাঁর ফ্ল্যাটে উপস্থিত হলে আমাকে বলা হল—স্বামীজী বেরুবেন, সুতরাং কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। কিন্তু আমি জানতাম তিনি আমাকে দর্শন দেবেন, কারণ আমাকে আসতে বলেছিলেন। তদনুযায়ী আমাকে উপরতলায় সামনের বসবার ঘরে যেতে দেওয়া হল। অল্প সময়ের মধ্যে স্বামীজী ঘরে ঢুকলেন, লম্বা ওভারকোট পরনে, ছোট গোল টুপি মাথায়, মৃদুস্বরে স্তোত্রগান করছেন। ঘরের অপর প্রান্তের একটি চেয়ারে বসে তিনি তাঁর অপরূপ ভঙ্গিতে গুন্‌গুন্ ক'রে স্তোত্রগান ক'রে চললেন। তারপর বললেন, 'তাহলে মহাশয়া—!' আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না, কাঁদতে লাগলাম, অবিরল অশ্রু, যেন হৃদয়ের কূল ভেঙেছে। স্বামীজী আরও কিছুক্ষণ স্তোত্রগান করলেন, তারপর বললেন, 'আগামীকাল এই সময়েই এসো।'

"এইভাবেই পুণ্যপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের সমাপ্তি। তিনি আমাকে কোনো প্রশ্নই করেননি, কিন্তু যখন তাঁর সান্নিধ্য থেকে চলে এলাম, তখন আমাব সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে, সমাধান হয়েছে সকল সমস্যার। স্বামীজীর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের পরে, ২৪ বছরের বেশি কেটে গেছে, তথাপি আমার স্মৃতিলোকে সেই দিনটি জীবনের সবচেয়ে বড় পবিত্র সৌভাগ্যের দিন।" [রেমিনিসেনসেস, ৩৯৪-৯৫]

॥ ৩ ॥ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্যারিস-প্রদর্শনী ও প্যারিস-কংগ্রেস : প্রস্তাবিত বেনারস কংগ্রেস

আমেরিকা থেকে যাত্রা ক'রে স্বামীজী ফ্রান্সে পেঁৗছান ৩ অগস্ট, ১৯০০। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে (১৯৬০ সংস্করণ) আছে, মিঃ ও মিসেস লেগেট, যাঁরা লন্ডনে অবস্থান করছিলেন, স্বামীজীকে বিশেষ তাগিদ দেন—স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্যারিসে এসে কিছু সময় কাটাতে। সেইসঙ্গে স্বামীজীর কাছে প্যারিস-প্রদর্শনীর সূত্রে আয়োজিত "কংগ্রেস অব দি হিস্টরি অব রিলিজিয়নস্"-এ বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ এসেছিল। স্বামীজী উভয় আমন্ত্রণই স্বীকার করেছিলেন।

স্বামীজী প্যারিস যাচ্ছেন—এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ভারতবর্ষে জল্পনা শুরু হয়ে যায়। এমন হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কয়েক বৎসর আগে থেকেই ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের প্যারিস-প্রদর্শনী এবং প্যারিস-কংগ্রেসের কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছে। ১৮৯৩ সালের পৃথিবীতে বিরাট ব্যাপার ছিল চিকাগোর বিশ্বমেলা—১৯০০ সালের প্যারিস প্রদর্শনী ততোধিক বৃহৎ জমকালো কান্ড। ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে প্রদর্শনী-আয়োজনের যেসব বিবরণ বেরোয় তার একটিতে [মাদ্রাজ টাইমস, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫][৬] সেখানে নানা বৈজ্ঞানিক কান্ডকারখানা ঘটবার চমৎকার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল। সেখানে নাকি এমন বিরাট এক দূরবীন বসবে যার সাহায্যে নৈশ আকাশ ও চন্দ্রমন্ডলের ঘনিষ্ঠ ছবি সরাসরি দর্শকরা পর্দায় প্রতিফলিত দেখতে পাবে। অজস্র মিউজিয়ামের কথাও ঐ লেখায় ছিল। প্যারিস-প্রদর্শনী শুরু হয়ে যাবার পরে তার দীর্ঘ বিবরণ বেরোয় মাদ্রাজ মেলে, ৮ মে, ১৯০০, যার মধ্যে স্যার জর্জ বার্ডউড রবিবর্মার প্রদর্শিত "চমৎকার চিত্রের" কথা বিশেষভাবে বলে-

৬ *Madras Times*, Sep. 4, 1895, *The Paris Exhibition.*

ছিলেন।৭ চিকাগোর বিশ্বমেলার মতো প্যারিসের এই মহাপ্রদর্শনীর সময়েও ভারতীয় হিন্দুদের সস্তায় ইউরোপ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুতি দিল 'টমাস কুক অ্যাণ্ড সন' কোম্পানি। কালাপানি পার হবার দোষটুকু যদি কেউ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে সে ব্রাহ্মণ পাচকের দ্বারা প্রস্তুত নিরামিষ ভোজন, ও পবিত্র জলপান ক'রে, হোটেলে আলাদা বন্দোবস্তের মধ্যে অবস্থিত থেকে, ঘরে ফিরতে পারবে—এমন আশ্বাস উক্ত কোম্পানির পক্ষে দেওয়া হয়েছিল। 'বম্বে গেজেট' নামক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিক সংবাদপত্র থেকে এই শুভসংবাদ 'বেঙ্গলী' পরিবেশন করে ২২ অক্টোবর, ১৮৯৮। সমুদ্রযাত্রাকে 'জলচল' করার পক্ষে আন্দোলনকারী এই সংবাদপত্র সানন্দে জানায়—ইতিমধ্যেই কুড়িজন ভারতীয় নারী ও পুরুষ ঐ জাহাজে ঠাঁই লাভের জন্য আবেদন করে বসেছে।৮

এইসকল ও অন্যান্য সংবাদ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও মনে হয় না, ভারতবর্ষে প্যারিস-প্রদর্শনীর বিরাটত্ব ও আশ্চর্যজনকতা সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা গড়ে উঠেছিল। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় বেশ কয়েক সংখ্যায় 'ইউরোপে বিবেকানন্দ' পর্যায়ে তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখেছেন। তাদের মধ্যে এই মহাপ্রদর্শনীর আকার ও প্রকারের আভাস পাওয়া যায়। স্তম্ভিত ক'রে দেওয়ার মতো ব্যাপার। এর জন্য খরচ হয়েছিল দশ কোটি ফ্রাঁ। প্যারিসের মধ্যাংশে ২৫০ একর জমিতে [মতান্তরে ৫৫০ একর জমিতে] এটি বিস্তৃত, কলাশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহে পূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্রদর্শনীভবন নির্মাণ করেছিল স্বদেশীয় স্থাপত্যের সর্বোত্তম নমুনা দেখিয়ে। ফোয়ারা, মূর্তি ও স্মারকস্তম্ভে পূর্ণ স্থানটির কেন্দ্রস্থলে ছিল ৯ বৎসর পূর্বে নির্মিত আইফেল টাওয়ার, তৎকালীন পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন। সেখানে সুড়ঙ্গ ছিল, তৎসহ চলমান পথ, এবং বেলুনে আকাশভ্রমণের সুচারু ব্যবস্থা। প্রতি সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা, বলনৃত্য; পরে নৈশভোজনের অজস্র আসর। নদীতে আলোকিত বাদ্যমুখরিত নৌবিহার। 'প্যারিস নগরী'-র পক্ষে ফ্রান্সের সকল মেয়রের জন্য যে-নৈশভোজের আয়োজন হয়, তাতে যোগ দেন ২২,০০০ মানুষ। রাজারাজড়া-সহ ৫ কোটি লোক প্রদর্শনী দেখেছিল।

কিন্তু সবচেয়ে চমকপ্রদ ও বৈপ্লবিক ছিল বিদ্যুতের বিচিত্র ব্যাপক বিকাশ। "আমেরিকান ঐতিহাসিক হেনরি অ্যাডামস [বিদ্যাত্মানন্দ লিখেছেন] বহুবার এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখেছেন। তাঁর ক্লাসিক গ্রন্থ 'দি এডুকেশন অব হেনরি অ্যাডামস্'-এর একটি গোটা অধ্যায় তিনি এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে ব্যয় করেছেন। নানা নতুন যন্ত্র, বিশেষতঃ একটি বিরাট ডায়নামো দেখে তিনি মোহিত হয়ে পড়েন। অ্যাডামস ঐ ডায়নামোতে ভবিষ্যতের জন্য সেইপ্রকার বৈপ্লবিক শক্তির স্ফুরণ দেখেছিলেন যা অতীতে কোপার্নিকাস বা গ্যালিলিওর চিন্তায়, কলম্বাস

কর্তৃক আমেরিকার আবিষ্কারে, ৩১০ খ্রীস্টাব্দে কনস্টানটাইন কর্তৃক খ্রীস্টধর্মের স্বীকৃতিতে, সূচিত হয়েছিল।"৯

চিকাগোর বিশ্বমেলার মতো এই প্যারিসের মহাপ্রদর্শনীও স্বামীজী বহুবার ঘুরে দেখেছেন। চিকাগোয় ঐকালে অখ্যাত পরিব্রাজক তিনি, নতুন পৃথিবীর সম্মুখীন বিস্ময়াকুল এক তরুণ, সানন্দ কৌতূহলে একাকী ঘুরে দেখছিলেন অভাবিতের সম্ভার। এখন তিনি পৃথিবীর সম্মানিত ধর্মাচার্য, তাঁর সঙ্গে আছেন আমেরিকা ও ইংলণ্ডের অভিজাত বিদ্বান-বিদুষীগণ; সঙ্গে থেকে প্রদর্শনী দেখাচ্ছেন অন্য কেউ নন, সমকালের বিখ্যাত মনীষী প্যাট্রিক গেডেস।১০

স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ লিখেছেন, ফ্রান্সের সমকালীন পত্রপত্রিকায় এই মহাপ্রদর্শনীর বিষয়ে প্রচুর সংবাদ দেখলেও ধর্মীয় কংগ্রেস ('ধর্মেতিহাস সভা') সম্বন্ধে কদাচিৎ উল্লেখ দেখেছেন। বিস্ময়ের কথা, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্যথা ঘটেছিল। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের আসল মনোযোগ গিয়ে পড়েছিল প্রস্তাবিত ধর্ম-কংগ্রেস সম্বন্ধেই। এর মূলে ছিল বিবেকানন্দের প্রভাব। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় তাঁর সাফল্য জনচিত্তকে এই ধরনের সভার বিষয়ে আগ্রহে আকুল ক'রে রেখেছিল। ভারতীয় নবজাগরণে চিকাগো ধর্মমহাসভার নিমিত্ত-ভূমিকার পক্ষে এখানে আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল।

চিকাগো ধর্মমহাসভার পরে সারা পৃথিবীতে ধর্মমহাসভার ঢেউ উঠেছিল। ভারতবর্ষও বাদ পড়েনি। বারাণসীতে ধর্মমহাসভা আহ্বানের প্রস্তাব বেশ জোরালো রূপ ধরে। ধর্মমহাসভার বিজ্ঞান শাখার সভাপতি মারউইন মেরী স্নেলের ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রকাশিত [৩১ অগস্ট, ১৮৯৪] চিঠিতে প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছিল।১১ ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ তারিখে এঁর একটি চিঠি মিরারে বেরোয়, যাতে প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। কলকাতা টাউন হলে তখন স্বামীজীকে ধন্যবাদ দেবার জন্য সভার আয়োজন হচ্ছিল। ইনি বললেন, ঐ সভাকে, ১৮৯৭ সালের প্রস্তাবিত বারাণসী ধর্মমহাসভার প্রারম্ভিক সংগঠনী সভা ক'রে ফেলা যায়। যাতে হিন্দুরাই এই সভার আমন্ত্রণকর্তা হন, হিন্দুদের সকল সম্প্রদায় যাতে এই সংগঠনে যোগদান করেন, সে-বিষয়ে মনোযোগী হতে ইনি অনুরোধ করেন। তবে হিন্দু ছাড়াও ভারত ও বহির্ভারতের বৌদ্ধদের এর কার্যকরী সমিতিতে নিতে হবে, যেমন নিতে হবে ভারতের মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী, পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়কে। টাকার দায়দায়িত্ব ভারতবাসীরই নেওয়া উচিত; এ-বিষয়ে দেশীয় রাজা মহারাজা-সহ অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া যায়, কিন্তু, ইনি সতর্ক করে বলেন, পাশ্চাত্ত্যের সাহায্য নেওয়া বিপজ্জনক। "যদি এখানকার [আমেরিকার] লোকজনকে খরচের ভারী অংশ বহন করতে হয় [মারউইন মেরী স্নেল বলেন] তাহলে তারা...ধর্মমহাসভা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ নেবেই, এবং চিকাগো ধর্মমহাসভার ক্ষেত্রে যা করেছে সেইভাবে কার্যবিবরণীকে খ্রীস্টান মতানুগত করবার জন্য সংশোধিত, পরিবর্তিত বা সম্পাদিত করবে। অবশ্য তথাকথিত খ্রীস্টান সায়েনটিস্টগণ (আমাদের কর্তাভজারা), থিয়জফিস্টগণ, আর বিশেষ করে স্বামী

বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছে এমন মানুষেরা, নিঃস্বার্থ সাহায্য করবে বলেই মনে হয়।"১২

বারাণসী ধর্মমহাসভার ব্যাপারে অনাগারিক ধর্মপাল খুবই উৎসাহী ছিলেন। মারউইন মেরী স্নেল উল্লিখিত পত্রে তাঁর উদ্যোগের উল্লেখ করেছিলেন। এর পরে আমরা কলকাতার লাইট অব দি ইস্ট পত্রিকার ১৮৯৫ ডিসেম্বর সংখ্যায় অ্যাবে ভিক্টর চারবনেল-এর একটি রচনা থেকে বারাণসী ধর্মমহাসভার প্রস্তাব কিভাবে উঠল তার বিবরণ পাই। চিকাগো ধর্ম-মহাসভার সমাপ্তিকালে রেভারেণ্ড জের্নাকিন লয়েড জোনস আবেগভরে বলেছিলেন: "আমার মনোলোকে পরবর্তী ধর্মমহাসভার দৃশ্য ভেসে উঠছে—যা এই প্রথম ধর্মমহাসভার অপেক্ষা অধিকতর গৌরবময় এবং সম্ভাবনাময় হবে। আমি প্রস্তাব করি, সেই ধর্মমহাসভা বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরটিতে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হোক।"১৩

ধর্মপালের মহাবোধি সোসাইটি জার্নাল মার্চ ১৮৯৬ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে, বারাণসী কিজন্য ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ স্থান, তা ব্যাখ্যা করে বলেছিল। বারাণসী শিবভূমি, সেইসঙ্গে বুদ্ধের প্রথম প্রচারক্ষেত্র—এমন জায়গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভূমি কল্পনা করা যায় না, একথা ঐ লেখায় বলা হয়েছিল।১৪

বারাণসীতে পরিকল্পিত ধর্মমহাসভা ১৮৯৭ সালে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি, কিন্তু উদ্যোক্তা রেভারেণ্ড জের্নাকিনস্ লয়েড জোনস (চিকাগো 'অল সোলস্ চার্চ'-এর প্যাস্টর) এবং অনাগারিক ধর্মপাল সে চেষ্টা আরও কিছুদিন চালিয়ে গিয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে সংবাদ পাই মহাবোধি জার্নালের এপ্রিল ১৮৯৮ সংখ্যায়। এই লেখা থেকে বোঝা যায়, এই ব্যাপারটি মহাবোধি সোসাইটির পরিচালনাধীনে সম্পন্ন করতেই ধর্মপাল সচেষ্ট ছিলেন. এবং স্বয়ং বৌদ্ধ হিসাবে ধর্মমহাসভার আদর্শ প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আদর্শকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।১৫

ভারতবর্ষে বারাণসীতে ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা যত সংগত ও মহৎই হোক, তাকে সফল করার মতো সঙ্গতি অবশ্যই এদেশের ছিল না। পরাধীন দরিদ্র দেশ, সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার শিক্ষা যার নেই, স্বতঃই সে ঐ ধরনের বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করতে পারে না। তাছাড়া পরিকল্পনাটি ধর্মপালের মতো ব্যক্তির কুক্ষিগত থাকায় [ভারতবর্ষে যাঁর পায়ের

১২ Merwin Marie Snell to K. Chakravarti, *Mirror*, Sep. 1, 1894, *VIN*, 40.

১৩ Abbe Victor Charbonnel, *A Universal Congress of Religions in* 1900. [*Light of the East*, Dec. 1895].

১৪ *A Universal Congress of Religions in* 1900 [*Journal of the Mahabodhi Society*, March, 1896]

১৫ *The Beneres Parliament of Religions in* 1900 ; *A Suggestion*, [*Ibid*, April 1898]

একই সংখ্যায় মহাবোধি জার্নাল চিকাগোর "নিউ ইউনিটি" পত্রিকার ১৪ এপ্রিল ১৮৯৮ তারিখের সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করে। মন্তব্যটি সহানুভূতিসম্পন্ন একটি পত্রিকার। পত্রিকাটি বারাণসীতে ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা সমর্থন ক'রে, তাকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু পত্রিকাটির মন্তব্য থেকে বোঝা যায়. সেকালে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে কোন্ অবজ্ঞার মনোভাব ছিল। "নিঃসন্দেহে উক্ত প্রস্তাব অনেককে হাসিয়ে দেবে, যার প্রান্তে থাকবে অবিশ্বাস, বিরক্তি এবং আপত্তি।" এশিয়ার কোটি-কোটি মানুষ কোন্ দুর্বলতা ও হতাশায় নিমজ্জিত, অন্যান্য ধর্মের আলোকের সঙ্গে পরিচিত হলে সেই গহ্বর থেকে তার উদ্ধার কিভাবে সম্ভব—সে সম্বন্ধে কৃপাপূর্ণ মন্তব্য এই পত্রিকা করেছিল। তবে, ভারতবর্ষে বারাণসীতে এমন একটা অনুষ্ঠানের কল্পনা যে করা সম্ভব হচ্ছে, সেটাই চিকাগো ধর্মমহাসভার পক্ষে সর্ববৃহৎ এক প্রশস্তি—তাও পত্রিকাটি জানাতে ভোলেনি।

তলায় জমি নেই, এবং যিনি ইতিমধ্যেই বুদ্ধগয়া আন্দোলনের দ্বারা বৃহত্তর জনসমষ্টিকে বিরূপ করে তুলেছেন]—সফল হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। লক্ষ্য করার বিষয়, ভারতবর্ষে ধর্মমহাসভার সঙ্গে যাঁর নাম অচ্ছেদ্য-সম্পর্ক—সেই স্বামী বিবেকানন্দের সমর্থনের কথা প্রচারিত হয়নি। এইক্ষেত্রে অনেকেই সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়েছিলেন। এই-ভাবে দিল্লীতে মৌলবী নিশার আলীর নেতৃত্বে ধর্মমহাসভা সংগঠনের চেষ্টা করা হয়, এবং তা ব্যর্থ হয়।১৬

বারাণসীতে ধর্মমহাসভার কল্পনা—মধুর কল্পনার বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে ধর্মমহাসভার কল্পনা বাস্তবায়িত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তার মুখ্য কারণ—চিকাগোর সঙ্গে ঘটনাগত ঐক্য। ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় বিশ্বমেলা উপলক্ষে ধর্মমহাসভা হয়—১৯০০ সালে প্যারিসে হচ্ছে আর এক বিশ্বমেলা—তাহলে সেখানে কেন আর একটি ধর্মমহাসভা হবে না? চিকাগোর ধর্মমহাসভা অনেক ভাবুকের কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বোত্তম ঘটনা বলে প্রতিভাত—নূতন শতাব্দীর সূচনায় অনুরূপ বা অধিকতর উজ্জ্বল এক ধর্মমহাসভায় তা নবরূপ লাভ করুক—এমন কল্পনা ও পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল চিকাগো ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পর থেকেই।

প্যারিসে ধর্মমহাসভা কিন্তু হয়নি। সে দেশ ভারতবর্ষ নয়, সেখানে লোকবল, অর্থবল, বা কর্মক্ষমতার অভাব নেই—তবু হল না কেন?

সে কাহিনী চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। ভারতের সংবাদপত্র থেকে পূর্বাপর ইতিহাস যা পাই, তার সারসংক্ষেপ করছি।

"ইউনিটি অ্যান্ড দি মিনিস্টার" কাগজে ১৬ জুন, ১৮৯৫, প্যারিস ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা সম্বন্ধে ঐ আন্দোলনের কর্মাধ্যক্ষ, 'মনিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক, ডাঃ পল কেরুসের বিবৃতির অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে, এর মূল্য উদ্দেশ্য—'চার্চ ইউনিভার্সাল' স্থাপন করা—এমন লেখা হয়।

'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকায় ১৮৯৫, ডিসেম্বরে প্রকাশিত পূর্বোক্ত অ্যাবে ভিক্টর চার-বনেল-এর রচনা থেকে দেখা যায়—প্যারিসে ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব বিশেষ জোরদার হয়ে উঠেছিল। এই লেখক বারাণসী ধর্মমহাসভার প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে, তাকে প্যারিসের পক্ষে বাতিল ক'রে দেন। রেভারেন্ড জেনকিন লয়েড জোনসের পূর্বোক্ত প্রস্তাবের উত্তরে ইনি বলেন :

"ব্রাহ্মণগণের পবিত্র শহর বেনারস, যেখানে শিবের ত্রিশূল স্বর্ণমণ্ডিত, একজন পাদরীর চিন্তায় সে স্থান উদিত হতেই পারে, কেননা তিনি ধর্মমহাসভার বিদায়সভার জাঁকজমকে অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু ওর পিছনে ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু নেই।

"আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরে আমরা ফ্রান্সের দিকেই দৃষ্টি ফেরাই। আমেরিকাকে বাদ দিলে ফ্রান্স হল সেই অপর দেশ যেখানে বিবেকের মুক্তির সর্বোচ্চ গরিমাময় প্রকাশ দেখার

১৬ *"A Proposed Religious Conference.* The proposal for holding a grand religious Conference at Delhi in 1898, on the lines of the Chicago gathering, has received support in many influential quarters. Moulvi Nissar Ali, from whom the proposal has emanated, and who is devoting his whole energy to whipping up public interest in his splendid scheme, prints in his paper the *Nasrat* a list of the distinguished men, including Hon'ble Charles C. Bonney, President of the Chicago Congress, who have written to him expressing approval and offering help." *Journal of the Mahabodhi Society*. Feb. 1897.

প্রত্যাশা আমরা করতে পারি। বিদ্যায় অলংকৃত সভ্যতার ঐ কেন্দ্রভূমিতে, বিখ্যাত একাডেমী-গুলির কঠোরতম বিচারের সম্মুখীন হয়ে, ধর্মসংস্থাগুলি সার দিয়ে যেন দণ্ডায়মান থাকবে, সৃষ্টি করবে পবিত্র এক ধারার—এবং সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষবাদী ও জড়বাদী নৈতির বিরুদ্ধে অধ্যাত্মসত্যের অবিনাশী সত্যের বার্তা ঘোষণা করবে। শেষ কথা, খ্রীস্টধর্মের সর্ব-প্রাচীন ও সর্বাধিক গৌরবময় শাখার [অর্থাৎ ক্যাথলিক মতের] অবস্থানভূমি ঐ দেশে সর্বযুগের বিরাটতম ধর্ম-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়াই উচিত। আহা, কি অপূর্ব!—চিকাগোর ধর্মমহাসভার পরে প্যারিসে ধর্মের সর্বজনীন মহাসভা!”

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে ধর্মীয় উদারতার বহু কথা ছিল, কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটি উদ্দেশ্য উঁকি দিচ্ছিল—খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে প্যারিসের ধর্মমহা-সভায়। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন—খ্রীস্টানদের অন্তর্বিরোধের মীমাংসা। অজস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত খ্রীস্টানগণ যাতে একমত হতে পারেন, অনেকখানি জায়গা নিয়ে তার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। চিকাগো ধর্মমহাসভাকে ক্যাথলিকরা সরকারীভাবে সমর্থন জানান নি। সেই সমর্থন যাতে প্যারিস ধর্মমহাসভা লাভ করে, সেজন্য এই প্রবন্ধে ব্যাকুল আবেদন-নিবেদনের শেষ ছিল না। লেখক দেখাতে চেয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক-প্রধান কার্ডিনাল গিবনস্ চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলেন এবং প্রথম দিনের অধিবেশনে সবচেয়ে মর্যাদার “সিংহাসনে” উপবিষ্ট ছিলেন—তাতে ক্যাথলিক-মহলের একাংশে যদিও ঘোরতর আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু মহামান্য পোপ ব্যাপারটিকে নিন্দা করেন নি, বরং মৌন সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিছু কিছু ক্যাথলিক ব্যক্তিগতভাবে প্যারিস-ধর্মমহাসভার প্রস্তাবকে সমর্থন করলেও, এই লেখক সবশেষে এই নৈরাশ্যজনক সংবাদটি না জানিয়ে পারেননি, পোপ সরকারীভাবে প্যারিস-ধর্মমহাসভাকে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত নন। তবে, ইনি এই আশা বোধ করেছিলেন—আন্দোলন চালিয়ে গেলে হয়ত ক্যাথলিক-মহলের সমর্থন মিলতে পারে।

ভিক্টর চারবনেলের এই প্রবন্ধ পরিষ্কার দেখিয়ে দেয়—বাহ্য উদারতার পিছনে ধর্মমহা-সভার সমর্থকদের মনে কোন্ উদ্দেশ্য বলবৎ ছিল। সে উদ্দেশ্য—খ্রীস্টান সম্প্রদায়গুলিকে একত্র ক'রে, সমবেত শক্তিতে বিশ্ব অধিকার করা। সেজন্য ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের যুক্তফ্রন্ট সবিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ক্যাথলিকরা এই প্রস্তাবে সায় দিতে রাজি হননি। যে-সময়ে লাইট অব দি ইস্ট পত্রিকায় উপরের লেখাটি বেরিয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই বম্বে ক্যাথলিক এগজামিনার পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে ক্যাথলিকদের মনোভাব পরিষ্কার খুলে বলে। সে মন্তব্য এই :

“চিকাগো বিশ্বমেলায় অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে মহাপ্রদর্শনীতে অন্য একটি ধর্মমহাসভার আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু হোলি ফাদার [পোপ] তেমন সমাবেশে ক্যাথলিকদের অংশগ্রহণ বাতিল ক'রে দিয়েছেন। মঁসিয়ে সাটোলির কাছে লেখা এক চিঠিতে (যা কোনো-কোনো আমেরিকান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে) তিনি বলেছেন—ক্যাথলিকদের পক্ষে নিজেদের জন্য পৃথক সমাবেশের আয়োজন করাই বাঞ্ছনীয়। কয়েক বৎসর আগে চিকাগোর সমাবেশে ক্যাথলিকদের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি ছিল—ঐ সমাবেশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, খ্রীস্টতত্ত্ববিরোধী হীদেনদের ধর্মসমূহের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মকে একাসনে স্থাপন করেছিল। ...বর্তমান ক্ষেত্রে হোলি ফাদারের মনোভাব, এই ধরনের অন্যান্য সমাবেশ সম্পর্কে ক্যাথলিকরা কোন্ আচরণ করবে, তা একেবারে স্থির করে দিয়েছে।”১৭

ধর্মমহাসভার বিরুদ্ধে ক্যাথলিকদের অভিযোগের উত্তর প্রোটেস্টান্টরা যথাসম্ভব দেবার

চেষ্টা করেছিল। ১৮৯৬, ডিসেম্বর সংখ্যার "মিশনারী রিভিউ অব দি ওয়ার্ল্ড্" পত্রিকার "এ রিভাইজড্ পার্লামেণ্ট অব রিলিজন" নামক রচনায়, চিকাগো ধর্মমহাসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বলা হয়—ওখানে মিশনারিদের বিরুদ্ধে অখ্রীস্টানরা এমনভাবে আক্রমণ করেছিল যে, বিদেশে মিশনারি প্রেরণের ঔচিত্য সম্বন্ধে অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে পত্রিকাটি ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে আর একটি ধর্মমহাসভা আয়োজনের সংবাদে বিষাদবোধ না করে পারেনি। ভারতের প্রোটেস্টাণ্ট পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান ইভানজেলিক্যাল রিভিউ" জানুয়ারি ১৮৯৭ সংখ্যায় ক্যাথলিকদের উক্ত বক্তব্যের খণ্ডনে অগ্রসর হয়ে বলে—চিকাগো ধর্মমহাসভার খুব ভাল ফলই হয়েছে; হীদেনদের সমালোচনার উপযুক্ত উত্তর দিতে গিয়ে মিশনারিরা অনেক কথাই পরিষ্কার ক'রে তুলতে পেরেছেন; হীদেনী আক্রমণের অসারত্বকে তাঁরা খুলে দেখিয়েছেন, এবং এই ধর্মমহাসভাসূত্রে সংগঠিত বক্তৃতামালার বক্তারূপে ডাঃ পেণ্টিকস্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রাচ্যভূমে এসে অসাধারণ বক্তৃতাদি করতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে ইভানজেলিক্যাল রিভিউ পত্রিকা প্রধান অপরাধী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝাড়ার সুযোগ নিতে দেরী করেনি। বিবেকানন্দ-বেলুন কিভাবে ফেঁসে গেছে, তা সে সোৎসাহে বোঝাতে চেয়েছিল।১৮

প্যারিসের ধর্মমহাসভাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টাই করা হল, কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না। হিন্দু পত্রিকার ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ সংখ্যায় দেখছি : "গোড়ায় মনে হয়েছিল, পোপ এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করবেন; এমনকি কার্ডিনাল গিবনস্-এর সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে তাঁকে উৎসাহিতও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু যখন পুরো ব্যাপারটি তিনি জানতে পারলেন, দেখলেন যে, বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রস্তাবিত হয়েছে, তখন ভাটিক্যান খোলার মধ্যে গুটিয়ে গেল—সম্মেলনে অংশ নিতে অস্বীকার করল। আর, রোমক চার্চের সম্মতি যদি না থাকে তাহলে প্যারিসে ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত না হয়ে পারে না, প্রথমতঃ ক্যাথলিক ধর্মের গুরুত্বের জন্য, দ্বিতীয়তঃ যে-দেশে ঐ ধর্মসভা হবে সেটি ক্যাথলিক ধর্মের দেশ বলে।"

অবস্থাটা কিছুটা সুসহ করবার জন্য প্যারিসের আর্চ বিশপ কার্ডিনাল রিচার্ড রোমে গিয়ে পোপের সঙ্গে আলোচনাক্রমে খ্রীস্টানধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সেইসঙ্গে ক্যাথলিক মতের মহিমা প্রদর্শনের জন্য এক প্রদর্শনী আয়োজনের অনুমতি আদায়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাও হিন্দু-র উক্ত সংবাদে দেখতে পাই।১৯

ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯, সংবাদ দেয়—প্যারিসে ধর্মমহাসভা সংগঠনে উৎসাহী অ্যাবে চারবনেলকে ক্যাথলিকদের বিরোধিতার জন্য ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে

১৮ প্যারিসে প্রস্তাবিত ধর্মমহাসভা কোন্ শুভকার্য খ্রীস্টানদের পক্ষে ঘটাবে, সেই প্রসঙ্গে এই পত্রিকা লেখে :

"There would be a rejoicing of heart over a proposed second Parliament in which an opportunity would be taken advantage of to have these impressions [created by the heathens who were unmindful of accuracy in their statements] corrected... The so-called Swami Vivekananda has been since then found out that his statements discredited. His momentary success, standing upon the gullibility and ignorance of the public has come to an end. Even the fascination and romance of his robes and personal appearance have lost their charms, and he in his way book to his own country." [*Indian Evangenical Review*, January, 1897.]

১৯ *Hindu*, Feb. 20, 1899, "The Paris Exposition of 1900 : Scheme to Exhibit Religion."

সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়েছে। ১৮৯৯, জানুয়ারি মাসের 'ওপন্ কোর্ট' পত্রিকায় তিনি হতাশা প্রকাশ ক'রে লেখেন যে, আমেরিকার তুলনায় ইউরোপে ধর্মমহাসভা সম্ভবপর করা অনেক কঠিন, কার্যতঃ অসম্ভব। উদারনৈতিক কিছু ক্যাথলিকের আগ্রহ থাকলেও তাঁদের পিছু হটতে হয়েছে, যেহেতু তাঁরা বুঝেছেন, রোমক চার্চের দারুণ বিরোধিতার সম্মুখীন তাঁদের হতে হবে। এইসব তথ্য জানাবার পরে, সোস্যাল রিফর্মার প্রশ্ন করেছিল—বেনারসে ধর্ম-মহাসভার কি হল?২০

মরিয়া না মরে রাম অবস্থায় পেঁছিতে চাইলেন উৎসাহীরা। বিভিন্ন ধর্মকে সমস্তরে স্থাপন করতে দিতে যখন ধর্মক্ষেত্রে বিশেষ অধিকারভোগী ক্যাথলিকরা গররাজি, তখন ব্যাপারটাকে 'ধর্মসমূহের মহাসভা' থেকে সরিয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হল "ধার্মিক মনুষ্যগণের মহাসভায়।" লাইট অব দি ইস্ট পত্রিকার মার্চ ১৮৯৯ সংখ্যায় সংকলিত এক রচনায় (লেখকের নাম সেখানে ছিল না) এই প্রস্তাবিত সম্মেলনের নীতি ও আদর্শ, সেই সঙ্গে কার্যবিধি প্রকাশিত হয়েছিল। আদর্শ যথেষ্টই উদার ছিল, স্বামীজী চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় সর্বজনীন ধর্মের চরিত্র নির্ণয়ে যে কথা বলেছিলেন, তার প্রায় অনুরূপ কথা ওতে ছিল,২১ আর সেইজন্যই বোধহয় রক্ষণশীল রোমক চার্চের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। প্রবন্ধলেখক গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, ক্যাথলিক চার্চের আত্মস্বতন্ত্র সংকীর্ণতা এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে মহৎ উদার মানুষেরা নিরুপায়। বদ্ধদৃষ্টি জেসুইটরা কিভাবে রোমক চার্চকে করতলগত ক'রে রেখেছে, তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেবার পরে লেখক (ইনি সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত অ্যাবে ভিক্টর চারবনেল) বেদনার্তভাবে রোমক চার্চের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা জানিয়েছিলেন।

যাঁরা আদিতে প্যারিসে ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁরা গোড়াতে একটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন :

"এই ধর্মমহাসভা যেন পণ্ডিতগণের সম্মেলন হয়ে না দাঁড়ায়। পণ্ডিতেরা মৃত ধর্ম-সমূহের ইতিহাস, অতীতের ধর্মজীবনের কাহিনী, নানা ধারণা ও বিশ্বাসের বিবর্তন, কিংবা বর্বর দেশসমূহে কি ধরনের ধর্মবোধ প্রচলিত—তাদেরই ইতিহাস উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত থাকেন। এঁরা হয়ত বিদ্বজ্জনদের ও মনস্তাত্ত্বিকদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ, কিন্তু যাঁরা বর্তমান মানব সমাজের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তায় নিরত, তাঁদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারে কদাপি সমর্থ নন।"২২

ভাগ্যের পরিহাস—প্যারিসে ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তারা যে-জিনিসটিকে পরিহার করতে সচেষ্ট ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাই আবির্ভূত হল ১৯০০ সালে প্যারিস মহাপ্রদর্শনীতে।

২০ *Indian Social Reformer*, Feb. 26, 1899.

সোস্যাল রিফর্মারের এই মন্তব্য ঈষৎ বর্জিত আকারে বেরিয়েছিল মহাবোধি সোসাইটি পত্রিকার এপ্রিল ১৮৯৯ সংখ্যায়।

২১ "The Congress will declare that religion is, and ought to be, among men a principle of love and peace, and not a principle of hatred and war, a bond and not a cause of discord; that humanity may, and ought to, find the sentiment of its moral unity in a common aspiration which lifts all hearts toward God...and finally that there is a religious fraternity by which the idea of the brotherhood of man is completed and confirmed in the notion of the fatherhood of God." ["A Universal Religious Congress in 1900". *Light of the East*, March 1899.]

২২ *Light of the East*, Dec. 1895.

লাইট অব দি ইস্ট পত্রিকায় মে ১৯০০ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ থেকে আমরা দেখতে পাই : ডাঃ পল কেরুস প্রমুখ ব্যক্তিরা প্যারিসে ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের চেষ্টা ক'রে ক্যাথলিকদের বিরোধিতায় যখন ব্যর্থ হলেন, তখন অগত্যা ধর্ম-ইতিহাস-সভার অনুষ্ঠান করাই স্থিরীকৃত হল।২৩ উক্ত প্রবন্ধমধ্যে এই সংগঠনে কারা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হয়।

প্যারিসের এই ধর্মেতিহাস সভার চরিত্র সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শিক্ষিত মহলে কিন্তু সঠিক ধারণা গড়ে ওঠেনি, যদিও সে সম্বন্ধে কিছু-কিছু যথার্থ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে ক্যাথলিকদের বিরোধিতার কথা হয়ত কেউ-কেউ শুনেছিল কিন্তু যখন প্যারিসে ধর্মেতিহাস সভা অনুষ্ঠিত হবে শোনা গেল, তখন ঐ দুই ধরনের সভার পার্থক্য সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। এইসঙ্গে শোনা গেল, স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত সভায় যোগ দিচ্ছেন। ফলে সাধারণের কল্পনায় আগুন ধরে গেল, সকলেই স্বামীজীর আর একটি বিশ্বজয়-সংবাদের অপেক্ষায় অধীর হয়ে রইল। মরাঠার মতো বিখ্যাত পত্রিকাও এই প্রলোভনে ধরা দিয়ে ৯ জুলাই, ১৮৯৯, লিখেছিল :

"পরের বছর প্যারিসে মহাপ্রদর্শনী হবে—সেখানে যে-কোনো আকারেই হোক ধর্ম অন্যতম প্রদর্শনী-বস্তু হবে। বস্তুতঃপক্ষে আমরা শুনলে বিস্মিত হব না যে, চিকাগোর মতোই প্যারিসেও ধর্মমহাসভা হবে। স্বামীজীর কাছে এই ধরনের সুযোগ অবশ্যই স্বাগত। আমরা অবশ্যই স্বামীজীর সাফল্যের প্রত্যাশা করব, তিন বৎসর আগে যেমনটি ঘটেছিল।"২৪

জগদীশচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে যোগ দিতে প্যারিসে যাচ্ছেন, এই সংবাদ দেবার পরে, মরাঠা ৮ জুলাই, ১৯০০, লিখল :

"প্যারিসে মহাপ্রদর্শনীতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন আর এক বিখ্যাত ভারতীয়, স্বামী বিবেকানন্দ; তিনি আমেরিকা থেকে প্যারিসে যাচ্ছেন, আমরা তা জানতে পেরেছি। মহা-প্রদর্শনীতে ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে হিন্দুধর্মের পক্ষ সমর্থন করাই হবে স্বামীজীর উদ্দেশ্য। স্বামীজী এবং অধ্যাপক বসু এমন দুই ব্যক্তি যাঁরা নিশ্চিতভাবে যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।"২৫

প্রত্যাশার চরিত্র যখন এই, তখন প্যারিস থেকে চিকাগো ধর্মমহাসভার অনুরূপ বিবেকা-নন্দীয় সাফল্যের সংবাদ না আসাতে অনেকেই নৈরাশ্য বোধ করেছিলেন। মরাঠা তো ২১ অক্টোবর, ১৯০০, ছাপার অক্ষরে সেই হতাশা প্রকাশ করেই ফেলেছিল :

"আমরা একথা শুনব বলে আশা করছিলাম যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে অনুষ্ঠিত

২৩ "...In a country like France where the great majority of the people are, at least in name, professing Roman Catholics, a Parliament of Religions in which no authorised representatives of the Catholicism took part would be doomed to failure from the start... Seeing that a second Parliament of Religions was altogether out of the question at Paris in 1900, the scholers who were occupied more particularly with the scientific investigation of religion believed that it was incumbent upon them to assure to religious studies their rightful place in the great concert of Congresses of the Universal Exposition, by providing for the meeting of an International Congress of the History of Religions." [Professor Jean Reville, "International Congress of the History of Religions", *Light of the East,* May, 1900]

২৪ *Mahratta,* July 9, 1899, "Swami Vivekananda on Another Tour."

২৫ *Ibid,* July 8, 1900, "Two Notable Indians at the Paris Exhibition."

কংগ্রেস-সমূহের কোনো একটিতে খ্যাতিলাভ করবেন। কিন্তু আমরা হতাশ হয়েছি।"২৬

মরাঠায় এ-বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য বেরোয়নি। কিন্তু এই হতাশা যে যুক্তিযুক্ত বা তথ্যসহ ছিল না, তা মরাঠার মুখ্য পরিচালক বালগঙ্গাধর তিলকের পরবর্তী মন্তব্যে দেখা যায়। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে তিনি "কেশরী" পত্রিকায় লেখেন :

"১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে এক প্রদর্শনী হয়। ঐকালে স্বামীজী ফরাসি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং ওখানে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেজন্য সেখানকার সংবাদপত্রে বিশেষ প্রশংসিত হন।"

প্যারিস কংগ্রেস থেকে স্বামীজীর সাফল্য সম্বন্ধে অবিলম্বে উৎসাহজনক সংবাদ না আসায়, মনে হয়, স্বামীজীর বিরোধীপক্ষ নানা কটাক্ষ শুরু করে। প্রবুদ্ধ ভারতে নভেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য লেখা হয় :

"স্বামীজীর সর্বশেষ সংবাদ আমরা পেয়েছি ফ্রান্স থেকে। সেখানে মহাপ্রদর্শনী সূত্রে আয়োজিত ধর্মেতিহাস সভায় যোগ দেবার জন্য তিনি আহূত হয়েছিলেন। আমরা অবশ্য সংবাদ পেয়েছি যে, ঐ সভাকে ধর্মমহাসভা নামে আখ্যাত করা যাবে না, কারণ তা কয়েকজন পণ্ডিতের সভা, যাঁরা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ পড়েছেন। স্বামীজী সেখানে দুবার ভালভাবে বক্তৃতা করেছেন, যথাযথ হয়েছিল তাঁর বক্তব্য। সম্মেলনের শেষে আইফেল টাওয়ারে একটি নৈশ ভোজসভা আয়োজিত হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গেডেস এবং সুপরিচিত উদারনৈতিক পাদরী পিয়ের হায়াসিন্থ—এই দুইজন, স্বামীজীর দীর্ঘ বন্ধুতালিকায় নব সংযোজন।"২৭

স্বামীজীকে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ থেকে প্যারিস কংগ্রেসের সঠিক সংবাদ জানাবার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছিল। উদ্বোধন পত্রিকায় [২য় বর্ষ, ২০ সংখ্যা] "প্যারি প্রদর্শনী" নামক তথ্যবহুল এক চমৎকার প্রবন্ধে তিনি ভিতরের কথা খুলে লিখে পাঠান। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে যেসব সংবাদ উপস্থিত করেছি, তার থেকে বোঝা যায়, স্বামীজীর কথা একেবারে আক্ষরিক সত্য :

"এই মাসের [অগস্ট, ১৯০০] প্রথমাংশে কয়েক দিবস যাবৎ পারি প্রদর্শনীতে 'কংগ্রে দ লিস্তোয়ার দে রিলিজিঅঁ'—অর্থাৎ ধর্মেতিহাস-নামক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় অধ্যাত্ম-বিষয়ক এবং মতামতসম্বন্ধী কোনো চর্চার স্থান ছিল না, কেবলমাত্র বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস অর্থাৎ তদঙ্গসকলের তথ্যানুসন্ধানই উদ্দেশ্য ছিল। এ বিধায়, এ সভায় বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধির একান্ত অভাব। চিকাগো মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার ছিল। সুতরাং সে সভায় নানা দেশের ধর্মপ্রচারকমণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় জনকয়েক পণ্ডিত, যাঁহারা বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক চর্চা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন। ধর্মসভা না হইবার কারণ এই যে, চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন; ভরসা—প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার; তদ্বৎ সমগ্র খ্রীস্টান জগৎ—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্ব-মহিমা-কীর্তনের বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল অন্যরূপ হওয়ায় খ্রীস্টান সম্প্রদায় সর্বধর্মসমন্বয়ে একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছেন; ক্যাথলিকরা এখন ইহার প্রধান বিরোধী। ফ্রান্স ক্যাথলিকপ্রধান; অতএব যদিও কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট বাসনা ছিল, তথাপি সমগ্র ক্যাথলিক জগতের বিপক্ষতায় ধর্মসভা করা হইল না।

২৬ *Ibid*, October 21, 1900.

২৭ ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় স্বামীজী মহাপ্রদর্শনীতে দর্শন-বিভাগে দুবার বক্তৃতা করেছিলেন, এমন লেখা হয়েছিল।

"যে-প্রকার মধ্যে-মধ্যে 'কংগ্রেস অব ওরিয়েনটালিস্টস্' অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি আরব্যাদি ভাষাভিজ্ঞ বুধমণ্ডলীর মধ্যে-মধ্যে উপবেশন হইয়া থাকে, সেইরূপ উহার সহিত খ্রীস্টধর্মের প্রত্নতত্ত্ব যোগ দিয়া পারি-তে ধর্মেতিহাস সভা আহূত হয়।" [৬—৪৭]

॥ ৪ ॥ প্যারিস কংগ্রেসে বিবেকানন্দ

প্যারিস কংগ্রেসে [প্যারিস কংগ্রেস বলতে আমরা ধর্মেতিহাস সভাই অতঃপর বুঝব] স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রধান সংবাদ-উৎস কিছুদিন আগেও ছিল স্বামীজীর লেখা 'পারি প্রদর্শনী' নামক প্রবন্ধটি। এর সঙ্গে প্রবুদ্ধ ভারত বা ব্রহ্মবাদিনে প্রকাশিত দু'এক লাইন সংবাদ তাঁর জীবনীতে যুক্ত হয়েছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ এক্ষেত্রে বেশ কিছু মূল্যবান নূতন তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছেন। প্রয়োজনমতো আমরা সেগুলি ব্যবহার করব।

স্বামীজী, "পারি প্রদর্শনী" প্রবন্ধে বলেছেন, আমরা আগে দেখেছি, প্যারিস কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার ছিল না। বিদ্যাত্মানন্দ আরও জোর দিয়ে ব্যাপারটির গুরুত্ব-হীনতার কথা তুলে ধরেছেন। স্বামীজীর জীবনীকারেরা এই সম্মেলনে স্বামীজীর অংশ-গ্রহণের গৌরব ঘোষণা ক'রে কার্যতঃ স্বামীজীর গৌরব হ্রাস করেছেন, এমন পরোক্ষ অভিযোগ তিনি করেছেন। আগেই বলেছি, প্যারিস কংগ্রেস সম্বন্ধে সন্ধানকালে তিনি সমসাময়িক কাগজপত্রে এই কংগ্রেসের বিবরণ প্রায় পাননি, যদিও প্যারিসের মহাপ্রদর্শনীর বিবরণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছিল। এই অবহেলা সমকালীন একটি ফরাসি সাময়িক-পত্রের [১৯০০, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যার *Revue de l' Historie des Religions*] যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ হয়েছিল, তাও তিনি মন্তব্যের অংশ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন।

ধর্মেতিহাস সভার বিবরণী ১৯০১-০২ সালে চার খণ্ডে বেরিয়েছিল। সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণও বেরোয়। এই গ্রন্থগুলি থেকে বিদ্যাত্মানন্দ এই সম্মেলনের নীতি ও কর্মবিধি সম্পর্কে যে-সব তথ্য দিয়েছেন, তা ভারতীয় কাগজে সমকালেই [বিশেষতঃ লাইট অব দি ইস্ট পত্রিকায়] বেরিয়েছিল, তার উল্লেখ আমরা ক'রে এসেছি। বিদ্যাত্মানন্দ জানিয়েছেন, কার্যকরী সমিতি প্রধানতঃ প্যারিসের সরবোনের ফরাসি অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এ'দের মধ্যে পরবর্তীকালেও স্মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ইনি মিশরতাত্ত্বিক গাসটন মাসপারো এবং এমিল গুইমেটের [বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ এবং এক মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা] নাম করেছেন। বিদ্যাত্মানন্দ বলেছেন, স্থানীয় সংবাদমতো, গুইমেটের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ছিল, তিনি স্বামীজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, যদিও ওর সমর্থক কোনো প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। এখানে আমরা এইটুকু বলতে পারি, নিবেদিতার পত্র থেকে দেখা যায়, গুইমেটের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ছিল, এবং উভয়ের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনাও হয়েছে। বিদ্যাত্মানন্দ তাঁর প্রবন্ধে প্যারিস-কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা ম্যাক্সমূলারের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। ঐ পত্রে ম্যাক্সমূলার, ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জীবনব্যাপী গবেষণার কথা সঙ্গত গৌরবের সঙ্গে জানাবার পরে, ধর্মের মূল সত্য সম্বন্ধে সুগভীর কিছু কথা বলেছিলেন, যা পেশাদার গবেষকদের নীরস তথ্যের কচ্‌কচিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল এবং দেখা যায়, স্বামীজীর চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তার প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে। ম্যাক্সমূলার বলতে চেয়েছিলেন : মূলগত অর্থে যাকে ধর্ম বলা যায় তার জন্য কোনো পাদরী-পুরোহিত বা মন্দির-মসজিদের দরকার নেই। দরিদ্র সাইবেরিয়ার এক নারী যখন প্রত্যূষে তাঁবুর বাইরে এসে সূর্যপ্রণাম ক'রে বলে, 'হে সূর্য, যখন তুমি উদিত হও আমিও শয্যাত্যাগ করি, যখন তুমি অস্তাচলে শয়ন করো আমিও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি;' কিংবা যখন আফ্রিকার পশ্চিম

উপকূলে বৃদ্ধ নিগ্রো ফেটিশ-উপাসনায় নিরত থাকে; কিংবা টোটেম-অঙ্কিত, পূর্বপুরুষগণের নাম-লিখিত দণ্ডের সামনে কোনো রেড ইণ্ডিয়ান প্রার্থনা করে;—সে সকলেরই মধ্যে ধর্ম রয়েছে। যিনি অন্তর্যামী, যিনি কথিত অকথিত সকল কথারই মর্মজ্ঞ—তিনি এইসকল আকৃতির অর্থও কি, অবশ্যই জানেন।

প্যারিস কংগ্রেস ঠিক কবে, কোথায়, হয়েছিল, স্বামীজী সেখানে কোন্ ভূমিকা নিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে প্রাপ্ত সংবাদ দেবার আগে একবার ভেবে নেওয়া যেতে পারে—স্বামীজী কোন্ উদ্দেশ্যে প্যারিস কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন? এ সম্বন্ধে কিছু তথ্যভিত্তিক অনুমান আমরা করতে পারি।

চিকাগো ধর্মমহাসভা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্যারিসে পরবর্তী ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা যখন প্রচারিত হল, তখন স্বামীজী অবশ্যই তার বিষয়ে মানসিকভাবে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটি দূরবর্তী, নিকট বর্তমানে বিদেশে ও স্বদেশে প্রচার ও সংগঠনের গুরুদায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে—সেহেতু দ্বিতীয় ধর্মমহাসভার আকাশকুসুম শুঁকবার জন্য ব্যস্ত হতে পারেন নি।

কিন্তু স্বামীজী নিশ্চয় একই সময়ে বুঝেছিলেন, সে বোধ ইংলণ্ড ও ইউরোপের অংশবিশেষে অবস্থান ও ভ্রমণের দ্বারা দৃঢ়তর হয়—কেবল ইংলণ্ড ও আমেরিকা পাশ্চাত্ত্যদেশ নয়। ঐ দুই দেশ অপেক্ষা সংস্কৃতির দিক দিয়ে অনেক ঐশ্বর্যশালী ভূমি হল মহাদেশীয় ইউরোপ, যার কেন্দ্রমণি ফ্রান্স। এই ইউরোপে ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ রূপের উন্মোচন অতীব শ্লাঘ্য কর্তব্য। এবং ধর্মমহাসভার মঞ্চ ব্যবহার ক'রে ফ্রান্সের বিদগ্ধ জনমনে প্রবেশ করা সম্ভব।

সত্যই কি সম্ভব? স্বামীজী নিশ্চয় প্রশ্ন করেছিলেন। প্যারিসে ধর্মমহাসভা-মঞ্চে দাঁড়ানো যায়—কিন্তু তার দ্বারা জয়লাভ করা কি দুঃসাধ্য নয়? সাফল্যের পথে প্রথম বাধা ভাষা-ব্যবধান। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তি অবশ্যস্বীকার্য কিন্তু প্যারিসের সভাস্থলে অপরের মনে ও হৃদয়ে প্রবেশের প্রধান উপায় যে ভাষা—সেই ফরাসি ভাষা তাঁর যথেষ্ট আয়ত্তে নেই। স্বামীজীর ইংরেজি ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য কিভাবে ইংরেজিভাষী অঞ্চলে স্বীকৃত হয়েছিল, তা আমরা যথেষ্ট দেখেছি। সেই স্বীকৃতি তিনি ফ্রান্সে পাবেন না। আর সাধারণের মধ্যে যদি বক্তব্যকে সরাসরি উপস্থিত করতে না পারেন তাহলে তাঁর সাফল্য সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য।

কিন্তু স্বামীজী একই সঙ্গে ইউরোপের চিত্তলোকে অনুপ্রবেশের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাই ফরাসি ভাষা শিক্ষায় যত্নবান হয়ে ওঠেন। ভেবেছিলেন, যদি কাজ-চলা গোছের ফরাসি শিখে নিতে পারেন, তাহলে অন্ততঃ বিদগ্ধ মহলের সঙ্গে ভাববিনিময় ক'রে নিতে পারবেন। সময় ও সুযোগ মিললে ঘরোয়া সভায় বক্তৃতা কিংবা তারও বেশি অগ্রসর হতে পারবেন।

সে যাই হোক, ব্যক্তিগত সাফল্য আসুক বা না-আসুক, অসাফল্য-সম্ভাবনার ঝুঁকি নিয়েও, স্বামীজী প্যারিসে প্রস্তাবিত ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এবং যখন 'ধর্মমহাসভা' না হয়ে 'ধর্মেতিহাস সভা' হল, তখনও, অসুস্থতা সত্ত্বেও, তাতে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৯৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন ক'রে, ভারতীয় আন্দোলনের ভিত্তিস্থাপন করার পরে, স্বামীজী পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন—তখন মানবসমাজের জন্য মহান বার্তার স্পন্দনে কম্পান্বিত তিনি—তারই অভিব্যক্তি ১৮৯৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁর মহামানবতার বাণীবর্ষণ এবং আন্তর্জাতিক কার্যের বাসনা—যার দিগন্ত প্রসারিত করতে চাইলেন ইউরোপে—ফ্রান্স হবে তার মঞ্চ। স্বামীজী একটি পত্রে তাঁর আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার

কথা পরিষ্কার বলেছেন। মিসেস ওলি বুলকে ২২ অক্টোবর, ১৯০০, তারিখের পত্রে [এটি বিদ্যাত্মানন্দ তাঁর প্রবন্ধে প্রথম ব্যবহার করেছেন] স্বামীজী কিছু দরকারী খবর দেবার পরে [যথা বৈজ্ঞানিক হিরাম ম্যাক্সিম তাঁর বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী, চীন সম্বন্ধীয় তাঁর গ্রন্থে তিনি স্বামীজীর কথা লিখতে চান; বিখ্যাত ক্যানন হাউইসও ইংলণ্ডে তাঁর কাজের বিষয়ে উৎসাহী] বলেন :

"কে জানে, হয়ত মা এবার আমার আদি পরিকল্পনা—আন্তর্জাতিক কাজের পরিকল্পনা—কার্যকর করে তুলবেন।...বোধ হচ্ছে যেন, আমার দেহ-মনের নিম্নতরঙ্গের পরে ঊর্ধ্ব-তরঙ্গ ঘটবে—বৃহত্তর কর্ম, অধিকতর আন্তর্জাতিক কর্মের পথ খুলে যাবে। মা-ই জানেন।"২৮

সিস্টার ক্রিস্টিনকে মাত্র দুদিন পরে লেখা এক চিঠিতে স্বামীজী বলেছিলেন, নিকট-প্রাচ্য ভ্রমণ সেরে তিনি আবার ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করবেন, এবং কাজ চালিয়ে যাবেন। তাঁর কাজের ভাষা হবে ইংরাজি, কারণ, অন্য এক চিঠিতে (১৪ অক্টোবর) তিনি বলেন যে, "নতুন ভাষা পুরো আয়ত্ত করবার মতো সময় বা শক্তি আমার নেই।"২৯

ইউরোপে আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্র বিস্তারের জন্য স্বামীজীর মানসিক তাগিদ বোঝা যায়—ফরাসি ভাষা শিক্ষায় তাঁর আগ্রহ থেকে। পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ মানুষের ভাষা ফরাসি, এ-সম্বন্ধে পরিব্রাজক জীবন থেকেই তিনি সচেতন। ঐ পর্যায়ে পোরবন্দরে অবস্থানকালে, সেখানকার দেওয়ান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানে পণ্ডিত, শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ তাঁকে কেবল পাশ্চাত্ত্যে গমনের জন্য প্রণোদিত করেননি, ফরাসি ভাষা শিক্ষা করা সেজন্য বিশেষ প্রয়োজন, তাও বুঝিয়েছিলেন। শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ ইউরোপ-ঘোরা মানুষ, ফরাসি ও জার্মান ভালই জানতেন। স্বামীজীকে তিনি বলেন, "যদি ইউরোপে কেউ বিদগ্ধ মানুষদের সঙ্গে মিশতে চায়, তাহলে তাকে ফরাসি জানতেই হবে।" ইনি স্বামীজীকে ফরাসি শেখায় সাহায্য করেন, এবং স্বামীজী বরাহনগর-মঠে ফরাসিতে একটি চিঠি পর্যন্ত লিখে পাঠান (অবশ্যই কৌতুকচ্ছলে)।৩০

পোরবন্দরের ঘটনা ১৮৯১ সালের। ১৮৯২, অক্টোবর মাসে স্বামীজী বেলগাঁওয়ে হরিপদ মিত্রের বাড়িতে ছিলেন—তখন তিনি "ফ্রান্সদেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন।" ইতিমধ্যেই স্বামীজী কিছুটা ফরাসিচর্চা আরম্ভ করেছিলেন, সঙ্গীতে তাঁর আসক্তি ও ব্যুৎপত্তি ছিল, তাই ধরে নিতে পারি উক্ত ফরাসি সঙ্গীতের বইটি ফরাসি ভাষাতেই লিখিত ছিল। কিছুদিনের মধ্যে স্বামীজীর ফরাসি-জ্ঞানের স্পষ্ট উল্লেখ আমরা পাই থিয়জ-ফিস্ট পত্রিকার মার্চ ১৮৯৩ সংখ্যায়। সেখানে লেখা হয় : "সন্ন্যাসীর অর্জিত বহুবিধ গুণের কয়েকটি—পালি, সংস্কৃত, ইংরাজি, ফরাসি এবং হিব্রু ভাষায় পুরো জ্ঞান"—আগেই স তথ্য জানিয়েছি। [১ম, ২য় সং, ১০০]। মহেন্দ্রনাথ দত্ত "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে [২য় খণ্ড, ১৫৮-৫৯] বলেছেন, স্বামীজী ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে অবস্থানকালে মিস মুলারের কাছ থেকে ফরাসি ভাষা শিখতে চেয়েছিলেন। মিস মুলার ফরাসি ও জার্মান ভাষা জানতেন। স্বামীজীর ফরাসি ভাষাশিক্ষার কারণ হিসাবে মহেন্দ্রনাথ বলেছেন : "ইউরোপের বিভিন্ন অংশে গমনাগমন করিতে হইলে এবং কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে, ফরাসি ভাষা-জ্ঞান অতি আবশ্যকীয়। বহুদেশের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বর্গের সহিত স্বামীজীকে কথাবার্তা বলিতে হইত। এইজন্য ঐ ফরাসি ভাষা জানা তাঁহার বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, এবং আশ্চর্যের বিষয় তিনি উহা উত্তমরূপে শিক্ষা ও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন।"

স্বামীজীর এই 'উত্তম' ফরাসি—ফরাসি ভাষা না-জানা মানুষের কাছে উত্তম ঠেকলেও ফরাসিদের কাছে যে তা মনে হবেনা—যে-বিষয়ে স্বামীজী অবহিত ছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যগমনের সূচনা থেকেই তিনি ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, তাঁর ও অন্যান্যদের চিঠিপত্র থেকে তা দেখা যায়। স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ স্বামীজীর ফরাসি-জ্ঞানের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গোড়ায় তাঁর মনে হয়েছিল, স্বামীজীর ফরাসি-জ্ঞান উত্তম শিক্ষানবিশী মানের; পরে কিন্তু তিনি স্বামীজীর ফরাসি বুঝবার ও সম্ভবতঃ বলবার উপযুক্ত ক্ষমতার কথা স্বীকার করেছেন।৩১

৩১ বিদ্যাত্মানন্দ প্রবুদ্ধ ভারতের ১৯৬৭ মার্চ এবং ১৯৭৭ এপ্রিল—এই দুই সংখ্যায় স্বামীজীর ফরাসি নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। তিনি যেসব তথ্য দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমরা একটি দুটি যোগ করতে পারি।

১৮৯৯ সালে আমেরিকা যাওয়া অবধি স্বামীজী ফরাসি চর্চায় একটু বেশি মন দেন। রিজলি ম্যানরে থাকাকালে ফরাসি অধ্যাপক মার্চণ্ডের কাছে স্বামীজী অবশ্যই ফরাসি ঝালিয়ে নিয়েছেন, কারণ উক্ত অধ্যাপককে লেগেটরা বিশেষভাবে এনেছিলেন পরবৎসরে প্যারিসে মহাপ্রদর্শনীতে যাতায়াতকালে যাতে ভাষাগত অসুবিধা না হয়। ['সেকেণ্ড ভিজিট,' ১০০]। একই জায়গা থেকে স্বামীজী মেরী হেলকে লিখেছেন [সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯] : "আমি ফরাসি শেখার চেষ্টায় আছি। এ বছর তা যদি করতে না পারি তাহলে পরের বছর প্যারিস মহাপ্রদর্শনী ঠিকভাবে সাবড়াতে পারব না। আর এখানে রীতিমতো ফরাসি শিখে ফেলব যেহেতু এমনকি ভৃত্যরাও ফরাসি বলে।" একই স্থান থেকে সিস্টার ক্রিস্টিনকে লেখা চিঠিতে [৪ নভেম্বর, ১৮৯৯; চিঠিটি বিদ্যাত্মানন্দ কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত] একই প্রসঙ্গ : "মনে রেখো আমাকে জার্মান শিখতেই হবে। [ক্রিস্টিন ছিলেন জার্মান-বংশোদ্ভূত]: আমি ফরাসি ও জার্মান ভাষায় পণ্ডিত হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফরাসি, মনে হয়, অভিধানের সাহায্যে সামলাতে পারব। যদি মাসখানেকের মধ্যে জার্মান ভাষায় সেটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পারি তাহলে অত্যন্ত খুশি হব।" সানফ্রান্সিসকো থেকে মেরী হেলকে লেখেন [২৮ মার্চ, ১৯০০]; "একটা ফরাসি অভিধান কণ্ঠস্থ করার চেষ্টায় আছি!" একই জায়গা থেকে নিবেদিতাকে [৬ এপ্রিল, ১৯০০ :] "তুমি প্যারিস যাচ্ছ জেনে খুশি। আমিও প্যারিস যাচ্ছি নিশ্চয়। কেবল ঠিক জানিনা কখন যাব। মিসেস লেগেটের ধারণা, অবিলম্বে গিয়ে ফরাসি ভাষাশিক্ষা আরম্ভ করে দেওয়া উচিত।.. তোমার বইগুলো শেষ করে ফেল। প্যারিসে আমরা ফরাসিদের জয় করেই ফেলব!"

সম্ভবতঃ ১৮৯৯ সালে লেখা মাদাম কালভের একটি চিঠিতে [কালভের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম পরিচয় কবে—১৮৯৫, না ১৮৯৯? লুই বার্ক বলেন, ১৮৯৫; স্বামী বলরামানন্দ বলেন, ১৮৯৯: আমরা শেষোক্ত ধারণাই ঠিক বলে মনে করি] কিন্তু দেখি, স্বামীজী যদিও নিজেকে ফরাসি ভাষায় সদ্য শিক্ষানবিশী বলেছেন, কিন্তু মিসেস মিলওয়ার্ড অ্যাডমসের মতো নাট্যশিল্প, দার্শনিক বিষয়, শরীরচর্চা ইত্যাদির বিখ্যাত আমেরিকান বক্তা ও সংস্কৃতিনেত্রীর কাছে বিবেকানন্দ ফরাসি ভাষাভিজ্ঞ বলেই প্রতীয়মান হয়েছিলেন। মিলওয়ার্ড অ্যাডমস ফরাসি জানতেন। কালভের কাগজপত্রের মধ্য থেকে বিদ্যাত্মানন্দ কর্তৃক আবিষ্কৃত উক্ত পত্র এই : [প্রবুদ্ধ ভারত, এপ্রিল ১৯৭৭]:

"মাদ্‌মোয়াজেল মিলওয়ার্ডস, বন্ধু আমার, খুবই প্রিয়। খুব বুদ্ধিমতী, সুন্দর বৃহৎ ভাবরাজিতে পূর্ণ, ভালই ফরাসি বলেন, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করেছেন—স্বয়ং বৌদ্ধ। তিনি প্রায়ই আমার কাছে তাঁর আচার্য সউয়ামী-র [স্বামী] কথা বলে থাকেন। হিন্দুদের কাছে সউয়ামী শব্দের অর্থ আচার্য। সউয়ামী বিবি কানন্দ, আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রবিষ্ট পুরুষ ['বিবেকানন্দ' শব্দের ব্যাখ্যার চেষ্টা];—বৈদিক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। এই সম্প্রদায় ব্রহ্মের বিশুদ্ধ নীতিধর্মকে রক্ষা করার গর্ব করে থাকেন। ইনি যীশুখ্রীস্টের মতো জীবনযাপন করেন—কখনো এর বাড়িতে কখনো ওর বাড়িতে থাকেন—সর্বত্রই প্রাণের বাণী বহন ক'রে নিয়ে যান—ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। বিশিষ্ট ডাক্তার, আইনজীবী, রসায়নবিদ্, ভাষাতাত্ত্বিকের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা। তিনি সবই জানেন, সবই বোঝেন। তিনি ফরাসি ভাষা অনর্গল বলতে ও লিখতে পারেন—বছরখানেক আগেও কিন্তু এ-ভাষা প্রায় জানতেন না। বর্তমানে তিনি আমার বন্ধু মিসেস লেগেটের নিউইয়র্কের বাড়িতে আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে বিশেষ উৎসুক।"

ভাষা-প্রসঙ্গ ছাড়াও চিঠিটির স্বতন্ত্র মূল্য আছে। সে যাই হোক, এইকালে নিবেদিতার সঙ্গে কালভের পরিচয় ঘটে, স্বামীজীর সঙ্গেও কালভের পরিচয় ঘটে গিয়েছিল। কালভে স্বামীজীর

মহাপ্রদর্শনী-সূত্রে ফ্রান্সে স্বামীজীর যাওয়ার ব্যবস্থা করতে তাঁর পাশ্চাত্ত্য অনুরাগীরা উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এক্ষেত্রে মিস ম্যাকলাউডের প্রয়াস বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিনি চেয়েছিলেন, ১৮৯৯ সালের সফরে স্বামীজী যেন প্রথমে আমেরিকায় গিয়ে তাঁদের রিজলি ভবনে কিছু সময় কাটান। মিস ম্যাকলাউড ও লেগেটগণ স্বামীজীর জ্যোতির্ময় উপস্থিতির গৌরবে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন তাঁদের প্রিয় বিশ্রামভবনটিকে; তারপর সেখান থেকে স্বামীজী যাবেন প্যারিস মহাপ্রদর্শনীতে। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ৮ মার্চ, ১৮৯৯ তারিখের চিঠি থেকে দেখা যায়, স্বামীজী যখন ভারতে আছেন তখনই প্যারিস মহাপ্রদর্শনী সম্বন্ধে মিস ম্যাকলাউডের অভিপ্রায় তাঁর গোচর হয়েছে। "স্বামীজী আপনি ভাববেন না, [নিবেদিতা তাঁকে বলেন], পরের বছর য়ুম-এর [মিস ম্যাকলাউডের] প্যারিস-সংক্রান্ত পরিকল্পনা সত্যই কার্যকরী হবে। সেক্ষেত্রে আমার কাজকে বড় ভিত্তিতে স্থাপন করার বড় সুযোগ ঘটে যাবে মনে হয়।" [সেকেন্ড ভিজিট, ১০]।

প্যারিসে ধর্মমহাসভা না হয়ে যখন ধর্মেতিহাস সভা হল, যা কতিপয় বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকের সমাবেশ ছাড়া কিছু নয়, তখন প্রচলিত অর্থে ঐতিহাসিক না হলেও স্বামীজীকে শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের জন্য উক্ত সভায় আমন্ত্রণ করা হয়েছিল—সে আমন্ত্রণ সংগ্রহে তৎপর হয়েছিলেন প্যারিসের এক বিশিষ্ট নাগরিক জিরাল্ড নোবল। স্বামীজী ২ মার্চ, ১৯০০, মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন :

"ফরাসি আমন্ত্রণ উত্তম। কিন্তু পছন্দসই বিষয়ে ভালো প্রবন্ধ লেখা অসম্ভব। কারণ এখানে আমাকে বক্তৃতা করে টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে—অন্য কিছু করার জন্য কম সময়ই মিলবে। পুনশ্চ, এখানে কোনো [সংস্কৃত] বই পাচ্ছি না। যদি পারি কিছু টাকা এখানে জোগাড় করার চেষ্টা করা যাক, তারপর ফ্রান্সে হাজির; যদিও কোনো প্রবন্ধ পাঠানো নয়।

ফরাসি ভাষাজ্ঞানের পরিমাণ জেনে, আরও ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন বুঝে, নিবেদিতাকে বলেছিলেন [নিবেদিতার ১০ নভেম্বর, ১৮৯৯, মিসেস বুলকে লেখা পত্র থেকে পাই]: "স্বামীজীকে অবশ্যই ফরাসি শিখতে হবে—ফ্রান্স ক্ষুধার্ত হয়ে অপেক্ষা করছে তাঁর দানকে পেতে।"

ফ্রান্সে পৌঁছবার পরে স্বামীজী যে, ফরাসি ভাষা শিক্ষায় অতীব উদ্‌গ্রীব ছিলেন তা তাঁর চিঠি ও লেখা থেকে দেখা যায়। সেখান থেকে ক্রিস্টিনকে লিখেছেন [২৮ অগস্ট ১৯০০]: "আমি ফরাসি শিখতে চেষ্টা করছি—এখানে ফরাসিতে কথাও বলছি। ইতিমধ্যেই অনেকে খুবই সমাদর করতে আরম্ভ করছেন।" তুরীয়ানন্দকে [১ সেপ্টেম্বর]: "এখন কিছু সময় গা-ঢাকা দিয়ে আছি। [স্বামীজী জুল বোওয়ার সঙ্গে বাস করছিলেন]। ফরাসিদের সঙ্গে বাস করে তাদের ভাষা আয়ত্ত করে নেব।...ফরাসি ভাষাটা যাহোক কিছু শিখেছি; এখন যদি মাসখানেক কি মাস-দুই ফরাসিদের সঙ্গে থাকি তাহলে ভালভাবে ফরাসিতে কথাবার্তা বলতে পারব।" পরিব্রাজক-এ স্বামীজী প্রসঙ্গটি আরও বিস্তারিত বলেছেন। স্থির হয়ে বসে কিছুদিন ফরাসি শিক্ষার বাসনা তাঁর ছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে হল; সকৌতুকে সে প্রসঙ্গে লিখেছেন : "এত মনে করলুম যে, পারি-তে বসে কিছুদিন ফরাসি ভাষা ও সভ্যতা আলোচনা করা যাবে; পুরনো বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ ক'রে, এক গরিব ফরাসি নবীন বন্ধুর [জুল বোওয়া] বাসায় গিয়ে বাস করলুম—(তিনি না জানেন ইংরেজি; আমার ফরাসি—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার!)—বাসনা যে, বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায় ফরাসি বলবার উদ্যোগ হবে, আর গড়গড়িয়ে ফরাসি এসে পড়বে। [তা নয়] কোথায় চললুম ভিয়েনা, তুর্কি, গ্রীস, ইজিপ্ত, জেরুজালেম পর্যটন করতে!" [৬—১১৮]। এই ভ্রমণ অবশ্য ভাষাশিক্ষার দিক দিয়ে একেবারে বৃথা যায়নি, তাও লিখেছিলেন : "এদের সঙ্গে [মিস ম্যাকলাউড, পিয়ের হায়াসিন্থ ও পত্নী, জুল বোওয়া, মাদাম কালভে] [ভ্রমণে] আমার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ এক আমেরিক ছাড়া এরা কেউ ইংরেজি জানে না; ইংরেজি ভাষায় কথা একদম বন্ধ; কাজেই কোনোরকম করে আমায় কইতে হচ্চে ফরাসি এবং শুনতে হচ্চে ফরাসি।" [৬—১২৩]।

এমন তাড়াহুড়ার মধ্যে আধ-খেঁচাভাবে পাণ্ডিত্যের কাজ করা যায় না। ওর জন্য সময় নিয়ে পড়াশোনার প্রয়োজন।

"মিঃ [জিরাল্ড] নোবলকে কি ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখব? যদি সম্ভব হয়, এসব ব্যাপারে, [ইউরোপে] যাবার আগে সব জানিয়ে চিঠি লিখবে।"

১৯০০ সালে স্বামীজী ফ্রান্সে মোটামুটি তিনমাস ছিলেন। তার একটা বড় অংশ কাটান লেগেটদের প্যারিসের বাসভবনে। ফ্রান্সের অন্যত্রও ঘুরে আসেন। আগেই জেনেছি, তিনি ১৯০০ অগস্টের একেবারে গোড়ায় ফ্রান্সে পৌঁছেছিলেন। প্রখ্যাত গায়িকা এমা থার্সবির একটি চিঠি থেকে জানা যায়, [চিঠিটি বিদ্যাত্মানন্দের আবিষ্কার], স্বামীজী প্যারিস এক্সপোজিশনে বক্তৃতা করেছিলেন। সঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে—সে বক্তৃতা করেন "ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভানসমেণ্ট অব সায়েন্স, আর্টস অ্যান্ড এডুকেশন' কর্তৃক আয়োজিত সভায়—যার সংগঠনকর্তা ছিলেন স্বামীজীর অনুরাগী প্যাট্রিক গেডেস্।

বিদ্যাত্মানন্দ-প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ধর্মেতিহাস সভার উদ্বোধন হয় সোমবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০০। এটি ছিল প্রভাতী অধিবেশন—অনুষ্ঠিত হয় প্রদর্শনী-স্থলের মধ্যে নির্মিত একটি ভবনে [Palais des Congres] উদ্বোধনী সভায় শুভেচ্ছাপত্র পাঠ, [যার মধ্যে ছিল ম্যাক্সমূলারের পূর্ব-কথিত মূল্যবান পত্রটি], সাংগঠনিক তথ্য পেশ, এবং সভাপতির [Albert Reville] ভাষণ। স্বামীজী এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন কিনা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। খুব সম্ভব যোগ দেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন উইলিয়ম জেমস, প্যাট্রিক গেডেস, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, সিস্টার নিবেদিতা প্রভৃতি। ধর্মেতিহাস সভার বাকি সাধারণ সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয় অন্যত্র—প্যারিসের প্রধান বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান সরবোনের অন্তর্গত একটি সভাকক্ষে (Amphitheatre Michelet) যেখানে শ' দুই লোক ধরতে পারে। সেপ্টেম্বর মাসের ৩ (বিকালে), ৪ (ঐ), ৬ (ঐ), ৮ (সকালে) তারিখে ঐ সভাগুলি হয়েছিল। ঐসব সভাতেও স্বামীজীর যোগদানের বিষয়ে কিছু জানা যায় নি। এই সরবোনের শাখা-সভার অধিবেশনগুলি হয়, ক্ষুদ্র ক্লাস-রুমে—যেমন হয়েছিল "দূর প্রাচ্যের ধর্ম-ইতিহাস' এবং "ভারত ও ইরানের ধর্ম-ইতিহাস"—এই দুই শাখার মিলিত সভা। শেষোক্ত মিলিত সভাগুলি হয় সেপ্টেম্বরের ৩ (বিকালে), ৫ (সকালে), ৭ (সকালে) তারিখে। ৭ সেপ্টেম্বরের শেষ সভাতেই স্বামীজীর উপস্থিতির সংবাদ আছে ধর্মেতিহাস-সভার বিবরণী-গ্রন্থে। ভারত-ইরান ধর্মেতিহাসের যুগ্ম-সভাপতি ছিলেন এ এম ই সেনার্ট, সহ-সভাপতি সিলভাঁ লেভি, সম্পাদক এম এ ফুসে। ৭ তারিখের সভাটি সকাল সাড়ে ৯টায় আরম্ভ হয়ে দু'ঘণ্টা চলে; ৬জন বক্তা বলেন ও তাঁদের বক্তব্যের ফাঁকে আলোচনাও হয়। সুতরাং স্বামীজী এই সভায় দীর্ঘ বক্তৃতা করেন নি ধরে নিতে হবে। স্বামীজীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপ বিবরণীতে বেরিয়েছিল, তবে যেহেতু তিনি মৌখিক বক্তৃতা করেন, তাই তাঁর বক্তব্য ঠিকভাবে বেরিয়েছে কিনা সন্দেহজনক। অন্ততঃ বিদ্যাত্মানন্দ সে সন্দেহ করেছেন। অপরপক্ষে স্বামীজী যাঁদের মত খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা লিখিত প্রবন্ধ দেওয়ায় সেগুলি বিবরণীতে হুবহু প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামীজী হয়ত আশঙ্কা করেছিলেন, তাঁর বক্তব্য ঠিকভাবে প্রকাশিত হবে না, তাই বোধহয় এদেশের জন্য তার সারাংশ লিখে পাঠিয়েছিলেন।

বিদ্যাত্মানন্দ ৭ সেপ্টেম্বর তারিখের সভা-সংবাদ ফরাসি "বিবরণী" থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে হাজির করেছেন। ঐ বিবরণী অসম্পূর্ণ এবং কিছুটা অস্পষ্ট। তার পুনশ্চ বঙ্গানুবাদ এই :

৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবারের অধিবেশন সকাল ৯-১৫ মিনিটে আরম্ভ হয়; সভাপতিত্ব করেন এই দুই শাখার সভাপতি মঁসিয়ে সেনার্ট।

১। মঁসিয়ে জি ওপার্ট শালগ্রাম পূজা সংক্রান্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। শালগ্রাম এক জাতীয় জীবাশ্ম, গণ্ডকীতে [নদী] পাওয়া যায়, লেখকের মতে যা ভারতের আদিবাসীদের কাছে নারীর প্রজননশক্তির [Female energy] প্রতীক—পরে বিষ্ণুর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মঁসিয়ে দ্য গুবারনাটিস [সম্ভবতঃ ইনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ দ্য গুবারনাটিস] এইসূত্রে 'বৈদ্যুতিক প্রস্তর' বা উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে কিছু কুসংস্কারের উল্লেখ করেন। মঁসিয়ে সিলভ্যাঁ লেভি জানতে চান, যেখানে এইসব প্রস্তর পাওয়া যায় সেই স্থান কি চক্রতীর্থ?—তা কি কেবল নেপালের অন্তর্গত গণ্ডকীর ধারাপথেই পাওয়া যায়? স্বামী বিবেকানন্দ এই শালগ্রাম শিলার যৌন ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করেন। তিনি একদিকে বিষ্ণুর শালগ্রাম ও তুলসীর সাদৃশ্যের কথা, অন্যদিকে নর্মদায় প্রাপ্ত শিবলিঙ্গের সঙ্গে বিল্ববৃক্ষের সাদৃশ্যের কথা বলেন। সবশেষে ক্ষুদ্র বৌদ্ধস্তূপ এবং অশ্বত্থ বৃক্ষের সম্পর্কের কথা বলেন। সভাপতি এই মত প্রকাশ করেন : যেহেতু এইসকল প্রতীকের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা শক্ত তাই এই ধরনের তুলনামূলক বিচারের বিশেষ মূল্য আছে। মঁসিয়ে জি ওপার্টকে তাঁর আকর্ষক প্রবন্ধের জন্য তিনি ধন্যবাদ দেন এবং উক্ত বিচিত্র শিলাসংক্রান্ত সকল তথ্য ঐরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশের জন্য প্রশংসা করেন।

২। সহ-সভাপতি মঁসিয়ে সিলভাঁ লেভি, লিয' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মঁসিয়ে পি রেগনড-এর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, বিষয়, ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল। প্রবন্ধমধ্যে ব্রহ্মণ্য ঐতিহ্যকে লেখক আক্রমণ করেন এবং নতুন এক ব্যাখ্যারীতি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। মূল পাঠ হাতে না নিয়ে এই ধরনের প্রশ্নের যথাযথ আলোচনা যেহেতু সম্ভব নয়, তাই এই প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা হয়নি। প্রবন্ধমধ্যে প্রাঞ্জলভাবে মত প্রকাশ করা হয়েছে, এবং তাতে লেখকের দৃঢ়বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে, সেজন্য সভাপতি তারিফ করেন।

৩। হিন্দুধর্মের সূচনা থেকে পরবর্তী বিকাশ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মত প্রকাশ করেন। তিনি এক্ষেত্রে সর্বপ্রাণবাদ ['Animism'] এবং পিতৃপুরুষ-অর্চনার মনোভাবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন—নিসর্গ-প্রকৃতির উপাসনার ['Naturism'] ব্যাপারটি তাঁর মতে কেবল আনুষঙ্গিক। তদুপরি তিনি দার্শনিক ও ঐন্দ্রজালিক বস্তুর পার্থক্য দেখান। দুটি জিনিসই তাঁর মতে অত্যন্ত প্রাচীন। তিনি, ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা যেভাবে ইচ্ছামতো প্রাচীন শব্দের নব ব্যাখ্যা করেন, বা অর্থান্তর ঘটিয়ে তদনুযায়ী থিয়োরী নির্মাণ করেন, তার সমালোচনা করেন। ঐ সব মত ও ব্যাখ্যা প্রায়শঃই ভ্রান্ত। তিনি ভারতের ধারাবাহিক ঐতিহ্যানুসারী মতের পক্ষসমর্থন করেন। তাঁর মতে, উত্তরোত্তর অনুশীলনের দ্বারা ঐসব ধারাবাহিক মতের সত্যতা প্রমাণিত হবে। উপসংহারে তিনি উপনিষদের প্রভাবের নব-উত্থানের বিষয়টির উপর জোর দেন।

সভাপতি, স্বামী বিবেকানন্দকে ধন্যবাদ দেন। স্বামীজীর সমালোচনার লক্ষ্য পণ্ডিতকুলকে সমর্থনের জন্য সময়ক্ষেপ না ক'রে (যিনি ইতিমধ্যেই মহাভারতের গুরুত্ব, বিশেষরকম হিংসাত্মক উৎপীড়ন ছাড়াই ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের বিদায় ইত্যাদি বিষয়ে স্বামীজীর ধারণাকে স্বীকার করেছেন) এটাই প্রতীয়মান করতে সচেষ্ট ছিলেন—এই শাখা-সম্মেলন এক হিন্দুর মুখ থেকে তাঁর দেশের প্রাচীন ধর্ম-

সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাকে কত না গভীর আকর্ষণের সঙ্গে শ্রবণ করেছে।

৪। মাঁসিয়ে এ ফুসে সম্মেলনে তাঁর আশু প্রকাশিতব্য গ্রন্থ *Etude sur l'Iconographie Boudhique de l'Inde* সম্মেলনের সামনে উপস্থিত করেন। কোন্-কোন্ নূতন উপাদান তিনি ব্যবহার করেছেন তাদের বর্ণনা করেন; তাঁকে এই কাজের জন্য আদি প্রেরণা যিনি দিয়েছেন সেই মাঁসিয়ে এস দা ওল্ডেনবার্গ সম্মেলনে উপস্থিত নেই বলে দুঃখপ্রকাশ করেন। সভাপতি বলেন, [ফুসে-র] এই কাজ পুরো-পুরি ভারতীয় উপাদানের উপরে নির্ভরশীল, এবং বৌদ্ধ ভিত্তিচিত্রাদির ও পটশিল্পের বিষয়ে এটি মৌলিক অবদান।

৫। মাঁসিয়ে সিলভ্যাঁ লেভি৩২ এক তাৎক্ষণিক ঘরোয়া আলোচনায় তাঁর সাম্প্র-

৩২ শিক্ষিত ভারতবাসীর অনেকের কাছে সিলভ্যাঁ লেভির নাম পরিচিত। তিব্বত ও চীনের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এই ফরাসি পণ্ডিত প্রথম ভারতে আসেন ১৮৯৭ সালে পরে আসেন ১৯২১ সালে--বিশ্বভারতীর প্রথম ভিজিটিং প্রফেসাররূপে। এঁরই প্রচেষ্টায় বিশ্বভারতীতে তিব্বতী ও চীনা ভাষার চর্চা শুরু হয়। সিলভ্যাঁ লেভি বিবেকানন্দের কথা খুবই জানতেন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে মুখোমুখি সাক্ষাতের কথা প্যারিস কংগ্রেসের বিবরণী থেকেই প্রথম জেনেছি। রোমাঁ রোলাঁর ডায়েরি থেকে পাচ্ছি–বিবেকানন্দ সম্পর্কে লেভির মনোভাব মোটেই প্রসন্ন ছিল না। কালিদাস নাগের সঙ্গে কথাসূত্রে লিখিত রোলাঁর ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ তারিখের ডায়েরি-বিবরণ চিত্তাকর্ষক। গ্রীস, বুলগেরিয়া প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে এসে নাগ রোলাঁকে বলেন, গ্রীসকে তাঁর মনে হয়েছে প্রাণহীন, মৃত। অর্থাৎ অতীত প্রাণশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। তারপর : "প্যারীতে সিলভ্যাঁ লেভি তাঁর সামনে আমার [রোলাঁ লিখেছেন] সম্পর্কে আর একবার বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। আমার 'গান্ধী'র [গান্ধী বিষয়ক পুস্তকের] পর, আমার 'বিবেকানন্দ'-এর জন্য তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া তিনি বিবেকানন্দকে ঘৃণা করেন, যেমন ঘৃণা করেন আমাকে। তিনি বলেছেন, 'ঐ দুই বাক্যবাগীশ ।' তাঁর কাছে ভারতবর্ষকে হয়ে থাকতে হবে মিউজিয়ম আর পুথিপত্রের বস্তু; নবজীবন পাওয়াটা নিষিদ্ধ!–তাঁর অনুমতি ছাড়াই সে তা পাবে? . এই শ্রেণীর ইহুদিরা এশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমের (অতিশয়িত) প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের দেখাতে গিয়ে হাসির খোরাক জোগায়! নিজেরা যে কতখানি বিদ্রূপের পাত্র হয়ে ওঠে, সে বোধও, (যদি কখনো তাদের সে-বোধ থেকে থাকে) এই বিদ্রূপকারীরা হারিয়েছে।" [পৃ. ২৮৪]।

রোলাঁর এই তীব্র লেখা বিবেকানন্দের প্রগতিশীল ভূমিকার উপরে আর একবার তীক্ষ্ণ আলোক-পাত করল। রিভাইভ্যালিস্ট-রূপে কোনো-কোনো দায়িত্বহীন ব্যক্তির দ্বারা চিহ্নিত বিবেকানন্দ যে মোটেই তা ছিলেন না, এখানে তা পুনশ্চ দেখতে পাচ্ছি। ভারততাত্ত্বিক বা প্রাচ্যবিদ্গণের অনেকেই তাঁদের আকর্ষণের প্রাচীন সভ্যতাকে বর্তমানে সম্পূর্ণ মৃত ধরে নিয়ে, গুপ্তধনের সন্ধানের মতো প্রাচীন সভ্যতার বস্তুোদ্ধারে ব্রতী ছিলেন। আর বিবেকানন্দ কদাপি স্বীকার করেন নি—ভারতবর্ষ মৃত। তার পতন হয়ত হয়েছে, কিন্তু নিম্নগতির মধ্যেও সে অতীতের সংস্কৃতিধারাকে বহন ক'রে চলেছে, এবং ক্রমেই জাগ্রত হয়ে উঠছে—অতীতের সম্পদে ও বর্তমানের শিক্ষায়। ভারতের অতীত-পূজায় ব্রতী পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের কাছে বিবেকানন্দের এই ভূমিকা অসহ্য। প্যারিস কংগ্রেসে (অন্যত্রও) বিবেকানন্দ এঁদেরই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। স্বামীজী এ-সম্পর্কে নিবেদিতাকে সতর্ক ক'রে যা বলেছিলেন, তা আগে উদ্ধৃত করেছি। [তৃতীয় খণ্ড, ৩৪১]। তিনি বলতে চেয়েছিলেন—এই শ্রেণীর পুরাতাত্ত্বিকেরা তাঁদের গবেষণা-বিষয় প্রাচীন দেশটির প্রতি 'স্বার্থজড়িত অনুরাগ' বোধ করেন। [উক্ত প্রাচীন দেশ তাঁর গবেষণার এবং সুনামের সুযোগ করে দিয়েছে বলে!!] তাঁরা অতীতের স্বপ্নে এমনই মশগুল থাকেন যে, সেই দেশের আধুনিক জীবন তাঁদের কাছে অগ্রাহ্য। [এমন কি ম্যাক্সমুলার পর্যন্ত তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হবে বলে ভারতবর্ষে আসতে চাননি!]। স্বামীজী চেয়েছিলেন–প্রাচীন ভারতের শক্তি নূতন যুগে নূতন পদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করুক—এমনভাবে করুক, যা পূর্বে কোনো কল্পনাতেই আসেনি। এমন দৃষ্টিভঙ্গির মানুষকে পূর্বোক্ত ধরনের ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্গণ কি ক'রে ক্ষমা করবেন—যিনি উক্ত পণ্ডিতদের চেয়ে কম পুরাতনকে জানেন না—অথচ ওঁদের স্বপ্নপৃথিবীর রাজবর্ত্মের সঙ্গে একালের বাস্তব জগতের সড়ককে যুক্ত ক'রে দিতে চাইছেন। অপরপক্ষে রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দ-প্রীতির কারণ—বিবেকানন্দকে তিনি ভারতবর্ষের যুগ-যুগ ধাবিত রথের সারথিরূপে দর্শন করেছেন—যিনি একালের কুরুক্ষেত্রে নবগীতা শোনাচ্ছেন।

তিক নেপাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু জীবন্ত বর্ণনা দেন; সে দেশে বৌদ্ধ-ধর্মের রূপ সম্বন্ধে অনুরূপভাবে বলেন। অল্প সময়ের মধ্যে, নেপাল থেকে বৌদ্ধধর্ম কোনো হিংসাত্মক উৎপীড়ন ছাড়াই, কোন্-কোন্ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক কারণে বিদূরিত হয়েছে, তাদের তিনি চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেন। সভাপতি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, এই বিষয়টিতে তিনি তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছেন, যেমন হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে। সকলেই ভালভাবে জানেন যে, উৎপীড়নের দ্বারা ধর্মকে ধ্বংস করা যায় না। মঁসিয়ে ওপার্ট যেরূপ ইংগিত করেছেন সেই ধরনের স্থানীয় গণ্ডগোল অবশ্যই ছিল কিন্তু যে-ঐতিহাসিক মত নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করে—ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমরের ফলে ধ্বংস হয় বা বিতাড়িত হয়—সেই মতকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে।

সম্মেলন ১১.৩০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

এই বিবরণের সঙ্গে স্বামীজীর নিজের বিবরণের অংশবিশেষ উপস্থিত করা যায়। প্রথম বিবরণে একটি জিনিস স্বভাবতঃই আশা করা যায় না, নীরস তথ্যবিবরণী পুস্তকে তা থাকেও না—তা হল, স্বামীজীকে উক্ত সম্মেলনে কিরূপ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছিল, কিভাবে তিনি সংবর্ধিত ও সমাদৃত হয়েছিলেন। অধিবেশনের সভাপতি সকলের সম্বন্ধেই প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছিলেন, কিন্তু ঐ সকল প্রশংসার দৈর্ঘ্য ও গাঢ়ত্বের তারতম্যকে নিশ্চয় 'বিবরণী' গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারে না। তবু উদ্ধৃত বিবরণেও, জনৈক হিন্দুর মুখনিঃসৃত তাঁর স্বদেশীয় ধর্মের কথা কি-প্রকার আগ্রহের সঙ্গে শোনা হয়েছে, এবং উক্ত হিন্দু রীতিমতো কঠোরভাবে পাশ্চাত্ত্য প্রাচ্যবিদ্‌গণের দায়িত্বহীন থিয়োরীবিলাসের সমালোচনা করলেও, সভাপতি তার খণ্ডনের চেষ্টা করেন নি, বরং তাঁর কিছু বক্তব্য অবিলম্বে মেনে নিয়েছিলেন, তাও দেখা যায়।

স্বামীজীর নিজস্ব বিবরণীতে পাই : ভারতবর্ষ থেকে কেবল তিনিই উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে প্রবন্ধ পড়তে আহ্বান করা হয়েছিল : 'বৈদিক ধর্ম অগ্নি-সূর্যাদি জড়বস্তুর আরাধনা-সম্ভূত'—অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের এই মত সত্য কি না? স্বামীজী অত্যন্ত অসুস্থতার জন্য প্রবন্ধ লিখে উঠতে পারেন নি [কতখানি অসুস্থ ছিলেন জুল বোয়ার স্মৃতিকথা থেকে আমরা কিছু পরে দেখব] –তিনি কোনোমতে উপস্থিত হয়ে কিছু বলতে পেরেছিলেন মাত্র। স্বামীজী উপস্থিত হলে "ইউরোপ অঞ্চলের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; উঁহারা ইতিপূর্বেই স্বামীজীর রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন।"

ধর্মেতিহাস সভায় স্বামীজী একবার না একাধিকবার বক্তৃতা করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। [সে প্রসঙ্গে পরে আসব।] সে যাই হোক, যখন তিনি বৈদিক ধর্মের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বলেন, তাঁর সে-বক্তব্য অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতের প্রতিকূল হলেও, তিনি যুক্তি-শক্তিতে (প্রবল ব্যক্তিত্বের শক্তিতেও) নিজ মতের পক্ষে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। "বক্তৃতার পরে অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন। অনেকেই বলিলেন : স্বামীজী যাহা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের সম্মত এবং স্বামীজীকে আমরা বলি যে, সংস্কৃত প্রত্নতত্ত্বের আর সে দিন নাই। এখন নবীন সংস্কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের মত অধিকাংশই স্বামীজীর সদৃশ এবং ভারতের কিংবদন্তী পুরাণাদিতে যে বাস্তব ইতিহাস রহিয়াছে, তাহাও আমরা বিশ্বাস করি। অন্তে—বৃদ্ধ সভাপতি মহাশয় অন্য সকল বিষয় অনুমোদন করিয়া, এক গীতার মহাভারত-সমসাময়িকত্বে দ্বৈত মত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগ এইমাত্র করিলেন যে, অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে, গীতা মহাভারতের অঙ্গ নহে।" [৬—৪৮-৫০]

বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্বামীজী যা বলেছিলেন তার চুম্বক তিনি "পারি প্রদর্শনী" প্রবন্ধে দেন। একই বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ কিছুটা পূর্বোক্ত "বিবরণী" গ্রন্থের মধ্যেও পাওয়া যায়। স্বামীজী বৈদিক ধর্মের মধ্যে নিহিত অধ্যাত্মবাদই যে, বৌদ্ধাদি ধর্মে বিকশিত হয়েছিল, তাই দৃঢ়ভাবে বলবার চেষ্টা করেছিলেন; এক্ষেত্রে স্বতঃই তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, বৈদিক ধর্মের প্রধান প্রাচীন প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর গীতাকে, তৎসহ মহাভারতকে, বুদ্ধ-পরবর্তী প্রমাণ করার জন্য যে-চেষ্টা করে থাকেন (সেইসঙ্গে মহাভারত ও গীতা এককালে রচিত নয়, এমন কথাও)—তাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মৌলিক প্রাচীনত্ব অস্বীকারে উৎসাহী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রিয় থিয়োরী—ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে গ্রীক-প্রভাব বিষয়ক অতিরঞ্জিত দাবিকেও স্বামীজী তথ্যযুক্তিতে নস্যাৎ করেন। স্বামীজী এমনকি তীক্ষ্ণভাবে ম্যাক্সমুলারের উক্তিকেও সমালোচনার লক্ষ্য করেন। [গ্রীক-প্রভাব প্রসঙ্গটি স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টির অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে]। স্বামীজী এইসঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের ধারাপথে যে-সকল কিংবদন্তী ও পৌরাণিক কাহিনী আছে, তাদের অনুসরণে ভারতীয় শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে, উদ্ভট অর্থ আবিষ্কার বা আরোপ না করতে, অনুরোধ করেছিলেন। পুরাণের মধ্যে সত্য ইতিহাস লুকিয়ে আছে, তা স্বামীজীর কালেই গবেষণামুখে অল্পস্বল্প প্রমাণিত হচ্ছিল [স্বামীজী তার উল্লেখও করেছেন], পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইউরোপীয় অপ-পাণ্ডিত্যের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়েছিল গুস্তাভ ওপার্ট-কৃত শালগ্রাম শিলার উদ্ভট যৌন ব্যাখ্যায়।৩৩ ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির সর্বত্র যৌন ব্যাপার দর্শনে

---

৩৩ গুস্তাভ ওপার্টের পরিচয় প্রসঙ্গে বিদ্যাত্মানন্দ লিখেছেন, তিনি ইহুদী-জার্মান বংশ-সম্ভূত, জন্ম ১৮৩৬ সালে। তারা তিন ভাই, গুস্তাভই সর্বকনিষ্ঠ, তিনজনই পেশাগতভাবে প্রাচ্যবিদ্। গুস্তাভ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রাবিড় ভাষার শিক্ষকতা করেছেন। ১৮৭২-১৮৯৪—এই একুশ বছর তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-শিক্ষক; ভারত সংক্রান্ত নানা প্রাচীন অপ্রচলিত বিষয়ে বহুগ্রন্থের লেখক।

সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং অক্লান্ত লেখক হিসাবে ওপার্ট ভারতবর্ষে পণ্ডিতমহলের একাংশে পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের সংবাদপত্রে আমি ইতস্ততঃ তাঁর নাম দেখেছি। তিনি নানাপ্রকার চমকপ্রদ থিয়োরী হাজির করতেন তথ্য ও কল্পনা মিশিয়ে। ১৮৯৪ সালে, ওপার্টের অবসর গ্রহণের সময়েই প্রকাশিত হয় তাঁর *The Original Inhabitants of India*, যা নানাস্থানে আলোচিত হয়। মাদ্রাজ মেল ১২ এপ্রিল, ১৮৯৪, বইটির উপর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলে : এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়, কারণ ইতিমধ্যেই তার বড় অংশ "জার্নাল অব দি মাড্রাস লিটারারি সোসাইটি"-তে বেরিয়ে গেছে। এই পত্রিকা উক্ত গ্রন্থ-বিষয়ের সারসংক্ষেপ করেছিল, তার থেকে ওপার্টের বক্তব্য জানতে পারি : বর্তমান ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ একজাতি সম্ভূত, আদিতে তারা ছিল দ্রাবিড়, দ্রাবিড় ভাষাই বলত; তারা ছিল পার্বত্যবাসী। এই দ্রাবিড়রাও কিন্তু বহিরাগত, ভারতে ঢুকেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে; আর্যদের দ্বারা পরাভূত হবার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে তারা আধিপত্য করত। আর্যরা তারপরে যখন বিজয়লাভ করল, তখন বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর ভাগ পর্যন্ত ভূখণ্ডে নিজেদের ভাষা চাপিয়ে দিতে পেরেছিল, কিন্তু তার নিম্নে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার করলেও তারা দ্রাবিড় ভাষাকে হঠাতে পারেনি। এমনকি উত্তর ভারতেও আর্যসংস্কৃতির বিজয় সর্বাত্মক হতে পারেনি—আর্যরা দ্রাবিড়দের রীতি-নীতি ও ধর্মাচারের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। বর্তমান হিন্দুধর্ম বস্তুতঃ দ্রাবিড় ধর্মই—উপরে আর্য প্রলেপ পড়েছে মাত্র। সারা ভারতেই নিম্ন-শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কতকগুলি বিচিত্র ধর্ম ও কর্মরীতি দেখা যায়—সেগুলি দ্রাবিড়দের পূর্ব-আধিপত্যেরই স্মারক। একদিন তারা ভারতের প্রভু ছিল, এখন দাস।

বম্বে গেজেট, ৩১ মার্চ, ১৮৯৪, এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে ওপার্টের অবসর গ্রহণের উল্লেখ ক'রে, সেইসূত্রে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের উপরে আলোচনা করে। মাদ্রাজ মেল-কৃত সারসংক্ষেপের অতিরিক্ত এখানে পাই—ভারতে আর্য ও অনার্যের দীর্ঘ সংঘাত-বিবরণ, এবং এই বিচিত্র সংবাদ—দ্রাবিড়রা 'ভরত' নামে অভিহিত হত, যাদের প্রধান দুই শাখা, পাণ্ডব ও দ্রাবিড়; ভারতে যারা আর্য

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বাসনার্ত অনুসন্ধিৎসা স্বামীজীর কাছে ইউরোপীয় রুচির বিচিত্র বিকার বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল। শালগ্রাম-বিষয়ে যৌন-ব্যাখ্যা "অশ্রুতপূর্ব ও অপ্রাসঙ্গিক," স্বামীজী গুরুত্ব দিয়ে তার আলোচনায় অগ্রসর হননি, কিন্তু শিবলিঙ্গ-উপাসনার উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব-প্রচলিত মতের খণ্ডনে এমন-কিছু চিন্তাপূর্ণ উক্তি করেছিলেন, যা পরবর্তী গবেষকদের সহায়তা করেছিল, এবং নিবেদিতার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই মত হ্যাভেলের গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করেছিল। [বিষয়টি "নিবেদিতা লোকমাতা" গ্রন্থের একটি খণ্ডে আলোচনার আশা রাখি]।

"পারি প্রদর্শনী" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি একটি বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ক'রে তোলে—স্বামীজীর অনুচিত কার্পণ্য!!! প্রত্নতত্ত্বে তাঁর কোন্ অসাধারণ অধিকার ছিল, ঐ ক্ষুদ্র রচনাটি তার অসংশয়িত প্রমাণ। তিনি ঐ ক্ষুদ্রাকার রচনার মধ্যে এমন সব ইঙ্গিতবহ মন্তব্য করেছেন যা পরবর্তীকালে দিগ্‌দর্শক হয়ে উঠেছে। স্বামীজী প্রায়শঃই প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা করতেন কিন্তু সেগুলি লিখে নেবার মতো মানুষ তাঁর নিকটে ছিলেন না, ফলে সেগুলি আমরা পাই না [নিবেদিতা কিছু কিছু লিখেছেন, সেগুলিই আমাদের সম্বল, যার পরিমাণ মোটেই বেশি নয়]। স্বামীজীর প্রত্নতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যের একটি অসম্পূর্ণ নমুনা-প্রমাণ কিছু পরেই মাদাম কালভে লিখে রেখেছেন, তাঁর কাগজপত্রের মধ্য থেকে বিদ্যাত্মানন্দ সেটি আবিষ্কার করেছেন। সর্প-প্রতীক সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান বিদ্যাত্মানন্দের কাছে "আশ্চর্য এবং অবিশ্বাস্য" বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।৩৪

নয়, তারা এই দুই শাখা-সম্ভূত। যেহেতু ভারতের আর্য-পূর্ব অধিবাসীদের সাধারণ নাম 'ভরত', তাই ওপার্টের প্রস্তাব- ভারতবর্ষ যেন 'ইণ্ডিয়া' না হয়ে 'ভারতবর্ষ' নামে চিহ্নিত হয়। দ্রাবিড় মত কিভাবে আর্য ধর্মমতকে প্রভাবিত করেছে, সে প্রসঙ্গে পাই : দ্রাবিড় প্রভাবেই আর্যদেবতা ব্রহ্মার অবনতি ঘটেছে, যিনি সৃষ্টিকর্তার গরিমা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পশ্চিম উপকূলে নানা ব্যাধির সৃষ্টিকর্তা রূপে গৃহীত। শিবের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ঋগ্বেদে লিঙ্গোপাসনার কথা নেই, দ্রাবিড়রাই ও বস্তু শিবের সঙ্গে যুক্ত ক'রে যতপ্রকার অশ্লীল ব্যাপার ঘটিয়েছে। বেদে নারী দেবতার প্রাধান্য নেই; পরবর্তী হিন্দুধর্মে নারী-দেবতার প্রাধান্য ঘটেছে দ্রাবিড় প্রভাবেই।

ওপার্টের গবেষণার সঙ্গে কল্পনাবিলাসের অবাধ লীলা সংবাদপত্রে কটাক্ষের বিষয়বস্তু হয়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করার সময়ে তিনি একেবারে মুক্তপুরুষ—এমনও বলা হয়। তাঁর গবেষণা একটি মারাত্মক অপকারের বীজ পুঁতেছিল—তা ইন্ধন দিয়েছিল উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের বিবাদে। একদিকে তা ভারতবর্ষে দ্রাবিড়দের পূর্ব-আধিপত্যের কথা শুনিয়ে তথাকথিত দক্ষিণ-ভারতীয় দ্রাবিড় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে আত্মাভিমান জাগিয়েছিল, অন্যদিকে তাদের সেই পূর্ব-অধিকার হরণকারী আর্যদের (অর্থাৎ তথাকথিত আর্য বংশোদ্ভবদের) বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। প্যারিস কংগ্রেসে স্বামীজী এ-বিষয়েও আলোচনা করেন। [৬ ২০৯-১০]।

এই প্রসঙ্গ পরে "ভারতীয় সংস্কৃতি" অধ্যায়ে আরও আলোচিত হবে।

৩৪ স্বামীজী গ্রীসের ন্যাশন্যাল মিউজিয়ম পরিদর্শন করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে কালভে তাঁর নোটে লিখেছেন :

"The Museum contains the most beautiful collection of amphores [a tall jar with narrow neck and two handles] in the world. I saw the delicious statue of Minerva Athena [Athena had a shield, attached to which is the snaky-haired head of Medusa].

"If I am ever obliged to sing *Armide* ["Tasso's story of Armide, a beautiful queen with supernatural powers, was recast as an opera by some forty different composers, the best known version being by Gluck"], I shall have those jewels reproduced, those interlaced serpents on the breast. That bizarre girdle formed of two snakes, their heads raised. The serpent, the Swami tells us, is found again and again in all religions : the Virgin Mary crushing the serpent,

আরও দুটি প্রশ্ন উঠেছে। তার একটি—স্বামীজী কতবার ধর্মেতিহাস-সভায় বক্তৃতা করেছেন? স্বামীজীর ইংরাজি জীবনী অনুযায়ী—তিনি দুবার বক্তৃতা করেছেন। বিদ্যাত্মানন্দ কিন্তু "বিবরণী" গ্রন্থে মাত্র একবার বক্তৃতার কথাই পেয়েছেন। তিনি ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন, একই অধিবেশনে স্বামীজী দু'বার বলতে ওঠেন, একবার ওপার্টের বক্তব্যের খণ্ডনে, অন্যবার ভারতীয় বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশ বর্ণনায়—তার থেকেই হয়ত ঐ দুবার বক্তৃতার কথা উঠেছে। স্বামীজী নিজে "পারি প্রদর্শনী" প্রবন্ধের মধ্যভাগে দ্বিতীয় প্রসঙ্গের সূত্রপাত ক'রে বলেছেন : "অন্য এক বক্তৃতা—স্বামীজী ভারতীয় ধর্মমতের বিস্তার বিষয়ে দেন।" এর থেকেও মনে হতে পারে, তিনি দুবার বক্তৃতা করেছিলেন, যদিও একই অধিবেশনে অন্য প্রসঙ্গে বক্তৃতাকে "অন্য এক বক্তৃতা" বলা অসম্ভব নয়। এ-বিষয়ে ঠিক তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।৩৫

দ্বিতীয় প্রশ্ন : স্বামীজী উক্ত সভায় কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন? বিদ্যাত্মানন্দ বলেন, তিনি খুব সম্ভবতঃ ইংরাজিতে বলেন, সে কারণে তাঁর বক্তৃতার নোট ঠিকভাবে নেওয়া যায়নি। এইকালে স্বামীজীর ফরাসি ভাষাচর্চার বিবরণ দেওয়ার পরে, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, স্বামীজীর পক্ষে তখনি জটিল প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে ফরাসিতে বক্তৃতা করা সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ।

the archangel Michael squashing the dragon—the most ancient civilizations known to man adore the serpent. Those religions which have endured have all kept the serpent—the emblem of wisdom, of prudence, of force : Moses, the Hindus, the Egyptians, and Christianity. The word 'mage' [magician]—'gatur' [probably 'jadu'] in Hindu—means 'charm', 'charmer', 'master of the serpent'—that is to say, master in God ; this word 'mage' comes from that same adoration of serpents." [*PB*, April 1977]

স্বামীজী সর্প-প্রতীকগুলির দৃষ্টান্ত কোথা থেকে আহরণ করেছিলেন, কোন্ অর্থে তাদের ব্যবহার করেছেন—সে সম্বন্ধে বিদ্যাত্মানন্দ যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছেন। সেন্ট মাইকেল ও ড্রাগনের পৌরাণিক কাহিনী, তিনি বলেছেন, সুবিদিত। কিন্তু খুবই রহস্যাচ্ছন্ন হল মোজেস ও সর্প-কথা, ততোধিক দুর্জ্ঞেয় সর্প-পীড়নরত ভার্জিন মেরী। মোজেস ও সর্প ব্যাপারটির পশ্চাতের কাহিনী এই : মিশর ত্যাগের পরে ইহুদীরা যখন যাযাবর, তখন তারা মোজেস ও জিহোবার বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ করত। শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর অগ্নিসর্প প্রেরণ করেছিলেন, যাদের দংশনে অনেকেই নিহত হয়। অনুতপ্ত ইহুদীরা মোজেসকে অনুনয় করে বলে, তিনি যেন ঈশ্বরের কাছে সর্পদের সরিয়ে নেবার প্রার্থনা করেন। মোজেস তখন একটি ব্রোঞ্জের সর্প প্রস্তুত ক'রে দণ্ডের উপর রাখেন ও বলেন —সর্পদষ্ট ব্যক্তি তাঁর সর্পের দিকে চাইলে বেঁচে যাবে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই খ্রীস্টান শাস্ত্রকথা প্রায়ই উপস্থিত করা হচ্ছিল যে, ভার্জিন মেরী হলেন এক নব ঈভ, যিনি আদি ঈভকে যে-সর্প প্রলুব্ধ করেছিল তাকে ধ্বংস করতে সমর্থ। অর্থাৎ মেরী হলেন পরিত্রাণকর্ত্রী। এই ভাবটি ক্যারাভাগ্গিও কর্তৃক তাঁর "মেরী ও শিশু যীশু : সঙ্গে সেন্ট অ্যানী" নামক সুন্দর চিত্রে রূপায়িত। চিত্রে দেখা যায়, মেরী তাঁর বাম পদ সর্প-মস্তকে স্থাপন করেছেন, আর তাঁর দিব্য সন্তান তাঁর পায়ের উপরে নিজের পা স্থাপন ক'রে চাপ দিচ্ছেন।

৩৫ দুবার বক্তৃতার তথ্য পাওয়া গেছে ব্রহ্মবাদিনে ডিসেম্বর, ১৯০০ তারিখের সংবাদে :

"We learn that Swami Vivekananda twice addressed the Philosophic Section of the Exposition Universelle and that his lectures were much appreciated." [*Brahmavadin*, Dec. 1900, *VIN*, 553]

প্রবুদ্ধ ভারতের নভেম্বর ১৯০০ সংখ্যাতেও লেখা হয় :

"Swami Vivekananda...was invited to attend the Congress of Religions.. The Swami spoke twice, well and to the point." [*VIN*, 632]

স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে কিন্তু ফরাসিতে বক্তৃতা করার কথা আছে : "স্বামীজী এই সম্মেলনের জন্য দু'মাস নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টায় নিরত ছিলেন, যাতে তিনি ঐ ভাষায় বক্তৃতা করতে পারেন। ঐ সময়ের মধ্যে বুঝতে পারেন—তিনি এমন সাবলীলভাবে ফরাসি বলতে পারছেন যাতে শ্রোতাদের কাছে ঐ ভাষায় সংস্কৃত দর্শনের সূক্ষ্ম জটিল পরিভাষা বোধগম্য করা যায়।" [ইংবাজি জীবনী, ১৯৬০ সং, ৬৮৩]। স্মরণ রাখতে হবে, এই জীবনী স্বামীজীর বন্ধু ও শিষ্যদের দ্বারা লিখিত বা পরীক্ষিত হয়েছিল। বহুদিন পরে মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্বামীজীর স্মৃতিকথায় বলেছেন, স্বামীজীর কাছে তিনি শুনেছেন যে, ৬ মাসের চেষ্টায় স্বামীজী ফরাসি ভাষা শিখে নিয়ে তাতে কিছু বক্তৃতা করেছিলেন। [রেমিনিসেনসেস, ৩৫৪]। মন্মথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই স্মৃতিকথার নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে সন্দেহ করা হয়েছে, এবং ইনি স্পষ্টভাবে ধর্মেতিহাস সভায় ফরাসি ভাষায় স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়ে বলেন নি [ঐ ফরাসি বক্তৃতা প্যারিস প্রদর্শনীর পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক শাখাতেও হতে পারে]—কিন্তু কাছাকাছি সময়ের ইণ্ডিয়ান মিরারে [১২ ডিসেম্বর, ১৯০০] স্পষ্টভাবে স্বামীজীর ফরাসি বক্তৃতার কথা আছে, যদিও সেখানে বলা নেই—ঐ বক্তৃতা তিনি ধর্মেতিহাস সভাতেই করেছিলেন।৩৬ তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে শোকপ্রবন্ধে লেখেন, স্বামীজী প্যারিস প্রদর্শনীতে ফরাসি ভাষাতে বক্তৃতা করেছিলেন। [পূর্বে উদ্ধৃত]।

বিষয়টি তথাপি সন্দেহের স্তরে থেকে যায়। বিদ্যাত্মানন্দ, যিনি ইংবাজি জীবনীতে লিখিত স্বামীজীর ফরাসি ভাষায় বক্তৃতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—তিনিই আবার উক্ত ভাষার মর্মগ্রহণে স্বামীজীর সামর্থ্য স্বীকার না করে পারেন নি। ওপার্ট কোন্ ভাষায় প্রবন্ধ পড়েছিলেন, সেই প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে, বিদ্যাত্মানন্দ অনুমান করেছেন সম্ভবতঃ ফরাসিতেই পড়েছিলেন। সেক্ষেত্রে, সদ্য সে প্রবন্ধ শুনে, তার সম্বন্ধে স্বামীজী যে উপযুক্ত তথ্যবহুল উত্তর দিয়েছিলেন—তা তাঁর ফরাসি ভাষজ্ঞানেরই পরিচায়ক। ওপার্ট যদি ইংরাজিতেও বলে থাকেন, বেগনড অন্ততঃ তাঁর প্রবন্ধ ফরাসিতেই পড়েছিলেন—সে প্রশ্নের বক্তব্যও স্বামীজী পুরো বুঝেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। একই কালে এবং সামান্য পরে, পিযের হায়াসিন্থ, জুল বোয়া বা মাদাম কালভের সঙ্গে কেবল ফরাসিতেই তিনি ধর্মীয়, দার্শনিক, ও ঐতিহাসিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন—এও দেখা যায়। বিদ্যাত্মানন্দ

৩৬ "A gentleman, who was on a visit to the Math yesterday, writes to say that the Swami...besides delivering very impressive and eloquent lectures in French at Paris... delivered three lectures at Constantinople, and he has a host of admirers there." [*Mirror*, Dec. 12, 1900, *VIN*, 214]

একই কাগজে ৩ জুলাই, ১৯০০, স্বামীজী প্রদর্শনীতে যে, ফরাসি ভাষাতেই বক্তৃতা করবেন, এমন সংবাদ ছিল :

"Swami Vivekananda has been invited to represent Hinduism and Vedanta in the Paris Exhibition, and the Swami will deliver and address in French." [*Ibid*, 214]

ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর কাগজে ৮ জুলাই ১৯০০, অনুরূপ কথা লেখা হয় :

"Swami Vivekananda has been invited to represent Hinduism and Vedanta in the Paris Exposition, and the Swami will deliver an address in French." [*Indian Spectator*, July 8, 1900, *VIN*, 415]

উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় লেখা হয় : "স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস নগরে বর্তমান প্রদর্শনীর ধর্ম বিভাগে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শুনিলাম, নাকি তিনি ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিবেন।"

অনুমান করেছেন, অতঃপর কনস্টান্টিনোপলের স্কুটারিতে মেয়ে-কলেজে স্বামীজী যে-বক্তৃতা করেন, তার ভাষা ফরাসি, কারণ তুরস্কে ঐকালে উচ্চতর শিক্ষার ভাষা ছিল ফরাসি।

॥ ৫ ॥ স্বামীজীর অনুরাগী বন্ধু : জগদীশচন্দ্র বসু

প্যারিসে থাকাকালেই জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় ও সৌহার্দ্য ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় খণ্ডে [৬৪-৭২] আমরা বিস্তারিতভাবে বসুর ১৮৯৫-৯৭ সালের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের বিবরণ দিয়ে এসেছি। বিশ্বভূমিকায় স্বামীজীর অবতরণের কালেই বসুও পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেন। স্বামীজী ভারতবর্ষে যে নবোত্থানের সূচনা করেছিলেন, তার সহযোগী হিসাবে যেন বসুর সাফল্যময় আবিষ্কারাদি ঘটেছিল—ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রায়শঃই তেমন কথা লেখা হয়। ভারতবর্ষের সমকালীন সংবাদপত্র থেকে ঐ ধরনের সংবাদ ও মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করেছি। ১৮৯৬ সালে স্বামীজী ও বসু উভয়েই ইংলণ্ডে ছিলেন; সে সময়ে যখন ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে বসুর আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হচ্ছিল তখন স্বামীজীর সম্ভাব্য উল্লাসের কারণও আমরা ঐ প্রসঙ্গে জানিয়েছি।

প্যারিসে বিশ্বমেলায় স্বামীজীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা-সংবাদের সঙ্গে বসুর সেখানে যাত্রার কথাও ভারতীয় সংবাদপত্রে আনন্দের ও প্রত্যাশার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল।৩৭

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা স্বামীজীর সঙ্গে বসুর যোগাযোগের বিষয়ে কোনো সংবাদ দিইনি। উভয়ের মধ্যে প্রথম পরিচয় কবে হয় তা বলা কঠিন, ১৮৯৬-৯৭ সালে ইংলণ্ডে থাকাকালে তা ঘটতে পারে, নাও পারে, কিন্তু ১৮৯৭-৯৮ সালে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা স্বামীজীর উক্তিতেই আছে।

১৮৯৮-এর শেষে নিবেদিতার সঙ্গে ব্রাহ্মদের যখন পরিচয় ঘটে, তখন স্বামীজী তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উৎসাহ দেন। সেজন্য নিবেদিতার পক্ষে ব্রাহ্ম জগদীশচন্দ্র ও তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে সৌহার্দ্যস্থাপনে অসুবিধা হয়নি। এই যোগাযোগকালে নিবেদিতা একদিকে জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত আচরণের সৌন্দর্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিভার

৩৭ যথা মরাঠা পত্রিকায় :

"We learn from the *Amrita Bazar Patrika* that the State Secretary for India has, at the request of the Government of India, sanctioned the deputation of Professor J. C. Bose to attend the International Congress of Physicists to be held in Paris and also the meeting of the British Association, to enable him to lay before the scientific public in Europe certain discoveries made by him."

[*Mahratta*, July 8, 1900. *VIN*, 388]

বসুকে ইউরোপে পাঠানোর ব্যাপারে বাংলার লেফট্ন্যাণ্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন কিছু ইচ্ছা বোধ করেছিলেন বলেই তাঁর 'ডেপুটেশন' পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। নচেৎ তৎকালীন শিক্ষা-বিভাগের নীচ ঈর্ষাকাতর কিছু ইংরাজ কর্মচারী সর্বপ্রকারে বসুর কর্মজীবনে বাধাসৃষ্টি ক'রে চলেছিল, যারা কদাপি চায়নি—কোনো ভারতীয় বিশ্ব-বৈজ্ঞানিকের মর্যাদা পান। এই কাহিনী আমি বিস্তারিত লিখেছি "নিবেদিতা লোকমাতা" গ্রন্থে (১ম খণ্ড)। প্রকাশিতব্য *Letters of Nivedita* গ্রন্থেও প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হবে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একমাত্র বসুকে নির্বাচন ক'রে পাঠানো একটা বিরাট সম্মানের বিষয় বলে বেঙ্গলী মন্তব্য করেছিল :

"...That Dr. Bose should have been selected among the scientists in India to represent the Government is a great and signal honour done to him."

[*Bengalee*, June 30, 1900]

বিরাটত্বে মোহিত হন, অন্যদিকে ধর্মধারণার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডীবদ্ধতার রূপও দেখেন। [বিষয়টি নিয়ে "নিবেদিতা লোকমাতা" (১ম খণ্ড) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা আছে]। বসু বলেছিলেন, ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে শিহরিত হন, কারণ স্বামীজী ঘোষণা করেন, তাঁর জীবনোদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে পৌরুষ জাগানো। বসু চমৎকৃত হয়ে দেখেন, সত্যের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য স্বামীজী তাঁর বিরাট জনপ্রিয়তাকে টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে যখন তিনি দেখলেন, সেই একই মানুষ নিজ গুরুর পূজায় এবং কালীপূজায় উৎসাহ দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন জগদীশচন্দ্রের কাছে "সংকীর্ণ ছাঁচে গড়া একটি মানুষ, যিনি নারীকে প্রায় শয়তানী মনে করতেন, সে-কারণে নারী দেখলে মূর্চ্ছা যেতেন।" নিবেদিতার কাছ থেকে বসুর এইসব অযৌক্তিক কথা শুনে স্বামীজী হেসেছিলেন। "অথচ উক্ত বালক [অর্থাৎ বসু] আমাকে তিন দিন ধরে প্রায় অর্চনা করেছে"—স্বামীজী বলেছিলেন। নিবেদিতা নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তা স্বীকার ক'রে বলেন, "হ্যাঁ উনি সত্যই আপনাকে অর্চনা করেন।" স্বামীজী যোগ করেন : "আর এইসব মানুষই ব্যক্তিপূজো নিয়ে হৈ-চৈ ফেলে দেয়।" স্বামীজী এইকালে একবার বসুর সন্ন্যাসবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে ঝলসে উঠে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "ওঁকে বলো, যদি বিরাট আকারের কোনো ত্যাগ না করেন তাহলে সত্যকার শক্তিশালী পুরুষ হবেন না।"

এইভাবে দেখা যায়, স্বামীজীর বিষয়ে এই পর্বে বসুর মিশ্র অনুভূতি। স্তুতির সঙ্গে সমালোচনার সহাবস্থান। তখনো উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ কোনো পরিচয় ঘটেনি। তা ঘটল ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে। সেখানে বসুর সাফল্যের প্রত্যক্ষদর্শী বিবেকানন্দ আবেগে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এই আবেগ বোধ করবার জন্য বসুর সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না—বসুর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বই যথেষ্ট ছিল—যে-কৃতিত্ব বিবেকানন্দের প্রিয়তম একটি স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। আমরা দেখি, এই ঘটনার অল্প আগেও বসু, আমেরিকায় বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে নিবেদিতার মতসংঘর্ষের কথা রবীন্দ্রনাথকে রীতিমতো ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লিখে পাঠিয়েছেন [নিবেদিতা ও বিপিন পালের মতসংঘর্ষের অন্যতম হেতু—জাতীয় জীবনে বিবেকানন্দের ভূমিকা নিয়ে উভয়ের ধারণার পার্থক্য]। উক্ত পত্রশেষে বসু তির্যকভাবে বলেন, "যাহা হউক এরূপ অসাধারণ ভক্তি দুর্লভ।" স্বামীজী এসব বিষয় জানলেও জানতে পারেন, কিন্তু তার জন্য বসুর প্রতি তাঁর সমাদরের হেরফের ঘটেনি। তিনি প্যারিস কংগ্রেসের পূর্বেও বসুর গবেষণা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন এবং তাঁর খবরাখবর নিয়েছেন [মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, চিঠি]। নিবেদিতাকে বসু খবরাখবর দিয়ে যে-চিঠি লিখেছেন, তা স্বামীজীকে নিবেদিতা পাঠিয়েছেন পড়ার জন্য [একই জনকে নিবেদিতার চিঠি, ১৩ জানুয়ারি, ১৯০০]। প্যারিস কংগ্রেসের আগেই, স্বামীজী ১৭ জুন, ১৯০০, মেরী হেলকে লিখেছিলেন : "তুমি খুবই ভুল করবে যদি মনে করো—হিন্দুরা বসুদের পরিত্যাগ করেছে। ইংরেজ শাসকরা তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে ও-ধরনের প্রতিভাবিকাশ ঘটুক—ওরা তা চায় না। তাই তারা তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে—সেজন্যই তিনি অন্যত্র যেতে চান।" [এর পিছনের কথা হল, মিসেস ওলি বুল, নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতিরা বসুর জন্য আমেরিকায় উপযুক্ত কর্মসন্ধান করছিলেন। মেরী হেলের ধারণা হয়েছিল, বসুরা ভারতে অপাঙক্তেয় হয়েছেন বলেই এই চাকরির সন্ধান]।

এর কিছুদিন পরেই ঘটল—প্যারিসে পদার্থবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে বসুর অপূর্ব সাফল্যময় পরীক্ষাকার্য। স্বামীজী অবিলম্বে প্যারিস থেকে যা লিখে পাঠালেন, সে কথাগুলি সুপরিচিত। মনে রাখা দরকার, স্বামী বিবেকানন্দের মতো জাতীয় নায়কের মুখ থেকে

নির্গত ঐ কথাগুলির গুরুত্ব সেদিন এদেশে ছিল অপরিসীম। স্বামীজী লেখেন :

"আজ ২৩শে অক্টোবর।...এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসংগম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ-নিজ প্রতিভা-প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন-সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসি, ইংরেজ, ইতালি প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়—বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির—নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস।৩৮ একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী। ধন্য বীর। বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণ-সম্পন্না গেহিনী যে-দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!" [৬—১২৪]৩৯

৩৮ স্বামীজীর লেখায় বা কথায় মাতৃভূমি রূপে বঙ্গভূমির উল্লেখ খুবই কম। তিনি অধিকাংশক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কথাই বলেছেন। উদ্ধৃত অংশে কিন্তু বেশিবার বঙ্গভূমির কথা আছে, যদিও সেইসঙ্গে ভারতভূমিকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে এমন ঘটবার বিশেষ ঐতি-হাসিক কারণ আছে বলেই মনে করি। স্বামীজী ঐকালে ইংরাজ শাসকদের মধ্যে বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যে ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব বর্তমান ছিল—তার প্রতিরোধেই ঐ কথাগুলি বলেছিলেন। জগদীশ-চন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক সাফল্য উক্ত অবজ্ঞার উপযুক্ত উত্তর—একথা সাহেবী কাগজ মাদ্রাজ মেল-এও লেখা হয়েছিল। কয়েক বছর পরে, বাঙালীরা যখন রাজনৈতিক বোমারু হল, তখন দেশী-বিদেশী প্রায় সকলেই স্বীকার করেছিল—মেকলের ঘৃণার লক্ষ্য কাপুরুষ বাঙালী এবার মুখে নয়, বোমার জবাব দিয়েছে। মাদ্রাজ মেলে ২০ নভেম্বর, ১৯০২, বসু-সূত্রে লেখা হয় :

"Perhaps the world has scoffed long enough at the highly educated Bengali. Maccaulay first made the seoff classical. Kipling did much to crystalise the charges against the Bengali by his story... G. W. Steevens, though dead in his youth, is not yet forgiven in certain quarters for some scathing pages condemning the Bengali for his 'merely verbal cleverness'."

অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে, স্যার উইলিয়ম হান্টার বাঙালী চরিত্রের প্রশংসা করেছেন, এবং 'পাঞ্চ' পত্রিকায় বাঙালীদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিরুদ্ধে তিনি আপত্তি করেছেন—এইসব তথ্যের উল্লেখের পরে, মাদ্রাজ মেল বাঙালীদের গুণের তালিকা আরও কিছু বাড়াবার পরে, বাঙালীর পক্ষে সর্বোত্তম গুণপ্রকাশ যেভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটেছে, তার সমাদরপূর্ণ বিবরণ দেয় :

"Science is generally supposed to be as un-Indian a thing as possible. Yet the latest discovery in science, just now occupying the trained intellects of England, and of the Continent, hails from Calcutta. With peculiar and poetic appropriateness, it also comes as a re-inforcement of the old Hindu doctrine of Pantheism."

৩৯ স্বামীজীর লেখার কিছুদিন পর থেকে বসুর প্যারিসে পরীক্ষা-প্রদর্শন এবং পরবর্তী কার্যাবলীর বিষয়ে প্রশস্তিসূচক সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে, তাদের কিছু উল্লেখ ও কিছু সারসংক্ষেপ করা যায়।

রমেশচন্দ্র দত্তের এই প্রসঙ্গে একটি লেখার কিছু অংশ লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকায় ১১ অক্টোবর, ১৯০০, উদ্ধৃত হয়, তার ভাষা ও ভঙ্গি প্রায় স্বামীজীরই অনুরূপ :

"Among the many intellectual achievements of the people of India in this generation, I know of none which are higher and more significant and more

বসুর সাফল্যে স্বামীজীর স্ফূর্তির শেষ ছিল না। ব্যাপারটি নিয়ে তিনি একেবারে বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে পাই : একবার এক বিশিষ্ট মনীষী-সমাবেশে কোনো এক খ্যাতনামা ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের শিষ্য যখন বলেন—তাঁর বিজ্ঞানাচার্য অপুষ্ট লিলি ফুলের বিকাশ সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করছেন—তখন স্বামীজী মহা আনন্দে তাঁকে জানিয়ে দেন—আরে ওটা কিছু নয়; আমাদের বসু-মহাশয়, যে-টবে লিলি ফুলটা রাখা আছে তাকেই নাচিয়ে দেবেন।৪০ রোমা রোলাঁর ডায়েরী থেকে

brilliant than those of Dr. Bose. . Dr. Bose's native genius and inborn spirit of research have vindicated the talent, the fame, and the honour of his country to the face of the civilised world!"

রমেশ দত্ত অতঃপর বর্ণনা করেছিলেন, বসুকে কোন্ বিরূপ পরিবেশ, অর্থকৃচ্ছ্র এবং সরকারী উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে অগ্রসর হতে হয়েছে। বসুর আবিষ্কারগুলির শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে—রমেশ দত্ত বলেছিলেন—সেগুলি যেমন চমকপ্রদ তেমন সরল।

১৯০০, ১৩ অক্টোবর বেঙ্গলীর "লণ্ডন লেটার"-এর মধ্যে বসুর গবেষণা-সংবাদ বেরোয়। একই তারিখে অমৃতবাজার একাধিক সংবাদ দেয় বসু-প্রসঙ্গে। তার একটিতে বিদেশী কাগজ থেকে বসুর প্রশংসার নানা দীর্ঘ উদ্ধৃতি ছিল।

১৯০১, ৩ জুন, অমৃতবাজার রয়াল ইনস্টিটিউশনে বসুর বক্তৃতার সংবাদ দেয়। ১৮ জুনের বেঙ্গলীতে বসু-সংবাদ ছিল। ৩১ জুলাই, একই কাগজে দেখা যায়, লণ্ডনে ভারতীয়দের "সুখ সমিতি" বসুকে তাঁর বৈজ্ঞানিক সাফল্যের জন্য সংবর্ধনা জানিয়েছে—সেখানে উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন দাদাভাই নৌরজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, নিশি সেন প্রভৃতি। বেঙ্গলীর লণ্ডন সংবাদদাতা সংবাদটি পাঠিয়ে, তার সূচনায় লেখেন :

"No one deserves greater honour than Dr. J. C. Bose . He has won renown all over the world... India is proud to possess such a son, for, he lifts her in rank in the comity of nations."

হিন্দু কাগজে বেঙ্গলীর এই সংবাদটি উদ্ধৃত হয়েছিল।

১৯০২, ২৯ জানুয়ারি, বেঙ্গলীতে, বসুর ইংলণ্ডে প্রদর্শিত চমকপ্রদ আবিষ্কারের সংবাদ ছিল। অমৃতবাজারে ১৭ এপ্রিল, ২৮ এপ্রিল, ১০ জুন বসু-সংবাদ আছে। মাদ্রাজ মেল কাগজে কিছু মূল্যবান সংবাদ এই প্রসঙ্গে বেরিয়েছিল। ২০ অগস্টের সংবাদে অধ্যাপক আওয়েস-লিখিত উচ্চ প্রশংসার কিছু অংশ এই :

"Professor Iowes, L.L.D., D.Sc., F.R.S., successor to Professor Huxely at the Royal College of Science...drew attention to the biological importance of Dr. J. C. Bose's latest discovery : 'Professor Bose came as a pioneer, in so far as it was he who first discovered and announced before the Royal Society, in May 1901, that electrical responses are common to animals and the simpler type of plants. It is impossbile for any of us who have not attempted to confirm the experiments of the kind exhibited by Professor Bose, to form the slightest idea of the difficulties which would be set us in the work. The difficulties he has overcome in a marvellous way, and it is a matter of gratification that some of the facts which he discovered and published a year ago, have subsequently been confirmed by a leading English physiologist. Nothing was more striking than the fact that the electrical phenomenon in plants he has discovered are the common property of all living tissues, contractile and non-contractile, of muscle, nerve and of the vegetable cell. We are coming to a time when we shall more than ever realise the truth that organic nature is one in all its forms, that the plant and the animal, that the multi-cellular and unicellular organisms. in all questions relating to the universe at large are bound up functionally and structurally in one. And I venture to say that the facts

পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী আমরা আগেই জানিয়েছি [টাটা-অধ্যায়ে]—স্বামীজী কিভাবে বসুকে রাজনৈতিক কার্যে লিপ্ত না হয়ে বিজ্ঞানসাধনাতে নিরত থাকবার জন্য প্রণোদিত করেছিলেন। ঐ একই অংশে জগদীশচন্দ্র রোমা রোলাঁর কাছে "স্বামীজীর সেই মোহিনীশক্তির কথা বলেছিলেন, যে-মোহিনীশক্তি—জীবনীশক্তি ও বুদ্ধিতে উপচে-পড়া ঐ ব্যক্তিত্ব বিস্তার করতেন।"৪১ ধর্মের নামে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বসু বিবেকানন্দের মতোই গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। বিবেকানন্দের অকাল প্রয়াণ সম্বন্ধে তিনি দুঃখ প্রকাশও করেন।

রোলাঁর সঙ্গে বসুর উল্লিখিত সাক্ষাৎকার হয় রোলাঁর আবাসে, ৯ জুলাই, ১৯২৭। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮, আর এক সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে রোলাঁ লিখেছেন :

"বসু ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দকে জানতেন এবং খুব ভালবাসতেন। বসু বিবেকানন্দের বিস্ময়কর শক্তি ও প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন, 'এই যেমন, বিনয়ের [অর্থাৎ অতিবিনয়ের] আতিশয্য তাঁর ছিল না।' জগদীশচন্দ্রেরও তা নেই। তাঁর এই মূল্য-চেতনা স্বাভাবিক ও ন্যায্য। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা এই চেতনাকে সহমর্মী করে তোলে। উভয়ের সাদৃশ্যের অপর লক্ষণ : বিবেকানন্দ বলতেন, দারিদ্র্য ও ত্যাগের সমর্থন করা যেমন ভালো, তেমনি ভালো ঐশ্বর্য ও রাজকীয় জীবনযাত্রার পক্ষ সমর্থন করাটাও; সব কিছুরই সময় আছে; আজ আমীর, কাল ফকির। জগদীশচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে ঐশ্বর্য, ভোগ, জয়, সক্রিয় ও উচ্ছল শক্তিসমূহের মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন—কিন্তু নিজের জন্য নয়,

Professor Bose has brought before us testify more than ever to the truth of the great generalisation, and that the time is not far off when many problems relating to the great mystery of life will be solved through the study of life-processes in simpler types of plants, and I would add, the hope that Professor Bose may not be long in finding the clue."

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি উপস্থিত করার কারণ—এর মধ্যে বসুর গবেষণার মৌল তত্ত্বের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে। ঔপনিষদিক অন্বয়বোধকেই বসু কার্যতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণীকৃত করছেন, একথা উক্ত বৈজ্ঞানিক প্রকারান্তরে স্বীকার করেছিলেন—এবং মাদ্রাজ মেল—পরিষ্কারভাবে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইতিহাসের একটি পরিহাসের দিকে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় : বসু নিজে যদিও তাঁর গ্রন্থারম্ভে উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করেছেন, এবং তার দ্বারা তিনি যে উক্ত বাণীরই বস্তু-প্রমাণ সন্ধানে ব্যাপৃত তা দেখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বসুর ইদানীন্তন কালের কিছু অবুঝ ভক্তের ধারণায় ঐসব ধর্মীয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বসুর গবেষণাকে যুক্ত করার চেয়ে গর্হিত ব্যাপার আর কিছু নেই। বসুকে পরিমার্জনা করার জন্য তাঁর এইসব অনুরাগীর দরদী প্রয়াস নিঃসন্দেহে সহানুভূতিযোগ্য।

মাদ্রাজ মেল, ২০ নভেম্বর, ১৯০২ তারিখে এক দীর্ঘ রচনায় বসুর গবেষণার বিস্তারিত পরিচয় দেয়। তারও মধ্যে, তিনি যে অদ্বৈততত্ত্বকে প্রমাণসিদ্ধ করছেন, তার স্বীকৃতি ছিল। ঐ লেখায়, কয়েক বৎসর পূর্বে বসু পরীক্ষামূলক বক্তৃতাদির দ্বারা কিভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, এবং তাঁর "ইনভিজিবল্ লাইট" তত্ত্বই যে কিছু পরে মার্কনির সাফল্যময় বেতার আবিষ্কারে পরিণতি পেয়েছিল—তাও বলা হয়। বসু অতঃপর অধিকতর বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর আবিষ্কার মার্কনির তুল্য বাস্তব জগতের উপকার করেনি, চিন্তাজগতেই তার মূল্য,—এইসব কথাও বলা হয়েছিল। শেষে লেখা হয় :

"The creditable, the notable thing is that an Indian scientist should have won a place and a hearing among the foremost European men of science. On the contemplative side, Professor Bose is right in claiming that if he has in any degree reduced the gulf 'between vital and non-vital' the unity thus shown is far-reaching, and marks an epoch in human thought."

ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের জন্য। গান্ধীর তপশ্চর্যায় ও প্রকৃতির মধ্যে বা সরল জীবনে ফিরে যাবার বাণীর প্রতি তাঁর কোনোই সহানুভূতি নেই।...বসু ভারতবর্ষের বৃহৎ শিল্প বিকাশের পক্ষে বললেন। বৃহৎ শিল্পকে আটকাতে ব্যর্থ হয়ে গান্ধীর খদ্দর কেবল জাপানী নকল মাল ডেকে আনার কাজে লাগছে। জাপান এরই মধ্যে পাকা হাতে তৈরী-করা মেকী 'মেড ইন টোকিও' খদ্দরে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেলেছে। বসুর মধ্যে জাতীয় গর্ব—শুধু ভারতীয় নয়, বাঙালী গর্ব—থেকে থেকে বিদ্যুতের মতো ঝলসে-ঝলসে ওঠে। বুঝতে পারা যায়, তাঁর মনের মধ্যে আছে বাঙালী চরিত্রের বীর্যহীনতা এবং অবশ্যই তথাকথিত ভীরুতা সম্পর্কে ইংলন্ডের, বিশেষ ক'রে কিপলিঙ-এর করা দারুণ অপমান। বাংলাদেশে যে বিপুল দৈহিক ও মানসিক ঘুমন্ত শক্তি আছে, তিনি তার সাক্ষ্য দিলেন, কিছু-কিছু দৃষ্টান্তও দিলেন। বললেন, 'একটা জাতকে বীর বা ভীরু—যা বলা হবে, সে তাই হয়।' একথাটা বিবেকানন্দেরও ' যেদিন থেকে বাংলাদেশে নিজের সাহস সম্বন্ধে চেতনা হয়েছে, সেদিন থেকে সেই সাহস সে পেয়েছে। তিনি আমাদের সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক কারণে ফাঁসির আসামীদের কাহিনী বললেন। ফাঁসির হুকুম পাওয়ার পর থেকে, ফাঁসি-হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, তাঁদের যেন বয়স কমে যেত, শরীর ভাল হয়ে যেত। [বসু, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক শক্তি ও সাহসের দীর্ঘ বর্ণনা দেন]।"

রাজযোগের দ্বারা অতিলৌকিক ক্ষমতালাভ হয় কিনা, সে সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন রোলাঁ বসুকে করেছিলেন। পতঞ্জলির সূত্র-অনুসারে রচিত রাজযোগ গ্রন্থে বিবেকানন্দ ঐ ধরনের শক্তির কথা বলেছেন, যা রোলাঁকে বিব্রত করেছিল, কারণ বিবেকানন্দ "শক্তিশালী ও আন্তরিক বুদ্ধির মানুষ।" জগদীশচন্দ্র বলেন; "তাঁর বিশ্বাস, রাজযোগে বিরাট শক্তি-লাভ হয়—কিন্তু এক বিশেষ সীমার বাইরে নয়। অরবিন্দর উচ্চ প্রতিভার প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধা জানিয়েও, বিশ বৎসরের দীর্ঘ নির্জনবাসে তিনি ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যে-অলৌকিক ফলের আশা করছেন, সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র সংশয় প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, যোগের মাধ্যমে যদি এমন অলৌকিক ব্যাপার সম্ভব হত, তাহলে প্রাচীন ঋষিরা কেন তার ব্যবহার করতেন না, বোঝা যায় না।"৪২

বিবেকানন্দ সম্পর্কে যথার্থ ধারণায় উপস্থিত হবার জন্য প্যারিসে বিবেকানন্দকে নিকট থেকে বসুর দেখার প্রয়োজন ছিল। তারপর থেকে বিবেকানন্দ বসুর মনে অত্যুচ্চ শ্রদ্ধার আসনে অবিচল অবস্থিত ছিলেন।

প্যারিস কংগ্রেসের পরে বসু যখন ১৯০০-০২ সালে ইংলন্ডে গবেষণাদির প্রয়োজনে অবস্থান করছিলেন, তখন নানাসূত্রে স্বামীজী সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। সে সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছেন : "প্রায়শঃই বুঝতে পারি, [স্বামীজী সম্পর্কে] এখানে [অর্থাৎ বসুর মধ্যে] গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। এক-এক সময়ে বিমূঢ় হয়ে ভাবি, মূর্তিপূজার ক্ষেত্রেও ধারণার পার্থক্য আছে কি না!" [নিবেদিতার ১৫ নভেম্বর, ১৯০০, চিঠি]। নিবেদিতা এই পর্বে বসুকে বিজ্ঞানের বই লেখায় সাহায্য করেছেন, তা যে "পিতার" অর্থাৎ স্বামীজীর কাজ হিসাবেই তিনি করেছিলেন, বসুর তা বুঝতে বা মানতে অসুবিধা হয়নি। [নিবেদিতার ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০০, চিঠি]। নিবেদিতা বৎসরাধিককাল এই সময়ে বসুর সঙ্গে কাজ করেছেন—যার জন্য তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হচ্ছিল। শ্রীমা সারদাদেবী উৎকণ্ঠিত হয়ে নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠান—তিনি কবে ফিরবেন? অথচ মিসেস বুল ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিরা চাইছিলেন—নিবেদিতা আরও কিছুদিন ইংলন্ডে

থেকে বসুর সঙ্গে বিজ্ঞানের কাজ করুন। স্বামীজী যাতে অনুমতি দেন, সেজন্য তাঁরা তাঁকে চিঠিও লিখেছিলেন। [নিবেদিতার ৭ মার্চ ও ১৫ মার্চ, ১৯০১, চিঠি]। স্বামীজী ৪ এপ্রিল. ১৯০১, নিবেদিতাকে এই বিষয়ে লেখেন :

"মিঃ রমেশ দত্তর কাছ থেকে এইমাত্র একটি চিঠি এসেছে, যাতে তোমার এবং ইংলণ্ডে তোমার কাজের প্রভূত প্রশংসা আছে—এবং আমি যাতে তোমাকে আরও বেশি সময় ইংলণ্ডে থাকার অনুমতি দিই. সেই ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। তোমার সম্বন্ধে এইসব সংবাদ, যা মিঃ দত্ত অনুগ্রহ করে লিখে পাঠিয়েছেন. সেগুলি পড়ে আমার যে আনন্দের সীমা নেই, তা নিশ্চয় বলে বোঝাতে হবে না। ভালভাবে কাজ করার জন্য যতদিন দরকার ততদিন তুমি অবশ্যই থাকতে পারো। য়ুম [মিস ম্যাকলাউড] তোমার সম্বন্ধে মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে কথা বলেছিল—মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছা তুমি চলে এসো। ওটা তোমার প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ—তোমাকে দেখতে তিনি খুবই চান. তাছাড়া আর কিছু নয়।.. মিঃ দত্তর কাছ থেকে তোমার কাজের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি বলে খুশি। তাঁকে নিশ্চয় আত্মীয়সুলভ অন্ধ ভালবাসার দোষ দেওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যেই মিসেস ওলি বুলকে পত্র লিখেছি।"৪৩

একই তারিখে স্বামীজী রমেশচন্দ্র দত্তকে একই প্রসঙ্গে লেখেন :

"সিস্টার নিবেদিতা ইংলণ্ডে যেসব ভালো কাজ করছে. তার সম্বন্ধে আপনার তুল্য মর্যাদাযুক্ত এক মানুষের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তার লেখনীর দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের যে-সেবা হবে বলে আপনি আশাপোষণ করেন—তার সঙ্গে যুক্ত রইল আমার ঐকান্তিক প্রার্থনাও। সে তার বর্তমান কর্মক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে ভারতবর্ষে চলে আসুক, আমার এমন কোনো ইচ্ছাই নেই।

"আপনি আমার কন্যাটিকে স্নেহ-সৌহার্দ্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, এজন্য আমি আপনার কাছে গভীর কৃতজ্ঞ। সে কতদিন ইংলণ্ডে থাকবে এবং কী ধরনের কাজ করে যাবে, সে সম্বন্ধে তাকে ধারাবাহিক উপদেশ দিতে আশাকরি আপনি বিরত হবেন না।"৪৪

বলাবাহুল্য, বসুর বিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ দেশসেবা মনে করেছিলেন বলেই স্বামীজী তাঁর সঙ্গে কাজ করবার জন্য নিবেদিতাকে সানন্দে অনুমতি দেন। এরই ফলে বসু তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের এক অত্যন্ত সংকটপূর্ণ, কিন্তু সৃষ্টিশীল অধ্যায়ে নিবেদিতার কাছ থেকে অপরিসীম মূল্যবান সাহায্য লাভ করেন।

---

৪৩ *Unpublished Letters of Swami Vivekananda. PB,* Aug. 1977, 357.

৪৪ *PB*. Nov. 1978, 471.

উদ্বোধন. ১৫ আষাঢ়, ১৩০৮ (তৃতীয় বর্ষ. দশম সংখ্যা) সংখ্যায় রমেশ দত্ত নিবেদিতার ইংলণ্ডের কাজের প্রশংসা করে পাঠিয়েছেন—এই সংবাদ দেয়।

রমেশ দত্তর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়নি এবং তিনি স্বামীজীর কর্মধারা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, এমন দাবিও তিনি করেননি। কিন্তু নিবেদিতার পত্র থেকে দেখা যায়—নরেন্দ্রনাথ 'দত্ত'-র জন্য 'দত্ত' রমেশচন্দ্র গর্বিত ছিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে তিনি 'সম্ভবতঃ' নিবেদিতাকে লেখা চিঠিতে [ব্রহ্মবাদিন, জুলাই. ১৯০২] এই "teacher of great truths" সম্পর্কে শ্রদ্ধানিবেদন ক'রে বলেন :

"You know how sincerely I appreciated and admired his high patriotism, his genuine belief in the greatness of his country, his manly faith in the future of his countrymen if they are true to themselves. That spirit of self-reliance, that determination to work out our own salvation, that faith in our country and ourselves, that conviction that our future rests in our own hands—are the noblest lessons that we learn from the life of him whose loss we all lament to-day."

১৯০২-এর গোড়ার দিকে নিবেদিতা ভারতে ফিরে আসেন। মাদ্রাজে অবতরণ করেই তিনি বসুর বিজ্ঞানসাধনা সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দেন—স্বামীজীকে তা খুবই তৃপ্তি দেয়। বসু ঐ সময়ে আরও কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডে থেকে গিয়েছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে স্বামীজীর দেহত্যাগ হয়। সে খবর বসুর কাছে পৌঁছলে স্তম্ভিত ও বেদনার্তভাবে তিনি নিবেদিতাকে লিখে পাঠান :

"কী নিদারুণ শূন্যতা এনে দিয়েছে এই মৃত্যু! মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কী সব বিরাট-বিরাট কাজ সম্পন্ন হল! এই সমস্ত কিছুই একজন মানুষ কি ক'রে সম্ভব করতে পারলেন! আর সকলই এখন কিভাবে স্তব্ধ!! কিন্তু তবু, যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়েন, তখন তাঁর নিশ্চয় বিশ্রাম চাই। আমি এখনো যেন তাঁকে ঠিক সেইভাবে দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে দু'বছর আগে প্যারিসে দেখেছি—বিরাট শক্তিধর পুরুষ—বিরাট আশায় পূর্ণ!—তাঁর সবকিছুই বিরাট!

"কী বিপুল বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। এই বিষাদকে যেন অতিক্রম করতে পারি।"৪৫

মিসেস ওলি বুলকে বসু লেখেন :

"হারিয়ে যায় না কিছুই। যে-সকল চিন্তা, কর্ম, সেবা ও আশা সুমহান—তারা মূর্ত হয়ে থাকে তাদের উৎসভূমির ভিতরে ও বাহিরে। আমাদের সমগ্র জীবন কয়েকটি মহা-মুহূর্তের প্রতিধ্বনি—কালের মধ্যে যে-প্রতিধ্বনি চিরদিন অনুরণিত হয়। সেই মহান আত্মা মুক্ত হয়েছে; পৃথিবীতে তাঁর মহা বীরকর্ম এখন সমাপ্ত। সেই কার্য যথার্থতঃ কী—তা অনুভব করবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? একজন মানুষ একাকী কি ক'রে ঐ সকল-কিছু সম্ভব করলেন—তা কি আমরা উপলব্ধি করতে পারব? যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাঁকে ঘুমোতে দাও, সেই ভাল—কিন্তু তাঁর কীর্তি, তাঁর শিক্ষা এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করবে—তাকে জাগিয়ে তুলবে আর শক্তি দেবে।"৪৬

নিবেদিতা তাঁর বিরাট সৃষ্টি 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ'—যাকে তিনি তাঁর হাত দিয়ে স্বামীজীর রচনা মনে করতেন—স্বামীজীর উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা হয়—"*Wah Guruki Fate*," "Victory to the Guru!" জগদীশচন্দ্র নিজের হাতে নিবেদিতার পাণ্ডুলিপিতে কথাগুলি লিখে দিয়েছিলেন—যার অর্থ ঐ কথাগুলি তাঁরও। তারপর, নিবেদিতা যখন আরও কয়েক বৎসর পরে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরে স্বামীজীর মর্মর রিলিফমূর্তি নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং সে সম্পর্কে নানাজনের কাছে লিখে পাঠাচ্ছিলেন, তখন বসু তাগিদ দিয়ে বলেছিলেন—নিবেদিতা যেন সর্বত্র লিখে পাঠান, এটি জাতীয় জীবনের পক্ষে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। [নিবেদিতার ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১১, চিঠি]।

স্বামীজী ও নিবেদিতার প্রভাবে বসুর ধর্মধারণার ক্ষেত্রে মাত্রা-পরিবর্তন ঘটেছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। মূলগত প্রত্যয়ের পরিবর্তনের কথা অবশ্য বলছি না। বড় কিছু করতে হলে ব্যক্তিজীবনে সন্ন্যাস-আদর্শ গ্রহণের যে-কথা স্বামীজী একদা বসুকে বলেছিলেন—তা যে তিনি গ্রহণ করেন, তা প্যাট্রিক গেডেস তাঁর বসু-জীবনীতে পরিষ্কার লিখেছেন।৪৭ আমরা এমনও দেখি, বসু, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার গভীরতাকে পূর্ণতরভাবে উপলব্ধি ক'রে,

তার বিরাটত্বের ঘোষণায় ঝলসে উঠেছিলেন। মায়াবতীতে ১৯১১ মে মাসে সপরিবারে বসু অবস্থান করছিলেন, নিবেদিতাও ছিলেন—সেখানে সাধু ব্রহ্মচারীদের কাছে ঘরোয়া বক্তৃতা-কালে নিবেদিতা ধর্মপথের মানুষদের জন্য সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাতে এক ছোকরা ব্রহ্মচারী অত্যুৎসাহে জ্ঞানদান ক'রে বলেন, কিন্তু ঠাকুর তো নিরক্ষর ছিলেন! তা শুনে বসু নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হন। পরে বলেন : "ওরা কি বোঝেনি যে, দিনের পর দিন গঙ্গাতীরে বসে এক হাতে সোনা অন্য হাতে মাটি নিয়ে বদলাবদলি ক'রে, [উভয়ের সমত্ববোধে উপনীত হয়ে] তাদের উভয়কেই গঙ্গাগর্ভে ছুঁড়ে ফেলার অর্থ কি? এই নির্বোধরা কি দেখতে পায় না—মনের কোন্ দারুণ শক্তি ওখানে বর্তমান? ওরা কি জানে না—ঐ শক্তি গণিতে, পদার্থবিদ্যায়, গ্রীক ভাষা শিক্ষায় কিংবা ধর্মে—যেখানেই প্রকাশ পাক, কোনোই পার্থক্য নেই। ওরা কি জানে না—ওই হল শিক্ষার সার বস্তু?" [নিবেদিতার ৯ মে ১৯১১, চিঠি]।

নিবেদিতার একাধিক পত্র থেকে একথা আমরা জেনেছি যে, জগদীশচন্দ্র তাঁর পত্নী অবলা বসুকে নিয়ে উদ্বোধনে এসেছিলেন—এবং অবলা প্রণাম ক'রে এসেছিলেন শ্রীম সারদাকে। নিবেদিতার আবাসে গোপালের মা যখন তাঁর শেষ অসুখের সময়ে ছিলেন, তখন আচার্য বসু সেখানে আসতেন, এবং গোপালের মা তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন। আর শ্রীমতী অবলা গভীর ভক্তির সঙ্গে, নিবেদিতার দেহান্তের পরে লিখিত প্রবন্ধে, এই সিদ্ধ তাপসী নারীর উল্লেখ করেছেন।

বিবেকানন্দের সঙ্গে সৌহার্দ্য এবং তাঁর আন্দোলনের প্রতি অনুরাগের জন্য আচার্য বসু সপরিবারে বেশ কয়েকবার মায়াবতীতে রামকৃষ্ণ মিশনের অদ্বৈত আশ্রমে গেছেন—সঙ্গে ছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতার দেহান্তের পরেও সেখানে গেছেন।৪৮ কেবল তিনি নন, তাঁর নিকট কুটুম্ব বিখ্যাত আনন্দমোহন বসুও মায়াবতী গেছেন—এবং স্বামীজীর সময়েই। স্বামীজী খুশি হয়ে সিস্টার ক্রিস্টিনকে ১৪ জুন, ১৯০২, লিখেছিলেন, "মি: [আনন্দমোহন] বসু আশাকরি এখনো ওখানে আছেন, এবং তুমি নিশ্চয়ই তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করছ। যথার্থ মানুষ তিনি, প্রস্তরবৎ দৃঢ় স্থির।"৪৯ স্বামীজী কদাপি ভোলেন নি—প্রথমবার পাশ্চাত্ত্য থেকে তিনি যখন ফিরেছিলেন তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি এই

৪৮ বসুর নিয়মিত মায়াবতী গমন সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমি 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে দিয়েছি। তার মধ্যে আছে : ১৯০৪ গ্রীষ্মে বসুরা নিবেদিতার সঙ্গে মায়াবতী যান—সেখানে "প্ল্যাণ্ট রেস্পনস্" গ্রন্থের কাজ পুরোদমে চলে। ১৯০৭ এবং ১৯১১ গ্রীষ্মেও সেখানে তাঁরা গেছেন। নিবেদিতার মৃত্যুর পরেও বসুরা সেখানে গেছেন। এখানে উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারতে বসুর যত সংবাদ বেরিয়েছে, সংঘবহির্ভূত আর কারো বিষয়ে তা বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ। ১৯১১, অগস্ট প্রবুদ্ধ ভারতে—মায়াবতীতে বসুর বক্তৃতার বিবরণ দেবার পরে বলা হয় —মায়াবতীতে আসা এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে অন্ততঃ একটি বক্তৃতা দেওয়া ডাঃ বসুর রীতির মধ্যে পড়ে গেছে। একই পত্রিকার জুন, ১৯১৩ সংখ্যায় লেখা হয় : আমাদের এই আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে ডাঃ বসু খুবই আনন্দবোধ করেন, কারণ এখানে নির্জনতা এবং পূর্ণ অবসরের সুযোগ তিনি পান—সেইসঙ্গে শান্তচিত্তে সুগভীর চিন্তা করতে পারেন। পারিপার্শ্বিকের অপূর্ব নিসর্গ দৃশ্যও তাঁকে মোহিত ক'রে রাখে। জগদীশচন্দ্র বলতেন, মায়াবতীতে থাকলে মাথায় ভাব যেন ধেয়ে আসে, কিন্তু কলকাতায় থাকাকালে সব যেন শুকিয়ে যায়। বসুর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় মায়াবতীতে যে-পথ ধরে তিনি হাঁটতেন—তার নাম দেওয়া হয়েছে— "বসু-পথ।"

৪৯ আনন্দমোহনের দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র প্রবুদ্ধ ভারত (সেপ্টেম্বর ১৯০৬) উচ্চ ভাষায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। ব্রাহ্মসমাজ এবং বাংলাদেশের জন্য আনন্দমোহন কী করেছেন, তা স্মরণ করার পরে, রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কের বিষয়ে লেখা হয় :

আনন্দমোহন বসুই এগিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেন।৫০ সংক্ষেপে বলতে গেলে, কলকাতার বিদ্যা বৈদগ্ধ্য ও প্রতিভায় অলংকৃত যেসব পরিবারের সঙ্গে স্বামীজীর গোষ্ঠীর সর্বাধিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে বসু-পরিবারের নামই সর্বাগ্রে করতে হবে।৫১

॥ ৬ ॥ বিবেকানন্দ ও প্যাট্রিক গেডেস

প্যারিসে এইকালে স্বামীজীর সঙ্গে যেসব বিখ্যাত জ্ঞানী গুণীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে, তাঁদের মধ্যে প্যাট্রিক গেডেস ছিলেন। এঁর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় প্রসঙ্গটি এখানে তুলে আনব—কারণ গেডেসের জীবনের এক পর্ব ভারতবর্ষে কেটেছে, এবং তার মূলে ছিল প্রধানতঃ স্বামীজীর প্রভাব।

প্যাট্রিক গেডেসের কিছু কথা আগে এসেছে। পূর্ব অধ্যায়ে টাটা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধসূত্রে ভাবতের সংবাদপত্রে তাঁর কোন্ পরিচয় বেরিয়েছিল, তা কিছুটা উপস্থিত করেছি। প্রবুদ্ধ ভারতে মে, ১৯৪৮ সংখ্যায় *Patric Geddes and Swami Vivekananda* নামে একটি প্রবন্ধ বেরোয়—যার অন্তর্গত তথ্য সংকলিত হয়েছিল গেডেসের অন্যতম প্রধান জীবনীকার ফিলিপ বোর্ডম্যানের গ্রন্থ থেকে। সেখান থেকে সোসিওলজিস্ট হিসাবে গেডেসের বিরাটত্বের কথা আমরা জানতে পারি।

সুবিখ্যাত জীববিজ্ঞানী টমাস হাক্সলি ছিলেন গেডেসের শিক্ষক; গেডেস ওঁর সেরা ছাত্র। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় জীববিজ্ঞানীরা আশা করতেন, তিনি দ্বিতীয় ডারউইন হয়ে উঠবেন। গেডেস নিজেকে কিন্তু জীববিজ্ঞানের গন্ডীতে আবদ্ধ রাখেন নি। তথাপি জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন তিনি আর্থার টমসনের সহযোগিতায়, দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল, বহু প্রতীক্ষিত গ্রন্থ, "লাইফ : আউটলাইনস্ অব জেনারেল বায়োলজি" প্রকাশ করেন—তখন জুলিয়ান হাক্সলি তার বিষয়ে বলেন, "অভ্রভেদী কান্ড।" আর ইংলন্ডের 'নেশন' পত্রিকায় বলা হয়, এই বই ওয়েলস্ ও জে হাক্সলির বিখ্যাত "সায়েন্স অব লাইফ"-এর তুলনায় অনেক উচ্চস্তরের।

গেডেসের প্রতিভা জীববিজ্ঞানকে অতিক্রম করে আরও অগ্রসর হয়। জুলিয়ান হাক্সলি থেকে তিনি মুখ ফেরান অন্যান্য আচার্যদের দিকে—যথা, স্পেনসার, কোমত্, কার্লাইল, ডিমলিনস্ এবং লা প্লে। গেডেস অতঃপর স্থায়ী সম্পদ রেখে গেছেন—অর্থনৈতিক,

---

"His was the first handshake to welcome Swami Vivekananda to Calcutta, on his return from the West. We recall with sweetness, the most charming days that we, the inmates of the Advaita Ashrama, spent in his amiable company during his sojourn here for some weeks in 1902, and the childlike joy that he felt to be in the midst of the splendid scenery and solitude of our Himalayan retreat."

৫০ *NCW*. V, 259.

৫১ বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে (১৯৫৮) বসুর সঙ্গে স্বামীজীর সুগভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কের কথা উত্থাপন করে, সম্পাদক অমল হোম লেখেন—শ্রীমতী অবলা বসুর কাছ থেকে তিনি একাধিকবার শুনেছেন, "স্বামীজী তাঁর বহির্ভ্রমণের মধ্যকালে তাঁর এই বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলকাতায় আসতেন, এবং বাইরের নানা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলে বসুকে আমোদিত করতেন—আর মহানন্দে পূর্ববঙ্গীয় রান্না খেতেন, খুব ঝাল দেওয়া চাই তাতে—যত ঝাল তাঁর তত স্ফূর্তি। এক বিশেষ আগমনের কথা লেডি বসু স্পষ্ট স্মরণ করতে পারেন : শীতের এক উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায় পুরো ইউরোপীয় পোশাকে, বেলুড় থেকে ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে সোজা হাজির হয়ে কিভাবে তিনি চমকে দিয়েছিলেন।"

সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের নানা দিকে। বলা হয়েছে, এইসকল ভাবরাজি নতুন বিশ্বসভ্যতার ভিত্তিপত্তনের কাজ করবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে গেডেস—অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, জিভনস্, মার্শাল প্রভৃতি প্রাচীনতর অর্থনৈতিকদের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন। বর্তমানে কোনো-কোনো অর্থনৈতিক মহলে যে, অর্থনীতিকে মূলগতভাবে মানবকল্যাণের বিজ্ঞান বলে মনে করা হয়—তাঁদের চিন্তার পিছনে গেডেসের দান আছে।

বিরাট প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও গেডেস প্রচারকে অবজ্ঞা করতেন, গ্রন্থসমুদ্রে ডুবে থাকাই পছন্দ করতেন, স্পেশালাইজেশনের যুগে সিনথিসিস-এর অনুরাগী ছিলেন—তাই পরবর্তীকালে তিনি উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু গেডেস ছিলেন প্রাচীনকালের গুরুদের মতো—সহজ কিন্তু সুগভীর, সস্তা জনপ্রিয়তার প্রতি ঘৃণাযুক্ত। তবু তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দেখা যায়নি তা নয়। তাঁর মৃত্যুর পরে (মৃত্যু ১৭ এপ্রিল, ১৯৩২) বহুদর্শী লেখক ও সমাজবিজ্ঞানী এস কে র‍্যাটক্লিফ লিখেছিলেন : "আমাদের কালে ব্রিটেন যে সামান্য কয়েকটি সংশয়াতীত প্রতিভার জন্ম দিয়েছে—প্যাট্রিক গেডেস তাঁদের অন্যতম।...অপূর্ব অফুরন্ত প্রতিভা; অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ও সুন্দরতম মেজাজ; ভবিষ্যদর্শনের দৃষ্টি-উন্মোচক, কল্পনা-রহস্যের সৃষ্টিকারী।" বোর্ডম্যানের গেডেস-জীবনীর ভূমিকায় লুইস মামফোর্ড লিখেছেন : "গত শতাব্দীর যথার্থ মৌলিক এক মনের অধিকারী—প্যাট্রিক গেডেস। তিনি সেই দার্শনিক যাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁকে অ্যারিস্টটল বা লাইবনিৎস-এর পর্যায়ে উত্তোলন করেছে।"

ভারতবর্ষের সঙ্গে এই বিরাট ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। দুবার তিনি ভারতে আসেন—একবার ১৯১৪ সালে, পরের বার ১৯২৩ সালে—এবং জীবনের এক দশক কাল এদেশে কাটিয়ে তরুণদের মন জ্ঞানের নানা শাখায় চালিত করেন। ভারতে নগর-পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন, এবং ভারতের গোটা তিরিশেক শহর ও নগর সম্বন্ধে প্রায় পনরটি রিপোর্ট তিনি প্রস্তুত করেন, যার মধ্যে তাঁর চিন্তা-ভাবনা গ্রথিত ছিল।

আমরা আরও জানি যে, গেডেসের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় হয়েছিল এবং গেডেস বসুর অনুমোদনে তাঁর জীবনী রচনা করেন—যেটি বসুর ক্লাসিক জীবনীর মর্যাদা পেয়েছে।

গেডেসের জীবনীকার এই যে-সব তথ্য জানিয়েছেন—গেডেসের সুদীর্ঘ ভারতবাস, শিক্ষকতার কাজ, ভারতবর্ষের 'অধ্যাত্ম অদ্বয়বাদের' প্রতি তাঁর সুগভীর আসক্তি—এর উদ্ভব কিভাবে হয়? বোর্ডম্যান উত্তরে জানিয়েছেন—স্বামী বিবেকানন্দই এর মূলে। ১৮৯৩ সালে গেডেস চিকাগোয় তরুণ স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পান—এবং তাঁর শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হন। বোর্ডম্যান, নিবেদিতা ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে গেডেসের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা বলেছেন। নিবেদিতা ১৮৯৮ সালে কলকাতায় মিস ম্যাকলাউডকে বলেছিলেন, "যদি তুমি প্যাট্রিক গেডেস নামক ব্যক্তির কথা শোনো, তাকে অনুসরণ ক'রো। শিষ্যদল সৃষ্টি করতে পারেন—এমন মানুষ তিনি।" মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে গেডেস-দম্পতির অতঃপর যে-পরিচয় হয়, তা—[বোর্ডম্যান জানিয়েছেন]—"এই আমেরিকান মহিলা ও গেডেসদের মধ্যে সুদীর্ঘ বন্ধুত্বের সূচনা করে।"

বিবেকানন্দ ও গেডেসের সম্পর্ক সম্বন্ধে বোর্ডম্যানের রচনার কথায় আসার আগে বলে নেওয়া যায়—নিবেদিতার পত্র থেকে আমরা গেডেসের বহু কথা জানতে পেরেছি। 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে সেসব কথা আমরা উপস্থিত করব। সংক্ষেপে বলি : নিবেদিতার সঙ্গে গেডেসের প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় নিউইয়র্কে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে। নিবেদিতা গেডেসের প্রতিভায় ও চরিত্রে মুগ্ধ হন। তিনি পরে গেডেসের উচ্চ প্রশস্তিসহ এক দীর্ঘ চিঠি স্বামীজীকে লিখে পাঠান (১৩ মার্চ, ১৯০০)—তার মধ্যে

গেডেসের সর্বোত্তম এক গুণপরিচয় আমরা লাভ করি। কিছুদিনের মধ্যে নিবেদিতা স্থির করেন, তিনি প্যারিসে গেডেসের সহকারী হিসাবে কাজ করবেন। গেডেসকে প্যারিস বিশ্ব-মেলায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আন্তর্জাতিক সম্মিলনী সংগঠনের ভার দেওয়া হয়েছিল। নিবেদিতা কিন্তু গেডেসের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন, কারণ প্রচলিত সেক্রেটারির মতো ক'রে অপরের কাজকর্মের হুবহু হিসাব তৈরী করা তাঁর ধাতে ছিল না। গেডেস তাঁর এই অসামর্থ্যে সুখী হতে না পারলেও, ঐ ব্যর্থতার মূলে নিবেদিতার মৌলিক প্রতিভাব স্বাতন্ত্র্য—এটা বুঝে আনন্দিত হয়েছিলেন। আর নিবেদিতাও প্রভূত শিক্ষালাভ করেছিলেন গেডেসের সমাজবিজ্ঞান থেকে। সে ঋণ তিনি অকুণ্ঠে স্বীকার করেছেন তাঁর 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' গ্রন্থের ভূমিকায়। গেডেসের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা এবং সমাজ-মনস্কতার বিষয়ে নিবেদিতা এমনই শ্রদ্ধাপর ছিলেন যে, তাঁকে কলকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ক'রে আনবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। নিবেদিতাই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে গেডেসের পরিচয় ঘটিয়ে দেন, এবং তাঁর রেখে-যাওয়া উপাদান ব্যবহার ক'রে গেডেস জগদীশ-চন্দ্র বসুর জীবনী লেখেন।

বোর্ডম্যান লিখেছেন, ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় স্বামীজীর সঙ্গে গেডেসের প্রথম পরিচয় হয়। এ-বিষয়ে অন্য কোনো সূত্রে সমর্থন আমরা পাইনা। চোখের দেখা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু উভয়ের সত্যকার পরিচয় হয় প্যারিসে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে। তার আগেই নিবেদিতার সূত্রে স্বামীজী গেডেস সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত। প্যারিসে তাঁদের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে ইতি-পূর্বে একাধিকবার বলেছি—স্বামীজী ও তাঁর দলবলকে নিয়ে গেডেস প্রতিদিন প্রদর্শনী দেখাতেন। স্বামীজীর লেখায় দু'একবার গেডেসের পরোক্ষ উল্লেখ আছে।৫২ খেয়ালী কংগ্রেস সম্বন্ধে কৌতুকজনক পত্রে স্বামীজী গেডেসের জটিল সমাজবিজ্ঞান-তত্ত্ব নিয়ে কিছু তামাশাও করেছেন।৫৩

---

৫২ "একজন স্কটল্যাণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় সেদিন বললেন যে, পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র; যে-দেশ যে-পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতিলাভ করবে। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সত্য। কিন্তু এ কথাটাও সত্য যে, যদি কারু কোনো নূতন ভাব এ-জগৎকে দেবার থাকে তো এই পারি হচ্ছে সে প্রচারের স্থান।" [৬—১১৪]

৫৩ স্বামীজীর অনবদ্য সৃষ্টির অন্যতম এই পত্রটি--প্যারিস থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০০, মিসেস লেগেটকে লেখা। এর মধ্যে লেগেট-ভবনে একটি খেয়ালী কংগ্রেসের বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস, প্যাট্রিক গেডেস, মিসেস ওলি বুল, ভগিনী নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড, এবং সূর্যদেবতা ও অগ্নিদেবতার উপাসক জনৈক ভারতীয়। পর্য-বেক্ষকরূপে স্বামীজী তো ছিলেনই। স্বামীজী কৌতুকে ব্যঙ্গে মিলিয়ে এইসব ব্যক্তির বিত্যান বিতর্কের যে-বিবরণ দিয়েছেন, তাতে সেরা রসসাহিত্যের লক্ষণ আছে। [লুই বার্ক অবশ্য মনে করেন—সত্যই এমন কোনো খেয়ালী কংগ্রেস হয়নি, গোটা ব্যাপারটিই স্বামীজীর বানানো, মজা করার জন্য।] স্বামীজী উপস্থিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের আচার-আচরণ ও কথাবার্তার কিছু অতিশয়িত বর্ণনা দিয়ে উচ্চাঙ্গের হিউমারযুক্ত চরিত্র-চিত্রণ করেছেন। আমি কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"...তখন উঠলেন বস্টনের মিসেস বুল। তিনি বোঝাতে শুরু করলেন—নরনারীর সত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে বোধের অভাব থেকে কিভাবে জগতের সকল সমস্যার উৎপত্তি হয়। তিনি বললেন, 'সঠিক মানুষদের মধ্যে যথার্থ বোঝাপড়া—নরনারীর দাম্পত্য-সম্পর্কের আদর্শকে উন্নত রেখে প্রেমের মধ্যে মুক্তি, এবং ঐ মুক্তির মধ্যে মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, পিতৃত্ব, ঈশ্বরত্ব ও স্বাধীনতার সন্ধান—স্বাধীনতার মধ্যে প্রেম এবং প্রেমের মধ্যে স্বাধীনতার দর্শন—এগুলির মধ্যেই আছে সর্ব ব্যাধির একমাত্র ঔষধ।'

"এই কথায় স্কচ প্রতিনিধি [গেডেস] প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন : যেহেতু শিকারী ছাগপালককে তাড়া করেছে, ছাগপালক তাড়া করেছে মেষপালককে, মেষপালক তাড়া করেছে কৃষককে,

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস প্রদর্শনীতে স্বামীজীর সঙ্গে গেডেসের মেলামেশার প্রসঙ্গে বোর্ডম্যান বলেছেন—ঐকালে সেখানে বিশিষ্ট প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন, যেমন জেন অ্যাডমস্, জে আর্থার টমসন, লেস্টার ওয়ার্ড, বেলজিয়ামের সেনেটার লা ফনটেন, ওয়ারশ'র জ্যা ডি বলক্। এঁরা এবং স্বামীজী ইংরাজিতে [?] বক্তৃতা করেছিলেন—ইংলন্ড ও আমেরিকার আরও পঁচিশ জন শিক্ষকও বক্তৃতা করেন।

গেডেসের উপর বিবেকানন্দের প্রভাবের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য বোর্ডম্যান করেছেন :

"বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত শরীর ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার প্রাচ্যরীতি অ্যানা [গেডেস-পত্নী] ও প্যাট্রিকের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, পরে তাঁরা তাঁদের অল্পবয়সী সন্তানদের হাতে সরল রাজযোগ শিক্ষা বই ধরিয়ে দেন—'অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মনের' এবং বাল্যশিক্ষার মূল্যবান অভিজ্ঞতা-রূপে।"

এই সময়ে বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে উপস্থিত গেডেসের যে-বর্ণনা বোর্ডম্যান দিয়েছেন, তাতে গেডেসকে অনুগত শিক্ষার্থীর রূপেই দেখা গেছে :

"১৯০০ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে প্যারিসে স্বামীজীর সঙ্গে এই পুনশ্চ সম্মিলন ভারতবর্ষ ও তার আত্মার বিষয়ে গেডেসের আগ্রহকে আরও গভীর করে তোলে। দশ বছর পরে প্যাট্রিক গেডেস স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থের ফরাসি সংস্করণের ভূমিকা লেখেন। তারও চার বছর পরে তিনি ভারতের অভিমুখে বিশেষ ভাবোদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করলেন—সেখানে যাপন করলেন প্রায় এক দশকের জীবন। গেডেস একদা শিশুদের উপর সিস্টার নিবেদিতার প্রভাবের বিষয়ে যা লিখেছেন, সেকথা বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ও তাঁর উপরে বিবেকানন্দের প্রভাবের বিষয়েও বলা যায়। গেডেস নিবেদিতা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'নিবেদিতা শিশুদের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ধারে মেঝের উপর বসতেন—আর তাদের শোনাতেন হিন্দুধর্মের শিশু কাহিনী ['ক্র্যাডল্ টেলস্ অব হিন্দুইজম']। এমন মোহিনী শক্তির সঙ্গে সেসব কথা বলতেন, যা এমনকি তার উচ্চাঙ্গের লিখিত রূপকেও ছাপিয়ে যেত। এইভাবে তিনি উৎসুক তরুণ মনগুলিকে এমনভাবে ছুঁয়ে যেতেন যে, তারা তাঁকে অনুসরণ ক'রে সুন্দর প্রাচ্য ভূমিতে উপস্থিত হবার স্বপ্ন দেখত'।"

বিবেকানন্দের সঙ্গে নিকট পরিচয়ের পর থেকে গেডেস বিবেকানন্দের ও ভারতবর্ষের হয়ে গিয়েছিলেন। প্যারিসে ও সংযোগের অল্পদিন পরেই মিস ম্যাকলাউড লিখতে পেরেছিলেন (৩০ অক্টোবর, ১৯০১) :

"গেডেসরা!—ওঁরা আমাদেরই। প্রাচ্যদেশে ওঁদের আমরা চাই—একদিন না একদিন।"[৫৪]

॥ ৭ ॥ জুল বোয়া-র বিবেকানন্দ-স্মৃতি

স্বামীজী পরিব্রাজক গ্রন্থে তাঁর ১৯০০ প্যারিস বিবরণে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে এক তরুণ ফরাসি সাহিত্যিকের কথা বলেছেন :

এবং কৃষক তাড়া করেছে জেলেকে—তাড়া ক'রে তাকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে—এক্ষেত্রে এখন আমরা চাই গভীর সমুদ্র থেকে জেলেকে উঠিয়ে এনে কৃষকের উপর ফেলতে, কৃষককে চাই মেষ-পালকের উপর ফেলতে, ইত্যাদি। এমনি করলেই জীবনের জাল সম্পূর্ণ বোনা হবে এবং আমরা সুখী হব।

"ওঁকে ওঁর এই তাড়া-করা ব্যাপারে আর বেশিক্ষণ এগোতে দেওয়া হল না। মুহূর্তের মধ্যে সকলে সোজা দাঁড়িয়ে উঠল এবং আমরা কেবল কতকগুলি বিমিশ্র বিশৃঙ্খল চীৎকার শুনতে পেলাম .." [৮—১৫৯-৬০]

৫৪ *Letters of Nivedita* (in press), 454.

"মসিয়ায় জুল বোওয়া প্রসিদ্ধ লেখক; ধর্মসকলের, কুসংস্কার সকলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারে বিশেষ নিপুণ। মধ্যযুগে ইউরোপে যে-সকল শয়তানপূজা, জাদু, মারণ, উচাটন, ছিটেফোঁটা, তন্ত্রমন্ত্র ছিল, এবং এখনও যা আছে—সে সকল ইতিহাসবদ্ধ করে এ'র এক প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইনি সুকবি, এবং ভিক্তর হ্যুগো, লা মার্টিন প্রভৃতি ফরাসি মহাকবি এবং গ্যেটে, শিলার প্রভৃতি জার্মান মহাকবিদের ভেতর যে ভারতের বেদান্ত ভাব প্রবেশ করেছে, সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে—কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রই দেখছি বেদান্তী; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেদান্ত।... ইনি অতি নিরভিমান, শান্তপ্রকৃতি এবং সাধারণ অবস্থার লোক হলেও অতি যত্ন করে আমায় নিজের বাসায় প্যারিসে রেখেছিলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেছেন।" [৬—১২১]

এই বৃত্তান্তের মধ্যে পরেও বোয়া-র দু'একটা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে।

বিদ্যাত্মানন্দ অথবা লুই বার্ক, যাঁরা স্বামীজীর এই পর্বের কাহিনী লিখেছেন, তাঁরা জানিয়েছেন—স্বামীজীর কালে বোয়া-র লেখকখ্যাতি থাকলেও পরে তিনি ফরাসি দেশের পক্ষে কোনো বড় লেখক হয়ে দাঁড়ান নি, যদিও বিদ্যাত্মানন্দ নিউইয়র্ক টাইমস-এ ৩ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে প্রকাশিত বোয়া-র মৃত্যুসংবাদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানিয়েছেন [প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ, ১৯৭৭]—তিনি সর্বমোট ৪০টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন। আমরা জেনেছি : ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮, মার্সেলিজে বোয়া-র জন্ম, পিতা ফরাসি, ব্যবসায়ী, মাতা স্পেনীয়; অনতিবিংশ বর্ষ থেকে বোয়া প্যারিসবাসী; ১৮৮৪ সাল থেকে গ্রন্থরচনা শুরু করেন, এবং তা অবিরাম ধারায় বয়ে চলে; ১৯১৫ সালে আমেরিকায় যান, এবং জীবনের শেষপর্যন্ত সেখানে কাটান; জীবনের শেষভাগে ক্যাথলিক-মতে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে বোয়া-র কয়েকটি প্রকাশিত, খ্যাত গ্রন্থের নাম লুই বার্ক দিয়েছেন . *Le Satanisme et la magie, avec une étude de J. K. Hysmans* | ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থ, দু'বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়; প্রথম প্রকাশকালে বোয়া-র বয়স, লুই বার্কের মতে, ২৪]; কাব্য নাট্য *Les Noces de Satan*; উপন্যাস *L' E'ternelle Poupée*; এবং রহস্যবাদী পুস্তক *L' Au-dela' et les forces inconnues* ["The next world and unknown forces"; বইটি বৃহৎ এবং সুপ্রচারিত]।

১৯০০, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে স্বামীজী বোয়া-র বাসায় ৪ সপ্তাহ কাটান। প্যারিসের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে একটি বাড়িতে [19, Rue Gazan] ৬ তলার উপরে যে-ফ্ল্যাটে স্বামীজী বোয়া-র, সঙ্গে কাটিয়েছিলেন—তার নিকটে ও দূরে ছিল অপূর্ব নিসর্গদৃশ্য। স্বামীজী বোয়া-কে নিয়ে ব্রিটানিতে গিয়ে কিছুদিন মিস ম্যাকলাউডের আতিথ্য নিয়েছেন। তারপরে ওরিয়েন্ট একস্প্রেসে তিনি বোয়া-র সঙ্গে একত্রে প্যারিস থেকে কনস্টানটিনোপল গেছেন—পরে একত্র বেড়িয়েছেন নিকট প্রাচ্যে। আরও পরে, ১৯০১ সালে বোয়া ভারতে এসে বেলুড়ে স্বামীজীর আতিথ্য নেন।

স্বামীজীর চিঠিপত্রের মধ্যে বোয়া-র কথা কিছু-কিছু আছে, এবং সেগুলি প্রীতি-সূচক। স্বামীজী ১৯০০, সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে বোয়া-র বাসায় গিয়ে ওঠেন। উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ বোধহয় ২৪ অগস্ট, লেগেটদের প্যারিস-ভবনে, যেখানে স্বামীজী একটি ঘরোয়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১ সেপ্টেম্বর তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে লেখেন : "যে ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকব, গতকাল তাঁর বাড়ি দেখে এসেছি। দরিদ্র পণ্ডিত তিনি, ঘরভর্তি বই, ৬ তলায় উপরে ফ্ল্যাটে থাকেন। আমেরিকার মতো এখানে লিফট্ নেই, সুতরাং সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করতে হয়। কিন্তু ওটা আর এখন কষ্টসাধ্য নয়। বাড়িটার চারধারে সুন্দর সাধারণের পার্ক। ভদ্রলোক ইংরেজি বলতে পারেন না। সেটা ওখানে যাবার একটা বিশেষ কারণ—বাধ্য

হয়ে কেবল ফরাসি বলতে হবে। এখন সবই মায়ের ইচ্ছা। তাঁর কাজ তিনিই জানেন। ফুটে তো বলেন না, 'গুম্ হোকে রহতী হ্যায়।' তবে মাঝখান থেকে ধ্যান-জপটা খুব হয়ে যাচ্ছে দেখছি।" [৮—১৫৬]।

বোয়া-র বাড়িতে গিয়ে ওঠার পরে, স্বামীজী সম্ভবতঃ ৮ অক্টোবর, ১৯০০, একটি ফরাসি চিঠিতে লেখেন [মনে হয় : মিস ম্যাকলাউডকে লেখা] যেটি স্বামীজীর প্রথম ফরাসি চিঠি—"এখানে ভারী সুখী আর পরিতৃপ্ত। বহু বছর পরে সেরা সময় পেয়েছি। মঁ বোয়া-র সঙ্গে জীবনযাত্রা পরম তৃপ্তিকর—বইপত্র, শান্তি! আর যেসব জিনিস আমাকে পীড়া দেয়, তাদের অভাব। কিন্তু জানি না, কোন্ নিয়তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।" [৮—১৬১]। ১৪ অক্টোবর সিস্টার ক্রিস্টিনকে লেখা স্বামীজীর ফরাসি চিঠি থেকে জানতে পারি, উভয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আগে থেকেই বোয়া স্বামীজীর বিষয়ে কেবল আগ্রহী নন, স্বামীজীর লেখা অনুবাদ পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন।—

"আমি জুল বোয়া নামক প্রখ্যাত ফরাসি লেখকের সঙ্গে অবস্থান করছি। আমি তাঁর অতিথি। লিখে জীবিকা অর্জন করতে হয় বলে তিনি ধনী নন—কিন্তু আমাদের উভয়ের মধ্যে অনেক বৃহৎ ভাবের ক্ষেত্রে ঐক্য আছে, এবং আমরা পরস্পরের সাহচর্যে বেশ আনন্দে আছি।

"বছর কয়েক আগে তিনি আমাকে আবিষ্কার করেন, আমার কয়েকটি পুস্তিকা ইতিমধ্যেই ফরাসিতে অনুবাদ করে ফেলেছেন। আমরা দু'জনেই শেষ পর্যন্ত আমাদের সন্ধানের বস্তুকে পেয়ে যাব, কি বলো?" [৮—১৬২]

বোয়া ভারতে এসেছিলেন। তাঁর কলকাতায় আসার সম্ভাবনার কথা জেনে স্বামীজী ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯০১, মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন, "বোয়া কলকাতা আসছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁকে অবিলম্বে মঠে পাঠিয়ে দেবে। আমি এখানেই থাকব। যদি সম্ভব হয় তাঁকে এখানে কয়েকদিন আটকে রাখব- তারপর আবার নেপালে যাবার জন্য ছেড়ে দেব।" [৮—১৭৮] চার মাস পরে, ১৪ জুন স্বামীজী একই জনকে লেখেন : "নেপালে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে বোয়া লাহোর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কাগজে দেখলাম, গরম সহ্য করতে না পেরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপর জাহাজে নিরাপদ সমুদ্রযাত্রা। মঠে আমাদের দেখাসাক্ষাতের পরে তিনি আমাকে এক ছত্রও লেখেননি।" [৮—১২৫]।

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, বোয়া-র সঙ্গে স্বামীজীর রীতিমতো জানাশোনা হয়েছিল এবং বোয়া বেশ কিছুদিন স্বামীজীর নিকট সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। স্বামীজী সম্পর্কে বোয়া-র কী ধারণা হয়েছিল? তাঁর কিছু স্মৃতিকথামূলক রচনা থেকে সে ধারণার রূপ আমরা সরাসরি উপস্থিত করব। তার আগে বলে নিতে চাই, ব্যক্তিজীবনে বোয়া মোটেই সাধুসন্ত ছিলেন না। সেকালীন অনেক ফরাসি লেখকের মতো তিনিও নৈতিকতা নিয়ে ব্যস্ত হতেন না, উদারতার সঙ্গে নীচতা তাঁর চরিত্রে যথেষ্টই ছিল। যে-বিবেকানন্দকে তিনি নিজের আচার্য বিবেচনা করতেন, তাঁকেই প্রলুব্ধ করবার জন্য তিনি মাদাম কালভেকে প্ররোচিত করেন। তাঁর এই নষ্ট বুদ্ধির জন্য মিস ম্যাকলাউড তাঁকে কদাপি ক্ষমা করেন নি। রোলাঁ ১৬ মে, ১৯২৭, ডায়েরিতে লিখেছেন : "ফ্রান্স সফর সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিদারুণ বিরক্তিভরে মিস ম্যাকলাউড জুল বোয়া-র নীচতার কথা বললেন; বিবেকানন্দকে প্রলুব্ধ করবার জন্য তিনি কায়দা করে এমা কালভেকে উত্তেজিত করেছিলেন। কিন্তু অতি মর্যাদাময়ী এমা কালভে এই বলে তাঁকে ধমক দিয়েছিলেন যে, বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, তাঁর মধ্যে ঈশ্বর আছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা করি।" ['দিনপঞ্জী', ২০৩]।

বোয়া দীর্ঘদিন ধর্মীয় উদারতার চর্চা ক'রে, জীবনের শেষ পর্যায়ে পারিবারিক ক্যাথলিক মতে প্রত্যাবর্তন করেন। এটা তিনি হৃদয়ের আবেগে কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে করে-

ছিলেন, আমরা জানি না। ক্যাথলিক-মতে প্রত্যাবর্তন করার পরে, যথারীতি পাপস্খালনের ভঙ্গিতে, পূর্ব-মতের প্রতি আক্রমণ করেন। মিশনারি-রীতিতে বলেন, খ্রীস্টধর্মের তুলা কোনো ধর্ম নেই, অন্য মতের সঙ্গে তাকে একাসনে বসানো উচিত নয়। আমেরিকার এক বিখ্যাত মাসিকপত্র "ফোরাম"-এর মার্চ, ১৯২৭ সংখ্যায় আমেরিকায় অ-খ্রীস্টান ধর্মবিষয়ে লেখার সময়ে ঐসব কথা তিনি বলেন। আমেরিকায় বহিরাগত ধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে পাদরি-সুলভ আশঙ্কা তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছিল। প্রবুদ্ধ ভারতের তৎকালীন সুপণ্ডিত সম্পাদক তাঁর এই বক্তব্যের সুদৃঢ় যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেছিলেন ["A French Critic on the Vedanta Movement", PB, May 1927, 219-29]। বোয়া, রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকান শাখাগুলি এবং সেখানকার সন্ন্যাসীদের বিষয়ে যথেষ্ট শ্রদ্ধার ও প্রশংসার সঙ্গে অবশ্য মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে জানান, [বলা উচিত, **সেইজন্যই** জানান]: "আমি দেখছি যে, সংবিশ্বাসসম্পন্ন [আমেরিকান] নরনারী, যাঁরা নিজেদের খাঁটি খ্রীস্টান বলে মনে করেন, কিন্তু বর্তমান সময়ে যথেষ্ট প্রচলিত বেদান্তধর্মের এই প্রতিপাদ্যকে বিশ্বাস করেন—সকল ধর্মই সমমূল্যের—তখন আমি তাঁদের সতর্ক ক'রে এইকথা জানানো কর্তব্য বোধ করি : বুদ্ধ, কৃষ্ণ, জরথুস্ত্র, মহম্মদ প্রভৃতির মধ্যে অন্যতম অবতাররূপে যীশুখ্রীস্টকে স্থাপন ক'রে, তাঁর উপরে অজস্র প্রশস্তি বর্ষণ করলেও- সে বস্তু খ্রীস্টধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। যদি তাঁরা খাঁটি খ্রীস্টান থাকতে চান, তাহলে তাঁদের বিশ্বাস করতেই হবে, ব্রাউনিং যে-কথা বলেছেন, খ্রীস্ট হলেন 'the Son of God and the very God'. এই মতের বাইরে পদক্ষেপ করলেই আমরা ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে পা বাড়াব।"৫৫

বোয়া-র খ্রীস্টধর্মের প্রতি তীব্র অনুরাগকে স্বামীজী নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাতেন, (স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পঁচিশ বৎসরের পরে যদিও বোয়া-র ওহেন ভাবোদয় হয়েছিল) কিন্তু হয়ত বেদনার সঙ্গে ভাবতে পারতেন—অন্য ধর্মের সত্যকে স্বীকার করেও কি নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ অনুরাগ রক্ষা করার অবস্থায় পৃথিবী কোনোদিন আসবে না? নচেৎ বোয়া-র খ্রীস্টধর্মানুরাগের জন্য তাঁর দুঃখের কোনো কারণ থাকতে পারে না, যেহেতু তাঁর বেদান্তের উদ্দেশ্য—হিন্দুকে আরও বড হিন্দু করা, মুসলমানকে আরও বড মুসলমান করা, খ্রীস্টানকে আরও বড় খ্রীস্টান করা।

যে রচনাতে বোয়া বেদান্ত-বিরোধিতা করেছেন, তার মধ্যেও দৃষ্টিদাতা বিবেকানন্দকে নমস্কার করা আছে :

৫৫ জুল বোয়া খুবই অনিশ্চিত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ভারত ত্যাগের পরে ফ্রান্সে ফিরেই তিনি অকস্মাৎ ভারতে বৃটিশ শাসনকে লম্বা-চওড়া সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন। মাদ্রাজ মেলে ২১ অক্টোবর, ১৯০০, সংবাদে অন্ততঃ তাই দেখা যায়। বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে এইকালে স্বামীজীর তিক্ততম মনোভাব। সেকথা জেনেই কি তিনি বেলুড় থেকে বিদায় নেবার পরে স্বামীজীকে কোনো চিঠিপত্র লেখেন নি? কিংবা স্বামীজী সম্পর্কে শাসক-সম্প্রদায় তাঁকে সতর্ক করেছিলেন? যাই হোক সংবাদটি এই :

"M. Jules Bois, who has just returned to France after a long stay in India, with Pierre Loti, has been defending our rule with an enthusiasm as gratifying as is unexpected. He said that the British 'barbarians' are liked and respected by the natives, who are perfectly satisfied. The British have done everything humanly possible to better the lot and further the education of the native, who, recognizing that he must always be subject to some great nation, prefers that the British should be that nation. In the event of a Russian invasion, says M. Bois, the whole of Northern India would rise as one man to fight, and, if need be to die for the sake of the British." [*Madras Mail*, Aug. 21, 1901]

"বিবেকানন্দের কাছে মানবীয় জ্ঞানালোকের জন্য আমি সবিশেষ ঋণী। মাসের পর মাস তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছি আমি। আমার বিরল সৌভাগ্য, একদেহে মার্কাস অরেলিয়াস, এপিকটিটাস এবং সম্ভবতঃ বুদ্ধকে দর্শন করার সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি। উল্টোপক্ষে খ্রীস্টীয় সত্যের গভীরতর অর্চনার সুযোগের জন্যও তাঁর কাছে আমি ঋণী। দুর্মোচ্য যবনিকাকে কেবল মনঃশক্তিতে ছিন্ন করার চেষ্টা আমরা করেছি—সেই প্রয়াস-কালে আমি নিত্যবস্তুর সম্মুখীন হবার ক্ষেত্রে মানবিক যুক্তির অসম্পূর্ণতাকে অনুভব করেছি। স্টয়িক মত যত শৌর্যাত্মক হোক না কেন, হতাশাই তার পরিণতি। আমার জননী শৈশবে যে-কথা মৃদুস্বরে আমার কাণে শুনিয়েছিলেন,—তার অন্তর্গত সহজ বিশ্বাস, ঘনিষ্ঠ ভালবাসার মধ্যে অনেক বেশি বাস্তব জ্ঞান রয়েছে—যা কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিদের নির্দেশ-বাণীতেও নেই।"

অর্থাৎ জ্ঞানের পথ অবলম্বন করতে গিয়ে যে-ব্যক্তিগত ব্যর্থতা জুল বোয়া বোধ করে ছিলেন, তারই দায় তিনি অন্য জ্ঞানবাদীদের উপরে চাপাবার চেষ্টা করেছেন। নিজ মনের সীমাবদ্ধতার চূড়ান্ত প্রমাণ তিনি দিয়েছেন যখন বুদ্ধ বা বিবেকানন্দ যে-পথে দুর্মোচ্য যবনিকাকে ছিন্ন করেছিলেন—সেই পথকে এক কথায় ত্যাজ্য বলে বাতিল করেছেন।

সংকীর্ণ ধর্মমতকে আশ্রয় ক'রে বোয়া বিবেকানন্দের মতকে অগ্রাহ্য কবতে চেষ্টা করলেও, ব্যক্তি বিবেকানন্দ তাঁর কাছে সর্বদাই চরম এক মানবপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান। বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে রচিত এক গভীর কবিতায় বিবেকানন্দের ললাটের জ্ঞানজ্যোতি, নয়নের পবিত্রতার দ্যুতি, অপূর্ব উন্মাদনার অগ্নিতাপের কথা বলেছিলেন। দীক্ষাদাতা প্রবর্তক তিনি, সন্ধ্যার মধুরিমা তাঁতে; তিনি সেই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ—যিনি পরিশুদ্ধ আদর্শের কথাই কেবল ঘোষণা করেছেন। বিবেকানন্দকে ভ্রাতা এবং আচার্যরূপে সম্বোধন ক'রে, গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বোয়া বলেছেন : বিবেকানন্দের ধ্রুব-হৃদয় ও কণ্ঠোৎসারিত মহাসংগীতের ভিতর থেকে তিনি আহরণ করেছেন প্রকাণ্ড অনিবার্য শক্তি, যা পার্থিবতাকে ঘৃণা করতে কিন্তু পৃথিবীকে ভালবাসতে শিখিয়েছে।

To A Sage

(To the memory of Swami Vivekananda)

The angels of Vinci turn away, jealous,
So much infinite science irradiates around your brow.
Purity meditates within your eyes where fools see madness.
You have never partaken of the vile things of life,
For, you pass amidst the crowd, by them uncontaminated,
Dreaming of Sin only that you may subjugate it.
You the initiator, sweet like Evening,
O my fervour unique, O brother, O master,
You the prophet who proclaimed solely the Ideal,
Hail to you ! my thanks ! for, I drew from your sidereal heart
And from your songs, the august strength, indispensable,
In order to scorn the world, yet to love the earth".৫৬

স্বামীজীর সঙ্গে দীর্ঘ মেলামেশার ফলে তাঁর কাছ থেকে জুল বোয়া বৃটিশ শাসনের যে-ছবি পেয়েছিলেন নির্ঘাত তাকে ঝেড়ে ফেলতেই মনে হয় তাঁর এই ধরনের আক্রোশপূর্ণ বৃটিশ-স্তুতি। কি জানি!

৫৬ *PB*, March, 1925.

১৯০৩ সালে [অর্থাৎ স্বামীজীর দেহত্যাগের অল্প পরেই] প্রকাশিত হয় বোয়া-র *L'Exstase* [The Ecstasy] গ্রন্থ, যার অষ্টম অধ্যায় *Visions de l'Inde*-এর মধ্যে তিনি ১৯০১ সালে বেলুড়ে আগমনের কথা বলেছেন। আর ফোরাম-এর পূর্বকথিত প্রবন্ধে রয়েছে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও পরবর্তী সাহচর্যের কথা। এই দুটি লেখার অংশ কালানুক্রমিকভাবে পুনর্বিন্যাস ক'রে দিচ্ছি। বোয়া লিখেছেন :

"চিকাগোর যখন ধর্মমহাসভা চলছিল তখন প্যারিসে বসেই তার আলোচনার বিষয়গুলি আমি আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করছিলাম। তখন তরুণ হিন্দু প্রফেটের সর্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধে ঘোষণা আমার সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সুগভীর রস উক্তি—তথাপি স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ—ঐ ধরনের উক্তি সাধারণতঃ যে-প্রকার বর্ণহীন, প্রাণহীন হয়ে থাকে, একেবারেই সে ধরনের নয়। কথাগুলিতে প্রতিভার নিশ্চিত মুদ্রণ। কথাগুলি আমার মনে বর্তমান ছিলই—এমন সময়ে আমি উক্ত স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর এক ধনী আমেরিকান বন্ধুর [মিঃ ও মিসেস লেগেট] প্যারিসের বাড়িতে মিলিত হবার নিমন্ত্রণ পেলাম।

"ঘরোয়া আলোচনা-সভা শেষ হবার পরে, বিবেকানন্দ আমার কাছে এমনভাবে এসে কথা বলতে শুরু করলেন যাতে মনে হতে পারে, আমরা যেন পরস্পরকে দীর্ঘদিন ধরে চিনি। সংক্ষিপ্ত কথাবার্তার শেষে তিনি আমাকে চমকে দিয়ে প্রস্তাব করলেন—আমার বাড়িতে এসে থাকতে চান। তাঁর প্রস্তাব আমাকে সম্মানিত করেছে—একথা বলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম—এখানে তিনি কত বিলাস-বৈভবের পরিবেষ্টনীতে আছেন, সেইসঙ্গে কত না মনোযোগ ও আকর্ষণের মানুষ!—আর সেখানে, তরুণ লেখক আমি—তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রায় কোনো ব্যবস্থাই করতে পারব না।

"'আমি সাধু ফকির', তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি মাটিতে বা মেঝেয় শুতে অভ্যস্ত। আচার্যদের জ্ঞানসম্পদই হবে আমাদের বিলাসদ্রব্য। আমি আমার পাইপটিকে নিয়ে যাব; তার সুগন্ধি ধূমের ভিতর থেকে জেগে উঠবে বেদ ও উপনিষদের স্তোত্র।' [এই কথা বলার সময়ে অবশ্যই কৌতুকে স্বামীজীর চোখ ঝিকিয়ে উঠেছিল]।

"পরদিন [বস্তুতঃ কয়েকদিন পরে] স্বামীজী একটি ছোট ব্যাগ নিয়ে হাজির হলেন।

"তাঁর মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞা যেন আমার কাছে বাঙ্ময় হয়ে উঠল। প্রাচ্যের প্রাচীন রীতিতে—মৌখিক শিক্ষা পুথির শিক্ষার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ক্ষেত্রে যেখানে 'ছাত্র'—এশিয়াবাসীর কাছে সেখানে 'শিষ্য।' প্রাচ্যের বিশ্বাস, হৃদয়ের রহস্য যেমন অনুকূল ক্ষণেই উদ্‌ঘাটন করতে হয়, তেমনি জ্ঞানের সঞ্চারের জন্য উপযুক্ত ক্ষণ প্রয়োজন।

"ঐ সময়ে আমি রু গাজান-এ বাস করছিলাম—যার সামনে ছিল মণ্টসৌরি পার্ক। শহরের কর্ম-কোলাহল থেকে দূরে আমাদের জীবনধারা বয়ে যেত অবিচলিত প্রশান্তি এবং প্রায়-নির্জনতার মধ্যে। বারান্দা থেকে দেখা যেত দূরে উজ্জ্বল সূর্যস্নাত পাহাড়, উপত্যকা, কৃত্রিম হ্রদ—যেন ক্ষুদ্রাকার এক সুইজারল্যান্ড। দিনের শেষে, কাজকর্ম সাঙ্গ ক'রে যখন ফিরে আসতাম তখন বিবেকানন্দকে যাবার আগে যেখানে দেখে গিয়েছিলাম, সেইখানেই উপবিষ্ট দেখতাম, নড়াচড়া প্রায় করেছেন কিনা সন্দেহ, যা করেছেন তা হল—প্রচুর ধূমপান আর প্রভূত ধ্যান। এই শৈব সন্ন্যাসী পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরিভ্রমণ ক'রে তাঁর ভয়ঙ্কর কিন্তু সুমোহন দর্শন প্রচার করেছেন—যা এই বাহ্য পৃথিবী এবং আমাদের ব্যক্তিস্বরূপের মায়ারূপের কথা ঘোষণা করেছে—জীব ও জগতের বহু-ব্যক্ত রূপের অন্তরালে রয়েছে এক অদ্বয় সত্য—ব্রহ্ম। দর্শন এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাদকতায় ভরা অপূর্ব সেই সন্ধ্যাগুলি। নবোদ্‌গত পুষ্পের সৌগন্ধ, আর গম্ভীর হিন্দু স্তোত্র-গান; প্যারিসের বাসন্তী রাত্রে গঙ্গার বায়ুপ্রবাহ; আকাশে তারকার আচ্ছন্ন দ্যুতি, আর উপবিষ্ট প্রাচীন ভারতের বার্তাবহ; মস্তকে তাঁর জ্যোতির্বলয়তুল্য পুঞ্জ-কেশ, মহা মহিমার অবয়ব, বিশাল নয়ন,

কখনো তা আয়ত উন্মুক্ত, কখনো স্ফীত অক্ষিপত্রে অর্ধাবৃত; হিমালয়ের বুদ্ধ, যেন সেইন নদীতটের এক শহরতলিতে স্থানান্তরিত। ফকির আর ক্ষ্যাপা-পাগলদের ভারত নয়—তাঁর ভারত সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞার আশ্চর্য পৃথিবী। স্মরণাতীত কাল ধরে যে পঞ্চ যোগ গুরু থেকে চেলায় সঞ্চারিত হয়েছে—তাই যেন আবার উন্মোচিত হল—এবার এক তরুণ ফরাসি কবির কাছে—উন্মোচিত হল, প্রথমে নিজ আত্মার সঙ্গে, পরে ঈশ্বরের সঙ্গে, সাক্ষাৎকারের পদ্ধতি।

"এই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিব সামান্য বিবরণ দিতে গেলেও দীর্ঘ স্থান লাগবে। সামান্য কয়েক জনই তা পেতে সমর্থ। এখানে আমি ঐ আচার্যের মানবিক দিকটির উপরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিবেকানন্দ তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের বিশ্বস্ত শিষ্য। বিবেকানন্দের যৌবনে এঁরই মূলগত প্রভাব। প্রাচ্যবিদ্‌গণের শিরোমণি ম্যাক্সমূলার রামকৃষ্ণকে 'যথার্থ মহাত্মা' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। যথার্থ সে অভিধা—ভেলকিবাজির উপর যাঁদেব খ্যাতি নির্ভরশীল তেমন মেকী মহাত্মাদেব থেকে রামকৃষ্ণ একেবারে স্বতন্ত্র। তাঁর জাতির এই শেষ শ্রেষ্ঠ ঋষির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করার সময়ে বিবেকানন্দ গভীর ভাবাবেগে আপ্লুত ছিলেন।.. দীর্ঘ নীরবতার পবে আমার সঙ্গী এমন স্বরে অতঃপর বলতে লাগলেন যা প্রায় ফিসফিসানির রূপ ধারণ করল: 'তিনি আমাকে বলতেন বিবেকানন্দ (বিবেকের আনন্দ); তাঁর মৃত্যুর পরে আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম। একেবারে সর্বস্বহারা অবস্থা। সবকিছু, এমন কি পরিচ্ছদ পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসী হলাম। গায়ে ভস্ম মেখে, পায়ে হেঁটে ভারতভ্রমণ করলাম, আহার কখনো দীনতম কৃষকের সঙ্গে, কখনো রাজার সঙ্গে; একসময়ে এর দেউড়িতে পড়ে থাকি, অন্যসময় বৃক্ষতলে; অশান্ত কান্না গুরুর জন্য, আর তাঁর কাছ থেকে যে-বার্তা লাভ করেছি তাকে অমর করে রাখার জন্য প্রতিজ্ঞা। এই কৃচ্ছ্রসাধ্য পরিব্রাজক-জীবনে আত্মিক শক্তি অর্জন করার পরে আমি আমেরিকাযাত্রা করলাম। সেখানে বক্তৃতার দ্বারা যে-অর্থ উপার্জন করলাম, তার মালিক কিন্তু আমি নই—তা রয়েছে এক আমেরিকান বন্ধুর হাতে [মিসেস ওলি বুল?], গঙ্গাতীরে রামকৃষ্ণ-মঠ নির্মাণে তা ব্যয়িত হবে। তারপরে আমার দেহান্ত হবে।'

"ঐ সন্ধ্যায় আমি অনুভব করলাম—মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী পূরণে বিলম্ব নেই। বিবেকানন্দের উপরে মৃত্যুর ঘনায়িত ছায়া; তাঁর আপাতদৃঢ় শরীরের মধ্যে মৃত্যুর করপ্রসার তখনি হতে আরম্ভ করেছে—সুকঠিন প্রয়াসে ও পরিশ্রমে শরীর ভগ্ন। প্যারিসের সেরা ডাক্তারদের কাছে তাঁকে নিয়ে গেলাম—তাঁরা নৈরাশ্যে মাথা নাড়ালেন।

"১৯০০ খ্রীস্টাব্দের বিশ্বমেলার জন্য প্যারিস যখন রসে-রঙ্গে ঝলমল করছে, তখন আমরা সেই স্থান থেকে বেরিয়ে পড়লাম—জেরুজালেম ও বারাণসীর অভিমুখে—সঙ্গে নির্বাচিত সঙ্গীরা—দেখলাম কনস্টান্টিনোপল, গ্রীস, মিশর। পোর্ট সৈয়দে আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম। শৈব সন্ন্যাসী ভারতের জাহাজ ধরলেন, আর আমি ঠিক করলাম—বেথলেহেমে ক্রীস্‌মাস কাটাবার জন্য প্যালেস্টাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। বিবেকানন্দের পথ নির্বাণের অভিমুখে, আর আমার যাত্রা ক্যালভ্যারির [যে-স্থানে যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন] দিকে।"

উভয়ের পরবর্তী সাক্ষাৎকার ১৯০১ সালে বেলুড়ে। জুল বোয়া পৃথিবীভ্রমণে বেরিয়ে ভারতে উপনীত হয়েছিলেন। বেলুড়ে আসার জন্য স্বামীজীর আমন্ত্রণ ছিল।—

"দ্রুত শহর অতিক্রম ক'রে এলাম। বারো মাইল দীর্ঘ ডকের সমাপ্তি হল। আমাদের চারিদিকে গঙ্গার জল উঠছে-পড়ছে, অনুকূল স্রোতে বয়ে চললাম সর্বশুভ্র মঠের উদ্দেশ্যে, তালীবনে ঢাকা, প্যাগোডা-মন্দিরের শীর্ষে শিবের ত্রিশূল [বোয়া দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও বেলুড় মঠের স্মৃতিকে গুলিয়ে ফেলেছেন]। মঠবাড়ি সার-সার সুঠাম গৃহছাদের উপর থেকে যেন আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করছিল।

"আমেরিকান মহিলা [মিস ম্যাকলাউড] এখন গম্ভীর। তাঁর মনে পড়ছে নিউইয়র্কে

বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার কথা—বিবেকানন্দ আত্মাকে বশীভূত করেন। আমাকে নিয়ে মঠে যাবার কথা বলাতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। তিনি অদম্য পর্যটক। প্যারিসে বিশ্ব মেলার সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কায়রোয় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ, পরে আবার কলকাতায়—গতকাল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে। তাঁর স্থির দৃষ্টি, এবং পবিত্র ও চিরজিজ্ঞাসু আকার দেখেই তাঁকে চিনেছিলাম। 'কী ক্ষুদ্র এই পৃথিবী!'—তিনি সরবে বললেন। 'এ পৃথিবী চৌমাথা ছাড়া কিছু নয় যেখানে রাহী মানুষেরা একে অন্যকে দেখে চলে যায়।' বিবেকানন্দ ছাতের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বৃহৎ চক্ষু যেন সমস্ত মুখকে গ্রাস করে জ্বলজ্বল করছিল।

"এই প্রাণ কৃষ্ণবর্ণ মানুষটি ছয় হাজার বছর পূর্বের ঋষিদের মতো পরিচ্ছদে আবৃত, আমার জগতের বহু দূরে জাত, ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন দেবতার পূজক—ইনিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। ...ইনি এঁর প্রতিভা ও ভয়ঙ্কর উন্মাদনার শক্তিতে আমার কাছে মূর্ত করে তুলেছিলেন ভারতবর্ষকে—যা আমার স্বপ্নের পিতৃভূমি, চিরজাগ্রত আদর্শের স্বর্গোদ্যান। আমরা মানব-নিয়তি এবং তৎপরবর্তী অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম। মহান টলস্টয়ের মতো, যিনি এখন মৃত্যুপথযাত্রী, এই হিন্দুও নিজ জীবনকে আদর্শের মাপেই নির্মাণ করেছেন, পরিব্রাজকের জীবন নিয়েছেন, মানুষ যেসব জিনিসে আনন্দিত ও গর্বিত—সেই প্রেম, পরিবার, এমনকি লেখক ও শিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষাকেও পরিহার করেছেন; সন্ন্যাসী তিনি —তাঁর সম্বন্ধে এমার্সন বলতে পারতেন—ঐ জীবনের প্রতিনিধি-পুরুষ তিনি। গৃহের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রথম যে-কথা বললেন তিনি, তা হল : 'বন্ধু, এখন আমি স্বাধীন মুক্ত। সবকিছু ছেড়েছি। টাকাগুলো শিকলের মতো ভার হয়ে ঝুলছিল। সব দিয়ে দিয়েছি। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের দরিদ্রতম মানুষ আমি। কিন্তু রামকৃষ্ণের ভবন তৈরী হয়ে গেছে, তাঁর ভাবসন্ততিদের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই হয়েছে।'

"আমেরিকান মহিলাকে দেখে তিনি নম্রভাবে হাত জোড় করে, মাথা নামিয়ে নমস্কার করলেন—পাশ্চাত্ত্যে প্রার্থনার সময়ে যেমন করা হয়। তারপর তিনি তাঁর মানুষগুলিকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন! এঁরাই হলেন আমার ভ্রাতৃগণ, আমার পুত্রগণ!' মাথায় সুন্দর পাগড়ি-জড়ানো তরুণ মানুষগুলি আমাদের উদ্দেশ্যে হাসলেন, ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী তাঁদের চোখে সরল চাহনি। বৃদ্ধ মানুষেরা ব্রহ্মধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন; অভিবাদনে আনত তাঁদের ললাটে ছিল শৈব চিহ্ন। শূদ্র, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ—সকলে এখানে মিলিত—এই প্রফেটের কাছে জাতিভেদ নেই, ঈশ্বর সকলের মধ্যে সমভাবে বর্তমান। এক শিষ্য হুঁকায় ধূমপান করছিলেন; সেটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, যার গোলাপ-গন্ধে চারদিক ভরে গেল। তারপর তিনি আমাদের কিছু পদ্মফুল দিলেন। 'উপরে ছাতে চলুন, আমার বন্ধুরা এবার 'টিফিন' [টিফিন বলতে মধ্যাহ্নভোজ বুঝতে হবে] তৈরী করবেন।' ছাতের উপর থেকে যে-দৃশ্য দেখলাম তাতে মন কেড়ে নিল। এই তো ভারতবর্ষ—জ্বলন্ত রৌদ্রের নীচে সতেজ ক্ষেত, পুষ্করিণীগুলি মুকুরের মতো—যেন কোনো দেবী আকাশপথে উড়ে যাবার সময়ে সেগুলিকে নীচে ফেলে গেছেন, দূরে বনভূমি, রেশমী মেঘের মতো কোমল-দর্শন, আর গঙ্গা—যেন একেবারে ভালবাসায় ভরা হাতদুটি দিয়ে পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে।

"নদীর অপর পারে একটি প্যাগোডার [মন্দিরের] চূড়া উপরে উঠে আছে। তার নিকটে বিরাট বটবৃক্ষ তার অগণিত ঝুরি ভূমিতে নামিয়ে দিয়েছে। সেগুলি মাটিতে শিকড় গজিয়ে নতুন বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ওরই নীচে আমার গুরু রামকৃষ্ণের প্রথম সমাধি, অর্থাৎ ঈশ্বর-নিমজ্জনে আত্মহারা অবস্থা হয়। আমাদের কাছে ঐ স্থানটি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের মতোই পবিত্র।'

"আধ ঘণ্টা পরে বিবেকানন্দ তাঁর ঘরে নিজের হাতে আমাদের টিফিন সরবরাহ করলেন—ডিম, তাজা দুধ, সুগন্ধি শস্য [সম্ভবতঃ পোলাও] এবং আম্র—আমাদের পীচ ফলের চেয়ে যা সুন্দর সুস্বাদু। কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন না। [বলাবাহুল্য গৃহস্বামী কর্তৃক অতিথিসেবার রীতিতে]। মাংস দিতে না পারার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। মঠে ও-জিনিসের প্রচলন নেই।

"বিচিত্র স্বামীজীর কক্ষটি, যেখানে হিন্দুসন্ন্যাসীর নগ্ন সরলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের কার্যকর আসবাবপত্র—দোলানো চেয়ার, নানা শ্রেণীর পুস্তকে পূর্ণ গ্রন্থাগার, সেখানে এমার্সন ও স্পেনসারের সঙ্গে দেশীয় গ্রন্থের সহাবস্থান।

"এক শিষ্য একটি সবুজ পাতায় ক'রে কিছু সুপারি [অর্থাৎ পান] এনে দিলেন। এ সকলই মঠের বাগানে উৎপন্ন। আমি চিবোতে লাগলাম, নিকোটিন ও ফুলের গন্ধে মুখ ভরে গেল—ঠোঁট মুখ লাল হয়ে গেল।.

"ঘরের জানালার দিকে তাকালাম। ঘড়ি বাজল। বাগানে এক ডুমুর-জাতীয় গাছের তলায় সন্ন্যাসীরা গোল হয়ে বসেছেন। ছন্দোময়ভাবে তাঁদের মাথা ওঠানামা করছে। যিনি সদা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বিচিত্র স্বরে গান গাইলেন—আমাদের গির্জা-গীতির তুল্য, কিন্তু অধিক তীক্ষ্ন ও উল্লসিত। আবেষ্টনীর মধ্যে আগুনে জ্বলে ক্রমে কাঠগুলি অঙ্গারে পরিণত। আগুনের ধারে ত্রিশূল পোঁতা, তার উপরে পুষ্পমাল্য। সকলের চোখ অগ্নিতে নিবদ্ধ—অগ্নিদেবতা! আগ্নেয় সত্তায় আচ্ছন্ন সকলের ভিতর থেকে উৎসারিত শান্তিতে চতুর্দিক পরিপূরিত। ঐ শান্তি, যা আমাদের মতো কর্মোন্মাদদের কাছে ভয়ংকর—তারই উৎস থেকে যেন শব্দময় ডানা মেলে স্তোত্রগান উত্থিত হচ্ছিল, মাতোয়ারা মস্তকগুলির চারপাশে রৌদ্রালোকে নাচছিল স্বর্ণবর্ণ মৌমাছিরা, পবিত্র গো-শালার ভিতরে গাভীরা মুখ উঁচু ক'রে এই বিচিত্র ধর্মমতের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করছিল। এ সেই মতাদর্শ, যার সাহায্যে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করে এবং পরাভূত করে মৃত্যুকে।"

॥ ৮ ॥ একটি বক্তৃতা, একটি স্মৃতি ও একটি দৃশ্য

১৯০০, ২৪ অক্টোবর, ওরিয়েণ্ট একসপ্রেসে যখন স্বামীজী চড়ে বসলেন—তখন বস্তুতঃ-পক্ষে পাশ্চাত্ত্য থেকে তাঁর বিদায়যাত্রা শুরু হল। লেগেটদের বিলাসময় ভবনে জ্ঞানী-গুণীর বিরাট সমাবেশে প্রতিভার উৎসবে তিনিই ছিলেন কেন্দ্রপুরুষ। সেখানে থেকে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিলেন দরিদ্র জুল বোয়া-র অনাড়ম্বর আবাসে। সহাস্য সুগভীর জীবন্মুক্ত পুরুষ, দেখছিলেন, ভাবছিলেন, আর হাসছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর হাসির চোখ কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল যখন প্যারিসে সমবেত মানুষগুলি তাদের গুহাহিত অন্তরের রূপ নিয়ে তাঁর কাছে ধরা পড়ছিল : "আজ দু'তিন দিন ধরে প্যারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রান্সের প্রতি সদা-সদয় সূর্যদেব আজ ক'দিন বিরূপ। নানা দিগ্‌দেশাগত শিল্প, শিল্পী, বিদ্যা, ও বিদ্বানের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে প্রবাহিত ইন্দ্রিয়বিলাসের স্রোত দেখে ঘৃণায় সূর্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা 'কাষ্ঠ, বস্ত্র ও নানা রাগরঞ্জিত এ মায়া-অমরাবতীর আশু বিনাশ ভেবে তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।" [৬-১২৫]। "এগজিবিশন ভাঙা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ভূস্বর্গ, নন্দনোপম প্যারিসের রাস্তা এক হাঁটু কাদা চুন বালিতে পূর্ণ হবেন। দু'একটি প্রধান ছাড়া এগজিবিশনের সমস্ত বাড়িঘরদোরই—কাঠকুটরো, ছেঁড়া ন্যাতা আর চুনকামের খেলা বইতো নয়—যেমন সমস্ত সংসার!" [৬-১২৫]।

'ইউরোপে বিবেকানন্দ' পর্যায়ে প্রাপ্ত সকল সংবাদ এই অধ্যায়ে পরিবেশন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল বিশেষভাবে তাঁদের কথাই বলতে চেয়েছি, যাঁদের জীবনের সঙ্গে ভারত-বর্ষের যোগ ছিল। সুতরাং "পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী এবং সর্বশ্রেষ্ঠা নারী

সারা বার্নহার্ডের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎকারের ঘটনা, কিংবা শ্রেষ্ঠা অপেরা গায়িকা মাদাম কালভের সঙ্গে পরিচয় ও পরবর্তী কাহিনী [বার্নহার্ড ও কালভের কাহিনী বলেছি "সুরনৃত্যের উর্বশী" গ্রন্থে] এখানে বলতে চাই না; এইপর্বে স্বামীজীর সঙ্গে পুনশ্চ মিলিত বৈজ্ঞানিক হিরাম ম্যাক্সিম বা দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের কথা আগে অবশ্য কিছুটা বলে এসেছি [১ম, ২০৭—৯; ২য়, ৩৮-৪৭]; রদাঁ প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

স্বামীজীর জীবনীতে অনুল্লিখিত একটি বক্তৃতার সামান্য উল্লেখ এখানে করব, যেটি তিনি কনস্টানটিনোপলের নিকটবর্তী স্কুটারিতে আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত নারী কলেজে দিয়েছিলেন। বক্তৃতাটির বিষয়ে প্রথম অবহিত হই দেশ পত্রিকায় ১৯৩৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, কেশবচন্দ্র গুপ্ত অনূদিত, মাদাম হালিদা এদিবের স্মৃতিকথা থেকে।৫৭ হালিদা এদিব তুরস্কের রাজনৈতিক নেত্রী এবং লেখিকা। পরে আমি কেশবচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে মূল গ্রন্থ থেকে [*Memoirs of Halide Edib*, London: John Murray] প্রয়োজনীয় অংশ সংগ্রহ করি। এর পরে, স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ তাঁর পূর্বে-উল্লিখিত ইউরোপে বিবেকানন্দ পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েক স্থানে এই বক্তৃতাটির কথা বলেছেন, যার থেকে জানতে পারি, স্বামীজী ২ নভেম্বর, ১৯০০, ঐ বক্তৃতা দেন। বিদ্যাত্মানন্দ পিয়ের হায়াসিন্থের ডায়েরিতে এই বক্তৃতার উল্লেখ পেয়েছেন, কিন্তু তিনি মাদাম এদিবের স্মৃতিকথার সন্ধান পাননি। সেই তথ্য সরবরাহ ক'রে পটভূমিকাসহ আমি প্রবুদ্ধ ভারতের ডিসেম্বর ১৯৭৮ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছি [*Swami Vivekananda in Scutari*]। সেখানে মাদাম এদিবের মূল রচনাংশ উদ্ধৃত আছে। ঘরোয়াসভায় পিয়ের হায়াসিন্থ এবং স্বামীজীর বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে উনি লিখেছেন :

"কলেজে দুজন বিখ্যাত ও চিত্তাকর্ষক বক্তার আগমন।...প্রথমজন পিয়ের হায়াসিন্থ.. বিখ্যাত ফরাসি পাদরি, যিনি সর্বজনীন ধর্ম প্রবর্তন করেছেন, যা সকল মতের মানুষকে সম্মিলিত করতে পারবে—বাহাই মতের খ্রীস্টীয় রূপ। তাঁর ঐকান্তিকতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বক্তৃতার দীপ্তশক্তির জন্য তাঁর যথেষ্ট অনুগামী হয়েছিল। ভাটিক্যান মহা ক্রুদ্ধ হয়, তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে। পোপ প্রতিনিধি পাঠিয়ে এমন ব্যবস্থা করেন যাতে তুরস্কে প্রকাশ্যে তাঁর বক্তৃতা নিষিদ্ধ হয়। তিনি কেবল কলেজের ছাত্রীদের কাছেই বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর কথা শোনা সৌভাগ্যের বিষয়।. পিয়ের হায়াসিন্থ খাটো সুদৃঢ় গঠনের মানুষ, সহাস্য সুগোল আনন, ক্ষুদ্র সদয় চক্ষু, কুঞ্চিত শুভ্র কেশ—তাঁকে দেখে গির্জার মঞ্চে প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে সাধারণভাবে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু চিত্তের শক্তি, চিন্তার ঐকান্তিকতা, ভাষার শিল্পসৌন্দর্যের প্রভৃত উৎকর্ষের জন্য তিনি আমার স্মৃতিতে জীবন্ত। অপরাপর মহান বক্তাদের মতোই তাঁর 'মুখ ধূলিবদ্ধ' হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি কবরেও ধ্বনিত হবে আমার কর্ণে।

"স্বামী বিবেকানন্দ নামক বিখ্যাত ব্রহ্মণ্যবাদীও আমাদের কলেজ পরিদর্শন করেন এবং তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতার একটি এখানে প্রদান করেন, যা শ্রোতৃবৃন্দকে সম্মোহিত করে রাখার যশ অর্জন করেছে। শ্যামবর্ণ কৃশ মানুষটি ঢিলে-ঢালা পোশাকে আবৃত, শীর্ণ দুই হস্ত এমন সঞ্চালিত হচ্ছিল যেন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাঁর সুঠাম সুন্দর অবয়বে ভাবের বিকাশ, এবং কণ্ঠে এশিয়ার আধ্যাত্মরহস্যের কুহক। এ সকলই তাঁর বক্তৃতাকালে পরিস্ফুট হয়ে [।]।

"আমি তাঁর শিল্পনিপুণ ভাবভঙ্গিতে মোহিত হয়েছিলাম, কিন্তু সেই বয়সেও অনুভব

৫৭ শ্রীবিশ্বনাথ বসু এটি আমাকে সংগ্রহ করে দেন।

করেছিলাম—তাঁর মধ্যে এক ধরনের 'মেক-আপ' আছে, যা মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছেই অধিক আবেদন জানায়। ও-বস্তুর বিপরীত জিনিস ছিল পিয়ের হায়াসিন্থের ভাষণে।"

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এই বর্ণনা, যা এই বৈদান্তিক সম্বন্ধে সেমেটিক দ্বৈতবাদীদের প্রতিরোধাত্মক মনোভাব বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে, এবং সেইজন্যই এই রচনাংশটিকে বিশেষভাবে উপস্থিত করেছি।

হালিদা এদিব যে, হায়াসিন্থের বক্তৃতার প্রশংসা করেছেন, সেটা অদ্ভুত কিছু নয়। স্বামীজী স্বয়ং পরিব্রাজক গ্রন্থে লিখেছেন, "পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতাগুণে এবং তপস্যার প্রভাবে ফরাসিদেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে এঁর অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল।" স্বামীজী এঁর আরও বর্ণনা উক্ত গ্রন্থে করেছেন। বিদ্যাত্মানন্দ প্রবুদ্ধ ভারতে, মার্চ, ১৯০১ সংখ্যায় বিবেকানন্দ ও হায়াসিন্থের উপরে অত্যন্ত সুলিখিত এক প্রবন্ধে উভয়ের সম্পর্কের বিষয়ে প্রচুর প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়েছেন। সেখান থেকে, অন্য সূত্র থেকেও আমরা দেখি, ইনি ফ্রান্স, ইটালি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু বৎসর ধরে চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী পুরুষ ছিলেন। আলোচ্য সময়ের পাঁচ বছর আগে (১৮৯৫-৯৬) ইনি সমগ্র কনস্টানটিনোপল ভ্রমণ করে ব্যাপক বক্তৃতা করেন। তদুপরি ঐ সময়ে উনি খ্রীস্টান, মুসলমান ও ইহুদীদের বোঝাপড়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যেজন্য ঐ সম্প্রদায়গুলির উদারনৈতিক অংশে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অপরদিকে, বিবেকানন্দ তাঁর বিশ্ব-খ্যাতি সত্ত্বেও তুরস্ক অঞ্চলে কিছু শিক্ষিত মানুষের কাছে কেবল নামে পরিচিত। তখনো পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের মানুষের জন্য তিনি এমন কিছু করে উঠতে পারেননি, যার জন্য কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবেন। সর্বোপরি, ঐ অঞ্চলে স্বামীজীর ধর্মীয় ভাষা একেবারেই অপরিচিত। সেমেটিক ধর্মগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও ঐক্যের ক্ষেত্রও ছিল যথেষ্ট, যা ছিল না হিন্দুধর্মের সঙ্গে। তাদের কাছে বহুক্ষেত্রে হিন্দুধর্মমত কেবল অপরিচিত বা রহস্যময় নয়—অরুচিকর, আপত্তিকরও বটে। বিদ্যাত্মানন্দের প্রবন্ধে দেখা যায়, পিয়ের হায়াসিন্থের মতো সুপরিচিত ধর্মতাত্ত্বিক, দীর্ঘ আলোচনার পরেও, স্বামীজীর অদ্বৈত-দর্শন সম্পূর্ণ বুঝতে পারেননি। কেবল দ্বৈতবাদী ধারণার মধ্যে লালিত মানুষের পক্ষে অদ্বৈত মতের ধারণা করা সত্যই কঠিন। স্বামীজীর প্রিয় হেল-ভগিনীরা পর্যন্ত দীর্ঘ পরিচয়ের পরেও অদ্বৈতদর্শন বুঝতে কতখানি অসমর্থ ছিলেন, তা স্বামীজীর চিঠি থেকেই দেখা যায়। জুল বোয়া কিজন্য স্বামীজীর অদ্বৈত দর্শনকে শেষপর্যন্ত মানতে অস্বীকার করেছিলেন তাও এইখানে বুঝতে পারা যায়। তিনিও ভেবেছিলেন—স্বামীজী কেবল মনঃশক্তির দ্বারাই যবনিকা উত্তোলন করতে চেয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে যদি হালিদা এদিবের মতো অনতিপরিণত এক কলেজ-ছাত্রীর মস্তকে ও হৃদয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা প্রবেশ না করে, বিস্ময়ের কিছু নেই। কেশবচন্দ্র গুপ্ত এই সূত্রে বলতে চেয়েছেন, "কুমারী হালিদার তখনকার সাধনা ও কৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপীয়; তুর্কীর শিক্ষিতসমাজ তখন ফরাসি সাহিত্যদর্শনের বিশেষ অনুরক্ত; পিয়ের হায়াসিন্থ ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্ম প্রচার করছিলেন; তাঁর ভক্তিমূলক ধর্মের কাছে বেদান্ত বুঝবার পক্ষে কঠিন, স্বামীজী যতই ভাষার কুহক বিস্তার করুন।"

তবে হালিদা এদিব যখন বলেন, স্বামীজীর বক্তৃতায় 'এক ধরনের মেক-আপ' ছিল, তখন তিনি ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন, বোঝা শক্ত। তাঁর আর একটি দুর্বোধ্য উক্তি—স্বামীজীর বক্তৃতা ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে আবেদন করে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে ব্যাপারটির রহস্য পরিষ্কার হবে, এবং স্বামীজী কোন্ অর্থে দিব্য বাগ্মী, তা আর একবার বোঝা যাবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে দেখা যায়, বক্তৃতাকালে স্বামীজীর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটত—

তখন তিনি যেন কোনো এক অলৌকিক শক্তির বশবর্তী। সম্ভবতঃ স্বামীজীর এই পরিবর্তিত আকার হালিদা এদিবের কাছে এক ধরনের মেক-আপ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। দেখা যায়, বক্তৃতাকালে স্বামীজী যেমন শ্রোতৃবৃন্দকে যুক্তিজালে বাঁধতে চাইতেন, সেই পরিমাণে বা ততোধিক, তাদের উত্তোলন করতেন ঊর্ধ্বতর চেতনালোকে, সেখানে বস্তুবোধ প্রায় লুপ্ত হয়ে যেত। আলোচ্যক্ষেত্রে স্বামীজী এই ধরনের তীব্র অনুভূতিপ্রবাহ অবশ্যই সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে মাদাম এদিব পরবর্তীকালে চিন্তাকালে 'ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে আবেদন' মনে করেছেন। ব্যাপারটির তাৎপর্য না বুঝলেও তার রূপ তার স্মৃতিতে ছিল, কেননা তিনি বলেছেন বক্তৃতাকালে স্বামীজীর সঞ্চালিত হস্তগুলি মনে হচ্ছিল যেন সেগুলি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। ও-বস্তু যথার্থতঃ কী—বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মানুষদের ভাবাবেশকালে যারা তাৎপর্য বুঝে দর্শন করেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য থেকে তা বোঝা যায়। শ্রীচৈতন্যকে অনেক সময়েই তাঁর আকারের তুলনায় দীর্ঘতরদেহ মনে হত, যেন বিগলিত দেহ। স্বামী সারদানন্দ পাণিহাটীর মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য বর্ণনার মধ্যে লিখেছেন [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ. ২৩৪] : "প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে-দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইবে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে।" স্বামীজী যে বক্তৃতাকালে ঐ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করতেন, তার যথেষ্ট বর্ণনা আগে দিয়েছি। [বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, ২য় খণ্ড, ৯৭-৯৮, ১১১-১৭]। হালিদা এদিবের দুর্ভাগ্য, তাঁর ঐ দর্শনের যথার্থ প্রকৃতি বুঝতে পারেন নি, তাঁর সৌভাগ্য—ঐ রূপ তিনি দর্শন করতে পেরেছিলেন।

সামান্য পেছিয়ে গিয়ে প্যারিসে বিবেকানন্দের এক টুকরো স্মৃতিকথা নিবেদন করতে পারি। ডিউক আরমণ্ড অব রিশল্যু, [উক্ত উপাধির শেষ অধিকারী] যিনি ফ্রান্সের অন্যতম মার্শাল—যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে, তাঁর প্যারিস-বাসকালে, কিছুকাল ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন। ৩০ মে, ১৯৫২, নিউইয়র্কে তিনি ৭৬ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের কারণে তিনি ভারতবর্ষকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। নিউইয়র্ক 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টার'-এর অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। নিখিলানন্দ আগস্ট, ১৯৫২, মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ডিউকের বিষয়ে লিখেছিলেন—তা প্রবুদ্ধ ভারতে অক্টোবর, ১৯৫২ সংখ্যায় বহুলাংশে উদ্ধৃত হয়। ঐ রচনায় ডিউকের সঙ্গে নিখিলানন্দের প্রথম পরিচয় এবং পরবর্তী আদান-প্রদানের কিছু বিবরণ আছে। নিখিলানন্দ-স্বামী ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বেলুড় মঠে বসে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন। মডার্ন রিভিউ-এর বিবরণের সঙ্গে তা মোটামুটি এক, তবে স্বভাবতঃই প্রকাশিত বিবরণে তিনি নিজের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন, এবং অন্তরঙ্গ আলাপের উত্তাপও তাতে নেই। আমি নিখিলানন্দের কাছে ব্যাপারটা যেভাবে শুনেছি, তাই বর্ণনা করছি। গভীর রসাত্মক সে কাহিনী।

নিখিলানন্দ বলেছিলেন : "আমি তখন মেরুজ্যোতি দেখার জন্য জাহাজে ক'রে যাচ্ছি [১৯৩৪ সাল]—আছি ট্যুরিস্ট ক্লাসে। একদিন একটি অল্পবয়সী মেয়ে [প্রিন্সেস ম্যাচাবেলি] এসে আমাকে বলল, 'আপনি কি স্বামী নিখিলানন্দ?' আমি 'হাঁ' বলায় সে বলল, 'এই জাহাজে ফার্স্ট ক্লাসে একজন প্রবীণ ফরাসি ডিউক যাচ্ছেন, আপনার আপত্তি না থাকলে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। যাত্রীদের নামের তালিকায় আপনার নাম দেখে তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে বিশেষ উৎসুক।' আমি ইতঃস্তত করছি দেখে মেয়েটি

আমার দ্বিধার কারণ অনুমান ক'রে বলল, 'না না, আপনার সংকোচের কারণ নেই, আপনাকে ফার্স্টক্লাসের লাউঞ্জে যেতে হবে না, সকলের জন্য যে সাধারণ লাউঞ্জ আছে তাতেই দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে।'

"ডিউকের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই, আমি স্বামী নিখিলানন্দ, একথা জেনে নিয়েই, তিনি সহসা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি স্বামী বিবেকানন্দকে চেনেন?' আমি একটু থতিয়ে গেলাম। তারপর বললাম, না, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি, তবে আমি তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংঘের সন্ন্যাসী। আমি আরও বললাম, স্বামীজী আর নেই, দীর্ঘদিন আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

"আমার কথা শুনে ডিউক গভীরভাবে বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। এবার আমি প্রতিপ্রশ্ন করলাম—আপনি ঐ প্রশ্ন করলেন কেন?

"ডিউক বললেন, 'আমি তাঁকে চিনতাম।'

"কিভাবে?

"ডিউক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সে অনেক বছর আগে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে তাঁর সঙ্গে আমার চেনা হয়। কিছুদিনের আলাপ, কিন্তু তার মধ্যেই খুব জমে গিয়েছিল। তারপর যখন তাঁর চলে যাবার সময় হল, তিনি একদিন আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে ভারতে চলো। আমি কথাটাকে হালকাভাবে নিয়ে কোনো উত্তর দিলাম না। তিনি আবার বললেন, আমার সঙ্গে ভারতে চলো। এবার আমি বললাম, না, তেমন ইচ্ছে নেই। তিনি বললেন, ভেবে দ্যাখো। আমি বললাম, না। তিনি যেন ক্রমে চাপ দিতে লাগলেন। আমি অস্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করলাম। তাই আবার যখন ঐকথাটাই বললেন, তখন আমি ধারালো গলায় বললাম, কেন যাবো? আপনি আমাকে কী দেবেন?

"'স্বামীজী আমার দিকে স্থির চোখে তাকালেন, বিরাট চোখে সর্বগ্রাসী চাউনি। তারপর বললেন, আমি তোমাকে মরবার বাসনা দেব, কি ক'রে মরতে হয় শিখিয়ে দেব।

"'এবার আমি অট্টহাস্য করে উঠলাম। জীবনে এমন অদ্ভুত কথা শুনিনি। হাসতে-হাসতে বললাম, না, স্বামীজী, ঐ বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা বোধ করছি না। ও-বস্তু লাভের জন্য আপনার অনুসরণ করবার কোনোই ইচ্ছা নেই।

"'স্বামীজী অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। দৃঢ়স্বরে বললেন, আবার ভেবে দ্যাখো। আমি যা দেব বলছি, সে জিনিস তোমাকে কেউ দিতে পারবে না।

"'আমার হাসির ঝোঁক তখনো কাটেনি। হাসির মধ্যেই, কিছু ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললাম, কি বলছেন আপনি? আমি দূরে ভারতবর্ষে যাব আপনার সঙ্গে—অন্য কিছুর জন্য নয়—কি ক'রে মরতে হয়, তাই শিখতে? হাঃ হাঃ! আমার এই তরুণ বয়স, রূপ আছে, বিদ্যা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়েছি, অর্থের অভাব নেই, ফ্রান্সের সবচেয়ে নামী এক বাড়ির ছেলে আমার সামনে খোলা আছে মজার প্যারিস—ভোগ—সুখ!—সেসব ছেড়ে আমি যাব ভুতুড়ে দেশ ভারতে? না না স্বামীজী, ও-অভিপ্রায় নেই আমার।

"স্বামীজী বললেন, তবু ভেবে দ্যাখো, জীবনে সুযোগ দুবার আসে না।

"'আমি বললাম, প্রয়োজন নেই।

"'সেখানেই আমাদের কথাবার্তার শেষ।'

"ডিউক এইসব কথা যখন বলছিলেন, আমি গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলাম। ডিউক বলে চললেন : 'খুবই বিস্ময়ের বিষয়, এর পর স্বামীজীর কথা আমার মন থেকে একেবারে মুছে গেল। আমার জীবন তার স্বাভাবিক ধারাতেই বয়ে চলেছিল। তারপর কয়েক বছর আগে আমার জীবনে গভীর এক সংকট আসে, সবকিছু তখন ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায়, মৃত্যুভাবনা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন হঠাৎ মনে পড়ল—স্বামী বিবেকানন্দের কথা,

তাঁর চেহারা। তিনি তো আমাকে বলেছিলেন—আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কি ক'রে মরতে হয়! ব্যাকুল হয়ে ভাবতে লাগলাম, তিনি কোথায়, তিনি কি নেই, তাঁর দেখা কি পাওয়া যায় না? তারপর অনেক সন্ধান করেছি কিন্তু তাঁর কোনো হদিশ করতে পারিনি। এখন এই জাহাজে প্যাসেঞ্জার-লিস্টে আপনার নাম দেখে মনে হল, আপনি হয়ত স্বামী বিবেকানন্দের খবর দিতে পারেন, তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

"ডিউক একটু থেমে হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা স্বামী নিখিলানন্দ, আপনি কি আমাকে শেখাতে পারেন, কি করে মরতে হয়?'"

কাহিনীটি শেষ করার পরে, স্বামী নিখিলানন্দ বললেন, "আমি ডিউককে একটি উত্তরই দিতে পেরেছিলাম : সুযোগ জীবনে দুবার আসে না।"৫৮

জীবন মানুষকে অনেক কিছু দেয়, হরণও করে অনুরূপভাবে। আলোর তরঙ্গ, ক্লেদের প্রবাহ পাশাপাশি। বিবেকানন্দ বললেন, যেখানে আছে দুঃখ বঞ্চনা পাপ, সেখানে আছি আমি। কেমনভাবে ছিলেন, অন্ততঃ থাকতে চাইতেন, তারই একটি ছবি চিরকালের পটে এঁকেছেন মাদাম কালভে, তাঁর স্মৃতিকথায়। সেই ছবিটি দিয়েই বর্তমান অধ্যায় শেষ করব। কালভে ও অন্যান্যরা যখন ১৯০০, নভেম্বর মাসে কায়রোয় ভ্রমণ করছিলেন, তখনকার ঘটনা।—কালভে লিখেছেন :

"একদিন কায়রোয় আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। মনে হয়, খুবই মগ্ন হয়ে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম। যেভাবেই তা ঘটুক, আমরা সচেতন হয়ে দেখলাম—একটা নোংরা, কটুগন্ধ পথে হাজির হয়েছি, যেখানে অর্ধনগ্ন নারীদের কেউ জানলা থেকে উঁকি দিচ্ছে, কেউ-বা দরজা-গোড়ায় হাত-পা ছড়িয়ে এলিয়ে বসে আছে।

"স্বামীজী পরিবেশ বিশেষ লক্ষ্য করেননি—যতক্ষণ না একটা জীর্ণ বাড়ির ছায়ায় বসে-থাকা একদল অত্যন্ত প্রগল্‌ভ নারী খিল্‌খিল্‌ হেসে তাঁকে ডাকাডাকি করেছিল। 'আমাদের দলের জনৈক মহিলা তাড়াতাড়ি ওখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু স্বামীজী মৃদুভাবে নিজেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, বেঞ্চে বসে-থাকা মেয়েগুলির দিকে এগিয়ে গেলেন।

"'হায় হতভাগিনীরা! হায় সন্তানেরা! এরা নিজেদের ঈশ্বরত্বকে টেনে নামিয়েছে দেহের রূপে! দ্যাখো একবার ওদের!"

৫৮ নিখিলানন্দ মডার্ন রিভিউ-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ডিউক রিশল্যুর সঙ্গে তাঁর পরবর্তী কালের আলাপ-পরিচয়ের কথা কিছু বলেছেন। তার থেকে জেনেছি, তরুণ ডিউক স্বামীজীকে অসাধারণ রূপবান পুরুষরূপে দেখেছিলেন। গোড়ায় সন্দেহ করেছিলেন, ইনি হয়ত ভেলকি-দেখানো সাধু, (যাঁদের বেশ-কিছু সংখ্যা তখন ইউরোপে ঘোরাফেরা করছিল)। আলাপের পরে অচিরে সে সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং তিনি স্বামীজীর মোহিনী আকর্ষণে ধরা দেন। কয়েক সপ্তাহ নিয়মিত তাঁর সাক্ষাতে গেছেন। স্বামীজী কিভাবে ব্যক্তির মূল্যের কথা বলতেন, তার কথা ডিউক স্মরণ করতে পারেন। ব্যক্তি যদি উচ্চস্তরের মানুষ হন, তাহলে গোষ্ঠী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেও তাদের প্রভাবিত করতে সমর্থ। তার মানে, একদিকে যেমন সে, অনেক শ্রমিক নেতার মতো গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে তাদের অন্যায় স্বার্থের সমর্থক হবে না, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় অনেক খ্রীস্টানের মতো নিজ স্বার্থে গোষ্ঠী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নও করবে না। নিঃস্বার্থতা হবে তার আদর্শ, এবং অপরের জন্য ভালবাসা। স্বামীজী প্রেমকে, কর্ম ও যোগ অপেক্ষা উচ্চে স্থাপন করতেন। ব্যক্তির যথার্থ মূল্য—সার্বভৌমিকতায়, এবং সার্বভৌমিকতার মধ্যে ব্যক্তিমূল্য প্রতিষ্ঠায়। স্বামীজী আরও বলেছিলেন, যেমন পাপের দ্বারা বিচলিত না হতে শিখতে হবে; তেমনি শিখতে হবে—ভালোর দ্বারা সুখী না হতে। ভালো মন্দর বাইরে গিয়ে বুঝতে হবে, দুইয়েরই প্রয়োজন আছে।

"তিনি কাঁদতে লাগলেন—যে-কান্না প্রভু যীশুও কাঁদতে পারতেন ব্যভিচারিণী নারীদের সামনে।

"মেয়েগুলি স্তব্ধ হয়ে গেল, অত্যন্ত অপ্রতিভ। তাদের একজন নতজানু হয়ে, তাঁর বসনপ্রান্ত চুম্বন করে, ভাঙা-ভাঙা স্প্যানিশে অস্ফুটে বলতে লাগল, 'ঈশ্বরপুত্র! ঈশ্বর-পুত্র!' অন্য একজন সহসা লজ্জায়, আতঙ্কে অভিভূত হয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। সে যেন ঐ পবিত্র আঁখির দীপ্তি থেকে নিজের সংকুচিত আত্মাকে ঢেকে রাখতে চাই-ছিল।"৫৯

৫৯ লেখককৃত 'সুর নৃত্যের উর্বশী', ১০৩-০৪।

চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়

বিবেকানন্দের হিমালয় স্বপ্ন ঃ অদ্বৈত আশ্রম ঃ স্থপতি—সেভিয়ার-দম্পতি

॥ ১ ॥ স্বামীজীর প্রত্যাবর্তন

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর রাত্রিকালে, বেশি রাত্রি নয়, আটটা-ন'টার মধ্যে কোনো সময়—বেলুড়-মঠে একটি নাটকীয় কান্ড ঘটেছিল। সাধু-ব্রহ্মচারীরা নৈশ আহারে বসেছেন—মঠের মালী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে জানাল—এক সাহেব এসেছেন।—এমন অসময়ে কে আবার সাহেব এল—যাইহোক যখন এসেছে তাকে ভিতরে নিয়ে এসো—এই নিয়ে যাও চাবি—বলতে-বলতে সাহেব স্বয়ং হাজির। সাহেব ভিতরে আসতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, চাবি আনার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন নি, সামান্য একটা প্রাচীর টপকানো তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ নয়, ধুত্তোর পাঁচিল, হোন না তিনি বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি—কিন্তু খ্যাতিকে কি তিনি জীর্ণ বস্ত্রের মতো ছুঁড়ে ফেলে মাড়িয়ে চলেন না—আর.. বিশেষতঃ সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি তাঁর কাণে ঢুকেছে—না না, আরতির ঘণ্টা নয়, আহারের ঘণ্টা, তিনি কখনো অপেক্ষা করতে পারেন—লাফিয়ে ঢুকে একেবারে পংক্তিতে বসে পড়লেন—আঃ কী মজা! দেবভোগ্য খাদ্য—শীতের রাতে গরম খিচুড়ি—কতদিন খাইনি—

টুপি খুললে দেখা গেল সাহেবটি কিনি। আর তারপরেই আনন্দের বাঁধ ভেঙে প্লাবন' স্বামীজী! স্বামীজী! নরেন—!

স্বামীজী বললেন—হাঁ—চাবি আনার জন্য দাঁড়াবো? খাওয়ার ঘণ্টা কাণে গেলে দাঁড়ানো যায়?—

তারপরে স্বামীজী যে বালকের মিষ্ট-দুষ্ট হাসি হেসেছিলেন, তা দেখার জন্য, ভক্তদের কথা বলতে পারি—তাঁরা বহু তপস্যা করতে রাজি।

অল্প কিছুদিন পেছিয়ে যাব। কয়েকজনের মুখের হাসি অন্ততঃ কেড়ে নিয়ে স্বামীজী চলে এসেছিলেন। কায়রোয় স্বামীজী সদলবলে বেড়াচ্ছিলেন। দিব্যস্বপ্নের মতো দিনগুলি কাটছিল; সঙ্গীদের তাই মনে হচ্ছিল। সহসা স্বামীজী স্বর্গ হইতে বিদায়-বাণী উচ্চারণ করলেন।

স্বামীজী—আমি চলে যেতে চাই।

মিস ম্যাকলাউড—কোথায় যাবেন?

স্বামীজী—ভারতে ফিরব।

মিস ম্যাকলাউড—ঠিক আছে, যান।

স্বামীজী—যেতে পারি তো?

মিস ম্যাকলাউড—নিশ্চয় পারেন।

মিস ম্যাকলাউড মাদাম কালভেকে বললেন, স্বামীজী চলে যেতে চান। মাদাম কালভে বলেছিলেন, 'ইচ্ছে হলে অবশ্যই যাবেন।' মাদাম কালভে ফেরার টিকেট কেটে দিয়েছিলেন। গভীর নৈরাশ্য বোধ করেছিলেন তাঁরা, কিন্তু আভাসে বোধ হয়েছিল, কোনো এক গভীর বেদনা স্বামীজী বহন করছেন। কালভে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, স্বামীজীর যেন মনে হয়েছিল, তাঁর দিনশেষ হয়ে আসছে; শেষের দিনগুলি তিনি তাঁর শৈশব যৌবনের বিচরণ-ক্ষেত্রে এবং অন্তরঙ্গদের সান্নিধ্যে কাটাতে চান।

ট্র্যাজিক বিষাদ যে, স্বামীজীকে আচ্ছন্ন করেছিল—তা তাঁর ভ্রমণসঙ্গীরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কেন এই বিষাদ, স্বামীজী কি সচেতনভাবে তা জানতেন? আমরা জানি না। কিন্তু অবশ্যই জানি—তাঁর অন্তর্গহনে ছায়াপাত হয়েছিল—মৃত্যুর ছায়া। মৃত্যুর বার্তা নিয়ে একটি চিঠি তাঁর পিছনে ছুটছিল, যখন তিনি ঘুরছেন মধ্য ইউরোপে, ভিয়েনায়, এথেন্সে, কনস্টান্টিনোপলে, মিশরে।

পত্রটিতে লেখা ছিল—২৮ অক্টোবর ক্যাপ্টেন সেভিয়ার মায়াবতীতে দেহত্যাগ করেছেন। মিসেস সেভিয়ার সে-সংবাদ জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। সে-চিঠি দু'মাস ঘুরে, ফিরে এসেছিল বেলুড়ে। বেলুড়ে পৌঁছে স্বামীজী সব জানলেন—কোন যন্ত্রণা তাঁকে বহুদূর থেকে উপড়ে এনেছে।

স্বামীজী স্থির করলেন, তিনি মায়াবতী যাবেন। পথ দুর্গম, দুঃসহ শীত, প্রকৃতি বিরূপ, স্বাস্থ্য ভগ্ন—তবু যেতে হবে। সেখানে আছে একটি পরম স্বপ্নের সিদ্ধি-মন্দির—আর তারই অনুপরমাণুতে দধীচি-স্থপতির অস্থিচূর্ণ।

বিবেকানন্দ ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের জীবনকালে মায়াবতী যেতে পারেন নি।

॥ ২ ॥ সেভিয়ারদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয়ের কাহিনী

মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমকে বলেছি—বিবেকানন্দের পরম স্বপ্ন। কিভাবে এই আশ্রম গড়ে উঠেছিল?

১৮৯৬ সালের কথা। স্বামীজী আমেরিকা থেকে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে এসেছেন, বেদান্ত-সত্য প্রচার করছেন। একদিন তাঁর বক্তৃতাসভায় এলেন ক্যাপ্টেন জে এইচ সেভিয়ার এবং মিসেস শার্লট এলিজাবেথ সেভিয়ার। সেভিয়ার-দম্পতি দীর্ঘদিন ধরে সত্যসন্ধানী, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে তাঁরা তাঁদের বাঞ্ছিত সত্যকে খুঁজে পাননি। জনৈক বন্ধুর কাছে তাঁরা একদিন এক হিন্দু যোগীর কথা শুনলেন, যিনি জ্ঞানযোগের উপর ভাষণ দিচ্ছিলেন। এই প্রৌঢ়-দম্পতি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। চমৎকৃত হয়ে শুনলেন—তেত্রিশ বছরের প্রদীপ্ত তারুণ্যের কণ্ঠে ধ্বনিত অনন্ত জীবন, অনন্ত সত্যের বাণী—অদ্বৈত দর্শন। "অল্পভাষী, মধ্যবয়সী ভিক্টোরীয়-ইংরাজ উক্ত ক্যাপ্টেন ভাবলেন—এই তরুণবয়স্ক মানুষটি যা বলছেন, তা কি ইনি নিজে বুঝেছেন?"

বক্তৃতাশেষে মিস ম্যাকলাউডকে এঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—"এই তরুণটিকে আপনি জানেন? এঁকে দেখে যা মনে হচ্ছে ইনি কি তাই?"

দ্বিধাহীন কণ্ঠে মিস ম্যাকলাউড বললেন—"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে আমরা এঁকে অনুসরণ করব—ঈশ্বরের পথে।"

ঐ প্রৌঢ় দম্পতির পক্ষে সহসা এই ধরনের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত আপাততঃ বিস্ময়কর মনে হলেও তা অনিবার্য ছিল, কারণ, "সারাজীবন এই মানুষটিকে এবং এঁর মুখোচ্চারিত দর্শন-সত্যকে আমরা খুঁজে এসেছি।"

প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষাতে স্বামীজী মিসেস সেভিয়ারকে মাতৃসম্বোধন করে বললেন—"ভারতবর্ষে চলুন। আমার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি আপনাদের দেব।"

বিবেকানন্দ তাঁর বাক্য রক্ষা করেছিলেন—সেভিয়ার-দম্পতিকে দিয়েছিলেন অদ্বৈত সত্য। আর উক্ত দম্পতি তাঁদের তরুণ গুরুকে দেন মাতা ও পিতার স্নেহ এবং শিষ্য ও শিষ্যার আনুগত্য।

॥ ৩ ॥ স্বামীজীর হিমালয়-আশ্রমের কল্পনা : সেভিয়ার-দম্পতি কর্তৃক অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন : অদ্বৈত আশ্রমের আদর্শ ও কর্মরীতি

বিবেকানন্দ তার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি কেবল এই দুইজনকেই দিতে চাননি—আচার্য তিনি —বিলিয়ে দেবেন। সেই অদ্বৈত সত্যের বীজ দিকে-দিকে বাহিত হয়েছে, অংকুরিত হয়েছে —কোথায়, কত স্থানে, হিসাব করা সম্ভব নয়। তবু বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ঐ সত্যের একটি স্থায়ী যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত হোক, যেখান থেকে নিত্য বিচ্ছুরিত হবে আলোক। আদর্শ যজ্ঞস্থলী হিমালয়। অধ্যাত্মস্বভাবে বিবেকানন্দ সমতলের নন—হিমালয়ের সন্তান। হিমালয়ের অদ্বৈতকে সমতলের দ্বৈতের মধ্যে স্থাপন করাই তাঁর জীবনব্রত।*

হিমালয়ে একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর বহুদিনের। সেভিয়ারদের সঙ্গে পরিচয়ের পরে তার ক্রমবৃদ্ধি হতে লাগল। সেভিয়াররা তাঁর অদ্বৈতকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৬, গ্রীষ্মে সেভিয়ারদের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণকালে স্বামীজী যখন আলপস্ পর্বতের তুষারভূমিতে বিচরণ করছিলেন, তখন তাঁর মন আচ্ছন্ন ছিল হিমালয়স্মৃতিতে। হিমালয়-মঠের বহুপোষিত আকাঙ্ক্ষা এঁদের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। জীবনের কর্ম যখন সাঙ্গ হবে তখন তিনি চলে যাবেন হিমালয়-আশ্রমে—শান্তির মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে। সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যরা একসঙ্গে থাকবে—তাদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে দেবেন। তারপর ভারতীয় শিষ্যরা যাবে পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত শিক্ষা দিতে, আর পাশ্চাত্ত্য শিষ্যরা ভারতে থেকে যাবে—এখানকার মানুষদের কল্যাণকর্ম সম্পাদনে। সেভিয়াররা স্বামীজীর কথা শুনে বলেছিলেন, "আহা, তা যদি করা যায় কী অপূর্ব হবে স্বামীজী! এমন একটি মঠ করতেই হবে।"

এই সময়কার নানা চিঠিতে হিমালয-আশ্রমের স্বপ্ন ও পরিকল্পনার কথা ছড়িয়ে আছে। ৫ অগস্ট, ১৮৯৬, আলমোড়ার লালা বদ্রী শা'কে লেখেন : "আলমোড়ায়, কিংবা কাছাকাছি অন্য জায়গায় একটা মঠ করতে চাই।..আলমোড়ার কাছাকাছি মঠের উপযোগী বাগানসুদ্ধ জায়গা আপনার সন্ধানে আছে? একটা গোটা ছোট পাহাড় পেলে ভাল হয়।" [৭—২৬১]। ঐ বছরই ২১ নভেম্বর, একই জনকে : "আমার সঙ্গে তিনজন ইংরেজ বন্ধু আছেন। তাঁদের দুজন—মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার আলমোড়ায় আস্তানা গাড়বেন। তাঁরা আমার শিষ্য। আপনি জানেন, তাঁরা আমার জন্য হিমালয়ে মঠ তৈরি করে দেবেন। এইজন্য আপনাকে উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করে দিতে বলেছিলাম। একটা ছোট গোটা পাহাড় চাই—সামনে খোলা থাকবে তুষার শৃঙ্গমালা।" [৭-৩০৬]। আগের তারিখে আলাসিংগাকে লেখেন : "মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর পত্নী হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে একটা আস্তানা জোগাড় করবেন—তাতে আমি আমার হিমালয়-কেন্দ্র আরম্ভ করব, যেখানে অধিকন্তু পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় শিষ্যরা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী রূপে বাস করবে।" [৭-৩০৪]। ২৮ নভেম্বর হেল-ভগিনীদের : "এখন কলকাতায় একটা আর হিমালয়ে একটা—এই দুটি কেন্দ্র স্থাপনে আমি উদ্যোগী। হিমালয়-কেন্দ্রটি হবে ৭০০০ হাজার ফুট উঁচু একটা গোটা পাহাড় নিয়ে—গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ-শীতল, শীতে বরফ-শীতল। ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার সেখানে থাকবেন—সেটি হবে ইউরোপীয় কর্মিদের কেন্দ্র। তাদের আমি ভারতীয় জীবনযাত্রা এবং আগুনে ঝলসানো প্রান্তরে ঠেলে দিয়ে মেরে ফেলতে চাইনা।" [৭-৩০৮]।

* উপরের চিঠিগুলি ভারতের বাইরে থাকাকালে স্বামীজী লেখেন। তারপর ভারতে ফিরে, ১৮৯৭ গ্রীষ্মে তিনি আলমোড়ায় সফরে গিয়ে, হিমালয়-কেন্দ্র স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন, এবং তা আলমোড়াবাসীকে কিরকম ভাবাবেগ দান করেছিল, তার কাহিনী আগেই বলেছি। [৩য়, ১৫-১৬]। অভিনন্দনের উত্তরদানকালে ব্যাকুল হয়ে তিনি হিমালয়বন্দনা করেছিলেন। তারপর মঠস্থাপন প্রসঙ্গে বলেন :

"আমার মাথায় এখনো হিমালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার সংকল্প আছে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানটিই কেন সার্বভৌমিক ধর্মশিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে নির্বাচন করিয়াছি, তাহা সম্ভবতঃ তোমাদের বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছি। হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ জড়িত। যদি ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে হিমালয়কে বাদ দেওয়া যায়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। অতএব এখানে একটি কেন্দ্র অবশ্যই চাই। এ কেন্দ্র কর্মপ্রধান হইবে না—এখানে নিস্তব্ধতা, শান্তি ও ধ্যানশীলতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিবে।" [৫-২৫৫]।

গভীর আগ্রহের সঙ্গে, ব্যস্ত হয়ে, সেভিয়াররা উপযুক্ত স্থানসন্ধান করেছিলেন। বেশ-কিছু জায়গা দেখাশোনা করেও পছন্দ করতে পারেননি। দেরাদুন, মসুরী প্রভৃতি জায়গা পছন্দ হয়নি, আলমোড়া শহরও নয়। অবশেষে তা মিলল—"লাজুক ক্যাপ্টেন এবং তাঁর কল্পনাপ্রবণ পত্নী" জায়গাটি দেখে খুশি হলেন। আলমোড়া শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একেবারে নির্জনে, সত্যই একটি গোটা পাহাড়ের উপরে, সেই স্থানটি। আগে ছিল তা চা-বাগানের সম্পত্তি, মালিক ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন জেনারেল মিঃ ম্যাকগ্রেগর।

সাত হাজার ফুট উঁচু পাহাড়, আরও কয়েকশো ফুট উপরে আছে একটি সুন্দর অগভীর হ্রদ, সামনে তুষারশৃঙ্গমালা, অসীম নির্জনতা, দীর্ঘ উন্নত দেওদারের গভীর নিশ্বাসে মথিত হয় দিনে-রাতে—এমনই স্থানে, শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মদিনে, ১৮৯৯ সালের ২১ মার্চ, অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হল। জায়গাটির নাম ছিল মায়াপিট—বদলে করা হল মায়াবতী। নিকটতম রেলস্টেশন ৬০ মাইল দূরে।

অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তার প্রসপেক্টস্ প্রকাশিত হল প্রবুদ্ধ ভারতে, নভেম্বর, ১৮৯৯, এবং সাদরে উদ্ধৃত হল বেশ কয়েকটি সাময়িকপত্রে।১ প্রসপেক্টসটি প্রচারিত হয়েছিল মিসেস সি ই সেভিয়ার, জে এইচ সেভিয়ার এবং স্বামী স্বরূপানন্দের নামে। এটি কিন্তু স্বামীজীরই লেখা—মার্চ, ১৮৯৯, তারিখের একটি চিঠির সঙ্গে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন।২ মহনীয় ভাষায় স্বামীজী এই লেখার সূচনায় মূলগত অদ্বৈতসত্যের কথা বলেন। বহুত্বে একত্বই সেই শাশ্বত সত্য। পরাধীনতাই দুঃখ—স্বাধীনতাই সুখ। অদ্বৈত দেয় স্বাধীনতা, দ্বৈতে আছে পরাধীনতা। স্বামীজী লিখেছিলেন :

"অদ্বৈতই একমাত্র মতবাদ যা মানুষকে স্বাধিকার দান করে; সর্বপ্রকার পরাধীনতা ও তৎসংশ্লিষ্ট কুসংস্কার দূর করে আমাদের যন্ত্রণাবহনে ও কর্মসম্পাদনে শক্তিশালী করে তোলে; পরিশেষে দান করে পূর্ণ স্বাধীনতা।"

দ্বৈতভাবের দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে এই বলপ্রদ সত্য মানবসমাজে এতদিন সম্যকভাবে প্রচার করা যায়নি—একথা বলার পরে, স্বামীজী অদ্বৈত আশ্রমের আপসহীন আদর্শের কথা সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন :

"এই এক এবং অদ্বিতীয় সত্যকে ব্যক্তির জীবনোন্নয়নের জন্য অধিকতর স্বাধীন ও পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে, বৃহত্তর মানবসমাজকে ঊর্ধ্বতর স্তরে স্থাপন করতে, আমরা হিমালয়ের এই উচ্চ প্রদেশে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করেছি। এই হিমালয়েই অদ্বৈতসত্য প্রথম উদ্গীত হয়।

"সকল প্রকার কুসংস্কার ও দুর্বলকর ভাব-সংক্রমণ থেকে অদ্বৈতসত্তা এইস্থানে মুক্ত থাকবে—আমরা তাই আশা করি। **বিশুদ্ধ অভেদ-তত্ত্ব ভিন্ন এখানে অন্য কিছুর শিক্ষা বা অনুশীলন হবে না। অপর মতবাদসমূহের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকবে, কিন্তু এই আশ্রম অদ্বৈত—কেবল অদ্বৈতের জন্যই—উৎসর্গীকৃত।**" [১০-২৬৩।৩

॥ ৪ ॥ স্বামীজীর মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গমন

অদ্বৈত আশ্রমের দুর্ভাগ্য, প্রতিষ্ঠাতা ক্যাপ্টেন সেভিয়ার অতঃপর দেড় বৎসরের বেশি জীবিত থাকেন নি। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের দুর্ভাগ্য—যাঁর স্বপ্ননয়নে তিনি এই আশ্রমের ছবি দেখেছিলেন—তাঁকে এই আশ্রমে উপস্থিত দেখে যেতে পারেননি। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের জীবনকালে স্বামীজী মায়াবতীতে আসতে পারেননি।

২৮ অক্টোবর, ১৯০০, ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের জীবনদীপ তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে নিভে গিয়েছিল—নিরুপায় পত্নীর চোখের সামনে। প্রায় কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়নি। প্রয়াত ক্যাপ্টেনের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী ভারতীয় পদ্ধতিতে তাঁর দেহের অগ্নিসংকার করা হয়, মায়াবতী আশ্রমেরই নিম্নপ্রান্তে, একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর ধারে, সেখানে গাছে-লতায় পাতায় জড়ানো আচ্ছন্ন শান্তি এবং মৃদু জলকলতান। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার অদ্বৈতবাদী ছিলেন; তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেখানে কোনো স্মারকচিহ্ন রাখা হয়নি।

ক্যাপ্টেনের দেহান্তে প্রবুদ্ধ ভারতে নভেম্বর, ১৯০০ সংখ্যায় যে-চরিতকথা লেখা হয়, ব্রহ্মবাদিন ডিসেম্বর সংখ্যায় সেটি উদ্ধৃত ক'রে বলে—এর প্রতিটি কথা সত্য এবং তা সত্যই সত্য।

"...মিঃ জে এইচ সেভিয়ার, অদ্বৈত আশ্রমের যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম; ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের বিশ্বস্ত বন্ধু। সর্বোচ্চ বৈদিক দর্শনের একনিষ্ঠ অনুগামী তিনি—খাঁটি অদ্বৈতবাদীর মতো অপর সকল মতবাদ সম্পর্কে সহজাত মানসিক উদারতা ও সার্বভৌমিকতায় সম্পন্ন; মানবিক সহানুভূতির মহত্ত্বে পূর্ণ; বিশ্বস্ত বিশুদ্ধ হৃদয়। 'হরি ওম্ তৎ সৎ!'—এই সামমন্ত্র শ্রবণে তিনি আনন্দিত হতেন, এই মন্ত্রেরই ধ্যান করতেন—দেহবন্ধন থেকে তাঁর আত্মার মুক্তির সময়ে সমবেত প্রেমপূর্ণ অনুগত হৃদয়গুলি পূর্ণকণ্ঠে পূর্ণপ্রাণে ঐকান্তিক সুরে ঐ মন্ত্রগানই করেছিল। ঐ মন্ত্রবাণীকেই অগ্রবর্তী ক'রে তিনি যেন অগ্রসর হন—পরমে বিলীন হবার তীর্থযাত্রায়।"

মঠে অল্পদিন কাটিয়ে স্বামীজী চললেন মায়াবতীতে—জানুয়ারি মাসের তীব্রতম শীতের সময়ে—সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। পথে তুষারঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন, জীর্ণ সরাইখানায় হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় রাত্রিবাস করতে হয়েছিল—তবু তাঁর বেপরোয়া ভালবাসা তাঁকে থামতে দেয়নি। স্বামীজীর সেই যাত্রা ও অদ্বৈত আশ্রমে কয়েকদিনের অবস্থান—সেখানকার পরমতম স্মৃতিসম্পদ।

কাঠগোদাম থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০০, সকালে হাঁটাপথে যাত্রা ক'রে [স্বামীজী ডান্ডীতে ছিলেন] চারদিন পরে, ৩ জানুয়ারি, ১৯০১, দ্বিপ্রহরে স্বামীজী মায়াবতীতে

পৌঁছান। স্বরূপানন্দের ডায়েরি এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, স্বামীজী কতখানি অসুস্থ ছিলেন, এবং কি পরিমাণ ঝুঁকি নিয়েছিলেন।৪

অদ্বৈত আশ্রম কোন্ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে—ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের অবর্তমানে তার ভবিষ্যৎ কী—সেই দুশ্চিন্তার ভার স্বামীজীর মনে ছিলই। মিস ম্যাকলাউডকে ১১ ডিসেম্বর, ১৯০০, লিখেছিলেন; "পরশু রাত্রে [বেলুড়ে] পৌঁছেছি। হায়! তাড়াহুড়া করে এসেও ফল হল না। কিছুদিন আগেই বেচারা ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। [দেখা যাচ্ছে, কোনো অজ্ঞাত শক্তিতে স্বামীজী ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের আসন্ন মৃত্যুর বিষয় ভ্রমণকালেই বুঝতে পেরেছিলেন]। এভাবে দুজন মহাপ্রাণ ইংরাজ আমাদের জন্য—হিন্দুদের জন্য—জীবন দিলেন। শহীদ বলে যদি কোথাও কেউ থাকে—এ'রা তাই। মিসেস সেভিয়ারকে এইমাত্র চিঠি লিখলাম—তাঁর ভাবী কার্যক্রম জানবার জন্য।" [৮-১৬৫]। মিসেস ওলি বুলকে ১৫ ডিসেম্বর যে-চিঠি লিখলেন, তাতে বেদনা ও দুশ্চিন্তা দুই-ই প্রকাশ পেল : "মিঃ সেভিয়ার দেহত্যাগ করেছেন। সত্যই দারুণ আঘাত। জানিনা, হিমালয়ের কাজের ভবিষ্যৎ কি! মিসেস সেভিয়ার এখনো সেখানে আছেন, রোজই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আশা করছি।" [৮-১৬৬]। মায়াবতী যাত্রার আগের দিন, ২৬ ডিসেম্বর, মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী পুনশ্চ ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করলেন। এই আশার খবরও দিলেন, মিসেস সেভিয়ার অবিচলিত আছেন : "প্রিয় মিঃ সেভিয়ারের.. সৎকার করা হয়েছে হিন্দুরীতিতে, তাঁর আশ্রমের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটির তীরে। পুষ্পমাল্যশোভিত তাঁর দেহ বহন করে নিয়ে গিয়েছিল ব্রাহ্মণেরা আর বেদধ্বনি করেছিল ব্রহ্মচারীরা। আমাদের আদর্শের প্রয়োজনে এরই মধ্যে শহীদ হয়ে গেলেন দু'জন ইংরাজ। [অপরজন গুডউইন]। প্রিয় পুরাতন ইংলণ্ড —তার বীর সন্তানগণ—প্রিয়তর হয়ে উঠেছে আমার কাছে। ভবিষ্যৎ ভারতের তরুণ বৃক্ষের মূলে মহামায়া ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ শোণিতসিঞ্চন করছেন—জয় হোক তাঁর। প্রিয় মিসেস সেভিয়ার আত্মস্থ আছেন। প্যারিসের ঠিকানায় যে-চিঠি আমাকে তিনি লিখেছিলেন, তা এই ডাকে ফিরে এল। আগামীকাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাত্রা করব। ঈশ্বর এই প্রিয় সাহসী প্রাণকে আশীর্বাদ করুন।" [৮-১৭২]।

গভীর বেদনায় আক্রান্ত বিবেকানন্দ দুঃখের গহনে আলোকসন্ধান করছিলেন। এই চিঠিতেই লিখলেন :

সম্মুখে তাকাই—তাকাই পিছনে
সকলই নিত্য, সকলই ঠিক,
আমার গভীর দুখের গহনে
আত্মার দীপ নির্নিমিখ।

মায়াবতীতে পৌঁছে, সবকিছু দেখে, আশ্বস্ত হয়ে, স্বামীজী মিসেস ওলি বুলকে ৬ জানুয়ারি, ১৯০১, লিখেছিলেন : "মিসেস সেভিয়ার দৃঢ়চিত্ত মহিলা, সাহসের সঙ্গে, শান্তভাবে নিজের ক্ষতিকে সহ্য করছেন।...স্থানটি অত্যন্ত সুন্দর, আর এরা একে অপরূপ করে তুলেছে। বিরাট জায়গা, অনেক একর, সযত্নরক্ষিত। আশা করি, মিসেস সেভিয়ার একে রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্য তিনি সর্বদাই তেমন ইচ্ছা করছেন।...মিসেস সেভিয়ারের

৪ স্বরূপানন্দের ডায়েরিকে অবলম্বন ক'রে, অন্যান্য সূত্র থেকে আরও তথ্যসংগ্রহ ক'রে, ব্রহ্মচারী অমল, মায়াবতীতে স্বামীজীর দৈনন্দিন জীবন-সংবাদ পরিবেশন করেছেন প্রবুদ্ধ ভারতে, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ সংখ্যায়।

জমিগুলি দেখতে-দেখতে বরফের উপর দিয়ে মাইলখানেক চড়াই ভেঙেছি। চারদিকে সুন্দর রাস্তা তৈরি করেছেন। অনেক বাগিচা, খেত, ফলের বাগান এবং বিস্তৃত বন—সবই তাঁর এলাকায়। থাকার বাড়িগুলি যেমন সাদাসিধে, তেমনি পরিচ্ছন্ন, অথচ কী সুন্দর। সর্বোপরি কাজকর্মের উপযোগী।...কালী দুটি বলি গ্রহণ করেছেন—আমাদের আদর্শের প্রয়োজনে দুজন ইউরোপীয় শহীদ হয়েছেন—এখন তা অপূর্বভাবে উত্থিত হবে।" [৮-১৭৩-৭৪]

স্বামীজী দেখছিলেন, আর স্বপ্ন দেখছিলেন। ঐ চিঠিতেই লেখেন : "চারদিকে ৬ ফুট পুরু বরফ; উজ্জ্বল গরীয়ান সূর্য; এখন দিবা-দ্বিপ্রহর, বাইরে বসে আছি আমরা, আমার বই পড়ছি। চারধারে বরফ আর বরফ। তা সত্ত্বেও শীত নাতিতীব্র। বাতাস শুষ্ক ও সুখকর, জলের গুণ প্রশংসার অতীত।"

আশ্রমের লাগোয়া পাহাড়গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ হল ধরমগড়। তার উপর থেকে দেখা যায়, কেদার ও বদরী শিখর, অন্নপূর্ণা, ধবলগিরি এবং আরও নানা শৃঙ্গ। দেড় মাইল হেঁটে স্বামীজী একদিন ধরমগড়ের উপরে উঠে এমনই মোহিত হলেন যে, সেখানে ধ্যানের কুঠিয়া স্থাপনের ইচ্ছা করলেন। আশ্রমের এলাকার মধ্যে যে-ক্ষুদ্র হ্রদটি ছিল, তার ধারে পায়চারি করতে-করতে বিগলিত আনন্দে বললেন : "কাজকর্ম সাঙ্গ করে এখানে চলে আসব, কেবল লিখব, আর এই হ্রদের ধারে বাল্যকালের মতো সুখের শিস্ দিতে-দিতে ঘুরে বেড়াব।"

মিসেস সেভিয়ার তাঁর গভীর শোকের প্রহরগুলির মধ্যে এই খেলাভোলা শিশুটিকে পেয়েছিলেন : কখনো হাসছেন, কখনো রাগছেন, বিশেষতঃ খিদে পেলে মুহূর্তে চটিতং; খাবার পেলেই সব ভুলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন; বলেন, আরে বড্ড খিদে পেয়েছিল, তাইতো রেগে গিয়েছিলুম। মিসেস সেভিয়ার তাঁর গুরুকেও দর্শন করতেন : যখন দেখতেন —ধ্যানমগ্ন বিবেকানন্দ; স্তব্ধ হিমগিরি; অদ্বৈতে নিমজ্জিত শিব ও বুদ্ধ। কখনো দেখতেন —নেতাকে। তেমনি একদিনের কথা, ইংরাজি জীবনীতে যা আছে [যে-জীবনী মিসেস সেভিয়ারের তত্ত্বাবধানে রচিত] :

"একদিন কথা বলতে-বলতে স্বামীজী বাগ্মিতার অনর্গল প্রবাহ সৃষ্টি করলেন। সহসা আসন থেকে উঠে পড়ে ঘরের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর স্তরে-স্তরে উঠতে লাগল, আবেগে জ্বলতে লাগল দুই নয়ন, মনে হল, তিনি যেন বিশাল জনসমষ্টির সামনে বক্তৃতা করছেন। স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের বিষয়ে বলছিলেন। কী তাদের ভক্তি আর আনুগত্য! আদেশ দিলে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তেও প্রস্তুত। একজন দু'জন নয়—বহুজন তেমন করতে রাজি। নীরবে, সুগভীর ভালবাসায়, সবকিছু ঢেলে দিয়ে তারা তাঁর সেবা করেছে—যদি মুখের কথা খসিয়েছেন, তারা সবই ত্যাগ করতে উদ্যত। স্বামীজী চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—একবার ভেবে দ্যাখো ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের কথা—কিভাবে তিনি মায়াবতীতে আত্মোৎসর্গ করলেন!" [ইংরাজি জীবনী, তৃতীয় খণ্ড, ১৯১৫ সং, পৃ. ৪২৭]।

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার চলে গেলেও রয়ে গেলেন মিসেস সেভিয়ার—বৈধব্যের শুভ্রবাসে, তুষাররাজ্যের দিকে দৃষ্টি মেলে। আশ্রম-মাতা তিনি, শুধু আশ্রমের নন, আশপাশের সমস্ত গ্রামবাসীদেরও মাতা, তারা তাঁকে 'দেবী' বলত। মাদার সেভিয়ার আরও ১৭ বছর আশ্রমে কাটিয়েছিলেন। সেই নির্জনে কি করে কাটাতেন, এই প্রশ্ন করা হলে, একবাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন—"যখন মনে ভার নামে, আমি স্বামীজীর কথা ভাবি।"

যাঁর কথা মাদার সেভিয়ারের মননের বিষয় ছিল, সেই বিবেকানন্দ কেবল ব্যক্তিমানুষ নন, তিনি একটা সত্যের প্রতিনিধি। "স্বামীজী একটি গবাক্ষের মতো, যার মধ্য দিয়ে অনন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়"—ভগিনী নিবেদিতা একবার লিখেছিলেন। সেই অনন্তকেই 'মাতাজী' লাভ করতেন অদ্বৈত আশ্রমে—বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে। বিবেকানন্দ যে, সেই মহাদানের প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥ অদ্বৈত আশ্রমে অদ্বৈত-নীতির অন্যথা : স্বামীজীর ক্ষোভ : সেইসূত্রে শ্রীমা সারদাদেবীর পত্র

মায়াবতীর দিনগুলি স্বামীজীর পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির হয়নি। তাঁর একটি 'বিরক্তি' তাঁর জীবনীতে ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করেছে, এবং সেইসূত্রে একটি 'ঐতিহাসিক' পত্র রচিত হয়েছিল।

অদ্বৈত আশ্রমের স্বামীজী-রচিত প্রসপেক্টসের ইতিপূর্বে-উদ্ধৃত অংশে দেখা গেছে—এই আশ্রমে বিশুদ্ধ অদ্বৈতই মনন ও ধ্যানের বিষয়। স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছিলেন—রামকৃষ্ণ-সংঘের একটি কেন্দ্র অন্ততঃ থাক যেখানে বিশুদ্ধ নিরাকার অদ্বৈতের উপাসনা হবে। [পাঠকদের আশাকরি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না, নিরাকার দ্বৈত উপাসনাও কেউ-কেউ করতে চেষ্টা করেছেন, যেমন ব্রাহ্মরা। ব্রাহ্মদের ধর্মীয় ধারণার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে চতুর্থ খণ্ডে "বিবেকানন্দ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার" অধ্যায়ে]। মিঃ ও মিসেস সেভিয়াবের নেতৃত্বে সেই অদ্বৈত আশ্রম হয়েছে, সুতরাং সেখানে কেবল অদ্বৈত ভাবনা চলেছে, স্বামীজী তাঁর স্বপ্নসিদ্ধিতে উল্লসিত—কিন্তু একদিন অদ্বৈত আশ্রমে এমন একটি জিনিস দেখলেন, যা তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করল। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে পাই :

"কয়েকজন [অদ্বৈত] আশ্রমবাসীর একান্ত ইচ্ছায় একটি ঠাকুরঘর কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা হত। [মায়াবতীতে] উপস্থিত হবার পরে স্বামীজী একদিন সকালে সেই ঘরটি দেখতে পান। দেখেন যে, অদ্বৈত আশ্রমে রীতি-মতো ঠাকুরঘর চালু হয়ে গেছে; ধূপ-ধুনো, ফুল-ফল দিয়ে দিব্যি ভোগ-পূজা চলেছে। তখনি তিনি কোনো কথা বলেন নি। কিন্তু সন্ধ্যায় সকলে যখন অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসেছেন তখন তিনি অদ্বৈত আশ্রমের মতো জায়গায় ঠাকুরপূজা করার কঠোর সমালোচনা করলেন। বললেন, অত্যন্ত অনুচিত কাজ হয়েছে। অদ্বৈত আশ্রমে ধর্ম আচরিত হবে ব্যক্তিগতভাবে: আশ্রমবাসীরা নিজস্বভাবে ধ্যানাদি করবেন; একক বা সমবেতভাবে শাস্ত্রচর্চা করবেন; তাঁরা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদের অনুশীলন করবেন ও তার শিক্ষা দেবেন; দ্বৈতবাদের দুর্বলতা বা নির্ভরতা থেকে একেবারে দূরে থাকবেন।...স্বামীজী বললেন, এক্ষেত্রে বিচ্যুতির সমালোচনা করার অধিকার তাঁর আছে। তাছাড়া তিনি তাঁর নিজ গুরুর শিক্ষা ও আশী-র্বাদেই অদ্বৈতবাদী হয়েছেন; তিনি এ-বিষয়ে সচেতন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সর্বপ্রকার ধর্ম ধারণা শিক্ষা দেবার ও প্রচার করবার দায় দিলেও—তাঁর ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদের উপরই জোর দিয়ে গেছেন।

"অদ্বৈত আশ্রমে আনুষ্ঠানিক পূজা সম্বন্ধে স্বামীজী যদিও তাঁর কঠোর মনোভাব উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পূজাঘরটি অবিলম্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেননি—যাঁরা ওর জন্য দায়ী তাঁদের অনুভূতিতে আঘাত করার মতো কোনো কাজ তখন করেন নি। সেটা করলে কর্তৃত্বের জোর খাটানো হত। যাঁরা ও-কাজ করেছেন, তাঁরাই যেন নিজেদের ভুল বুঝে তার থেকে সরে যান—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু স্বামীজীর আপসহীন মনোভাব (যার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন তাঁর দুই অদ্বৈতবাদী শিষ্য, স্বামী স্বরূপানন্দ ও মিসেস সেভিয়ার)—আশ্রমবাসীদের মনের উপরে প্রভাববিস্তার করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত আদর্শ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবার জন্য, ও তাকে রক্ষা করবার জন্যই যে, স্বামীজী তাঁদের নিয়োগ করেছেন, সেটা গভীরভাবে অনুভব করে তাঁরা পূজা বন্ধ করে দেন—ক্রমে ঠাকুরঘরও বন্ধ হয়ে যায়।"

স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে প্রকাশিত এই বিবরণের বিশেষ মূল্য এইখানে—জীবনীটি লেখা হয় মিসেস সেভিয়ার ও স্বামী বিরজানন্দের [স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য] প্রত্যক্ষ

তত্ত্বাবধানে। অদ্বৈত আশ্রমের পূর্বোক্ত ঘটনা ঘটার কালে উভয়ই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই ওখানে মিলেছে। আরও উল্লেখযোগ্য—ভাবধারার ক্ষেত্রে স্বামীজীর ঐ দুই শিষ্য পরস্পর বিরোধী শিবিরে অবস্থিত—মিসেস সেভিয়ার কট্টর অদ্বৈতবাদী, আর স্বামী বিরজানন্দ ঠাকুরঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

"অতীতের স্মৃতি" [স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রণীত] গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আরও পাই : স্বামীজী, মিসেস সেভিয়ার এবং স্বরূপানন্দকে "খুব তিরস্কার" করেছিলেন—অদ্বৈত আশ্রমে নীতি-বিরুদ্ধ পূজাদি তাঁরা চলতে দিয়েছিলেন বলে। পরে বেলুড়মঠে ফিরে এই প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে স্বামীজী বলেছিলেন, "ভেবেছিলুম, অন্ততঃ একটি কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্যপূজাদি বন্ধ থাকবে। হায়, গিয়ে দেখি, বুড়ো ওখানেও জেঁকে বসে আছে।"

স্বামীজীর ক্রোধের বিশেষ কারণ—অদ্বৈত আশ্রমে পূজা ব্যাপারটি তাঁর কাছে এক ধরনের 'বিশ্বাসঘাতকতা।' অদ্বৈত আশ্রমের দুই প্রতিষ্ঠাতা ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার ঘোরতর অদ্বৈতবাদী, অদ্বৈত সাধনার জন্যই আশ্রম স্থাপন করেছেন, সেখানকার প্রধান কর্মী স্বরূপানন্দও তাই—সেই আশ্রম যেহেতু রামকৃষ্ণ-সংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—তারই জোরে সাধু-ব্রহ্মচারীরা যদি সেখানে রামকৃষ্ণ-পূজা আরম্ভ করে দেন, তাহলে সেটা ভাবালুতা-কেন্দ্রিক গোঁড়ামি হয়ে দাঁড়ায়, আর একইসঙ্গে নেতার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ঘটায়।

ঠাকুরঘরের প্রতিষ্ঠাতৃগণ (যাঁরা স্বামীজীর শিষ্য) কিন্তু স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাহলে কে তাঁদের সংশয়ের নিরাকরণ করবেন—বিশেষতঃ স্বামীজী যেখানে প্রতিপক্ষ? সে অধিকার একজনেরই ছিল—শ্রীমা সারদাদেবী। স্বামী বিমলানন্দ তাঁকে এসম্পর্কে প্রশ্ন ক'রে পত্র দিয়েছিলেন। স্বামী বিমলানন্দের এই কাজ দুটি জিনিস স্পষ্ট করে তোলে। এক, যাঁরা সর্বস্ব দিয়ে ধর্মকে বরণ করেন, তাঁরা মূলে যখন আহত হন, তখন স্বামীজীর মতো গুরুর কৃতকর্ম বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসার্থিত হতে পারেন। দুই, সংঘের কাছে শ্রীমা সারদাদেবী কেবল গুরুপত্নী ছিলেন না, তিনি গুরুর প্রতিনিধি, সংঘজননী এবং সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ।৫

সারদাদেবী বিমলানন্দের পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁর পত্রটিকে আমি একটি ঐতি-হাসিক পত্র বিবেচনা করি। রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এই পত্রের স্থান আছে। এই আন্দোলন যেহেতু ভারত ও পৃথিবীর ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে, তাই এর ইতিহাসে যদি কোনো রচনার বিশেষ মূল্য থাকে তাহলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

একথাও স্বীকার্য—পত্রলেখিকা লেখিকা-হিসাবে মোটেই গণ্য নন। তিনি স্বহস্তেও লিখতেন না। ঠিকভাবে বলতে গেলে—তিনি লিখতেই পারতেন না। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'নিরক্ষর' স্বামীকেও অতিক্রম করেছেন। 'নিরক্ষর' শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্যই লিখতে জানতেন, আর অতি সুছাঁদ ছিল তাঁর হস্তাক্ষর। এ-বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। [২য়, ২৫৭]।৬

৫ সোজা ভাষায় সংঘের 'হাইকোর্ট'।' স্বামী শিবানন্দ ঐ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দের "শ্রীমা সারদাদেবী" গ্রন্থে পাই—একবার এক ব্রহ্মচারী কি-একটা অন্যায় কাণ্ড ক'রে ফেলে পাছে স্বামী শিবানন্দ তাঁকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেন সেই ভয়ে একেবারে সোজা পায়ে হেঁটে জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের কাছে হাজির হন। শ্রীমা উক্ত ব্রহ্মচারীকে ক্ষমা করার অনুরোধ জানিয়ে শিবানন্দ-স্বামীকে পত্র দেন। ছেলেটিকে সেইসঙ্গে মঠে পাঠিয়ে দেন। "ব্রহ্মচারী মঠে পেঁৗছিলে শিবানন্দজী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ব্যাটা, তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গিয়েছিলি?"

৬ স্বামী গম্ভীরানন্দের "শ্রীমা সারদাদেবী" গ্রন্থে সারদাদেবীর লেখাপড়ার কিছু সংবাদ আছে। বিয়ের আগে নিজের পড়াশোনা সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছেন : "ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ (জ্ঞাতিভাই),

সারদাদেবীর পত্রটি থেকে দেখা যায়, তাতে বর্ণাশুদ্ধি যথেষ্ট, ভাষাও সুগঠিত নয়। পত্রের বক্তব্য শ্রীমা বলে গিয়েছিলেন, সঙ্গিনী বা সেবকদের কেউ তা লিখে দেন। অর্থাৎ সাহিত্যের বিচারে পত্রটি কিছুই নয়। এসব সত্ত্বেও বলতে হবে—এর মধ্যে এমন-কিছু বস্তু আছে যার মূল্য অপরিসীম।

এই পত্রের উপরে উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৭৯, সংখ্যায় আমি একটি প্রবন্ধ লিখি—যার মধ্যে সম্ভবতঃ পত্রটি প্রথম সম্পূর্ণতঃ প্রকাশিত হয়। অংশতঃ অবশ্য পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে পত্রটির একটি ফটোকপি আমি পেয়েছিলাম।

যতদূর দেখেছি, পত্রটির প্রয়োজনীয় অংশ স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীর তৃতীয় খণ্ডে (১৯১৫ খ্রীঃ) প্রথম বেরিয়েছিল। সেখানে কিন্তু শ্রীমায়ের কথার আক্ষরিক অনুবাদ নেই। তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর "অতীতের স্মৃতি" গ্রন্থে স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরি থেকে উক্ত পত্রের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর "শ্রীমা সারদাদেবী" গ্রন্থে নিয়েছেন ইংরাজি জীবনীর অনূদিত বক্তব্য, আর "যুগনায়ক বিবেকানন্দ" গ্রন্থে "অতীতের স্মৃতি" গ্রন্থের উদ্ধৃতি। স্বরূপানন্দের ডায়েরি আমি স্বামী অব্জজানন্দের সৌজন্যে দেখতে পেয়েছিলাম—সেখান থেকে ব্যবহার করেছি "নিবেদিতা লোকমাতা" (১ম) গ্রন্থে। স্বরূপানন্দের ডায়েরিতে আছে : "খগেন [বিমলানন্দ] মাতা ঠাকুরাণীর পত্র পাইল, জয়রামবাটী হইতে, ১৩০৯, ১৫ ভাদ্র, ৩১ অগস্ট, ১৯০২।" অতঃপর ডায়েরিতে মাতা ঠাকুরাণীর পত্রের দরকারী দু'এক লাইন অংশ উদ্ধৃত।

পত্রটি সম্পূর্ণতঃ এই :

শ্রীগুরবে নম

জয়রামবাটী
১৩০৯/১৫ই ভাদ্র

নিরাপদেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদবিশেষ—

বাবাজী—১খানপত্র পাইয়া জ্ঞাত আছি। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জন্য যে কষ্ট হইতেছে লিখিয়া কি জানাই। আমাদের গুরু জিনি তিনিত অদ্বৈত—তোমরা সেই গুরুর শিস্য তখন তোমরাও অদ্বৈত বাদী। আমি যোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা

ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সঙ্গে কখনও-কখনও যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম।" বিয়ের পরে লেখাপড়া সম্বন্ধে বলেছেন : "কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু-একটু পড়তুম। ভাগনে [হৃদয়] বই কেড়ে নিলে; বললে, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই; শেষে কি নাটক নবেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি একআনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত; সে এসে আবার আমায় পড়াত।"

সারদাদেবীর কথায় আরও জানা গেছে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে আরও একটু ভাল করে শিখতে পেরেছিলেন। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে স্নান করতে এসে তাঁকে পড়িয়ে যেতেন। শ্রীমা তাঁকে মাইনে-রূপে (গুরুদক্ষিণারূপে!) বাগানের শাকপাতা দিতেন। "এই বিদ্যাভ্যাসের ফলে তিনি রামায়ণাদি পড়িতে পারিতেন কিন্তু লিখিতে বিশেষ পারিতেন না। এমনকি শেষ বয়সে নাম-সহি পর্যন্ত করিতে পারিতেন না।"

নিবেদিতার লেখায় এই নিরক্ষর মহিলার অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার বহু কথা আছে। তার কিছু আমরা "নিবেদিতা লোকমাতা" (১ম) গ্রন্থে পরিবেশন করেছি।

অবশ্য অদ্বৈতবাদী। মিসেস সেভিয়ারকে আমার ভালবাসার সহিত আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। কালী কৃষ্ণ তথায় যাইবেক জানিয়া মতি লালের ১খান পত্র পাইয়াছি। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। মেয়ে মানুষের মঠ৭—মঠে সাবধানে থাকিবে। আর স্বামীজির যোর নাই। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমাদের সংবাদ লিখিবে। ইতি

তোমাদের মাতা
আশীর্বাদীকা

স্বামীজীর সমর্থক বক্তব্য হিসাবেই শ্রীমা সারদাদেবীর আলোচ্য পত্রটি এতাবৎ বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু ওটি কি সারদাদেবীর জীবনীর পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ? যদি একবার ভেবে দেখি—কী সহজে স্বচ্ছন্দে পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তিনি নিত্য সত্যের ভূমিতে অধিষ্ঠিত থাকতেন—তাহলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সারদাদেবী নারী এবং মাতা, দৈনন্দিন জীবনে স্বতঃই দ্বৈতবাদী, তাঁর পূজার দেবতা আবার নিজ স্বামী, যিনি একইসঙ্গে তাঁর কাছে গুরু এবং ঈশ্বর, সারাদিন তাঁরই পূজাতে কাটে—সেই স্বামী-গুরু-ঈশ্বরের পূজার পট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে—গুরুর প্রধান পার্ষদ-শিষ্যের ইচ্ছায়—তখন সারদাদেবী কি সিদ্ধান্ত দিলেন? তিনি এই চমৎকারজনক কথাটি বললেন—অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা বন্ধ করিয়ে স্বামীজী ঠিকই করেছেন!! আমাদের লৌকিক বুদ্ধিতে এ-বস্তু অলৌকিক। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর পক্ষেই এ-জিনিস করা সম্ভবপর। শ্রীরামকৃষ্ণ, একথা স্মরণ করা যেতে পারে, অদ্বৈতসাধনার সময়ে, জ্ঞানের অসিতে মাতৃমূর্তিকে পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন—"ও সারদা, সরস্বতী" —সে কথার আর কোন্ সমর্থক প্রমাণ প্রয়োজন?

পত্রটির আর একটি বিশেষ মূল্য আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের এবং রামকৃষ্ণ-সংঘের সর্বোচ্চ ধর্মধারণা কি—সে-বিষয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এই পত্র তার মীমাংসা করে দেবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়াচার্য সত্য, কিন্তু তিনি নিজে অদ্বৈতবাদীও। তাঁর ধর্মমত নিয়ে অবশ্য তর্ক আছে। তিনি কি দ্বৈতবাদী, না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, নাকি অদ্বৈতবাদী? কথামৃত পড়ে অনেকেই তাঁকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মনে করেন। দর্শনের বিশিষ্ট অধ্যাপক-লেখক অধরচন্দ্র দাস বই লিখে ["এ মডার্ন ইনকারনেশন্ অব গড্"] প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ মোটেই অদ্বৈতবাদী নন—অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ জোর করে তাঁকে অদ্বৈতবাদী প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।৮ এক্ষেত্রে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তের জন্য প্রমাণপত্র চাই। সারদাদেবীর পত্রটি সেইপ্রকার চূড়ান্ত প্রমাণপত্র।

৭ "মেয়ে মানুষের মঠ"—কথাটি চিঠির মার্জিনে লেখা ছিল। অদ্বৈত আশ্রমের কর্ত্রী ছিলেন মিসেস সেভিয়ার—সেইজন্য শ্রীমা ঐরূপ লিখেছিলেন।

৮ না, স্বামী সারদানন্দও একই দোষে দোষী। তিনি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" [১ম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, ৩৩২] গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সাক্ষাৎ যা শুনেছেন, তার উপর নির্ভর করে লিখেছেন :

"অদ্বৈতভাব-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুর এইকালে আর একটি বিষয়ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ ভারতের প্রচলিত প্রধান-প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা; ঈশ্বরপ্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।'"

আরও স্মরণ করাতে চাই—শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়াচার্য হওয়ার সঙ্গে অদ্বৈতবাদী হওয়ার বিরোধ তো নেইই, বরং বলা যায়, অদ্বৈতবাদী না-হলে তিনি সমন্বয়াচার্য হতে পারতেন না। সমন্বয়বাদীদের বক্তব্য : যে-কোনো পথ ধরে অগ্রসর হওয়া যাক না কেন, যদি যথার্থ ব্যাকুলতা থাকে, তাহলে চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। মাত্র অদ্বৈতবাদীরাই একথা বলতে পারেন কারণ তাঁরা পথের প্রান্তে কোনো সাকার ভগবানকে স্বীকার করেন না। পরিণতিতে যাঁদের কাছে মূর্তি নেই—এক অদ্বয় সত্তাকেই যাঁরা সর্ববিধ ঈশ্বরীয় রূপের মূল বলে গ্রহণ করেন—তাঁরা একটিমাত্র পথকে সত্য বলতে পারেন না। অপরদিকে দ্বৈতবাদীরা যেহেতু তাঁদের সম্প্রদায়-স্বীকৃত সাকার ভগবানকেই মানেন, তাই সেই ভগবানের কাছে উপস্থিত হবার জন্য সম্প্রদায়গত পথটিকেও একমাত্র অবলম্বনীয় বলে ধারণা করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। দ্বৈতবাদীরা খুব উদার হলে বড়জোর ভিন্নমতাবলম্বীদের "সহ্য" করেন—কিন্তু কদাপি "স্বীকার" করেন না।

অদ্বৈতবাদীরা আপেক্ষিক জগতের সৃষ্টিবোধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—মায়ার দ্বারাই ঐ জিনিস হয়ে থাকে। ঐ মায়া ক্ষেত্রবিশেষে 'শক্তি' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—ব্রহ্ম যদি অগ্নি, শক্তি তার দাহিকা। কিন্তু অগ্নিরই দাহিকাশক্তি—দাহিকাশক্তির অগ্নি নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মের শক্তি সারদা—সজোরে মূল সত্যরূপকে প্রকাশ করেছেন :

"আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত।"

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায়

ভারতীয় সংহতির প্রশ্নে স্বামী বিবেকানন্দ

॥ ১ ॥ ভারতীয় "সংহতির" জন্য স্বামীজীর উৎকণ্ঠা

স্বামীজীর বড় ইচ্ছা ছিল—কাজ কর্মের বোঝা নামিয়ে দিয়ে তিনি মায়াবতীর হ্রদের ধারে সুখের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে পায়চারি করবেন। হায় ইচ্ছা! হিমালযের বরফও শীতল করতে পারবে না, এমন অগ্নিকুণ্ড মাথায় নিয়ে তিনি ঘুরতেন। মায়াবতীতে অবস্থানকালে তিনি তিনটি প্রবন্ধ লেখেন, যাদের মধ্যে তাঁর মনের যন্ত্রণার রূপ আঁকা আছে। প্রবন্ধগুলিতে তিনি ভারতের উদ্দেশে শেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সেগুলি হল—"আর্য ও তামিল", "সামাজিক সম্মেলন অভিভাষণ," "থিয়জফি সম্বন্ধে কিছু চিন্তা।" [*Aryans and Tamilians; The Social Conference Address; Stray Thoughts on Theosophy*] যতদূর জানি, এই তিনটিই স্বামীজীর শেষ তিন রচনা।

স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরি থেকে জানা যায়—স্বামীজী প্রথম প্রবন্ধটি লেখেন ১০ জানুয়ারি, ১৯০১, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায়। সেটি তিনি আশ্রমবাসীদের পড়ে শোনান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ লেখা শুরু হয় ১৪ জানুয়ারি—কবে শেষ হয়, ডায়েরিতে লেখা নেই। প্রবন্ধগুলির একটিই মাত্র স্বামীজীর নামে প্রবুদ্ধ ভারতে বেরোয়—"আর্য ও তামিল"—জানুয়ারি, ১৯০১। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি একই সংখ্যায় বেরিয়েছিল, কিন্তু লেখকের নাম ছিল না। তৃতীয় লেখাটি, লেখকের নাম ছাড়াই অংশতঃ বেরিয়েছে।

স্বামীজীর শেষ তিন রচনার অন্যতম হিসাবে "আর্য ও তামিল" প্রবন্ধটির গুরুত্ব আছে জীবনীকারদের কাছে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে এটি অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হবে, বিষয়গুরুত্বের জন্যই। প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে ভারতের ঐক্য ও সংহতি প্রশ্নের বিশেষ যোগ আছে। স্বাধীনতার আগে ভারতীয় সংহতি-প্রশ্নের যে-গুরুত্ব ছিল, স্বাধীনতার পরে তা মোটেই কমেনি, ববং ক্ষেত্রবিশেষে বেড়েছে। এই জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগ করা হয়েছে। অসহায় কোটি-কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে সে খেলার শেষ এখনো হয়নি। ভারতের বর্জিত অংশ থেকে মার-খাওয়া মানুষগুলি যখন আশ্রয়ের সন্ধানে এদেশে আসে, তখন কখনো তাদের গুলি ছুঁড়ে ভাগিয়ে দেওয়া হয়, আবার কখনো, যদি তারা এসেই পড়ে এবং মরীয়া-কষ্টে কুঁড়ে তুলে তাতে ঢুকে পড়ে, তখন বিদেশী বলে সে কুঁড়েতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে এখন নবোদ্যমে শুরু হয়েছে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা—রুটি ছুঁড়ে দিয়ে আত্মার ঘৃণ্য ধর্ষণ। দেশ-বিদেশের খ্রীস্টধর্ম-সাম্রাজ্যবাদীরা জয়ধ্বনি দিচ্ছে তার। সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতার কালো লাভা গড়িয়ে ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে চাইছে।

বিবেকানন্দ একদিন সবলে অন্ধকার থেকে এই দেশকে টেনে তুলে আলোকের সম্মুখীন করে দিয়েছিলেন। সেই তিনি, পরবর্তী সম্ভাব্য নিম্নগতির কথা কি ভাবেন নি?

অবশ্যই ভেবেছিলেন। জাতিভেদের বিষাক্ত রূপ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণের কথা আমরা জানি। তাঁর আরও গুরুতর সংগ্রাম—বিশেষাধিকারের বিরুদ্ধে—এবং বঞ্চিত মানুষের পক্ষে—তাদের ভোগসম্পদ লাভ ও আত্মপ্রত্যয়ী শিক্ষার সমর্থনে। সে প্রশ্ন এখানে আলোচ্য নয়। এখানে প্রধানতঃ আমরা আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তথ্যযোগে তুলে ধরব।

॥ ২ ॥ প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে স্বামীজীর ভারত-চেতনার রূপ : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সিস্টার ক্রিস্টিন : সুন্দররাম আয়ার : ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষ্য

ঐ প্রশ্নে প্রবেশের আগে দেখে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে—ভারতের কোন্ সামগ্রিক রূপের দর্শন তিনি করেছিলেন। সে চেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিবেকানন্দের ভারত-দর্শনকে ধারণায় আনার ক্ষমতা আর যারই থাক, এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি লেখকের নেই। একটু ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে বলতে পারি—ভারত-মহাসাগরের সমগ্র ধ্বনিকে কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে ধরিয়ে দেবার মতোই দাঁড়াবে সে প্রয়াস। এখানে উপায়—ঐ সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত দু'একটি শঙ্খের ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করা। আর সর্বোত্তম যে শঙ্খের কথা আমি জানি—তিনি নিবেদিতা।

সূচনা করব কিন্তু সিস্টার ক্রিস্টিনের কয়েকটি লাইন দিয়ে :

"আমি মনে করি, আমাদের ভারতপ্রেমের জন্ম হয়েছিল যখন আমরা স্বামীজীকে *I-n-d-i-a* শব্দটি তাঁর সেই অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভাবি—পাঁচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অতকিছু ধরিয়ে দেওয়া যায়। তাতে ছিল—ভালবাসা, জ্বালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা—এবং পুনশ্চ ভালবাসা—ভালবাসা। কোনো বিরাট গ্রন্থও এই-ভাবে অপরের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চারে সমর্থ নয়। অন্যের অন্তরে প্রেমসঞ্চারের যাদুশক্তি ওর মধ্যে ছিল। যে-ই তা শুনত, তার কাছে ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা; তখন ভারতের সবকিছুই তার আগ্রহের বস্তু; তার জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-স্থাপত্য, আচার-ব্যবহার, নদী-পর্বত-উপত্যকা-সমভূমি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্মধারণা, শাস্ত্রাদি—সবকিছু জীবন্ত।" ['রেমিনিসেনসেস্' ১৫৭-৫৮]

নিবেদিতার বর্ণনা দেবার আগে আরও দু'একজনের বক্তব্য স্মরণ করা যাক। "ভারতকে ভালবাসতে হলে ভারতকে জানতে হবে"—স্বামীজীর সূত্রে ক্রিস্টিন এই যে-কথা বলেছেন, তার সার্থকতা স্বামীজীর জীবনে কিভাবে ঘটেছিল, তা বলেছেন বিখ্যাত লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত :

"বিবেকানন্দের ছিল এক অপরিমেয় সুযোগের সৌভাগ্য—তিনি এমন একজন আচার্যের পাদমূলে বসে শিক্ষালাভ করতে পেরেছিলেন, যাঁর তুল্য কাউকে পৃথিবী বহুশত বৎসর পায়নি। তারপর, বিবেকানন্দ জেনেছিলেন কাকে বলে দারিদ্র্য আর ক্ষুধা। তিনি পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ ভারতের দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে বিচরণ করেছিলেন—তাদের প্রতি ঢেলে দিয়েছিলেন ভালবাসা। প্রাচীন আর্য ঋষিদের প্রজ্ঞার নিত্য-উৎসের বারিতে নিজের গভীর তৃষ্ণা তিনি মিটিয়েছেন। দুর্ধর্ষ সাহসের অধিকারী তিনি—অবিচলিত প্রতাপে পৃথিবীর সম্মুখীন হয়েছেন। ধর্মমহাসভায় যখন তাঁর শঙ্খকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল, তখন অন্যের নাড়ির স্পন্দন হয়েছিল দ্রুততর, যাঁরা ভাবমগ্ন তাঁদের নয়ন উজ্জ্বলতর—কারণ তাঁর মধ্যে শোনা গিয়েছিল সেই স্বর যা নীরব হলেও হয়নি নিষ্প্রাণ—এখন নবজীবনের কলধ্বনিতে হয়েছে জাগ্রত। প্রাজ্ঞজনদের সেই সম্মেলনে ভারতের এই তরুণ সন্ন্যাসীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অভিজ্ঞানপত্র আর কার ছিল? —ঐ রাজকীয় প্রতাপের আকার, দৃঢ় সুন্দর মুখ, জ্যোতিচ্ছুরিত বিশাল নয়ন, গভীর সুরে ঝঙ্কৃত পরিপূর্ণ কণ্ঠস্বর।" [ঐ, ১৩]।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির কথা বলার পরে যোগ করেছেন : "তাঁর দেশপ্রেম : তাঁর ধর্মের তুল্যই গভীর।" ধর্মের ক্ষেত্রে স্বামীজী কোন্ বিরাট ঐক্যকল্পনায় নিয়োজিত ছিলেন, তার বর্ণনা করেছেন অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার। ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে স্বামীজীর মুখে তিনি ঐ পরিকল্পনার কথা শুনেছিলেন :

"স্বামীজী ভারতবর্ষে বিরাট ধর্মীয় উত্থান ও সংস্কারের পরিকল্পনা আমাদের কাছে ব্যাখ্যা

করেছিলেন। হিন্দু, খ্রীস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ—সকলেই ভ্রাতৃভাবে এক সাধারণ পতাকাতলে সমবেত হবে আশায় ও সমন্বয়বোধে পূর্ণ হয়ে—সর্ব মত ও পথের মানুষেরা অশ্রান্ত প্রয়াসে অগ্রসর হয়ে চলবে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাপূর্তির সাধারণ লক্ষ্যে। তিনি সম্পূর্ণ নূতন রূপ-রীতির এক মন্দিরের কল্পনা করেছিলেন, যার সম্মুখের প্রশস্ত কক্ষে থাকবে সকল বৃহৎ ধর্মের আচার্য ও প্রফেটদের মূর্তি, তারপরে 'ওম্', এই শব্দখচিত স্তম্ভ—তারপরে মুক্ত আকাশ।" [ঐ, ৯৭]।

এইকালে স্বামীজীকে দেখে মনে হয়েছিল—কে এস রামস্বামী শাস্ত্রী লিখেছেন—"মূর্ত ভারতবর্ষ।" [ঐ, ১১৩]।

স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এবং তাঁর মধ্যে জাতীয় চেতনার অপূর্ব বিকাশের সর্বোত্তম প্রত্যক্ষদর্শী ভগিনী নিবেদিতা—স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে, অসাধারণ এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন—ভারত ও পৃথিবীর ধর্মাচার্য বিবেকানন্দ কিভাবে যুগপৎ ভারতের জাতীয় সত্তার প্রতিনিধি-পুরুষ ছিলেন। [নিবেদিতার প্রবন্ধটি বেরোয় মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায়, ২৭ জুলাই, ১৯০২, নাম : *The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work*. এটি ভারতের শিক্ষিত মহলে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল; ভারতের অন্যান্য জায়গার অনেক কাগজে এটি উৎকলিত হয়।] নিবেদিতা স্বামীজীর এই রূপের উন্মোচনে উচ্চারণ করেছেন স্পন্দিত ও অনুরণিত বাক্যরাজি।—"যেমন তিনি অতীন্দ্রিয় ঊর্ধ্বচেতনার সুবিরাট প্রকাশ [নিবেদিতা লিখেছিলেন]—তেমনি আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকদের অন্যতম। জাতীয় চিত্তের উদ্‌ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার যুগে তাঁর আবির্ভাব, এবং তিনি প্রগতিতে নির্ভয় ছিলেন। ঐতিহ্যে বিশ্বাস হারিয়েছে যখন মানুষ—তখন তিনি পুরাতনকে নমস্কার করেছেন। তিনি জাতির নিয়তি-পুরুষ; নব-প্রত্যয়ের নেতাদের মতোই তিনি চেতনার নূতন তরঙ্গাঘাত করেছেন। তাঁর মতো পুরুষের কণ্ঠে প্রকাশিত হয় ভবিষ্যতের 'বেদ'।" স্বামীজীর মধ্যে "স্বাধীনতার বিশাল কণ্ঠ অব্যাহত মহিমায় নিনাদিত"—একথা বলার পরে নিবেদিতা জানান—স্বামীজী ভারতের মর্যাদারক্ষার জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ করতেও প্রস্তুত থাকতেন, তাঁর আচরণের কঠোরতা তখন রূঢ়তায় পৌঁছত। বিদেশে যে-বাড়িতে তিনি থাকতেন, সেখানে যে-কোনো ভারতীয়, সে যে-অবস্থা বা যে-ধর্মেরই হোক না কেন, যদি আদর-অভ্যর্থনা না পেত তাহলে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বিবেকানন্দের বিদায়। "ভারতকে যদি ভালবাসতে চাও তাহলে সে যেমন আছে তাকে সেইভাবে মেনে নিয়ে ভালবাসো"—স্বামীজী বলতেন। তিনি খুলে ধরতেন "অপরূপ কাব্য—ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনের কাব্য।" "প্রতিটি ভারতীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আশা-আদর্শকেই তিনি কেবল শিক্ষা করেননি—তাদের গৌরবস্মৃতিকেও বরণ করেছিলেন। কলকাতার হিন্দু-পল্লীর এই সন্তান—কলকাতার গঙ্গাতীরে জীবন সমাপন করবার জন্য যিনি ফিরে এসে-ছিলেন—পঞ্জাব সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপনা দেখে মনে হত, পঞ্জাবই বুঝি তাঁর জন্মস্থান। কিংবা একই কারণে রাজপুতনা বা হিমালয়খন্ড—সেইভাবে অন্য স্থানও। গুরু নানকের, মীরা-বাঈয়ের, তানসেনের গানের সুর ক্রমান্বয়ে ঝঙ্কৃত হত তাঁর কণ্ঠে। পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ সিংহের বীরকাহিনী, দিল্লী বা চিতোরের ইতিহাসকথা, শিব-উমা-রাধা-কৃষ্ণের বা বুদ্ধের জীবনকথা জড়াজড়ি হয়ে থাকত তাঁর মুখে। বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা সেখানে প্রতিটি নাটকই মহানাটক।...তাঁর প্রাণ-মন-আত্মা এক জ্বলন্ত মহাকাব্য—যা 'ভারত' এই নামোচ্চারণে মহারহস্যব্যাকুল।"

ইংরাজের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনের সৃষ্টি ভারতের যে-রাজনৈতিক ঐক্য—সহজ যোগা-যোগ ব্যবস্থা যার অঙ্গ—তাকে ইংরাজশাসনের গুণগ্রাহীরা মহামূল্য বিবেচনা করতেন। ঐ

ঐক্যের মূল্য স্বামীজী স্বীকার করতেন কিন্তু অহেতুক অধিক মূল্য দিতেন না। "দু'পয়সার ডাকটিকেট, সস্তার রেলভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা—এদের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে—এমন কথা তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল। ভারতের কোনো মৌল ঐক্য থাকলেই তবে ঐ জিনিসগুলি তার প্রকাশে সাহায্য করবে। সে ঐক্য কি সত্যই আছে? তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন, প্রতি গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, শিখলেন প্রতিটি মানুষের কাছে—তার ফলে যে-ভারতের দর্শন পেলেন, তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পুঙখানুপুঙখ, গভীর ও ব্যাপক।" স্বামীজীর মূলগত সন্ধানের প্রধান লক্ষ্য—হিন্দুধর্মের নানা শাখার মধ্যে সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার। তারপরে, সেই ধর্ম অপরাপর ধর্মের সঙ্গে কোন্ সাধারণ ভিত্তিতে দন্ডায়মান, তা আবিষ্কার করা। তারপরে, ধর্মশক্তির সঙ্গে অপরাপর কর্মশক্তিকে যুক্ত করা।

এইভাবে স্বামীজী যে-ভারতকে দেখেছেন, "তাঁর দেখা সেই ভারতের সঙ্গে অন্যের দেখা ভারতের কোনোই ঐক্য ছিল না। কারণ তিনি মুঠিতে ধারছিলেন—যা অখণ্ড, মূলীভূত, প্রাণগত। প্রাণের উৎসরহস্য তিনি জানতেন।"

এইকালেই নিবেদিতা আর একটি প্রবন্ধ লেখেন যশোহরের 'ব্রহ্মচারিন্' পত্রিকায় [বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইন্ডিয়া'য় এটি ২ অক্টোবর, ১৯০২, উৎকলিত হয়]—প্রবন্ধটির নাম সরাসরি "দেশপ্রেমিকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ।" [*Swami Vivekananda as a Patriot*]। সূচনাতেই নিবেদিতা বলেন : "স্বামীজীর স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য—তা দেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।" "স্বামীজীর জীবন...জাতীয় ভাবধারার প্রগতিশীল পুনরুদ্ধার-সংগ্রাম।" "এই ভারতের মৃত্তিকা পর্যন্ত তাঁর কাছে অপরূপ—'শ্যামা জননী'।" "এ-দেশের সর্ব পর্যায়ের শ্রম-সংগঠন, আদর্শের বিকাশ, চিন্তা ও কর্মের, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের ফল-পরিণতি—এ সকলই তাঁর কাছে রত্নসমুদ্রতুল্য।...তিনি ভারতী-চেতনার সাক্ষীপুরুষ, ভারতের নিজস্ব প্রতিভা-প্রবাহের নির্গমন-গুহাস্বরূপ।"

এই দুই রচনায় স্বামীজীর ভারতস্বপ্নের কী না অসামান্য উন্মোচন ঘটেছে!—

"তাঁর কাছে এদেশ নবীন; ভারতের ভাষাসমূহ অকর্ষিত, সম্ভাবনায় নমনীয়; ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে।...ভারতের আশার উৎস নিজের মধ্যে—বিদেশে কদাপি নয়।...ভারত আবার সকল ধমনীতে তীব্র হৃদয়স্পন্দন অনুভব করুক; তাহলে জগতের কোনো শক্তিই নবজাগ্রত ভারতের সম্মুখীন হতে পারবে না।"

"তাঁর দিগ্-দিগন্তরব্যাপ্ত আহ্বানের আর্তনাদ : 'সম্মোহিত হয়ে আছি আমরা; আমরা ভাবছি আমরা দুর্বল—তাই আমরা দুর্বল। একবার যদি ভাবি আমরা শক্তিধর—কে আমাদের জয় করবে?...পুরাতনী ভারতবর্ষ তাঁর কাছে সর্বদেহে নবীনা—কারণ তার প্রাচীন সভ্যতায় সঞ্চিত আছে ভাবী বহু যুগের নবসৃষ্টির প্রেরণা। **সে ভারতে মানুষের ভাগ্য তার নিজের মাটিতে—আর সে মাটির ভাগ্য মানুষেরই হাতে।**"

"জাতীয় চৈতন্যের মূল সন্ধানে বিবেকানন্দ অনলস আপসহীন সংগ্রাম করেছিলেন।" কারণ তাঁর দৃষ্টিতে "মানবচৈতন্যই জাতীয় ঐক্যের কেন্দ্রভূমি।" এই কথা নিবেদিতা বলেন বোম্বাইয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০২—স্বামীজীর বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতায়। স্বামীজীর অনুসরণে তিনি বলেছিলেন, "ধর্ম মানে নয় কেবল পরিত্রাণ—শক্তিও ধর্ম।" ঐ বক্তৃতায় স্বামীজীর বেদান্ত-প্রসঙ্গে তিনি বলেন : এ-বস্তু জাতীয় ঐক্যবোধেরই অভিব্যক্তি, যা ঘোষণা করেছে —কোনো ধর্মই অপরের পক্ষে ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির নয়। পাটনায় ২৪ জানুয়ারি, ১৯০৪, বক্তৃতায় নিবেদিতা বলেন, স্বামীজী "জাতীয় আন্দোলনের সেন্ট পল।" ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫, বেলুড়-মঠে বক্তৃতায় বলেন, "যেমন তরুণ বুদ্ধ নালন্দায় [?] তীর্থযাত্রা করেছিলেন নিজ গুরু কপিলের শিক্ষার তেজ-বীর্য, প্রাণশক্তি যাচাই করে নেবার জন্য—তেমনি

বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিরাট জীবনের শক্তিকে বহন করে বহির্গত হয়েছিলেন।... তাঁর মধ্য দিয়ে মুখর হয়েছিল বিশ কোটি মানুষ। আমাকে দেখো, যাচাই করো—এই আহ্বান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি গোটা জাতি, এক পূর্ণ বিবর্তিত সভ্যতা—তাঁর মধ্য দিয়ে।"

নিবেদিতা স্বামীজীর জাতীয় মূর্তির উপরে ক্ষণে-ক্ষণে আলোকপাত করে গেছেন। কয়েকটি আকারে স্বামীজীকে বারবার দেখা গেছে। প্রথম, তাঁর যন্ত্রণাদীর্ণ রূপ—ভারতের দুঃখের আগুন তাঁকে নিশিদিন পুড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ দেশপ্রেম স্বামীজীর জীবনের অচ্ছেদ্য সত্য—সহসাগত কোনো ব্যাপার নয়—তা সহজাত। তৃতীয়তঃ, তাঁর সামগ্রিক ভারত-বোধ। শেষোক্ত বিষয়ে নিবেদিতা অনলসভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রথম বিষয়টির রূপ এই :

"আচার্যদেবের প্রকৃতির গভীরে নিহিত ছিল একটি জিনিস, যার সামঞ্জস্য তিনি কিভাবে করবেন নিজেই জানতেন না। সে তাঁর দেশপ্রেম ও দেশের দুর্দশায় অস্থির ক্ষোভ। এই বৎসরগুলিতে, যখন আমি প্রায় প্রত্যহ তাঁর দর্শন পেয়েছি—দেখেছি যে, ভারতের চিন্তা যেন তাঁর শ্বাসবায়ুর মতো। সত্য বটে, মূল ধরেই তাঁর কাজ। তিনি 'জাতীয়তা' কথাটি ব্যবহার করতেন না, 'জাতিগঠনের যুগে'র প্রবক্তাও নন। 'মানুষ গড়াই আমার কাজ'—তিনি বলতেন। কিন্তু প্রেমিকের হৃদয় নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, আর তাঁর অর্চনার দেবী—তাঁর মাতৃভূমি। নিপুণ কৌশলে লম্বিত ঘণ্টা যেমন যে-কোনো শব্দের স্পর্শে স্পন্দিত ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—ঠিক সেইভাবে তাঁর হৃদয়ও সাড়া দিত জন্মভূমি সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়েই। ভারতের এমন কোনো আতঙ্কের আর্তনাদ, দুর্বলতার কম্পন, অপমানের লজ্জা ছিল না, যাকে তিনি না জানতেন বা বুঝতেন। তার পাপের জন্য কঠোর আঘাত তিনি করেছেন, পার্থিব বস্তুজ্ঞানের অভাবকে ক্ষমা করেন নি, কিন্তু সে সকলই করেছেন—এ আমার পাপ —এই বলে। অপরদিকে তাঁর মতো আর কেউ ভারতের মহিমাদর্শনে তন্ময় হননি।" ['দেখিয়াছি', ৫১-৫২]।

"আমি শুনেছি," নিবেদিতা লিখেছেন, "শিশুশয্যা থেকেই বিবেকানন্দ যেন সহজাত সংস্কারে অনুভব করেছিলেন—দেশের সেবা করার জন্যই তাঁর জন্ম।" [ঐ, ৮৩]। এই বাল্য-সংস্কার পরবর্তী সাধনাযোগে তাঁর জীবনের বৃহৎ অংশকে গ্রাস করেছিল। তিনি হয়ে উঠে-ছিলেন "জাতীয় জীবনের সার নিষ্কর্ষ।" [ঐ, ৫৭]। তা হতে পেরেছিলেন—প্রথমতঃ ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষার দ্বারা; দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র শাস্ত্র যে-আদর্শের ঘোষক তারই প্রমাণমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রপ্রভাবে; তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানযোগে। [ঐ, ৮১]। এরই ফলে স্বামীজীর জীবনোদ্দেশ্য প্রধান দুই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল—এক, সমগ্র জগতের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টি করা, দুই, ভারতীয় মহাজাতি গঠন করা। [ঐ, ২৩৪]। "বিবেকানন্দের ধারণায় ভারত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। তলিয়ে দেখলে, সে ঐক্য যতখানি মনোলোকে ততোধিক হৃদয়গভীরে। তাঁর ধারণামতো তাঁর কাজ—নিজ গুরুদেবের বাণীকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষা বলয়িত ছিল দেশকল্যাণের অনির্বাণ বাসনাগ্নিতে। তিনি কদাপি জাতীয়তার প্রবক্তা ছিলেন না—তিনি ছিলেন জাতীয়তার প্রতিমূর্তি।" [ঐ, ২৫০-৫১]।

ঐ মূর্তির আর এক রূপাঙ্কন :

"স্পাইরালের ক্ষেত্রে যেমন হয়, স্বামীজীর দেশপ্রেমের রূপও সেইপ্রকার : সর্বনিম্ন বেড়গুলিতে দেশের মাটি ও প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালবাসা। জাতি ও তার ইতিহাস, অভিজ্ঞতা এবং ধ্যানধারণার সর্বপ্রকার অনুষঙ্গ পরবর্তী বেড়; আর সবকিছুই ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত—সেটি হল তাঁর এই দৃঢ়বিশ্বাস—ভারতবর্ষ স্থবির ও জীর্ণ হয়ে পড়েনি (সমালোচকরা যেমন ভেবে থাকেন)—পরন্তু তা নবীন, সম্ভাবনায় পূর্ণ

--এই বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তা এমন মহান বিকাশের সম্মুখীন যেরূপ পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।...'আমি নিজেকে বহু শতাব্দীর পর আবির্ভূত পুরুষ বলে অনুভব করছি,' গভীর শান্ত এক মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, 'আমি দেখছি—ভারত নবীন।'...তাঁর উচ্চারিত সকল বাক্যেই যেন এই 'দর্শন' জড়িত থাকত, তা স্পন্দিত হত তাঁর বলা প্রতিটি কাহিনীতে। আর যখন তিনি ভারত সম্বন্ধে ভারতীয়দের মধ্যে সংকোচপূর্ণ দীনতা দেখে প্রচণ্ড ঘৃণায় ফেটে পড়তেন, কিংবা ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ বা অবজ্ঞার সমালোচনাকে জ্বলন্ত ভাষায় ধ্বংস করতেন, কিংবা কোন্ প্রেম ও বিশ্বাসের শক্তি নিয়ে দেশসেবায় অগ্রসর হতে হবে তার নির্দেশ দিতেন (হায়, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রেম ও বিশ্বাস তার ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়ার বেশি-কিছু হতে পারত না!)—তখন কতবারই মনে হয়েছে, সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ খসে পড়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে যোদ্ধার বর্ম।" [ঐ, ৫৫-৫৬]।

স্বামীজীর মনোভূমে অশোক ও বাবর, হুমায়ুন ও শেরশাহ, আকবর ও প্রতাপসিংহ, শিবাজী ও শিখ গুরুগণের সহাবস্থান ছিল। (এ-প্রসঙ্গ কিছু পরে আবার আসবে)—এখানে সমন্বয়ী ধর্মভাবনার কথা উপস্থিত করছি। স্বামীজী প্রথমতঃ হিন্দুধর্মের সীমাকে প্রসারিত করতে বা দেখতে আগ্রহী ছিলেন। হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেদের পরিচিত করে এমন শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ই কেবল নয়—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকেও তিনি এই পরিধির অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। [বৌদ্ধধর্ম, স্বামীজীর উক্তিতে, "হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান।" তিনি বলেছেন : "পশ্চিমভারতের জৈনদের যদি প্রশ্ন করা যায় আপনারা হিন্দু কিনা, তাঁরা উত্তেজিত হয়ে উঠবেন।"] এমন মনোভাব যাঁর, তিনি যে, শিখ, ব্রাহ্ম ও আর্য সমাজীদের হিন্দুপরিধিভুক্ত ভাবেন, তাতে বিস্ময়ের কি আছে? [যৌবনে স্বামীজী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন; পরবর্তীকালে আগ্রহের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমি তাঁদেরই কিনা তাঁরাই বলুন। আমার নাম যদি তাঁরা কেটে না দেন, তাহলে আজও সেটা খাতায় আছে।"]। স্বামীজী কল্পনা করতে ভালবাসতেন—পক্ষিণী যেমন তার ডানাদুটি দিয়ে সকল শাবককে আচ্ছাদন করে রাখে, হিন্দুধর্মও তেমনি আচ্ছাদন করে রাখুক নিজ পক্ষচ্ছায়ে সকল সম্প্রদায়-সন্তানদের। স্বামীজী হিন্দু-পরিধি নিয়েই থামেন নি—যারা কোনোমতেই হিন্দু নয়, সেই মুসলমান ও খ্রীস্টধর্মকে তিনি বেদান্তের দৃষ্টিতে 'সম্প্রদায়' বিবেচনা করে এই আশা করেছেন—ঐ দুই সম্প্রদায় উদার সমন্বয়ী ভাবকে গ্রহণ ক'রে ভারতের জাতীয় জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে। [ঐ, ২৪১-৪২, ২৪৭-৪৮, ২৭১]।

বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব আবার কতকগুলি চিত্র দিয়ে অমর চিত্র—অক্ষয় পটে আঁকা :

"তাঁর এইসব কথোপকথনকালে রাজপুতগণের বীরত্ব, শিখগণের বিশ্বাস, মরাঠাদের শৌর্য, সাধুগণের ঈশ্বরভক্তি, মহীয়সী নারীগণের পবিত্রতা ও সতেজ সরলতা—সকলই যেন পুনর্জীবিত হয়ে উঠত। মুসলমানদের প্রসঙ্গও তিনি বাদ দিতে পারেন না। হুমায়ুন, শেরশাহ, আকবর, শাজাহান—এঁরা, এবং আরও বহুশত মানুষের উজ্জ্বল নাম তাঁর স্মৃত ও কথিত নামমালাব অন্তর্ভুক্ত হত। এই হয়ত তিনি আকবরের রাজ্যাভিষেকের বিষয়ে তানসেন-রচিত যে-গান আজও দিল্লীর পথে-ঘাটে শোনা যায় তা তানসেনেরই সুরে-ছন্দে গেয়ে শোনালেন, আবার হয়ত ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন—মোগলকুলে বিবাহিত নারীরা বিধবা হলে, পুনর্বিবাহ না করে, হিন্দুনারীর মতোই পরবর্তী নিঃসঙ্গ বৎসরগুলি পূজা-পাঠে নিমগ্ন থেকে কাটিয়ে দিতেন। অন্য সময়ে তিনি সেই মহতী জাতীয় প্রতিভার [আকবরের] কথা বলতেন, যিনি বিধান দিয়েছিলেন—মুসলমান পিতা ও হিন্দু মাতা থেকে ভারতীয় সম্রাটগণের জন্ম হওয়া উচিত। পুনশ্চ আর এক সময়ে হয়ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে তাঁর বর্ণনা-মতো আমরা চলে গিয়েছি সেই ভাগ্যহত নবাব সিরাজদ্দৌলার উজ্জ্বল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী রাজ্যকালে। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর হিন্দুসেনাপতি [মোহনলাল] বিশ্বাসঘাতক-প্রেরিত

সংবাদ শুনে গভীর আক্ষেপে বলেছিলেন, 'তাহলে আজ আর যুদ্ধে জয়ের আশা নেই।'—সেই নৈরাশ্যমথিত কণ্ঠস্বর আমরা শুনেছি, এবং স্বামীজীকে অনুসরণ করে, সেই সেনাপতিকে অতঃপর আমরা অশ্বসমেত গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেও দেখেছি। সিরাজের সাধ্বী পত্নী বৈধব্যের শুভ্রবাস পরিধান করে নিজের আত্মীয়দের মধ্যে কিভাবে দিন কাটিয়েছিলেন—এবং পরবর্তী দীর্ঘ বৎসরগুলিতে প্রতিদিন তিনি মৃত স্বামীর কবরের উপর প্রদীপ জ্বালাতেন—সে দৃশ্যও আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত।...তিনি আমাদের বলেছিলেন—পাশ্চাত্যে অবস্থানকালে তাঁর মন আতুর হয়ে আবার শুনতে চাইত গ্রামের বহিঃপ্রান্তে দাঁড়িয়ে—সন্ধ্যাগমে ক্রীড়ারত শিশুদের তন্দ্রাজড়িত কোলাহল, সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি, রাখালদের চীৎকার, দ্রুত অপসৃয়মাণ গোধূলি-আলোকের সঙ্গে মিশ্রিত অস্ফুট কণ্ঠস্বর। বাংলাদেশে আশৈশব তিনি আষাঢ়ের বারিধারার যে-শব্দ শুনেছেন, তার জন্য আকুল হত তাঁর মন। কি অপূর্ব সেই বর্ষাবারির শব্দ কিংবা প্রপাতের নির্ঘোষ কিংবা সমুদ্রের গর্জন। তাঁর স্মরণে সবচেয়ে সুন্দর যে-ছবিটি ভেসে উঠেছিল সেটি হল : সন্তানসহ মাতা। পার্বতী নটিনী পার হচ্ছে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে, আর তারই ফাঁকে পিঠে ঝোলানো শিশুটিকে মুখ ফিরিয়ে কখনো দেখছে,—কখনো-বা তার সঙ্গে আদরের খুনসুটি করে নিচ্ছে। স্বামীজীর কাছে, হিমালয়ের অরণ্যানী-মধ্যে, প্রস্তরখণ্ডে শায়িত থেকে, নিম্নে প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর অবিরাম 'হর! হর'' ধ্বনি শুনতে-শুনতে মৃত্যুই আদর্শ মৃত্যু।" ঐ, ৫৩-৫৫]।

"আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত-খামার, গ্রাম, ও সমতল প্রদেশ অতিক্রম করার সময়ে তাদের সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে যে-ধরনের প্রবল প্রগাঢ় তদ্‌গত ভালবাসার রূপ দেখেছি, এমনটি আর কখনো দেখিনি। এইখানে তিনি অবাধে নিজ দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কিরূপে ভাগে জমিচাষ হয়, বুঝিয়ে দিতেন, কিংবা কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করতেন, খুঁটিনাটি পর্যন্ত বাদ যেত না—যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য সারারাত উনুনে খিচুড়ি ফুটত, ইত্যাদি। সন্দেহ নেই, তাঁর নিজের পরিব্রাজক-জীবনের স্মৃতিই এইসব বর্ণনাকালে তাঁর নয়নকে উজ্জ্বল এবং কণ্ঠকে ভাবাবেগে কম্পিত করে তুলত। আমি সাধুদের কাছে শুনেছি, দরিদ্র কৃষকের কুটীরে যেমন অতিথিসেবা হয়, এমনটি আর কোথাও নয়। সত্য বটে যে, কৃষকপত্নীর পক্ষে বিচালি ছাড়া শুতে দেবার জন্য অন্য কোনো শয্যার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, কুটীরের বাইরের দিকে মাটির চালার আশ্রয়ই তিনি মাথা গোঁজার জন্য দিতে পারতেন—সেই নারীই আবার বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, নিজে শুতে যাবার আগে, চুপিচুপি একটি দাঁতন ও একবাটি দুধ এমন এক জায়গায় রেখে যেতেন যাতে অতিথি ভোরে উঠে সেগুলি দেখতে পান এবং তৃপ্তি-ভরে সে জায়গা থেকে চলে যেতে পারেন।" [ঐ, ৩১-৯২]।

এই ভারতবর্ষ—'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী', 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।' এই ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের চিরজীবনের ভিটা।' নাড়িতে-নাড়িতে পাক-খাওয়া সম্পর্ক এই দেশের সঙ্গে তাঁর। এরই প্রেমে পড়ে—"যদিচ প্রতি দেশের সর্বোত্তম বস্তু তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি পুরনো হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন।" "বৃহত্তর পৃথিবীর জিজ্ঞাসু ছাত্র ও নাগরিকগণ তাঁকে পৃথিবীর অধিবাসী বলে দাবি করে গর্ববোধ করতেন—তিনি কিন্তু নিজের ভারতীয় জন্মের গৌরব ঘোষণাই করতেন।" [ঐ, ২৩৩]।১

১ জানি এমন ভুল কেউ করবেন না, তবু সাবধানতার জন্য বলছি, স্বামীজীর দেশপ্রেম—অনন্ত প্রেমেরই অংশ। সংকীর্ণ জাতীয়তার উপরে তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রথম ভাষণেই তা দেখা গেছে। "জাতীয়তামূলক সমস্ত ভাব দুষ্ট কুসংস্কারমাত্র"—একথা অন্ধ জাতীয়তা সম্বন্ধে বলেছেন। 'সমগ্র জগৎকে নিজের সঙ্গে টেনে না নিয়ে জগতের একটি পরমাণুও চলতে

॥ ৩ ॥ উত্তরভারত ও দক্ষিণভারত ভেদ-প্রশ্নে বিবেকানন্দ : ভারত-সংস্কৃতিতে দক্ষিণভারতের দান : ফুলে-র বিদ্রোহী আন্দোলন : শৈবসিদ্ধান্ত আন্দোলন : আর্য ও তামিল মনোভেদ সৃষ্টিতে ইউরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভূমিকা : স্বামীজীর 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধ

জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা প্রবলাকার ধারণ করেছে, তাদের অন্যতম প্রধান হল—উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের মনোভেদ সমস্যা। স্বামীজীর কালে এই সমস্যার সদ্য উদ্ভব, এবং মোটামুটি তখন এর নাম ছিল আর্য তামিল সমস্যা। স্বামীজীর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ঐ নামই আছে।

পূর্বভারতীয় বিবেকানন্দ—উত্তরভারতীয় আর্য সংস্কৃতির রসে পুষ্ট ছিলেন—তাঁর কিন্তু দক্ষিণভারত সম্বন্ধে ছিল অন্তহীন ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। দক্ষিণভারত তার প্রতিদানও দিয়েছে। আমরা আগে 'হিন্দু' পত্রিকার গর্বোক্তির উল্লেখ করেছি—কলকাতা জন্ম দিয়েছে বিবেকানন্দের, কিন্তু মাদ্রাজ আবিষ্কার করেছে তাঁকে। এই সংবাদও বারবার উল্লিখিত যে, দক্ষিণভারতের তরুণেরাই তাঁকে পাশ্চাত্ত্যে পাঠাবার জন্য দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করেছিল—এবং বিজয়ী বিবেকানন্দ ফিরে এলে এমন অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, যার তুল্য কিছু সে-কালের ইতিহাসে ঘটেনি। সুতরাং দক্ষিণভারতের প্রতি স্বামীজীর ভালবাসার মূলে একটা 'ব্যক্তিগত' কৃতজ্ঞতার প্রেরণা ছিলই। কিন্তু বৃহত্তর ছিল তাঁর 'দেশগত' কৃতজ্ঞতা—দক্ষিণের প্রতি। দক্ষিণভারত বহুশত বৎসর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির দুর্গভূমি—সেইকালে, যখন উত্তরভারত বহিরাগত আক্রমণকারীদের ভয়াল অস্ত্রে, ও বিজাতীয় ভাবে ছিন্নভিন্ন। স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তরে [১৮৯৪, আমেরিকা থেকে প্রেরিত] সানন্দ গৌরবে সেকথা লিখেছিলেন : "হে দাক্ষিণাত্যবাসিগণ! আর্যাবর্তের অধিবাসীরা তোমাদের কাছে বিশেষ-ভাবে ঋণী, কারণ ভারতে আজ যে-সকল শক্তি সক্রিয়, তাদের অধিকাংশেরই মূল দাক্ষিণাত্যে।

পারে না।" [৫-১৬৩]। "ভারতকে আমি সত্যই ভালবাসি, কিন্তু...আমার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি?" [৭--১৪৫-৪৬]। স্বামীজীর আন্তর্জাতিক চিন্তার কিছু উজ্জ্বল পরিচয় আমরা পূর্বে উপস্থিত করেছি। [৩য় খণ্ড, ৪৭২-৭৮]

অশোক ও তাঁর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মূলে কোন্ বিরাট বিশ্বভাবনা ছিল, স্বামীজী তার উন্মোচন করেছেন সাগ্রহে। সে সম্পর্কে নিবেদিতা লিখেছেন : "খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক দেশবিদেশে প্রেরিত ধর্মপ্রচারকদের উপর যে মহান দায়ভার অর্পণ করেছিলেন--সেই ঘটনার কথা স্বামীজী যেরূপ বারবার বলতেন, ভারত-ইতিহাসের আর কোনো ঘটনার কথা সেইভাবে নয়। বিভিন্ন দেশে বুদ্ধের অনুশাসন যাঁরা বহন করে নিয়ে যাবেন, তাঁদের উদ্দেশ করে ঐ প্রতাপান্বিত সম্রাট বলেছিলেন, 'স্মরণ রাখবেন, সর্বত্রই আপনারা ন্যায় ও ধর্মের বীজ দেখতে পাবেন। সে বীজকে আপনারা লালন করবেন--কদাপি ধ্বংস করবেন না।' এইভাবে অশোক সমগ্র জগৎকে—ভাবরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত-রূপে কল্পনা করেছিলেন—ঐ সকল ভাব—পরম সত্য ও পূর্ণ সদাচারলাভের জন্য অভিসারী মনুষ্যদের দ্বারা সর্বত্র সঞ্চারিত ও সুনিয়মিত। কিন্তু অশোকের স্বপ্নসিদ্ধির পথে অন্তরায় ছিল—নানা বিচিত্র জাতি-অধ্যুষিত অর্ধ-জানিত দেশসমূহে গমনাগমনের সমস্যা। সুতরাং অশোকের সংকল্পিত বিশ্ব-জাতি-সভা ['World-Federation'] সম্ভব করার প্রাথমিক আয়োজনেই এত সময় লেগে গেল যে, সেই সময়ের মধ্যে সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের আদি প্রাণশক্তি ও গতিবেগ লোপ পেয়েছিল। এইসকল প্রশ্ন স্মরণে রেখেই স্বামীজী বোধহয় একদিন—যখন আমরা কাঠগুদামের কিছু পরে গিরিখাতের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম—দীর্ঘ গভীর চিন্তার নীরবতা ভঙ্গ করে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন : 'হাঁ, ঠিক! ঠিক! আধুনিক জগৎই বৌদ্ধদের ভাবকে রূপ দিতে সমর্থ। আমাদের কালের আগে তার রূপায়ণের সুযোগই ঘটেনি।'" ['দেখিয়াছি' ২৫৬]।

স্বামীজী যখন ঐকথা বলেছিলেন তখন অবশ্যই তাঁর মনের পশ্চাৎপটে ছিল চিকাগো ধর্ম-মহাসভার ছবি।

শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকারগণ, যুগপ্রবর্তনকারী আচার্যগণ—শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য—সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে-মহাত্মা শঙ্করাচার্যের কাছে জগতের সকল অদ্বৈতবাদীই ঋণী, যে-মহাত্মা রামানুজাচার্যের স্বর্গীয় স্পর্শ পদদলিত পারিয়াদের আলোয়ারে পরিণত করিয়াছিল, যে-মহাত্মা মধ্বাচার্যের নেতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল সমগ্র ভারতে প্রভাববিস্তারকারী আর্যাবর্তের একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুবর্তীদের দ্বারা—এঁদের সকলেরই জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যে। বর্তমানকালেও বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ গৌরব-স্বরূপ মন্দিরসমূহে দাক্ষিণাত্যবাসীরই প্রাধান্য। হে দাক্ষিণাত্যবাসিগণ! তোমাদের ত্যাগই হিমালয়ের সুদূরবর্তী চূড়াস্থিত দেবালয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।" [৫—৪৬৭]।

এই লেখাতেই স্বামীজী অপর চিত্রও এঁকেছিলেন—দাক্ষিণাত্যের শোচনীয় সামাজিক সংকীর্ণতা ও অস্পৃশ্যতাব্যাধির রূপ। তারপর ফুটিয়েছিলেন ভারতের মহাসাগরকে—পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ কিভাবে এক মোহানায় মিলিত, আবার প্রসারিত, সমগ্র দেশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ভাবতরঙ্গরূপে। সে অংশে আগেই উদ্ধৃত ও আলোচিত হয়েছে।

[১ম খণ্ড, ২৫৯-৬৩]।

১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে ঐ 'উত্তরপত্র' লেখার সময়ে স্বামীজী উত্তরভারতের বিরুদ্ধে দক্ষিণভারতের একাংশের ক্ষোভ ও অভিমানের কথা কতখানি স্মরণে রেখেছিলেন বলতে পারব না। তবে দক্ষিণভারতের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় পরিচয়ের কারণে ও-বস্তু তাঁর মনে থাকতেই পারে, এবং কে জানে, সেইজন্যই কিনা, অনুপ্রাণিত কণ্ঠে উত্তর-দক্ষিণ-মিলিত ভাবসমুদ্রের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন!

ভারতীয় সমাজকে বিশ্লিষ্ট করেছে যে-যে কারণগুলি, তাদের মধ্যে, কোনো সন্দেহ না রেখে বলা যায়, সবচেয়ে মারাত্মক উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে বিভেদ। স্বামীজী স্পষ্টই দেখে-ছিলেন—এর থেকেই উত্তর ও দক্ষিণভারতের মধ্যে ভেদের প্রাচীর মাথা তুলবে। এই ভেদ-বিন্ধ্যের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের অগস্ত্য-প্রতিভা শাসনের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করেছিল।

স্বামীজীর কালে উত্তরভারতের তুলনায় দক্ষিণভারতে নিম্নবর্ণের প্রতি অত্যাচার অবিচার ছিল অনেক বেশি। স্বামীজী জানতেন, কোনো অত্যাচারই চিরস্থায়ী হতে পারে না, বিদ্রোহ হবেই—সেই বিদ্রোহের কালে নবোত্থিত নিম্নবর্ণ স্বতঃই দায়ী করবে ব্রাহ্মণদের। আর ঐ ব্রাহ্মণরা এসেছে—তারা ভুল করে বা ঠিক করে জেনেছে—উত্তরভারত থেকে। তাই যদি হয়, তারা ভাববে, অত্যাচারীদের আদি বাসস্থান উত্তরভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দরকার কি?

এইসঙ্গে ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হবে—ঐতিহ্যের বিরুদ্ধেও। জাতিভেদ প্রথা যদি নিম্নবর্ণের পীড়নের কারণ হয়, তাহলে যে-ধর্ম ও সভ্যতা এই বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করেছে, তার বিরুদ্ধেও ঘৃণা জাগবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে ব্রাহ্মণদের আদি বাসভূমি উত্তরভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—তদনুসারে আর্যধর্ম ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

দক্ষিণভারতের মনোজগতে এইসকল ভেদরেখা ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে ভাষাতাত্ত্বিকদের সজ্ঞান বা অসজ্ঞান ভূমিকা স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিকরা ঐকালে প্রত্নতাত্ত্বিক-দের উপরি-কাজও সানন্দে করছিলেন। তাঁরা যত্নসহকারে জানাচ্ছিলেন—উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের ভাষা এক নয়; দক্ষিণের ভাষার উপরে সংস্কৃতের যে-প্রভাব দেখা যায় তা জোর ক'রে আর্যরা চাপিয়ে দিয়েছে, আর্যদের সাম্রাজ্যবাদী বাহু দক্ষিণের ভূমিই কেবল হরণ করেনি, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করতেও চেয়েছে। এইসকল প্রচারের অন্যতম লক্ষ্য—দক্ষিণভারতীয়দের জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষাভিমান এমনভাবে জেগে উঠুক, যাতে তারা উৎসাহের সঙ্গে নিজস্ব ভাষা, বংশ ও ঐতিহ্যের সন্ধান করতে পারে—এবং আঞ্চলিক জাতীয়তার তেজে উত্তরভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়।

উত্তরের বিরুদ্ধে দক্ষিণের বিক্ষোভ কেবল উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের বিক্ষোভের

সঙ্গেই জড়িত ছিল না—অধিকন্তু দাক্ষিণী সংস্কৃতির অভিমান ভাষাতাত্ত্বিকদের কল্যাণে উচ্চবর্ণের মধ্যেও প্রবেশ ক'রে, আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবিকে জোরদার ক'রে তুলেছিল।

স্বামীজীর দূরপ্রসারী দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের সংকটের রূপ ধরা পড়েছিল। ভেদকারী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রয়োজনও তিনি বুঝেছিলেন। কিন্তু তখন ভগ্ন শরীর তাঁর, আয়ু ক্ষীণ, ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করার ক্ষমতা নেই। তাই অগত্যা এক্ষেত্রে রেখে গেলেন অসামান্য এক রচনার মধ্যে ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শন।

কিন্তু উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিরোধের রূপকে স্বামীজী কেবল সম্ভাবনার স্তরেই দেখেন নি—সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের ক্ষীণ সূচনা দেখেছিলেন—যদিও তা সেই প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো সামাজিক গুরুত্ব লাভ করেনি। উচ্চবর্ণের অত্যাচারের একটা ফল—নিম্নবর্ণের হিন্দুদের খ্রীস্টান বা মুসলমান হয়ে যাওয়া—তার কথা স্বামীজীর লেখায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত। স্বামীজী, এই ধর্মান্তর সমস্যার চেয়ে মনে হয় কম মারাত্মক মনে করেননি ধর্মত্যাগের সম্ভাবনাকে। ধর্মান্তরিত হলেও জাতিভেদ থেকে অব্যাহতি নেই, একথা যখন নিম্নবর্ণের মানুষ বুঝবে তখন হয়ত সে ধর্মত্যাগের মধ্য দিয়েই অব্যাহতি চাইবে। তেমন আন্দোলনের সূত্রপাত স্বামীজীর কালের আগেই মহারাষ্ট্রে আরম্ভ হযে গিয়েছিল, এবং স্বামীজী সে-বিষয়ে জানতেই পারেন।

মহারাষ্ট্র, পশ্চিম ও দক্ষিণভারতের মধ্যবর্তী স্থান; মরাঠি ভাষা উত্তরভারতীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত; তবু মরাঠিরা নিজেদের দাক্ষিণীই মনে করে—এই মহারাষ্ট্রে পেশোয়াদের আমলে নিম্নবর্ণের প্রতি অকথ্য অত্যাচার হয়েছে—তার বিরুদ্ধে ইংরাজশাসনের সূচনাকালে বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দেয়—নেতৃত্ব করেন জ্যোতিরাও ফুলে (১৮২৭-১৮৯০)। স্বামীজী কোন্ ধরনের অন্তঃসংঘাত আশঙ্কা করছিলেন তা বুঝতে পারব ফুলে-র কাহিনী থেকে।

তর্কতীর্থ লক্ষ্মণশাস্ত্রী যোশী "র‍্যাশন্যালিস্টস্ অব মহারাষ্ট্র" গ্রন্থে ফুলে-র উপরে যে-প্রবন্ধ লিখেছেন, তার থেকে জানতে পারি : ফুলে মহারাষ্ট্রে "অব্রাহ্মণ সংস্কার-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা।" "তিনি ঈশ্বর, ধর্ম, রীতি-নীতি এবং অতীতের তথাকথিত পবিত্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।" "ব্রহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ফুলে 'সত্যসাধক সমাজ' স্থাপন করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, হিন্দুধর্মনীতির, ঠিকভাবে বলতে গেলে, যে-কোনো ধর্মনীতির অপেক্ষা ঊর্ধ্বতর ও মহত্তর নীতিকে গ্রহণ করলেই তবে সাফল্যের সঙ্গে ব্রহ্মণ্যবাদের মোকাবিলা করা যাবে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রতিটি সংগঠিত ধর্মে কোনো না কোনো অবিচারের সমর্থন থাকে এবং কম বা বেশি পরিমাণে সত্যের কণ্ঠরোধ করা হয়। তাই তিনি কোনো সংগঠিত ধর্মকে স্বীকার করেন নি।"

অচ্ছুতদের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিবরণ ফুলে দিয়েছেন (স্বামীজীও তা যথেষ্ট দিয়েছেন), যথা, শূদ্রের ছোঁয়া বা ছায়া লাগলে পাছে ব্রাহ্মণের জাত যায় তাই ব্রাহ্মণের চলার কালে তার পথ চলার অধিকার ছিল না। যদি অগত্যা পথ চলতে হয়ই, তাহলে বিশেষ সাবধান হতে হত ছায়া-দোষ সম্পর্কে, বিশেষতঃ সকালে বা সন্ধ্যায়, যখন ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ে। গলায় তাকে ঝুলিয়ে রাখতে হত ভাঁড় থুতু ফেলার জন্য, কোমরের পিছনে ঝুলিয়ে রাখতে হত ঝাঁটা, যা তার পদচিহ্ন মুছে-মুছে চলবে। এই পটভূমিকায় জন্মেছিল ফুলে-র অভিনব ইতিহাসদর্শন—'দাসত্ব' গ্রন্থে যা ধৃত। নিজ প্রতিপাদ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য দেওয়া ফুলে-র পক্ষে সম্ভব হয়নি, এবং তিনি যে, কাব্য-পুরাণ-শাস্ত্রের মন-গড়া ব্যাখ্যা করে গেছেন, তাতেও সন্দেহ নেই। তাঁর মতে : পারস্য থেকে আর্যরা দুবার জলপথে এসে ভারতবর্ষ জয় করার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়, (মৎস্য ও কূর্মাবতারের যুগ); তারপর স্থলপথে এসে তাতে সফল হয় (বরাহ, নৃসিংহ ও বামনাবতারের যুগ)। আর্য-ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের নিধন ক'রে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছিল (পরশুরামের যুগ)

—এবং সাধারণ মানুষকে দেবতা ও অসুরের অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়ে বশীভূত করেছিল —তাদের বেঁধে ফেলেছিল দুর্নীতিযুক্ত সামাজিক নিয়মের শৃঙ্খলে। ব্রাহ্মণরা সংখ্যালঘু ছিল, তাই জাতিভেদ প্রথা ছড়িয়েছিল জনগোষ্ঠীকে ভেদের দ্বারা শাসনে রাখার অভিপ্রায়ে। ফুলে-র মতে, কেবল ব্রাহ্মণরাই বহিরাগত। [সাধারণ ঐতিহাসিক মত হল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন বর্ণ আর্যদের মধ্যে ছিল, সুতরাং ঐ তিন বর্ণই বহিরাগত]। ফুলে-র এহেন অনৈতিহাসিক ধারণার কারণ, লক্ষ্মণশাস্ত্রী বলেছেন, দক্ষিণভারতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, এই দুই বর্ণই বর্তমান। ফুলে আরও বলতে চেয়েছেন—শূদ্ররা আগে ক্ষত্রিয় ছিল, ব্রাহ্মণরা তাদের পরাভূত করে 'অসুর' নামে চিহ্নিত করেছে।

ফুলে-র বিষয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন লেখক লক্ষ্মণশাস্ত্রী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, ফুলে কোনো বড় দার্শনিক বা লেখক ছিলেন না, তাঁর ভাব অনেকক্ষেত্রে স্থূল এবং ভাষা কর্কশ গ্রাম্য। কিন্তু তাঁর তত্ত্বকথা, স্বামীজীর নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হয়নি, পরে মার্জিত বস্তুবাদীদের সমর্থন আদায় করে নেবে। কিছুদিনের মধ্যে দক্ষিণভারতে তা দেখা গেছে—জাস্টিস পার্টির বক্তব্যে, এবং দ্রাবিড় কাজাগাম আন্দোলনে।

উত্তরভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন কেবল নিম্নবর্ণ থেকেই দক্ষিণভারতে সংগঠিত হয়নি, একশ্রেণীর উচ্চপর্যায়ের মানুষ (ব্রাহ্মণ ছাড়াও উচ্চপর্যায়ভুক্ত মানুষ সেখানে ছিলেন) আর একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উত্তরভারতের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠন করেন—সে আন্দোলনের নাম শৈব সিদ্ধান্ত আন্দোলন। ১৮৯৬ সাল থেকে দক্ষিণের "শৈব সিদ্ধান্ত" মতকে কেন্দ্র করে আর্য-দর্শনের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়। এই ধরনের মনোভাবের কিছুটা আঁচ স্বামীজী সম্ভবতঃ ১৮৯৩ সালে মাদ্রাজে থাকাকালে পেয়েছিলেন।১খ ১৮৯৭ সালের গোড়ায় ভারতে পদার্পণ করে, মাদ্রাজে অভ্যর্থনার দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও, তিনি এই মতের ক্রমপ্রসার সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ওঠেন। অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের স্মৃতিকথায় দেখি—৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, মাদ্রাজে ক্যাসল্ কার্নানে স্বামীজীর অবস্থানকালে তাঁর কাছে একদল শৈবসিদ্ধান্তবাদী এসেছিলেন—নিজেদের মতের পক্ষে যুদ্ধঘোষণা করে। তাঁরা একরাশ প্রশ্ন টুকে এনেছিলেন। তাঁদের অগ্রণী ছিলেন নলস্বামী পিল্লাই, যিনি ঐ বৎসরই নিজ সম্পাদনায় "সিদ্ধান্ত দীপিকা" পত্রিকা প্রকাশ করেন। উনিই "শৈব-সিদ্ধান্ত-মহাসভা" আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, যা পরে বহু "শৈব সভা-র" সৃষ্টি করে। স্বামীজী কোন্ আশ্চর্যজনক বুদ্ধির ঝলকে এঁদের দিশাহারা করে দিয়েছিলেন, তারপর পর্যুদস্ত এই মানুষগুলিকে লোকসেবার বাণীমন্ত্রে অভিভূত করেছিলেন, অধ্যাপক আয়ার তা বর্ণনা করেছেন, এবং আমরা সে অংশ আগে উদ্ধৃতও করেছি। [২য় খণ্ড, ৩৭৭-৭৮]। নলস্বামী পিল্লাইয়ের পরিচয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক আয়ার জানিয়েছেন : "নলস্বামী পিল্লাই যদিও শৈব সিদ্ধান্ত মতের প্রবল সমর্থক, তবু সে মতকে তিনি উদারতর

১খ ১৮৯২ ডিসেম্বরে ত্রিবেন্দ্রামে থাকাকালে স্বামীজী অধ্যাপক সুন্দররাম পিল্লাই ও অন্যান্যদের মধ্যে অন্ধ দ্রাবিড়-অভিমান দেখেছিলেন; সে সম্পর্কে অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার লিখেছেন :

"One remark of Prof. Sundaram Pillai—that he considered himself, as a Dravidian, entirely outside the Hindu polity—put him somewhat out of court with the Swami, who, later on, remarked of him that eminent as he was as a scholar, he had thoughtlessly given himself away to the sway of race prejudice, which already during his travels the Swami had noted as an unpleasant characteristic of certain South Indian minds of the unbalanced or mediocre type."

[*Reminiscences*, 65]

ভিত্তিতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চেয়েছিলেন—কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও তাকে ছড়াতে চেয়েছেন। আমার ধারণা, তিনি আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যত্র স্বামী বিবেকানন্দের বিজয়ী ভূমিকার দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। শৈবমতের ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, তার মধ্যে ব্রাহ্মণদেরও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নলস্বামী পিল্লাই উৎকণ্ঠিত ছিলেন।" ['রেমিনিসেনসেস', ৯৪-৯৫]।

শৈবসিদ্ধান্ত আন্দোলন প্রবর্তকের এই উদারতা অনুবর্তীদের মধ্যে বজায় ছিল কিনা সন্দেহ। যদি থাকত তাহলে অধ্যাপক আয়ার, নলস্বামীর উদারতার কথাটা ঐভাবে তুলে ধরতেন না। সিদ্ধান্তবাদীদের বক্তব্যের কথায় আসার আগে বলে নেওয়া যায়, স্বামীজী কিভাবে ঐ ভেদবাদী মনোভাবের ইঙ্গিত পেয়েই তার সম্মুখীন হতে চেষ্টা করেছিলেন।

আমরা লক্ষ্য করি, সকল সংঘাতের মূল যে জাতিপ্রথা—তজ্জনিত সংঘর্ষের মাত্রা স্বামীজী যথাসম্ভব কমাতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ তিনি চেয়েছেন "জাতি" শব্দটির ভ্রান্ত ব্যবহার বন্ধ করতে। মৌলিক অর্থে জাতি মানে ব্যক্তিস্বভাব—ব্যক্তির স্বভাব অনুযায়ী তার জাতি নির্ণীত হওয়া উচিত, জন্ম অনুযায়ী নয়। ও-জিনিস আদিতে হত, ভবিষ্যতে তাই হোক। [বিষয়টি পূর্বে বিশদ আলোচিত; ৩য়, ৪৭৮-৮২]। দ্বিতীয়তঃ তিনি ব্রাহ্মণের রক্তগৌরবের উপর আঘাত করেছেন এই বলে যে, অন্যান্যদের মতো ব্রাহ্মণেরাও মিশ্র জাতি। ১৮৯২, ডিসেম্বর মাসে, ত্রিবেন্দ্রামে থাকাকালে স্বামীজীর সঙ্গে এই বিষয়ে অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের তর্ক-বিতর্ক হয়। স্বামীজী তখন অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসী। তাঁর মত অধ্যাপক আয়ারকে বিচলিত করেছিল, কেননা তিনি ব্রাহ্মণদের রক্তবিশুদ্ধি প্রশ্নাতীত মনে করতেন। "স্বামীজী আমার মতের প্রতিবাদ ক'রে বলেন [অধ্যাপক আয়ার লিখেছেন], ব্রাহ্মণরা পৃথিবীর অন্য যে-কোনো জাতির মতোই মিশ্রজাতি, তাদের রক্তবিশুদ্ধির কথা প্রধানাংশে গালগল্প ছাড়া কিছু নয়। আমি সি এল ব্রেস ও অন্যান্য বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য আমার সমর্থনে উপস্থিত করলেও স্বামীজী জেদের সঙ্গে নিজ মত আঁকড়ে থাকেন।" ['রেমিনিসেনসেস্', ৭৫]। একই মত স্বামীজী বছর দেড়েক পরেও, আমেরিকা থেকে লেখা এক চিঠিতে প্রকাশ করেছেন : "আর্যাবর্তের সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কোথায় গেলেন? তাঁরা একেবারে লুপ্ত। কেবল এখানে-ওখানে ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব-অভিমানী কতকগুলি মিশ্র-জাতি বাস করছে।" [৮-২১৫]।

ব্রাহ্মণদের রক্তবিশুদ্ধির দাবিকে অগ্রাহ্য করে স্বামীজী একদিকে যেমন ব্রাহ্মণদের অযথা অভিমানকে সংবৃত করতে চেয়েছেন, অপরদিকে তেমনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মণ্য-আদর্শের মহিমা ঘোষণা ক'রে, 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির বিরুদ্ধে উগ্র অব্রাহ্মণদের জাতক্রোধকেও প্রশমিত করতে সচেষ্ট থেকেছেন। আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব বলতে তিনি এক ধরনের অত্যুন্নত চারিত্রিক বিশেষত্ব বুঝেছেন, যা মানবসমাজের সর্বোচ্চ আদর্শ হবার যোগ্য। স্বামীজী এক্ষেত্রে 'আদর্শ মনুষ্যত্ব' না বলে 'আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব' কেন বললেন? তার কারণ, মনে হয়, অন্য সকল জাতি অপেক্ষা জন্ম-ব্রাহ্মণেরাই ত্যাগ-তপস্যার দ্বারা অধিক সংখ্যায় ঐ অবস্থায় উন্নীত হতে পেরেছেন, তদনুযায়ী তাঁরা 'ব্রাহ্মণ' শব্দটিকে আদর্শের প্রতিশব্দ করে তুলতে পেরেছেন। তাছাড়া 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি বহুসংখ্যক অব্রাহ্মণের মধ্যে যে-রকম ভীতি ও বিদ্বেষের আকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাতে ঐ শব্দকে পরিমার্জিত আকারে উপস্থিত করতে না পারলে ঘৃণার মূলোৎপাটনও হবে না, তিনি ভেবেছিলেন।

১৮৯৭ সালে স্বামীজী কুম্ভকোনম্-বক্তৃতায় আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব কী, তা বিশদভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন। "যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন মহাত্যাগী", "যাঁরা স্বার্থপরতাকে একেবারে নাশ করে ফেলেছেন, এবং যাঁদের জীবন জ্ঞান ও প্রেমের অর্জন ও বিস্তারে সদানিযুক্ত" যাঁরা এমন উচ্চপর্যায়ে অবস্থিত যে, "তাঁদের শাসনের জন্য সৈন্যসামন্ত বা পুলিশের

প্রয়োজন নেই....তাঁদের কোনো শাসনতন্ত্রের অধীনস্থ হবার প্রয়োজন নেই" ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বামীজী ব্রাহ্মণদের আদর্শ নৈরাজ্য-লোকে স্থাপন করেছিলেন।

বলাবাহুল্য অধিকাংশ ব্রাহ্মণই ঐ জগৎ থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত। একই বক্তৃতায় স্বামীজী জাতিভেদ সমস্যার মূলগত সমাধানের যে-পথ দেখান, তাও সাধারণ ব্রাহ্মণের মনঃপূত হবার কথা নয়—এবং পছন্দ হবেনা সেইসকল অব্রাহ্মণদেরও, যাঁরা ব্রাহ্মণ শব্দটিকে অবিরাম চাঁদমারি করছিলেন। স্বামীজী তাঁর ধ্রুব বক্তব্যকে এখানেও তুলে ধরেছিলেন—উচ্চকে নীচে টেনে নামালে সমস্যার সমাধান হবে না—নিম্নকে উত্তোলিত করার মধ্যেই আছে স্থায়ী সমাধান। 'প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়—তবেই এই জাতিভেদ সমস্যার সমাধান হবে। তোমরা আর্য, অনার্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ, অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ জাতি—যাই হওনা কেন, ভারতভূমি-বাসী তোমরা—তোমাদের সকলের প্রতি পূর্বপুরুষদের এক মহান আদেশ আছে : চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। উচ্চতম জাতি থেকে নিম্নতম পারিয়া পর্যন্ত সকলকেই ব্রাহ্মণ হবার চেষ্টা করতে হবে। আর বেদান্তের এই আদর্শ কেবল ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগৎকে এই আদর্শে গঠন করতে হবে।" [৫—৮৬-৮৭]।

কুম্ভকোনম বক্তৃতার কয়েকদিন পরে মাদ্রাজে স্বামীজী "ভারতের ভবিষ্যৎ" নামে যে বক্তৃতা করেন তার নামটিই তাৎপর্যপূর্ণ। নাম অনুযায়ী তিনি ঐ বক্তৃতায় ভারতের বর্তমান ও ভাবী সমস্যার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, এবং যেহেতু দক্ষিণ-ভারতে বক্তৃতা করছিলেন, তাই সেখানকার সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছিল। তাঁর মনে ভারতের সামগ্রিক সংহতির প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছিল—এবং দক্ষিণভারতের যে-চিন্তাধারা ঐ সংহতির পরিপন্থী, তার বিরোধিতাই করতে চেয়েছিলেন। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সংঘাতের বিষময় ফলের বিষয়ে তিনি সতর্ক করেন। "উচ্চতর জাতিগণের বিরুদ্ধে এই-যে লেখালেখি দ্বন্দ্ব-বিবাদ চলেছে, এতে কল্যাণ নেই, এতে অশান্তির আগুন আরও জ্বলে উঠবে, এবং পূর্ব থেকে নানা ভাগে বিভক্ত এই জাতি আরও বিভক্ত হয়ে পড়বে। জাতিভেদ উঠিয়ে দেবার, সাম্যভাব আনার, একমাত্র উপায়—যে-শিক্ষার দ্বারা উচ্চবর্ণের তেজ ও গৌরব—সেই শিক্ষাকে আয়ত্ত করা।" "চণ্ডালকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই আসল কার্যপ্রণালী।" ব্রাহ্মণ-বিরোধীদের হীন-মন্যতাকে আঘাত করে স্বামীজী বলেছিলেন, কয়েক হাজার মানুষ যদি একসঙ্গে নিজেদের উচ্চবর্ণ বলে ঘোষণা করে—কার সাধ্য তাকে অস্বীকার করে? সে-জিনিস তো অতীতে হয়েছে। শক্তিশালী নিম্নবর্ণের মানুষেরা কেন শিক্ষালাভে সচেষ্ট হচ্ছে না?

এই বক্তৃতায় স্বামীজী বারবার বৃথা সংঘাতের ভয়াবহ পরিণামের কথা বলেন। নিম্ন-বর্ণকে যেমন তিনি বিবাদে অযথা শক্তিক্ষয় না করে আত্মোন্নয়নে আহ্বান করেছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণদের অধিকতর সতর্ক করে বলেছিলেন—সংঘাতে সাক্ষাৎ সর্বনাশ ব্রাহ্মণদেরই। বিশ্বপরিস্থিতি স্বামীজী ভালই জানতেন, শ্রমজীবী অভ্যুত্থানের 'দর্শন' কিভাবে উপস্থিত করেছেন, পূর্বে [তৃতীয় খণ্ডে] যথেষ্ট দেখেছি। ব্রাহ্মণদের তদনু-যায়ী সমঝে দিয়ে এখানে তিনি বলেন : "বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাদপ্রতিবাদ চলেছে.... এতে ব্রাহ্মণদের কোনোই লাভ নেই, কারণ একচেটিয়া অধিকারের দিন গেছে।" এর পরে তিনি ব্রাহ্মণদের জন্য মারাত্মক কর্তব্য উপদেশ করেন : "প্রত্যেক অভিজাত জাতির কর্তব্য নিজের সমাধি নিজে খনন করা।" কথাগুলির সরলার্থ—নিজের কুক্ষিগত জ্ঞান ও অন্য সম্পদ অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে বৈষম্য দূর করা। যদি ব্রাহ্মণ সর্বের মধ্যে নবজন্ম নিতে না চায় তাহলে মহতী বিনষ্টি তাদের নিয়তি।

স্বামীজী এই বক্তৃতায় আর্য তামিল প্রশ্নে সরাসরি নেমে পড়েছিলেন। আর্য ও তামিলের পার্থক্য সম্বন্ধে, বহিরাগত আর্যগণ কর্তৃক তামিল-বিজয় সম্বন্ধে, যে-সব থিয়োরীর বিষবৃক্ষকে নানা প্রয়োজনে বপন ও বর্ধন করা হচ্ছিল, স্বামীজী তাদের কিছুটা

যুক্তিতে, কিছুটা ব্যঙ্গকৌতুকে, ওলটপালট করে দেন। তাঁর যুক্তির অংশ কতদূর গ্রাহ্য তা ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিকগণ বিচার করবেন, (তবে কিনা আমরা জানি, উক্ত শাস্ত্রগুলি মতান্তরের অবাধ স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন, এবং ইচ্ছামতো মতশোধনের সাত্ত্বিকতাকে প্রদর্শন করেন!!)—আমাদের কাছে বিশেষ লক্ষণীয় ভারতীয় ঐক্যের জন্য এই মহান ভারতপ্রেমিকের হৃদয়ের অত্যন্ত উদ্বেগ। স্বামীজী বলেন :

"আমি এইসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের বিচার করতে চাই, মাদ্রাজের সঙ্গে যার বিশেষ সম্বন্ধ। একটি মত আছে—দাক্ষিণাত্যে আর্যাবর্তবাসী আর্যগণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল; দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরাই কেবল আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের থেকে উৎপন্ন; তাই দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাতিরা দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। এখন প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয় আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি বলি ঐ মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঐ মতের একমাত্র প্রমাণ এই যে, আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের ভাষায় প্রভেদ আছে—এছাড়া আর কোনো প্রভেদ তো দেখতে পাই না। আমরা এতগুলি আর্যাবর্তের লোক এখানে আছি, আমি আমার ইউরোপীয় বন্ধুগণকে এই সমবেত লোকগুলির মধ্য থেকে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করতে আহ্বান করছি। বলে দিন, প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ তো কেবল ভাষার। পূর্বোক্ত মতবাদীরা বলেন, দক্ষিণী ব্রাহ্মণরা আর্যাবর্ত থেকে আগমনকালে সংস্কৃতভাষী ছিলেন, এখানে এসে দ্রাবিড় ভাষা বলতে-বলতে সংস্কৃত ভুলে গেছেন। যদি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে থাকে, তাহলে অন্য জাতিদের ক্ষেত্রে তা ঘটবে না কেন? কেন বলা যাবে না, অন্য জাতিরাও আর্যাবর্তবাসী ছিলেন, দাক্ষিণাত্যে এসে সংস্কৃত ভুলে দ্রাবিড়ভাষী হয়েছেন? যে যুক্তির দ্বারা দাক্ষিণাত্যের অব্রাহ্মণদের অনার্য বলে প্রমাণ করতে চাইছ, সেই যুক্তিতেই আমি তাদের আর্য বলে প্রতিপন্ন করতে পারি। হতে পারে একটি দ্রাবিড় জাতি ছিল, তারা এখন লোপ পেয়েছে, যারা অবশিষ্ট আছে বনে-জঙ্গলে বাস করছে। খুব সম্ভব তাদের ভাষা সংস্কৃতের বদলে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এখন সকলেই আর্য—সকলেই আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যে এসেছে—সমগ্র ভারত আর্যময়—এখানে আর কোনো জাতি নেই।"

শূদ্রদের এক ঝাপটে অনার্য বলে প্রতিপন্ন করার জন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সাধু চেষ্টাকে স্বামীজী অতঃপর আক্রমণের লক্ষ্য করেন :

"আবার একমত আছে, শূদ্রেরা নিশ্চিত অনার্যজাতি, তারা আর্যদেব দাসস্বরূপ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়, সুতরাং যেহেতু তাঁদের স্বজাতি—মার্কিন, ইংরাজ, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা—হতভাগ্য আফ্রিকানদের ধরে জীবদ্দশায় অমানুষিক খাটিয়েছে, এবং মরবার পরে টেনে ফেলে দিয়েছে; যেহেতু আফ্রিকানদের সঙ্গে তাদের মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন সংকর-সন্তানদের ক্রীতদাস করা হয়েছে, এবং বহুবৎসর সে ব্যবস্থা বলবৎ ছিল—তাই ওঁরা ঐ ধরনের ঘটনার অনুরূপ সন্ধান ক'রে, লাফিয়ে হাজার-হাজার বছর পেছিয়ে গিয়ে, কল্পনা ক'রে বসলেন—ভারতেও তাই হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা স্বপ্নে দেখেন—ভারত একদিন কৃষ্ণচক্ষু আদিম জাতিসমূহে পূর্ণ ছিল—উজ্জ্বলকায় আর্যরা তারপর তাদের জায়গায় এসে বসবাস আরম্ভ করে দিলে—কোথা থেকে এল ভগবানই জানেন—কারো মতে মধ্য তিব্বত থেকে, কারো মতে মধ্য-এশিয়া থেকে। অনেক স্বদেশহিতৈষী ইংরাজ মনে করেন, আর্যরা সকলেই হিরণ্যকেশ, অন্যরা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী কেশের রঙ বদলান। লেখকের চুলের রঙ অনুযায়ী আর্যদের চুলের রঙ হয়। আর্যরা সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদতীরে বাস করতেন, এমন প্রমাণ করার চেষ্টাও সম্প্রতি হচ্ছে। ওঁরা যদি ওঁদের মতের সঙ্গে হ্রদে ডুবে মরতেন, দুঃখিত হতাম না। আর্যদের উত্তরমেরু-নিবাসী করবার চেষ্টাও আজকাল দেখা যায়। আর্য ও তাঁদের বাসভূমির বালাই নিয়ে মরি আর কি! কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এসকলের পক্ষে কোনো প্রমাণ আছে কিনা যদি অনুসন্ধান করা যায় দেখা যাবে যে, কোনোই সমর্থক প্রমাণ

নেই। সেখানে এমন কোনো বাক্য নেই যাতে আর্যদের ভারত-বহিভূর্ত দেশের অধিবাসী মনে করা যেতে পারে। আর আফগানিস্থান তো প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্তই ছিল। শূদ্রজাতি যে বহুসংখ্যায় ছিল, ও সকলে অনার্য ছিল, এ কথাও অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েক-জন ঔপনিবেশিক আর্যের পক্ষে শতসহস্র অনার্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভবই ছিল না। সেক্ষেত্রে আর্যরা তাদের চাটনি করে ফেলত।" [৫—১৮৮-৯০]।

ঐকালে দক্ষিণভারতের একাংশে উত্তরভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আক্রোশ ক্রমেই বাড়ছিল, এবং তাতে ইন্ধন দিচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি--প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাসের ঝুলি-ভরা পদার্থ নিয়ে। স্বামীজী বিভিন্ন লেখায় যথাসম্ভব তার প্রতিবাদ করে গেছেন। উদ্বোধন পত্রিকার প্রস্তাবনা-প্রবন্ধে ['বর্তমান সমস্যা'] তিনি ভারতে আর্য-সমাগম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন তুলেছিলেন কিন্তু মীমাংসার চেষ্টা করেননি, তবে ভারতবর্ষে সর্বজাতির মনুষ্যগণ সম্মিলিতভাবে যে মহান সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, তার গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন। [৬-২৯-৩০]। কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু উদ্বোধনে প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার বহির্দেশ থেকে আর্যদের ভারতে আগমন-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন, সেইসঙ্গে কঠোর সমালোচনা করেছেন আর্যগণ কর্তৃক অনার্য-সংহার থিয়োরীকে—যে-থিয়োরীকে মান্য ক'রে দক্ষিণভারতে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী রামচন্দ্রকে সাম্রাজ্যবাদী আর্য-সম্প্রসারণের প্রতিভূ করে তুলেছিলেন। স্বামীজী ক্ষোভ বোধ করেছিলেন এই দেখে যে, হিংস্র পাশ্চাত্ত্য-বাসীরা এশিয়া-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সাবাড় করার সাফাই গাইতে যেখানে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে অনুরূপ কান্ড দেখাতে ব্যস্ত—সেখানে ভারতবাসীরা কিনা সেই ইউরোপীয় হস্তনিক্ষিপ্ত কলঙ্ককে সানন্দে ললাটভূষণ ক'রে স্বদেশীয় মানুষদের মধ্যে ভেদরেখাকে প্রসারিত ও দুর্মোচ্য করে তুলছে!![২]

এবার চলে আসতে পারি স্বামীজীর জীবনের শেষ পর্বের রচনা "আর্য ও তামিল" প্রবন্ধ প্রসঙ্গে, যার মধ্যে আছে তাঁর ভারতসম্বন্ধীয় গভীর আর্তি ও প্রীতির উচ্চারণ। ওখানে তিনি পন্ডিত শবরীরয়ান ও তাঁর বক্তব্যের উপর মন্তব্য করেছেন। শবরীরয়ানের মত কী, তা স্বামীজীর প্রবন্ধ থেকে কিছুটা বোঝা সম্ভব হলেও পুরো বোঝা যায়নি—এবং কেন তিনি স্বামীজী কর্তৃক অভিনন্দিত, তারও কারণ কিছুটা অস্পষ্ট থেকে গেছে। আনন্দের কথা দক্ষিণভারতে সন্ধানকালে "সিদ্ধান্ত দীপিকা" পত্রিকার[৩] কিছু সংখ্যা দেখবার সুযোগ

২ স্বামীজী লিখেছেন : "ঐ যে ইউরোপী বলছেন যে, আর্যরা কোথা থেকে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলে—ওসব আহাম্মকের কথা। আমাদের পন্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ।. আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই এ পারি-সভায় [প্যারিস ধর্মেতিহাস সভায়] বিশেষ প্রতিবাদ করেছি।. ইউরোপীয়রা যে-দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন—অতএব আর্যরাও তাই করেছে!!.. বলি প্রমাণটা কোথায়—আন্দাজ? ..কোন বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখেছ যে, আর্যরা কোনো বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে-কেটে ফেলেছেন? ..রামায়ণটা তো পড়া হয়নি! খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপরে কেন বানাচ্ছ? রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়!! বটে! রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন কার সঙ্গে - লঙ্কার রাবণরাজার সঙ্গে সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড়-বই কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বলো না?" [৬—২০৯-১০]।

৩ *"The Light Of Truth Or The Siddhanta Dipika And Agamic Review-*
A monthly journal devoted to the study of the Agamanta or the Savia-Siddhanta Philosophy and mysticism, prognostic Astronomy, Indo-Dravidian culture etc. etc."

আমরা পেয়েছি—তার থেকে সিদ্ধান্তবাদীদের মত, তৎসহ পণ্ডিত শবরীরয়ানের মত—স্পষ্টতরভাবে বোঝা সম্ভবপর হয়েছে।

সিদ্ধান্তবাদীদের আন্দোলন সম্পর্কে অধ্যাপক জুলিয়েন ভিনসন একটি ফরাসি পত্রিকায় যা লেখেন, তা সিদ্ধান্ত দীপিকার জুন-জুলাই ১৯০১ সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়।৪ অধ্যাপক ভিনসন লিখেছিলেন : "বর্তমানে ভারতে, বিশেষতঃ তার মধ্যাংশে, একটি ধর্মীয় আন্দোলন সক্রিয়, যা বস্তুতঃ দার্শনিক আন্দোলন—এবং সেটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শৈবমতের পুনরুত্থান ঘটানোই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। শৈবসিদ্ধান্ত মতের পক্ষে জোরালো প্রচার চালানো হচ্ছে; সে কাজ করছেন খুবই বিশিষ্ট কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক, যাঁরা ইউরোপীয় ভাবধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৮৯৭ জুন মাসে মাদ্রাজে এইমতের বিস্তারের জন্য একটি পত্রিকা আরম্ভ করা হয়েছে, যার ক্রমোন্নতি ঘটে যাচ্ছে।"

সিদ্ধান্ত দীপিকার সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার-এ প্রকাশিত 'পায়োনীয়ারস্ অব সাউথ ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন" নামক প্রবন্ধের আলোচনাসূত্রে "এন্সেণ্ট টামিলিয়ান সিভিলাইজেশন" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, পত্রিকাটির অক্টোবর ১৮৯৮ সংখ্যায়। এর মধ্য থেকে জানা যায়—শৈবসিদ্ধান্তবাদীদের আন্দোলন কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল। সম্পাদক জানিয়েছেন : তাঁরা গোড়ায় ঘরোয়াভাবে নিজের মত নিয়ে আলোচনা করতেন। তারপরে ১৮৯৬ সালে মাদ্রাজের 'উইকলি রিভিউ' পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধে, তামিলদের জাতি-সম্বন্ধে তথ্যসন্ধান বেদ বা সংস্কৃত সাহিত্যে করা কতখানি অনুচিত তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়। তামিলরা ভারতের আদিম অধিবাসী—এই মতও অগ্রাহ্য করা হয়। তামিলরা আসলে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন অ্যাসিরীয় সভ্যতার সন্তান। তারা সমুদ্রপথে অ্যাসিরীয়া বা এশিয়া মাইনর থেকে ভারতে আসে, এবং দ্রুত দক্ষিণভারতে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণে তারা নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও নীতিধর্ম প্রবর্তন করে। আর্যরা দ্রাবিড়দের আগমনের সময়ে বা পরে উত্তরভারতে আসে এবং পরবর্তী সহস্র বৎসর তারা দক্ষিণের কথা জানতই না। দক্ষিণীদের তাই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলা অত্যন্ত আপত্তিজনক—যেমন উদ্ভট কথা হবে যদি কোনো ভারতীয় ব্যক্তি ইউরোপীয় পোশাক পরে তার জোরে নিজেকে ইউরোপীয় বলে দাবি করে। সম্পাদক জানিয়েছেন, তাঁর এই মত ঐকালে যথেষ্ট মনোযোগ পায়নি, কেবল মিঃ নেলসন কিছু গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন।

১৮৯৬ সালে উইকলি রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত এই বক্তব্য পুনশ্চ সিদ্ধান্ত দীপিকায় উপস্থিত করার পরে, সম্পাদক সগৌরবে বলেন, তামিলদের সঙ্গে উত্তরভারত বা উত্তর-ভারতীয়দের শিল্পে, সাহিত্যে বা সভ্যতায় কোনো সম্পর্ক ছিল না।—আমরাই প্রথম, তামিলরা অ্যাসিরীয়া থেকে এসেছে, এইমত উপস্থিত করেছি—ভরাট গলায় এই দাবি উপস্থিত করার পরে তিনি ভারতে তামিল সংস্কৃতির উৎস সম্পর্কিত নানা মতবাদেরও উল্লেখ করেন। কয়েক দশক ধরে, তামিলরা ভারতের "আদিম অধিবাসী," এইমত চালু ছিল, যাদের আর্যরা পরাজিত ও অধীনস্থ করে। পরবর্তী থিয়োরী—তামিলরাও আর্য, কিংবা আর্যপূর্বকালে

---

৪ অধ্যাপক পল রেগনড্ (যাঁর কিছু পরিচয় 'প্যারিস কংগ্রেস' অধ্যায়ে দিয়েছি)—অধ্যাপক ভিনসনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন : উনি ফ্রান্সের বিদগ্ধমহলে সম্মানিত ব্যক্তি, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এক পত্রিকার সম্পাদক, প্যারিসের 'গভর্নমেণ্ট স্কুল অব ল্যাংগোয়েজেস্'-এ তামিল ও হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক। উনি দক্ষিণভারতে কিছুকাল কাটিয়েছেন এবং তামিল-প্রেমিক, তামিলদের মধ্যে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈন কাহিনী নিয়ে বই লিখেছেন; বর্তমানে তামিল ব্যাকরণ-সমূহের তালিকা রচনায় ব্যাপৃত।"

["Prof. Julien Vinson and Tamil Literature", *Siddhanta Dipika,* June-July 1901.]

উত্তরভারতের অধিবাসী, আর্যরা তাদের যুদ্ধে হারিয়ে দক্ষিণদেশে ঠেলে দিয়েছিল। ভাষার প্রশ্নে আগে বলা হত যে, [সম্পাদক আরও বলেন] তামিল ভাষাও সংস্কৃত থেকে আগত। ঐ মত কিছু সংশোধনের পরে দাঁড়ায়—তামিল, সংস্কৃতের পাশাপাশি অবস্থান ক'রে সংস্কৃত থেকে প্রচুর ঋণ নিয়েছে। সম্পাদক এসব মত অগ্রাহ্য করে বললেন, ওঁরা যেন-তেন-প্রকারে সংস্কৃত ও তামিলের মধ্যে যোগ দেখাতে ব্যস্ত। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তামিলদের মধ্যে কখনই পরাভূত দেশের হীনমন্যতা দেখা যায়নি। তাদের ভাষায় ছিল প্রচণ্ড প্রাণশক্তি—প্রাচীন তামিল লেখকেরা বিদেশী শব্দগ্রহণে একেবারে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই আর্যরা দক্ষিণে এসে তামিল ভাষা গ্রহণে বাধ্য হয়। এইজন্য অষ্টম নবম শতকের আগে দক্ষিণভারতীয় আর্যদের লেখা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত বই পাওয়া যায় না। শেষের দিকে অবশ্য সংস্কৃত প্রভাব পড়ে। কিন্তু তামিলরা কখনই নিজেদের 'দাস' বলেনি।

সম্পাদক আরও বলেছেন : অগস্ত্য প্রথম আর্য ব্রাহ্মণ যিনি দক্ষিণভারতে আসেন। রামচন্দ্র তামিলদের সাহায্য নিয়ে হিংস্র সিংহলীদের শায়েস্তা করেছিলেন—তিনি তামিলদের দেবতা শিবের কাছ থেকে পাশুপত অস্ত্রও নিয়েছিলেন। কিন্তু রামায়ণের লেখক এমনই অকৃতজ্ঞ যে তামিলদের বিকৃত ক'রে এঁকেছেন। মহাভারতেও দেখা যায়, দক্ষিণভারতে সুনির্দিষ্ট আকারে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই অঞ্চল জয় করতে যাঁরা চেষ্টা করেন তাঁরা কেবল বিবাহবন্ধন স্থাপন করেই তা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেখা যায়, উত্তরভারতে নারীর সম্মান ছিল না—যা ছিল দক্ষিণে।

সম্পাদক এইসূত্রে অধ্যাপক সুন্দররাম পিল্লাইয়ের সংগে তাঁর পত্রে আলাপ-আলোচনার বিবরণ দেন। সম্পাদকের মতামত অধ্যাপক পিল্লাই বহুলাংশে মেনে নেন—এমনকি ক্ষেত্র-বিশেষে উগ্রতরভাবে তামিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের জয়গান করেন। অধ্যাপক পিল্লাই বিশেষ দুঃখ করে বলেন—তামিলদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির থেকে তামিল জাতির সারস্বরূপ ভেল্লালুম-রা শূদ্র বলে বহিষ্কৃত। এসকলই ঘটেছে আর্য চক্রান্তে। আর্যদের গৃধ্নু-স্বভাব সম্পর্কে উক্ত অধ্যাপক বলেছিলেন : "ভ্রান্তিবশে যেসব জিনিস আর্যদর্শন, আর্যসভ্যতা বলা হয়, সেগুলি অধিকাংশই মূলে দ্রাবিড় বা তামিল।.. কর্মবাদ, মায়াবাদ, কৃপাবাদ,.. সরাসরি আমাদেরই বস্তু বলে প্রমাণিত করা যায়, এবং শ্রেষ্ঠ মনীষী, দার্শনিক, এমনকি কবিগণেরও অধিকাংশই যাদের আর্য বলে চালানো হচ্ছে—আমাদেরই লোক। ইউরোপীয়রা তা খুঁজে বার করতে শুরু করেছেন।" পিল্লাই আরও সাহসী হয়ে, আর্যরা কিভাবে আর্যপূর্ব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে তার বিবরণ দেন। গোল্ডস্টাকর, মেয়ার, ম্যাক্সমুলার, কাউয়েল, ডয়সন, চার্লস জনস্টন প্রমুখ পণ্ডিতজনেরা অবশেষে ধরতে পেরেছেন[৫]—হিন্দুদর্শনের ভিত্তি ব্রাহ্মণ্যমতের উপর নির্ভরশীল নয়। এইসব কথা পবিত্রপিতর

৫ ম্যাক্সমুলারের *The Six Systems of Indian Philosophy* নামক গ্রন্থের উপরে লিখিত সম্পাদকীয় রচনায় মাদ্রাজ মেল ১৪ অগস্ট, ১৮৯৯, আলোচ্য প্রসঙ্গে ম্যাক্সমুলারের উক্তি উদ্ধৃত করে :

"In the South India there exists a philosophical literature which, though it may show clear traces of Sanskrit influence, contains also original indigeneous elements of great beauty and of great importance for historical purposes. Unfortunately few scholars only have taken up, as yet, the study of the Dravidian languages and literature."

ডাঃ পোপও একই ধরনের আবেদন জানিয়েছেন—সে কথাও সম্পাদক বলেন :

"An appeal of the same kind was uttered by Dr G. U. Pope in a recent number of the Royal Asiatic Society's Journal, which we noticed in an article entitled *Tamil Epics and Tamil Heroes.*" ["MaxMuller On Indian Philosophy". *Madras Mail*, Aug. 14, 1899]

সঙ্গে জানিয়ে পিল্লাই বলেন, উত্তরভারতের সংস্কৃতের মধ্যে হিন্দুসভ্যতার মূল সন্ধানের চেয়ে ভ্রান্তিজনক কাজ আর কিছু হতে পারে না। "বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাংশে যে-ভারতীয় উপদ্বীপ—তাই এখনো পর্যন্ত আসল ভারতবর্ষ। এখানকার জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ সুস্পষ্টভাবে তাদের আর্যপূর্ব রীতিনীতি, ভাষা, সামাজিক আচার-আচরণ বজায় রেখেছে।" ইনি শৈবসিদ্ধান্ত মত সম্বন্ধে আবেগের সঙ্গে বলেন : "এই মতকে সমর্থ ও সহৃদয় তামিল-বিশেষজ্ঞ ডাঃ পোপ সঙ্গতভাবেই 'দ্রাবিড়-মনীষার সর্বোত্তম উৎপাদন' বলে চিহ্নিত করেছেন।"

সিদ্ধান্ত দীপিকার সম্পাদকও এই প্রবন্ধে ডাঃ পোপের মতামতের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। ভারতীয়দের আর্যত্ব সম্বন্ধে যেমন ম্যাক্সমূলারের উক্তির বহুল ব্যবহার করার অভ্যাস সে-কালে প্রচলিত ছিল, তদনুযায়ী গরিমা বাগিয়ে নেবার চেষ্টা [রবীন্দ্রনাথের বক্রোক্তি আমাদের স্বতঃই স্মরণ হয় এক্ষেত্রে : "মোক্ষমূলর বলেছে আর্য, সেই হতে মোরা ছেড়েছি কার্য"]—ঠিক তেমনি তামিল-অভিমানের সহায়করূপে কিছু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতকে পাওয়া গিয়েছিল —তাঁদের মধ্যে রেভারেন্ড ডাঃ জি ইউ পোপের নাম প্রায়শঃই উল্লিখিত—যিনি এই মতবাদী-দের কাছে হোলি পোপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।৬ সম্পাদক 'তামিল' শব্দটিকে ধরিয়ে দেবার জন্য ডাঃ পোপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন : "আগে দক্ষিণীদের বিষয়ে বলা হত তারা তুরানীয়। সেটা বন্ধ হয়ে এখন দ্রাবিড় শব্দ ব্যবহৃত। দ্রাবিড় শব্দ প্রথম ব্যবহার করেন বিশপ কল্ডওয়েল। এখন আবার ব্যবহৃত হচ্ছে 'দক্ষিণভারতীয় মানুষ', 'দক্ষিণভারতীয় ভাষা।' এগুলি গুরুভার। তার বদলে 'তামিল' ভালো—সেটি আকারে ছোট। রেভারেন্ড ডাঃ পোপ এশিয়াটিক কোয়ার্টারলি রিভিউ পত্রিকায় তাঁর 'পোয়েটস্ অব দি তামিল ল্যান্ড' লেখায় কথাটি ধরিয়ে দিয়েছেন।' এখন প্রশ্ন, সমগ্র দক্ষিণভারতের ক্ষেত্রে তামিল শব্দটি কি করে প্রযুক্ত হতে পারে যেখানে সেটি একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী ও তাদের ভাষা সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়? সম্পাদক কিছুটা আলিঙ্গনের, কিছুটা পেষণের বাহুতে সবাইকে জড়াতে চাইলেন : "এক্ষেত্রে অসুবিধা ছিল মালাবারিদের নিয়ে। কিন্তু এখন তারা তামিল প্রভাব মেনে নিচ্ছে। কিছুটা ঝঞ্ঝাট আছে কানাড়ীদের নিয়ে—যারা সাহিত্যে পিছনের বেঞ্চে বসে আছে, এবং জানেনা প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি? তাদের অবশ্য বোঝানো যাবে যে, তামিল ভাষা ও আচার-আচরণ তাদের কতখানি নিজের জিনিস। সবচেয়ে গণ্ডগোল ঘটবে তেলেগুদের নিয়ে, যাদের সামলানো সত্যই কঠিন, আর তাদের ভাষাও সবচেয়ে বেশি সংস্কৃত-প্রভাবিত।"

উত্তরভারত-বিরোধী আন্দোলন যে-সব জিনিসকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল তার একটি রামায়ণ-বিরোধিতা। কারণ—রামায়ণে নাকি দক্ষিণীদের বানর বলা হয়েছে। সিদ্ধান্ত দীপিকায় রামায়ণ-বিরোধী অনেক লেখা এই পর্বেই বেরিয়েছে। তার একটিতে [মার্চ, ১৯০২, *Sri Rama and the Ramayana*] এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ তর্কযুদ্ধের বিবরণ আছে। সম্পাদক ও তাঁর মতবাদীদের নিন্দাত্মক রচনার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেন টি সদাশিব আয়ার এবং সম্পাদক তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। এইসূত্রে সম্পাদক রামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্র তপস্বী হত্যা করার তীব্র নিন্দা করে বলেন—"রাম জাতিভেদ ও পুরোহিততন্ত্রের স্বৈরাচারের অতি

৬ সিদ্ধান্ত দীপিকা, মার্চ ১৮৯৯ সংখ্যায় মাদ্রাজ মেল থেকে সিদ্ধান্তমত সম্পর্কে ডাঃ পোপের মত সংকলন করার পরে মন্তব্য করে :

"Learned men who had an opportunity of looking in the work [of Dr Pope] are of opinion that nothing has yet been published at all like it concerning Siddhanta." ["Dr Pope's Latest Work", *Siddhanta Dipika*, March 1899]

ডাঃ পোপ, এই পত্রিকার মতে, "ইংলণ্ডের একমাত্র প্রবীণ তামিল পণ্ডিত।"

ভয়াবহ সহায়ক-দৃষ্টান্ত।...তিনি সাহসশূন্য এবং নৈতিক শক্তিহীন,...ন্যায় ও মানবতার বিরোধী।" "অমার্জিত লেখক" বাল্মীকিকে তিনি আক্রমণ করে বলেন—বাল্মীকি দক্ষিণীদের বানর বানিয়ে ঘোর অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। সদাশিব আয়ার ঐ সকল অভিযোগের উপযুক্ত উত্তর দেবার চেষ্টা করেন, সেইসঙ্গে তামিল আঞ্চলিকতার পৃষ্ঠপোষক সাহেবদের জ্ঞানগম্যির কিছু নমুনাও দেন। মাদ্রাজ ক্রীশ্চান কলেজ ম্যাগাজিনে রেভারেণ্ড লাজারাস লিখেছিলেন : প্রখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ভগবদ্‌গীতা জাল রচনা; ও-কাজ করেছেন দ্বিতীয় শতাব্দীর এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। সদাশিব আয়ার মধুরভাবে বলেন, অবশ্য! অবশ্য! নিশ্চয় সেই জালিয়াত ব্রাহ্মণটি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে হাজির হয়ে, মহাভারতের সকল সংস্করণের মধ্যে উক্ত জাল বস্তুটি ঢুকিয়ে দিতে তাঁদের বাধ্য করেছিলেন। তখন রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ, ছাপাখানার ব্যবস্থা না থাকলেও কি হবে—ও-কাজ তিনি করতে পেরেছিলেনই—না করে পারেন কখনো?

সদভিপ্রায় বা অসদভিপ্রায়ে প্রণোদিত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদে উস্কানি দিচ্ছিলেন৭—কিন্তু মাঝে মাঝে বিপত্তি যে হয়নি তা নয়, যেমন হয়েছিল পূর্বোক্ত অধ্যাপক জুলিয়েন ভিনসেনের বক্তব্যে, যখন তিনি বলেছিলেন, তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে তামিলরা লিখতেই জানত না এবং প্রথম তামিল বই লেখা হয় পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই মারাত্মক বক্তব্যের যৎপরোনাস্তি প্রতিবাদ করা হয়, চড়া গলায় বলা হয় : পুরনো উপাদান না পাবার কারণ তো প্রাচীন তামিল কিংবদন্তীতেই মেলে—তামিল জাতির

৭ অক্সফোর্ডের ম্যানস্‌ফিল্ড কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডাঃ ফেয়ারবার্ন ভারতে এসেছিলেন 'হ্যাসকেল বক্তা'রূপে। অনুরূপ অন্য বক্তাদের ক্ষেত্রে যা হয়, এঁর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল—গোড়ার উদারতার ভঙ্গি প্রদর্শন, শেষে ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষোদ্‌গার। ভারতের অপরাধ—উনি বা ওঁদের ইচ্ছামতো 'দেখিলাম ও জয় করিলাম' ব্যাপারটি এখানে ঘটেনি। 'কনটেম্পোরারি রিভিউ' পত্রিকার জুন ১৮৯৯ সংখ্যায় ফেয়ারবার্ন 'রিলিজন ইন ইণ্ডিয়া' নামে এক প্রবন্ধে মনের কথা খুলে বলেন। ভারত-সফরের পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে লেখা এই প্রবন্ধে ইনি প্রচলিত মিশনারি-থিয়োরীই উগ্‌রে দেন : "হিন্দুধর্ম কোনো একটি ধর্ম নয়, বিভিন্ন ধর্মের সমষ্টি হিন্দুধর্মকে না বলা যায় নির্দিষ্ট দর্শন, না আছে এতে নির্দিষ্ট পূজাপদ্ধতি, না স্থির ধর্মতত্ত্ব বা বিশ্বাস—এতে নির্দিষ্ট কেবল জাতিভেদ।" ইনি যথারীতি উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের বিরোধে উস্কানি দেন; দক্ষিণের বীর মানুষেরা উত্তরভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সমর্থ ছিল—কি আর্যযুগে, কি মুসলমান যুগে। ইনি অবশ্য না জানিয়ে পারেননি—সেই বীর দক্ষিণীরা ইদানীং ইংরাজরাজের বড়ই ভক্ত। এঁর ধারণার অগভীরতা এঁর নিম্নের উক্তি থেকে বোঝা যায় :

"In Madras, both physical and historical conditions have been kindlier, caste character is less strongly marked, there is more social freedom."

এই ব্যক্তির কাছে দক্ষিণভারতে খ্রীস্টান সংখ্যাবহুলতা প্রীতিপ্রদ ঠেকেছিল, সেইসঙ্গে খ্রীস্টানী শাসন (ইংরাজশাসন এঁদের কাছে খ্রীস্টানী শাসন) সম্বন্ধে সহিষ্ণুতার মনোভাবও। তারিফ করে ইনি লিখেছেন :

"There is . a keener intellectual and intenser public life, more vivacity and openness of mind, due perhaps to larger exposure to Western influences." ["Religion in India : Dr Fairbairn's Views", *Madras Mail*, June 26, 1899]

এখানে ডাঃ গুস্তাভ ওপার্টের মতামতও উল্লেখযোগ্য। এই জার্মান ভারততাত্ত্বিকের সঙ্গে ইতিমধ্যেই 'প্যারিস কংগ্রেস' অধ্যায়ে পাঠকের পরিচয় ঘটেছে। দ্রাবিড় জাতির আত্মাভিমানে সুড়সুড়ি দিতে ওপার্ট সর্বদাই উৎসাহী ছিলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন—ভারতের আর্যপূর্ব অধিবাসীরা ফিনিশ-উগ্রিয়ান বা তুরানীয়। পণ্ডিত শবরীরয়ান ওপার্টের তুরানীয়-উৎস থিয়োরী না মানলেও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তামিল প্রভাব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন মনে হয়।

আদি বাসভূমি জলপ্লাবনে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেছে। তাছাড়া ষষ্ঠ শতাব্দীতে এক সিংহলী রাজা তামিল বই পুড়িয়েও ফেলেছেন।৮

তামিল জাতীয়তার প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিল তামিল ভাষা। তাই উক্ত তামিল ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পর্কহীন, তা অতি প্রাচীন এবং নিজ শক্তিতে অতীব সমৃদ্ধিশালী—একথা প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে বলবার চেষ্টা করা হয়।৯ অধ্যাপক ভিনসন তামিল সাহিত্যের অতি প্রাচীনত্ব স্বীকার না করে এঁদের বিরাগভাজন হলেও, সংস্কৃতের সঙ্গে এই ভাষার অতি পার্থক্য বর্তমান—একথা বলে কিছুটা মনোহারী হন। শেষোক্ত ক্ষেত্রটিতে কিন্তু শবরীরয়ানের সঙ্গে অধ্যাপক ভিনসনের মতপার্থক্য ঘটে।

শবরীরয়ানের মূল বক্তব্য : তামিল কোনোমতেই তুরানীয় ভাষা নয়; তামিল ও আর্য-ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর, তবে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল; দক্ষিণ-ভারতে তৃতীয় শতাব্দীর বহু পূর্ব থেকেই লিখনরীতি জ্ঞাত ছিল, এবং তামিল সাহিত্য সুপ্রাচীন। তামিল যে তুরানীয় ভাষা নয়—শবরীরয়ানের এই মত অধ্যাপক ভিনসন মেনে নেন, কিন্তু সংস্কৃত—আর্যভাষা ও তামিলের মিশ্রণের উৎপাদন—এ মত মানতে পারেন নি। তিনি বলেন, তামিল ভাষা লেখ্যরূপ ধারণের অনেক আগেই সংস্কৃত গঠিত হয়ে গেছে, এবং যেহেতু তামিলের তখন উৎকর্ষ ছিল না তাই তামিলদের মধ্যে সংস্কৃতের বিস্তার ঘটতে পেরেছিল। জৈনরা অবশ্য কিছুটা যত্নের সঙ্গে তামিলচর্চা করেন। শবরীরয়ান কিন্তু তাঁর এই মতে অটল থাকেন যে, অসংস্কৃতিসম্পন্ন সংস্কৃত দ্রাবিড়-সম্পর্কেই উৎকৃষ্ট ভাষা হয়ে দাঁড়ায়; আর্যসংস্কৃতের মধ্যে যেসব অভাব ছিল তাদের পূরণ করে দ্রাবিড়রা তাকে 'সংস্কৃত' ভাষা করে তোলেন।১০

পণ্ডিত শবরীরয়ান সিদ্ধান্ত দীপিকার অক্টোবর ১৯০০ সংখ্যা থেকে *The Admixture of Aryan with Tamilians* বলে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন, যা কয়েক বৎসর চলে। এই প্রবন্ধটি স্বামীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে স্বামীজী অবশ্যই পণ্ডিত-প্রবরের তামিল-অভিমান লক্ষ্য করেছিলেন, ইচ্ছামতো নিজস্ব 'ইতিহাস-সৃষ্টি'র চেষ্টাও—কিন্তু একইকালে এঁর সমন্বয়ী দৃষ্টি তাঁর চোখ এড়ায়নি, যা বিচ্ছিন্নতার মনোভাবের প্রশ্রয় দেয়নি। একদিকে ছিল উত্তরভারতের আর্যাভিমান দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের মধ্যে তার উত্তরাধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি—অন্যদিকে দক্ষিণীদের মধ্যে, প্রধানতঃ অব্রাহ্মণ অংশে, তামিল-অভিমান এবং নিজেদের উত্তরভারত থেকে পৃথক দেখাবার প্রবৃত্তি। ঐকালে মাতামাতি হচ্ছিল প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির উৎসকথা নিয়ে—কিন্তু পরবর্তী বহু শত বৎসরের সমীকরণের যুগটি অস্বীকৃত হচ্ছিল। স্বামীজীর কাছে ভারতবর্ষই মূল সত্য—তা আর্য কি অনার্য কিছু এসে যায় না; যদি আর্যদের গুণমহিমা থাকে, তা স্বীকার্য, যদি তামিলদের বা অন্যান্যদের থাকে তাও স্বীকার্য। সকলই ভারতের গৌরববস্তু। পণ্ডিত শবরীরয়ান যখন সংস্কৃত ভাষাগঠনে তামিলদের প্রভাবের কথা বললেন, তখন তাকে স্বাগত জানাতে স্বামীজী এতটুকু দ্বিধা করেননি, এবং উত্তরভারতের সংস্কৃতির গঠনে দক্ষিণভারতীয় প্রভাবকে সানন্দে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৮ "Corespondence : A Reply to Prof Julien Vinson of Paris", *Siddhanta Dipika*, Feb.-March, 1902.

৯ "Tamil Literature," *Ibid* March-April, 1900. "An Appeal to Tamil Nation", *Ibid* June-July, 1901.

১০ "Some Disputed Points Cleared," by D. Savariroyan, *Siddhanta Dipika*, Sep.-Oct., 1901. "Some Disputed Points," by Julien Vinson, *Ibid* May, 1902.

'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধে স্বামীজী আর্য শব্দকে জাতিসূচক না রেখে সংস্কৃতিসূচক করতে চেয়েছেন—ওর অর্থ শিষ্ট বা সভ্য। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা উচ্চ সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের আর্য মনে করেছেন। এই 'আর্য'-এর প্রতিশব্দ 'হিন্দু।' "আর্য-জাতি সংস্কৃত ও তামিল, এই দুই ভাষাভাষীর সংমিশ্রণে গঠিত।" "আর্য ও দ্রাবিড়—শব্দ-দুটি ভাষা-সূচক—তথাকথিত করোটিতত্ত্বগত (craniological) প্রভেদ-সূচক নহে।" "আমরা পুরোপুরি মিশ্র জাতি।"

দ্বিতীয়তঃ স্বামীজী বর্ণবিভাগকে, অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি–প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মবিভাগ বলেছেন। কোনোপ্রকার আত্মসংকোচ না রেখে বলেছেন, "ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম মানবজাতিকে প্রদত্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের অন্যতম।" এই বর্ণবিভাগকে তার উৎপত্তি ও সুস্থ বিকাশের কালে নমনীয় পদ্ধতি মনে করেছেন বলে, স্বামীজীর মতে, "বর্ণবিশেষের উৎপত্তি সম্বন্ধে দাম্ভিকতাপূর্ণ মতবাদ [যা ব্রাহ্মণরা উপস্থিত করেছিল] অসার কল্পনামাত্র।"

দৃঢ়সাহসের সঙ্গে স্বামীজী এই রচনাতেও ব্রাহ্মণ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন; একই সঙ্গে তাঁর বহুকথিত কথার পুনরুচ্চারণ করেছেন : "ব্রাহ্মণগণ। তোমার চারি-পাশের অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া তোমাদের মনুষ্যত্ব–ব্রাহ্মণত্ব–প্রমাণ করো।"

এই প্রবন্ধটি যে উত্তরভারত ও দক্ষিণভারতের ভাবসংঘাতের পটভূমিকায় স্বামীজী অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে রচনা করেছিলেন তা বোঝা যায় এর সংক্ষিপ্ত আকারের মধ্যেও পুনঃপুনঃ সতর্কবাণী থেকে। "ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস লইয়া আমরা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি নাই, সেইরূপ ইচ্ছা করিয়াই আমরা দাক্ষিণাত্যের সামাজিক অত্যাচারের কথা বেশি বলি নাই। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে যে-বিরোধের উত্তেজনা বিদ্যমান, তাহার উল্লেখই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।" ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ, সকলেই পরস্পরের বিষয়ে ঘৃণাসৃষ্টিতে ব্যস্ত, এবং "অহিন্দুরাও এই পারস্পরিক ঘৃণার অগ্নিতে প্রচুর ইন্ধন দিতেছেন"—একথা বলার পরে নির্দেশের অঙ্গুলি তুলে স্বামীজী বলেছিলেন :

"বিভিন্ন বর্ণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান হইবে না। যদি এই বিরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া ওঠে, তাহা হইলে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক প্রগতিই কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে।"

আর্য বা তামিল—কাউকেই বহিরাগত মনে করতে স্বামীজী চাননি। তারা উভয়েই বহিরাগত, এই মত যদি সত্য হয়ও, স্বামীজী বলতে চেয়েছেন বর্তমান ভারতীয় জাতির মধ্যে ঐ পার্থক্য লক্ষিতব্য নয়। আরও বলেছেন, বেদে দস্যুদের কুৎসিত আকার সম্বন্ধে যে-সব বিশেষণ আছে, সেগুলি কোনোমতেই "মহান তামিলভাষীদের" বিষয়ে প্রযুক্ত হতে পারে না, কারণ "আর্য ও তামিলদের মধ্যে কাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য বেশি, এ সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা হইলে ফলাফল সম্বন্ধে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ভবিষ্যৎবাণী করিতে সাহসী হইবেন না।"

পণ্ডিত শবরীরয়ান তামিলদের বহিরাগত ধরেছেন—তাঁরা সুমেরীয় ইত্যাদি। যে-জাতীয়তার প্রেরণায় এই ধরনের সিদ্ধান্ত, তার মুখে বাড়তি ভোজ্য এগিয়ে দিয়ে স্বামীজী বললেন : "আমরা মনে করি, মালাবার কেবল মিশরবাসীদের পন্ট্ দেশই নহে, পরন্তু সমগ্র মিশরীয়গণ মালাবার-তীর হইতে সমুদ্র পার হইয়া, নীলনদের তীর ধরিয়া, উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং তাহারা পন্ট্-কে পুণ্য-ভূমি জ্ঞান করিয়া সর্বদাই সেদিকে সাগ্রহে মানসনেত্রে তাকাইয়া থাকিত।"

পণ্ডিত শবরীরয়ানের প্রতি স্বামীজীর বিশেষ সাধুবাদের হেতু অবশ্যই তামিলরা বহিরাগত—এই থিয়োরীর জন্য নয়—শবরীরয়ান ভারতীয় সভ্যতাকে আর্য ও তামিল সংস্কৃতির

সম্মিলিত সৃষ্টিরূপে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, সেই জন্যই। শবরীরয়ান অবশ্যই "কিছুটা অনিশ্চয়তার পথে বিচরণ" করেছিলেন, কিন্তু একথাও সত্য, "তিনি ঘৃণা ও অজ্ঞতাপ্রসূত কোলাহলের মধ্যে যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞোচিত পন্থা অনুসরণ" করছিলেন। "নির্বোধ ও নিরর্থক কোলাহলে মহামূল্য প্রাণশক্তি নষ্ট না করিয়া, তিনি সিদ্ধান্ত দীপিকায় 'আর্য ও তামিলগণের সংমিশ্রণ' নামক প্রবন্ধে বেপরোয়া পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিদ্‌গণের সৃষ্ট মতবাদের কুয়াশাই কেবল ভেদ করেন নাই, অধিকন্তু দাক্ষিণাত্যের জাতিসমস্যার যথার্থ রূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়তা করিয়াছেন।" তাঁর "প্রচেষ্টা ঠিক পথে চলিয়াছে," কারণ তিনি "সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে তামিল ভাষা ও উপাদান আবিষ্কারে ব্রতী।"

স্বামীজী কোনো বিশেষ ভাষাগোষ্ঠী বা রক্তসম্বন্ধের পক্ষে ওকালতি করছিলেন না বলে, কোনো বিশেষ আবিষ্কারে বা মতবাদে আশঙ্কিত ছিলেন না, যদি-না তা ইচ্ছাপূর্বক ভারতের স্বার্থনাশে প্রয়াসী হয়। সুতরাং শবরীরয়ানের মতবাদের বিষয়ে লিখতে পেরেছিলেন : "পণ্ডিত শবরীরয়ান যে, সাহস-ভরে প্রাচীন তামিলগণের সঙ্গে আক্কাদো সুমেরীয়গণের জাতিগত ঐক্যসম্বন্ধীয় মতবাদের উপর জোর দিয়াছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত। ইহার ফলে অন্য সমুদয় সভ্যতার পূর্বে যে-সভ্যতাটি বিকশিত হইয়াছিল--যাহার তুলনায় আর্য ও সেমিটিক সভ্যতাদ্বয় শিশুমাত্র—সেই সভ্যতার সহিত আমাদের রক্ত সম্বন্ধের কথা ভাবিয়া আমরা গৌরববোধ করিতেছি।"

বিশাল বাহু মেলে সমগ্র মানবজাতিকে যে-বিবেকানন্দ আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন-সেই তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষের সমগ্র মানুষকে নিজের ভ্রাতা বা সন্তান বলা আর এমন কি। নিম্নের মহান উক্তি 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধেই তিনি করেছেন :

"আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি। আমরা গর্ব অনুভব করি তামিলভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য, যাঁহারা এতাবৎ জ্ঞাত সর্বপ্রাচীন সভ্যতার সন্তান। এই দুই সভ্যতারও পূর্ববর্তী, অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল পূর্বপুরুষদের জন্য আমরা গর্বিত। আমরা গর্বিত—মানবজাতির আদিপুরুষ, প্রস্তর-অস্ত্রধারী মনুষ্যগণের জন্য। আর যদি বিবর্তনবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে আরও পূর্ববর্তী পশুরূপী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্বিত। জড় অথবা চেতন—এই সমগ্র বিশ্বজগতের উত্তর-পুরুষ বলিয়া আমরা গর্বিত।" [৫—৩৮৩]।

কী ব্যাপক, বিশাল, বিচিত্র ও গভীর স্বামীজীর ভারতবর্ষ! রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতায় যার পরবর্তী কাব্যিক প্রতিধ্বনি—তাই বিবেকানন্দের শক্তিধর গদ্যে রক্তমাংস ধরে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ও-বস্তুকে বাংলা অনুবাদে ফোটানো সত্যই কঠিন :

"সত্যই এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়ত সম্প্রতি-আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধ-বানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যে-কোনো স্থানে খুঁড়িলে মিলিবে। হ্রদবাসী বা নদীতীরবাসীরা নিশ্চয় কোনোকালে এখানে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্রসজ্জাকারী, তৎসহ বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনো নানা অঞ্চলে দেখা যাইবে। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয় দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের তথাকথিত নানা আর্য শাখা-প্রশাখা মিলিত। পারসিক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হূন, চীন, সীথিয়ান—অসংখ্য জাতি মিলিত মিশ্রিত। ইহুদী, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি, যাহারা এখনো একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই সকল বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তন-

শীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, নিম্নে ছড়াইয়া পড়িয়া, ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া, আবার শান্ত হইতেছে। ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।" [৫—৩৭৭-৭৮]১১

॥ ৫ ॥ বিবেকানন্দ ও আর্যসমাজ আন্দোলন

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শক্তিশালী আর্যসমাজ-আন্দোলনের কথা এই প্রসঙ্গে এসে যায়। এই আন্দোলন সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব কি ছিল—এবং এই সম্প্রদায়ভুক্তরা স্বামীজীর বিষয়ে কী ভেবেছেন, তা এইসূত্রে দেখে নেওয়া যায়। এখানে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—স্বামীজী সম্পর্কে আর্যসমাজের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি, কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্য অবশ্য পেয়েছি।

স্বামী দয়ানন্দের মতো প্রচণ্ড শক্তিধর পুরুষের বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা ছিল, বলাই বাহুল্য। রোমা রোলাঁ—দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দের তুলনা ক'রে, উভয়ের মনোগঠন ও কার্যধারার ঐক্যপার্থক্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা আগেই উপস্থিত করেছি। [৩-৩৭৪-৭৫]. সমাজসংস্কারের কোন্-কোন্ বিষয়ের প্রতি দয়ানন্দের সমর্থন ছিল, তাও ঐ অংশে উল্লিখিত হয়েছে। আর্যসমাজ যেখানে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছে, কিংবা ছলে-বলে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পূর্বধর্মে পুনর্গ্রহণের চেষ্টা করেছে,১২ সেখানে স্বামীজীর

১১ সিদ্ধান্ত দীপিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক যে স্বামীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তা অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের স্মৃতিকথা থেকে আগেই দেখেছি। সিদ্ধান্ত দীপিকায় ব্রহ্মবাদিন ও প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত ধর্মীয় ও দার্শনিক মত নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করা হয়েছে, সেসব আলোচনা বিতর্কমূলক হয়েও সশ্রদ্ধ। রামকৃষ্ণ মিশনের সংবাদও পত্রিকাটি ছাপত। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে এই পত্রিকার জুলাই-অগস্ট সংখ্যায় জি এম স্বামীর লেখা প্রবন্ধে স্বামীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়েছিল। স্বামীজীর "পৃথিবীখ্যাত বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় বাগ্মিতা, এবং ঐকান্তিকতার" তুল্য কিছু দীর্ঘকালের মধ্যে মিলবে কিনা, এই যথার্থ সন্দেহ লেখক প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজীর ধর্ম ও দর্শনসংক্রান্ত মত সকলে স্বীকার করবেন না—এইকথা বলার পরে, লেখক যোগ করেন—ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর ধর্মরক্ষায় বিবেকানন্দের ভূমিকা সর্বথা স্বীকার্য। স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয়ে লেখকের এই সমকালীন উক্তি উল্লেখ্য :

"As recently as 20 years ago there were scarcely 5 percent of even so-called educated who knew anything of their own religion... And even in the civilized continents of Europe and America atheism and agnosticism were beginning to predominate in the minds of the thinking men and women... We are sure that thousands will bear honest testimony to our statement that Vivekananda contributes not a little to raising the mind of man from matter to spirit." [*Light of Truth or Siddhanta Dipika*, July-Aug., 1902]

১২ স্বামীজী ধর্মান্তরিতকরণের মোটেই সমর্থক ছিলেন না, সমন্বয়বাদীরূপে তা হতেও পারেন না—সুতরাং ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে [৯—৪৮৩-৮৬] তিনি এমনকি বলেছেন, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতরা স্বধর্মে ফিরতে চাইলে কোনোরূপ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই; তবে যারা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত তাদের প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা হলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হবে।

যেসব শিখ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল তাদের শিখধর্মে ফিরিয়ে নেবার উদার ব্যবস্থা দেখে স্বামীজী খুশি হয়েছিলেন। লাহোরে শিখদের এক শুদ্ধিসভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। "স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গিগণসহ এই [শুদ্ধি] সভার একটি অধিবেশনে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন তখন একটি সুবৃহৎ কড়ায় কড়াপ্রসাদ (হালুয়া) প্রস্তুত হইতে-

সমর্থন ছিলই. কিন্তু অবশ্যই সমর্থন ছিল না দয়ানন্দের অবুঝ স্বমতপ্রীতিতে এবং রূঢ় সাম্প্রদায়িকতায়। দয়ানন্দ অপর ধর্মকে সহ্য করতে রাজি ছিলেন না—তিনি "নিজ ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের পার্থক্যকে দিবা ও রাত্রির পার্থক্যের তুল্য" মনে করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে গোড়ায় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করলেও পরে সে পথ থেকে দয়ানন্দ সরে গেছেন, কারণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদবিরোধিতা তাঁর কাছে অসহ্য, এবং বিরক্তিকর কেশবচন্দ্র সেনের খ্রীস্ট-ধর্মানুরক্তি। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি শেষপর্যন্ত জাতীয়তাবিরোধী মনে করেছিলেন। খ্রীস্টান ও মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে দয়ানন্দ যুদ্ধংদেহি মনোভাব পোষণ করতেন, এবং তাঁর 'সত্যার্থ-প্রকাশে'র শেষাংশে বাইবেল ও কোরান সম্বন্ধে বিরূপ কথা আছে।

ধর্মসমন্বয়ের অবতার ও প্রচারক রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কাছে দয়ানন্দের আপসহীন স্বধর্মপ্রীতি অবশ্যই গ্রাহ্য নয়—গ্রাহ্য নয় দয়ানন্দের নিজস্ব বেদ-বদ্ধতা। দয়ানন্দ সত্যই রিভাইভ্যালিস্ট—চেয়েছেন বর্তমানকে উপড়ে বেদের যুগে ছুঁড়ে ফেলতে। যে-ভারতবর্ষ উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড এবং পুরাণসমূহের ভক্তিস্রোতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, সে ভারতবর্ষ তার কাছে প্রক্ষিপ্ত ছাড়া কিছু নয়। দয়ানন্দ চড়াভাবে দ্বৈতবাদী. এবং চার্লস হিমসাথ যা বলেছেন. সে প্রশংসা তার প্রাপ্য—তিনি ভারতীয় শাস্ত্রসমর্থনে একটি একেশ্বর-বাদী ধর্ম প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ বহু সহস্র বৎসর ধরে 'বৈদিক' নয়, বৈদান্তিক—কর্মকাণ্ডকে অতিক্রম করে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বিত ধর্মদর্শনে বিশ্বাসী; সেই সঙ্গে একান্ত সাধনায় ব্রতী, যার মূল লক্ষ্য অপরোক্ষানুভূতি। এই সকলের প্রয়োজন বা মূল্য দয়ানন্দ স্বীকার করেননি। সেজন্য দয়ানন্দের ধর্মদর্শন ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রসারলাভ করেনি। দয়ানন্দ দক্ষিণভারতে যাননি সেখানে তাঁর প্রভাব নেই. এবং পূর্বভারতে এলেও ভাবময় ধর্মসাধনার রসে নিমজ্জিত সেই ভূমিতে স্বীকৃতি পাননি। উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে, কিন্তু প্রধানতঃ পঞ্জাবেই দয়ানন্দের প্রভাব ব্যাপক, এবং তার ঐতিহাসিক কারণও আছে। শিখধর্ম ও ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত পঞ্জাবে ব্রাহ্মণ্যশাসন শিথিল, জাতিপ্রথার কড়াকড়ি নেই। নানক. কবীর রামানন্দের মূর্তিপূজা-বিরোধী মতবাদ প্রসারিত সেখানে। এই ভূমিতেই দয়ানন্দের উগ্র যুযুধান মত বিশেষভাবে জাঠদের কাছে স্বীকার্য হয়েছিল, যারা ব্রাহ্মণ্যশাসনে নিজেদের বেঁধে ফেলেনি।

স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের যে-পরিচয় ইতিমধ্যে দিয়েছি. তার থেকে পাঠক অবশ্যই বুঝেছেন. তিনি দয়ানন্দের একেবারে বিপরীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিবেকানন্দ বেদ বলতে তার অন্ত্যভাগ উপনিষদকে বুঝতেন—এবং মনে করেছেন—জ্ঞানকাণ্ডের চরম চিত্ত-স্বাধীনতাতেই আছে মানবজাতির মুক্তি। তিনি আবার অন্তে অদ্বৈতবাদীও। তাছাড়া ধর্ম তাঁর কাছে মতবাদ নয়—তা উপলব্ধি। Religion is Realisation। মহারহস্যচেতনায় তিনি ব্যাকুল থাকতেন সর্বদা—অন্তর্গহনে নিমজ্জিত হতেন ক্ষণে-ক্ষণে। এঁর সঙ্গে, নীতি-সমাপ্ত ধর্মব্রতী দয়ানন্দের ভাবৈক্যের ক্ষেত্র যে অত্যন্ত সংকীর্ণ হবে তাতে সন্দেহ কি? জগৎ-ছাড়া এক ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন—একথা বিবেকানন্দের জ্ঞান-বুদ্ধিতে উদ্ভট, এবং পুরাণে কেবল আছে ক্লেদ১৩—এ-কথা শুনলে ঈশ্বরের প্রেমে অশ্রুগলিত বিবেকানন্দের

ছিল। আজ দুইজনকে শুদ্ধ করা হইবে। শুদ্ধকামিদ্বয় অনুতাপ প্রকাশপূর্বক সভাসমক্ষে পুনর্বার শিখধর্মে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করিলে, গুরুগোবিন্দ সিংহের নামোচ্চারণ, গ্রন্থসাহেবের পবিত্র মন্ত্রসকল পাঠ ও পবিত্র বারিসেচনে উহাদিগকে শুদ্ধ করা হইল।...স্বামীজী শিখদিগের এইরূপ উদারভাব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন।" ['ভারতে বিবেকানন্দ' (১৩৪৮সং) ৪৪৪-৪৫]

১৩ আর্যসমাজীরা পুরাণকে কতখানি ঘৃণার চোখে দেখতেন, এবং তাঁদের ঘৃণার প্রকাশ ক্ষেত্র-বিশেষে কতখানি শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করত, তা দেখতে পাই ইন্ডিয়ান মিরারে ১৭ এপ্রিল, ১৮৯৭. প্রকাশিত এক পত্রে। পত্রলেখক দয়ানন্দের পুরাণ-বিদ্বেষের অংশীদার ছিলেন।—

নয়নে আহত বিস্ময় ছাড়া আর কি ফুটতে পারে? বিবেকানন্দের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনা অট্টহাস্য করে উঠেছে—আমেরিকা 'পাতাল' এবং 'অসুরের নিবাস'. একথা শুনে, [দয়ানন্দ তা বলতেন; ২য়, ১৭২]. এবং অবশ্যই আতঙ্কিত হয়েছে নিজ ধর্মের বাইরে অন্য ধর্ম সম্বন্ধে দয়ানন্দের রূঢ় অসহিষ্ণুতার রূপ দেখে।

আর্যসমাজীরাও, অন্ততঃ তাঁদের গোঁড়া অংশ, বিবেকানন্দ ও তাঁর মতের সহসা প্রসার দেখে প্রসন্নতা বোধ করতে পারেনি।১৪ আমরা যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে প্রধানাংশে এঁদের তিক্ত বিবেকানন্দ-বিরোধী মনোভাবই দেখতে পাই। ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০১, "আর্য মেসেনজার" পত্রিকার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ উৎকলন করেছিল, যাতে দেখা যায়, আর্যসমাজী পত্রিকাটি সাগ্রহে মাদ্রাজ মেলে 'জনৈক হিন্দুর' এই মন্তব্য সমর্থন করেছে : ভারতে সংস্কার-আন্দোলন বেশান্ত ও বিবেকানন্দের জন্যই স্তিমিত। অবশ্য উক্ত 'জনৈক হিন্দু' যখন বলেছিলেন, হিন্দুশাস্ত্র স্বার্থপরতা শিক্ষা দেয়, সেকথাকে আর্যসমাজী পত্রিকা গ্রহণ করতে পারেনি। যাইহোক আর্যসমাজের পত্রিকা এই 'নিরাপদ ভবিষ্যৎবাণী' করেছিল—বেশান্ত ও বিবেকানন্দের মিশন অচিরে ব্যর্থ হবে, যেহেতু এঁরা বাগ্মিতা এবং জনতোষণী কুসংস্কারের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। [বিবেকানন্দ কোথায় কুসংস্কারের তোষণ করেছেন, সেকথা অবশ্য জানানোর প্রয়োজন পত্রিকাটি বোধ করেনি]। ঐ দু'জনের আরও দোষ : "এঁরা যা শিক্ষা দেন তা প্রাচীন ধর্ম নয়। প্রাচীন ধর্ম অর্থহীন অধ্যাত্মবাদের অপেক্ষা অনেক বিশাল, মহান ও মূল্যবান; নৈষ্কর্ম্য নয়, কর্মের সমর্থক তা; স্বার্থপরতা নয়, নিঃস্বার্থতার পোষক।" অতঃপর স্বামী দয়ানন্দ কিভাবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নির্ভেজাল সত্য ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তা বিবৃত করার পরে, ঐ সত্য যে, দিন দিন শক্তিবৃদ্ধি করে যাবে, এই আশা প্রকাশ করেছিল পত্রিকাটি। সে অধিকন্তু জানায়, সংস্কারকদের সহযোগিতা ছাড়াই দয়ানন্দের অনুগামীরা পঞ্জাবে প্রথমশ্রেণীর কলেজ ও স্কুল, (মেয়ে-স্কুল তার মধ্যে আছে) স্থাপন করতে পেরেছেন। "প্রায় একডজন অনাথ আশ্রমও স্থাপন ক'রে প্রায় ১৪০০ অনাথকে আমরা বাঁচাতে পেরেছি, যখন সংস্কারকগণ ও নেতৃগণ বাইরে আরামে বক্তৃতাবাজি করে গেছেন। কে এই কাজে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন?—স্বামী দয়ানন্দ নামক রিলিজিয়াস রিভাইভ্যালিস্ট ছাড়া আর কেউ নন। তিনি গুণসম্পন্ন রিভাইভ্যাল ঘটিয়েছেন—খাঁটি প্রাচীন ধর্ম যা—ভারতের অন্ধকার যুগের অপদার্থ অভ্যাসের পুনরাবর্তন নয়।"

আর্যসমাজের এক মুখপত্র খ্রীস্টানদের বৈদিক ধর্ম গ্রহণে আহ্বান করেছিল, সেই আস্পর্ধায় মিশনারি-মুখপত্র 'ইন্ডিয়ান উইটনেস' ও 'বম্বে গার্ডিয়ান' বিশেষ চটে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের খুশির সীমা ছিল না যখন আর্যসমাজী পত্রিকাটি বিবেকানন্দকে "পল্লবগ্রাহী,

"পুরাণ—যাকে দয়ানন্দ সরস্বতী জালিয়াতি বলতেন—হিন্দুসমাজের সর্বনাশ ঘটিয়েছে। দয়ানন্দের গুরু স্বর্গতঃ স্বামী বিরজানন্দ পুরাণ সম্বন্ধে এতই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে, তাঁর শিষ্যদের কদাপি পুরাণ পড়তে দিতেন না, এবং কথিত আছে, তিনি তাঁর শিষ্যদের দিয়ে প্রতিদিন প্রভাতে 'শ্রীমদ্ভাগবত' লেখা কাগজের উপর পদাঘাত করাতেন, কারণ তাঁর মতে, অন্য সকল কিছু অপেক্ষা পুরাণই বঙ্গজাতির মূল। ব্যাসদেবের নাম নিয়ে বোপদেব যেভাবে কৃষ্ণচরিত্র চিত্রণ করেছেন, তা কৃষ্ণের দিব্য গীতা-শিক্ষাকে মিথ্যা করে দিয়েছে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা সর্বোত্তম দেহধারী প্রতিভাধরেরও অসাধ্য। তাই ওসব বস্তু দয়ানন্দ বাতিল করে দিয়েছিলেন।"

১৪ বোম্বাইয়ের সুপরিচিত সাপ্তাহিক পত্রিকা গুজরাটি ২ মে, ১৮৯৭, লিখেছিল :

"Dayanand Saraswati, to judge from results was a far greater power than all these [Ram Mohan Roy, Keshub Chandra Sen, Pratap Chandra Mazumdar] rolled into one. But Swami Vivekananda's achievements outshine everybody else's."

সোস্যালিস্ট এবং বৈদিক ধর্মের ক্ষেত্রে শিক্ষার্নাবিশ" বলে গাল দিয়েছিল। বিবেকানন্দের অপরাধ—"গীতা ছাড়া তাঁকে চালাবার আর কেউ নেই।" আর্যসমাজীদের কাছে তাঁদের পত্রিকা কম্বুকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিল : (ভিতরে আশঙ্কার কাঁপন অবশ্য ছিল বিবেকানন্দ-প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে) : "আর্যগণ! কোমর বেঁধে নেমে পড়ো। বিদগ্ধ খ্রীস্টানদের অপেক্ষা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের সহজে ধর্মান্তরিত করা যাবে—এই ভ্রান্ত ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। ঐ ভয়ানক আলেয়ার মারাত্মক ছলনা ইতিমধ্যে তোমাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছে. প্রচুর কর্মশক্তি ক্ষয় করেছে। এতাবৎ অধঃপতিত হিন্দুদের উদ্ধারের জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা পরিমাণে প্রচুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠেনি। হিন্দুরা প্রায় সংস্কারের অতীত। শিখধর্ম, জৈনধর্ম এবং আরও অজস্র অনুরূপ ধর্ম হিন্দুধর্মের অতল সাগরে তলিয়ে গেছে—আর্যসমাজও সেই বিপদের সম্মুখীন।"

আর্যসমাজীদের যে-দুটি লেখা উপস্থিত করলাম—সে দুটিই ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর পঞ্জাব ভ্রমণের পরবর্তীকালের। ১৮৯৭-এর আগে স্বামীজী সম্পর্কে আর্যসমাজীদের মনোভাবের বিষয়ে বিশেষ সংবাদ পাইনি. সম্ভবতঃ তাঁরা 'অপেক্ষা করো ও দেখো' নীতি নিয়েছিলেন। তারপর তাঁরা যখন সত্যই দেখলেন, তখন তাঁরা খুশি হতে পারলেন না মোটেই। বিবেকানন্দের ক্ষমতার অভাব নয়. ক্ষমতার প্রভাবই তাঁদের কাছে বিপজ্জনক মনে হল—যিনি আর্যসমাজের মতের অংশীদার হলেন না—এবং সেজন্য. কে জানে. ভবিষ্যতে সমাজের মধ্যে ফাটল ধরাবেন কিনা! আর্যসমাজীরা তেমনই মনে করেছিলেন।

স্বামীজীর পঞ্জাব সফরের আগেই. ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭. ইণ্ডিয়ান মিররে এক পত্রলেখক বলেছিলেন : আর্যসমাজ প্রতিমাপূজায় অবিশ্বাস সত্ত্বেও স্বামীজীকে সমর্থন ও সহানুভূতি জানাতে পারে. হিন্দুসমাজের মধ্যে একমাত্র ঐ সম্প্রদায়ের সহানুভূতিই তিনি পেতে পারেন—কিন্তু স্বামীজী যদি তা লাভ করেন, তাহলে সেখানকার সনাতনী "ধর্ম সভা"-র বিরাগভাজন তিনি হবেন। স্বামীজী পঞ্জাবের কোন্ সম্প্রদায়ের দিকে ঝুঁকবেন এ-প্রশ্ন তাঁর সফরের আগে সেখানে বড় হয়ে উঠেছিল। তারপর স্বামীজী পঞ্জাবে গেলেন এবং বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বের শক্তিতে সেখানে ঝড় বইয়ে দিলেন, যার বিবরণ আমি আগে যথাসম্ভব দিয়েছি। [৩য়—২০-৩০]। স্বামীজী কিন্তু বিশেষভাবে নিজেকে কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়ালেন না; তিনি বললেন, বহু মতের এই প্রদেশে তিনি সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করতে আসেন নি. হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কারই তাঁর লক্ষ্য। সম্প্রদায়ের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করলেন, কিন্তু সতর্ক করলেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। [৫-২৭৩]। বহু আর্যসমাজী তাঁর কাছে এলেন. তাঁকে সাদর অভ্যর্থনাও জানালেন, কেউ-কেউ মুগ্ধ হলেন. কিন্তু বিরূপও হলেন অনেকেই কারণ স্বামীজীর উক্তি বা আদর্শ আর্যসমাজের আদর্শের সমর্থক ছিল না। ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় ১ ডিসেম্বর. ১৮৯৭ রিপোর্টে পাই, স্বামীজী. 'আর্যসমাজের নেতৃগণ যে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতাবোধ করেছেন। কৃতজ্ঞতার আরও কারণ—ওঁরা স্বামীজীর সবিশেষ বাস্তববাদী কর্মনীতির বিষয়ে সাহায্যের মনোভাব জানিয়েছেন।" কিন্তু একটু মনোযোগী হলে দেখব—বোঝাপড়া যতখানি ছিল. ভাবসংঘাত ছিল ততোধিক। ঐ ভাবসংঘাতের বেশ কিছু সংবাদ আমরা পেয়ে যাই "ভারতে বিবেকানন্দ" বই থেকে। ওর মধ্যে "স্বামী অচ্যুতানন্দ নামক আর্যসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক এবং [এখন] স্বামীজীর একটি বিশেষ ভক্তের," (যিনি স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন) ডায়েরি থেকে যেসব অংশ উদ্ধৃত আছে, তাতে প্রাসঙ্গিক অনেক সংবাদ পেয়েছি। সেগুলি এই :

"(১৫ অগস্ট, ১৮৯৭)...অপরাহ্নে আর্যসমাজীদের সহিত ধর্মালোচনা।...(১৬ অগস্ট) রাত্রে মুসলমান, ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী এবং হিন্দু—এইসকল বিভিন্ন মতাবলম্বী অনেক

ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের সহিত নানাবিধ তত্ত্বের আলোচনা হইল। (১৭ অগস্ট) প্রাতঃকালে সমাগত আর্যসমাজীদিগের সহিত বিশেষ শাস্ত্রালোচনা। আর্য-সমাজীগণ নানাবিধ কূট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু যথাযথ উত্তরদানে স্বামীজী সকল-কেই নিরুস্ত করিলেন।...(১৯ অগস্ট) সন্ধ্যার পর আর্যসমাজী দ্বারকানাথ উকীল প্রমুখ অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত দেশভক্তি, সমাজনীতি ও তত্ত্ববিদ্যার সবিশেষ আলোচনা। দ্বারকানাথবাবু স্বামীজীর কথাবার্তায় বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। (২০ অগস্ট) রায় মূলরাজ প্রমুখ আর্যসমাজীদের প্রধান-প্রধান ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলোচনা।...(১৮ সেপ্টেম্বর) রাত্রে আর্যসমাজ ও মুসলমানদিগের সম্বন্ধে অনেক শঙ্কা সমাধান।...(২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার পর...ফিরিয়া আসিয়া একজন বাঙালী মাস্টার ও অচ্যুতকে আর্যসমাজের দোষের বিষয় বর্ণনা ও অন্যান্য উপদেশ।"

লাহোরে স্বামীজীর অবস্থানকালে আলোচ্য ব্যাপারে "ভারতে বিবেকানন্দ" গ্রন্থের বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত :

"আর্যসমাজও স্বামীজীকে অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না। দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজের অধ্যক্ষ লালা হংসরাজ প্রভৃতি বড়-বড় আর্যসমাজীগণ সর্বদা তাঁহার সহিত নানা-রূপ চর্চা করিতেন। আর্যসমাজীরা বেদকে—বিশেষতঃ বেদের সংহিতাভাগকে—একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, আর ইহাও বলেন, বেদের ব্যাখ্যা একপ্রকারই হইতে পারে। কিন্তু স্বামীজীর মত—বেদের উপনিষদ্‌ভাগই বিশেষ প্রামাণ্য, এবং ঐ উপনিষদের ব্যাখ্যা —অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাদিগণ আপনাপন ইচ্ছা-অনুযায়ী করিতে পারেন। ইহাতে কোনো হানি নাই, বরং ইহাতে উন্নতিই হইয়া থাকে—কারণ মানুষকে জোর করিয়া কোনো-একটা ভাব না দিয়া, তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিলে যদিও তাহার উন্নতি খুব ধীরে ধীরে হয়, তথাপি সেই উন্নতি খুব পাকা হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, দুইটি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত কিরূপে এক সময়ে সত্য হইতে পারে, তাহার উত্তর এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির তারতম্যানুসারে ইহা সম্ভব।

"আর্যসমাজীদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর-ধারণার তুল্য। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময়। তাঁহারা অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্মও বুঝিতে পারেন না, এবং মূর্তিপূজকের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কারণে তাঁহারা অদ্বৈতবাদ ও মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। স্বামীজী অকাট্য যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া আর্যসমাজীদিগকে বিচার ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত আর কোনো মত টিকিতে পারে না—ইহা বেশ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তারপর দেখাইলেন—নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের ধারণা—আমাদের মন এবং তজ্জাত কল্পনাশক্তির সহায়তা ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং যদি আমাদের অক্ষমতাবশতঃ আমরা কল্পনা-শক্তিরই সহায়তা গ্রহণ করিলাম, তখন যাহারা আরও নিম্ন অধিকারী, তাহারা যদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রতিমাদি দেখিয়া ঈশ্বরোপলব্ধি সহজে করিতে পারে, তবে তোমার তাহাকে বাধা দিবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী হও, তোমার নিজ অভিপ্রায়মতো সাধনা করো—কিন্তু অপর দুর্বল ভ্রাতাকে বাধা দাও কেন? আর তুমি আপনাকে যতদূর জ্ঞানী মনে করিতেছ, বাস্তবিক তুমি ততদূর জ্ঞানী নহ—তোমা অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের ভাবুক আছে। এইরূপ নানাবিধ উপদেশ দ্বারা স্বামীজী আর্যসমাজের গোঁড়ামি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।...

"একদিন নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের [ট্রিবিউনের সম্পাদক] বাটীতে [লালা] হংসরাজের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিম্নলিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হংসরাজ আর্যসমাজের মত—

বেদের একপ্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে পারে—সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামীজী নানাবিধ যুক্তিজাল প্রয়োগ করিয়া অধিকারবিশেষে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে উন্নতিপথে অগ্রসর হওয়াই যে, শ্রেয়ঃ ইহা বুঝাইতেছিলেন—হংসরাজও বিপরীত যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করিয়া উহা খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশেষে স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন—লালাজী, আপনারা যে বিষয় লইয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাকে আমি ফ্যানাটিনিজম বা গোঁড়ামি আখ্যা দিয়া থাকি। সম্প্রদায়ের সত্বর বিস্তৃতিসাধনে যে ইহা বিশেষ সহায়ত করে তাহাও আমি জানি।"

স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে স্বামীজী কিভাবে পঞ্জাবে অবস্থানকালে সাম্প্রদায়িব গোঁড়ামি দূর করাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার কিছু কিছু উল্লেখ আছে। তিনি আম্বালায় "হিন্দু-মহমেডান স্কুল" সাগ্রহে পরিদর্শন করেন, কারণ এই বিদ্যালয়টি "দুই মহান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক স্বরূপ।" বেরিলীতে তিনি আর্যসমাজের অনাথ আশ্রমে গিয়েছিলেন। "পঞ্জাবে স্বামীজীর প্রধান কর্মোদ্দেশ্য ছিল—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষে জড়িত বিভিন্ন মতবাদী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্যবিধান। আর্যসমাজীরা হিন্দুধর্মের নবতর ব্যাখ্যা করছিলেন, আর সনাতনীরা গোঁড়া হিন্দুদের রীতিনীতি আঁকড়ে ছিলেন কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ তিনি তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধি ঘটাতে পেরেছিলেন কেননা দেখা যায় —আর্যসমাজ সনাতনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল এবং বিপুলসংখ্যায় তাঁর সভায় হাজির হয়েছিল। বস্তুতঃ স্বামীজী আর্যসমাজীদের সম্বন্ধে এমন উদার মনোভাব দেখিয়েছিলেন, এবং তাঁর সম্বন্ধে আর্যসমাজীরা এমনই শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন যে, বেশ কয়েকদিন ধরে অবিরাম গুজব শোনা গিয়েছিল—কয়েকজন প্রধান আর্যসমাজীর ইচ্ছা হয়েছে, তাঁরা স্বামীজীকে তাঁদের সংঘের অধ্যক্ষ হতে অনুরোধ করবেন। আর্যসমাজী ও মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতার ভাব দূর করার একটি পথও স্বামীজী নির্দেশ করেছিলেন।"

কিন্তু গোটা ব্যাপারটি সাময়িকই ছিল। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও চারিত্রশক্তি সাক্ষাতে অনেককিছুই ঘটাতে সমর্থ ছিল কিন্তু তিনি-বন্যা সরে যাবার পরে মাথা তুলত অভ্যস্ত জীবনের ক্লেদ-কর্দম। এ-ধরনের ঘটনা স্বামীজীর জীবনীতে আমরা বারবার পাই। স্বামীজী উদারতাবশে শান্তি ও সৌভ্রাত্রের বাণী উচ্চারণ করতে পারেন—কিন্তু সত্যকে শোনানোর দায়ও তাঁর। তাঁর জীবনীতে আছে—লাহোরে সনাতনীরা আর্যসমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচার করবার জন্য তাঁর উপরে বিশেষ চাপ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে সায় দেননি; তবে 'শ্রাদ্ধ' সম্পর্কে বক্তৃতা করতে রাজি হয়েছিলেন। স্বামীজী নিজে শ্রাদ্ধ-নুষ্ঠানকে মূলগত ধর্ম-ব্যাপার মনে করতেন না [১ম, ১০৪], তবে ঐ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ থাকে বলে তা বিশ্বাসীদের পক্ষে পালনীয় —তাঁর ধারণা এইরকমই ছিল। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে প্রকাশ্য বক্তৃতা কিন্তু হয়নি, ঘরোয়া সভাতেই আলোচনা হয়েছিল। আর্যসমাজীরা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ঔচিত্য অস্বীকার ক'রে তর্ক তুলেছিলেন, স্বামীজী ধীরস্থিরভাবে, কোনো আক্রমণ না করে, শ্রাদ্ধের কারণ ও প্রয়োজন বুঝিয়ে বলেন। ['ভারতে বিবেকানন্দ' নবম সং, ৪৮৩]

'হিন্দু' পত্রিকায় ২২ অক্টোবর, ১৮৯৮, "পঞ্জাব সংবাদদাতা" প্রেরিত বিবরণে কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে। ১৮৯৭ সালে স্বামীজীর লাহোর সফরকালে "দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী বক্তৃতা," "শ্রোতাদের উপর তার দারুণ প্রভাব এবং তাঁর সম্বন্ধে সর্বজনীন প্রশংসার" কথা বলার পরে ঐ বিবরণে যোগ করা হয়—"এতৎসত্ত্বেও তাঁর মত অনেকের দ্বারা বহুভাবে পরে সমালোচিত হয়েছে।" এই "অনেক" অবশ্যই প্রধানতঃ আর্যসমাজীরা। এই বিবরণেই স্বামীজীর 'শ্রাদ্ধ' বক্তৃতা ভণ্ডুল হওয়ার কথা আছে। ভণ্ডুল হওয়ার আসল কারণ এই

পত্রলেখক জানতেন বলে মনে হয় না। "ভারতে বিবেকানন্দ" বইয়ে তা মেলে। স্বামীজী চেয়েছিলেন—শুষ্কচিত্ত পঞ্জাবীদের সামনে ভক্তিভাবের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য পথে সংকীর্তন করবেন। সংকীর্তনের পরে শ্রাদ্ধ বিষয়ে বক্তৃতা হবে। সংকীর্তনের জন্য খোল দরকার, গোটা লাহোরে কিন্তু একটি মাত্রই খোল ছিল—সেটি প্রথম চাঁটিতেই ফেঁসে গেল। ফলে সংকীর্তনও ফেঁসেছিল। সনাতনীরা সেই লজ্জায় শ্রাদ্ধ-সভা ডেকেও সভাস্থলে হাজির হল না। কিন্তু—সেটাই কি উদ্যোক্তাদের সভায় উপস্থিত না হবার মূল কারণ, নাকি, তাঁরাও, আর্যসমাজের বিরোধী হয়েও, সংকীর্তনে ভাসতে রাজি ছিলেন না, এবং শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে তার আগে স্বামীজীর যে-মতামত শুনেছিলেন, তা নিজেদের পক্ষে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি? 'হিন্দু'র সংবাদদাতার বিবরণে পাই : "এই প্রদেশে আর্যসমাজ আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী,১৫ এবং এই সমাজের মতবাদের বিরুদ্ধে বললে সমালোচনা ও নিন্দার হাত থেকে কারো রেহাই নেই। স্বামীজীকে সতর্ক করে সম্ভাব্য ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছিল। তাই তিনি শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে গররাজি হন। কিন্তু স্মার্তরা চেয়েছিলেন, তিনি ঐ বক্তৃতা করুন, যাতে তাঁর গুরুভার মতের সমর্থনের দ্বারা তাঁরা নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে নিতে পারেন।"

সনাতনীদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে পত্রলেখক ঠিক কথা বলেছিলেন, কিন্তু আর্যসমাজের বিরাগের ভয়ে স্বামীজী শ্রাদ্ধ সম্পর্কে বক্তৃতা করতে পিছিয়ে যান, একথা একেবারেই সত্য নয়। তীর্থরাম গোস্বামীর [পরে স্বামী রামতীর্থ] যে তাৎক্ষণিক চিঠি আমি আগে উদ্ধৃত করেছি, [৩-২৭] তাতে দেখা যায়—আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি কিভাবে তাঁদের যুক্তিতে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন, কিভাবে তাঁদের দিয়েই তাঁদের যুক্তির অসারত্ব মানিয়ে নিয়েছিলেন। আর্যসমাজের বিশেষ ক্ষতির কথা তীর্থরাম ঐ পত্রে বলেছেন, কারণ স্বামীজী প্রকাশ্যে পুরাণ, শ্রাদ্ধবিধি ও মূর্তিপূজার সমর্থন করেছিলেন।

তীর্থরামের বক্তব্য খুবই যথাযথ। স্বামীজীর পঞ্জাবে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর বিষয়-বিশ্লেষণ করলে যে-কেউ তা দেখতে পাবেন। তাঁর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম বলে কথিত, লাহোরে প্রদত্ত "বেদান্ত" বক্তৃতা তো আর্যসমাজের বক্তব্যের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবাদ। এর মধ্যে স্বামীজী গোড়াতেই কর্মকাণ্ডের তুলনায় জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন। কর্মকাণ্ড বহির্জগৎ নিয়ে প্রধানতঃ জড়িত, কিন্তু অন্তর্জগতের রহস্যের মধ্যে আলোকপাত করেছে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড। বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ সমার্থক, এই ধরে নিয়ে বেদান্তের যে-সমালোচনা করা হয়, তার নিরসন করে স্বামীজী বলেছেন—বেদান্তের মধ্যে দ্বৈত অদ্বৈত সকল মতেরই আশ্রয় আছে। তবে স্বামীজী অদ্বৈতবাদেরই মহিমার কথা অধিক বলেছিলেন, এবং দ্বৈতবাদী আর্যসমাজীরা তাঁর মুখে শুনেছিলেন—"আধুনিক বিজ্ঞানের লৌহ-মুদ্গরাঘাতে সকল স্থানের দ্বৈতবাদাত্মক ধর্মসকলের কাচনির্মিত ভিত্তিসমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। শুধু এখানেই যে দ্বৈতবাদীরা শাস্ত্রীয় শ্লোকের টানিয়া-টানিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে (এতদূর টানা হইতেছে যে, আর চলে না, শ্লোকগুলি তো আর

১৫ বম্বে ক্যাথলিক এগজামিনার ১২ জুলাই, ১৯০২, ভারতের হিন্দু সংস্কারবাদী সমাজগুলি সম্বন্ধে মন্তব্যকালে জানায়, ১৯০১ সেনসাস অনুযায়ী ব্রাহ্মদের সংখ্যা যেখানে ৪০৪০, সেখানে আর্যসমাজীদের সংখ্যা ৬৭,১০৫। বেঙ্গলী পত্রিকার সংবাদ সে এই সূত্রে উদ্ধৃত করে। সেখানে পাই, ১৮৯১ সালের সেনসাসে আর্যসমাজীদের সংখ্যা যেখানে ছিল ৪০,০০০, দশ বছরে তা বেড়ে পূর্বোক্ত সংখ্যা দাঁড়িয়েছে। "কিন্তু আর্যসমাজের সংখ্যার তুলনায় [বেঙ্গলী লিখেছিল] বাস্তব প্রভাব অনেক বেশি। পঞ্জাবে গেলেই বোঝা যায়, এই সমাজের ভাবাদর্শ প্রদেশের শিক্ষিত মানুষদের মনের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করেছে।"

রবার নহে)—ইউরোপ আমেরিকায় এই চেষ্টা আরও বেশি।" অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের যেসব অভিযোগ করা হয়, আর্যসমাজীরাও যা করতে অভ্যস্ত ছিলেন (যথা, অদ্বৈত-বাদ বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না; তা জীবনবিমুখ, তা নৈতিকতার ভিত্তি হতে পারে না)—তাদের উপযুক্ত খণ্ডন স্বামীজী করেন।

স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল—সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে দীর্ণ পঞ্জাবে শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন—একথা আগেই বলেছি। এ-বস্তু কেবল 'সংঘর্ষ ভালো নয়,' 'তোমরা ঝগড়া করো না', 'সবাইকে ভালবাসো'—এইসব সাধুবাক্য চেঁচামেচি করে বললেই ঘটে যাবে না। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি চাই—চিন্তাস্তরে পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। তা যদি ঘটানো যায় তবেই কর্মস্তরে পরিবর্তন আসবে। স্বামীজী ঐ কাজে শেষপর্যন্ত সফল হোন বা না হোন—তিনি চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টার দুটি দিক আছে : এক, হিন্দুদের সঙ্গে অন্য ধর্মা-বলম্বীদের সংঘর্ষ নিবারণ; দুই, হিন্দুদের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিবারণ। প্রথম ক্ষেত্রে আসে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘাত, যা আর্যসমাজের প্রচার ও প্রচেষ্টার জন্য, বিশেষতঃ তাঁদের শুদ্ধি কার্যের জন্য, ঘোররূপ ধারণ করেছিল। এক্ষেত্রে স্বামীজী নাকি একটি মীমাংসাসূত্র বার করেছিলেন (আগেই তার উল্লেখ করেছি) কিন্তু সেটি কী, তা জীবনীগ্রন্থে লেখা নেই। হিন্দুদের সঙ্গে শিখদের বিরোধও উঁকিঝুঁকি মারছিল। এক্ষে স্বামীজী অবশ্য দুই ধর্মের সংঘাত মনে করতে চাননি—তাঁর মতে ওটা হিন্দুধর্মের দুই শাখার সংঘাত। এই বিষয়টি পরে বিশদভাবে আলোচিত হবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নিবারণের জন্য তিনি সনাতনী দল ও আর্যসমাজের মধ্যে বিবাদ দূর করতে চেয়েছেন। আগেই বলেছি, তিনি নিজেকে কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়াতে চাননি। বলেছিলেন, আমি সকল সম্প্রদায়েরই [তাঁর এই মত তাঁর নিজের অপূর্ব সম্প্রদায়টির সৃষ্টিহেতু হয়েছিল, যাকে তিনি নিজেই বলেছেন 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়', যা সাম্প্রদায়িকতা নাশের জন্য উদ্ভূত], এবং তিনি এমন কতক-গুলি চিন্তা ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, যা সম্প্রদায়ের মূল্য স্বীকার করেও সাম্প্রদায়িকতার কলুষকে বর্জন করবে। সাম্প্রদায়িকতার মূল লক্ষ্যই হল—একমাত্র আমার সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধি। আর্যসমাজ নিজেদের বিশ্বাস সম্বন্ধে ঘোর বিশ্বাসী হয়ে অপরের বিষয়ে ঘোরতর বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বামীজী শিয়ালকোটে 'ভক্তি' বিষয়ে বক্তৃতাকালে পৃথিবীতে নানাত্বের প্রয়োজনের পক্ষে প্রবল যুক্তি উত্থাপন করে বলেছিলেন : "জগৎ কখনও এক ধর্মাবলম্বী হইতে পারে না।...ঈশ্বর করুন—জগৎ যেন কখনো এক ধর্মাবলম্বী না হয়। তাহা হইলে জগতে সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।" নানা ধর্মের পক্ষে তাঁর নানা যুক্তির একটি হল : "বিভিন্ন শক্তি মানবমনে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিলে মনুষ্য চিন্তায় সমর্থ হয়। এই বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না থাকিলে মানুষ চিন্তা করিতেই সমর্থ হইত না। এমন-কি মনুষ্যপদবাচ্যই হইত না। মন্ ধাতু হইতে মনুষ্য শব্দ ব্যুৎপন্ন—মনুষ্য শব্দের অর্থ মননশীল। মনের পরিচালনা না থাকিলে চিন্তাশক্তিরও লোপ হয়—তখন সেই ব্যক্তিতে আর একটা সাধারণ পশুতে কোনো প্রভেদ থাকে না।...অতএব মনুষ্যত্ব যাহাতে থাকে তজ্জন্য একত্বের মধ্যে বহুত্বের প্রয়োজন।" লাহোরে প্রদত্ত "হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ" বক্তৃতায় একই প্রসঙ্গে বলেন : "সম্প্রদায় থাক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক। সাম্প্রদায়িকতায় জগতের কিছু উন্নতি হইবে না, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না। একদল লোক সবকিছু কার্য করিতে পারে না। এই অনন্তপ্রায় শক্তিরাশি অল্প কয়েকটি লোকের দ্বারা কখনই পরিচালিত হইতে পারে না। এই বিষয়ে বুঝিলেই আমরা বুঝিব, কী প্রয়োজনে আমাদের ভিতর সম্প্রদায়ভেদরূপ এই শ্রমবিভাগ অবশ্যম্ভাবী-রূপে আসিয়াছে।"

দয়ানন্দের অনুসরণে আর্যসমাজীরা ভারতবর্ষের বেদোত্তর বহু সহস্র বৎসরের গৌরবময় অধ্যায়গুলিকে একেবারে ঘষে রগড়ে তুলে ফেলার যে-দুশ্চেষ্টা বা অপচেষ্টা করছিলেন—তার বিরুদ্ধে, আর্যসমাজের গৃহীত পরিধির বহির্বর্তী, হিন্দুসমাজের ভাব ও চিন্তার বিভিন্ন দিককে স্বামীজী খুলে ধরার চেষ্টা করেন। এইসূত্রে তিনি বিশেষভাবে ভক্তিবাদের কথা আনেন, যার তরঙ্গ উত্তরভারত, পূর্বভারত এবং দক্ষিণভারতকে প্লাবিত করে বর্তমান ছিল। স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল—সর্বভারতীয় প্রাণতন্ত্রীগুলি নিয়ে একটি সুমহান সুবৃহৎ জীবনবীণা নির্মাণ করা। তাই শুষ্ক পঞ্জাবীদের ভাবধর্ম দিতে স্বামীজী কতখানি উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তা বোঝা যায় পঞ্জাবে 'ভক্তি' সম্বন্ধে তাঁর একাধিক বক্তৃতা থেকে।' শিয়ালকোটের 'ভক্তি' বক্তৃতায় বলেন, সকল ধর্মই ভক্তিকে কোনো না কোনো আকারে স্বীকার করে থাকে, যথা, ইহুদীদের মধ্যে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ থাকলেও তারা 'মুশার দশ ঈশ্বরাদেশ' সমন্বিত সিন্ধুককে প্রতিমার মতো করেই পূজা করে; রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক খ্রীস্টানরা বহুভাবে প্রতিমা-উপাসক; প্রোটেস্টান্টরা প্রতিমাপূজা না করেও ঈশ্বরকে ব্যক্তিবিশেষরূপে পূজা না করে পারে না; পারসিক ও ইরানীরা করে অগ্নিপূজা এবং মুসলমানেরা করে সাধুপূজা, সেইসঙ্গে প্রার্থনার সময়ে অতি অবশ্যই কাবা'র দিকে তাঁরা মুখ ফেরান। লাহোরে ভক্তি বক্তৃতায় স্বামীজী সজোরে আর্যসমাজীদের দ্বারা বহুনিন্দিত পুরাণের গুণগৌরব দেখিয়ে দেন। পুরাণে অনেক অবান্তর গাল-গল্প আছে, অবৈজ্ঞানিকতা আছে কিন্তু তাদের বাদ দিয়েও এমন বহু জিনিস সেখানে আছে যা ভারতীয় জাতির চিত্তগঠন করেছে। "আপনারা পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও নাই যাঁহাদের জীবনে প্রহ্লাদ, ধ্রুব বা ঐসকল পৌরাণিক মহাত্মাগণের প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না"—স্বামীজী বলেছিলেন। "পুরাণে ভক্তির চরম আদর্শ দেখা গেছে;" "পুরাণ সর্বসাধারণের উপযোগী;" অবনত বৌদ্ধধর্মের প্রকোপের কালে ভারতীয় জনজীবনের সামনে পুরাণ "প্রশস্ততর ও উন্নততর ধর্মশিক্ষা" দিয়েছিল। পুরাণ-বিরোধী আর্যসমাজীদের সম্বন্ধে এই বিদ্রূপ তিনি না করে পারেন নি : "যতদিন সাহায্যের নিমিত্ত কোনো ব্যক্তির উপরে নির্ভর করার মতো মানবিক দুর্বলতা থাকিবে, ততদিন এইসকল পুরাণ কোনো না কোনো আকারে থাকিবেই থাকিবে।...আপনারা এতাবৎ-বর্তমান পুরাণ-গুলির নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু আপনাদিগকেও বাধ্য হইয়া নূতন পুরাণ প্রণয়ন করিতে হইবে। ধরুন, আপনাদের মধ্যে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল—তিনি এইসকল প্রাচীন পুরাণ অস্বীকার করিলেন—তাঁহার দেহত্যাগের পরে বিশ বর্ষ যাইতে না যাইতে আমরা দেখিব যে, তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার জীবন অবলম্বন করিয়াই আর একখানি পুরাণ রচনা করিয়া ফেলিবে। পুরাণ ছাড়িবার জো নাই—প্রাচীন পুরাণ বা আধুনিক পুরাণ—এইটুকু পার্থক্য।"

এই একই বক্তৃতায় স্বামীজী সাধারণের পক্ষে প্রতিমা পূজার সার্থকতার প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে উত্থাপন করেছিলেন। লাহোরে "বেদান্ত" বক্তৃতাতেও মূর্তিপূজকদের প্রতি অহেতুক ঘৃণাত্যাগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আর তিনি 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ' বক্তৃতায় আর্যসমাজীদের দ্বারা উপেক্ষিত "প্রত্যক্ষানুভূতি" প্রসঙ্গটির বিশেষ উত্থাপন করে বলেন—এই হল ধর্মের চরম লক্ষ্য, এক্ষেত্রে আপস করলে ধর্মই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এইসূত্রে অত্যন্ত মূল্যবান একটি কথা বলেছিলেন—ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতিই সাম্প্রদায়িকতা দূর করার প্রকৃত উপায় :

"আমরা অনেক সময় অনর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্মিক সত্য বলিয়া ভ্রম করি; পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীর ধর্মানুভূতি মনে করি। তাই সাম্প্রদায়িকতা, তাই বিরোধ। যদি আমরা একবার বুঝিতে পারি, প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম, তাহা হইলে নিজ হৃদয়ের

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব—আমরা ধর্মের সত্যসমূহ উপলব্ধির পথে কতদূর অগ্রসর; তাহা হইলেই বুঝিব, আমরা নিজেরা অন্ধকারে ঘুরিতেছি এবং অপরকেও ঘুরাইতেছি—আর তাহা বুঝিলেই আমাদের সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব দূর হইবে। কোনো ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে চাহিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করো—'তুমি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছ? তুমি কি আত্মদর্শন করিয়াছ? যদি না করিয়া থাকো,...তবে তুমি নিজেই অন্ধকারে ঘুরিতেছ—আর আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ। অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় আমরা যে, খানায় পড়িয়া যাইব।...সকলকেই আপন-আপন সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষানুভূতির দিকে অগ্রসর হইতে দাও।...যখন তাহারা সেই ভূমা, অনাবৃত সত্য, দর্শন করিবে, তখনই তাহারা অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাইবে। ...তখন তাহার হৃদয় হইতে কেবল প্রেমের বাণী বাহির হইবে, কারণ যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ, তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তখনই—কেবল তখনই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদ অন্তর্হিত হইবে।"

॥ ৬ ॥ "শিখরা কি হিন্দু?"—এই প্রশ্নে বিবেকানন্দ

এই ১৮৯৭ সালেই স্বামীজী পঞ্জাবে আর এক সদ্যোজাত সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের রূপ দেখে সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এই সময়েই অকস্মাৎ একটি বক্র জিজ্ঞাসা উদ্গত হয়—শিখরা কি হিন্দু? শিখদের ধর্মস্বাতন্ত্র্য, এবং তার থেকে রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্যের দাবি—যা পরবর্তীকালে প্রবলতর হয়ে উঠে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে নূতনতর জটিলতার সৃষ্টি করেছিল, যার যন্ত্রণাদায়ক কামড় এখনো অনুভূত হয়—সেই দাবির পিছনে প্রাথমিক পর্যায়ে অন্ততঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী উস্কানিই সক্রিয় ছিল, আমরা সমকালীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালে তা দেখতে পাই। যে-সমস্যা ছিল না, তাকে কিভাবে সাম্রাজ্যবাদীরা ভেদনীতি অনুসরণে জাগাতে পেরেছিল—এখানে তার আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিস্ময়ের কথা, এই সমস্যাটির সূত্রপাতও ঊনিশ শতকের শেষভাগে, যে-কালে ভারতে জাতীয় চেতনার সূত্রপাত।

এই সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে—"নিও খালসা পার্টি" নাম নিয়ে কয়েকজন শিখ যুবক প্রচার শুরু করেন—শিখরা হিন্দু নয়। এই মতের পক্ষে-বিপক্ষে পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু হয়। এইকালের ট্রিবিউন পত্রিকায় সে-ধরনের বাদ-প্রতিবাদমূলক কিছু লেখা আমরা দেখেছি। সর্দার দলীপ সিং নামক এক ব্যক্তি ৬ মার্চ, ১৯০০, ট্রিবিউনে, নানা যুক্তিতে শিখরা হিন্দু নয়—এই কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্ভট যুক্তিসমূহের মধ্যে ছিল—যেহেতু গুরু নানক হিন্দু-মুসলমান ভাব সম্মিলিত করতে চেয়েছিলেন, যেহেতু নানকের সঙ্গে একজন মুসলমান গায়ক মন্দিরে মসজিদে ঘুরতেন, যেহেতু শিখদের মাথায় বড় চুল, যেহেতু বড় চুলের সঙ্গে বীরত্বের সম্পর্ক আছে, যেহেতু ভাইসরয় শিখদের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন, যেহেতু হিন্দুরা বীর নয়—সেহেতু শিখরা ভিন্ন জাতি। যুক্তিগুলি এমন অদ্ভুত এবং নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধির সৃষ্টি যে, কৃপারাম ভাটিয়া নামক এক পত্রলেখকের পক্ষে (ট্রিবিউন, ২৪ মার্চ) তাদের নস্যাৎ করা কঠিন হয়নি। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, বড় চুল থাকলেই যদি কেউ ভিন্ন-জাতি হয়, তাহলে হিন্দুদের মধ্যে যারা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে, তারা ভিন্ন-জাতি, বা যারা কাছা না দেয়, তারাও ভিন্ন-জাতি।

তবু যে-প্রশ্ন ছিলনা সে-প্রশ্ন তোলা হল কেন—এই প্রশ্ন অনেকে তুলেছেন। আদি প্রশ্নটি যে বয়সে অর্বাচীন, তা সকলেই স্বীকার করেছেন। ট্রিবিউনে ২২ মার্চ ১৯০০

তারিখে এক লেখক বলেছেন—"অল্প কিছুদিন হল হিন্দু ও শিখদের জাতিগত ও ধর্মগত সম্পর্ক নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আলোচনা হচ্ছে।" একই বছরে ২৯ মার্চের এক চিঠিতেও বলা হয়, "এই বিতর্ক মাত্র কয়েক বৎসরের।" ২ জুন, ১৯০০, ট্রিবিউনের সম্পাদকীয়তেও অনুরূপ স্বীকৃতি ছিল। শিখধর্ম যে, হিন্দুধর্মের শাখা ছাড়া কিছু নয়, তার সম্পর্কেও ঐ প্রবন্ধে প্রচুর তথ্য দেওয়া হয়। শিখ রীতিনীতি, বিবাহপদ্ধতি সবই হিন্দুদের অনুরূপ। যাঁরা বিচ্ছিন্নতাকামী তাঁরা নগণ্যসংখ্যক, কোনো গুরুত্ব তাঁদের নেই, নিজ সম্প্রদায়েই তাঁরা নিন্দিত—একথাও নানা লেখায় পাই। ১৫ মে, ১৯০০, ট্রিবিউনের সম্পাদকীয় থেকে জানতে পারি—শিখদের প্রধান নেতা পাতিয়ালার মহারাজা এই আন্দোলনকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, ওটা প্রচণ্ড বজ্জাতি। "শিখদের ধর্মগুরু, মাননীয় স্যার বাবা ক্ষেম সিং বেদী," "উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবের ৯/১০ ভাগ শিখের কাছে যাঁর বাক্য ধর্মবিধি"—তিনিও একই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। 'সর্দার দয়াল সিং উইল কেসে'র রায় দেবার সময়ে পঞ্জাবের "সর্বোচ্চ ট্রাইবুনাল" শিখদের হিন্দু বলেই ঘোষণা করেছিল। ঐ সম্পাদকীয়তে হিন্দু-শিখকে পৃথক করার অনৌচিত্য দেখাতে গিয়ে বলা হয়, পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান প্রভৃতি জায়গায় বহু হিন্দু আছে, যারা নামে না হলেও কাজে শিখ—তারা দেবদেবীর পূজা করে না, গ্রন্থসাহেবকে ধর্মগ্রন্থ বলে গ্রহণ করে, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির তাদের কাছে হরিদ্বার, কাশীরই তুল্য। সাহেবরা যদিও ভাবে, লম্বা চুল থাকলেই কেবল শিখ—সেকথা বাস্তবে সত্য নয়, ইত্যাদি।

তবু সমস্যাটা উঠেছে কেন, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা জন নানা কথা বলেছিলেন। এক পত্রলেখকের মতে (ট্রিবিউন, ২২ মার্চ, ১৯০০), এই বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইছে প্রধানতঃ সেই সকল শিখ, যারা হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল, সেখানে সামাজিক সম্মান পায়নি। তারা শিখ হয়েও দেখেছে, হিন্দুসমাজের জাতিভেদ শিখসমাজে ঢুকে পড়েছে। তাই তারা পূর্ব আক্রোশে, এবং এখন সমানাধিকারের আকাঙ্ক্ষায়, হিন্দুধর্ম থেকে শিখধর্মকে পৃথক করতে চাইছে। এই পত্রলেখক বলেন, অথচ শিখদের সেরা সময় যখন ছিল, সেই মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের আমলে, হিন্দু ও শিখকে পৃথক ভাবা হয়নি, পরবর্তী শিখ রাজারাও তা করতে দেননি। অন্য এক পত্রলেখক বলেন (ঐ, মার্চ ২৯), শিখসমাজে মূর্তিপূজার ক্রম-প্রচলন দেখে কিছু শিখ আতঙ্কিত হয়ে একাজ করছেন। এইসব লেখক শিখসমাজের প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন, এবং বেদনার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পুত্র শক্তিশালী ও সমৃদ্ধি-শালী হয়ে পিতাকে ত্যাগ করতে চাইলে সেটা কি অকৃতজ্ঞতার কাজ হয় না?

কিন্তু কিছুতে কিছু হবার নয়—যখন পিছনের সুতো ধরা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী হাতে। এই ভেদ সৃষ্টির মূলে ছিল ইংরাজ শাসকদের কূটবুদ্ধি, তা তখনি অনেকের চোখে ধরা পড়েছিল। সেনসাসের সময়ে শিখদের অহিন্দু করে দেখানো হয়েছে, সুতরাং শিখরা ভিন্ন জাতি—পূর্বোক্ত সর্দার দলীপ সিংয়ের এই যুক্তির পিছনে যা ছিল সেটা দলীপ সিং না দেখতে পারেন, কিন্তু অন্যের চোখ এড়ায়নি। সেনসাসে পৃথক রাখার ব্যবস্থা তো শাসকরাই করেছিল! ভাইসরয় যে, ঐকালে শিখ-বীরত্বের গুণগান বাড়াবাড়ি-রকম করছিলেন, তার কারণও একই—শিখদের অপরাপর সম্প্রদায়গুলি থেকে (যারা বলাবাহুল্য 'বীর' নয়) পৃথক করা, এবং 'বীর' শিখদের বৃটিশরাজের প্রতি অনুগত রাখা। ১৯ এপ্রিল, ১৯০০, ট্রিবিউনে এক পত্রলেখক চক্রান্তটি খুলে বলেন :

"অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরাই [অর্থাৎ ভারতবাসী ইংরাজ] যে, শিখরা হিন্দুদের থেকে পৃথক—এই মতবাদের সৃষ্টিকর্তা ও সমর্থক, তার পক্ষে জানাতে পারি : কয়েকদিন আগে এক উচ্চ [ইংরাজ] বিচারকর্তা বলেছেন, শিখরীতিতে হিন্দুবিবাহ হলে তা অবৈধ। বিচারকের আসন থেকে উচ্চারিত এই উক্তিতে কতখানি বদমাইশি আছে তা বুঝতে পারব যদি চিন্তা করি

যে, মধ্য ও পশ্চিম পঞ্জাবের প্রায় সকল শিখ-বিবাহই বৈদিক ব্রহ্মণ্য পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়, এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশের অধিকাংশ হিন্দু-বিবাহ শিখরীতিতে গ্রন্থসাহেবের সামনে সম্পাদিত হয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বিচারের মাপকাঠিতে তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে শিখরা, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হিন্দুরা, অবৈধ সন্তানের জন্মদাতা। হিন্দুরীতি শিখ-রীতির বিরোধী, অথবা শিখরীতি হিন্দুরীতির বিরোধী—একথা ভাবা অত্যন্ত ভুল। অগ্নিসাক্ষী করা বিবাহ, বা গ্রন্থসাহেব-সাক্ষী করা বিবাহ—অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ভিন্নতর ধারণা সত্ত্বেও—জনসাধারণের চোখে সম্পূর্ণ বৈধ।"

আমরা যে-কালের কথা বলছি, সে সময়ে বিচ্ছিন্নতাকামীরা সত্যই সংখ্যায় বা প্রভাবে তুচ্ছ ছিল। তবু ট্রিবিউনের মতো বিখ্যাত কাগজ কেন গুরুত্ব দিয়ে বিতর্কমূলক লেখাগুলি প্রকাশ করেছিল, তার উত্তর দিতে গিয়ে পত্রিকাটি বলে (১৫ মে, ১৯০০)—হাঁ আমরা জানি, সবাই যাকে গোল বলে জানে তাকে চ্যাপটা বলার মতো নির্বোধ জেদ কয়েক ব্যক্তি দেখাচ্ছেন, এবং তর্কবিতর্ক ব্যাপারটা নিষ্কর্মাদের কাছে বেশ সুখসেব্য কবোষ্ণ বস্তু—তবু কণ্টক ক্ষুদ্র হইলেও তার বিদ্ধ করিবার শক্তি অসাধারণ—তাকে গোড়াতেই উৎপাটন করা ভালো। অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক "শিখ ফকির" এই প্রসঙ্গে সম্পাদককে যেকথা বলে-ছিলেন, তিনি তা উদ্ধৃত করেন। উক্ত শিখ ফকির বলেন : "এই আন্দোলনকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। অন্যান্য নষ্টামির সঙ্গে এই আন্দোলনের 'বীজ' শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনৈক্যের 'ফল' উৎপাদন করবে, যার তুল্য কিছু, খালসাকে এখনো পর্যন্ত 'আহার' করতে হয়নি। এই 'নয়া-খালসা' মতবাদের অনুগামীর সংখ্যা এখন সামান্য, এবং এদের মতবাদের উদ্ভট রূপ স্বতঃপ্রকাশিত—এই ব্যাপারটি কিন্তু ভবিষ্যতে এদের ক্রমবিস্তার ও বৃহৎ সংখ্যক মানুষের মনকে গ্রাস করার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কোনো গ্যারান্টি নয়। এই রকমই দেখা যায়, কোনো বিরুদ্ধ মত, যত অদ্ভুতই তা হোক না কেন, অভিনবত্বের কারণে, অন্যান্য কারণেও, অগভীর স্বভাবের মানুষের কাছে (যাদের সংখ্যা সব সময়েই বিপুল) অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কারণ হয়।...বর্তমানের তিক্ত ও আক্রমণশীল বিতর্ক 'কলমধারী মনুষ্য-সমাজেই' আবদ্ধ, যাঁরা নিজেদের অসন্তোষ বা অসমর্থন জানাতে সংবাদপত্র বা বক্তৃতা-মঞ্চের বাইরে পদক্ষেপ করেন না; কিন্তু যেহেতু অনেক শিখ সৈন্য এখন উর্দু ও গুরুমুখী ভালভাবে পড়তে বা লিখতে পারে, এবং সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাসও তাদের আছে, ধর্মীয় ও সামাজিক বাদ-প্রতিবাদে অংশ নিতেও চায়—এরা যখন কোনো না কোনো দলে যোগ দেবে, তাদের মধ্যে কয়েক ডজন দাঁড়াবে নয়া-খালসাদের পক্ষে, বাকিরা পুরাতন রক্ষণশীল পন্থ-এর পক্ষসমর্থন করবে—তখন কি, এখন যেমন বিতর্ককালে কণ্ঠ ও কলম যথেচ্ছ ব্যবহৃত হচ্ছে, সেইভাবে ডান্ডা ব্যবহৃত হবে না?"

শিখসমাজের মধ্যে এই আন্দোলন সত্যই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। এবং সৃষ্টি করেছিল হিন্দু ও শিখ দ্বন্দ্বও। ২ জুন, ১৯০০, তারিখে ট্রিবিউনের সম্পাদকীয়তে ক্ষুদ্র অপচ্ছায়ার ক্রমবিস্তারের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের দিকও :

"কয়েক বছর আগে কারো স্বপ্নেও ছিল না—শিখরা অ-হিন্দু, এমন অদ্ভুত কথা কেউ বলতে পারে। ওকথা বললে সর্বজনীন বিদ্রূপ ভিন্ন আর কিছু তার বরাতে জুটত না। কিন্তু এখন দেখছি—কয়েকটি অখ্যাত শিখের ঐ ধরনের কথাকে সাহেবী সংবাদপত্রে ব্যাপক পাবলিসিটি দেওয়া হচ্ছে, আর ঐ লোকগুলিকে কোনো গুপ্ত রহস্যজনক উপায়ে সর্বদাই জনসাধারণের চোখের সামনে বড়ো আকারে তুলে ধরা হচ্ছে। যখন আমরা একদিকে ঐসব বাদ্যভান্ডগুলির নিতান্ত ক্ষুদ্রতা ও ভঙ্গুরতার কথা ভাবি, অন্যদিকে প্রচন্ড গুমু-গুমু শব্দ শুনি, তখন কিছুতে মেনে নিতে পারি না, ঐ আওয়াজ খাটো বস্তু থেকে বেরুচ্ছে।

নিশ্চয় পিছনে কোনো মেগাফোন-যন্ত্র লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।...পাতিয়ালার মহারাজা, কি মাননীয় বেদী সাহেব, কি চীফ কোর্ট-এর মতামতের কোনো মূল্যই এক্ষেত্রে থাকতে পারেনা, কি করে থাকবে?—আমরা কি দেখছি না, ভারত ও বহির্ভারতের ইউরোপীয়রা অবিরাম লিখে যাচ্ছেন—*Sikh Race, Sikh nation, Sikh Religion!* পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একদিকে নয়া-খালসা সমিতির কতিপয় ব্যক্তি, যাঁদের পৃষ্ঠরক্ষা করছেন ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে পঞ্জাবী হিন্দুদের বিপুল জনসংখ্যা, যার অন্তর্ভুক্ত শিখরাও। 'শিখ' শব্দটিই দেখিয়ে দেয়, সাধারণ হিন্দু বলতে যা বোঝায়, শিখরা তা নন। 'শিখরা' গুরুর শিষ্য, তাঁরা গুরুদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মের অনুগামী। হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদী এক রূপের নাম শিখধর্ম; শিখরা তাঁদের সম্প্রদায়ের লক্ষণ হিসাবে কিছু বাহ্য চিহ্ন ধারণ করেন —যেমন হিন্দুধর্ম-রূপ জনক-বৃক্ষ থেকে বহির্গত সকল শাখাই নিজস্ব প্রতীক গ্রহণ করে থাকে। পরবর্তী এক রচনায় আমরা বলবার চেষ্টা করব—দশম গুরু [গুরুগোবিন্দ] দুর্গা-উপাসক ছিলেন কিনা; শিখদের দীক্ষার প্রথম অনুষ্ঠানে দেবীপূজা, তৎসহ তাঁর বেদীমূলে বলিদান, পালনীয় মুখ্য রীতি কি না? কিন্তু এটা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না— 'চন্ডী পথ'-এর আদর্শে রচিত সর্বাপেক্ষা প্রাণোন্মাদী হিন্দী কাব্য গুরুরই সৃষ্টি। ঐ সকল প্রেরণাদায়ী কবিতাগুলিকে শিক্ষিত শিখরা যেখানে কালাতীত সত্যের গুণবর্ণনা বলতে চান, সেখানে সাধারণ শিখরা তাদের দেবীশক্তির মহিমাই মনে করেন।"

পঞ্জাব, তার বহু রেখাঙ্কিত বর্ণোজ্জ্বল অতীতের দ্বারা, স্বামীজীর অন্তশ্চেতনাকে আলোড়িত করেছিল। ইতিহাসের ঝড়ের নৌকায় উঠে তিনি যেন মহাকালসমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছিলেন—পঞ্জাবে তাঁকে দেখে নিবেদিতার মনে হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে আবার তিনি পঞ্জাব-ভ্রমণে যান, সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যা এবং গুরুভাই। এটি যেহেতু বক্তৃতা-সফর নয়, সেকারণে সভামঞ্চে তাঁকে শক্তিবিকিরণ করতে হয়নি—হয়ত তাই তাঁর সঙ্গিগণ অবরুদ্ধ ভাবের তরঙ্গদলকে তাঁর দেহতটে আছড়ে পড়তে দেখার বিরল সুযোগ পেয়েছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন : "১৪ জুন, ১৮৯৮। পরদিন আমরা পঞ্জাবে প্রবেশ করিলাম; স্বামীজী তাহাতে প্রবল উন্মাদনা বোধ করিলেন। এই প্রদেশের প্রতি তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ও সবিশেষ প্রীতির রূপ দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন এই প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বামীজী বলিলেন, 'এখানকার মেয়েরা চরকা কাটিতে-কাটিতে তাহার ঘর্ঘর-ধ্বনিতে সোঽহম্ সোঽহম্ শুনিয়া থাকে।' বলিতে-বলিতে সহসা বিষয়ান্তর গ্রহণ করিয়া সুদূর অতীতে প্রস্থান করিলেন—আমাদের সামনে খুলিয়া দিলেন বহু দৃশ্য-অঙ্কিত বিশাল ঐতিহাসিক পটচিত্র—গ্রীকরা সিন্ধুনদতীরে অভিযান করিয়া আসিতেছে—চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব হইতেছে—বৌদ্ধসাম্রাজ্য ক্রমবিকাশলাভ করিতেছে। এই গ্রীষ্মে তিনি আটক পর্যন্ত গিয়া, ঠিক যে-স্থানটিতে বিজয়ী আলেকজান্ডারকে প্রতিহত করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—সেই স্থানটি দেখিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের কাছে গান্ধার-ভাস্কর্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন।...তারপর আমরা কয়েকটি দীর্ঘ-প্রত্যাশিত নগরের উপর দিয়া চলিলাম;...লুধিয়ানা,...এবং লাহোর—যেখানে তাঁহার ভারতীয় বক্তৃতার অবসান হইয়াছিল। চকিতে নগরগুলি আসিল, চলিয়া গেল। অনেক শুষ্ক বালু-প্রস্তরময় নদীগর্ভ অতিক্রম করিয়াও অগ্রসর হইয়াছিলাম; শুনিলাম যে, দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে 'দোয়াব' বলে—এবং সমস্ত নদী-সমন্বিত স্থানটির নাম পঞ্জাব। গোধূলির আলোকে একদিন যখন আমরা এইপ্রকার পার্বত্য ভূখণ্ড অতিক্রম করিতেছিলাম, স্বামীজী তাঁহার বহুদিন পূর্বেকার অপূর্ব মহান দর্শনের কথা আমাদের বলিয়াছিলেন। তিনি যখন সবেমাত্র সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই ঐ দর্শন ঘটিয়াছিল, এবং তাহার দ্বারাই, তাঁহার বরাবর

এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করার প্রাচীন রীতি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"স্বামীজী বলিলেন, 'সন্ধ্যা হইয়াছে; আর্যগণ সদ্য সিন্ধুনদতীরে পৌঁছিয়াছেন; আমি দেখিলাম এক বৃদ্ধ বিশাল নদীতটে উপবিষ্ট। অন্ধকারের তরঙ্গ ক্রমান্বয়ে তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্‌বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তারপর সহজ অবস্থা ফিরিয়া পাইয়াই আমি মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম—সেই সুরে, যাহা আমরা বহু প্রাচীনকালে ব্যবহার করিতাম।'...

"স্বামীজী বলিতেছিলেন, 'শঙ্করাচার্য বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন—উহাই আমাদের জাতীয় তান। বলিতে কি, আমার সর্বদাই এই ধারণা,'—বলিতে-বলিতে তাঁহার কণ্ঠে স্বপ্নসুর ঘনাইয়া আসিল, দূরপ্রসারী হইল দৃষ্টি—'আমার স্থির ধারণা, শঙ্করাচার্য তরুণ বয়সে আমারই মতো কিছু দর্শন করিয়াছিলেন, এবং সেইভাবেই প্রাচীন তানকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। সে যাই হউক, ইহা সত্য যে, শঙ্করাচার্যের সমগ্র জীবন উহাই—বেদ ও উপনিষদসমূহের সৌন্দর্যের স্পন্দন।'" ['হিমালয়ে', ৫৬-৫৮]।

পূর্ব বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে, লাহোরে প্রদত্ত 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ' বক্তৃতার সূচনা হয়েছিল পঞ্জাবের ভূমি ও ইতিহাসের বন্দনা দিয়ে। এই ভূমিকে স্বামীজী "পবিত্র আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম" বলে উল্লেখ করেছিলেন, "মনু-মহারাজের" মতে যে-ভূমি "ব্রহ্মাবর্ত।" আত্মতত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় এই ভূমিতে—তার সিদ্ধির স্রোত বন্যাকারে পৃথিবীকে প্লাবিত করেছে। নানা ধর্মের প্রবল নদীসম্মিলন এই ভূমিতে, এবং এই বীরভূমিই অসভ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ বারংবার বুক পেতে গ্রহণ করেছে। সেই তেজ বিলুপ্ত হয়নি, তার প্রমাণরূপে স্বামীজী নানকের উল্লেখ করেছিলেন : "এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়া, বাহু প্রসারিত করিয়া, সমগ্র জগৎকে, শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদের পর্যন্ত, আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন।"

লাহোরের প্রথম বক্তৃতার গোড়াতে স্বামীজী এই-যে গুরু নানকের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করলেন, এর তাৎপর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হিন্দুসন্ন্যাসী তিনি, আতিথ্য নিয়েছেন 'সনাতন ধর্মসভা'র, কিন্তু পঞ্জাবে তাঁর প্রথম প্রণাম শিখ গুরু নানককে! তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন : "হে পঞ্চনদ-দেশের সন্তানগণ! এখানে, আমাদের এই প্রাচীন দেশে, আমি তোমাদের নিকট আচার্যরূপে উপস্থিত হই নাই।...আমি পূর্বদেশ হইতে পশ্চিমদেশীয় ভ্রাতৃগণকে সম্ভাষণ করিতে, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে, ভাববিনিময় করিতে আসিয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি—আমাদের মধ্যে কোন্ বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে—কোথায় আমাদের মিলনভূমি তাহাই অন্বেষণ করিতে। আমি আসিয়াছি ইহাই বুঝিতে, কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে-বাণী অনন্তকাল আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে। তোমাদিগকে কিছু গড়িবার প্রস্তাব দিতেই আসিয়াছি, ভাঙিবার পরামর্শ দিতে নয়।"

উদ্দীপ্ত হয়ে স্বামীজী বলেছিলেন : "আজ আমাদিগকে এক মহাবাণী বলিতেছে—যথেষ্ট সমালোচনা, যথেষ্ট দোষদর্শন হইয়াছে, আর নয়। এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, সেই সমষ্টিশক্তির সহায়তায়, বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় গতি অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। এখন গৃহ পরিষ্কার হইয়াছে—ইহাতে নূতনভাবে বাস করিতে হইবে। পথ সাফ্ হইয়াছে—আর্যসন্তানগণ! সম্মুখে অগ্রসর হও।"

নানককে স্বামীজী কেবল শিখগণের নয়, ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নানকের গান তাঁর কণ্ঠে প্রায়শঃ শোনা যেত;১৬ তাঁর মুখে নানকের কাহিনীও তাঁর শিষ্যগণ শুনেছেন।১৭

আর স্বামীজী প্রবল উন্মাদনা বোধ করতেন গুরুগোবিন্দ সিংহের স্মরণমাত্রে। শিখদের সংগ্রামী প্রতিভার মধ্যে তিনি হিন্দুবীরত্বেরই প্রবল প্রকাশ দেখেছেন১৮ এবং গুরুগোবিন্দই প্রধানতঃ ঐ বীর্যশক্তিকে জাগিয়েছিলেন। "শিখদিগের বিখ্যাত খালসা সৈন্যদলের মতো সংঘ অতি অল্পই দেখা যায় [নিবেদিতা লিখেছেন]—এবং এ বস্তু হিন্দুধর্মের অপূর্ব প্রতিভা ও সহজাত শক্তিরই সৃষ্টি। কী আগ্রহের সহিত তিনি [স্বামীজী] আমাদের নিকট দৃশ্যটি পুনঃপুনঃ চিত্রিত করিতেন, যাহাতে দেখা যায়—গুরুগোবিন্দ শিষ্যগণের নিকট জ্বলন্ত ভাষায় আহ্বান করিয়াছেন—'কে আছো, ধর্মের জন্য কে প্রাণ দিতে প্রস্তুত'!" ['দেখিয়াছি', ২৪৭]।

গুরুগোবিন্দ স্বামীজীর কাছে হিন্দুবীর। "স্বামীজী হিন্দুধর্মের অসংখ্য শাখা প্রশাখার কোনোটিকে হিন্দুধর্মের গণ্ডীর বাহিরে রাখার চেষ্টাকে সহ্য করিতে পারিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কোনো ব্যক্তিই ব্রাহ্ম বা আর্যসমাজভুক্ত হওয়ার জন্য তাঁহার নিকট অহিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেন না।" ['দেখিয়াছি', ২৪৭]। গুরুগোবিন্দকে হিন্দু আদর্শের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করে স্বামীজী তাঁর লাহোর-বক্তৃতায় বলেছিলেন :

১৬ এ শ্রীনিবাস পাই তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন, স্বামীজী একটি শিশুকে কোলে নিয়ে কোন্ অপূর্বকণ্ঠে একদিন একটি পঞ্জাবী গান গেয়েছিলেন। "স্বামীজী বলেন, গানটি গুরু নানকের রচনা। তিনি আমাদের গানটির উৎপত্তির কাহিনী বলেছিলেন। এক সন্ধ্যায় আরতির সময়ে নানক একটি মন্দিরে গেছেন—ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিন্তু তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দিলেন না। তখন নানক সরে গিয়ে এই গানটি গেয়েছিলেন, যাতে তিনি আকাশকে রৌপ্যপাত্র, তারকাদের ঐ পাত্রে আরতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আলোক, সন্ধ্যার সুগন্ধপূর্ণ বাতাসকে আরতির গন্ধদ্রব্য, ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। [রেমিনিসেনসেস, ১২০]।

এটি নানকের সুপরিচিত গান—"গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে।" এর একটি বাংলা রূপান্তর করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তা স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় গান ছিল। শ্রীনিবাস পাই স্বামীজীর মুখে মূল গানটি, না তার বাংলা রূপান্তর শুনেছিলেন, জানি না, হয়ত মূলটিই শুনেছিলেন। যাই হোক, বাংলা রূপান্তরটি এই :

গগনের থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডনে তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥
সেই এক পুরাতন, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কররে।

১৭ কাহিনীটি সুপরিচিত। নিবেদিতা লিখেছেন : "স্বামীজী কিছু সময় শিখগণ ও তাঁদের গুরুদের কথা বললেন। গ্রন্থসাহেব থেকে গুরু নানকের একটি কাহিনী শোনালেন : নানক মক্কা গেছেন, সেখানে কাবা মসজিদের দিকে পা করে শুয়ে আছেন। তা দেখে ক্রুদ্ধ মুসলমানেরা তাঁকে জাগিয়ে তুলে এই মারে তো সেই মারে—কী! আল্লার স্থানের দিকে পা করে শোয়া? নানক শান্তভাবে উঠে শুধু বললেন, 'তাহলে আমাকে তোমরা দেখিয়ে দাও, কোন্ দিকে ভগবান নেই, আমি সেদিকেই পা করব।'" ['রেমিনিসেনসেস,' ২৪৫-৪৬]

১৮ "বর্তমান ভারত"-এ স্বামীজী লিখেছেন : "এ যুগের [মুসলমান যুগের] শেষে হিন্দু শক্তি মহারাষ্ট্র বা শিখবীর্যের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্মের কথঞ্চিৎ পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল।" [৬—২২৭-২৮]।

"কেবল তখনই তুমি প্রকৃত হিন্দুপদবাচ্য যখন মাত্র ঐ নামটিতেই তোমার ভিতরে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিবে;...যখন যে-কোনো দেশীয়, যে-কোনো ভাষাভাষী হিন্দু নামধারী তোমার পরমাত্মীয় বোধ হইবে;...যখন হিন্দুনামধারী যে-কোনো ব্যক্তির দুঃখকষ্ট তোমার হৃদয়স্পর্শ করিবে এবং নিজ সন্তান বিপদে পড়িলে যেরূপ উদ্বিগ্ন হও সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইবে;...যখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে সর্বপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত হইবে। ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তরূপে তোমাদের আমি গুরুগোবিন্দ সিংহের কথা বক্তৃতার আরম্ভেই বলিয়াছি। এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য নিজ শোণিতপাত করিলেন, নিজ পুত্রগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে দেখিলেন—কিন্তু যাহাদের জন্য নিজের ও নিজ আত্মীয়-স্বজনগণের রক্তপাত করিলেন, তাহারা তাঁহার সহায়তা করা দূরে থাকুক, তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, এমনকি দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল—অবশেষে এই আহত কেশরী নিজ কার্যক্ষেত্র হইতে ধীরভাবে অপসৃত হইয়া, দক্ষিণদেশে গিয়া, মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন—কিন্তু যাহারা অকৃতজ্ঞভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তাহাদের প্রতি একটি অভিশাপবাক্যও তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না।...এইরূপ ব্যক্তিই হিন্দুনামের যোগ্য। আমাদের সম্মুখে সর্বদাই এরূপ আদর্শ থাকা আবশ্যক। পরস্পর বিরোধ ভুলিতে হইবে—চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করিতে হইবে।" [৫—২৮১-৮২]।

স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথা বলতে সত্যই ভালবাসতেন। 'শিষ্য' শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এই-রূপ এক কথোপকথনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান এই কথা আছে—গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান সাধারণের মধ্যে সমষ্টিগত স্বার্থবোধ সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন বলেই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর অনুগামী হয়েছিল।১৯

আগেই বলেছি, পঞ্জাব ছিল স্বামীজীর কাছে ভারতীয় সভ্যতার বহুবর্ণাঙ্কিত পটচিত্র। তার দিকে ফিরে স্বামীজী কোন্ আবেগে উদ্বেল হতেন, নানাসূত্র থেকে তার সংবাদ সংকলন

১৯ "বেড়াইতে-বেড়াইতে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপস্যা তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দীক্ষাদান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া, শিখ-জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই-বা তিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন—ওজস্বিনী ভাষায় সে-সকল বিষয়ের কিছু-কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন যে কী মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহা আবৃত্তি করিলেন : 'সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ'। যব্ গুরুগোবিন্দ নাম শুনাউঁ।' অর্থাৎ গুরুগোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষামন্ত্র) শুনিয়া এক-এক ব্যক্তিতে সওবা লক্ষ অপেক্ষাও অধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত।..ধর্মমহিমাসূচক ঐ কথাগুলি বলিতে-বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।...

"কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, 'মহাশয়, ইহা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।'

"স্বামীজী। Common interest না হলে লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা-সমিতি, লেকচার দ্বারা সর্বসাধারণকে কখনও unite করা যায় না—যদি তাদের ইন্টারেস্ট্ এক না হয়। গুরুগোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করছে। গুরুগোবিন্দ কমন্ ইন্টারেস্ট্ ক্রিয়েট করেন নি—কেবল সেটা ইতরসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে ফলো করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।" [৯-৮৪-৮৫]।

"ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন :

"এইকালে উত্তরভারতে একজন শক্তিমান দিব্য পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। সৃজনী প্রতিভা-

করেছি—তার মধ্যে নিবেদিতার রচনাও আছে। প্রসঙ্গ শেষ করব নিবেদিতার রচনাংশ উদ্ধৃত করেই। ওখানে কিছুটা দেখতে পাব—স্বামীজী পঞ্জাবকে কি চোখে দেখতেন, এবং পঞ্জাব স্বামীজীকে কোন্ চোখে দেখেছিল?

"পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াই আমরা আচার্যদেবের স্বদেশপ্রেমের গভীরতম পরিচয়ের ঝলক দেখিতে পাইয়াছিলাম। যে-কেহ তাঁহাকে সেইসময়ে সেখানে দেখিলে মনে করিতে পারিতেন —তিনি ঐ প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এমন নিবিড়ভাবে উহার সহিত তিনি নিজেকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে হইত, যেন তিনি ঐ স্থানের অধিবাসীদের সহিত প্রেম ও শ্রদ্ধার অজস্র বন্ধনে নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। সেখানে তিনি যেমন অনেক কিছু পাইয়াছেন, দিয়াছেনও সেইরূপ। কতক মানুষ সেখানে ছিলেন যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে বলিতেন—স্বামীজীর মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রথম গুরু নানক এবং শেষ গুরু গুরু-গোবিন্দের অপূর্ব মিশ্রণ লক্ষ্য করিয়াছেন।" ['দেখিয়াছি', ৯৪-৯৫]।

॥ ৭ ॥ মুসলমান ও ইসলাম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

জাতীয় সংহতি প্রশ্নে অপরিহার্য আলোচনার বিষয়—ভারতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক। এই প্রশ্নে স্বামীজীর মনোভাব কী ছিল?

একালে হিন্দুধর্মের প্রধান আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না (বা থাকতে পারেন না!) ধরে নিয়ে কেউ-কেউ এখন স্বামীজীর সমালোচনায় উৎসাহী। অজ্ঞানের আস্ফালনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জেতা কঠিন। এবং যাঁরা সমালোচনা-কৈবল্যবাদে বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান আশা করাও যায় না। নচেৎ স্বচ্ছন্দে বলা যেত, যেহেতু স্বামীজীর কালে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠেনি, পরবর্তীকালে যা ভয়ানক রূপ ধরে ভারতবিভাগ ঘটিয়েছে—সেইকারণে স্বামীজী ঐ বিষয়ে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এমন বিচিত্র অভিযোগও শুনেছি—স্বামীজী হিন্দুদের জাগিয়ে তোলার জন্য পিছিয়ে-পড়া মুসলমানেরা আত্মরক্ষায় তৎপর হয়ে অধিক সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে। এর একটিই উত্তর সম্ভব—রাম জাগলে যেহেতু শ্যামের রাগ হবে, তাই উভয়ের নিদ্রাকে দীর্ঘায়ত করাই হচ্ছে লোককল্যাণকর্ম। পৃথিবীর ইতিহাসে যত বৃহৎ মানুষ হয়েছেন, যাঁরা বিশেষ মত প্রচার করেছেন, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধেই একই অভিযোগ করা সম্ভব। এবং যদি কোনো জাতি বিশেষরকম উন্নতি করে ফেলে, তার বিরুদ্ধে, যদি সে সাম্রাজ্যবাদী নাও হয়, একই অভিযোগ উঠবে।২০

সম্পন্ন শেষ শিখ গুরু—গুরুগোবিন্দ সিংহেব আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর ফলেই শিখ সম্প্রদায়ের সর্বজনবিদিত রাজনৈতিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল।" [৫—৩৯৪]

কিন্তু স্বামীজীর প্রখর মনীষার কাছে এই শিখ বা মরাঠা উত্থানের সংকীর্ণ চরিত্র গোপন থাকেনি। এই উত্থানে শক্তির সূচ্যগ্রতা ছিল কিন্তু ছিলনা জ্ঞানচর্চার ব্যাপক পরিধি। তাই পতনও হয়েছিল ত্বরান্বিত।—"কিন্তু মহারাষ্ট্র বা শিখ সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে-আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল। মালব কিংবা বিদ্যানগরের কথা দূরে থাকুক, মোগল-দরবারেও তদানীন্তন কালে যে-প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুনার রাজ-দরবার বা লাহোরের রাজসভায় বৃথাই আমরা সে দীপ্তির অনুসন্ধান করি। মানসিক উৎকর্ষের দিক হইতে এই যুগই ভারত-ইতিহাসের গাঢ়তম তমিস্রার যুগ, এবং ঐ দুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য—ধর্মান্ধ গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি-স্বরূপ ছিল, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী; উভয়েই মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।" [৫—৩৯৪]

২০ বিবেকানন্দের ভাগ্য—বিপুল সংখ্যক মানুষ যেমন তাঁর প্রচণ্ড অনুরাগী ছিলেন, তেমনি

তাহলেও অভিযোগটি গভীরে সত্য, নিন্দুকদের সংকীর্ণদৃষ্টি অনুযায়ী অবশ্য নয়। এ পৃথিবীতে যদি কেউ পিছিয়ে থাকে, তাহলে অন্যের সত্যকার অগ্রগতি সম্ভব নয়—স্বামীজীই বলেছেন। 'পশ্চাতে ফেলিছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'—রবীন্দ্রনাথের উক্তি। কিন্তু এইসঙ্গে এও বিবেচ্য, সময় উপস্থিত না হলে আহ্বান করলেও তা শোনা হয় না, বাড়ানো হাত ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের তাত্ত্বিক সমাজবিপ্লবীরা মুসলিম সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় ধারণার মধ্যে এখনো কতটুকু প্রবেশ করতে পেরেছেন?

বেশ-কিছু মানুষ সামাজিক, ধর্মীয়, ও অন্যান্য কারণে তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞতার বিরূপতা পোষণ করে গেছেন। শেষোক্তদের মধ্যে মহৎ মানুষেরাও ছিলেন, যাঁরা অনেকেই অবশ্য পরে ভ্রম সংশোধন করেছেন। উদাহরণতঃ স্বামীজীর একেবারে সমসাময়িক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা বলা যায়। তিনি প্রবাসী পত্রিকায় ১৩২৭ চৈত্র সংখ্যায় "জাতিগঠনে বাধা" নামক রচনায় আলোচ্য বিষয়ে স্বামীজী সম্পর্কে এক অসতর্ক উক্তি করেন। জাতিগঠনে বাধা কোন্‌গুলি, সে প্রসঙ্গে আলোচনা-সূত্রে তিনি বলেন : "আর্যসমাজের লোক জাতীয় শিক্ষার অর্থ করেন, বেদ পাঠ করা। কেননা তাঁদের মতে বেদ অভ্রান্ত। বিবেকানন্দের ভক্ত বলবেন, বেদান্ত পাঠ কর—দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত বিচার কর।..বেদ বেদান্ত পাঠ্য হলে বাংলার শতকরা ৫২ জন মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে?"

এই ধরনের মন্তব্য যে স্বামীজীর সামাজিক চিন্তার বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞতার সূচক, তাতে সন্দেহ নেই। প্রবাসীতেই বৈশাখ ১৩২৮ সংখ্যায় অখিলরঞ্জন মজুমদারের প্রতিবাদপত্র ["আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ"] কিয়দংশে প্রকাশিত হয়। যেহেতু প্রফুল্লচন্দ্র জাতীয় শিক্ষার কথা তুলেছিলেন, তাই অখিলরঞ্জন স্বামীজীর রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন—স্বামীজী আধুনিক বিজ্ঞানমূলক শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। প্রবাসী সম্পাদক সেগুলি "অপ্রাসঙ্গিক বোধে" বাদ দিয়ে বলেছিলেন, ঐ সকল লেখাতে "মুসলমানদিগের টানিয়া লইবার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোনো উপায় নির্দেশ নাই।" তবে তিনি, জনগণকে বিজ্ঞানশিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা, রুজি-রোজগারের পথ নির্দেশ ইত্যাদি বিষয়ে স্বামীজীর কিছু কথার স্থান তাঁর পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেন। সে যাইহোক, অখিলরঞ্জনের প্রতিবাদপত্রের যেটুকু অংশ প্রবাসী ছেপেছিল, তার শেষাংশে পাই : "এইরূপে [স্বামীজী] জীবনের শেষপর্যন্ত কিসে দেশের তথাকথিত নীচ জাতির উন্নতি হয়, কিসে দেশময় একটা সহানুভূতির দৃঢ়বন্ধন হয়, এবং কিসে দেশময় একটা কর্মস্রোত প্রবাহিত হয়, সে চেষ্টায় কাটাইয়াছেন। ইহার পরেও কি আচার্য রায় মহাশয় বলিবেন, স্বামীজী শতকরা ৫২ জন মুসলমানকে বাদ দিয়া কেবল দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিচার করিয়া চলিতে বলিয়াছেন?"

আচার্য রায়ের ঐ উক্তির প্রতিবাদ অন্যত্রও হয়েছে। 'যমুনা' পত্রিকার আষাঢ় ১৩২৮ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে [সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও ফণীন্দ্রনাথ পাল] এই সূত্রে প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রবাসী, উভয়েরই সমালোচনা করা হয়। ঐকালে রামমোহন রায় সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীও এক অবিবেচক মন্তব্য করে বসেছিলেন, তাতে প্রবাসী প্রচণ্ডভাবে গান্ধীজীর সমালোচনা করে। সেই সমালোচনার ঔচিত্য স্বীকার করার পরে যমুনার সম্পাদক প্রশ্ন করেন—"কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, প্রবাসীর এইসব মহাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁদের নামে অপমানসূচক কথা বলেন যাঁরা তাঁদের বিপক্ষে খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিবার মতো এই যে সৎসাহস, এটা কি প্রবাসীর মজ্জাগত?" প্রবাসীর নানা ধরনের গোঁড়ামির কঠোর নিন্দা করার পরে, যমুনায় লেখা হয় :

"মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্যের বিপক্ষে প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রবাসী একস্থানে লিখিয়াছেন, 'যেসব লোক, হইতে পারে ভ্রমবশতঃ তাঁহাদিগকে ভক্তি করে, অকারণে তাহাদিগকে আঘাত করিবার কি প্রয়োজন ছিল?' খুব ঠিক কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কিছুদিন পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যখন 'জাতিগঠনের বাধার' কথা লিখিতে বসিয়া ধাঁ করিয়া কোথাও কিছু নাই বিবেকানন্দ-স্বামীকে অযথা অপমান করিয়া বসিলেন, তখন এ কথাটা কি প্রবাসীর পরদুঃখকাতর অন্তঃকরণে একবারও উঠে নাই যে, তাঁর যাঁরা ভক্ত ('...ভ্রমবশতঃ নয়', যাঁরা সত্যসত্যই সজ্ঞানে এবং খুব ভাল করিয়া সকল দিক তলাইয়া দেখিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন) তাঁদের মনে ইহাতে কতখানি আঘাত লাগিতে পারে।

"স্বামীজীর সমস্ত বই প্রফুল্লচন্দ্র কখনই পড়েন নাই। তাহা হইলে কখনই অমন অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। বেশ, তিনি না-হয় না পড়িয়াই লিখিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা

যুক্তিহীন কথার আলোচনায় কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই। কেবল সুস্পষ্ট জানাতে চাই—স্বামীজীর বিষয়ে এই সংক্রান্ত অভিযোগ মূলে মিথ্যা। আমরা যতদূর জানি, রামমোহন রায়কে বাদ দিলে ঊনিশ শতকের হিন্দুনেতাদের মধ্যে স্বামীজীর মতো মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক আর কোনো হিন্দুনেতার ছিল কি-না সন্দেহ, এবং এক্ষেত্রে তিনি যে সাহস ও মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা সমাজসংস্কারকরাও দিতে সমর্থ ছিলেন না।

স্বামীজীর লেখায় বা কথায় ইসলাম-প্রসঙ্গ কতখানি, তার আলোচনা অবশ্যই করব। পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে মোটেই কম নয়। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেব, স্বামীজী মসীজীবী ছিলেন না বলে, যে-কোনো বিষয়ে রাশি-রাশি লেখার প্রয়োজন বোধ করতেন না। তাঁর রচনাবলী বলে পরিচিত বস্তুর বড় অংশ তাঁর বক্তৃতা ও ঘরোয়া আলাপের নোট। বলাবাহুল্য এমন সংকলন সর্বাত্মক হতে পারে না। ঘরোয়া আলাপের ক্ষেত্রে নোট-লেখক তাঁর ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন ক'রে তাকে লিপিবন্ধ করেছেন। সেকালের হিন্দুদের মুসলমান-ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল না বলে তাঁরা, স্বামীজী সে-প্রসঙ্গ তুললেও, সেসব লিখে রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দেখান নি, কিন্তু স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্য শিষ্যরা অপরপক্ষে ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি দেখতে সমর্থ ছিলেন বলে তাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন।

কিন্তু মুখের কথার কী মূল্য যদি-না জীবনের সঙ্গে তার যোগ থাকে। স্বামীজী সর্বদাই তত্ত্বকে জীবনগত করবার দিকে জোর দিয়ে গেছেন। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে স্বামীজীর সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক কেমন ছিল, তার অল্পবিস্তর সংবাদ এখানে দেওয়া উচিত।

ধর্মবিষয়ক উদারতা বিবেকানন্দ তাঁর পারিবারিক সংস্কৃতি থেকেই পেয়েছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এটর্নি, আইনব্যবসায়ের জন্য উত্তরভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, আরবী, ফার্সী এবং উর্দুতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত এসব কথা 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী' গ্রন্থে জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, "বাইবেল, কোরান ও শ্রীমদ্ভাগবত, তিনখানি গ্রন্থই তিনি [বিশ্বনাথ দত্ত] বিশেষ করিয়া পাঠ করিতেন।" স্বামীজীর গুরুভাই ও বন্ধু স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় ভাগ, 'দিব্যভাব', পৃঃ ৮০) লিখেছেন : "ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লখনৌ, লাহোর প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থানসকলে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহারের

করি, প্রবাসী-সম্পাদকও কি পড়েন নি? যদি না পড়িয়া থাকেন তো প্রবন্ধ ছাপাইবার মতো হঠকারিতা তিনি কোন্ সাহসে করিলেন?

"এই যে মহাপুরুষ, যাঁর মধ্যে সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া কোনো জিনিসই ছিল না, তাঁর নামে এই যে যা-তা বলিয়া নিন্দা প্রচার করা এবং সেই বিশ্রী প্রবন্ধটা প্রবাসীতে অকপটে প্রকাশ করা, ইহার মধ্যে সম্পাদক মহাশয় কি একটুও দোষ দেখিতে পাইলেন না? আর যত দোষ মহাত্মা গান্ধী করিয়াছেন স্বর্গীয় রামমোহনকে জগতের আর দুর্জন শ্রেষ্ঠ মহাত্মার তুলনায় খাটো করিয়া? প্রবাসী...স্বামীজীকে একজন সামান্য শিক্ষিত যুবকেরও নীচে স্থান দিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।...এইরূপ সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভাব বুকে পুষিয়া যাঁরা মুখে বড়-বড় কথা বলেন, তাঁদের হাত হইতে স্বর্গীয় রামমোহন কোনোদিন একটা ঝরা পুষ্পদলও গ্রহণ করিতে পারিবেন না।"

এখানে উল্লেখ্য, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ক্রমে যখন স্বামীজীর বিষয়ে অধিক অবহিত হয়ে ওঠেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারাও সাক্ষাতে জানতে পারেন—তখন স্বামীজী সম্পর্কে প্রভূত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে থাকেন। সে প্রসঙ্গ আমরা শেষ অধ্যায়ে উপস্থাপিত করব। প্রবাসীও, আমরা দেখি, ভাদ্র ১৩৩০ সংখ্যায়, প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত স্বামীজীর মতামতসূত্রে একটি সম্পাদকীয় টিপ্পনী লিখেছিল—"বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামিক দেহ"—যার মধ্যে প্রবাসীসুলভ সুষ্ঠু নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে স্বামীজীর সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণের চেষ্টা ছিল। স্বামীজীর যে-পত্রসূত্রে ঐ সম্পাদকীয় টিপ্পনী, সেই পত্রটি অধ্যায়শেষে উৎকলন করেছি।

কিছু-কিছুর প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। নিত্য পলান্নভোজন করিবার প্রথা বোধহয় ঐরূপেই তাঁহার পরিবার-মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল।" স্বামী গম্ভীরানন্দ এইসব তথ্যের উপর নির্ভর করে লিখেছেন ('যুগনায়ক' ১ম, ১৮), "পোষাক-পরিচ্ছদ, পানাহার, আদব-কায়দায় তিনি প্রাচীন হিন্দু-মুসলিম যৌথ পরিবারের রীতিনীতি অনুসরণ করিতেন।"

এহেন পিতার পুত্রের কিছু প্রাসঙ্গিক বাল্যকথা প্রমথনাথ বসুর "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থ থেকে হাজির করা যাক :

"বিশ্বনাথ দত্তের নিকট নানাজাতীয় মক্কেল আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মুসলমান ছিলেন। এ-ব্যক্তি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই সমুদয় বালিশগুলি উপরে-উপরে সাজাইয়া তাহার উপর সটান লম্বা হইয়া হেলিয়া পড়িতেন এবং অর্ধনিমীলিত নেত্রে হুঁকা টানিতে-টানিতে মাঝে-মাঝে 'ইয়া আল্লা', 'খোদা তুমিই সত্য' প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিতেন, ...এবং কখনো-কখনো-বা সেইসঙ্গে 'লা-এলাহা এল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলোল্লাহে' বলিয়া উচ্চ শব্দ করিয়া উঠিতেন।...[ইনি] নরেন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসিতেন। নরেন্দ্রও তাঁহাকে দেখিবামাত্র 'চাচা' বলিয়া ছুটিয়া আসিতেন।...[তিনি] আবার মধ্যে-মধ্যে তাঁহাকে [নরেন্দ্রনাথকে] মিঠাই সন্দেশ ইত্যাদি খাইতে দিতেন। নরেন্দ্রনাথও দ্বিধাশূন্য-চিত্তে সে-গুলি ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু অপর [হিন্দু] মক্কেলগণ ইহাতে শিহরিয়া উঠিতেন। কি সর্বনাশ! হিন্দু হইয়া মুসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য ভোজন! এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ঘন-ঘন ধূম উদ্‌গিরণ করিতে এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভ্রষ্টাচার বালকের ভবিষ্যৎ দুর্গতি স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভ্রূকুটিপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতে ছাড়িতেন না। বিশ্বনাথবাবু যখন গৃহে প্রবেশ করিয়া এইরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেন, তখন ব্যাপারটি বুঝিতে তাঁহার বাকি থাকিত না। কিন্তু তিনি নিজে আহারাদি বিষয়ে আচারপালন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদাসীন ছিলেন, সুতরাং পুত্রের এবংবিধ আচরণে প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া মনে-মনে হাসিতেন।

"একদিন বড় মজা হইয়াছিল।...[নরেন্দ্রের] পিতা মক্কেলদিগের সহিত কথাবার্তা শেষ করিয়া তাহাদের সহিত সদর দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই অবসরে নরেন্দ্র কোথা হইতে ধাঁ করিয়া বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সারি-সারি যত হুঁকা ছিল তাহার প্রত্যেকটিতে মুখ দিয়া একবার ভুড়ুক করিয়া টানিলেন। মুসলমানের হুঁকাটি একটু বেশি আগ্রহের সহিতই টানিলেন, কারণ উহা থেকে বেশ খোশবায় বাহির হইতেছিল।

"এরূপ করিবার একটু কারণ ছিল।...জাতিভেদ জিনিসটা বালক নরেন্দ্রের নিকট বড় দুর্বোধ্য বোধ হইত। একজন আর একজনের সহিত খাইবে না কেন? ভিন্নজাতি হইলেই বা দোষ কি? যদি জাতিভেদ না মানা যায় তো কী হয়? আকাশটা কি মাথায় ভাঙিয়া পড়ে, না মানুষ মরিয়া যায়?...এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে তিনি দ্রুতগতিতে সকল মক্কেলের হুঁকা হইতে ধূম উদ্‌গিরণ করিলেন। কিন্তু কই, তিনি তো মরিয়া গেলেন না! বা পৃথিবীটা তো ভাঙিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িল না!...এমন সময় বিশ্বনাথবাবু আসিয়া পড়িলেন, এবং পুত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করছিস রে?' পুত্র অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, 'দেখছি, জাত না মানলে কি হয়?' পিতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, এবং 'বটে রে দুষ্ট!' বলিয়া ধীরে-ধীরে নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন।"

বাল্যে নরেন্দ্রনাথ নিজ 'জাত'কে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, যৌবনে চেয়েছিলেন—তাঁর ধর্মবন্ধুরা সেই একই কাজ করুক। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে অবস্থানকালের একটি ঘটনার কথা স্বামী অভেদানন্দ 'আমার জীবনকথা' বইয়ে লিখেছেন :

"একদিন নরেন্দ্রনাথ হিন্দুদিগের আহারাদি বিষয়ে যে-সকল কুসংস্কার আছে, তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া আমাদের বলিতে লাগিলেন।...আমরা কেহই মুসলমানের হাতের রান্নাকরা খাদ্য পূর্বে কখনও খাই নাই। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগের ন্যায় জাতিবিচার মানিত

না, তাহার মতও ছিল উদার, তাই সে সকলের হাতের রান্না খাদ্য খাইয়াছে। সেইদিন নরেন্দ্রনাথ আমাদের বলিল, 'চলো, আজ তোমাদের কুসংস্কার ভেঙে আসি।' আমি তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে রাজি হইলাম, এবং শরৎ ও নিরঞ্জন আমার কথায় সায় দিল। সন্ধ্যার সময় কাশীপুর বাগান হইতে পদব্রজে নরেন্দ্রনাথ আমাদের লইয়া বিডন স্ট্রীটে (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার হইয়াছে) পীরুর রেস্টুরেণ্টে উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথ ফাউলকারীর অর্ডার দিল।...ফাউলকারী আসিলে আমরা সকলে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুসংস্কার ভাঙিতেছি, এবং ঘৃণা দূর করিতেছি, এই ধারণা হৃদয়ে রাখিয়া অল্পমাত্র গ্রহণ করিলাম। নরেন্দ্রনাথ মহানন্দে প্রায় সমস্তটাই আহার করিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঘটনার কথা জেনেছিলেন, কিন্তু মোটেই ক্ষুব্ধ হননি বরং বলেছিলেন, "বেশ করেছিস, ভালো হল, তোদের সব কুসংস্কার দূর হয়ে গেল।"

পাঠক আগে [১ম খণ্ড, ৭০-৭১] বঙ্গবাসী পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকেও জেনেছেন—নরেন্দ্রনাথ যৌবনে হিন্দুশাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যাদি গ্রহণ করতেন ও অপরকে তা করতে প্রণোদিত করতেন।

এখনো পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের ভাবী কর্মজীবন স্থিরীকৃত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি এসেছেন ঠিকই, কিন্তু সন্ন্যাসজীবন যাপন করবেন কিনা কেউ জানেনা। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে যখন সত্যই সন্ন্যাসী হয়ে বৃহত্তর ভারতের পথে পা বাড়ালেন, তখনকার আচরণ কী দাঁড়াল, পুনশ্চ তার কিছু প্রাসঙ্গিক কাহিনী শোনানো যাক।

প্রথমেই উল্লেখ করব আলমোড়ার সেই মুসলমান ফকিরের কথা যিনি "সত্যই স্বামীজীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন।" দুই পরিব্রাজক গুরুভ্রাতা—বিবেকানন্দ ও অখণ্ডানন্দ—হাঁটতে-হাঁটতে আলমোড়ার কাছে পৌঁছেছেন। দুজনেই বহুক্ষণ অভুক্ত। তার উপরে পথশ্রম। স্বামীজী মূর্ছিতপ্রায় হয়ে পড়ে রইলেন। কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই যে, আহার সংগ্রহ করবেন। অখণ্ডানন্দ সন্ধান করে দেখলেন, মুসলমানদের একটি গোরস্থান আছে, তার রক্ষক এক ফকির কাছেই পর্ণকুটীরে থাকেন। তাঁর কাছে গেলে, তিনি অবস্থা জেনে, করুণাপরবশ হয়ে একটি শশা খেতে দিলেন। তা খেয়ে তবে স্বামীজী সুস্থ হন। পরবর্তীকালে ঘটনাটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "লোকটি বাস্তবিক আমার প্রাণরক্ষা করেছিল। আর কখনও আমি ক্ষুধায় অত কাতর হইনি।"

বলাবাহুল্য এ-ঘটনা স্বামীজীর পক্ষে ভোলা সম্ভব ছিলনা। পাশ্চাত্ত্য-প্রত্যাগত বিখ্যাত বিবেকানন্দ আবার যখন আলমোড়ায় আসেন, সমবেত জনতার মধ্যে ফকিরকে দেখতে পান। ফকির তাঁকে না চিনলেও স্বামীজী চিনতে পারেন, এবং সাদরে তাঁকে ডেকে এনে জনমণ্ডলীর কাছে ঘটনাটি ব্যক্ত ক'রে নিজের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করেন। [প্রমথনাথ বসু, ১ম—১৫৯-৬০]।

১৮৯১, ফেব্রুয়ারির গোড়ায় স্বামীজী আলোয়ারে গিয়ে বাঙালী ডাক্তার গুরুচরণ লস্করের বাড়িতে আছেন, সেখানে তাঁর কাছে এলেন স্থানীয় হাইস্কুলের ফার্সী-শিক্ষক জনৈক মৌলবী। তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর গভীর সম্প্রীতি স্থাপিত হল, এবং ধর্মবিষয়ে নানা আলাপ-আলোচনাও হল। স্বামীজী কোরান-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "কোরানের একটি বিশেষত্ব, আজ পর্যন্ত এর উপরে কেউ কলম চালাতে পারেনি। ১১০০ বছর আগে তা যেমন ছিল, আজও ঠিক সেইভাবে আছে, একটিও নতুন কথা বসেনি। প্রাচীন পুস্তকের এমন বিশুদ্ধতা রক্ষা বড় দেখতে পাওয়া যায় না।"

স্বামীজীর জীবনীতে পাই, মুগ্ধ মৌলবী সাহেবের বন্ধুরা দলে-দলে এসেছিলেন স্বামীজীর দর্শনে। এর কিছুদিন পরে স্বামীজী যখন পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাড়িতে আছেন, তখন মৌলবী-সাহেব বিশেষ বিনয়ের সঙ্গে স্বামীজীকে নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে

আহার করাবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, হিন্দু-আচার পুরো বজায় রেখেই খাদ্যাদি প্রস্তুত করাবেন। বলাবাহুল্য স্বামীজীর কাছে ঐ প্রতিশ্রুতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তিনি মৌলবী-সাহেবের আতিথ্য নিয়েছিলেন—তারপরে আরো কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়িতেও। [বসু, ১ম—১৭৩-৭৪, ১৭৮-৭৯]।

আলোয়ারে পণ্ডিত শম্ভুনাথজী খুব উদারভাবে স্বামীজীর মৌলবী-ভবনে ভোজন-ব্যাপারকে গ্রহণ করেছিলেন। তা কিন্তু করতে পারেন নি খেতড়ি-রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্‌শি জগমোহন লাল। ১৮৯১ এপ্রিলে স্বামীজী আবু পাহাড়ে গিয়ে এক গুহাতে থেকে তপস্যাদি করছিলেন। ঐকালে "জনৈক দেশীয় রাজার উকিল এক মুসলমান ভদ্রলোক" তাঁকে দেখে আকৃষ্ট হন, এবং আলাপে তাঁর গুণপনা বুঝতে পারেন। তিনি স্বামীজীকে উক্ত গুহা থেকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। সেইসঙ্গে যোগ করে দেন —"কিন্তু মনে রাখবেন, আমি মুসলমান। আমি অবশ্য আপনার আহারের আলাদা বন্দোবস্ত করে দেব।" শেষোক্ত প্রতিশ্রুতির দিকে কান না দিয়ে স্বামীজী ওঁর বাড়িতে চলে যান এবং সেখানে তাঁর কাছে যথারীতি লোকসমাগম হতে থাকে। অন্যতম আগন্তুক মুন্‌শি জগমোহন। তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন : "আপনি তো হিন্দু-সাধু, আপনি মুসলমানের বাড়িতে আছেন কি করে? আপনার খাদ্য হয়ত কখনো-সখনো ছুঁয়েই ফেলল!" সেকথা শুনে স্বামীজী এই ঝলসানো উত্তর দেন :

"আপনি বলছেন কি? আমি তো সন্ন্যাসী, আপনাদের সমস্ত বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। আমি ভাঙ্গীর (মেথরের) সঙ্গে পর্যন্ত খেতে পারি। ভগবান অপরাধ নেবেন, সে ভয় আমার নেই, কেননা এটা ভগবানের অনুমোদিত। শাস্ত্রের দিক থেকেও ভয় নেই, কেননা শাস্ত্রে এটা অনুমোদিত। তবে আপনাদের এবং আপনাদের সমাজের ভয় আছে বটে। আপনারা তো ভগবান আর শাস্ত্রের ধারেন না। আমি দেখি, বিশ্বপ্রপঞ্চের সর্বত্র ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন। আমার দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচ নেই। শিব! শিব!" [যুগনায়ক, ১ম, ৩২১-২২]

সর্বভূতে সত্যই ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ এই হিন্দু সন্ন্যাসী মসজিদেও যেতেন ঈশ্বরপ্রণামের জন্য। তিনি আমেদাবাদে গিয়েছিলেন মসজিদে ও সমাধিস্থলে [প্রমথ ১ম—২০০], আজমীরে গিয়েছিলেন বিখ্যাত ফকির চিস্তি-সাহেবের সমাধিক্ষেত্রে শ্রদ্ধা জানাতে। [ঐ, ১৯২]। এমন উদার মানুষের কাছে স্বতঃই মুসলমানেরা এসে হাজির হতেন। বরাহনগর-মঠে থাকাকালে, সন্ন্যাসজীবনের প্রথম পর্যায়েই, "ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এরূপ দৃঢ় ছিল যে, অনেক সময় মুসলমান জাতীয় কোনো লোককে সম্মুখে দেখিবামাত্র শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিতেন। তাঁহার মনে হইত, সে ব্যক্তিও ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার একটি অঙ্গবিশেষ।" [ঐ, ১৩০]। পরে, মীরাটে এক শেঠজীর বাগানে যখন আছেন, স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর কাছে তাঁর পূর্বপরিচিত কাবুলের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আনেন। তিনি শ্রদ্ধাভরে প্রচুর মিষ্টান্ন এনেছিলেন স্বামীজীর জন্য। "স্বামীজী তাঁহার সহিত শ্বাতের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির আখুদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা" বলেছিলেন। [ঐ—১৬৯]। ইতিপূর্বে [১ম খণ্ড, ৮৭-৮৮] আমরা মহীশূরের প্রধানমন্ত্রী কে.পি পুত্তনা চেট্টিয়ার-এর স্মৃতিকথা থেকে দেখেছি, রাজসভাসদ আবদুল রহমান সাহেব কোরানের কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ মিটিয়ে নেবার জন্য স্বামীজীর কাছে গিয়েছিলেন। স্বামীজী সন্দেহ মেটাতে সমর্থ বুঝেই তিনি নিশ্চয় তাঁর কাছে যান। ১৮৯৩ ফেব্রুয়ারিতে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হায়দারাবাদে পৌঁছলে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন, সামসুলউলমা সৈয়দ আলী বেলগ্রামী, নবাব ইসাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব দুলো খাঁ বাহাদুর, নবাব ইমাদ নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দার নেওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর। হায়দারাবাদের প্রধান অমাত্যের সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাতের সংবাদ স্বামীজীর জীবনীতে এই প্রকার :

"[স্বামীজী গোলকুণ্ডা দুর্গ] হইতে ফিরিয়া দেখেন, হায়দাবাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ওমরাহ, হায়দারাধিপতির [অর্থাৎ নিজামের] শ্যালক নবাব-বাহাদুর স্যার খুরশেদ জা আমিরি-ই-কাবির কে-সি-এস-আই মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।...নবাব-সাহেব পরদিন প্রাতঃকালে স্বামীজীর দর্শন প্রার্থনা করিয়াছেন। তদনুসারে পরদিবস স্বামীজী...নবাব-সাহেবের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন।...নবাব-সাহেব স্বামীজীকে পরম সমাদরে স্বীয় আসনের পার্শ্বে বসাইলেন ও দুই ঘণ্টা ধরিয়া আলাপ করিলেন। তিনি সকল ধর্মের মধ্যে সারবস্তু গ্রহণ করিতেন এবং মুসলমান হইয়াও হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমুদয় হিন্দু তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলেন।...[আলোচনাকালে] তিনি নিজে নির্গুণতত্ত্বমাত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্মে যে, সগুণ বা পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের ধারণাও দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। স্বামীজী তদুত্তরে ঈশ্বর ধারণার ক্রমবিকাশ-প্রণালীর আলোচনা করিয়া দেখাইলেন—সগুণ ঈশ্বরের ধারণা শুধু যে, মনুষ্যবুদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা নহে, কিন্তু মানব—ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা হইতে উচ্চতর ধারণায় অসমর্থ। দেহাদিভাব দূর না হইলে নির্গুণ ধারণা মানুষের ঠিক-ঠিক হইতে পারে না।...তিনি দেখাইলেন...সব ধর্মই এক হিসাবে সত্য, কারণ বিভিন্ন ধর্মপ্রণালী বিভিন্ন আদর্শলাভেরই উপায়মাত্র।...বলিলেন, মনুষ্যই সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ মনুষ্যের আধ্যাত্মিক বুদ্ধির দ্বারাই বিশ্বের সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মনুষ্য সর্ববিধ ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডি ছাড়াইয়া আপনাকে দেবত্বে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বলিতে-বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বলাভা ধারণ করিল, এবং তাঁহার সর্ব অবয়বে একটা বিশেষ শক্তির আবির্ভাব লক্ষিত হইল।... নবাব-সাহেব মুগ্ধ হইয়া [গেলেন]।...[বিদায় লইয়া] স্বামীজী মক্কা মসজিদ, মারমিনার, ফলকনামা, বসীরবাব, নিজামের প্রাসাদাবলী ও অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থান দেখিতে গমন করিলেন। ১৩ই তারিখ [১৮৯৩] প্রাতঃকালে তিনি হায়দারাবাদের প্রধান অমাত্য স্যার আশমান জা, কে-সি-এস-আই [-এর সঙ্গে]...সাক্ষাৎ করিলেন।"

মুসলমান নবাব-বাহাদুরদের দ্বারা আপ্যায়িত এই হিন্দুসন্ন্যাসীর সহযাত্রী হয়েছিলেন ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ একজন মুসলমান পিয়ন। অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার তাঁর স্মৃতি-কথায় বলেছেন : "[স্বামীজী ১৮৯২ ডিসেম্বরে ত্রিবেন্দ্রামে] এলেন, একজন মুসলমান পথপ্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে।...প্রায় প্রথমেই তিনি তাঁর মুসলমান সঙ্গীর আহারের বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর এই সঙ্গী কোচিন স্টেট সার্ভিসের পিয়ন; সেখানকার দেওয়ানের সেক্রেটারি মিঃ ডবলিউ রামাইয়া...তাঁকে ত্রিবেন্দ্রামে পৌঁছে দেবার জন্য তাকে সঙ্গে দিয়েছেন। স্বামীজী নিজের জন্য কোনো পরিচয়পত্র নেননি, এবং ত্রিবেন্দ্রামে আসার আগে বা পরে নিজ স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ব্যবস্থাতেও রাজি ছিলেন না। পূর্ববর্তী গোটা দুইদিন স্বামীজী অল্প দুধ ছাড়া আর কিছু খান নি। যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ মুসলমান পিয়নটির খাওয়া হয়েছে, এবং সে বিদায় নিয়েছে, ততক্ষণ স্বামীজী নিজের বিষয়ে কোনো নজর দেবার কথা ভাবতেই পারেন নি।"

এইসব ঘটনার কয়েক বৎসর পরে পাশ্চাত্ত্য-প্রত্যাগত বিবেকানন্দ মাদ্রাজে 'অন্নদান সমাজম'-এ বক্তৃতাকালে সংকীর্ণচিত্ত মালাবারের লোকদের ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন—[দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৭৩]—সকলে তাঁকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করতে উৎসাহী ছিল, কিন্তু কেউ তাঁর মুসলমান সঙ্গীকে খাওয়াতে রাজি হয়নি।

স্বামীজী কদাপি গোপন করেন নি, তিনি মুসলমানের হাতে খান। জি এস ভাট তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, বেলগাঁওয়ে (১৮৯২) থাকাকালে "স্বামীজীকে যখন জিজ্ঞাসা করা

হয়, তিনি অ-হিন্দুদের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করবেন কি-না, তিনি বলেন, বস্তুতঃপক্ষে বেশ কয়েকবারই তাঁকে মুসলমানদের দেওয়া খাবার খেতে হয়েছে।"

প্রব্রজ্যাকালেই স্বামীজী (১৮৮৯, ডিসেম্বর) এলাহাবাদে "একজন মুসলমান ফকির-বেশী মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলেন। সে ব্যক্তির মুখের প্রত্যেক রেখাটি যেন বলিয়া দিতে-ছিল—ইনি পরমহংস। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামীজী শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' হইতে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন : দিগম্বরো বাপি সাম্বরো বা, ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ। উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা, পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম'।" [প্রমথ, ১ম, ১৫১]।

স্বামীজী এক মুসলমান ফকিরকে পরমহংস রূপে দেখলেন, আর তাঁর প্রথম শিষ্য তাঁকে দেখলেন—"সুফীদিগের বর্ণিত প্রেমের জীবন্ত আদর্শরূপে।" এই প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দের পরিচয় আগেই পেয়েছি [৪র্থ, ১২০-৩৪]। তিনি, বাল্যকালে জৌনপুরে মুসলমান বন্ধুদের কাছে সুফীদের ধর্মশাস্ত্র পড়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হন, স্বামীজীর মধ্যে তাঁর কল্পনার প্রেমকে মূর্ত দেখে তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছিলেন। স্বামীজী, সদানন্দের সঙ্গে সুফী কবিতার রসে মশগুল হয়ে থাকতেন।

অখ্যাত পরিব্রাজকের কথা থাক, তখন তিনি কী করলেন, কে তার খবর রাখে? কিন্তু যখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি, ভারতে ফিরেছেন, অভ্যর্থিত হয়েছেন নব শঙ্করাচার্যরূপে, কিন্তু অভিনন্দনের বন্যা সরে যাবার পরে রক্ষণশীলেরা তাঁকে আক্রমণে জোটবদ্ধ হয়েছে, সহস্রচক্ষু হয়ে আচারগত দোষসন্ধান করছে, যার সামনে অতিবড় সাহসী মানুষও গুটিয়ে যাবে—তখন আলোচ্য ব্যাপারে তাঁর আচরণ কী ছিল, সে-সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দেওয়া যাক।

"১৮৯৮, ১৪ জুন।...পঞ্জাবে প্রবেশের কালে একটি স্টেশনে তিনি এক মুসলমান খাবারওয়ালাকে ডেকে তার হাত থেকে খাবার কিনে খেলেন।" ['হিমালয়ে', নিবেদিতা, ৫৯]। একই কাজ তিনি করেছিলেন কাশীতে—শেষ কাশী ভ্রমণের সময়ে। ['দেখিয়াছি', ৯৫]।

মুসলমানদের প্রতি স্বামীজীর গভীর ভালবাসা হিন্দুসাধুদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। "[অমরনাথ তীর্থযাত্রাকালে] অনেকে মুসলমানধর্মের প্রতি স্বামীজীর প্রেম ও সহানুভূতির অর্থ বুঝিতে পারিতেন না,...কেননা প্রত্যক্ষতঃ হিন্দু ও মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহাদের যুক্তি, পঞ্জাবের মৃত্তিকা নিজ ধর্মবিশ্বাসীর রক্তে সিক্ত।...এই সকল উত্তপ্ত বাদপ্রতিবাদের কালে আমাদের [নিবেদিতাদির] বিদেশী বুদ্ধি একটি বিচিত্র অসংলগ্নতা দেখিয়া আমোদবোধ না করিয়া পারে নাই, তাহা হইল—এই যাত্রার তহশীলদার স্বয়ং এবং আরও বহু কর্মচারী ও ভৃত্য ধর্মে মুসলমান—গুহায় উপস্থিত হইবার পরে তাহার ভিতরে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে ইঁহাদের প্রবেশে কোনো আপত্তির কথা স্বপ্নেও কাহারও মনে উপস্থিত হয় নাই।" ['নিবেদিতা লোকমাতা ১ম, ৩৬]।

ইসলামের প্রতি সবিশেষ প্রীতিসম্পন্ন নিবেদিতা পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতি স্বামীজীর প্রগাঢ় ভালবাসায় বিস্মিত হয়ে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। স্বামীজী নিবেদিতার প্রশ্ন ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি, ভেবেছিলেন, নিবেদিতা বুঝি এ-ব্যাপারে তাঁর দোষ দেখিয়ে দিচ্ছেন (যা অবশ্য সত্য নয়)। স্বামীজী উত্তরে বলেছিলেন, "কি জানো, আমি আমার মুসলমানদের ভালবাসি।" ['দেখিয়াছি', ২৩৮-৩৯]

এই ভালবাসা অনেক মুসলমানকে তাঁর কাছে টেনে এনেছিল। নিবেদিতা লিখেছেন, "সকল ধর্মের লোকের ভিতরই, মুসলমানগণের ভিতরও, স্বামীজীর শিষ্য ছিল।" [ঐ—২৪৮]। "[অমরনাথ-পথের] তহশীলদারজী ও তাঁর কতিপয় বন্ধু স্বামীজীর নিকট যথাবিধি শিষ্যত্ব নেবার জন্য এসেছিলেন।" [ঐ—১২৪]।

এবং নিবেদিতা স্বামীজীর দলের সঙ্গে নৈনিতালে অবস্থানকালে (১৮৯৮, মে) পরম মধুময় একটি ক্ষণকে লাভ করেছিলেন, যখন জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে বলতে শুনে-

ছিলেন : "স্বামীজী, যদি ভবিষ্যতে কেউ আপনাকে অবতার বলে দাবি করে, স্মরণ রাখবেন, আমি মুসলমান হয়েও তাঁদের সকলের অগ্রণী।" ['হিমালয়ে', ১৪]

যথার্থ ধর্মবোধ মানুষকে সর্বসংস্কারমুক্ত চেতনার কোন্ ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত করে—তার আর দুটি দৃষ্টান্ত দেব। প্রথম ঘটনাটি শ্রীনগর উপত্যকার। ১৮৯৮, ২১ জুন, স্বামীজী সদলবলে কাশ্মীর উপত্যকায় পেঁৗছেছেন। তারপর, নিবেদিতা লিখেছেন :

"তাঁহার সহিত আমরা নিকটের গোলাবাড়িতে প্রবেশ করিলাম। সেখানে দেখিলাম, গাছের তলায় এক অসাধারণ সুন্দরী বর্ষীয়সী মহিলা বসিয়া আছেন। তাঁহার মাথায় কাশ্মীরী নারীসুলভ গাঢ় লালরঙের টুপি, তদুপরি শ্বেত অবগুণ্ঠন। তিনি বসিয়া পশমের সুতা কাটিতেছিলেন, এবং চারিপাশে বসিয়া তাঁহার দুই পুত্রবধূ ও তাহাদের পুত্রকন্যারা তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। স্বামীজী পূর্ববর্তী শরৎকালে এই গোলাবাড়িতে একবার আসিয়াছিলেন, এবং পরে বারবার এই মহিলার স্বধর্মে বিশ্বাস ও গৌরবানুভূতির কথা বলিয়াছিলেন। তিনি সেবার তাঁহার কাছে জল খাইতে চাহিলে মহিলা তৎক্ষণাৎ তাহা দেন। বিদায় লইবার কালে স্বামীজী তাঁহাকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, আপনার ধর্ম কী?' গর্ব ও উল্লাসের ঝঙ্কারিত কণ্ঠে বৃদ্ধা বলেন, 'আল্লার দয়ায় আমি মুসলমানী!' এখন সমগ্র পরিবার তাঁহাকে পুরাতন বন্ধুরূপে গ্রহণ করিল, এবং তিনি যে-সকল সঙ্গীসহ আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি সর্বপ্রকার সৌজন্য প্রকাশে ব্যাপৃত রহিল।" ['হিমালয়ে', ৬৯-৭০]।

অমরনাথ থেকে স্বামীজী শ্রীনগরে ফিরেছেন। অমরনাথযাত্রী সাধুদের বিনীত অনুরোধে তিনি মুসলমান পাচক না রেখে ব্রাহ্মণ পাচক রেখেছেন। প্রতিবাদে তিনি অনমনীয়, তবে অনুরোধে ধরা দেন, বিশেষতঃ অস্বীকারে যদি অযথা মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করা হয়। সাধুরা জানতেন, স্বামীজী মুসলমানদের হাতে খান। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, তা করবার শক্তি স্বামীজীর আছে। কিন্তু তাঁদের আবেদন, ঐ কাজে স্বামীজী যেন এখানে অন্ততঃ বিরত থাকেন। সে অনুরোধ রক্ষা করার পরে, স্বামীজী এমন একটি কাজ করেছিলেন, যা উক্ত ঘটনার বিরাশি বছর পরে নিতান্ত বর্তমানেও অত্যন্ত উদারদৃষ্টি হিন্দুকে চমৎকৃত করবে।

স্বামীজী, যে নৌকায় থাকতেন, তার মুসলমান মাঝির শিশু কন্যাটিকে উমা রূপে পূজা করেছিলেন!!

ঘটনাটির উল্লেখ করার পরে, স্বামীজীর সম্বন্ধে সর্বোত্তম যে-সব বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, তার একটিকে এখানে স্মরণ করতে পারি :

"বিবেকানন্দ যদি বন্ধনের অপনোদক না হন—তাহলে তিনি আর কী হলেন!"

"Vivekananda is nothing," exclaimed one of his admirers in the distant West, "if not a breaker of bondage!" [*Wanderings*, 55]

অনেকেরই হয়ত জানা নেই, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে কলকাতা টাউনহলে ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ তারিখে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় এক শিক্ষিত মুসলমান যুবক বক্তৃতা করেছিলেন—তাঁর নাম আবদুল সত্তার। দেশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করা যে-সভায় সমবেত, সেখানে তিনি, বয়সে তরুণ এবং জাতিতে মুসলমান হয়ে, কেন বক্তৃতা করতে উঠেছেন, তার কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করেছিলেন। "কিছু-কিছু লোকের কানে শুনতে উদ্ভট ঠেকবে, এক মুসলমান স্বামী বিবেকানন্দের শোকসভায় অশ্রুবিসর্জন করা কর্তব্য বিবেচনা ক'রে উপস্থিত হয়েছে," সত্তার-সাহেব বলেছিলেন। এমন করার একটা ব্যক্তিগত কারণ তিনি দেখান : "আমি এবং আমার মতো যারা অন্ততঃ একবারও তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, তারা একথা না ভেবে পারবে না—তাদের বড় প্রিয়, একেবারে প্রাণের একজন মানুষ,

চলে গেছেন। তিনি শেষবার যখন ঢাকায় যান [স্বামীজী মাত্র একবারই ঢাকায় গিয়েছেন], তখন আমি সেই কিছুসংখ্যক ভাগ্যবানের একজন, যারা দু'কান ভরে তাঁর মুখে পবিত্র ধর্মপ্রসঙ্গ শুনেছে, এবং সতৃষ্ণ নয়ন মেলে দেখেছে তাঁর অপূর্ব দেহসৌন্দর্য।" গভীর বিষাদের সঙ্গে আবদুল সত্তার বলেছিলেন—স্বামীজী নেই, মনে হচ্ছে, শুকিয়ে গেছে জীবনের তৃষ্ণাবারি।

জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে স্বামীজীর দেহত্যাগে কোন্ ক্ষতি হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

"গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আমি বলতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষতির কারণ নয়, তা মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে বেদনাদায়ক ক্ষতি।...হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়কে আমি ভারতমাতার, বহু বীরপ্রসবিনী ভারতমাতার, যমজ সন্তান মনে করি। এক সম্প্রদায়ের গর্ব ও গৌরবের কারণ যে-মানুষ, তিনি অপর সম্প্রদায়েরও গর্ব ও গৌরবের কারণ। সুতরাং স্বামীজীর দেহত্যাগে সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে যে-বিপর্যয় ঘটল, আমরা সকলেই তার অংশ গ্রহণ করি।...হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যদি মতভেদ বা সংঘাত ঘটে, তা হবে সমগ্র জাতির স্বার্থের পক্ষে আত্মঘাতী।...[এক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের আলোকপ্রাপ্ত নেতৃগণকে] সাম্প্রদায়িক বিভেদের ক্ষেত্রে সংযোজকের ভূমিকা নিতে হবে। তাই স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের ফলে, আমি মনে করি, উভয় সম্প্রদায়কে যেসব স্বর্ণশৃঙ্খল বেঁধে রেখেছে, তাদের একটি ছিন্ন হয়ে গেল।" [মিরার, ৮ অক্টোবর, ১৯০২]।

ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসাবে সত্তার-সাহেব স্বামীজীর উদ্দেশে আর একটি বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন :

'আন্তর্জাতিক মানুষ হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ—যে দেশে আমাদের মরুনিবাসী মহান প্রফেটকে সম্পূর্ণ সমাদর করা হয়না—সেখানে তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় মহম্মদের মহিমার পক্ষে বক্তৃতা করেছিলেন, বিরূপ পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে—আবদুল সত্তার ঐকালে কিভাবে তা জেনেছিলেন, তা বলতে পারব না। ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০, ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা শেক্সপীয়ার-সমিতিতে "জগতের মহত্তম আচার্যগণ" নামক বক্তৃতায় মহম্মদ-প্রসঙ্গে স্বামীজী কিছু বলেন। এবং ২৫ মার্চ, ১৯০০, সানফ্রানসিসকোর বে-অঞ্চলে 'মহম্মদ' এই নামেই বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলি ১৯০২ সালের মধ্যে সাধারণের কাছে পরিজ্ঞাত হয়ে গিয়েছিল কি-না ঠিক বলতে পারব না। এর মধ্যে শেষোক্ত বক্তৃতাটি বহু পরে প্রকাশিত হয়, তাতে সন্দেহ নেই। যাইহোক, বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে, শ্রোতাদের অনেকেই বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, যাঁরা মহম্মদের চরিত্রমহিমা অনুধাবন করতে সবিশেষ অনিচ্ছুক।

প্রথম বক্তৃতায় মহম্মদ-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন :

"তাহার পর আমাদের দৃষ্টি সেই মহাপুরুষ মহম্মদের দিকে নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্যবাদের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারো : 'মহম্মদের ধর্মে আবার ভালো কি থাকিতে পারে?' নিশ্চয় তাঁহার ধর্মে ভালো আছে—যদি না থাকিত, তবে উহা এতদিন বাঁচিয়া আছে কিরূপে? যাহা ভালো, তাহাই স্থায়ী হয়। ..এই পৃথিবীতে অপবিত্র ব্যক্তির জীবন কতদিন? পবিত্রচিত্ত সাধুর প্রভাব কি তাহা অপেক্ষা বেশি নয়? নিশ্চয় বেশি। কারণ পবিত্রতাই শক্তি—সাধুতাই শক্তি।...মুসলমান-ধর্মে যথেষ্ট ভালো জিনিস আছে। মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য। তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব—সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের—প্রচারক, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ।...মহম্মদ নিজ জীবনের দ্বারা দেখাইয়া গেলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে...বিভিন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গভেদ, কিছু থাকিবে না। তুরস্কের সুলতান, আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে কিনিয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া

তুরস্কে আনিতে পারেন; কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়, আর যদি তাহার উপযুক্ত গুণ থাকে, তবে সে সুলতানের কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। মুসলমানদের এই উদারভাবের সহিত এদেশে [আমেরিকায়] নিগ্রো ও রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তুলনা করিয়া দেখো। আর, হিন্দুরা কি করিয়া থাকে? যদি তোমাদের দেশের কোনো মিশনারি হঠাৎ কোনো গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুঁইয়া ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিবে।...অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় এইখানে মুসলমানদের মহত্ত্ব—জাতি বা বর্ণ বিচার না করিয়া সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করা।" [৮—৩০৫-৬]।

দ্বিতীয় বক্তৃতার পিছনে একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। লুই বার্ক তাঁর 'সেকেণ্ড ভিজিট' গ্রন্থে (৩৬৫-৬৯) সে সংবাদ দিয়েছেন। উক্ত ২৫ মার্চ, ১৯০০ তারিখের বক্তৃতার বিষয়বস্তু—"শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী"—এইভাবে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। টমাস জে অ্যালান স্মৃতিকথায় বলেছেন—স্বামীজী শেষ মুহূর্তে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেন এবং "মহম্মদ ও তাঁর বাণী"—এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অ্যালান সবিস্ময়ে দেখেন, স্বামীজী বিনা প্রস্তুতিতে বলতে শুরু করেও মূল ঘটনাগুলির সন-তারিখ পর্যন্ত বলে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা বিস্ময়কর ছিল এইজন্য যে, মহম্মদ প্রসঙ্গে আসবার আগে স্বামীজী কোন্ পটভূমিকায় জগতে নব ধর্ম ও ধর্মাচার্যের আবির্ভাব হয়, তা বিস্তারিত বলেছিলেন—বিশ্বইতিহাসের আকাশপটে তাঁর সেই বিশাল জ্ঞানের পক্ষবিস্তার—দর্শকের পক্ষে রীতিমতো শ্বাসরোধী দর্শন। দুঃখের বিষয়, ঐ বক্তৃতা যথাযথ তুলে নেবার মতো কোনো নিপুণ সংকেতলিপিকর ছিল না। [হায়, গুডউইন তখন মৃত! এক্ষেত্রে শিক্ষানবিশী শ্রীমতী এডিথ অ্যালান অপটু হস্তে যা লিখে রাখেন, দীর্ঘদিন পরে তার থেকে অল্পবিস্তর পাঠোদ্ধার ক'রে পরিবেশন করা সম্ভব হয়েছে।] ভূমিকারূপে স্বামীজী বলেছিলেন, প্রত্যেক বার্তাবহ নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য, —তাঁরা বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি। এ জগতে কার্যহীন কারণ, কারণহীন কার্য হওয়া সম্ভব নয়। সভ্যতার বিস্তারের ক্ষেত্রে, মানসিক শক্তির সঙ্গে দৈহিক শক্তির সম্পর্কের কথা স্বামীজী তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে বন্য যাযাবর জাতির ভূমিকাকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি। তারা যখন কোনো সভ্য জাতিকে পরাভূত করে, তখন তারা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে মস্তিষ্ক আর দান করে সতেজ রক্ত। এইভাবে সভ্যতা এগিয়ে চলে।

পৃথিবীর ইতিহাসের ঘূর্ণিঝড়ের নানা কাহিনী বলার পরে স্বামীজী এসেছিলেন মহম্মদ প্রসঙ্গে : "এই বিশৃঙ্খল আলোড়নের মধ্যে আবির্ভূত হলেন প্রফেট মহম্মদ।" স্বামীজী বক্তৃতার মধ্যে মহম্মদের জীবনের ঘটনাবলীর সারসংক্ষেপ করেন; কিভাবে সংস্বভাব প্রিয়দর্শন এক যুবক, জীবনের গভীরতর দিকের প্রতি আকৃষ্ট হন, সেই কাহিনী। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ যে-ধনবতী বিধবা মহিলাকে যুবক মহম্মদ প্রথমে বিয়ে করেন, তাঁর প্রতি মহম্মদের ঐকান্তিক ভালবাসার বিশেষ উল্লেখ স্বামীজী করেছিলেন। পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তারের পরে, যখন মহম্মদ একাধিক পত্নী গ্রহণ করেছেন, তখনো তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হল, কোন্ পত্নী তাঁর সর্বাধিক প্রিয়, তিনি প্রথমা পত্নীর নামই করেছিলেন, কারণ "তিনিই আমাকে প্রথম বিশ্বাস করেন।"

মহম্মদের বহুবিবাহ পাশ্চাত্ত্যজগতে বিশেষ সমালোচিত। স্বামীজী উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যেও এ-বিষয়ে আপত্তির গুঞ্জন শুনেছিলেন। কঠোর ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন, "আপনারা খুবই গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের বশবর্তী। এই বার্তাবহরা যদি-না ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেন, কিভাবে এত মহান হলেন? আপনারা কেবল ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করতে চান।... দুর্জনেরা সদাই দোষত্রুটি খোঁজে।...মক্ষিকাবৃত্তি অনুসরণ করবেন না, মধুমক্ষিকার পথ ধরুন।...পরবর্তী জীবনে মহম্মদ অনেক পত্নী গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মতো

মহাপুরুষ দুশো পত্নী গ্রহণ করতে পারেন। উল্টোদিকে আপনাদের মতো ভূতকে মাত্র একটা পত্নী গ্রহণ করতেও অনুমতি দেওয়া যায় না। মহাপুরুষদের চরিত্র রহস্যাবৃত, তাঁদের কার্য-ধারা দুর্জ্ঞেয়। তাঁদের বিচার করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে অনুচিত। খ্রীস্টই মহম্মদেব বিচার করতে সমর্থ—আপনি আমি কে?—শিশুমাত্র! এইসকল মহাপুরুষকে কী বুঝব!"

মহম্মদের নির্জন তপস্যা ও শক্তিলাভের কথা স্বামীজী তুলেছিলেন : "মহৎ কাজ করতে গেলে বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন।...দিবারাত্র প্রার্থনার পরে মহম্মদ অনেক কিছু দর্শন করতে থাকেন। জিব্রাইল স্বপ্নে আবিভূত হয়ে মহম্মদকে বলেন, তিনি সত্যের বার্তাবহ।...খ্রীস্টানরা তখন যীশুর নামে রাজনীতি, ও পারসিকরা দ্বৈতভাব প্রচার কর-ছিলেন; তা দেখে মহম্মদ বললেন, 'আমাদের ঈশ্বর এক। যা-কিছু আছে সব-কিছুরই প্রভু তিনি।'...ঈশ্বর ঈশ্বরই। এখানে কোনো দার্শনিকতা বা নীতিশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব নেই। 'আমাদের আল্লা এক ও অদ্বিতীয়, এবং মহম্মদই তাঁর রসুল'—মক্কার রাস্তায়-রাস্তায় মহম্মদ প্রচার করতে লাগলেন।...মক্কার লোকেরা তাঁকে নির্যাতন করতে আরম্ভ করলে তিনি মদিনায় পালিয়ে গেলেন; যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, এবং সমগ্র আরবজাতি ঐক্যবদ্ধ হল। আল্লার নামে মহম্মদের ধর্ম জগৎ প্লাবিত করল।...জনসাধারণের জন্য বার্তারূপে আবিভূত হল তাঁর ধর্ম। তাঁর প্রথম বাণী—সাম্য।...একমাত্র ধর্ম—প্রেম। জাতি, বর্ণ বা অন্য কিছুর প্রশ্ন নেই। এই সাম্যভাবে যোগ দাও। সেই বাস্তবায়িত সাম্যই জয়যুক্ত হল।...সেই মহতী বাণী খুবই সহজ সরল : স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা যে এক ঈশ্বর—তাঁতে বিশ্বাসী হও। তিনি শূন্য থেকে সর্বকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করো না।"

এই বক্তৃতাতে স্বামীজী আচারের ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্মের নির্মম সরলতার কথা বলে-ছিলেন : "মসজিদগুলিতে...সঙ্গীত, চিত্র, প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ। এককোণে একটি বেদী, তার উপরে কোরান রক্ষিত। সব লোক সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো পুরোহিত, যাজক বা বিশপ নেই।...যে নমাজ পড়ে, সেও শ্রোতৃমণ্ডলীর একপাশে দণ্ডায়মান থাকবে।"২০

স্বামীজী নানাদিক দিয়ে মুসলমানধর্ম সম্বন্ধে প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করতে চেয়েছেন। তার একটি—মুসলমানধর্মের মতে নাকি নারীর আত্মা নেই। স্বামীজী লণ্ডনে এক আলোচনাসভায় বলেন, "এই প্রকার যে-উক্তি আমাদের কাছে করা হয়েছে, তা ভ্রান্ত। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, খ্রীস্টানদের মধ্যে এই ভ্রান্তি বহুদিনের, এবং তাঁরা এই ভ্রমটি ধরে রাখা পছন্দ করেন। মানুষের এই অদ্ভুত স্বভাব—সে যাকে পছন্দ করে না, তার সম্বন্ধে খুব খারাপ কিছু প্রচার করতে উৎসুক।" স্বামীজী যোগ করে দেন : "আমি মুসলমান নই, কিন্তু ঐ ধর্ম অনুশীলনের সুযোগ আমার হয়েছে। আমি দেখেছি, কোরানে এমন একটি উক্তিও নেই যার অর্থ নারীর আত্মা নেই। বস্তুতঃ কোরান বলে, নারীর আত্মা আছে।" [৩—৪১৭]

বিশ্ব-ইতিহাসের পটে ইসলামকে উপস্থিত করার সময়ে তার শক্তির রূপকে স্বামীজী বারে বারে দেখাতে চেয়েছেন। ধর্মোন্মাদনার প্রচণ্ড শক্তিবন্যার আকার তাঁর বিশাল কল্পনাকে

২০ আনুষ্ঠানিকতা বর্জনের ব্যাপারে প্রোটেস্টান্টরা যে অগ্রাধিকার দাবি করে, স্বামীজী তাকে স্বীকার করতে গররাজি ছিলেন। এক্ষেত্রে ইসলামের কৃতিত্বই তাঁর কাছে অধিক স্বীকার্য ছিল :

"পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করে দেওয়া—সেটা মুসলমানধর্মই একমাত্র করেছে। প্রার্থনার ব্যাপারে যিনি নেতৃত্বে করেন, প্রার্থনাকারীদের দিকে তাঁর পিছন ফিরানো থাকে, এবং বেদী থেকে একমাত্র কোরানই পাঠ করা চলতে পারে। প্রোটেস্টান্টধর্ম এই ভাবটিই আনবার চেষ্টা করেছে।"

আলোড়িত করত।২১ তাই বলে তিনি তার নিষ্ঠুর রক্তপাতের দিকটির বিষয়ে অসচেতন ছিলেন না। বলেছিলেন :

"খ্রীস্টধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য, খ্রীস্টের ন্যায় নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যরা এত নরহত্যা করেছে! বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীস্টধর্ম—জগতে এই তিনটিই প্রচারশীল ধর্ম। এদের পূর্ববর্তী তিনটি ধর্ম—হিন্দু, ইহুদী, জরথুষ্ট্র (পারসিক) ধর্ম অপরকে ধর্মান্তরিত ক'রে দলপুষ্টির চেষ্টা করেনি। বৌদ্ধরা নরহত্যা করেনি। তারা কোমল ব্যবহারের দ্বারাই জগতের তিন-চতুর্থাংশ লোককে নিজ মতে এনেছিল।" [৪-২৫০]

"[আমরা সত্যের একমাত্র অধিকারী, এই দাবির ক্ষেত্রে] মুসলমানেরা সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপ তরবারির সাহায্যে। তাদের এক হাতে ছিল কোরান, অন্য হাতে তরবারি—হয় কোরান গ্রহণ করো, নয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করো। ইতিহাস-পাঠকমাত্রে তাদের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা জানেন। ছশো বছর ধরে কেউ তাদের গতিরোধ করতে পারেনি। কিন্তু তার পরে এমন সময় এলো, যখন তাদের অভিযান থামাতে হল। অপর কোনো ধর্ম যদি ঐ পন্থা নেয়, তাদেরও একই দশা হবে।" [৩-১৮৬-৮৭]

মুসলমানেরা বাহ্যপুজার বিরোধিতা করেও কিভাবে তার কাছে অল্পবিস্তর আত্ম-সমর্পণ করেছিল, তাও স্বামীজীর চোখ এড়ায়নি।২২

কিন্তু স্বামীজীর সাহসিক সত্যদর্শন এদেশের ইংরাজি-শিক্ষা-নিয়ন্ত্রিত ইতিহাসবোধ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে কতখানি পৃথক ছিল তা দেখা যায়, তরবারিযোগে খ্রীস্টানদের ধর্মপ্রচার ও তরবারিযোগে মুসলমানদের ধর্মপ্রচারের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে। প্রচারশীল খ্রীস্টান-ধর্মের নিতান্ত সংকীর্ণতার পাশে প্রচারশীল ইসলামের আপেক্ষিক উদারতার দিকটি স্বামীজী তীক্ষ্নভাবে তুলে ধরেছেন। বিস্ময়কর সেই রচনাটি এই :

"ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী ক্ষিপ্র সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে ক্রিশ্চানধর্মের প্রথম তিন শতাব্দীর তুলনা করো। ক্রিশ্চানধর্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎসমক্ষে আপনাকে পরিচিত করতেও সমর্থ হয়নি; এবং যখন কনস্টানটাইনের তলোয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান দিলে, সেদিন থেকে কোন্ কালে ক্রিশ্চানীধর্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতাবিস্তারের [ক্ষেত্রে] কোন্ সাহায্য করেছে? যে-ইউরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সচলা, ক্রিশ্চানধর্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন্ বৈজ্ঞানিক কোন্ কালে ক্রিশ্চানী ধর্মের অনুমোদিত? ক্রিশ্চানী সংঘের সাহিত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিজ্ঞানের, শিল্প বা পণ্যকৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে? আজ পর্যন্ত চার্চ, প্রোফেন-সাহিত্য [ধর্ম ভিন্ন অন্য বিষয়াবলম্বনে লেখা সাহিত্য] প্রচারে অনুমতি দেন না। আজ, যে-মনুষ্যের বিদ্যা ও

---

২১ ভগিনী নিবেদিতা ইউরোপ যাত্রাকালে জাহাজে স্বামীজীকে নানা ভাবাবেশে দেখেছেন। তারই একটি রূপ :

"জিব্রালটার প্রণালীর মধ্য দিয়া যাইবার সময়, আমি প্রাতঃকালে ডেকের উপর আসিতেই তিনি আমাকে এই বলিয়া সাগ্রহে সম্ভাষণ করিলেন : 'তুমি তাদের দেখেছ কি? তাদের দেখেছ কি? ওখানে জাহাজ থেকে নামছে, আর দীন! দীন! রবে গগন বিদীর্ণ করছে।' এই বলিয়া অর্ধঘণ্টা ধরিয়া তিনি মুরদিগের বারংবার স্পেন আক্রমণের জ্বলন্ত বর্ণনা দ্বারা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন।" ['দেখিয়াছি', ২০২]

২২ "মুসলমান ধর্ম যেভাবে বাহ্যপুজার বিরোধিতা করেছে, পৃথিবীতে অন্য কোনো ধর্ম তা করেনি।...চিত্র, স্থাপত্য বা সঙ্গীত, মুসলমানদের মধ্যে থাকতে পারবে না, কেননা ঐগুলি বাহ্য-পুজার সহায়ক। জনসাধারণের সঙ্গে পুরোহিতদের যোগাযোগ হবে না, হলেই পার্থক্যের সৃষ্টি হবে।...কিন্তু তবু পয়গম্বরের দেহত্যাগের পর দুই শতাব্দী যেতে না যেতে সাধু-সন্তের পুজা প্রবর্তিত হল।—এইখানে সাধুর পায়ের আঙুল!—ঐখানে তাঁর গাত্রচর্ম!—এইভাবে চলতে লাগল।" [৪—৩৫১]।

বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে, তার কি অকপট ক্রিশ্চান হওয়া সম্ভব? নিউ টেস্টামেণ্ট-এ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। ইউরোপের সর্বপ্রধান মনীষিগণ—ভলটেয়ার, ডারউইন, বুক্নার, ফ্লমারিয়ঁ, ভিক্টর হুগো-কুল—বর্তমানকালে ক্রিশ্চানী দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত; অপরদিকে এইসকল পুরুষকে ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এইসকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইঁহাদের পয়গম্বর-বিশ্বাসের অভাব। ধর্মসকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষরূপে পরীক্ষিত হোক : দেখা যাবে, ইসলাম যেথায় গিয়েছে সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সেসব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান। ক্রিশ্চানধর্ম [অপরদিকে] কোথায় এমন কাজ দেখাতে পারে? স্পেনের আরাব, অস্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিম নিবাসীরা কোথায়? ক্রিশ্চানেরা ইউরোপী ইহুদীদের কি দশা এখন করছে? এক দানসংক্রান্ত কার্য-প্রণালী ছাড়া ইউরোপের আর কোনো কার্যপদ্ধতি গস্‌পেলের অনুমোদিত নয়—গস্‌পেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত। ইউরোপে যা-কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ক্রিশ্চানধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহদ্বারা। আজ যদি ইউরোপে ক্রিশ্চানীর শক্তি থাকত, তাহলে পাস্তের (Pasteur), কক (Koch)-এর ন্যায় বৈজ্ঞানিক-সকলকে জীবন্ত পোড়াত, আর ডারউইনকল্পদের শূলে দিত। 'সভ্যতা' এখন তার প্রাচীন শত্রু ক্রিশ্চানীর বিনাশের জন্য পাদরীকুলের উৎসাদনে—এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয় সকল কেড়ে নিতে—কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহলে ক্রিশ্চানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হত না, এবং সমূলে উৎপাটিত হত, কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই ক্রিশ্চানী ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু![২৩] এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা করো। মুসলমান-দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলামধর্মের উপরে সংস্থাপিত, এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকেরা সমস্ত রাজকর্মচারীদের [দ্বারা] বহুপূজিত, এবং অন্য ধর্মের শিক্ষকেরাও সম্মানিত।" [৬—২১২-১৩]।

স্বামীজী উদ্ধৃত অংশে খ্রীস্টানী সম্বন্ধে অতিরিক্ত কঠোর এবং মুসলমানধর্ম সম্বন্ধে অতিরিক্ত উদার হয়েছেন কি-না, সে বিতর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যকেই তুলে ধরতে চাইছি। যাইহোক আমাদের কাছে বেশি জরুরী বিষয়—ভারত-ইতিহাসে ইসলামের অভ্যুদয় ও পরবর্তী আধিপত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য কি ছিল দেখে নেওয়া।

ভারতবর্ষে ইসলাম—এই বিষয়ে স্বামীজীর মতামতকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে এক্ষেত্রে মুসলমানদের ভূমিকাকে দুভাগে ভাগ করে নেওয়ার দরকার হবে। এক, মুসলমান যখন বহিরাগত আক্রমণকারী; দুই, পরবর্তীকালে মুসলমান যখন ভারতে অবস্থানকারী। এমন ভাগ করে নেবার কারণ, অনেক সময়ে মুসলমানদের প্রথম ভূমিকা সম্বন্ধে মন্তব্যকে দ্বিতীয় ভূমিকার উপরে চাপাবার প্রবণতা দেখা যায়।

মুসলমানদের প্রথম ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব ঠিক তাই ছিল, যা রাজ্যলোভী বিদেশী আক্রমণকারীদের সম্বন্ধে দেশীয় মানুষের হয়ে থাকে। বহিরাগত রক্তলোভী, অর্থ-লোভী, মাংসলোভী সেইসকল বর্বর মানুষ সম্বন্ধে যদি কেউ মৃদু ভাষায় কথা বলে, তবে তার পিছনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ কতখানি বর্তমান, সে-প্রশ্ন স্বতঃই তোলা যায়।

২৩ স্বামীজী এখানে শ্রমজীবী-কেন্দ্রিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সংগঠিত ক্রিশ্চান-ধর্মের সংঘর্ষের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

স্বামীজী একাধিক জায়গায় বলেছেন, ব্যাপক ধর্মীয় নির্যাতন ভারত-ইতিহাসে মুসলমানেরাই আনে। "আপনারা জানেন, হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করেনি।...মুসলমানদের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতে ধর্মীয় মতের ক্ষেত্রে হত্যা, অত্যাচার প্রবেশ করেছে।" [৯-৪৩৯]। "মুসলমান আক্রমণতরঙ্গ ভারতে আসার আগে এদেশে ধর্মের জন্য নির্যাতন কী, তা কেউ জানত না। যখন বিদেশীরা এই নির্যাতন হিন্দুদের উপর আরম্ভ করল, তখনই হিন্দুদের এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা হল।" [৩—২১১]। প্রাচীন হিন্দুর যুদ্ধনীতির সঙ্গে আগন্তুক মুসলমানদের যুদ্ধনীতির পার্থক্য স্বামীজী জানিয়েছেন : "[প্রাচীন ভারতে] সমরনীতি বড়ই অদ্ভুত ছিল। সারাদিন যুদ্ধের পরে সন্ধ্যা হলে যুদ্ধ শেষ হত, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে শত্রুভাব থাকত না।...মুসলমানদের ভারত-আক্রমণের সময় পর্যন্ত হিন্দুগণ নিজেদের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব রক্ষা করেছিল। প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল, অশ্বারোহী, পদাতিককে আঘাত করতে পারবে না, বিষাক্ত অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ হবে না, নিজেদের সুবিধার অনুরূপ সুবিধা শত্রুর না থাকলে তাকে পরাজিত করা যাবে না, কেউ ছল প্রয়োগ করতে পারবে না।...কেউ এইসকল যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করলে ঘোর অপযশের ভাগী হত।... যখন মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের উপর বহিরাক্রমণের তরঙ্গ আছড়ে পড়ল, তখন হিন্দুরা আক্রমণকারীর সম্বন্ধে উপরের শিক্ষানুযায়ী ব্যবহার করল। হিন্দুরা বারবার তাদের পরাজিত করেছে, এবং প্রতিবারই উপহারাদি দিয়ে সম্মানের সঙ্গে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি : অপরের দেশ বলপূর্বক অধিকার করবে না; কেউ পরাস্ত হলে পদমর্যাদা অনুযায়ী তাকে সম্মান দেখাতে হবে।...মুসলমান বিজেতারা কিন্তু হিন্দুরাজাদের সঙ্গে অন্য ব্যবহার করল। তারা হাতে পেলেই নির্বিচারে নিকেশ ক'রে দিত।"

[৮-২৬৭-৬৮]

মুসলমানদের যে-সাম্যের অবিরাম প্রশংসা স্বামীজী করেছেন, সে বস্তুও যে শুধু স্বধর্মের মানুষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তাও জানিয়েছেন একইসঙ্গে :

"মুসলমানগণ সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব-ভ্রাতৃভাব করে—কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই-যে, মুসলমান যে নয়, তাকে আর ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে নেওয়া হবে না—তার গলাকাটার সম্ভাবনাই অধিক।" [৩—১৫৪]

এই পর্যন্ত এক পর্ব। পরবর্তী পর্ব—আক্রমণকারী মুসলমানেরা ভারতে রাজ্যস্থাপন ক'রে বসবাস করছে। এইবার তাদের বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য কী? সংক্ষেপে তার উত্তর—বিভিন্ন হিন্দুরাজ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর যা মনোভাব এখানেও তাই—গৌরবের ক্ষেত্রে গৌরববোধ, গ্লানির ক্ষেত্রে ধিক্কার। এই পর্যায়ে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে স্বামীজীর অম্লান ঐতিহাসিক বিবেককে লক্ষ্য করি।

মুসলমানেরা ধর্মীয় নির্যাতন এনেছিল (অর্থাৎ ভিন্নধর্মীদের প্রতি নির্যাতন), ঠিক, কিন্তু একইকালে ধর্মীয় উদারতা তাদের মধ্যে ছিলনা তাও নয়। যথা, "এমন সময় ছিল যখন মুসলমানেরা সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিল। তাদের মূলমন্ত্র—আল্লা এক ও অদ্বিতীয়, মহম্মদই একমাত্র রসুল। যা-কিছু তাদের উপাসনাপদ্ধতির বহির্ভূত, সে সকলই ধ্বংস করতে হবে, এবং যে-কোনো গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হয়েছে, সেগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তথাপি সেই যুগেও যে-সকল মুসলমান দার্শনিক ছিলেন, তাঁরা এহেন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, তার দ্বারা প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, তাঁরা সত্যের স্পর্শ পেয়েছিলেন, উদার হয়েছিল তাঁদের হৃদয়।" [৮-২৯৬]।

কালগতে ভারতবর্ষের সমন্বিত সভ্যতার অংশীদার মুসলমানেরা কিভাবে হয়ে উঠেছিল, সে-বিষয়েও স্বামীজী নানাসময়ে বলেছেন। যথা, "এখন ইংলণ্ডের হাতে তরবারি,...যেমন আগে মুসলমান বিজেতারা ছিলেন। সম্রাট আকবর কিন্তু কার্যতঃ একজন হিন্দু হয়ে গিয়ে-

ছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে, সুফীদের সঙ্গে—হিন্দুদের সহজে প্রভেদ করা যায় না। তাঁরা গোমাংস খান না, এবং অন্যান্য বিষয়ে আমাদের আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করেন; তাঁদের চিন্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত।" [৯-৪৪৫]। পুনশ্চ: "ভারত তার মুসলমান বিজেতাদের ইতিমধ্যেই জয় করে নিয়েছে। শিক্ষিত মুসলমানেরা প্রায় সকলেই সুফী—তাঁদের হিন্দুদের সঙ্গে পৃথক করবার উপায় নেই। হিন্দুভাব তাঁদের সভ্যতার মর্মে প্রবেশ করেছে।" [৯-৪৩৯]।

স্বামীজী বহির্ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক করে দেখতে চেয়েছেন :

"বেদান্তের আধ্যাত্মিক উদারতা মুসলমান-ধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতের মুসলমান-ধর্ম অন্যান্য দেশের মুসলমান-ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। অপর দেশ থেকে মুসলমানেরা এসে যখন তাদের ভারতীয় সমধর্মীদের বলে—তোমরা কেন বিধর্মীদের সঙ্গে মিলে-মিশে আছো?—তখনই কেবল এখানকার অশিক্ষিত গোঁড়া মুসলমানেরা উত্তেজিত হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা ক'রে থাকে।" [৯—৪৯২-৯৩]। সাম্প্রদায়িক মুসলমান দাঙ্গাকারীদের রক্তপিপাসা সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব কঠোর ছিল, এবং তা তিনি ধর্মমহাসভায় প্রকাশও করেন।

কাশ্মীরে মুসলমানেরা হিন্দুভাবের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ভগিনী নিবেদিতা তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

"[ক্ষীরভবানীতে] একটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমাদের মুসলমান মাঝিগণ আমাদিগকে সেখানে জুতাপায়ে নামিতে দিল না—কাশ্মীরে মুসলমান-ধর্ম এত হিন্দুভাববহুল।" ['হিমালয়ে, ৭৬]

স্বামীজীর নিরপেক্ষ ইতিহাসদৃষ্টির অব্যর্থ একটি প্রমাণ এখানে দেব। প্রচলিত ধারণা, কেবল তরবারির জোরে ভারতে হিন্দুরা মুসলমান হয়েছিল। ঐ কথার আংশিক সত্যতা স্বীকার্য, কিন্তু স্বামীজী তাকে পুরো সত্য বলে মানতে পারেন নি। এক্ষেত্রে তিনি সাহসের সঙ্গে যে-কথা বলেছেন, তা সেকালের পক্ষে রীতিমতো চমকপ্রদ ছিল।

স্বামীজী ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারযুগে মুসলমানেরা ভারতে এসেছিল। যখন ভারতবর্ষ "সর্বতোভাবে হতবিদ্য, হতবীর্য, হতাচার হইয়া...একটি প্রকাণ্ড বাম-বীভৎস বর্বরাচারের আবর্তে পরিণত,"—যখন সে "কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্বল," এবং "দীর্ঘকালের জন্য গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন"—তখন তার সেই নিদ্রা "রূঢ়ভাবে ভাঙিয়াছিল আফগানিস্থানের গিরিবর্ত্ম দিয়া সবেগে সম্মুখে ধাবমান মুসলমান-অশ্বারোহীদলের বজ্রনিনাদে।" [৬-২২৬, ৫-৩১৩]

এদেশে সামাজিক অধিকারবঞ্চিত নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলামের মধ্যে মুক্তির উপায় দেখে তাকে গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়েছিল—এই সত্য স্বীকারে স্বামীজী অকুণ্ঠিত :

"ভারতবর্ষে দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশি কেন? একথা বলা মূর্খতা যে, তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।...বস্তুতঃ জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই তাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্যই বাংলাদেশে, যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য, সেখানে কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি।" [৬—৪-৫]।

স্বামীজী কি হঠাৎ আবেগে কথাটা বলেছিলেন? মোটে নয়। অনেকবারই একই কথা বলেছেন :

"আমরা যখন বৈদান্তিক, তখন নিশ্চয় করিয়া জানি, যদি নিজের অনিষ্ট নিজেরা না করি, তবে জগতে এমন শক্তি নাই যাহা আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে। ভারতের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী মুসলমান হইয়াছে।...এখনই প্রায় দশ লক্ষের অধিক খ্রীস্টান হইয়া গিয়াছে। ইহা কাহার দোষ? আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, 'যখন অনন্ত জীবন-নির্ঝরিণী নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণ ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় মরিবে কেন?' প্রশ্ন এই—ইহাদের জন্য আমরা কী করিয়াছি? কেন ইহারা মুসলমান হইবে না?" [৫—৫৬-৫৭]

"মুসলমানের ভারত-অধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই-জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। নিছক তরবারি ও বন্দুকের বলে ইহা হইয়াছিল মনে করা নিতান্ত পাগলামি।" [৫—১৯১]।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে মধুসূদন সরকারের রচনায় দেখেছি, [৩য়, ১৭০-৭১] এই একই কথা স্বামীজী বসুমতী পত্রিকার লেখককে বলেছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে মুসলমান শাসন স্থায়ী বাস্তব ব্যাপার হয়ে উঠবার পরে, স্বামীজী ঐ শাসনকে ক্ষত্রিয় শাসনরূপে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেননি; বলেছেন, "মুসলমান রাজা বহু পরিমাণে মৌর্য, গুপ্ত, আন্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি [আর্যাবর্ত ও গুজরাটের পারস্যদেশীয়] সম্রাড়্‌বর্গের গৌরবশ্রী পুনরুদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" [৬-২২৭]।

স্বামীজী এই ক্ষত্রিয় মুসলমানের গৌরবশ্রীর বহু বন্দনাগান করে গেছেন। স্বীকার করতে হবে—তাঁর সে প্রশস্তি ক্ষেত্রবিশেষে বিস্ময়কর।

মুঘলশাসন ও সম্রাটদের বিষয়ে স্বামীজীর সানুরাগ মনোভাবের প্রসঙ্গে আসার আগে বলে নিতে পারি—তাই বলে ঐ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শক্তির মধ্যে যেখানে তিনি যথার্থ মহিমা দেখেছেন, সেখানে কম উচ্ছ্বসিত হননি। সেজন্য তাঁর কাছ থেকে শিবাজী ও প্রতাপ-সিংহ বহু প্রশংসা পেয়েছেন, পঞ্জাবের শিখ গুরুগণও। মুঘলশাসনের মধ্যে "ত্রিশ বৎসর-ব্যাপী ছেদ" এনেছিলেন যে শেরশাহ, তাঁর গুণের সমাদরেও স্বামীজী কুণ্ঠিত ছিলেন না। ['দেখিয়াছি', ১৮১]। এতে কোনো আত্মখণ্ডন ঘটে নি, কারণ স্বামীজী ভারতে মুঘল-শাসনের গুণগান করলেও ঐ শাসনের একাধিপত্যের অধিকারকে স্বীকার করেন নি। ভারত-বর্ষে অন্যান্য রাজ্যের মতো মুঘলরাজ্যও একটি রাজ্য, হয়ত আয়তনে বড়। প্রাচীন ভারতে বহু রাজ্য ছিল—কাশীর রাজার গুণগান করবার সময়ে কোশলরাজের গুণগান করতে যেমন বাধা ছিল না, যদিও ধরা যাক, তাঁরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন, তেমনি আকবর ও প্রতাপসিংহ উভয়েই স্বচ্ছন্দে প্রশংসাভাজন হতে পারেন, যদি চরিত্রগুণ দুজনের মধ্যেই থাকে। স্বামীজীর মতে, দেশশাসনের নৈতিক অধিকার একমাত্র প্রজাসাধারণের; তা যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ বিভিন্ন বংশ বা গোষ্ঠীর শাসনের গুণদোষকে নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে নেওয়াই উচিত।

• স্বামীজীর জীবনীতে আমরা দেখি, ছাত্রজীবন থেকে ইতিহাসপাঠে তাঁর অত্যন্ত আসক্তি। তিনি যেমন বিশ্বইতিহাস পরিক্রমণ করতেন, তেমনি ভারত-ইতিহাস। প্রমথনাথ বসু লিখেছেন : "ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত তিনি এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন যে, বোধ হইত যেন সকলই তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন। গুপ্তবংশীয় হিন্দু নৃপতি ও মোগল বাদশাহগণের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করিতে-করিতে নরেন্দ্রনাথ সময়ে-সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন।" [১ম-৫৩]।

মুঘল বাদশাহগণের মধ্যে তাঁর কাছে সর্বোচ্চ গুণের প্রতিভূ আকবর, এবং তার

বিপরীত আরংজীব। তাঁর দৃষ্টিতে আকবর "প্রজারক্ষক" এবং আরংজীব "প্রজাভক্ষক।" [৬—২২৩]।২৪

আরংজীবের সর্বনাশা সংকীর্ণ নীতিই মুঘলসাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করেছে। সেইসঙ্গে অন্যান্য ভ্রান্ত নীতিও ছিল। এ-সম্বন্ধে খাঁটি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ক'রে স্বামীজী যা বলেছিলেন, তার কিছু আলগা বর্ণনা পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথায় :

"একদিন মোগলসাম্রাজ্যের কথা উঠিল। কেন এতবড় রাজ্য চূর্ণ হইয়া গেল? স্বামীজী বলিলেন : মোগলসাম্রাজ্য নিজের পাপে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেল। স্যার টমাস রো যখন ইংরাজদূত হয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারে যান, তিনি লিখেছেন, মোগল-সম্রাট যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যান, তখন তাঁর সঙ্গে একটি শহর চলে: শহরে যত শ্রেণীর লোক বাস করে, বাদশাহের তাঁবুর সঙ্গে তত শ্রেণীর লোক চলে। কয়েক লক্ষ লোক শিবিরের সঙ্গে যায়, তাদের মধ্যে কোনো জিনিসের অনটন বা অভাব থাকে না। স্নানাগার বা হামামখানা—সে এক বৃহৎ ব্যাপার—তাও থাকে; তারপর রান্নাবাড়ার ব্যাপার, সে কহতব্য নয়। পৃথিবীর মধ্যে ঐশ্বর্যে ও প্রতাপে মোগল-বাদশাহ সর্বশ্রেষ্ঠ—কবির কল্পনার বস্তু।

"জাহাঙ্গীরের পর সাজাহান ও আরংজীবের সময়ে ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস আরও বাড়তে থাকল। সেপাইয়ের সংখ্যা এত বেশি হল যে, এক টাকা মাসিক বৃত্তিতে একজন সেপাই নিযুক্ত হত। কিন্তু এত সেপাই রাখার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা শুরু হল। সেপাইরা নিজেরাই গ্রাম-নগর লুঠ করতে লাগল। এইরূপে প্রজার উপরে নানা অত্যাচার আরম্ভ হল। অতিরিক্ত ভোগবিলাস ও অতিরিক্ত সেপাই রাখার দরুন রাজ্যব্যয় সংকুলান হল না। সেইজন্য নিজের চাপে সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে গেল।" ['লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' ১ম—১৮২-৮৩]।

মুসলমান আকবর কিভাবে মতের ঔদার্যে কার্যতঃ হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি এমন জগতে বাস করতেন, যেখানে হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য ছিল না—এ বিষয়ে স্বামীজীর মন্তব্য আগে দেখেছি। আকবর স্বামীজীকে এমন অভিভূত ক'রে ফেলেছিলেন যে, তিনি ভাবতে চেয়েছেন—পূর্বজীবনে এই মহান সম্রাট সাধু ছিলেন :

"স্বামীজী আরও বললেন, 'অনেক সময়ে দেখা যায় যে, রাজাদের মনের মধ্যে পূর্বজন্মের সাধুজীবনের একটা অস্পষ্ট স্মৃতি বর্তমান থাকে।...আকবরের এই স্মৃতি ছিল। তিনি মনে করতেন যে, তিনি পূর্বজন্মে ব্রহ্মচারী ছিলেন, কোনো কারণে তাঁর পতন হয়েছিল; কিন্তু তিনি আরও অনুকূল অবস্থার মধ্যে আবার জন্মাবেন, এবং সেইবার সিদ্ধিলাভ করবেন'।" ['দেখিয়াছি', ১৯৯]

১৮৯৮, ১৬ সেপ্টেম্বর, কাশ্মীরে শ্রীনগরে আকবর প্রসঙ্গে বলতে-বলতে আকবরের সিংহাসন আরোহণ-সংক্রান্ত একটি তানসেনের গান স্বামীজী গেয়ে শুনিয়েছিলেন। সেটির মূল কী নির্ধারণ করতে পারিনি, ইংরাজি অনুবাদে তা এই :

২৪ রাজনৈতিক স্বার্থ উঁকি-দেওয়া একটি মত ইদানীং কিছু-কিছু হিন্দু ঐতিহাসিকের লেখায় দেখা যাচ্ছে—আরংজীব নাকি একজন দারুণ ভালো রাজা ছিলেন!! আরংজীবের কবরের উপরে চুনকাম করার এই চেষ্টার পিছনে উদ্দেশ্য—দেশের মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে তুষ্ট ক'রে কার্যসিদ্ধি করা। এইসব ঐতিহাসিক জেনে ফেলেছেন, আকবরের প্রশংসা করলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা তুষ্ট হবে না, অথচ নানা কারণে তাদের তুষ্ট করা দরকার; সেজন্য সামান্য তথ্যকে উদার বিশ্লেষণের গুণে অসামান্য ক'রে এঁরা হাজির করছেন, তাতে যদি স্বীকৃত ইতিহাসনীতি ক্ষুণ্ন হয় হোক—কেননা এঁদের বিবেচনায় ইতিহাসসত্য কখনো রাজনৈতিক স্বার্থের উপরে স্থান পেতে পারে না!!

Seated on the throne, a god amongst men,
Thou the Emperor of Delhi :
Blessed was the hour, the minute, the second
When thou ascendest the throne,
O God amongst men,
Thou the Lord of Delhi.
Long live thy crown, thy sceptre, thy throne,
O God amongst men,
Thou Emperor of Delhi :
Live long and remain awakened always,
O son of Humayoon,
Joy of the Sun, God amongst men,
Thou the Emperor of Delhi !

[*Wanderings,* 120-21]

অলমোড়ায় ১৮৯৮ গ্রীষ্মকালে অবস্থানের সময়ে স্বামীজী মোগলবংশের গৌরবকথা কিভাবে বলতেন, সে-বিষয়ে নিবেদিতা লিখেছেন :

"হয়ত-বা তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের কিংবা মোগলবংশের ইতিহাসের সারসংকলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে করিতেন। এই সারা গ্রীষ্ম-ঋতুটিতে তিনি থাকিয়া-থাকিয়া প্রায়ই দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। [এর পরে মোগল বাদশাহগণের শিল্পানুরাগ ও শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে গভীর কিছু মন্তব্য স্বামীজী করেন, যা স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টি প্রসঙ্গে আগে বলেছি।] ..তিনি আকবরের প্রসঙ্গ আরও বেশি করিয়া করিতেন। আগ্রা-সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজবিহীন, অনাচ্ছাদিত, উন্মুক্ত আলোক ও বাতাসের মধ্যে অবস্থিত সমাধির পাশে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে-বলিতে স্বামীজীর কণ্ঠ যেন অশ্রুগদ্‌গদ হইয়া আসিত, তখন তাঁহার অন্তর্নিহিত বেদনা কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিত না।" ['হিমালয়ে', ২৩]

সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথায় মোগলযুগ সম্বন্ধে স্বামীজীর বর্ণনার এক সুন্দর বিবরণ আছে। বর্ণনাটি যতখানি তথ্যবহুল, ততোধিক অনুভূতি-রোমাঞ্চিত। আমি তার আংশিক অনুবাদ দিচ্ছি :

"মোগলেরা স্বামী বিবেকানন্দের উপরে যেন মায়াবিস্তার করেছিল। ভারত-ইতিহাসের এই পর্বটিকে তিনি এমন নাটকীয় তীব্রানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করতেন যে, আমাদের প্রায়ই মনে হত, তিনি বোধহয় নিজের অতীত জীবনের কথাই বলছেন। প্রায়ই সবিস্ময়ে ভাবতাম —আমরা কি আমাদের সামনে মহাশক্তিধর আকবরের নব আবির্ভাবকে দেখছি?—নচেৎ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মোগলের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনোদ্দেশ্যকে এভাবে তিনি জানলেন কি করে?...

"রাজা রাণী অমাত্য সেনাপতি—প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে স্বামীজী এমন নিখুঁত জীবন্তভাবে চিত্রিত করতেন যে, শুনতে-শুনতে মনে হত, ঐসব মানুষগুলি আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচিত, ওদের চোখের সামনে দেখছি। আমরা দেখলাম বাবরকে—মধ্য এশিয়ার ফারগণার সেই ১২ বছরের কিশোর রাজাকে—মোঙ্গল পিতামহীর দ্বারা যিনি প্রভাবিত, মায়ের সঙ্গে যিনি কৃচ্ছ্রকঠিন জীবন যাপন করছেন। পরবর্তীকালে তাঁকে দেখলাম সমরখন্দের একশো দিনের নরপতিরূপে, তখনো বালক তিনি, এই রাজ্যকে যেন মস্ত বড় আকারের খেলনার

মতো ভেবে খুশি। এই স্বপ্নের নগরী হারিয়ে তাঁর রোষ ও নৈরাশ্য; তাঁর সংগ্রাম, পরাজয়, জয়। তারপর সময় বদলালো—দেখলাম, সদলবলে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটেছেন, সমুচ্চ গিরিখাত লঙ্ঘন ক'রে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়েছেন ভারতের সমতলে। বিদেশী আক্রমণকারী হলেও, ভারতের সম্রাটরূপে তিনি নিজেকে এই দেশের স্বার্থের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, অবিলম্বে বৃক্ষ-রোপণ, কূপ-খনন এবং পথ ও নগর-নির্মাণের কাজে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মনপ্রাণ পড়ে রয়েছিল সেই উচ্চ মালভূমির দেশটিতে, যেখান থেকে এসেছিলেন, এবং যে-ভূমিতে সমাধিস্থও হয়েছিলেন। মনোহারী রোমান্টিক মানুষ তিনি, মানব-ইতিহাসের এক প্রধান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

"তাঁর মৃত্যুর পরে রাজ্য হস্তান্তরিত হয়ে গেল; তাঁর উত্তরাধিকারী হুমায়ুনের ভাগ্যে পলাতকের জীবন। মুষ্টিমেয় অনুচর-সঙ্গে তিনি সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে প্রাণের ভয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এমনই অবস্থার মধ্যে তিনি সুন্দরী তরুণী মুসলমানী হামিদাব দেখা পান, তাঁকে বিয়ে করেন এবং উভয়ে চূড়ান্ত দুঃখের নিয়তিকে সমভাবে গ্রহণ করেন। এই মরুদেশেই তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্ম হয়, যিনি পরে হন সম্রাট আকবর। এই সময়ে এমনই দৈন্যদশা তাঁর যে, এই শুভজন্মের স্মরণে অনুচরদের উপহার দেবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। ছিল কেবল খানিক মৃগনাভি—তাই বণ্টন করে দিয়ে তিনি কামনা করেছিলেন—মৃগনাভির গন্ধ যেমন চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, আমার পুত্রের যশোগৌরব যেন তেমনি পৃথিবীর সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

"হুমায়ুন সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তাকে কিন্তু দীর্ঘদিন ভোগ করতে পারেন নি। ৪৮ বছর বয়সে দিল্লী-প্রাসাদে থাকাকালে মারাত্মক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যান। সাম্রাজ্য গিয়ে পড়ে পুত্র আকবরের উপরে—তাঁর বয়স তখন মাত্র তের। সেই সময় থেকে আরম্ভ করে, ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যু পর্যন্ত, আকবর ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত প্রভু। ইতিহাসে খুব কম মানুষের মধ্যেই তাঁর তুল্য গুণরাশির সমাবেশ দেখা যায়। তাঁর চরিত্রের মহান ঔদার্য তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি বৈরাম খাঁকে পর্যন্ত অধোবদন করে দিয়েছিল। আকবর তখনো বালক, তাঁর শত্রুকে সামনে ধরে এনে, বৈরাম আকবরের হাতে তরবারি দিয়ে বলেন—শত্রুকে শেষ করে দিন। তরুণ নৃপতি বলেছিলেন—'আমি পতিত শত্রুকে হত্যা করি না।' প্রশ্নাতীত সাহস ও বীর্য তাঁর, সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। ক্রীড়াকালে তাঁকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ছিল; লক্ষ্যভেদে তাঁর থেকে নৈপুণ্য কারো অধিক ছিল না; তাঁর থেকে ভালো অশ্বারোহী বা পোলো খেলোয়াড়ও কেউ নন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবন তাঁর কৃচ্ছ্রকঠোর। তিনি মাংসাহার করতেন না; বলতেন, আমার উদরকে কবরখানা করে তুলব কেন? রাত্রে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমোতেন, ধর্মীয় ও দার্শনিক আলাপ-আলোচনায় বেশি সময় কাটত। মুসলমান তিনি, কিন্তু সর্ব ধর্মের শিক্ষকদের কথা শুনতেন এবং নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। সারারাত নিজের কাওয়াখানায় এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে হিন্দু যোগরহস্য শিখবার জন্য অতিবাহিত করতেন। শেষের দিকে তিনি একটি নবধর্ম প্রবর্তনের ইচ্ছা করেছিলেন—স্বয়ং তার নেতা হবেন—সে ধর্মের নাম দীন ইলাহি—হিন্দু, খ্রীস্টান, পারসী, এবং মুসলমান, সবাই তার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

"রাজাধিরাজ তিনি, তথাপি যথার্থ অন্তরঙ্গ বন্ধুসংগ্রহ করতে পেরেছেন। দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা!—এহেন পুরুষের উপযুক্ত তিন বন্ধু—আবুল ফজল—প্রধানমন্ত্রী; ফৈজী—সভাকবি; বীরবল—ব্রাহ্মণ কবি। আর ছিলেন তাঁর ভগিনীপতি এবং সেনাপতি মানসিংহ।...তাঁর বন্ধুরা কেবল যে লঘু আনন্দের ক্ষণে তাঁর সঙ্গী ছিলেন তাই নয়, উপস্থিত থাকতেন সভাকক্ষে, অনুসরণ করতেন রণক্ষেত্রে। রাজপুতদের সঙ্গে এক যুদ্ধকালে যখন তাঁর জীবন বিপন্ন তখন দেখা গেল তাঁর বন্ধুরা উন্মুক্ত তরবারিতে তাঁকে আবৃত করে রেখেছেন। হিন্দু

ও মুসলমান—ঐ বন্ধুরা তাঁর নবধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর সকল প্রচেষ্টাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। তাঁর থেকে খাঁটি বন্ধুভাগ্য আর কখনো কারো হয়নি। সাধারণ মানুষের জীবনে পর্যন্ত অমন বন্ধু বিরল ক্ষেত্রে পাওয়া যায়—তাঁর মতো উচ্চে অবস্থিত মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রায় শোনাই যায় না। কাবুল থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তারিত তাঁর সাম্রাজ্য। শাসক হিসাবে এমন প্রতিভা দেখিয়েছিলেন যে, নিজ পুত্র সেলিমের (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর) হাতে অখণ্ড সাম্রাজ্য তুলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন।"

স্বামীজী অনুরাগের সঙ্গে জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, সাজাহানের কথাও বলেন। এর মধ্যে মোগলযুগের অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টির বিষয়ে তাঁর মুগ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই কথাগুলি স্বামীজীর শিল্পচিন্তা অধ্যায়ে আমরা উপস্থিত করেছি। ক্রিস্টিন আরও লিখেছেন, স্বামীজী ঘণ্টার পর ঘণ্টা "আরবদেশের তরুণ উষ্ট্রচালকের কথা বলে যেতেন, যিনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিজ দেশকে পতনের গহ্বর থেকে উত্তোলন করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।" স্বামীজী মহম্মদের "বহু রাত্রিব্যাপী প্রার্থনার কথা বলেছিলেন, অবশেষে মরুভূমির এক পর্বতের উপরে যিনি ভিশন্ লাভ করেন, ঈশ্বর-ব্যাকুলতার যা ফলশ্রুতি, হয়ে উঠেছিলেন আলোকপ্রাপ্ত পুরুষ, ঈশ্বর-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পুরুষদের একজন। তিনি সেই কতিপয়ের একজন, যাঁর বিষয়ে সত্যই বলা যায়—এঁর রাজ্যের শেষ সীমা নেই।"

আলোচনাকালে ইউরোপীয়রা তাঁদের পরিচিত আপত্তিগুলি উত্থাপন করেছিলেন: মহম্মদ বহুবিবাহের সমর্থক; মহম্মদের মতে, নারীর আত্মা নেই। স্বামীজী উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন। তৎকালীন আরবদেশে পুরুষের অগণিত বিবাহ যখন অনুমোদিত তখন বিবাহ-সংখ্যাকে চারটিতে সীমাবদ্ধ রাখা যথার্থ সংস্কারকার্য। স্বামীজী দেখিয়ে দিয়েছিলেন, মুসলমান নারীর এমন কতকগুলি অধিকার আছে, প্রগতিশীল মার্কিন নারীরাও তাতে বঞ্চিত।

মহম্মদ কি সত্যই নবধর্ম প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন? কিংবা, তাঁর ধর্ম অতঃপর যে আক্রমণশীল রূপ ধরেছিল, তা তাঁর অভিপ্রেত ছিল? এক্ষেত্রে স্বামীজীর বক্তব্য : যখন প্রচণ্ড শক্তি উন্মোচিত হয়, পরে তা কোন্ রূপ ধারণ করবে, কারো পক্ষে সঠিক বলা সম্ভব নয়। "মুসলমান অভিযানকারীরা এশিয়াকে প্লাবিত করে ইউরোপকে অধিকার করতে উদ্যত হয়েছিল। স্পেনকে জয় করে তারা সেখানে বিরাট বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল, যেখানে তখনকার পরিচিত পৃথিবীর সকল স্থান থেকে পণ্ডিতেরা আকৃষ্ট হয়ে এসেছিলেন। ভারতের প্রজ্ঞা, প্রাচ্যের জ্ঞানসম্পদের সঙ্গে এখানে পরিচয়সাধন করানো হত। দৈনন্দিন জীবনে শালীনতা, পরিমার্জনা ও সহবৎ তারা এনেছিল; পিছনে রেখে গিয়েছিল অতুলনীয় সৌন্দর্যময় সারাসেনিক স্থাপত্য, তৎসহ বিদ্যার ঐতিহ্য এবং প্রাচ্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উপাদান।"

মুসলমানদের বিষয়ে স্বামীজীর সামগ্রিক মনোভাব সম্বন্ধে ক্রিস্টিন লিখেছেন :

"ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে কেবল শ্রেষ্ঠ বস্তুকে দর্শন করবার প্রতিভায় সমৃদ্ধ পুরুষ বিবেকানন্দ—তাঁর পক্ষে মুসলমানদের সম্বন্ধে এমন মর্মগ্রাহী দৃষ্টিভঙ্গি বিচিত্র কিছু নয়। তাঁর কাছে ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর দেশই নয়—সবাই এর অঙ্গীভূত। 'আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণ'—এই কথাটা তাঁর মুখে লেগেই থাকত। তাঁর মুসলমান ভ্রাতৃগণের ধর্মীয় নিষ্ঠা, তেজ-শক্তি ও মার্জিত আদবকায়দা সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে যে-ধরনের সমাদর, শ্রদ্ধা এবং গ্রহিষ্ণুতাভাব ছিল—স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেও সে-বস্তু অল্পই দেখা যায়।"

ব্যাপারটা এমনই স্বতঃস্পষ্ট ছিল যে, নিবেদিতাও অনুরূপ কথা লিখে গেছেন :

"ইসলামের নাম উচ্চারণমাত্রে আচার্যদেবের মনে যে-চিত্রের উদয় হইত, তাহা উক্ত ধর্মাবলম্বীদের সাগ্রহ ভ্রাতৃত্ববোধের চিত্র—যাহা সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা দান করিয়াছে এবং

উচ্চ অবস্থার মানুষদের মনে গণতান্ত্রিক চেতনা আনিয়া দিয়াছে। আধুনিক ভারতবর্ষ যে বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি ব্যাপারকে তিনি কদাপি বিস্মৃত হইতেন না—ভারতবর্ষে মুসলমানেরা যদিচ বহিরাগত এব অনধিকার প্রবেশকারী, তথাপি তাহারা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও শাসনপদ্ধতিকে মানিয় লইয়াছিল। তাহাদের আর একটি দানকে তিনি কদাপি অস্বীকার করেন নাই : মুসলমানের যে কেবল নিম্নবংশে জাত মানুষের সামাজিক অধিকার উন্নীত করিয়াছিল, তাহাই নয় তাহারা এই অতি শান্তস্বভাব জাতির মধ্যে সংগঠিত সংগ্রাম ও প্রতিরোধের আদর্শবে সংরক্ষিত ও বর্ধিত করিয়াছিল। তিনি সর্বদাই দেখাইয়া দিতেন—মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ পাঠান, মোগল ও শেখ—এই চারি শ্রেণী আছে—এবং, ইহাদের মধ্যে শেখদের ভারতের ভূমি ও ঐতিহাসিক স্মৃতিতে যে-কোনো হিন্দুর তুল্য প্রাচীন ও প্রশ্নাতীত উত্তরাধিকার রহিয়াছে অবিবেচক এক মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'সাজাহান নিজেবে বিদেশী নামে অভিহিত হইতে শুনিলে কবরের মধ্যেও ফিরিয়া দেখিতেন—কে ওরূপ বলিতেছে?' সর্বশেষে, মাতৃভূমির কল্যাণকল্পে আচার্যদেবের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ছিল—দেশমাত যেন 'ইসলামীয় দেহ ও বৈদান্তিক হৃদয়'—এই দুই আদর্শকে পূর্ণব্যক্ত করিতে পারেন।' ['দেখিয়াছি,' ২৪৯-৫০]।

হিন্দুসন্ন্যাসীর মুসলমানদের প্রতি বিস্ময়কর বিশাল ভালবাসা দেখে নিবেদিতা প্রশ্ন করেছিলেন—"এই যে প্রত্যেক জাতিকে তার শ্রেষ্ঠ গুণগুলির দিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করার অভ্যাস—এ-জিনিস আপনি কোথা থেকে পেলেন? আপনি কি কোনো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত্রে এটি দেখেছেন? কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন?"

মুসলমানদের সম্পর্কে ওহেন মনোভাব স্বামীজীর কাছে এমনই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, তার মূলে বিশেষ কোনো কারণ থাকতে পারে বলে তাঁর মনেই হয়নি। তাই নিবেদিতার প্রশ্ন শুনে, সবিস্ময় বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে তিনি ধীরে বলেন :

"খুব সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণেরই শিক্ষার ফল। আমরা সকলে অল্পবিস্তর তাঁরই পথে চলেছি। তিনি অবশ্য যেসব কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের ততদূর করতে হয়নি। তিনি যাদের ভাব আয়ত্ত করতে চাইতেন, তাদের মতো আহার করতেন, পোশাক পরতেন, তাদের দীক্ষা নিতেন, এবং তাদের ভাষায় কথা বলতেন। 'অপরের আত্মার মধ্যে মধ্যে একেবারে প্রবেশ করে যাওয়ার শিক্ষা নিতেই হবে'—তিনি বলতেন। আর এ-পদ্ধতিটি একেবারে তাঁরই নিজস্ব। ভারতে তাঁর আগে কেউই ক্রমান্বয়ে বৈষ্ণব, মুসলমান ও খ্রীস্টান হননি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম-সাধনা সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নেই। সব ধর্মমতের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষপ্রান্তে পেৌঁছতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল—যত মত তত পথ। স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ সংঘ ঐ মতাদর্শে বিশ্বাসী। [৯-৩১]। শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ-কিছু মুসলমান ভক্ত ছিলেন ['পেট্রিয়ট-প্রফেট', ১৮২]—স্বামীজীরও ছিল আমরা দেখেছি। স্বামীজী শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে জাতিবিচার করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না, এবং সে-বিষয়ে নির্দেশও দিয়েছেন। [৭-৬৭]। অখণ্ডানন্দকে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, অনাথালয়ে অবশ্যই মুসলমান বালক নেওয়া হবে, কিন্তু কদাপি যেন তাঁদের ধর্মে হাত দেওয়া না হয়। [৮—৭-৮]।

॥ ৭ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসরণে স্বামীজী বলেছিলেন—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান—এইসব বিভিন্ন ধর্মনাম মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃভাবের প্রতিবন্ধক, এরা অশুভ ছায়া বিস্তার করে

প্রায়শঃই। যেখানে তা করে, সেখানে তাদের কঠোরভাবে নাশ করতে হবে। [৭—৯৫] এই কাজে সফল হওয়ার উপরই নির্ভর করছে ভারতের শুভ ভবিষ্যৎ, নচেৎ তা অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঐ কাজে প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য আসেনি—ছিন্ন রক্তাক্ত ভারতের আধুনিক ইতিহাস তার সাক্ষ্য।

ভারতীয় সমাজদেহের ভাবী আদর্শরূপ সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁর কল্পনাকে একটি অসাধারণ পত্রে লিপিবদ্ধ করেন। মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে ১০ জুন, ১৮৯৮ তারিখে লেখা সেই চিঠিটি বিবেকানন্দ-চিন্তার অতিমূল্য দলিল। চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব। তার আগে জানিয়ে দিই, এই ব্যক্তিগত চিঠির বক্তব্য সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৮, জুন মাসের প্রবুদ্ধ ভারতে। অর্থাৎ এটাই ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের ঘোষিত আদর্শ। পত্রটি এই :

"আপনার পত্রের মর্ম সাদরে উপলব্ধি করিলাম। আমি জানিয়া যার পর নাই আনন্দিত যে, ঈশ্বর সকলের অগোচরে আমাদের মাতৃভূমির জন্য অপূর্ব আয়োজন করিতেছেন।

"অদ্বৈতবাদকে বেদান্ত বা অন্য যে-কোনো নামে চিহ্নিত করি না কেন, সত্য এই যে, উহা ধর্মের ও চিন্তার শেষ কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস, ইহাই ভবিষ্যতের আলোকপ্রাপ্ত মানবসমাজের ধর্ম। হিন্দুরা অপরাপর জাতি অপেক্ষা পূর্বে ঐ তত্ত্বে পৌঁছানোর গৌরব পাইতে পারে, কারণ তাহারা হিব্রুজাতি বা আরব জাতিগুলির অপেক্ষা প্রাচীনতর; কিন্তু কর্মপরিণত বেদান্ত—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে কখনই বাস্তবে পুষ্টিলাভ করে নাই।

"অপরপক্ষে আমার অভিজ্ঞতা এই—যদি কোনো ধর্মের মানুষ এই সাম্যকে নিজেদের [দৈনন্দিন ব্যবহারিক] জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে আনিতে পারিয়া থাকে—তাহা একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই পারিয়াছে। আবার, ঐরূপ আচরণের যে-গভীর অর্থ, এবং উহার ভিত্তিস্বরূপ যে-সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, সে-সম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা পরিষ্কার, এবং ইসলামপন্থীগণ সে-বিষয়ে সাধারণতঃ সচেতন নন।

"এইজন্য আমার দৃঢ় ধারণা—বেদান্ত-মত যত সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম-পরিণত [আদর্শযুক্ত] ইসলামের সহায়তা ভিন্ন তাহা বিশাল জনসমষ্টির কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই—অথচ সে-কাজ করিতে হইবে বেদ, বাইবেল ও কোরানকে সমন্বিত করিয়াই। মানবজাতিকে এই কথাই শিখাইতে হইবে—প্রচলিত ধর্মসমূহ সেই অভেদরূপী নিত্যধর্মের অংশ। এই শিক্ষা পাইলেই মানুষ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী নিজ ধর্ম বাছিয়া লইবে।

"আমাদের নিজ মাতৃভূমির পক্ষে—হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম—এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

"আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি—এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া, মহা মহিমায়, অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।

"ঈশ্বর আপনাকে মানবজাতির, বিশেষতঃ আমাদের অতি হতভাগ্য মাতৃভূমির সাহায্যের জন্য একটি মহান যন্ত্ররূপে গঠিত করুন—ইহাই নিরন্তর প্রার্থনা।"২৫

---

২৫ মহাসঙ্গীতের মতো কথাগুলি—এর সৌন্দর্যকে আমি নষ্ট করতে চাইনি, মূল রচনার মধ্যে কোনো মন্তব্য যোজনা করে। উদ্বুদ্ধ কল্পনার ক্ষণেই বিবেকানন্দ এটি লিখেছিলেন। এর যোগ্য হবার সাধনাই ভারতবর্ষের সাধনা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি। কেন হয়নি তার নানা কারণের একটি কারণ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'পেট্রিয়ট প্রফেটে'র [পৃ-২৭১] মধ্যে পেয়ে যাই। মুসলিম লীগপন্থীরা নাকি স্বামীজীর কথার মধ্যে মুসলমানদের ছোট করার চেষ্টা দেখেছিলেন। এইসব অদ্ভুত চিন্তাশীল লীগপন্থীদের কাছে 'মস্তিষ্ক'—'দেহে'র থেকে বড় ছিল বলেই বোধহয় ঐ আপত্তি!! কিন্তু ওঁরা বুঝতে পারেন নি, 'দেহ' বলতে স্বামীজী শরীর বোঝেননি, কর্মপরিণত রূপকে বুঝেছেন। আর বৈদান্তিক মস্তিষ্ক কোনো হিন্দু-ব্যাপার নয়, তবে হিন্দুদের দ্বারা স্বীকৃত একটি তত্ত্ব বটে—যে-তত্ত্ব হিন্দু-সমেত সকল ধর্মমতকে পথমাত্র মনে করতে শেখায়! স্বামীজীর আদর্শ যদি গ্রহণ না করা যায়, তাহলে গোটা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণতঃ হয় হিন্দু, বা খ্রীস্টান বা মুসলমান ধর্মান্তরিত হয়ে পড়তে হয়। যদি অন্ততঃ ভারতবর্ষকে মুসলমান ধর্মান্তরিত করা না যায়, তাহলে ইসলামের সাম্যের অধিকার সে পাবে কি করে? কেননা নিজ ধর্মের বাইরে উক্ত সামাজিক সাম্যকে প্রসারিত করতে গোঁড়া মুসলমানেরা রাজি নয়। নিরেট চিন্তাবীরগণের অসুবিধা এই, তাঁরা কোন্ অর্থে কোন্ শব্দ ব্যবহার করা হয়, তা তলিয়ে বুঝবার মতো মনের সঞ্চরণক্ষমতা রাখেন না। এই রকম নিরেট বুদ্ধির গদাঘূর্ণন আমরা দেখেছি কিছুসংখ্যক সমাজতান্ত্রিকের মধ্যেও, যাঁরা স্বামীজী 'শূদ্র' শব্দকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা না জেনেই, ঐ শব্দের দ্বারা সাধারণ মানুষকে অসম্মান করা হয়েছে ধরে নিয়ে, চেঁচামেচি করেছেন। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, হিন্দুসন্ন্যাসী হয়েও স্বামীজী মানবজাতিকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন, যেখানে বেদ পর্যন্ত নেই!! সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাক, স্বামীজী বেদধ্বংসী কালাপাহাড়!!!

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

শেষ অভিযান—পূর্ববঙ্গে

॥ ১ ॥

মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া-হলে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭, স্বামীজী 'আমার সমরনীতি' ঘোষণা করেন। আর পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে কিছু-বেশি চার বছর পরে, দুটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে [এইসঙ্গে গৌহাটির দু'একটি বক্তৃতাও ধরতে হবে] তাঁর অভিযান সমাপ্ত হয়। স্বামীজীর 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতার বৃহৎ তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করেছি—কিন্তু পূর্ববঙ্গের দুটি বক্তৃতার গুরুত্ব উপযুক্তভাবে উন্মোচন করতে পারব না, যেহেতু তথ্যের অভাব; বক্তৃতা দুটির দায়সারা গোছের সারসংক্ষেপ ছাড়া বেশি কিছু পাইনা—যদিও তারই মধ্য থেকে, এবং অন্যসূত্রে প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত সংবাদ থেকে, ওদের মূল্য কিছুটা বুঝতে পারি।

পূর্ববঙ্গে, সেইসঙ্গে আসামে, স্বামীজী [১৯০১ মার্চের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত] ভ্রমণ করেছিলেন—কিন্তু সেই তাঁর শেষ ভ্রমণ নয়। তার প্রায় একবছর পরে তিনি বুদ্ধগয়া ও বারাণসী ভ্রমণ করেন। শেষোক্ত ভ্রমণ কিন্তু তীর্থযাত্রা—তাদের সামাজিক তাৎপর্য বড় কিছু নয়। [স্বামীজীর উপস্থিতি অবশ্য সামাজিক আলোড়নের কারণ হতই; তাঁর বুদ্ধগয়া-ভ্রমণের সঙ্গে বুদ্ধগয়া মন্দির আন্দোলনের একটা শিথিল সম্পর্ক ছিল, এবং বারাণসীতে কেদার-মঠের মোহন্ত কর্তৃক তাঁর অর্চনারও ধর্মীয় গুরুত্ব ছিল; সেইসঙ্গে বারাণসীর শ্রেষ্ঠ সেবাপ্রতিষ্ঠান তাঁর আশীর্বাদে সহস্রবাহু হয়ে তুলে নিয়ে এসেছিল পথপতিত আর্ত মানুষকে। এসব কথা আগেই বলেছি।] পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সঙ্গেও একটা তীর্থসম্পর্ক ছিল। এই ভ্রমণের একাংশে স্বামীজী তাঁর মাকে নিয়ে কয়েকটি তীর্থ দেখিয়েছিলেন। যথা, ঢাকার পার্শ্ববর্তী লাঙ্গলবন্ধ এবং চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থ; গৌহাটির কামাখ্যা তীর্থও। স্বামীজীর মনে একটা আত্মগ্লানি ছিল।—তিনি তাঁর মাকে যথেষ্ট দেখতে পারেন নি [এ-প্রসঙ্গ 'মহাসমাধি' অধ্যায়ে আরও আলোচিত হবে]। মায়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য তিনি ঐসব তীর্থ করেছিলেন। "আগামী সপ্তাহে আমার মাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছি [মিসেস বুলকে স্বামীজী লেখেন, ২৬.১.১৯০১]। তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করতে কয়েক মাস লাগবে। তীর্থদর্শন হল হিন্দুবিধবার প্রাণের সাধ। সারাজীবন আত্মীয়স্বজনদের কেবল দুঃখ দিয়েছি। তাঁদের এই একটা ইচ্ছা অন্ততঃ পূর্ণ করতে চেষ্টা করছি।" [৮-১৭৬]। একই জনকে ২৯ মার্চের চিঠিতে ব্রহ্মপুত্রে পবিত্র স্নানের যোগে "স্নান পূজা" ইত্যাদি করার খবর দিয়েছেন, এবং অতঃপর চন্দ্রনাথ তীর্থে যাচ্ছেন, এই কথা। [৮-১৭৯-৮০]। ১৪ এপ্রিল নিবেদিতাকে লেখেন, সদলে মাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছেন। [প্রবুদ্ধ ভারত, অগস্ট, ১৯৭৭]। এ ধরনের সংবাদ ক্রিস্টিনকেও লিখেছিলেন।

পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করেছিল। একাধিক পত্রে সেকথা লিখেছেন। "পর্বত ও জলের মিশ্র সৌন্দর্যের দিক দিয়ে দেশের এই অংশ অতুলনীয়।" [ক্রিস্টিনকে; ১৩.৫.১৯০১; প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮]। "কাশ্মীরের পরেই আসাম ভারতের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।...দ্বীপময় বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে, এ দৃশ্য দেখবার মতো। তুমি জানো, আমার দেশকে বলা হয়—জলের

দেশ। কিন্তু তার তাৎপর্য পূর্বে কখনও এমনভাবে উপলব্ধি করিনি। পূর্ববাংলার নদীগুলি যেন তরঙ্গসংকুল স্বচ্ছ জলের সমুদ্র—নদী মোটেই নয়—সেগুলি এত দীর্ঘ যে, স্টীমার সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।" [মেরী হেলকে; ৫.৭.১৯০১; ৮—১০৭-৮৮]। মঠে ফিরে শিষ্যকেও বলেছিলেন, "পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির শোভা অতুলনীয়।" [৯-১৯৩]।

পূর্ববঙ্গ, বিশেষতঃ আসাম—যেমন সৌন্দর্যময় তেমনি অস্বাস্থ্যকর—স্বামীজী বারবার বলেছেন। একসাটে বলেছিলেন, "বড়-বড় নদী, পাহাড় ও ম্যালেরিয়ার দেশ পূর্ববঙ্গ ও আসাম।" [৮-১৮১]। আসামে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। "আসামের পার্বত্য-নিবাস শিলং-এ আমার জ্বর, হাঁপানি ও এলবুমেন বেড়েছিল, শরীর দ্বিগুণ ফুলে গিয়েছিল।" [৮-১৮৪]। শিলঙ ও দার্জিলিঙ তাঁর বিবেচনায় "বাংলার সবচেয়ে দুটি ভিজে-স্যাঁতসেঁতে পার্বত্যনিবাস।" [প্রবুদ্ধ ভারত, মে, ১৯৭৮]। "পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের পর শয্যাগত আছি বললেই হয়।" [৮-১৯৪]।

কেবল অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া নয়, স্বামীজী বলেছেন, "[পূর্ববঙ্গ ও আসামে] দু-মাস কঠোর পরিশ্রমের পর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে।" [৮-১৮১]।

কঠোর পরিশ্রম কিসে? খুব একটা সাদামাঠা হিসাবেও দেখি—তাঁর যে-স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল, তাতে যেখানে সুখের ভ্রমণই বিপজ্জনক, সেখানে তিনি দলবল নিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন, ফলে চিন্তাভাবনার অন্ত ছিল না। তদুপরি বিরাট জনসভায়, যাদের কোনো-কোনোটিতে দুই থেকে তিন হাজার লোক হয়েছিল—খালি গলায় এক-এক দফে ঘণ্টাধিককাল বক্তৃতা করেছেন, বক্তৃতান্তে অজস্র লোকের সঙ্গে কথা বলেছেন; যখন বক্তৃতা করা স্বাস্থ্যে কুলোয়নি তখন দিনের পর দিন ঘরোয়া সভায় দুই-তিন ঘণ্টা ধরে কথা বলেছেন, যেসব সমাবেশে শতাধিক লোক হত। আমরা জেনেছি—স্বামীজী এই পর্যায়ে প্রকাশ্য জনসভায় অন্ততঃ ৬টি বক্তৃতা করেছিলেন। স্বামীজী যে-ধরনের বক্তৃতা করতেন—অর্থাৎ বক্তৃতায় যে-ধরনের আত্মবিস্তার করতেন—তাতে সেগুলি একেবারে জীবনক্ষয়ী ব্যাপার ছিল সন্দেহ নেই।

স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে [৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭১] পাই, তিনি এই ঢাকাতে নিজের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। "ঢাকায়, ১৯০১ সালে, প্রকাশ্য বক্তৃতাদি সমাপনের পরে একদিন তিনি সহসা শিষ্যদলের কাছে গম্ভীরমুখে এসে স্থির স্পষ্ট গলায় বলেছিলেন, "আমি বড়জোর আর একবছর আছি। মা যেসব তীর্থ করতে চান, সেগুলি তাঁকে দেখানো আমার কর্তব্য। তাই চন্দ্রনাথ ও কামাখ্যা যাচ্ছি। যারা আমার সঙ্গে যাবে, তারা যেন নারীর প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হয়। কে আমার সঙ্গে যাবে বলো?"

সুতরাং বিবেকানন্দ সেই মহাযোদ্ধার মতো পূর্ববঙ্গের রণস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, যাঁর দেহ ইতিমধ্যেই তীরবিদ্ধ হয়েছে, মৃত্যু সুনিশ্চিত—ধরাশায়ী হবার আগে শেষ অস্ত্রাঘাত করতে যাচ্ছেন—তারপর তুলে দেবেন নিজের হাতের অস্ত্র তাঁর শঙ্খধ্বনিতে সমাগত যোদ্ধাদের প্রসারিত হস্তে।

॥ ২ ॥

কোন্ পূর্ববঙ্গে স্বামীজী গিয়েছিলেন?

ঐকালের পূর্ববঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা সম্পর্কে সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী উদ্বোধন, "বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যায়" (পৌষ, ১৩৭০) "ঢাকায় বিবেকানন্দ" প্রবন্ধে জানিয়েছেন : ঢাকার রাজনৈতিক ঐতিহ্য বিরাট। যখন কলকাতার সৃষ্টি হয়নি তখন ঢাকা সমগ্র বাংলার রাজধানী ছিল; এখানে বিরাট আকারে কৃষ্ণপূজা হত, জন্মাষ্টমী মিছিল ও ঝুলন বিখ্যাত; তাছাড়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং বারদীর ব্রহ্মচারী-মহারাজের ভক্তগোষ্ঠী

সক্রিয় ছিল; কেশবচন্দ্র সেনের ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতার ফলশ্রুতিতে ব্রাহ্ম-আন্দোলনও অল্প-বিস্তর। এইসব কারণের জন্য ঢাকায় হিন্দুদের মধ্যে নানা ধর্মতরঙ্গ বইত।

এহেন ঢাকা স্বামীজীকে অবশ্যই অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত ছিল যেমন সতীশচন্দ্র রায়-চৌধুরী বলেছেন—কিন্তু কতখানি উৎসাহিত ছিল তাঁকে পরীক্ষা করতে, সেকথা সতীশ-চন্দ্র বহু বৎসর পরবর্তীকালে স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে বলেন নি।

স্বামীজী নিজে ঢাকার পরিস্থিতির কথা অল্পবিস্তর জানতেন। কারণ তাঁর আগে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে অভয়ানন্দসহ কালীকৃষ্ণ মহারাজ (স্বামী বিরজানন্দ) ঢাকায় গেছেন —কিছু পরে ঢাকা ও বরিশালে গেছেন স্বামী সারদানন্দ। ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের সূত্রপাতও হয়েছে।

স্বামীজীকে অনেকদিন ধরেই ঢাকায় নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছিল। রমণীকুমার দত্তগুপ্ত "পূর্ববঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রচার" নামক প্রবন্ধে [উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৫৭ সংখ্যায় আরম্ভ হয়ে প্রবন্ধটি কয়েক সংখ্যায় চলে] এসব বিষয়ে কিছু তথ্য দিয়েছেন। যতীন্দ্র-মোহন দাস ঢাকায় স্বামীজীকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঢাকাবাসিদের পক্ষে তিনি ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৮, স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র লেখেন, তার মধ্যে ঢাকার ছাত্রগণ স্বামীজীকে পাবার জন্য কতখানি উৎকণ্ঠিত, তা বিশেষভাবে বলা হয়েছিল। সুদূর ইউরোপ আমেরিকা যাঁর উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছে, তাঁকে কি তাঁর জন্ম-ভূমির নিকটবর্তী স্থানের মানুষেরা একবার পেতে পারে না?—কাতরভাবে ঐ পত্রে বলা হয়। জড়ত্ব ঢেকে ফেলেছে আমাদের, আপনি আসুন; পতিত, দলিত মানবগণকে 'উত্থিত জাগ্রত' করুন; ঐকাজের জন্য মহাকায় পুরুষের বিশাল হস্ত চাই; সূর্য ছাড়া কে অন্ধকার দূরীভূত করতে সমর্থ?—এইসকল কথা লেখা হয় উক্ত আমন্ত্রণপত্রে।[১] স্বামীজীর পক্ষে ঐ আমন্ত্রণ তখনি স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু উদ্যোগী ঢাকাবাসীরা হাল ছাড়লেন না। এবার নাগরিকদের পক্ষে পত্র লিখলেন বিখ্যাত দুই আইনজীবী—ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ। এঁরাও বললেন—আপনি আমাদের ধর্মের পবিত্র মশাল বয়ে নিয়ে গেছেন

---

১ যতীন্দ্রমোহন দাস, মালাকারতলা, ঢাকা, থেকে ২৮ অক্টোবর, ১৮৯৮, স্বামীজীকে নিম্নের পত্রে লেখন :

"Holy Father, I venture to intrude a little on your valuable time in the hope that the appeal of the benighted people of Dacca will meet with a sympathetic response from your noble and world-loving heart.

"Students of this city, impelled by some invisible power as it were, had the courage to invite your Holiness and you were pleased to concede to their request and accordingly sent a telegram in reply. The matter was made public. It was announced in the Indian Mirror and in all the local papers. The arrangements as lie in their humble power were accordingly made to bid you a hearty welcome. Unfortunately on a sudden a news came as to your illness. A blow fell upon the followers and admirers who took the lead. They were disappointed. Their long-looked-for day was not to dawn. The talk as to your Holiness's arrival is still prevalent and is held with enthusiasm. Under the circumstances will you not grant our prayer and favour us with your holy visit? Distant America and England were favoured with your benign visit and we born not far off from the place where you have been born and bred up are deprived of your favour. A stupor has spread over us all. Please come and 'raise and awake' the fallen and down-trodden humanity. It requires the hand of a giant. Nothing but the sun can dispel the darkness."

বিদেশে—আমরা সে সংবাদ শুনেছি—এখন কি সেই আলোকের সাক্ষাৎ স্পর্শ পাবো না আমরা?২

স্বামীজী ঐ পত্রের উত্তর দেন ৬ মার্চ, ১৮৯৯ তারিখে। তার মধ্যে নিজের অসুস্থতার কথা জানিয়ে বলেন : "আপনাদের সানুগ্রহ আহ্বানের সুযোগ গ্রহণের জন্য আমি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি। এই শীতকালেই আপনাদের ঐ অঞ্চল দর্শন করবার স্থির সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু কর্মের গতি অন্যরূপ। প্রাচীন বাংলার সভ্যতার কেন্দ্রভূমি দেখবার আনন্দ উপভোগের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।" [৮-২২৩]।

॥ ৩ ॥

'অপেক্ষা' চির অপেক্ষায় পৌঁছয়নি। স্বামীজী তাঁর বহুপ্রতীক্ষিত ঢাকা যাত্রা করেন ১৮ মার্চ, ১৯০১; ১৯ মার্চ নারায়ণগঞ্জে স্টিমার পৌঁছলে ঢাকা অভ্যর্থনাসমিতির কয়েকজন গিয়ে তাঁকে প্রাথমিক অভ্যর্থনা জানান। অপরাহ্ণে ঢাকা রেলস্টেশনে বিপুল অভ্যর্থনা হয়। ঢাকার প্রধান নাগরিকদের মুখপাত্র হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। "স্টেশন ভিড়ে উপচে পড়েছিল। জমজমাট সমারোহপূর্ণ দৃশ্য। সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে পরলোকগত বাবু মোহিনীমোহন দাসের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়।" [মিরার, ৩০ এপ্রিল]। উদ্বোধনের [১৫ বৈশাখ, ১৩০৮] বিবরণ থেকে জানতে পারি, স্টেশনে উপস্থিত "ভদ্রলোক ও ছাত্রাদি...আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়' ধ্বনিতে গগন পরিপূরিত" করেছিলেন। আমরা জেনেছি, স্বামীজী ঢাকা পৌঁছেই প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন নি। তিন দিন ঢাকায় কাটিয়ে লাঙ্গলবন্ধে তীর্থস্নান করতে গিয়েছিলেন। যে-তিনদিন ঢাকায় ছিলেন, তখন অপরাহ্ণে "প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হইত। প্রায় শতাবধি লোকসমাগম হইত। সকলেই তাঁহার বিশ্বাস, ভক্তি, ও তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন।" [ঐ]। তীর্থস্নান সেরে স্বামীজী ঢাকায় ফিরে এসে, "৩০ মার্চ ঢাকা জগন্নাথ কলেজ-হলে প্রথম বক্তৃতা দেন "আমি কি শিখিয়াছি"—এই বিষয়ে। কানায়-কানায় ভর্তি

২ ঢাকা 'জাজেস্ কোর্ট'-এর উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ, ১৩ ফাল্গুন, ১৩০৫ (১৮৯৯) স্বামীজীকে নিম্নের পত্র লেখেন :

"Dear Sir, We venture to approach you once again on behalf of ourselves and our people in these parts humbly asking you to honour this capital of East Bengal with your presence. It is a source of infinite satisfaction to us and co-religionists throughout this vast Empire that you should have carried the sacred torch of religion from the East to the West in your turn with such wonderful success. So many millions of your countrymen shall gratefully recollect the proud place that you so deservedly secured for India in the Congress of Religion and that but for you her very name might have been missed in that august assembly.

"We hope our claims to be enlightened by the living words from your lips will not be denied on this occasion as on the last. The people here expect to find a ready compliance with their earnest and respectful request. If it should please you to vouchsafe to us a favourable reply we should do our best to make your stay here as comfortable as it lies within our humble means."

হল, অনেককেই স্থানাভাবে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হল। পরদিন তিনি দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন পগোজ স্কুল প্রাঙ্গণে, বিষয়—"যে-ধর্মে জন্মিয়াছি।" "জনসাধারণের মধ্যে প্রভাববিস্তারে অতুলনীয় সে বক্তৃতা। এখানকার জনগণ এইপ্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ, মনীষাদীপ্ত দীর্ঘ ভাষণ শোনার সৌভাগ্য বহুদিন পায়নি। তাঁর নম্র মধুর ভাব, তাঁর প্রীতিকর সম্ভ্রমদ্যোতক মুখ, শাস্ত্রে তাঁর পূর্ণ অধিকার এবং সুন্দর, প্রবহমান, সাবলীল ভাষায় শাস্ত্রনিহিত রহস্য উদ্‌ঘাটনে সামর্থ্য—এই সবকিছু একত্র হয়ে শ্রোতাদের উপর গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল।" [মিরার, ৩০ এপ্রিল, ১৯০১]।

ঢাকা গেজেট, ১ এপ্রিল, ১৯০১, যে-বিবরণ ছেপেছিল, [তা উদ্ধৃত হয় ব্রহ্মবাদিনে এপ্রিল, ১৯০১ সংখ্যায়] তাতে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতার সারাংশ দেওয়া হয়। তার গোড়াতে পাই : "এই বিখ্যাত ব্যক্তি এখন আমাদের মধ্যে এসেছেন। তিনি বুধাষ্টমী উপলক্ষে 'লাঙ্গল-বাঁধ' ঘাটে পূজো দিতে গিয়েছিলেন। ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে, জগন্নাথ কলেজ হলে, গত শনিবার সন্ধ্যায় একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিয়েছেন।...পূর্ববঙ্গে আগমনের সুযোগ পেয়ে, এবং দেশের এই অংশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হয়ে, তিনি কতখানি আনন্দিত হয়েছেন, সেকথা বলে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বলেন, যদিও তিনি পাশ্চাত্যের বহু সভ্য দেশে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ভূমিতে পদার্পণ করতে পারেন নি—অথচ কী মহান্‌ দৃশ্য এখানে—বিশাল নদ-নদী, বিস্তীর্ণ উর্বর ক্ষেত্র, ছবির মতো গ্রামগুলি। হায়, নিজের বাংলাদেশের এইসব দৃশ্য আগে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি!" স্বামীজী তাঁর এই বিলম্বিত স্বদেশ-দর্শনের সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছিলেন নিজের বিলম্বিত স্বদেশীয় ধর্মের গৌরব-দর্শনকে। কিভাবে তা করেছিলেন, উদ্বোধনের ১৫ বৈশাখ, ১৩০০ সংখ্যার রিপোর্ট থেকে দেখে নিতে পারি : "আমি নানা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু আমি কখনও নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশের সবিশেষ দর্শন করি নাই; জানিতাম না, এদেশের জলে-স্থলে সর্বত্র এত সৌন্দর্য। কিন্তু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি ইহার সৌন্দর্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এইরূপই, আমি প্রথমে ধর্মের জন্য নানা সম্প্রদায়ে—বৈদেশিক ভাববহুল বহুবিধ সম্প্রদায়ে—ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলাম—জানিতাম না, আমার দেশের ধর্মে, আমার জাতীয় ধর্মে এত সৌন্দর্য আছে।"

স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতা হয় "পোকস কলেজের বিস্তৃত খোলা ময়দানে, প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে। 'আমরা যে-ধর্মে জন্মিয়াছি' সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাও ইংরাজি ভাষায়ই হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ ছিলেন।"

ঢাকা, এবং নিকটবর্তী কিছু স্থানে [তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত নাগ-মহাশয়ের দেওভোগ গ্রামের বাড়িও ছিল] কিছুদিন কাটিয়ে স্বামীজী ৫ এপ্রিল, চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থদর্শনে বের হন। সেই তীর্থ দেখার পরে গৌহাটিতে আসেন ও কামাখ্যা দর্শন করেন। গৌহাটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দেন। এই "বক্তৃতাগুলির কোনোটিই লিপিবদ্ধ হয় নাই।" সেজন্য স্বামীজীর জীবনীসমূহে এ-সম্পর্কে কোনো বিবরণই নেই। এক্ষেত্রে সংবাদের জন্য পদ্মনাথ ভট্টাচার্য-প্রদত্ত সংবাদের উপরই নির্ভর করতে হয়। সে সংবাদ আমরা বহুলাংশে ইতিপূর্বে উপস্থিত করেছি—রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিরোধিতার রূপ দেখাবার কালে। [৩য়, ১১৪-১৫, ১৫৬-৬০]। পদ্মনাথকে আইনের ভাষায় বলা যায় "বিরূপ সাক্ষী"—ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের সমালোচনার শোধ তুলতেই তিনি বই লিখে-ছিলেন, একথা নিজেই বলেছেন। তিনি স্বামীজীর ঘরোয়া চেহারা, ঘরোয়া আলোচনাকালে স্বামীজীর উক্তি প্রভৃতি বিষয়ে যা বলেছেন, তাও পূর্বোক্ত স্থানে জানিয়েছি, সেইসঙ্গে গৌহাটিতে বক্তৃতাকালে জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য শুনে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়ার

কথাও। পদ্মনাথের সর্বমোট সিদ্ধান্ত : স্বামীজী রাজনীতিরই প্রচারক, রজোগুণাধিক্যের জন্য এদেশে ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণে অনধিকারী।

পদ্মনাথের রচনার যে-সব অংশ ঐখানে উপস্থিত করিনি, অথচ এখানে প্রাসঙ্গিক, তাদের মধ্যে আছে : প্রথমদিনের বক্তৃতার শেষ সময়ে "দ্রুতগতিতে বক্তৃতার জায়গায়" হাজির হয়ে তিনি দেখেন, "লোকারণ্য; এই ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকটবর্তী হওয়া তখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুনিলাম, ইতঃপূর্বে সভায় পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) ধীরেশ্বরাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে নাকি স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছিল; সকলেই তাঁহার সংস্কৃত আলাপে দক্ষতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।"

এইসভায় স্বামীজী কিন্তু "দণ্ডায়মান হইয়া" বক্তৃতা দেননি [অবশ্যই স্বাস্থ্যের কারণে] —"বসিয়াই দুই-চারি কথা" বলেছিলেন। কী বলেছিলেন, অন্ততঃ গোঁড়া ব্রাহ্মণদের কাছে তার অরুচিকর অংশ কী ছিল, তা আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। গৌহাটিতে স্বামীজীর পরবর্তী বক্তৃতার সংবাদ পণ্ডিত পদ্মনাথের লেখায় এই :

"অতঃপর স্বামীজীর শিলঙ-যাত্রার পূর্বে আবার দুইদিন বক্তৃতা হয়। সেই দুই বক্তৃতা ইংরাজিতে নিয়মমতো বিজ্ঞাপন দ্বারা বিষয়-নির্দেশপূর্বক প্রদত্ত হয়। প্রথমদিন জনৈক প্রবীণ বাঙালী উকিল সভাপতি হন—অপরদিন আসাম ভ্যালি ডিভিশনের কমিশনার মিঃ এ পোর্টিয়াস বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। একদিন বিষয় ছিল—*Transmigration of Soul*—এটা খুবই স্মরণ আছে। কিন্তু অপরদিনে বক্তৃতার বিষয়টি ঠিক স্মরণ নাই; তাহাতে 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি উপনিষদবাক্য ছিল। ইহাদ্বারা অনুমান হয়—'Vedanta in Indian Life'—এইরূপ একটা বিষয় ছিল।

"তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জিনিসই বটে। কি সুমিষ্ট আওয়াজ, কি সুন্দর আবৃত্তি, কি সুষ্ঠু শব্দযোজনা! বিশেষতঃ প্রথম দিন তাঁহাকে দেখিয়া 'বিবেকানন্দ' বলিয়া ধরিতে পারি নাই—[এখন] তাঁহার সেই পাগড়ি, সেই আলখাল্লা দেখিয়া মনে হইল, হাঁ ইনিই সেই স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁর ছবি পূর্বে দেখিয়াছি। তাঁহার বক্তৃতার রীতি ছিল পায়চারি করিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বলা, যেন যাত্রার দলের অধিকারী। তাঁহার উজ্জ্বল বিশাল নেত্রদ্বয়, সস্মিত সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল—এও এক দেখিবার জিনিস। ফলতঃ আজ বিশ বৎসর পরেও যেন সেই মূর্তি চোখে ভাসিতেছে—সেই কণ্ঠস্বর কাণে বাজিতেছে। সাধে কি আমেরিকা খেপিয়াছিল?

"এই দুই বক্তৃতার দিন অনেক সাহেব বিবি সভাস্থ হইয়া স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া ঘন ঘন করতালির দ্বারা হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

এর পরে স্বামীজী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য শিলঙে যান। স্বামীজী তাঁর শিলঙ-বাস সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন : "শিলঙ পাহাড়টি অতি সুন্দর। সেখানে চীফ কমিশনার কটন-সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্বামীজী! ইউরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দূর পর্বতপ্রান্তে আপনি কী দেখতে এসেছেন?' কটন-সাহেবের মতো অমন সদাশয় লোক প্রায় দেখা যায় না। আমার অসুখ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুবেলা আমার খবর নিতেন। সেখানে বেশি লেকচার-ফেকচার করতে পারিনি; শরীর বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।" [৯-১১৫]।

কংগ্রেস-সমর্থক, ভারতবন্ধু ইংরাজ হিসাবে স্যার হেনরি কটনের নাম এই কালের ইতিহাসে বহুল উল্লিখিত। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে দেখি, কটন শিলঙে স্বামীজীর বেশ কিছুদিনের অবস্থানকালে সকাল সন্ধ্যায় সংবাদ নিতেন—নিজেও আসতেন। এঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পরে স্বামীজী বলেছিলেন, "এই একটি লোক ভারতের অভাব-অভিযোগ ঠিক-ঠিক বুঝেছেন, এবং প্রকৃতই এদেশের কল্যাণকামনা করেন। সকল ভারতবাসীর

প্রীতিলাভের যোগ্য মানুষ ইনি।"৩ "স্যার হেনরি কটনের অনুরোধে স্বামীজী স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারী এবং ভারতীয়দের বৃহৎ সমাবেশে [কুইনটন হলে] বক্তৃতা দেন। স্যার হেনরি কটন সহ উপস্থিত সকলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যায় অতীব পুলকিত হয়েছিলেন।"

এক্ষেত্রে পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের বিবরণ এই : "অতঃপর স্বামীজী শিলঙ চলিয়া যান—সেখানেও তাঁহার অবস্থান ও অভ্যর্থনার জন্য বাঙালী ভদ্রলোকগণ চাঁদা তুলিয়াছিলেন। সেখানে একদিন মাত্র বক্তৃতা হইয়াছিল। তারপর শ্বাসকাশে অভিভূত হইয়া পড়াতে বক্তৃতা দিতে পারেন নাই, বৈঠকী আলোচনা অবশ্যই হইয়াছিল। লোকপ্রিয় শাসনকর্তা (স্যার) হেনরি কটন চীফ কমিশনার ছিলেন। তিনি স্বামীজীর খুব তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তিনি সভায়ও যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলে স্বামীজী বক্তৃতারম্ভে বলিলেন : 'তীর্থস্থান পরিভ্রমণই সন্ন্যাসীর কর্তব্য; তাই কামাখ্যা হইয়া শিলঙে আসিয়াছি। এস্থানেও হেনরি কটনের ন্যায় সাধুপুরুষ রহিয়াছেন—তাই ইহাও একটি তীর্থ—তীর্থীকুর্বন্তি সাধবঃ' ইত্যাদি।'"

পদ্মনাথের শিলঙ-বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর নয়—কয়েকমাস পরে শিলঙে গিয়ে বন্ধুগণ-মারফত ঐসব কথা তিনি শুনেছিলেন।

স্বামীজীর শিলঙ-অবস্থান প্রসঙ্গে কিছু নতুন তথ্যযোজনা করতে পারি। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সেই তথ্য আমাদের দিয়েছেন। স্বামীজীর শিলঙ-বক্তৃতার খবর সমকালে বেরিয়েছিল খাসিয়া মাসিক "উ খাসি ম্যানতা"-য়। সম্পাদক উ হোর্মুরায় ডিয়েংডো আগে খুবই সংকীর্ণবুদ্ধি খ্রীস্টান ছিলেন—স্বামীজীর বক্তৃতার প্রভাবে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেন, এবং "সেং খাসি" নামক খাসিয়া জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী কর্মী হন। এইসকল সংবাদসহ, উক্ত "উ খাসি ম্যানতা"-র মে ১৯০১ সংখ্যা থেকে সোমেশ্বরানন্দ যা অনুবাদ করে পাঠিয়েছেন, তা উপস্থিত করছি :

"স্বামী বিবেকানন্দ নামে একজন বাঙালী হিন্দু সম্প্রতি এখানে এসেছেন। তিনি হিন্দু-ধর্মের এক বিখ্যাত প্রবক্তা। তিনি যে বিরাট পণ্ডিত এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তিনি সমগ্র বিশ্ব, বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকা, পরিভ্রমণ করেছেন। বিদ্বান ও বুদ্ধিমানদের সেসব দেশে তিনি বহু লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ করে তাঁর অনুগামী করেছেন। তাঁর বক্তৃতা-গুলির ভিত্তি ছিল হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বেদ। ১৮৯৩ সালে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য সকল ধর্মের প্রতিনিধিরা শিকাগোয় গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা নিজের-নিজের ধর্মপ্রসঙ্গে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এটি আমাদের গর্বের বিষয় যে, এই স্বামীজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

"স্বামীজী বর্তমানে শিলঙ-এ। এখানে এসে পৌঁছবার পর তিনি একটিমাত্র বক্তৃতা দিয়েছেন, ২৭ এপ্রিল, ১৯০১, সন্ধ্যাবেলায়। খুবই দুঃখের ব্যাপার, এই বক্তৃতা দেবার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, যার থেকে তিনি এখনও আরোগ্যলাভ করেননি।

"যে-হলে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা শ্রোতায় পূর্ণ ছিল, এমন-কি বহুলোক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। চীফ কমিশনারও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল সনাতন হিন্দুধর্ম। বক্তৃতার শুরুতে তিনি বললেন যে, শাস্ত্র-ভিত্তি ছাড়া কোনো ধর্মই টিকে থাকতে পারে না। গ্রীক, রোমান ও অন্য কয়েকটি ধর্মের ভিত্তি ছিল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহজ আচার-অনুষ্ঠান। তবুও সেগুলি টিকে থাকতে পারল না কারণ সেগুলির কোনো শাস্ত্র ছিল না। [আর] যাদের শাস্ত্র ছিল, যেমন ইহুদীরা—তারা যদিও কখনো-কখনো বিপথে

৩ 'তত্ত্বমঞ্জরী,' আষাঢ় ১৩০৮ সংখ্যায় পাই : "স্বামীজী ব্রহ্মপুত্র স্নানের পর আসামে গিয়া-ছিলেন। তথায় চীফ কমিশনার কটন সাহেব মহোদয় স্বামীজীকে বিশেষ অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজী এখানে সাধারণের অনুরোধে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াছিলেন।"

গেছে, তবুও তাদের ধর্ম আজও টিকে আছে। হিন্দুদের সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা যায়। আচার-অনুষ্ঠানগুলি মানুষের তৈরী, কিন্তু বেদ নিত্য। এবং এ-জন্যই আমরা আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে এতখানি আশাবাদী।

"বক্তৃতায় তিনি জোর দিয়ে বললেন, আচার-অনুষ্ঠানই সব নয়—ধর্ম হল প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ধর্মকে যে-মানুষ বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে, সে-ই আদর্শ মানুষ। সে যদি কোনো পাপও করে, তবু তার উন্নতির আশা আছে, যদি সে ভগবানলাভের চেষ্টা করে। তথাকথিত ধর্মভীরু লোকেরা তো আসলে অলস প্রকৃতির। গাছ বা গরুর চেয়ে এরা কোনো অংশেই বড় নয়।

"বক্তৃতার সময় স্বামীজী সংস্কৃত ভাষায় বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইংরাজিতে তার অনুবাদ দিচ্ছিলেন।

"পরের উপকার করার উপর তিনি খুবই গুরুত্ব আরোপ করছিলেন। মানবসেবামূলক কাজগুলিকে তিনি তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ, দুঃখীদের প্রতি সমবেদনা অনুভব ক'রে, তাদের খাদ্য ও বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা। তৃতীয়তঃ, মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে সাহায্য করা, যাতে তারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও আলোক পায় এবং কি করতে হবে তা বুঝতে পারে। এটিকে তিনি শেষে উল্লেখ করেছিলেন কারণ এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বললেন যে ব্রাহ্মণদের (ধর্মীয় শিক্ষক) সম্মান করা হত কারণ তাঁরা আত্মজ্ঞান দিতেন।

"তিনি গুরুত্ব আরোপ করে, জোর দিয়ে বললেন যে, শিক্ষার সাহায্যে অন্যকে আলোকিত করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে ছাত্ররা শুধু অক্ষর-পরিচয়ই লাভ করবে না, ব্যবহারিক জগতে কর্ম-কুশলও হয়ে উঠবে। এই কাজের দ্বারাই ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। তিনি এই বলে বক্তৃতা শেষ করলেন : 'বর্তমানে ভারতে আমাদের কর্তব্য, জনসাধারণের চোখ খুলে দেওয়া।'

"তিনি যখন বক্তৃতা এবং বেদের উদ্ধৃতি শেষ করলেন, আমরা বুঝতে পারলাম যে, তিনি বিশ্বের সকল মানুষকে আপনজন বলে মনে করেন। [তাঁর মতো] কথা আর কেউ কখনো আমাদের বলেন নি। তিনি বলেছিলেন যে, বেদ আমাদের নির্দেশ দিয়েছে—সত্য প্রচারের জন্য। [আমাদের] মনে হয়, এই উদ্দেশ্যেই তিনি সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন।"

॥ ৪ ॥

বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে আমি স্বামীজীর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ এবং ঘরোয়া ও প্রকাশ্য আলোচনাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেছি। ছোটখাট সমরনীতি ঘোষণার ব্যাপার সেখানে ছিল—এমন পর্যন্ত বলেছি। বলার কারণ কি?

ঢাকায় স্বামীজীর বক্তৃতার যে সামান্য বিবরণ আমরা পেয়েছি—সেইসঙ্গে তার প্রতি-ক্রিয়ার সংবাদ—তাদের ভিতর থেকেই কারণ সন্ধান করতে হবে।

লক্ষ্য করলে দেখব—স্বামীজী তাঁর এখানকার বক্তৃতাদিতেও পূর্বের মতো অপধর্মকে কঠোর আঘাত করেছেন, এবং সত্য ধর্ম কী, বাস্তবজীবনে তার প্রয়োগের উপায় কী, তা দেখিয়ে দিয়েছেন। উদ্বোধনে অবিলম্বে প্রকাশিত তাঁর ঢাকা-বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার (যা "ভারতে বিবেকানন্দ" গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে) বিশ্লেষণ করলে দেখি, স্বামীজী প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম-ধারণার বিচিত্র রূপগুলির প্রায় প্রত্যেকটিকেই বিঁধিয়ে কথা বলেছিলেন। প্রথম বক্তৃতায় ["আমি কী শিখিয়াছি"] তাঁর বক্তব্যে ছিল :

(ক) ব্রাহ্ম মতবাদীদের সমালোচনা : যাঁরা "ধর্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাই-বার বিশেষ পক্ষপাতী...[হইয়া] 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া একটি কথা রচনা করিয়াছেন।"

এ'রা পৌত্তলিকতা কী, কেন তার প্রাদুর্ভাব, ফলাফল ভালো বা মন্দ, সে বিচারে ধৈর্য না দেখিয়ে ঐ শব্দটি ছুঁড়ে হিন্দুধর্মকে বিধ্বস্ত করতে ব্যস্ত। [তিনি এইসব ব্যক্তিদের দ্বারা স্বীকৃত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের একটি মতকে দ্বিতীয় বক্তৃতায় খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন--বেদ জড়প্রকৃতির উপাসনা থেকে চৈতন্যের ধারণায় পৌঁছয়নি, মনুষ্যপূজার বাসনা থেকেই ঐ ধারণায় পৌঁছেছে। এইভাবেই অবতারবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই বক্তব্যটি তিনি অল্পবিস্তর প্যারিস কংগ্রেসে উপস্থিত করেছিলেন।]

(খ) পূর্বোক্ত মতবাদীরাই ঈশ্বর ও সংসার একসঙ্গে করো—এমন সুবিধা-দর্শন প্রচার করেন। অথচ ত্যাগ ছাড়া ধর্ম হয় না। "মড়াকে সোনার পাত মুড়িও না।"

(গ) শশধর তর্কচূড়ামণির মতবাদের সমালোচনা করেন : ওঁরা "হাঁচি টিকটিকির পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বার করেন।"

(ঘ) স্বামীজী নিজেকে প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত বলে দাবি করেন; যাঁদের বিশ্বাস—ঈশ্বরকে যে-নামেই ডাকা হোক, যদি আন্তরিকতা থাকে, ঈশ্বরলাভ হবে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী ধর্মলাভের পক্ষে "মনুষ্যত্ব—মুমুক্ষুত্ব—মহাপুরুষ-সংশ্রয়ের" প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, আদর্শ গুরুর কথা তোলেন। সেইসকল উজ্জ্বল মূর্তির পাশে হঠাৎ-উঠতি গুরুদেব আকার নিয়ে তিনি বিদ্রূপ করেন : "আজকাল যে-সে গুরু হতে চায়; ভিক্ষুকও লক্ষ মুদ্রা দান করতে চায়।"

দ্বিতীয় বক্তৃতার ["যে ধর্মে জন্মিয়াছি"] মধ্যে ছিল :

(ক) প্রাচীন ভারতের চিন্তা করা ভালো কিন্তু অন্ধ প্রাচীন প্রীতি যেন না জাগে। আমাদের আগেকার মতো ঋষি হলেই শুধু চলবে না, আরও বড় ঋষি হতে হবে।

(খ) ভারতবর্ষের নানাস্থানের হিন্দুদের মধ্যে আচার-আচরণগত পার্থক্যের রূপ তিনি তুলে ধরেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, একটি বিশেষ জায়গার লোকাচারকে চরম ধর্ম বলে চালাবার যে-চেষ্টা গোঁড়ারা বহুকাল ধরে করে আসছিলেন—তাকে নস্যাৎ করা। তিনি দেখালেন, গোমাংস ভোজনে নিষেধ ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে সর্বপ্রকার আচরণগত বৈচিত্র্য আছে। "জাঠেরা—মুসলমান বা খ্রীস্টান পর্যন্ত বিবাহ করিলেও জাতিচ্যুত হয় না। তাহারা অবাধে সকল দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। পঞ্জাবের অনেক গ্রামে যে-হিন্দু শূকর ভক্ষণ না করে, সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয়। নেপালে ব্রাহ্মণ, চারিবর্ণেই বিবাহ করিতে পারেন, আবার বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের অবান্তর বিভাগের ভিতরও বিবাহ হইবার যো নাই।"

(গ) স্বামীজী বেদ-মহিমা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু বেদ বলতে তিনি জ্ঞানকাণ্ডের বেদান্তকেই স্থাপন করেন; জোরের সঙ্গে বলেন, স্মৃতি বা পুরাণের যে-অংশ বেদের সঙ্গে অবিরোধে বর্তমান, তাই গ্রাহ্য, বাকি জিনিস নয়।

এইসূত্রে তিনি স্মার্তদের সম্বন্ধে অধিক অসুবিধাজনক এই কথাগুলি বলেন : "ঋষিগণ কে? বাৎস্যায়ন বলেন, যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎকৃতধর্মা—তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" স্বামীজী আরও মারাত্মক কথা বলেন : "বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ—আর ইহাতে সকলেরই অধিকার। 'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায়।' (শুক্লযজুর্বেদ, মাধ্যন্দিন শাখা, ২৬ অধ্যায় ২ মন্ত্র)। এই বেদ হইতে এমন কোনো প্রমাণ দেখাইতে পারো যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ তো একথা বলিতেছে না। ভৃত্য কি কখনো প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে?...আমরা এখন পুরাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছি। বেদের চর্চা তো বাংলাদেশ হইতে লোপই পাইয়াছে।"

(ঘ) স্বামীজী তন্ত্রের বামাচার অংশের নিন্দা করেও, তার মধ্যে বহু ভালো জিনিস আছে স্বীকার করেন, এবং বেদের ব্রাহ্মণ অংশ যে তন্ত্রের উৎস, তাও জানান।

উদ্বোধনে প্রকাশিত বক্তৃতার সারাংশ থেকে এই যে-সব বস্তু উপস্থিত করলাম—সেগুলি তৎকালীন ঢাকার ধর্মোৎসাহীদের অনেকের পক্ষেই নিতান্ত দুষ্পাচ্য ছিল। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর লেখা থেকে ব্রাহ্ম—রক্ষণশীল—বৈষ্ণব—প্রভাবিত ঢাকার সাংস্কৃতিক বাতাবরণের যে-চিত্র পেয়েছি—তার থেকেই বিরোধীদের ক্ষোভের রূপ অনুমান করা যায়। আবার এও বলতে হবে, উদ্বোধনের বিবরণ যতখানি নিরামিষ, স্বামীজীর আসল বক্তৃতা ঠিক তা ছিল না। 'ঢাকা গেজেট' স্বামীজীর ঠাট্টা-তামাশার কথা বিশেষভাবে জানায়। শশধরী মত সম্বন্ধে স্বামীজীর কথার উল্লেখ পত্রিকাটি এইভাবে করেছিল : "আর একদল আছেন [স্বামীজী বলেছিলেন] যাঁরা হিন্দু আচার-বিচারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাগল। তাঁরা সর্বদাই বৈদ্যুতিক শক্তি, চৌম্বক শক্তি, কম্পন শিহরণ ইত্যাদির কথা বলে থাকেন। এঁরা হয়ত একদিন ঈশ্বরকে রাশিকৃত কম্পন বলে বসবেন। (হাস্য)।" 'ঢাকা গেজেট' তারপর বলে : "বস্তুতঃপক্ষে স্বামীজী নিঃসন্দেহে বাকপটু। তিনি যে অতীব সাবলীল বক্তৃতা-শক্তির অধিকারী এটা সুপরিচিত ব্যাপার। কিন্তু তিনি যে এতবড় হাস্যরসিক এবং ধারালো প্রত্যুত্তরে দক্ষ, তা অনেক শ্রোতার কাছেই নতুন অভিজ্ঞতা।"

শশধর তর্কচূড়ামণির অনুগত ভক্ত পদ্মনাথ প্রমুখরা স্বামীজীকে হাঁচি-টিকটিকির ধর্ম, ভাতের হাঁড়ির ধর্ম, ছুৎমার্গ প্রভৃতিকে আক্রমণ করতে দেখে রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, স্মৃতির উপর আক্রমণ তাঁদের অসহ্য লেগেছিল, সর্ববর্ণের বেদাধিকার, ম্লেচ্ছের পর্যন্ত ঋষিত্বে অধিকার, হিন্দুদের শূকরভক্ষণ, ইত্যাদি তাঁদের কাণে সীসে ঢেলে দিয়েছিল, এবং তাঁরা কদাপি নিজেদের জন্য স্বামীজী-প্রদত্ত এই শাস্তিবিধানকে পরমানন্দে স্বাগত জানাতে পারেন নি : "ব্রাহ্মণগণকে বলি...শাস্ত্রমতে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব নাই—কারণ তোমরা এতকাল ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিতেছ। যদি তোমরা নিজেদের কথায় নিজেরা বিশ্বাস করো, তবে সেই প্রাচীন কুমারিল্ল ভট্ট যেমন বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধের শিষ্য হইয়া শেষে তাহাদিগকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত-জন্য তুষানলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমরা সকলে মিলিয়া তুষানলে প্রবেশ করো। আর তাহা যদি না পারো, তাহা হইলে আপনাদের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া সর্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত অধিকার দাও।"

এই রক্ষণশীলদের সঙ্গে "বৈষ্ণবপ্রধান ঢাকার" বৈষ্ণবরা বিবেকানন্দ-বিরোধী ঘোটে যোগ দিয়েছিলেন। স্বামীজী সবসময়ে "বোণ্টমীর" শত্রু। আহারও তাঁর বৈষ্ণবমতে গাছ-পালা নয়। ঠাট্টা-তামাশাও বৈষ্ণবদের নিয়ে যথেষ্টই করতেন। পদ্মনাথ জানিয়েছেন, "এই সকল কারণে, বিশেষতঃ জনৈক বৈষ্ণবমতাবলম্বী ভদ্রলোকের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী একটি অশ্লীল কথা বলাতে [লীলার কথা বলার সময়ে অনেক বাবাজির যে-লালাসিক্ত মনোভাব হয়, তার আসল চেহারাটা স্বামীজী সোজা ভাষায় বলেছিলেন] শিলঙে অনেকেই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। নদীয়া ভাজন-ঘাটের বৈদ্য গোস্বামীবংশীয় জনৈক অত্যুচ্চ-পদস্থ কর্মচারী বিবেকানন্দ-অভ্যর্থনায় চাঁদা দিয়াছিলেন বলিয়া পশ্চাত্তাপগ্রস্ত হইয়া এক-দিন নাকি উপবাসও করিয়াছিলেন।"

স্বামী-শিষ্য-সংবাদে পাই, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের পরে আলোচনা-কালে দুঃখ করে বলেছিলেন : "ও-দেশের লোক বোধহয় নাগ-মহাশয়ের মতো আপনাকেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই।"৪

৪ পূর্ববঙ্গের সামাজিক রক্ষণশীলতা একদিকে, অপরদিকে যুবকদের দেশভাবুকতা-মিশ্রিত প্রগতিশীলতা—উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ কিছুদিন আগেই বরিশালে হয়ে গিয়েছিল স্বামী সারদানন্দকে

স্বামীজী এইসূত্রে পূর্ববঙ্গের ধর্মধারণা সম্বন্ধে বলেন : "ধর্মভাব সম্বন্ধে দেখলুম বড় কনজারভেটিভ। উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে ফ্যানাটিক হয়ে পড়েছে।" ঢাকাতে অবতারের তখন খুবই সংখ্যাধিক্য; তেমন এক অবতারের এক যুবক শিষ্য তাঁর গুরুর অবতারত্ব স্বামীজীকে দিয়ে মানিয়ে নিতে বিশেষ জেদ ধরায় স্বামীজী অবশেষে বলেন : "বাবা, এখন থেকে ভালো করে খেয়ো-দেয়ো, তাহলে মস্তিষ্কের বিকাশ হবে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে তোমার মাথা যে শুকিয়ে গেছে।" এই প্রসঙ্গ ধরে স্বামীজী পরে শরচ্চন্দ্রকে বলেন : "একথা শুনে বোধহয় ছেলেটির অসন্তোষ হয়ে থাকবে। তা কি করব বাবা, ছেলেদের এরূপ না বললে তারা যে ক্রমে পাগল হয়ে দাঁড়াবে।" স্বামীজী আরও বলেন : "বৈষ্ণবভাবটা ঢাকায় বেশি দেখলুম।...ওদেশে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল করত। বলত—ওটা কেন খাবেন, ওর হাতে কেন খাবেন, ইত্যাদি। তাই বলতে হ'ত—আমি তো সন্ন্যাসী-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি? তোদের শাস্ত্রেই না বলছে—'চরেন্মাধুকরীং

কেন্দ্র করে। নরেন্দ্রনাথ সেন-লিখিত, উদ্বোধনে অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সংখ্যায় "বরিশালে স্বামী সারদানন্দ" প্রবন্ধে সে বিবরণ আছে; তার থেকে কিছু অংশ তুলছি :

"স্বামী সারদানন্দজী [বরিশালে, ১৮৯৯ শীতকালে] প্রকাশ্য সভায় তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে প্রথম বক্তৃতাটি হইবার কথা ছিল। স্থান ছিল—সনাতন হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভা। কিন্তু তাহা হইতে পারে নাই। ধর্মরক্ষিণী সভার তৎকালীন সম্পাদক জনৈক ব্যবহারজীবী বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে সভা হইবার অনুমতি প্রত্যাহার করিলেন; কারণ স্বামী সারদানন্দ বিলাতফেরত। বিলাতফেরত সন্ন্যাসীর আগমনে সনাতন-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী সভা যে কলুষিত হইয়া যাইবে! যিনি শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিতে পারিয়াছেন, হিন্দুধর্ম প্রচারে তাঁহার অধিকার নাই! এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অশ্বিনীকুমার, কালীশচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি উত্তেজনা, কি চাঞ্চল্য। উহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জনতা হইতে ধর্মরক্ষিণী সভায় লোষ্ট্রনিক্ষেপ আরম্ভ হইল, গৃহখানির উপর নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ হইল। অশ্বিনীকুমার অতিকষ্টে ক্ষুব্ধ জনতাকে সন্তুষ্ট করিয়া, পরদিবস হইতে তাঁহার কলেজে সভা হইবে ঘোষণা করিলেন।"

কলেজের সভায় বিপুল জনসমাগম হয়েছিল, শহর ভেঙে লোক এসেছিল, স্থানাভাবে লোক ফিরে গিয়েছিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত তিনদিনই সভাপতিত্ব করেছিলেন। সারদানন্দের শান্ত, যুক্তিপূর্ণ, তথ্য ও তত্ত্বসমন্বিত বক্তৃতা শ্রোতাদের মনোহরণ করেছিল। তবে সন্ন্যাসীর জটা নেই কেন, কেন তিনি জুতো জামা পরে আছেন, এহেন বিস্ময় কিছু কিছু মানুষের মনে ছিলই। অশ্বিনীকুমার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছেন, তাঁর শিষ্যদের ত্যাগ তপস্যার কথা জানতেন—তিনি সারদানন্দের উপযুক্ত পরিচয় দিয়েছিলেন সভাসূচনায় :

"স্বামী সারদানন্দজী ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন চিহ্নিত সন্ন্যাসী শিষ্য। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা। পরমহংসদেবের কৃপায় শুধু বিশ্ব-আলোড়নকারী একজন বিবেকানন্দই যে সৃষ্ট হইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার কৃপায় ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন বিবেকানন্দ। এক-একজন যেন এক-একটি আগ্নেয়গিরি। ইঁহাদের বাক্য, হাবভাব, প্রতি ভঙ্গিতে, ইঁহাদের জীবনযাত্রার আঁকেবাঁকে, অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। ইঁহাদের সত্তাটিই যেন জ্বলিতেছে। ইঁহারা যেখানে অবস্থান করেন ও যে-পথ দিয়া চলিয়া যান, সেখানেই অমঙ্গল ভস্মীভূত হয়। যে-ই ইঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িবে, সে-ই জীবনে ইঁহাদের একটা উত্তাপ অনুভব করিবে। ইঁহাদের প্রভাবে বাঘে ও মহিষে একঘাটে জল খায়। আমি আলমোড়ায় দেখিয়াছি, ভারতবাসীর সহিত একসঙ্গে ইংরেজ, বিবেকানন্দের পদসেবা করিতেছে, জুতা খুলিতেছে। ইঁহারা ঠাকুরের বিশেষ কার্যের জন্য ভারতের মুক্তিহেতু শরীরধারণ করিয়াছেন। যদি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিতেন তবেই আপনারা বুঝিতে পারিতেন, স্বামী সারদানন্দ তাঁহারই এক অবিকল প্রতিচ্ছবি। ইঁহারা আজন্ম সন্ন্যাসী, ঠাকুরের উপদেশ-বর্ণিত হোমাপাখী।...ইঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য অভিনব সন্ন্যাসধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন। ইনি ভগবান পরমহংসদেবের নির্দিষ্ট কার্য করিতে, বিবেকানন্দের মতো অল্প বয়সেই ইংলণ্ড ও আমেরিকা গমন করিয়া, অদ্ভুত তপঃশক্তি ও পাণ্ডিত্যপ্রভাবে তত্রত্য বুধমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন।"

বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি।' [মাধুকরী ভিক্ষা ম্লেচ্ছজাতি হইতেও গ্রহণ করিবে।]"। [৯—১১৪-১৬]।

স্বামীজীর বিরুদ্ধে ঢাকায় রীতিমতো ঘোট পাকিয়েছিল স্বার্থাহত ব্যক্তিরা, এবং তারা নিম্নশ্রেণীর কৌশলও নিয়েছিল। সর্বসাধারণের বেদাধিকার আছে—এই কথা স্বামীজী চ্যালেঞ্জের সুরে ঢাকার বক্তৃতায় বলেন। এটা রক্ষণশীলদের পক্ষে অসহনীয় কথা। তাঁরা ঠিক করলেন স্বামীজীকে খোঁচাবেন—আর তার এমন সময় বাছবেন যখন স্বামীজীর পক্ষে প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সেই ছুতোয় দুয়ো দিয়ে গায়ের ঝাল মেটাতে অসুবিধা কি! শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মিরারে ২৪ এপ্রিল, ১৯০১, যে-পত্র লেখেন [যার কিছু উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি: ৪র্থ, ২৮০] তার থেকে ঢাকার স্বার্থ-মহলে বিবেকানন্দ-বিরোধী চেঁচামেচির কিছু খবর পাওয়া যায়। পত্রটির প্রাসঙ্গিক অংশ তুলছি :

"স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকায় প্রচার-সফরে গিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দুধর্ম বিষয়ে দুটি বক্তৃতা দেন, যা দেশীয় সংবাদপত্রে প্রভৃত বিরোধী সমালোচনার কারণ হয়। [অমৃত]বাজারে প্রকাশিত সংবাদে স্বামীজীর মহান ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বিদ্বেষপ্রসূত আক্রমণ দেখা গেছে, যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। ৩১ মার্চ বক্তৃতাকালে স্বামীজী তাঁর শ্রোতাদের বলেন : বাংলায় আর পবিত্র বেদপাঠ করা হয় না; এমনকি অনেক টোলের পণ্ডিতও বেদ ভালভাবে পড়েন নি; স্মৃতির অপেক্ষা বেদ অধিক প্রামাণ্য; নারী ও শূদ্রদের বেদপাঠে অধিকার যে, নিষিদ্ধ করা হয়নি, তা প্রমাণ করতে তিনি প্রস্তুত। নারী ও শূদ্রদের বেদপাঠে অধিকার নেই—একথা বেদ থেকে প্রমাণ করবার জন্য তিনি চ্যালেঞ্জ জানান। স্বামীজীর অসাধারণ বাগ্মিতা, সুষ্ঠু যুক্তিগ্রথিত বক্তব্য, শ্রোতাদের বিমোহিত করেছিল, এবং সকল স্থানীয় পত্রিকা—'সারস্বত পত্রিকা' তাদের শীর্ষে—সমস্বরে স্বামীজীর প্রশংসা করেছে।

"যে-রাত্রে স্বামীজী ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে যাবেন—সেই ৫ এপ্রিল রাত্রি ৯টার সময়ে, কতিপয় ভদ্রলোক, স্থানীয় স্কুলের কয়েকটি বালককে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন—তাঁদের হাতে ঢাকার পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কারের একটি পত্র, যাতে স্বামীজীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করা হয়েছে। স্বামীজী তাঁর শেষ বক্তৃতায় যা বলেছিলেন, তার কোনো-কোনো অংশের ঔচিত্য সম্বন্ধে ইনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। চট্টগ্রামে যাবার জন্য মালপত্র বাঁধার কাজে স্বামীজী ব্যস্ত ছিলেন, তাই তিনি বিনীতভাবে জানান—সেই রাত্রে চট্টগ্রাম চলে যাচ্ছেন বলে তাঁর পক্ষে ঐ তর্ক করা সম্ভব নয়। স্বামীজীর উত্তর থেকে পত্রবাহকেরা হয়ত মনে করেছিলেন—স্বামীজী ঢাকার পণ্ডিত চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তর্কে ভীত! শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সেন—যিনি অতিথির প্রতি ভদ্র ব্যবহারের নমুনাস্বরূপ তাঁর সম্বন্ধে প্রায় মানহানিকর পত্র অমৃতবাজারের স্তম্ভে প্রকাশ করেছেন, যাঁর অনুগামীরা রাত্রির নীরবতাকে বিঘ্নিত ক'রে কদর্য কোলাহলের সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন—তাঁকে প্রশ্ন করি, বক্তৃতা হবার পাঁচদিন পরে, ৫ই রাত্রে কেন স্বামীজীর কাছে তর্কযুদ্ধের আহ্বানপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যখন সবাই জানত স্বামীজী ঐরাত্রে ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? তাকি স্বামীজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনা এড়াবার নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে করা হয়নি? শ্রীমান্ সতীশ ও তাঁর অনুগামীরা কি সুবিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ নামক ব্যক্তিকে ধরতে গিয়ে 'তাতার পাকড়ানোর' ফ্যাসাদে পড়তে ভয় পেয়েছিলেন বলেই ঐরকম করেছিলেন—তাই নয় কি? এও কি সম্ভব যে, আমাদের স্বামীজী—যিনি বিদ্যায় বুদ্ধিতে পৃথিবী জয় করেছেন, সভ্যজগতের সর্বত্র যাঁর নাম প্রচারিত, যাঁর বেদ-পাণ্ডিত্য বারাণসী, বোম্বাই ও মাদ্রাজের পণ্ডিতগণের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত, সংস্কৃতে যাঁর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা অধিকাংশ গভীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সম্মোহিত করেছে—[কয়েকদিন পরেই গৌহাটিতে স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষায় আলোচনার প্রশংসার কথা পণ্ডিত পদ্মনাথ পর্যন্ত জানিয়েছেন]—তিনি ঢাকার এক পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনায় ভয় পাবেন—

যে-ব্যক্তি আমি নিজেই জানি, চতুর্বেদের কোনো একটিও ভালভাবে পড়েন নি। এমন কি অত্যুজ্জ্বল মেধা ও প্রতিভাসম্পন্ন কলকাতার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার পর্যন্ত বেদ-পাণ্ডিত্যের গর্ব করেন না। এই শেষোক্ত পণ্ডিতের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত. এ'র সম্বন্ধে আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে, বাংলার সকল টোল-পণ্ডিত এ'র পাদমূলে বসে সানন্দে শিক্ষাগ্রহণ করতে প্রস্তুত—তিনিই আমাকে একাধিকবার বলেছেন, তাঁর সম্পূর্ণ বেদ-ব্যুৎপত্তি নেই, এবং—বৈদিক উচ্চারণপদ্ধতি আয়ত্ত করা অতীব কঠিন। যেখানে কলকাতার পণ্ডিত চন্দ্রকান্তের মতো ব্যক্তি নিজেকে বেদ-পণ্ডিত বলতে সাহসী নন, সেখানে বাংলার অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতগণের পক্ষে [পণ্ডিত সত্যব্রতর মতো দু'একটি সম্মানীয় ব্যতিক্রম অবশ্য আছে] বেদ-পাণ্ডিত্যের দম্ভ করা কী-না নির্বুদ্ধিতা ও ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক! স্বামী বিবেকানন্দ বাল্যাবধি বেদচর্চা করেছেন, তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা বেদের আলোকিত ব্যাখ্যা-সমূহের উপর নবতর আলোকসম্পাত করেছে, তাঁর সুরসঙ্গতিপূর্ণ বেদমন্ত্রের আবৃত্তি মোহিত করেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষকে—তিনি অবশ্যই এক্ষেত্রে বাংলার সকল পণ্ডিত-দের একত্র শক্তির অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। স্বামীজী অতীতে কী করেছেন, বর্তমানে কী করছেন—জনগণই তার বিচার করবেন। আমি কেবল পূর্ববঙ্গের স্থানীয় পত্রপত্রিকার অবাঞ্ছিত মন্তব্য, কদর্য গালিগালাজের খণ্ডনের জন্যই এই পত্র লিখছি। ঐসব বস্তু বর্ষিত হয়েছে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির উপরে যাঁর জন্য এদেশ চিরতরে গর্বিত।"

॥ ৫ ॥

ঢাকা-বক্তৃতার জন্য স্বামীজী প্রভূত প্রশংসা পেয়েছিলেন। বেশকিছু নিন্দাও পেয়েছিলেন গোষ্ঠী-পত্রিকাগুলি থেকে। শেষের বস্তু তিনি, বলতে গেলে, হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছিলেন, কারণ ভীমরুলের চাকে যখন খোঁচা মারছিলেন, তখন কি তাঁর মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানতেন না—অতঃপর দংশন অবশ্যম্ভাবী? কিন্তু তারই মধ্যে আসল কাজটা তিনি সমাধা করে ফেলেছিলেন—যারা সাড়া দেবার মানুষ, তাদের জাগিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের তরুণদের ঘা মেরে জাগানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য—এবং তাতে সফল হয়েছিলেন। তরুণদের সম্ভাবনাপূর্ণ মনে তাঁর বক্তৃতার, ঘরোয়া আলোচনার, এমনকি একান্ত আলোচনার, কোন্ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে তিনটি স্মৃতিকথার উল্লেখ আমরা করতে পারি—একটি স্বাধীনতা আন্দোলনকালের বিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মী—অধ্যাপক, সাংবাদিক, লেখক—'মাস্টার মহাশয়' নামে খ্যাত, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের; দ্বিতীয়টি পরবর্তীকালে ঢাকার প্রখ্যাত আইনজীবী সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর; তৃতীয়টি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতাদের অন্যতম হেমচন্দ্র ঘোষের। প্রথম স্মৃতিকথা দুটি এই অধ্যায়েই উপস্থিত করব—হেমচন্দ্র ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকথা দেব একেবারে শেষ অধ্যায়ে—যেখানে দেখা যাবে, স্বামীজীর স্পর্শই এই বিপ্লবী নেতাকে বজ্রবৎ গঠন করেছিল।

তার আগে বলে নিই, স্বামীজী পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে কোন্ আশা করেছিলেন। স্বামীজীকে ১৮৯৮ সালে ঢাকার নাগরিকদের পক্ষে যতীন্দ্রমোহন দাস যে-আবেদনপত্র পাঠান, তাতে আমরা আগেই দেখেছি, "ঢাকার ছাত্ররা যেন কোনো অদৃশ্য শক্তিতে চালিত হয়ে" স্বামীজীকে ঢাকায় আসতে আহ্বান করার সাহস দেখিয়েছিল। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর বিবরণে ঢাকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর কথা বলার পরে লিখেছেন : "সমাজের আর একটা প্রভাবশালী অংশ ঢাকার ছাত্রসমাজ। তাহারা তখন হইতেই স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত ছিল, এবং যাহা কিছু বাংলার তথা ভারতের গৌরব, তাহাতেই একাত্মতা বোধ করিত।" স্বামীজী পূর্ব-বঙ্গের এই ছাত্রসমাজকে দেখে, তাদের সঙ্গে কথা বলে, আশা ও উল্লাস বোধ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গীয় শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে স্বামীজী তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে

বলেছিলেন, "আমাদের এদিকের চেয়ে লোকগুলো কিছু মজবুত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ-হয়, মাছ-মাংসটা খুব খায়; যা করে খুব গোঁয়ে করে।" "আমায় বুঝুক আর নাই বুঝুক—এ অঞ্চলের [অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের] লোকের চেয়ে কিন্তু তাদের রজোগুণ প্রবল। কালে সেটার আরও বিকাশ হবে।" স্বামীজী পূর্ববঙ্গে আদবকায়দার কালচারের অভাব দেখেছিলেন—কিন্তু পরিবর্তে রজোগুণের শক্তি দেখেছিলেন, যাকে ভারতের জন্য তিনি অত্যাবশ্যক মনে করতেন। নিজের বুল ডগের গোঁ, এবং তাতারী চোয়াল নিয়ে তিনি গর্বিত—বাঙালদের গোঁ-নামক একবগ্গা তেজকে অবশ্যই পছন্দ করবেন। তিনি চাইছিলেন লড়ায়ে ছেলে—পূর্ববঙ্গে তা পাবার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। ঢাকায় বক্তৃতাকালে তিনি ছাত্রদের বিশেষ করে আহ্বান করেন। দুঃখের বিষয়, প্রকাশিত বিবরণ—স্বামীজীর ধর্মকথা জানাতে এত ব্যস্ত ছিল যে, কর্মকথা লেখার সময় করে উঠতে পারেনি, অথচ সে ডাক তিনি ঢাকার বক্তৃতায় সত্যই দিয়ে-ছিলেন। কী ধরনের কথা তিনি বলেন, তার কিছু আন্দাজ পেতে পারি 'বাঙাল শরচ্চন্দ্রের' কাছে এইপ্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য থেকে :

"সকলে তো মরতে বসেছে। তুই মৃত্যু জয় করতে এসেছিস্। মহাবীরের মতো অগ্রসর হ। কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করবিনি। ক'দিনের জন্যই বা শরীর? ক'দিনের জন্যই-বা সুখ-দুঃখ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, তবে ভেতরের আত্মাকে জাগা, আর বল্—আমি অভয়পদ পেয়েছি। বল্—আমি সেই আত্মা, যাতে আমার কাঁচা আমিত্ব ডুবে গেছে। এইভাবে সিদ্ধ হয়ে যা। তারপর যতদিন দেহ থাকে, ততদিন অপরকে এই মহাবীর্যপ্রদ নির্ভয় বাণী শোনা—'তত্ত্বমসি!' 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' এটি হলে জানব যে, তুই যথার্থই একগুঁয়ে বাঙাল।" [৯—১৯৮]।

পূর্ববঙ্গের চরিত্র স্বামীজী সঠিক অনুধাবন করেছিলেন—এবং পূর্ববঙ্গের যুবকদল তাঁর আশার মর্যাদা রেখেছিল। স্বামীজীর আগমন ও তাঁর স্পর্শ পূর্ববঙ্গের "ধূমায়িত স্বদেশীভাবকে" দাউদাউ করে জ্বালিয়ে তুলেছিল। কিছুদিনের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়—তাতে ছাত্রদলের গৌরবময় ভূমিকার কথা সকল ইতিহাসই স্বীকার করে। সকল তথ্যসূত্রেই পাওয়া যায়—এই ছাত্রদলের উপরে স্বামীজীর ভাব ও বাণীর বিপুল প্রভাব ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ববঙ্গে অগণিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—যারা সেবা ও শিক্ষামূলক কাজ ক'রে গণসংযোগ করেছিল; তলে-তলে রাজনৈতিক কাজ করেনি, তা নয়; সেজন্য সরকারের পক্ষে এইসকল প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। স্বামীজীর নামের প্রভাব তখন এমনই যে, তাঁর বা শ্রীরামকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলে সহজেই সেখানে তরুণেরা এসে জোটে—তখন সেখান থেকে তাদের বৈপ্লবিক কার্যে টেনে নেবার সুযোগ থাকে—সে সুযোগ বিপ্লববাদীরা গ্রহণও করেছিলেন। আরও স্মর্তব্য—পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর সংখ্যায় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়েছেন। সাধু ও বিপ্লবী, দুইই পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্ভূত হওয়ার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক, দুই কারণই ছিল। প্রকৃতি সেখানে যেমন শুভঙ্করী, তেমনি ভয়ঙ্করী। নদীমাতৃকা উর্বরা ভূমিতে ধনধান্যের হিল্লোল—আবার ঐ নদীগুলি কুলনাশা, কীর্তিনাশা। এই নদীর তটে যারা জন্মেছে, যারা দেখেছে—আজ ভাঙছে নদীর এ-পাড়, কাল উঠছে ওদিকে চর, ভাঙা-গড়ার নিত্য খেলা—সেই সব মানুষই কুল ভেঙে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পারে—আর সে বহির্গমন সহজসাধ্য হয় যদি পিছনে পড়ে-থাকা আত্মীয়-স্বজনের জন্য অন্নটুকু অন্ততঃ থাকে। তা সত্যই ছিল পূর্ববঙ্গে। চাকরির সুতোয় বাঁধা মানুষদের পক্ষে ফাঁস খুলে, বেরিয়ে পড়া খুবই কঠিন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সবে ঢাকায় কলেজে প্রবেশ করেছেন—এহেন সময়ে স্বামীজী এলেন। তাঁর বক্তৃতা শোনার প্রতিক্রিয়া এই প্রকার :

"আমার এইকালের জীবনের পক্ষে যে-কোনো হিসাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—বিরাট পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ঢাকায় আগমন—১৯০১ সালের মার্চ কি এপ্রিল মাসে—এবং ঢাকার জগন্নাথ স্কুলের [কলেজের] ঠাসা সভায় ইংরাজিতে বক্তৃতাদান। এই ঘটনা আমার মনে, মগ্নচৈতন্যেও সম্ভবতঃ, গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।...স্বামীজী পূর্ববঙ্গে আগে আসেন নি। তাঁর আগমন ঢাকা শহরের হিন্দুধর্ম বিষয়ে যথার্থ আগ্রহী ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের বিপুল সমাবেশ অনিবার্য করে তুলেছিল। আমি তখন বড়জোর পনর বছরের ছেলে—তাঁর বক্তৃতা সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছিলাম কিনা সন্দেহ। সে ছিল এক বৈদ্যুতিক ভাষণ, শক্তিতে ও শব্দতরঙ্গ সৃষ্টিতে প্রায় অতিপ্রাকৃত। তার একটি বাক্যও এখন ঠিক স্মরণ করতে সমর্থ নই—একটি ভাবও নয়। আমি রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মুদ্রিত গ্রন্থে ঢাকা-বক্তৃতার বিবরণ পড়েছি।...কিন্তু আমি মনে করতে পারি না—গ্রন্থে মুদ্রিত ঐ কথাগুলি স্বামীজী ঠিক-ঠিক বলেছিলেন কিনা, কিংবা ঐভাবে তিনি যুক্তিবিস্তার করেছিলেন কিনা? তথাপি একটি জিনিসের স্মৃতি আমার সমগ্র জীবন জুড়ে রয়েছে—আগ্নেয়গিরির মতো এক ব্যক্তিত্ব, সমুদ্র-ঈগলের মতো শরীর ও মন, আর আত্মার ভয়ানক বিস্ফোরণ। বিবেকানন্দ তাঁর সত্তার অগ্নিশিখার দ্বারা নিশ্চয় আমার মগ্নচৈতন্যের গহনতম অংশকে স্পর্শ করেছিলেন—সেইজন্য পরবর্তী জীবনে তাঁর বাণী ও রচনা আমাকে যেভাবে আলোড়িত করেছে, তেমন অন্যসূত্রে কদাচিৎ ঘটেছে। ঈশ্বর-উন্মাদ ঐ জ্যোতির্ময় আত্মার অরণ্যাগ্নি যেন ধেয়ে এসে আমার অপরিণত মনের যথেচ্ছ-বর্ধিত আগাছাগুলিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছিল, এবং আমার মনকে উত্তোলন করেছিল 'ঊর্ধ্বলোকের চিরনগরীতে'।"৫

সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর স্মৃতিকথা এইরূপ :

"আমেরিকায় স্বামীজীর বক্তৃতা ও কীর্তির সংবাদ পূর্বেই ঢাকার নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল স্বামীজীর শুভ পদার্পণের। আমাদের ঢাকা কলেজে তখন বিখ্যাত ইংরাজ ও বাঙালী অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা করিতেন। স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার স্থান স্থিরীকৃত হইল শহরের কেন্দ্রস্থলে জগন্নাথ কলেজের বিরাট প্রাঙ্গণে। স্বামীজী ধর্মবক্তা বলিয়া পরিচিত, কাজেই স্বামীজীর ভাষণ শুনিতে বড়-বড় সরকারী কর্মচারীদের কোনো বাধা ছিল না। দেখিতে-দেখিতে আমরা ছাত্রবৃন্দও স্বামীজীর ইংরাজি ভাষায় ভাষণ শুনিবার জন্যই প্রধানতঃ সমবেত হইলাম। ভাষার পিছনে যে একটা অসাধারণ শক্তি ছিল, সেটা আমরা তখনই প্রথম অনুভব করিলাম।

"সৌম্য, শান্ত, দীর্ঘায়তন, গৈরিক-পরিহিত ও পাগড়ি-বিভূষিত-মস্তক স্বামীজী যখন মঞ্চে দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িল চারিদিকে। তাঁহার চক্ষুর সরল অথচ অন্তঃস্থলস্পর্শী জ্যোতি এক মুহূর্তে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল সেই বিরাট জনতাকে। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু গৈরিক বসনকে গৌরবোজ্জ্বল মনোমুগ্ধকর করিয়া তুলে এমন স্বর্গীয় প্রতিভাদীপ্ত মূর্তি তো আর কেহ কখনও দেখে নাই। স্বামীজী বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আমেরিকার বক্তৃতার ধারা ছিল বেদান্ত-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী।...ঢাকার বক্তৃতায় এক নূতন সুর শুনিতে পাইলাম—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!' তোমরা চিনিয়া লও নিজেদের—অমৃতের অধিকারী তোমরা। তোমাদের উন্নতির গতি রোধ করিবার শক্তি পৃথিবীর কাহারও নাই। সাম্রাজ্যের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তোমরা হইবে জগতের গুরু ও শিক্ষক। চাই তোমাদের আত্মবিশ্বাস। ভারত ছিল একদিন আধ্যাত্মিক চিন্তা-জগতের শীর্ষস্থানে। আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তোমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবময় ও মহান। যুবকদলের প্রতি

ছিল [স্বামীজীর] বিশেষ আহ্বান—জাগো! ওঠো! ছুঁড়ে ফেলে দাও আলস্য ও নির্জীবতা; এ তোমাদের শোভা পায় না। অগ্রসর হও। চরৈবেতি চরৈবেতি।

"সে কী আহ্বান! কী তূর্যনিনাদ! ঢাকাবাসী মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকে বটে; কিন্তু ইহার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি তাহারা স্বকর্ণে শুনে নাই। আজ তাহারা শুনিল সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি—জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিল সে ভাষণ। এমনই তন্ময়ভাবে শুনিল যে, তাহার সারাংশ ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত করিল না। থাকিল শুধু তাহাদের অবচেতন মনে একটা বিরাট সর্বাত্মক চেতনা চারিদিকে চলিল নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা। শিক্ষককুল এমন সুন্দর সহজ অথচ মর্মস্পর্শী ইংরাজি বক্তৃতা পূর্বে আর শোনেন নাই। বাইবেলের ইংরাজি হইতেও স্বামীজীর বক্তৃতার ভাষা সহজ সরল। আর রাজনীতি চর্চাকারীরা বলিলেন, স্বামীজী প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক নেতা অচিরেই তাৎকালিক রাজনীতির ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিবেন। যুবকগণের চিত্তে সে ভাষণ এক সুদূরপ্রসারী ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিল এবং জনসেবায় আত্মোৎসর্গের সংকল্প জাগাইয়া তুলিল। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহার প্রতিধ্বনি এবং প্রেরণা পরবর্তীকালে ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের তীব্র স্বাদেশিকতায়। ঢাকার জনচিত্ত সাড়া দিয়াছিল বিপুলভাবে তাঁহার সেই বীর্যপূর্ণ আহ্বানে। ছিলেন না তিনি অহিংসাবাদের অন্ধসেবক। একদিন প্রশ্ন উঠিল—কোন্ খেলা ভালো? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—ফুটবল খেলা, যাহাতে আছে পদাঘাতের পরিবর্তে পদাঘাত। সেইসময়ে লাথি মারিয়া কুলির প্লীহা ফাটাইয়া দিয়াছিল কোনো দাম্ভিক ইংরাজ।"

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

বিবেকানন্দ ও তিলক

॥ ১ ॥ বিবেকানন্দ ও তিলক সম্পর্কের প্রথম পর্ব

সমকালীন ভারত-ইতিহাসের দুই প্রধান পুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দ এবং লোকমান্য তিলক দুবার মিলিত হয়েছিলেন। এঁদের মিলন ও ভাববিনিময়ের সুগভীর তাৎপর্যের সবটা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল এইটুকু বলতে পারি, ভারতের ধর্মগুরু এবং জাতীয় নায়ক মিলিত হয়েছিলেন, এবং ভাববিনিময় করেছিলেন—এর পিছনে ভবিতব্যের ইঙ্গিত ছিল, যার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের সামান্যই আমরা জানতে পেরেছি, আর অধিকাংশ রয়ে গেছে অগোচর।

লক্ষণীয় এই—প্রথমবার বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন তিলকের পুনা-আবাসে, আর দ্বিতীয়বার তিলক এসেছিলেন বিবেকানন্দের বেলুড়-আবাসে। মধ্যে ব্যবধান প্রায় এক দশক। এই কালের মধ্যে ভারত-ইতিহাসের রথ যেন অকস্মাৎ সচল হয়েছে দীর্ঘদিনের রুদ্ধগতির পরে। রথের সারথিরূপে বিবেকানন্দকে দেখা গেছে—এবং অল্পবিস্তর পার্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিলক, ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে একথা বলতেও কোনো অসুবিধা নেই।

১৮৯২, জুলাই বা অগস্ট মাসে তিলকের সঙ্গে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ এবং তিলকের পুনা-ভবনে বিবেকানন্দের কয়েকদিনের অবস্থান—সে-সময়ে তরুণ সন্ন্যাসীর চারিত্র ও প্রতিভায় তিলকের মুগ্ধতা—সে বিবরণ আগে দিয়েছি। [১ম, ৮১-৮৩]।১ গ্রন্থের পূর্ববর্তী

১ উদ্বোধন, ১৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় ভুবনমোহন হাওলাদার 'স্বামী বিবেকানন্দ' রচনায় তিলকের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন, সংবাদ-উৎস অবশ্য লেখাটিতে নেই। সে বিবরণ এই :

"একদা স্বামীজী ট্রেনে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাইতেছিলেন। সেই গাড়িতে মহামতি তিলক ও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্যারিস্টার ছিলেন। ব্যারিস্টার ও তিলকের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহু তর্ক-বিতর্ক হইতেছিল। ব্যারিস্টার হিন্দুধর্ম, বেদ-বেদান্ত অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। তিলকও যথাসাধ্য স্বীয় মত সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামীজী নাকে-মুখে একখানা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া তাঁহাদের তর্কবিতর্ক শুনিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, তিলক আর ব্যবহারজীবীর সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন মুখের কম্বল ফেলিয়া সিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিয়া ব্যারিস্টারের সহিত হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, এবং তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ব্যারিস্টার অবাক হইয়া রহিলেন। পরে তিলক চিকাগো মহাসম্মেলনে হিন্দুসন্ন্যাসীর বক্তৃতা পাঠ করিয়া ঐ ব্যারিস্টারকে বলিয়াছিলেন, এই সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, গাড়িতে যে-মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই এই ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এরূপ লোক ভারতে ইদানীং জন্মায় নাই।"

যথেষ্ট নাটকীয় বর্ণনা, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এর মধ্যে তিলকের বাড়িতে স্বামীজীর অবস্থানের কথা নেই। লেখক ট্রেনে সাক্ষাৎকারের পরেই চিকাগো ধর্মমহাসভা এনে ফেলেছেন। অবশ্যই লোকশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি লিখেছিলেন। এর মধ্যে সত্য অংশ এইটুকু হতে পারে—ট্রেনে তিলকের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ে, উপস্থিত কয়েকজনের সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিয়ে তিলকের কিছু তর্কবিতর্ক হয়েছিল, এবং স্বামীজী তাতে যোগ দিয়ে অন্যের অনায়ত্ত ভঙ্গিতে হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থন করেছিলেন। তাতেই তিলক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়িতে আনেন। স্বামীজী যে অন্য যে-কারো থেকে শ্রেষ্ঠতরভাবে ঐকালেই হিন্দুধর্মের পক্ষসমর্থন করতে পারতেন, তা স্বয়ং তিলকই বলেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।

খণ্ডগুলিতে নানা প্রসঙ্গে তিলক ও তাঁর পত্রিকা 'মরাঠা' ও 'কেশরীর' কথা এসেছে। যেমন, স্বামীজীর ধর্মবিষয়ক মত যথার্থ হিন্দুধর্মসম্মত কিনা, সে সম্বন্ধে যখন তর্ক উঠেছিল, তখন চিকাগো ধর্মমহাসভায় পঠিত তাঁর 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধের সমূহ প্রশংসা করে মরাঠা লেখে—এর মধ্যে হিন্দুধর্মের সঠিক নীতি ও তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। [ঐ, ২৫৩]। তিলকের পত্রিকা গোড়ার দিকে আমেরিকায় স্বামীজীর সাফল্যসংবাদ প্রচারে বিশেষ আগ্রহ না দেখালেও, ইংলণ্ডে তাঁর সাফল্যের বিস্তৃত বিবরণ ছেপেছিল, এমন করার হেতুও আমরা জানিয়েছি। [৩য়, ৯-১০]। ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজ, ভারতে প্রত্যাগত বিবেকানন্দকে বিপুল সংবর্ধনাজ্ঞাপনেব সৌভাগ্য লাভ করেছিল—তাতে এই পত্রিকা ঈর্ষাতুর আনন্দ প্রকাশ করেছিল। [ঐ, ২৪২]। কেশরীতে বিবেকানন্দকে নব শঙ্করাচার্য বলা হলে সংস্কারবাদী সুধারক পত্রিকা কোন্ ক্রুর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল, তার কথাও বলেছি। [৩য়, ২১৭-১৯]। সামাজিক ধারণায় ও আচারে তিলকের প্রাথমিক রক্ষণশীলতার কথা আলোচিত হয়েছে [ঐ, ২৬৭, ৩১৯], এবং ১৯০১ সালে সমাজসংস্কার সম্মেলনে রানাডের অযৌক্তিক কথাবার্তাগুলি কিভাবে মরাঠাব দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাও বলেছি। [ঐ, ৩১৫-১৮]। বলা হয়েছে, তিলকের জীবনকথা, শিবাজী উৎসবে তিলকের বক্তৃতা, যার ফলে তাঁর বিচার ও কারাবাস, মহারাষ্ট্রে প্লেগ ও সেইসূত্রে চাপেকর ভ্রাতৃগণ কর্তৃক র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট হত্যা, তিলকের প্রতি অবিচারে বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে স্বামীজীর গভীর বিতৃষ্ণা ইত্যাদি [৪র্থ, ৬-১৪, ৪৯]। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজে তিলকের পত্রিকার আনন্দের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। [ঐ, ৭৮—৮১]। ইতস্ততঃ উদ্ধৃত করেছি নানা সামাজিক ও ধর্মীয় প্রশ্নে তিলকের পত্র-পত্রিকার মতামত।

বিবেকানন্দ ও তিলকের সম্পর্কের বিস্তৃততর কাহিনীতে প্রবেশের সূচনায় 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকায় তিলকের স্মৃতিকথনের দ্বিতীয় অংশ [প্রথম অংশ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে] উপস্থিত করা যায় :

"[১৮৯২-তে তিলকের বাড়িতে অবস্থানের] দুই কি তিন বৎসর পরে স্বামীজী বিশ্ব-খ্যাতি নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন।...যেখানেই গেলেন সেখানেই অভিনন্দন ও মানপত্র তাঁকে দেওয়া হল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্মাদনা-সৃষ্টিকারী প্রতিভাষণ দিলেন। কোনো-কোনো সংবাদপত্রে তাঁর ছবি দেখে আমার মনে হল, ইনি হয়ত যে-সন্ন্যাসী আমার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন, তিনিই। আমার ধারণা ঠিক কিনা যাচাই করবার জন্য আমি তাঁকে পত্র লিখলাম, সেইসঙ্গে কলকাতা ফেরার পথে পুনা ঘুরে যাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালাম। প্রাণোত্তপ্ত এক উত্তরে স্বামীজী জানালেন, হাঁ, তিনি সেই একই সন্ন্যাসী, তবে দুঃখের বিষয়, ঐবার তাঁর পক্ষে পুনা যাওয়া সম্ভব নয়। স্বামীজীর পত্রটি এখন পাওয়া যাবেনা কারণ ১৮৯৭ সালে কেশরী মামলার পরে যেসব ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক চিঠিপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়, তাদের মধ্যে সেটিও নিশ্চয় ছিল।" ['রেমিনিসেনসেস' ২২]।২

তিলকের স্মৃতি অনুযায়ী তিনি ১৮৯৭ সালের গোড়ায় সংবাদপত্রে বিবেকানন্দের ছবি দেখার আগে তাঁকে পূর্বপরিচিত বলে বুঝতে পারেন নি। সুতরাং ঐকালের পূর্বে কেশরী বা মরাঠায় বিবেকানন্দ-বিষয়ে যেসব সংবাদ বেরিয়েছে, বা মন্তব্য করা হয়েছে, সেগুলির চরিত্র নৈর্ব্যক্তিক—দেশের মুখোজ্জ্বলকারী এক ভারতীয়কে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ঐসব লেখায়

২ তিলক চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেলেন পত্রলেখকদের নিরাপত্তার জন্যই। প্রহ্লাদনারায়ণ দেশপাণ্ডে তাঁর সংগৃহীত তিলক-স্মৃতিতে এ-সম্পর্কে একটু অসতর্কভাবে লিখেছেন, গুরুত্বহীন বিধায় তিলক যেসব চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেলেন, তাদের মধ্যে স্বামীজীর চিঠি ছিল। তিলক অবশ্যই স্বামীজীর চিঠিকে গুরুত্বহীন মনে করেন নি; যদি করতেন তাহলে ঘটনার দুই দশক পরেও স্বামীজীর চিঠির বিষয়বস্তু স্মরণ রাখতেন না। প্রহ্লাদনারায়ণের স্মৃতিকথায় একটু বাড়তি জিনিস পাই—তিলক কলম্বোর সংবাদপত্রে স্বামীজীর ছবি দেখে তাঁকে পূর্বপরিচিত বলে চিনতে পারেন।

দেওয়া হয়েছিল। আগেই বলেছি, স্বামীজীর ইংলণ্ডে সমাদরের পর থেকে তিলকের কাগজে বিবেকানন্দ-প্রশস্তি বাড়তে থাকে। এবং ১৮৯৫-৯৬ সালে মরাঠায় সে ধরনের সংবাদ ও মন্তব্য যথেষ্ট। [কেশরীতে ঐ জাতীয় সংবাদের পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে অল্প। তার কারণ, তিলক ইংরাজি সাপ্তাহিক মরাঠাকে সর্বভারতীয় কাগজ করতে চেয়েছিলেন বলে তাতে সর্বভারতীয় সংবাদ বেশি দিতেন, আর মরাঠি ভাষার কেশরী পত্রিকায় স্থানীয় সংবাদের প্রাধান্য থাকত।]৩ এইসূত্রে ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ তারিখের দীর্ঘ সম্পাদকীয় রচনাটির উল্লেখ করতে পারি, যাতে মুক্তকন্ঠে স্বামীজীর প্রতিভার প্রশস্তি করা হয়েছে; তৎসহ স্বামীজীর ধর্মধারণার ঔচিত্যকে স্বীকার করা হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে কিছু পরে আলোচিত হবে।

স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বিবেকানন্দ-তিলক সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্ব। স্বামীজীকে চিনতে পেরে তিলক এমনই ভাবাবেগ বোধ করেন যে, তিনি স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পুনা থেকে স্টিমারে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন—তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বিপ্লবী বসুকাকা যোশীর সঙ্গে। কিন্তু বিনায়ক রাও চিপলুংকরের অসুস্থতাজ্ঞাপক তার পেয়ে তাঁকে দ্রুত ফিরে আসতে হয়। বসুকাকা যোশীই একথা বলেছেন। [কেশরী ট্রাস্ট থেকে এ-সংবাদ আমাকে দেওয়া হয়েছে।]

তিলককে ফিরে আসতে হলেও, স্বামীজীকে পাবার জন্য তাঁর আগ্রহ প্রশমিত হয়নি। তিনি যে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন, তা কেবল তিলকের স্মৃতিকথা থেকেই পাইনি, অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারও একই কথা লিখেছেন: "মিঃ তিলক স্বামীজীকে পুনায় যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। স্বামীজী গোড়ায় ভেবেছিলেন যাবেন, কিন্তু তাঁর বিশ্রামের আশু প্রয়োজন—হিমালয়ে যেতে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।" ['রেমিনিসেনসেস', ১০৬]।

১৮৯৭ সালের সূচনায় মরাঠা সোৎসাহে স্বামীজীর অনেক সংবাদ ছাপে। সেগুলিতে নয়—কেশরীতে প্রকাশিত সংবাদেই মনোযোগ দেব। ভারতে ডাঃ বারোজকে আমরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছি যেহেতু স্বামীজী তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বলেছেন—কেশরীর এই মন্তব্য [২, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭] আগেই উপস্থিত করেছি [২য়, ৩২৫-২৭]। মরাঠাও একই ধরনের মন্তব্য করে। আমরা এবার উদ্ধৃত করব, কেশরীর ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭, সম্পাদকীয় মন্তব্যটি, যা আভ্যন্তর প্রমাণে তিলকের লেখা। স্বামীজীর চিঠি পাবার পরেই এটা লেখা হয়। এর মধ্যে স্বামীজীর পূর্ববর্তী পুনা-ভ্রমণের উল্লেখ আছে:

"ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা শেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ এই মাসের গোড়ায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করে স্বামীজী সেখানে বেদ সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করেছেন। তিনি যে সর্বত্র সম্মানিত হবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। খুবই স্বাভাবিক যে, মাদ্রাজের মানুষ স্বামীজী সম্পর্কে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাভক্তি বোধ করবেন, কারণ তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব আমেরিকানদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন, তাদের দিয়ে বলিয়েছেন যে, ভারতে মিশনারি প্রেরণ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়, এবং স্থূলচর্ম ইংরাজদের মনে এই বোধ জাগিয়েছেন—যদি কেউ সর্বজনীন ধর্ম চায় তাকে ভারত থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। কিছু-কিছু ইউরোপীয় সাংবাদিক বলেছেন, বিবেকানন্দের বাগ্মিতা মানবিক নয়—ঐশ্বরিক। যখন দিব্য বাগ্মিতার সঙ্গে যুক্ত হয় বেদান্তের মতো বিষয়, যা চিরন্তন সত্যকেই কেবল উন্মোচন ক'রে থাকে—তখন যারা বহিরিন্দ্রিয়ের সুখভোগে মগ্ন, তারা-যে চেতনায় ব্যথিত হয়ে স্বামীজীর চরণতলে পতিত হবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে! বিবেকানন্দ যখন মাদ্রাজ শহরে

৩ *Life and Times of Lokamanya Tilak*, by N. C. Kelkar, P. 111.

প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁকে যে-সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল—রাজাধিরাজের ভাগ্যেও তা জোটে না। সেখানকার সংস্কারকদের পত্রিকাতে পর্যন্ত লেখা হয়—অমন বিরাট জনতা, অমন সমারোহ, জনগণের অমন আগ্রহ-উদ্দীপনা, আর কখনো দেখা যায়নি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে খ্রীস্টান জাতির পাঁচ সহস্র মানুষ বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন—এই ব্যাপারটা মিশনারি পত্রিকা 'জ্ঞানোদয়'-এর কাছে যন্ত্রণার কারণ হয়েছে।...

"বিবেকানন্দের পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরিবারগতভাবে তাঁরা আইনজীবী। বিবেকানন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। সন্ন্যাস নেবার আগে অ্যাটর্নি-অফিসে কাজ শিখছিলেন। সেইকালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে যাতায়াত করতেন, এবং বৎসরখানেকের মধ্যে সন্ন্যাস নেন। তিনি-যে রামকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোনো-কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেছেন, যদি কেউ থিয়জফিস্ট-কথিত মহাত্মা দেখতে চায়, সে যেন রামকৃষ্ণ-স্বামীকে দেখে নেয়। এইভাবে বিবেকানন্দের গুরুর প্রশংসা করা হয়েছে। রামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে বিবেকানন্দ কিছুদিন হিমালয়ে কাটান—তারপর ভারত ভ্রমণ করেন। চার বছর আগে তিনি পুনা এসেছিলেন। তিনি ডেকান ক্লাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে কিছু লোক বক্তৃতা করছিলেন। বিবেকানন্দ সেখানে প্রাণপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা আনন্দ ও উন্মাদনা সৃষ্টি করেন। পুনাবাসীগণ হয়ত সেই ঘটনার কথা ভোলেন নি। পুনা ত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজ যান। স্বচ্ছন্দে বলা যায়, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই তিনি প্রথম বিখ্যাত হন। মাদ্রাজের মানুষই তাঁকে চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রেরণ করেন। এই মহাসভা আহ্বানের উদ্দেশ্য—খ্রীস্টধর্মের গৌরব ঘোষণা এবং যীশুখ্রীস্টের অনন্যত্বের ঘোষণা। এই ছিল খ্রীস্টান মিশনারিদের মতলব। কিন্তু বিবেকানন্দের বিবেক-প্রবুদ্ধ বক্তৃতায় মিশনারিদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল : কেউ অপরকে পুড়িয়ে মারার জন্য আগুন জ্বালল—কিন্তু নিজে সেই আগুনে পুড়ে মরল।...

"গত সপ্তাহে বিবেকানন্দ মাদ্রাজে চার-পাঁচটি বক্তৃতা করেছেন। যাদুমন্ত্রের মতো সেসব বক্তৃতা মাদ্রাজের অধিবাসীদের আচ্ছন্ন করেছে। বিবেকানন্দ ও ডাঃ বারোজ একই কালে মাদ্রাজে থাকবেন, এমন সম্ভাবনা আছে। পুনার বুদ্ধিমান লোকেরা মনে হয় মাদ্রাজের সংস্কারকদের জানাতে পারবেন—সে-ব্যাপারটা যেন ডাঃ বারোজের পক্ষে ট্রাজিক হয়ে না দাঁড়ায়। [বারোজ পুনায় আগেই নীরস ও গোঁড়ামিভরা বক্তৃতা করেছেন, তাতে সকলেই বিরক্ত—তারই ইঙ্গিত এখানে]। বিবেকানন্দের পাশে বারোজ একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যাবেন। [স্বামীজীর ধর্মধারণার বিবরণ এর পরে দেওয়া হয়।]...

"স্বামী বিবেকানন্দ আগামী বর্ষাঋতুতে ভারত-সফর করবেন—এবং ভারতের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত, এমন মানুষদের নিয়ে সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করবেন। তিনি অবশ্যই পুনাতে আসবেন। সকল হিন্দুই একই সুমহান তরণীতে বাহিত—কিন্তু তাতে কিছু ছিদ্র দেখা গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ছিদ্রগুলি বন্ধ ক'রে জাতীয় নৌকা সংস্কারে প্রস্তুত। ভারত যদি তাঁর সেবা গ্রহণ করে—তিনি আনন্দিত হবেন। কিন্তু যদি মাতৃভূমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন তবু তিনি আমাদেরই সঙ্গে থেকে ডুবতে রাজি। তাঁর এই প্রয়াসকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাই।"

১৮৯৭ সালের মাঝামাঝি থেকে প্রায় দু'বৎসর মরাঠা বা কেশরীতে বিবেকানন্দ-সংবাদ অপ্রতুল। তার মূল কারণ—পুনায় প্লেগ-মহামারী, খুন, তিলকের গ্রেপ্তার ইত্যাদি। সেই সঙ্গে বিবেকানন্দকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল এবং তাঁকে নানা মহল থেকে আক্রমণ করা হচ্ছিল। নিজেদের সংকট অবস্থায় বিবেকানন্দকে নিয়ে নতুন বিতর্কের ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে বোধহয় এ'দের ইচ্ছা হয়নি।

তিলক কারামুক্ত হন—৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮। ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির চেষ্টায় তিনি নির্দিষ্ট সময়ের ৬ মাস আগে মুক্তি পান। ঐ ৬ মাস তিনি রাজনীতিতে অংশ নেবেন না, এমন স্থির ছিল। কারামুক্তির পরে তিলক পুনশ্চ কেশরীর সম্পাদনার ভার নেন, কিন্তু মরাঠার সম্পাদক থেকে যান তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এন সি কেলকার। ইনি ২৭ জুলাই, ১৮৯৭, তিলকের গ্রেপ্তারের সময় থেকে মরাঠার সম্পাদনা করছিলেন।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে মরাঠায় বিবেকানন্দ-সংবাদের প্রাচুর্য দেখা যায়। ৫ মার্চ, ১৮৯৯, "স্বামী অভয়ানন্দ" নামে যে-সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় এতে লেখা হয়, তা বস্তুতঃ স্বামীজীর ধর্মীয় ও দার্শনিক ধারণার পক্ষে আবেগপূর্ণ সমর্থন ছাড়া কিছু নয়। এর কিছু অংশ আগেই উপস্থিত করেছি [৪র্থ, ৩০৫-৬]। বাকি অংশে স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে দ্বৈত-মতকে গ্রহণ না ক'রে অদ্বৈতমতের প্রচারের দ্বারা হিন্দুধর্মকে বিশ্বধর্ম ক'রে তুলবার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিলেন, তারই ব্যাপক বিশ্লেষণ ছিল।

এই বছরই মরাঠায় একাধিক সম্পাদকীয় মন্তব্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের বিশেষ প্রশংসা করা হয়। এইসব প্রশংসার পটভূমিকায় ছিল খ্রীস্টধর্মান্তরিত রমাবাঈয়ের চ্যালেঞ্জ। সেকথা এবং রমাবাঈয়ের ভারত-বিরোধী প্রচার ও তাঁর পক্ষপাতী আমেরিকানদের স্বামীজীকে আক্রমণের প্রসঙ্গ আগে অল্পবিস্তর উল্লিখিত হয়েছে। [৩য়, ২৪৬-৫১; ৪র্থ, ৭৮-৮১]। এখানে ভারতবর্ষে রমাবাঈ ঠিক কি করছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দেব—সমকালীন বিতর্কিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা হিসাবে।

॥ ২ ॥ পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের শারদা-সদনে বিভ্রাট : বিবেকানন্দকে রুখতে আমেরিকায় রমাবাঈয়ের ভারত-বিরোধী প্রচার

রমাবাঈ কর্তৃক 'শারদা সদন' নামে হিন্দু বিধবাদের জন্য আশ্রয়নিবাস স্থাপনের কথা পাঠক জেনেছেন, যেখানে আশ্রয় দেবার নাম ক'রে ধর্মান্তরিত করার সুচারু ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি রমাবাঈ প্রথম বড় ধরনের ফ্যাসাদে পড়েন, যখন যে-শারদার নামে সদনের প্রতিষ্ঠা তিনি অকস্মাৎ মারা যান, এবং সেজন্য শারদার স্বামী রমাবাঈকে দায়ী করেন। বিস্ময়ের কথা, রমাবাঈয়ের বড় সমর্থক সংস্কারবাদী পত্রিকাগুলি পর্যন্ত রমাবাঈয়ের উপর কটাক্ষ না করে পারেনি।৪ এই প্রসঙ্গে মরাঠার ১ অগস্ট, ১৮৯৮,

৪ শারদার মৃত্যুর পরে ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মারে সন্দেহসূচক যে-সংবাদ ও মন্তব্য বেরোয়, তার উত্তরে রমাবাঈ ব্যাখ্যাত্মক দীর্ঘ পত্র লেখেন—তা প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকার ১৭ জুলাই, ১৮৯৮ সংখ্যায়। [*The Late Mrs Sharadabai Ganti : An Explanation by Pandita Ramabai*]

তার আবার উত্তর দেন শারদার স্বামী ৭ অগস্ট, ১৮৯৮ সংখ্যায়। [*Pandita Ramabai on Conversions to Christianity.* A letter by G. L. Narasimham.]

কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজীদের দ্বারা পরিচালিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় নিয়মিত রমাবাঈয়ের সমর্থনে লেখা বেরিয়েছে। এই পত্রিকা রমাবাঈয়ের বিপক্ষীয়দের উক্তি অপেক্ষা রমাবাঈয়ের আত্ম-সমর্থন সূচক উক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশ করেছে। [যেমন, নভেম্বর, ১৮৯৫ সংখ্যায় "পণ্ডিতা রমাবাঈ ও শারদা-সদন" রচনা]। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই পত্রিকাকেও হিন্দুদের প্রতি করুণা করে লিখতে হয়েছিল : [জানুয়ারি ১৮৯৬, "শারদা-সদনে খ্রীস্ট বিভীষিকা"] : "মারহাট্টা পত্র লিখিয়াছেন, পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের শারদা-সদনে এককালে ১২টী হিন্দু রমণী খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। ইহাতে হিন্দুরা ভীত হইতে পারেন।"

সম্পাদকীয় মন্তব্যের [*Sharada's Death and Pandita's Defence*] কিছু অংশ উপস্থিত করছি, যাতে গোটা ব্যাপারটির ব্যাখ্যা ছিল :

"রমাবাঈ আমেরিকায় বিপুল অর্থ সংগ্রহ ক'রে, ভারতে শারদা সদন প্রতিষ্ঠা করেছেন—হিন্দুনারী, বিশেষতঃ হিন্দু বিধবাদের শিক্ষাদানের বাহ্য উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি কিছু সময়ের জন্য আমাদের উৎসাহী সমাজসংস্কারকদের চোখে ধুলো দিতে সমর্থ হন। ওঁরা রমাবাঈয়ের মিষ্ট কণ্ঠে বশীভূত হয়ে নিজেদের ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে মর্যাদা দান করেন। কিন্তু শীঘ্রই ধরা পড়ে যে, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ধর্মান্তর ঘটানো. ফলে দেশীয় সমর্থকরা একে-একে সরে পড়েন, আর রমাবাঈ ওসব ঝঞ্চাট থেকে মুক্ত হয়ে প্রায় খোলাখুলি স্বকার্যসাধনে লেগে পড়েন।...সকলেরই জানা আছে, এই সদনের নাম হয়েছে তাঁর ছাত্রী শারদার নামে, যিনি জনৈক মিঃ গদ্‌রের পুত্রী। উক্ত ব্যক্তি দীর্ঘকাল রমাবাঈয়ের সহকারী। শারদা পরে মিঃ জি এল নরসিংহমের সঙ্গে বিবাহিত হন। ঐ ব্যক্তি গ্রাজুয়েট এবং পি-ডবলিউ-ডি-র চাকুরিয়া। রমাবাঈ তাঁর সদনের কাউকে-কাউকে ধর্মান্তরিত করতে সমর্থ হলেও শারদা অটুট থাকেন, এবং বিয়ের পরে সদন থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।...শারদা অন্তর্বত্নী হলে রমাবাঈ তাঁর প্রতি স্নেহবোধ ক'রে বা অন্য উদ্দেশ্যে তাঁকে সদনে এসে থাকতে বলেন—ঐকালে তাঁকে মায়ের সেবাযত্ন করবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দেন। বালিকা প্ররোচিত হয়ে রাজি হন, তাঁর স্বামী সম্মতি দেন, এবং তাঁকে পুনার নিকটে কেদগাঁওয়ে সদনের সাময়িক ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রসবের এগারো দিন পরে বালিকাকে হঠাৎ সদন ত্যাগ করতে হয়।...তাঁর পিতা শিশুসহ তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছে বোম্বাইয়ের এক দেশীয় হোটেলে পৌঁছে দেন। তাঁর স্বামী এই সহসা আগমন একেবারেই আশা করেননি। হঠাৎ বেরিয়ে আসা, ট্রেনভ্রমণ ইত্যাদি শারদার পক্ষে স্বাস্থ্যহানিকর দাঁড়ায়, তিনি ৬ মাস ভুগে অকালে মারা পড়েন। তাঁর মৃত্যু মিঃ নরসিংহমের বন্ধুদের কঠোর আঘাত করে, এবং প্রথমে মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার, তার পরে পুনার সুধারক ও বোম্বাইয়ের সুবোধ পত্রিকা এই ঘটনার জন্য কৈফিয়ত দাবি করে। এইসকল পত্রিকা চরম সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী, এবং একদা রমাবাঈয়ের চড়া সমর্থক। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, কারণ না থাকলে এঁরা এমন দাবি করতেন না।...রমাবাঈ তারপর নিজ সমর্থনে সোস্যাল রিফর্মারে লিখেছেন; এবং সেখানে গত সংখ্যায় মিঃ নরসিংহম উত্তরও দিয়েছেন।. .রমাবাঈয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি প্রসবের ঠিক আগে শারদাকে ধর্মান্তরিত করতে চান, আর শারদা তাতে রাজি না হলে তাঁকে তাড়িয়ে দেন। রমাবাঈ এটা পুরো অস্বীকার করেছেন।...আমাদের বিচারে আমরা ধর্মান্তরসাধনের ব্যাপারে রমাবাঈকে মুক্তি দিতে পারি, কিন্তু মন্দস্বাস্থ্য ঐ বালিকাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করি।...শারদাকে খ্রীস্টান হবার জন্য মোটেই প্রণোদিত করিনি—এই কথা রমাবাঈয়ের কষ্ট করে বলার প্রয়োজন নেই। ও-কাজে তাঁর দোষ হয় না। খ্রীস্টান মিশনারি হিসাবে তাঁর পবিত্র কর্তব্য—যতগুলি পারেন মেষকে পালে ঢোকানো। বস্তুতঃপক্ষে তিনি ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ৩০০টি প্রাণীকে দলভুক্ত ক'রে ফেলেছেন। আমরা অনশনক্লিষ্ট শিশু, আর গর্ভযন্ত্রণায় কাতর নারীকে চাপ দিয়ে খ্রীস্টান করার চেষ্টার মধ্যে কোনোই তফাত দেখি না।...আমাদের বিস্মিত করছে শারদার স্বামী ও অন্য আত্মীয়দের আচরণ, যাঁরা ঐ অবস্থায় শারদাকে সদনে যেতে দিয়েছিলেন। বাঘের গুহায় ঢুকলে যদি বাঘ তোমাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে তোমার বুদ্ধিই তার জন্য দায়ী।... রমাবাঈ তাঁর কাজ করেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর বিবেক পরিষ্কার বলে তিনি গর্ব অনুভবও করতে পারেন।...তাহলেও আমরা রমাবাঈকে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে পারি না। তিনি স্বীকার করেছেন, প্রসবের পরে এগারো দিনের মাথায় তিনি শারদাকে বাড়ি থেকে বার করে দেন।...কোনো হিন্দুনারী প্রসবের পরে তিনমাস না কাটলে বাড়ির বাইরে যায় না।

রমাবাঈ তা জানেনই। একই অবস্থায় তিনি কি তাঁর নিজ কন্যাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতেন? যদি তাঁর উত্তর হয় 'হাঁ', তাহলে আমরা বলব—খ্রীস্টান মিশনারির ভূমিকা নেওয়া মানে নারীর হৃদয়ের সকল মানবিক অনুভূতিকে মেরে ফেলা।"

যে-শারদার উপর অনেক ভরসা করে 'শারদা সদন' নামকরণ—সেই শারদার অবাঞ্ছিত মৃত্যু এবং পরবর্তী কলঙ্ক স্বভাবতঃই প্রতিষ্ঠানটির নামের মৃত্যু ঘটাল—নূতন নাম হল 'মুক্তি সদন।' এই মুক্তিব্রতেও রমাবাঈ ঝঞ্ঝাট এড়াতে পারলেন না, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাকে তার আইনসম্মত অভিভাবকের কাছ থেকে নিয়ে এসে, জোর করে আটকে রাখার অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হল। মরাঠার ১২ নভেম্বর, ১৮৯৯ সম্পাদকীয় মন্তব্য [*Pandita Ramabai's Sublime Evangelism*] থেকে আমরা জানলাম—কেদ-গাঁওয়ের এক পাটিল পরিবারের ১০-১২ বছরের মেয়েকে রমাবাঈ সদনে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছেন, এবং মেয়েটির স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় তাকে নিয়ে আসতে গেলে তিনি তাঁদের হাঁকিয়ে দিয়েছেন—কেবল তাই নয়—তাঁদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামার কেস পর্যন্ত করেছেন। মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনও কেস করেন, এবং বিচারক রমাবাঈকে এক্ষেত্রে পুরো দোষী করে রায় দেন। এ সংবাদ বেরিয়েছিল মরাঠায় ১০ ডিসেম্বর ১৮৯৯, সম্পাদকীয়তে। [*Pandita Ramabai's Discomfiture*]। এই দুটি লেখাতে সঙ্গতভাবেই তিক্ত মনোভাব প্রবেশ পেয়েছিল। "চতুর এবং উচ্চাভিলাষী" রমাবাঈ, হিন্দুসমাজে উপযুক্ত লাভের কড়ি পাবার সম্ভাবনা না দেখে খ্রীস্টান হয়েছিলেন, এবং তারপরে "শৃগাল যেমন মেষশাবকদের পিছনে লুব্ধ হয়ে ঘোরে, ও নির্বোধ দলছুটদের পেলেই ছিনিয়ে নিয়ে যায়," ইনিও তাই করছেন। "হিন্দুসমাজে জন্ম, তার অন্ন খেয়ে বড় হয়ে, সেই সমাজেই বিয়ে করে, তিনি খ্রীস্টান হয়েছেন, আর নিরীহ অল্পবয়সী মেয়েদের ভুলিয়ে খ্রীস্টানীর ফাঁদে ফেলছেন"—এর সম্বন্ধে যথোচিত ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছিল মরাঠার লেখাটিতে। নৈতিকতার দিক দিয়ে ব্যাপারটি কতখানি দূষ্য এবং সামাজিক সংস্থিতির পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক, সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে মরাঠা বলে—"স্বামী বা পিতাদের কাছ থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের ফুসলে নিয়ে গিয়ে শান্তি-পূর্ণ পরিবারের মধ্যে বিবাদ ও অশান্তির বীজ বপন করাকে আমরা নৈতিকতার দিক দিয়ে অতীব নিন্দনীয় মনে করি।...পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মহিলাটি শান্তিপূর্ণ হিন্দুসমাজের মারাত্মক শত্রু, তদনুযায়ী এঁকে অবিশ্বাসের সঙ্গে ও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করা উচিত।"

ভারতীয় সমাজের সামনে যখন রমাবাঈয়ের এই চেহারা খুলে গিয়ে, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সকল হিন্দুকেই তাঁর বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে—ঠিক তখনই আমেরিকায় রমাবাঈ-বিতরিত ভারত-কুৎসার কিছু বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। মরাঠা ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, সম্পাদকীয়তে তার কিছু-কিছু উৎকলন করল আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি থেকে। রমাবাঈ ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা থেকে অর্থসংগ্রহ করে ফেরার পরে স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে হাজির হয়ে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন, ফলে মিশনারিদের তহবিলে টান পড়েছিল। তাঁরা রমাবাঈকে ডেকে পাঠালেন ঘটনার মোড় ঘোরাতে। রমাবাঈয়েরও আরো অর্থের প্রয়োজন—কিন্তু আমেরিকানদের ধারণাবদল ঘটাতে না পারলে অর্থ মিলবে না। তিনি আমেরিকায় পোঁছেই বিপজ্জনক কথা শুনলেন—সেখানকার নারীরা "ভারতের মহান দর্শনের" স্বাদ পেয়ে তার চর্চা করতে লেগেছে। রমাবাঈ তৎক্ষণাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন—ও ধাপ্পাবাজিতে ভুলো না; অনেক বাদসাদ দিয়ে তোমাদের কাছে উত্তম অনুবাদে যা হাজির করা হয়েছে, তাই তোমাদের মন কাড়ছে; কিন্তু আমি নিজে মূলে ভারতীয় শাস্ত্র পড়েছি—ওতে ফাঁকিকারি ছাড়া কিছু নেই; ওতে কি বলা হয়েছে জানো?—পৃথিবী মিথ্যা, তুমি নেই, আমি নেই; একদা ব্রহ্ম বলে এক ব্যক্তি ছিলেন—সে ব্যক্তিটি কিন্তু ব্যক্তি নন, অনেকটা আনন্দ আর জ্ঞান-ভর্তি বাতাসের মতো; তাঁর আবার মন বলে পদার্থ নেই; তিনি

কিছু বলেন না, করেন না, বোঝেন না; তারপর আর একজন এলেন তাঁরই মতো, তিনি আবার স্বয়ং অন্ধকার, সুতরাং মিথ্যা; এখন ঐ বাতাসের সঙ্গে এই মিথ্যার মিলন হয়ে নরনারী জন্মাল। তাহলেই তোমরা বুঝছ, মিথ্যা থেকে জাত এই শাস্ত্রের সবটাই মিথ্যা। রমাবাঈ ব্রহ্মের এই শ্রাদ্ধ ক'রে, শান্তি ঘটালেন এই বলে যে—ফলেন পরিচীয়তে; ভারতের দুর্গতি দেখলেই বুঝবে—তার দর্শন কি জাতের! রমাবাঈ সযত্নে বোঝালেন—ভারতীয় শাস্ত্র কতখানি নিম্নশ্রেণীর স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা শেখায়।

কিন্তু 'পণ্ডিতা' হিসাবে রমাবাঈ জানতেন, ভারতের 'মিথ্যা দর্শন' সম্বন্ধে কতখানি মিথ্যাভাষণ তিনি করেছেন। ও-বস্তুকে ধোপে টেকানো যাবে না। তখন তিনি ভারতের সমাজ নিয়ে পড়লেন—এবং "কিছুসংখ্যক ব্যক্তিকে সবসময়েই অন্ধ করে রাখা যায়," এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে, প্রচলিত মিশনারি রীতিতে, ভারতের সমাজ-কুৎসা করে গেলেন নাগাড়। শ্রোতারা জানল : "কোনো ভারতীয় বাড়িতে তিনি [রমাবাঈ] তাঁর [সদনের] কোনো বালিকাকে বিশ্বাস করে রাখতে পারেন না, এতই বীভৎস ভারতের দুর্নীতিকতা।" "হিন্দু ধর্ম-মতে নারীরা মিথ্যার মূর্তি, পুরুষেরা তাদের কাছে সত্য বলবে না।" "নারীরা পুরুষের সমান নয়; তারা মনুষ্যজাতীয় নয়, এমনকি পশুরও অধম।" "হিন্দু শাস্ত্রে নারীকে সৃষ্টির সবচেয়ে জঘন্য জীব করা হয়েছে—সর্বনিম্ন প্রাণীরও নীচে তার স্থান।" "নারীর কাছে যে তৃতীয় স্থানটি উন্মুক্ত আছে, তা হল নরক—সেখানে গিয়ে পুরুষ তাদের বিরক্ত করে না বলে ঐ একটি জায়গাতেই তারা মুক্তি পায়।" "শিশুকন্যাকে হত্যা করা দোষ নয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রমাবাঈকে দিয়ে বিবেকানন্দের প্রতিবাদে এইসব কথা বলাবার জন্যই তাঁকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং সন্দেহ নেই তিনি প্রাণখুলে তা বলেছিলেন। আর মরাঠাও পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়তে নিষ্ঠুরভাবে, কোনো ভদ্রতার ভড়ং না ক'রে, রমাবাঈকে তার জন্য আক্রমণ করেছিল। বলেছিল : "গত সংখ্যায় যখন আমরা পণ্ডিতা রমাবাঈকে...হিন্দুসমাজের শত্রু বলেছিলাম. .তখন আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি, এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের বক্তব্যের পক্ষে তথ্য এসে হাজির হবে।" "ধর্মান্তরসাধনে সচেষ্ট সকল মিশনারিই হিন্দুসমাজের শত্রু," কিন্তু তাদের মধ্যে রমাবাঈ "বিশেষ ধরনের শত্রু।" "তিনি নিজ নীড়েই ব্যাধ। সে হিসাবে ইউরোপীয় মিশনারিদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতি হিন্দুধর্মের করতে পারেন।" পণ্ডিতা দ্বিতীয়বার আমেরিকা সফরের কালে "মিথ্যাভাষণের শিল্পসৃষ্টিতে অধিকতর নিপুণ হয়েছেন।" "সম্ভবতঃ পণ্ডিতা ভেবেছিলেন, বহু হাজার মাইল দূরে মিথ্যা কথা বললে তাঁর কোনো বিপদ ঘটবে না, কিন্তু কুৎসা, খুনের মতোই ধরা পড়ে।" বিবেকানন্দের প্রভাবকে তাড়াতেই যে, পণ্ডিতাকে কুৎসার কুবাতাস বওয়াতে হয়েছিল, সেকথা বলার পরে, সম্পাদক লেখেন, "আমরা বলতে পারি, ভারতীয় মঞ্চ থেকে পণ্ডিতা তাঁর 'চিত্তাকর্ষক সংবাদের' কোনোটি পরিবেশন করতে পারবেন না। ওসব আমেরিকান শ্রোতাদের পক্ষেই উত্তম বস্তু!!" পণ্ডিতা বলেছিলেন—ভারতে মেয়ে হলে মেরে ফেলা হয়। তার এই মধুর উত্তর মরাঠা দেয় : "আমরা এইটুকু বলতে পারি, একজন ভারতীয় নারী অন্ততঃ শিশুকন্যা হত্যার অপরাধে অপরাধী নন—তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং পণ্ডিতার গর্ভধারিণী। কিন্তু ওঁর কন্যা স্বগৃহে যে-প্রকার ব্যাধিনীর ভূমিকা নিয়েছেন, তাতে বলতে পারি, উনি ঐ পাপটি করলেই ভাল করতেন। সেক্ষেত্রে ভারতের নারী ও পুরুষসমাজ এক অর্থলুব্ধ, গাঁজা-গল্প-বিলাসিনী নারীর দ্বারা তাদের অগোচরে দূরে সমুদ্রপারে প্রচারিত জঘন্য কুৎসার হাত থেকে অব্যাহতি পেত।"

এই লেখা পড়ে কিছু শিভাল্‌রাস ভারতীয়ের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল—কেননা ওতে নারীর অসম্মান করা হয়েছে। কিন্তু রমাবাঈয়ের কঠোর সমালোচনা কেবল মরাঠাই করেনি,

অমৃতবাজার, হিন্দু, এমন-কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে বিপিনচন্দ্র পাল পর্যন্ত করে-ছিলেন।[৫] যাইহোক, অভিযোগের উত্তরে মরাঠা ২৪ ডিসেম্বর পুনশ্চ এক সম্পাদকীয়ের মধ্যে লেখে : "উক্ত পণ্ডিতা, তথাপি বজ্জাত নারী, সম্বন্ধে ভুয়া ভদ্রতা দেখিয়ে লাভ নেই, যিনি আমেরিকান বদান্যতায় পুষ্ট হয়ে তাঁর চারিপাশের শান্তিময় হিন্দু-পরিবারগুলির

---

৫ অমৃতবাজার ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, তারিখে লেখে :

"It is exceedingly unfortunate that this talented Indian lady should be making herself detested by a large number of her countrymen. It was Macaulay who remarked that renegades are the worst enemies of progress and freedom. I am afraid that the remark seems to be only too true of Ramabai ever since she became a convert to Christianity... This Indian lady...has been circulating the grossest perversions of facts in America..." ["Pandita Ramabai Again," *ABP,* Dec. 30, 1899]

হিন্দু ১৩ জুলাই, ১৯০১, লিখেছিল :

"Pandita Ramabai though a convert to Christianity, appears to be a very bigoted woman. In her latest work the *Fruits of Christian Science in India* she says that 'with all the advancement of the nineteenth century, I am surprised and shocked to find that ancient philosophers are making their appearance in the United States under the guise of Christian names. It is a sad sight to me who is acquainted with the results of heathen philosophy and superstition to see educated people who enjoy the privilege of a Christian civilization being deceived by the glamour of a new name.' It was in the World's Parliament of Religions held in Chicago that Swami Vivekananda created a stir by expounding the Vedanta. Since then some Americans have opened their eyes and they are not as the Pandita thinks deceived by the 'glamour of a new name.' When she reached New York in 1898, she was surprised to see that women 'who are not deceived by the name of Christian Science but are confessedly studying and adopting the philosophy of Hindus'..." ["Pandita Ramabai", *Hindu,* July 13, 1901]

ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন বৃত্তিভোগী প্রচারক বিপিনচন্দ্র পাল আমেরিকা থেকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের পত্রিকা ইণ্ডিয়ান মেসেনজারে প্রেরিত পত্রে (২৯.৪.১৯০০) রমাবাঈ কী ধরনের মিথ্যা প্রচার করছিলেন তার উল্লেখ করেন।

"Pandita Ramabai had been in this neighbourhood, I was told, and naturally, had depicted the condition of Hindu women in colours which were essential for raising good collections... It is a hard work, very hard indeed, to secure justice against these pious exaggerations. A lie, which is all a lie, says Tennyson, can be faught outright, but a lie which is half a truth is the harder to fight, and it is these half-truths about India which are so exasperating."

ইণ্ডিয়ান মেসেনজার ৩ জুন, ১৯০০, রমাবাঈয়ের মিথ্যা ভাষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

ব্রহ্মবাদিন মার্চ, ১৯০০ সংখ্যায় 'হিন্দুইজম্ অ্যান্ড ইটস্ ক্রিটিকস্' নামক দীর্ঘ রচনায় রমাবাঈয়ের "দি ফ্রুটস্ অব ক্রীশ্চান সায়েন্স ইন ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থের প্রতিপাদ্যের দৃঢ় মর্যাদাপূর্ণ সমালোচনা করেছিল। রমাবাঈ এইকালে মিথ্যাচারের শেষ সীমায় পৌঁছেছিলেন, নচেৎ বেদান্তকে তিনি ক্রীশ্চান সায়েন্স বলে অভিহিত করতেন না। আসল কথা, রমাবাঈয়ের গোঁড়া আমেরিকান পৃষ্ঠপোষক-দের কাছে বেদান্ত-প্রভাবিত ক্রীশ্চান সায়েন্স-মত বেদান্তের মতোই চক্ষুশূল ছিল, এবং রমাবাঈয়ের এক ঢিলে তাঁরা বেদান্ত ও ক্রীশ্চান সায়েন্স, উভয়কেই নিকেশ করতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মবাদিন উক্ত অর্থলোভী মিথ্যাবিলাসী মহিলার বক্তব্যের কোন্ প্রতিবাদ করেছিল, তা জানানো প্রয়োজন নেই, তবে সামাজিক দুর্নীতির জন্য ধর্মকে দায়ী করার যে-চেষ্টা রমাবাঈ করছিলেন, তার একটা মুখের মতো জবাব দিয়েছিল বটে!—

মধ্যে অসন্তোষ ও অসুখের বীজ বপন করছেন।" যেসব আমেরিকান নারী রমাবাঈকে সাহায্য করছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়—"যদি আপনাদের ঘরের কোনো বিবাহিত নারীকে কোনো হীদেন-বিধবা কিডন্যাপ ক'রে নিয়ে যায়—স্বামী বা পিতার কাছ থেকে সরিয়ে আটকে রাখে—যাতে করে সেই নারী অধিক ঐহিক ও আধ্যাত্মিক আরামে থাকতে পারে—সেটা কেমন লাগে?" ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক শত্রুতার নয়, মিত্রতার—এই কথা মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেবার পরে, যা লেখা হয়, তাদের তাৎপর্য এই আশি বছরের ব্যবধানেও হারিয়ে যায় নি: "আমরা—দেশপ্রেমিকা আমেরিকান নারী যাঁরা রমাবাঈয়ের সাহায্য-সমিতির কর্মকর্ত্রী—তাঁদের কাছে নিবেদন করছি: তাঁদের মাইনে-করা এজেণ্ট তাঁদের নামে ভারতে যে-কাজ করছেন, তা কি ভারতে আমেরিকার যে-সুনাম ও সমাদর আছে, তার বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে?"

॥ ৩ ॥ বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলন সম্বন্ধে তিলকের কাগজে সমুচ্চ শ্রদ্ধা

রমাবাঈ ও রমাবাঈ-জাতীয়দের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে লড়াই করেছেন; [পুনায় নিবেদিতার দ্বারা বিধবাশ্রম খোলার ইচ্ছা তাঁর একবার ইচ্ছা হয়েছিল, পরে অবশ্য সে অভিপ্রায় ত্যাগ করেন; আমেরিকায় নিবেদিতা এইকালে রমাবাঈ-কুৎসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন৬]; তিনি ভারতকে দিয়েছেন সেবা প্রেম ও আত্মচেতনার সঞ্জীবনীমন্ত্র—এইসব কথা ভেবে তিলক ও তাঁর অনুবর্তীরা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিপুল ভাবাবেগ বোধ করেন। মরাঠায় ৭ মে. ১৮৯৯, 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম দিয়ে যে-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়, তা এক্ষেত্রে অন্যতম সেরা লেখা। এটি স্বয়ং তিলকের লেখা এমন বলার মতো উপাদান হাতে নেই, কিন্তু এটি যদি এন সি কেলকারের (যিনি আবার স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী) রচনাও হয়, তবু আভ্যন্তর প্রমাণ অনুযায়ী বলতে দ্বিধা নেই, এটি তিলকের সঙ্গে পরামর্শ-ক্রমে রচিত।

"আমরা পণ্ডিতার পন্থানুসরণ করতে চাইনা। আমেরিকা ও ইউরোপে যেসব বীভৎস পাপানুষ্ঠান হয়ে থাকে, তার বিবরণ-সংবলিত রাশিকৃত সংবাদপত্রের কর্তিত অংশ আমাদের কাছে আছে। সেগুলি উপস্থিত করছি না। কিন্তু যীশুখ্রীস্টের নব বার্তাবহকে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি। মধ্যযুগের ইউরোপে যে চরম জঘন্য অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অত্যাচার বর্তমান ছিল, তাদের জন্য কি খ্রীস্টধর্মকে দায়ী করব? দক্ষিণ আফ্রিকায় খ্রীস্টান জাতিগুলি যে পরস্পরের গলা কাটছে, তার জন্য কি খ্রীস্টধর্মকে দোষী করব? আমেরিকায় রেডইণ্ডিয়ানদের উপর পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের ব্যবহারের জন্য ঐ ধর্ম দায়ী? কালা নিগ্রোদের উপর সুবিচার প্রয়োগ করতে শ্বেত আমেরিকানদের লিনচ্-নীতি খ্রীস্টধর্মের অনুমোদিত নাকি? খ্রীস্টের নামে কতগুলি পবিত্র সমর ইউরোপে ঘটেছে? সেখানে ধর্মের নামে কত লক্ষ লোকের প্রাণ গিয়েছে? আমেরিকায় প্রতি মাসে কত শিশুহত্যা হয়? রমাবাঈ দয়া করে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিন। এবং তিনি দয়া করে 'ইফ্ ক্রাইস্ট কেম্ টু চিকাগো' বইটি পড়ে আনন্দে জানুন—আমেরিকা ও ইউরোপের খ্রীস্টান জাতিগুলির সামাজিক অবস্থা কী; তার সঙ্গে আমাদের জনগণের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক অবস্থার তুলনা করুন। তারপর তিনি নিজেই বিচার করে দেখুন, আমাদের প্রাচীন ঋষিদের বেদান্তের মতো পবিত্র, মহান, ধর্ম-দর্শনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কুৎসা করা উচিত কিনা?"

৬ নিবেদিতার চিঠিপত্রে পুনার নারী-আশ্রম প্রসঙ্গের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। স্বামীজীর পরিচিত ও গুণগ্রাহী মিঃ সেটলুর [তিলকের বিশেষ বন্ধু ও মামলাকালে তাঁর প্রধান সহায়] আলোচা প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

"The one great ambition of the Swami which he did not live long enough to fulfil was the establishment of a Ladies' Math in Poona, to train them to

রচনাটির শুরু কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাপ্রসঙ্গ দিয়ে। তারপর বলা হল, "বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিশেষ ইচ্ছা, তিনি ধর্মবিষয়ে কিছু বক্তৃতা এখানে করে যান।" তাঁকে যে, পূর্বেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সে প্রসঙ্গে লেখা হল : "কিছু ব্যক্তি হয়ত জানেন, ১৮৯৭ সালে পুনাবাসীর পক্ষে পশ্চিমভারত সফরের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি আসতে পারলে, সেই শরৎকালে হিন্দু জনগণ তাঁর প্রেরণা-প্রবুদ্ধ সম্মোহক বক্তৃতা, যা জড়-বাদী আমেরিকার বহুসংখ্যক হৃদয়কে পর্যন্ত বশীভূত করেছিল, শুনবার সুখ ও সৌভাগ্য অর্জন করত। কিন্তু ঐ বৎসর বর্ষা ঋতু থেকেই পশ্চিমভারতে দুর্বিপাক শুরু হয় এবং তাঁর আগমন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়।" পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পুনা-আগমনের কথা অতঃপর বলা হল, যা তিলকের স্মৃতিকথার অনুরূপ : "পুনার খুব কম লোকই সম্ভবতঃ জানেন—প্রায় সাত বছর আগে এক তরুণ সুদর্শন সন্ন্যাসী পুনায় এসে এখানকার সর্বাধিক পরিচিত নাগরিকদের একজনের সদাশিবপেটের বাড়িতে ছিলেন। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—তখন তিনি কিছুতে টাকা স্পর্শ করতেন না, তাঁর টিকেট অন্য লোক কেটে দিতেন। পুনা থাকাকালে, আমরা শুনেছি, পুনার বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনাসভায় মিলিত হবার সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল—সেখানে সন্ন্যাসীর ইংরাজি ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি এবং বাক্যালাপের শক্তি, সমবেত নাগরিকদের মনে অতি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।" তারপর, স্বামীজীর মহাবালেশ্বরে গমন ও সেখানে চমক-সৃষ্টি; পরে মাদ্রাজগমন ও সেখানে প্রতিভার পূর্ণ স্বীকৃতি; সেখান থেকে প্রফেট-রূপে আমেরিকাগমন—"প্রাচ্য আলোকের বর্ষণের জন্য।" মরাঠার সম্পাদক উদ্ধৃতিসহ যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে স্বামীজীর মত ও আদর্শের উপস্থাপনা করেছিলেন। এমন করার হেতু : "ভারতে বর্তমানে যে-ধর্ম প্রয়োজন, স্বামীজী ঠিক সেই ধর্মই দিয়েছেন।" "কী শক্তিশালী, প্রভাবশালী মন বিবেকানন্দের! প্রশস্ত, উদার, সুমার্জিত, আশা-বিশ্বাসে পূর্ণ, বিস্তার-শীল হিন্দুধর্মের যে-রূপকে তিনি উপস্থিত করেছেন, তাই হল একালের ভারতের প্রয়োজনের বস্তু।"

রচনা সমাপ্ত হয়েছে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে স্বামীজীকে পাবার ঐকান্তিক কামনা জানিয়ে :

"স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ যেদিন রূপায়িত হবে, সে হল মহা সুখের দিন। তার পূর্বে আমরা শুধু এই আশাটুকু পোষণ করি—স্বামীজী বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে পুনশ্চ আহূত হয়ে এসে উপস্থিত হোন, এবং জনসাধারণের মনকে অর্থহীন রাজনৈতিক কোলাহল থেকে সরিয়ে নিরাময়কারী এবং স্বাস্থ্যকর ধর্মের জগতে উত্তোলন করুন।"

রচনার সূচনাংশে একই ধরনের কথা ছিল। পশ্চিমভারতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য গণ্ড-গোলের জন্য স্বামীজীর আগমন স্থগিত হয়েছিল, একথা বলার পরে লেখা হয় :

"এখনও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত হয়নি। কিন্তু যদি তা সত্ত্বেও স্বামীজীকে ভারতের এই অংশে আনানো সম্ভব হয়, তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক হবে। কারণ স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণাময় আধ্যাত্মিকতার স্পর্শই এই প্রেসিডেন্সির মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নিরাময়ের প্রলেপ।"

তিলকের পত্রিকা সমকালীন ভারতবর্ষে এমন কথা অন্য কারো বিষয়ে লেখেনি বা লেখার কথা ভাবতে পারেনি।

৷৷ ৪ ৷৷ তিলকের ক্রমপরিবর্তিত সামাজিক ও ধর্মীয় ধারণার উপর বিবেকানন্দের প্রভাব

তিলক যে তাঁর ধর্মধারণায় বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এইসঙ্গে জানানো উচিত, উভয়ের মধ্যে সামাজিক ধারণায় অল্প-বিস্তর পার্থক্যও ছিল। স্বামীজী দায়িত্বহীন ধ্বংসাত্মক সমাজসংস্কার-চেষ্টাকে যেমন সমর্থন করতেন না, তেমনি ঐতিহ্যের দোহাই পেড়ে অমঙ্গলকর বস্তুকে বলবৎ রাখার প্রচেষ্টাকে আঘাত না করে পারেন নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সংস্কারকদের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা প্রধানতঃ ওঁদের অবলম্বিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে, উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে নয়।

সামাজিক ব্যাপারে তিলক প্রথমাবধি বিবেকানন্দের মতো প্রগতিশীল নন। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যেসব জিনিসের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ খড়্গহস্ত, তাদের সম্বন্ধে তিলক দ্বিধান্বিত। অবশ্য ঐসব সংস্কারের ব্যাপারে তিনি প্রধানতঃ বহির্গত হস্তক্ষেপের (যেমন আইনের সাহায্যে সংস্কার) অনৌচিত্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; তবু বেশ বোঝা যায়, এসব ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা কিছু সংকুচিত ছিল। ১৮৯৭, ৭ মার্চ, মরাঠায় এক সম্পাদকীয়তে তিনি সংস্কারকদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন, কিন্তু ঐসঙ্গে জাতিভেদ প্রভৃতি ব্যাপারে স্বামীজীর আগ্নেয় উক্তিগুলি তাঁকে উদ্ধৃত করতে দেখা যায়নি। নিম্নবর্ণকে ব্রাহ্মণাধিকার দানের ব্যাপারে তিলকের সংকোচ দেখা গেছে, যখন কোলাপুরের ছত্রপতি সাহু মহারাজকে ক্ষত্রিয়রূপে স্বীকার করার প্রশ্ন উঠেছিল। স্থানীয় ব্রাহ্মণরা মহারাজকে বেদোক্ত অধিকার দিতে রাজি হননি। তিলক এ-ব্যাপারে অতিরিক্ত গোঁড়ামি দেখান নি, কিন্তু মরাঠা-জাতিভুক্ত উক্ত মহারাজাকে বেদোক্ত ক্ষত্রিয়াধিকার দানে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না।

অপরপক্ষে বিবেকানন্দ সবসময়েই চেয়েছেন অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের স্তরে তুলতে। তবে সেটা যোগ্যতানুযায়ী হওয়া চাই। তিনি নিম্নবর্ণের মানুষকে প্রণোদিত করেছেন—নিজেদের উচ্চতর বর্ণে উত্থিত করাবার জন্য। এক্ষেত্রে প্রাচীন নজির দেখিয়ে বলেছেন—ঋষিরা অতীতে এমন কাজ বহু করিয়েছেন। তিনি বাংলার কায়স্থদের ক্ষত্রিয়াধিকারে, এবং দক্ষিণের নায়ারদের ব্রাহ্মণত্বে, প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

সামাজিক ব্যাপারে তিলককে কিছু রক্ষণশীল দেখলেও তাঁর চরিত্র কোনোমতে ম্লান বিবেচিত হয়নি স্বামীজীর কাছে। তিলকের মধ্যে মানুষকে ভালবাসার দুর্লভ ক্ষমতা তিনি দেখেছিলেন, আদর্শের জন্য ত্যাগস্বীকারে অপরিসীম সাহস। কংগ্রেসের পক্ষে গণসংযোগের প্রয়োজনকে তিলক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁতিদের নিয়ে সমবায়গঠন করে, বা প্লেগের সময়ে মৃত্যুভয় না রেখে সেবাকাজ করে, তিলক দেখিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর দ্বারা মানবিক অধিকার মূলে লঙ্ঘিত হবার সম্ভাবনা নেই। সে আশ্বাস স্বামীজী অবশ্যই বোধ করেছিলেন।

স্বামীজীর মরাঠি শিষ্য নিশ্চয়ানন্দের মতে, স্বামীজীর সংস্পর্শে আসার পরে তিলকের সামাজিক উদারতা বেড়ে যায়। এ-বিষয়ে অন্য সমর্থক প্রমাণ না পেলেও, তিলকের জীবনী-সূত্রে আমরা দেখেছি, সামাজিক ব্যাপারে তিলকের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ক্রমে বেড়েছে। তা তিলকের গণসংযোগ ও অন্যান্য অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় তাঁকে এক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারেনা তা নয়, বিশেষতঃ তিলক যখন স্বামীজীকে সমসাময়িক ভারতবর্ষের আচার্য বলে স্বীকার করেছিলেন।

ধর্মধারণায় তিলকের উপরে বিবেকানন্দের প্রভাব তিলকের মরাঠি-জীবনীকারেরা স্বীকার করেছেন। তিলকের এক জীবনীকার ১৮৯২ সালে তিলকের সঙ্গে বিবেকানন্দের গীতা-আলোচনা থেকে, এবং স্বামীজীর ধারণার সঙ্গে নিজ ধারণার ঐক্যে তিলকের সন্তোষ দেখে, তিলকের

গীতাভাষ্যের উপরে স্বামীজীর প্রভাব অনুমান করেছেন। সে প্রভাব ছাড়াও অন্য বিষয়েও বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। তিলক যখন অজ্ঞেয়বাদ থেকে আস্তিকতার দিকে আসছেন, ঠিক তখনই বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। বিবেকানন্দের দর্শন যে তিলকের মনোমত দর্শন, তা তিলকের সম্পাদনাকালে মরাঠা পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি। ৬ জুলাই, ১৮৯৬, মরাঠায় স্বামীজীর রচনার অংশ উদ্ধৃত ক'রে বলা হয় : "পৃথিবী সম্বন্ধীয় স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গি অতি অবশ্যই প্রতিটি বিবেচনা-সম্পন্ন মানুষের মনকে আকর্ষণ করবে।" ঐ দৃষ্টিভঙ্গি কী?—না, "এ-জীবন ভালও নয়, মন্দও নয়"—এই বৈদান্তিক তত্ত্ব। ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬, সম্পাদকীয়তে তিলক স্বামীজীর বক্তব্যকে সমর্থন করে লিখলেন : "যথার্থ ধর্ম কদাপি কোনো একজন প্রফেটের শিক্ষায় আবদ্ধ থাকতে পারে না; এক বিশেষ সময়ে একশ্রেণীর মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত সত্য-সংবলিত গ্রন্থেও তা সমাপ্ত থাকতে পারেনা। অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে—অজ্ঞেয়কে লাভ করবার জন্য আমরা বিভিন্ন উপায়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করি।" ঐ রচনায় বলা হয়, বিবেকানন্দের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, "শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ভাষায়।" "তাঁর প্রকাশ-রীতি যেমন মৌলিক তেমনি চিত্তাকর্ষক।" কেশরী পত্রিকায় ১৬ ফেব্রুয়ারি সম্পাদকীয়তে তিলক একই ধরনের কথা লেখেন : "বিবেকানন্দ অন্য ধর্মসম্বন্ধে একটি ত্রুটি দেখেছেন—সেগুলি ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। বাইবেল থেকে খ্রীস্টকে সরিয়ে নিলে পশ্চিমীদের ধর্ম লয় পাবে। কোরান থেকে মহম্মদকে সরালে কেউই, এমনকি কাজীরাও, বলতে পারবেন না, কোথায় আছে মুসলমান-ধর্ম।...ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর না করে, বেদান্ত শুদ্ধ সত্যসমূহ একত্র করেছে।...হিন্দুধর্মের দেবতারা কেবল আমাদেরই দেবতা নন—সকলের দেবতা। অন্যান্য ধর্মসমূহের দেবতারাও হিন্দুধর্মের পরিধির বহির্বর্তী নন। কারণ হিন্দুরা এই শিক্ষা দিতে সমর্থ যে, খাঁটি হিন্দুধর্মনীতির অন্তর্গত হয়ে আছে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সমুদয় জগৎসংসার। যে-পাশ্চাত্ত্যবাসিগণ প্রত্যক্ষ পৃথিবীর উপর আধিপত্য করছেন, তাঁদের সঙ্গে অন্তর্গত আত্মার পরিচয়সাধন করাবার কৃতিত্ব হিন্দুরা দাবি করতে পারে। স্বচ্ছন্দে আমরা বলতে পারি, মানুষ যদিনা প্রত্যক্ষ পৃথিবীর জ্ঞানের সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানকে মিলিত করতে পারে, সে যথার্থ সভ্যতার পথে অগ্রসর হচ্ছে বলা যাবে না।" স্বামীজীর চিন্তার আক্ষরিক উপস্থাপন এখানে ঘটেছে বলতে পারব না, তবু তিলক কিভাবে তাঁর ভাবধারাকে গ্রহণ ক'রে, তার প্রচার করছিলেন, উদ্ধৃত অংশে তা দেখতে পাই। স্বামীজীর চিন্তা সম্পর্কে তিলক অনুরূপ সমাদর জানিয়েছেন স্বামীজীর দেহত্যাগে লিখিত শোকপ্রবন্ধে। [সেটি পরে সম্পূর্ণতঃ উপস্থিত করব।]

তিলক-সম্পাদিত কেশরী পত্রিকায় ২০ অগস্ট, ১৯০০, স্বামীজীর কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের মরাঠি অনুবাদ প্রসঙ্গে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা হয় :

"একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, স্বামী বিবেকানন্দ বৈদিক তত্ত্ব ও নীতিকে নূতনভাবে প্রকাশে সবিশেষ পারদর্শী। ইউরোপ আমেরিকায় বেদান্তমত বিস্তারের গৌরব অবশ্যই বিবেকানন্দকে দিতে হবে। নৈয়ায়িক বা মীমাংসকদের চিন্তাপ্রকৃতি, ও তাঁদের দৃষ্টান্ত-যোজনার পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জগতের মানুষের পরিচয় প্রায় নেই। পুরাতন স্বর্ণা-লংকার যেমন গলিয়ে নূতন আকার দেওয়া হয়, তেমনি বেদান্তমতকে অবশ্যই বর্তমানে নূতন আকার দিতে হবে। বিবেকানন্দ সে কাজ করেছেন সর্বোচ্চ-সম্ভব উপায়ে। **রাজযোগ, কর্ম-যোগ ও ভক্তিযোগ ভগবদ্‌গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু তাদের কিভাবে ভিন্ন আকারে পরিবেশন ক'রে সাধারণের কাছে আকর্ষক করে তোলা যায়, তা বিবেকানন্দের বই না পড়লে বোঝাই সম্ভব নয়।**...নব্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত মানুষ সংস্কৃত পুস্তকের রীতিকে বিচিত্র মনে করে।...তাঁরা যেন বিবেকানন্দের বই ইংরাজিতে পড়েন,...তারপর পুরাতন তত্ত্ব ও প্রমাণ-

পদ্ধতির সঙ্গে নবপদ্ধতির সামাঞ্জস্য ক'রে, শুধু মরাঠি জানে, এমন মানুষদের কাছে মরাঠি ভাষায় তাকে উপস্থিত করেন। এইভাবেই আমাদের পুরাতন স্বর্ণালংকারকে বাক্সবন্দী ক'রে না রেখে, যদি গলিয়ে নবরূপ দিয়ে উপস্থিত করা যায়, তাহলে আমরা বহুভাবে উপকৃত হব। [একেই স্বামীজী বলেছিলেন, বনের বেদান্তকে সকলের মধ্যে হাজির করা]। যাঁরা কেবল পুরাতন পদ্ধতিতে বেদান্ত পড়েছেন, তাঁদের একবার অন্ততঃ [বিবেকানন্দের গ্রন্থের] এই মরাঠি অনুবাদ পড়বার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম।"

তিলকের জীবনীকারদ্বয় [প্রধান ও ভাগবত] জানিয়েছেন, ১৮৯৭-৯৮ সালে এগারো মাস জেলে থাকার সময়ে তিলক গভীর অধ্যয়নে নিমজ্জিত ছিলেন—সে সময়ে গীতা ও বেদ, তাঁর বিশেষ অনুশীলনের বস্তু হয়। গীতা সম্বন্ধে তিলকের ভাবনার প্রথম সূত্রপাতের কালে, অর্থাৎ ১৮৯২ সালে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর ঐ-বিষয়ে আলোচনা; তারপরে ১৮৯৭-৯৮ সালে যখন ঐ ভাবনা তাঁর কাছে স্পষ্টীকৃত হচ্ছে তখন দেশে বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার জোয়ার; এবং নিজের পত্র-পত্রিকায় তিলকের সে বিষয়ে স্বীকৃতি—তিলকের ধর্মধারণায় বিবেকানন্দের প্রভাবের পক্ষে অসন্দিগ্ধ প্রমাণ।

তিলকের উক্ত দুই জীবনীকারের মত (অন্য জীবনীকাররাও এক্ষেত্রে সহমত)—১৮৯৭-৯৮ সালে কারাবাসকাল থেকে পরবর্তী দু'তিন বৎসরের মধ্যে তিলকের ধর্মধারণা সংহত হয়, এবং এ-ব্যাপারে ম্যাক্সমূলারের গ্রন্থ ও বিবেকানন্দের বাণী ও ব্যক্তিত্ব সর্বাধিক প্রভাব তাঁর মনে বিস্তার করে।৭ আমাদের ধারণা, ম্যাক্সমূলারের তুলনায় বিবেকানন্দের প্রভাব গুরুতর হয়, কারণ ম্যাক্সমূলার যেখানে 'ধর্মগ্রন্থকে' উদ্ধার করেছিলেন, সেখানে বিবেকানন্দ উদ্ধার করেছিলেন 'ধর্ম'কে। ম্যাক্সমূলার ও বিবেকানন্দের দেহত্যাগে লেখা তিলকের শোকপ্রবন্ধগুলি পড়লেই তা বোঝা যায়। প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বাণী অপেক্ষা ব্যক্তিত্বের শক্তি অধিক প্রবল ও গভীরচারী। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিলকের প্রবল আবেগের কথা আগেই বলেছি। এমনকি বেদান্তধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের তুলনায় ম্যাক্সমূলারের সীমাবদ্ধতার কথা মরাঠা লিখেছিল ২৯ অক্টোবর, ১৮৯৯, সম্পাদকীয়তে। [২য় খণ্ড, ২৩২] সেখানে দেখা গেছে যে, মরাঠা-সম্পাদক বলতে চেয়েছেন [এক্ষেত্রে অবশ্যই তিলকের মতের

৭ "Vivekananda's dynamic personality and his teaching of the Vedantic Hindu doctrine, acclaimed even by the Western world, could not fail to impress Tilak. Along with Prof. Max Muller, Vivekananda was another powerful influence in turning the thoughts of Tilak from Western to Eastern philosophy." [*Lokamanya Tilak* by Pradhan and Bhagwat, P-140]

তিলকের গীতার উপরে অন্যান্যের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রভাব বিষয়ে টি ভি পরভাতে লিখেছেন:

"His [Tilak's] commentary on the Geeta establishes a new and convincing theory of Karmayoga, but he does not claim that he was entirely original in propounding it. He has given credit therefore, to Swami Vivekananda, Books of the Theosophical Society, and Prof. Radhakrishnan while writing about this point in his preface to the Geeta-Rahasya." [*Bal Gangadhar Tilak,* by T.V. Parvate, 302]

"At this time the dynamic personality of Swami Vivekananda sent a thrill throughout India... He preached the message of Hinduism in a modern way, intelligible to the Westerners...and was given a tremendous ovation. He sought to make Vedantism into a spiritual science which far from being imcompatible with Western science, would go beyond it. Vivekananda's success synchronised with Tilak's comparative study of the Hindu and Western thought." [Pradhan and Bhagwat, 82]

প্রতিধ্বনি ছিল]—বেদান্তচর্চা ক'রে খ্রীস্টান ম্যাক্সমুলার উদার হলেও পুরো উদার হতে পারেন নি, নচেৎ তিনি প্রতাপ মজুমদারকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে আহ্বান করতেন না; বেদান্ত, ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করে না; বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন, বেদান্ত উদারতা ও সর্ব-গ্রহণশীলতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, মত-পথের ঊর্ধ্বে, এক সত্যের অর্হণার কথা বলেছে, ইত্যাদি।

তিলকের জীবনীতে তাঁর ধর্মধারণার বিষয়ে যা লেখা হয়েছে, তার সারাংশ এই :

"১৯০০ খ্রীস্টাব্দে গণপতি উৎসবে হিন্দুধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতায় তিলক বলেন : 'সর্ব মত-পথ, জাতি ও বর্ণের হিন্দুদের এক ছত্রতলে আনতে হবে, কিন্তু বাদ দিতে হবে, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান ও মুসলমানদের। খ্রীস্টধর্ম ও মুসলমানধর্মের বিপরীত বিশ্বাস হিন্দুধর্মের —ঈশ্বরের অবতার এক নন বহু—যদিও হিন্দুধর্ম শেষপর্যন্ত এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বস্তুতঃ পক্ষে হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—ঈশ্বরের প্রেম ও করুণার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতায় তা বিশ্বাস করে না। হিন্দুধর্মের সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের পার্থক্য হল—হিন্দুধর্মে আছে এক ঈশ্বর এবং বহু অবতার;...অপরাপর ধর্মসমূহে আছে এক ঈশ্বর ও এক পথের অনড় ধারণা। হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের বহুধা প্রকাশ এবং বহু পথের অস্তিত্ব স্বীকার করে।'... তিলক মূর্তিপূজার সমর্থন করেছিলেন এই বলে যে, তা হল ঈশ্বরের প্রতীক উপাসনা; ঈশ্বরের অনন্ত অসীম রূপ ধারণাতীত বলে প্রতীকের সাহায্য নিতে হয়।...আমরা তো গোটা বিশ্বজগৎকে সামনে আনতে পারি না, আমরা তার প্রতিনিধি হিসাবে কিছু অংশকেই দেখাতে পারি।...মূর্তি হল ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপক রূপের প্রতিনিধি। যেসব ধর্ম মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করে না, তাদেরও কোনো না কোনো রূপে প্রতীককে স্বীকার করতে হয়েছে। তাকে অস্বীকার করতে গিয়েই প্রার্থনা সমাজের মতো সংস্কারবাদীরা ব্যর্থতার শিকার হয়েছে।"
[প্রধান ও ভগবত, ১২৮-২৯]

কারোরই বুঝতে অসুবিধা হবে না, তিলক স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন, যদিও স্বামীজীর ভাষা ও চিন্তার প্রবলতা এখানে নেই। একটি ক্ষেত্রে স্বামীজীর ধারণার সঙ্গে ঈষৎ পার্থক্য অবশ্য আছে; তিলক বৌদ্ধ ও জৈনদের হিন্দু-পরিধির বাইরে রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু স্বামীজী ঐ দুটি সম্প্রদায়কে হিন্দু-পরিধির বহির্বর্তী ভাবেন নি।

১৯০২ সালের একেবারে গোড়ায় কলকাতায় তিলকের ধর্মবিষয়ক একটি বক্তৃতার উল্লেখ এখানে করা যায়, যেটি খুব সম্ভবতঃ স্বামীজীর সঙ্গে সদ্য সাক্ষাতের পরে দেওয়া হয়। সভাটি হয়েছিল বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেস প্যান্ডালে। তিলক এখানে যা বলেন, তা প্রায় আক্ষরিকভাবে স্বামীজীর বক্তব্যের অনুরূপ। বক্তৃতার সারাংশ বেরোয় ২ জানুয়ারি, ১৯০২ অমৃতবাজারে—সেখান থেকে গৃহীত হয় ১২ জানুয়ারি, মরাঠায়। অমৃতবাজারের বিবরণ এই :

"মিঃ তিলক সূচনাতে বলেন, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে বিষয়টির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়, তাই তিনি কেবল হিন্দুধর্মের সংজ্ঞানিরূপণ করতে চেষ্টা করবেন, সেইসঙ্গে এই বিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে তার টিকে থাকার সম্ভাবনার কথাও বলবেন। ধর্ম বলতে প্রচলিত অর্থে অনেক কিছু বোঝায়, যা কিন্তু মূলগতভাবে তার সঙ্গে যুক্ত নয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যরীতি, জাতিভেদ ইত্যাদির কিছু যোগ হিন্দুধর্মের সঙ্গে আছে মনে করা হয়। কিন্তু যথার্থ বলতে গেলে, তারা সামাজিক ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়; সেগুলি ভালো, মন্দ, সামান্য, সাধারণ, যা'হোক হতে পারে। খাঁটি অর্থে ধর্ম বলতে বোঝায়, ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান—আর মানবাত্মা কিভাবে মুক্তিলাভ করতে পারে, সেই উপায়-নির্দেশ। হিন্দুধর্মকে অন্য ধর্মের সঙ্গে তুলনা করার সময়ে এই সংজ্ঞা সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। এই সংজ্ঞার আলোকেই এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হতে পারে। বক্তা তারপর বর্তমানে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যেসব শক্তি সক্রিয় তাদের বিবরণ দেন। তারা হল বিজ্ঞান ও

জড়বাদ, খ্রীস্টানধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম, তৎসহ দারিদ্র্য—তার সাহায্যে খ্রীস্টান মিশনারিরা গত দুর্ভিক্ষের সময়ে এক লক্ষ শিশুকে খ্রীস্টান করে ফেলেছে। মিঃ তিলক তারপর সংক্ষেপে হিন্দুশাস্ত্রকথিত ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের বিষয়ে বলেন। তিনি দেখিয়ে দেন—এক্ষেত্রে হিন্দুভাবসমূহ আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণাবিরোধী নয়। হিন্দুশাস্ত্র যেভাবে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, বা যোগমার্গকে স্ব-স্বভাব অনুযায়ী মুক্তিপথ হিসাবে গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছে, তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, এ-জিনিস অন্য ধর্মে স্বীকৃত নয়।...পরিশেষে তিনি বলেন, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য অপর ধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণুতার মনোভাব। এইসঙ্গে তিলক সত্যজ্ঞানের উন্মোচন সম্বন্ধে হিন্দু-ধারণার ব্যাখ্যা কবেন। তিনি বলেন, বেদের জ্ঞানরাশি যে চিরন্তন তা যুক্তিসিদ্ধভাবে, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব। সে জ্ঞান যুগ-যুগ ধরে, একেবারে আদিম তুষারযুগ থেকে বাহিত হয়ে এসেছে। তিনি এই বলে বক্তৃতা শেষ করেন...যেসব শত্রু হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে সকল হিন্দুর ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো উচিত, কারণ বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুধর্মই একমাত্র ঐক্য-বন্ধন। হিন্দুধর্ম ছাড়া আমরা ভেসে যাব।"

বক্তৃতার পরে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন বৈষ্ণব-প্রচারক আনন্দচরণ মিত্র। তিনি যথা-রীতি নিজেদের মত জাহির ক'রে, কেবল বৈষ্ণবধর্ম এবং তার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের মতাদর্শের কথাই বলেন। তিলকের সঙ্গে অমৃতবাজার-গোষ্ঠীর গভীর সৌহার্দ্য ছিল, শিশির-কুমার ঘোষকে তিলক রাজনৈতিক গুরুর সম্মান দিতে ভালবাসতেন, কিন্তু তাই বলে তিলক ধর্মধারণার ক্ষেত্রে অমৃতবাজারের মতকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না—এক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি বিবেকানন্দের অনুসারী। উল্লেখ্য, মরাঠা পত্রিকা তিলকের ভাষণটুকু অমৃতবাজার থেকে নিয়ে প্রকাশ করেছিল কিন্তু বর্জন করেছিল আনন্দচরণের বৈষ্ণব গোঁড়ামির কথাগুলি।

॥ ৫ ॥ বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ

১৯০১, ডিসেম্বরের শেষে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। তার একটা শুভফল অন্ততঃ আমরা দেখতে পাই—এর জন্যই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নায়কের সঙ্গে ভারতের ধর্মগুরুর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনার পরে স্বামীজী আর মাত্র মাসছয়েক মর্ত্যবাস করবেন।

কলকাতায় আসার পথে তিলক বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। তাই ছিল স্বাভাবিক। তাঁর চরম পন্থা, দুঃসাহস, ত্যাগবরণ—ভাবপ্রবণ বাঙালীর কল্পনাকে চঞ্চল করেছিল। তিলকের মামলার সময়ে বাংলা থেকে তাঁকে আর্থিক ও আইনগত সাহায্য করা হয়। মহারাষ্ট্র ও বাংলার আত্মিক সম্পর্ক তখন ঘনিষ্ঠ। সাহেবি কাগজগুলির মতে, ভারতের রাজনৈতিক অশান্তি বাঙালি বাবু ও মরাঠি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি।

পুনার বাইরে তিলক যে কলকাতাতেই সর্বাধিক সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, তা মরাঠা পত্রিকার ১২ জানুয়ারি, ১৯০২, সম্পাদকীয়তে স্বীকৃত হয়েছিল :

"কারামুক্ত হবার পরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে যোগ দিতে মিঃ তিলক কলকাতায় প্রথম যান—সেই কারণে কংগ্রেসে সমবেত বাঙালীরা যোগ্যভাবে তাঁর বিষয়ে আবেগ প্রকাশ করবেন, সেটাই প্রত্যাশিত। মিঃ তিলক যখন তৃতীয় দিনের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব সমর্থনের জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন তিনি যে-অভিনন্দন লাভ করেন তা সত্যই অপূর্ব—সমগ্র জন্মণ্ডলী দাঁড়িয়ে উঠে প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনির সঙ্গে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। কংগ্রেস-সপ্তাহের মধ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত যে দু'একটি সামাজিক সভায় তিলক যোগদান করেছিলেন, সেই সকল জায়গাতেও তাঁকে অনুরূপ অভিনন্দন জানানো হয়। এই কলকাতাই তিলকের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দশ হাজার টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছিল, এবং কলকাতার কাছেই তিনি

১৮৯৭ সালের কেশরী মামলার আইন-বিষয়ক পরামর্শাদির জন্য মুখ্যতঃ ঋণী। সুতরাং নিজ প্রদেশের বাইরে মিঃ তিলক কলকাতাতেই যে সবচেয়ে অনুরাগতপ্ত সংবর্ধনা পাবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।"

কংগ্রেসের কোলাহল ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসের এই লোকমান্য নায়ক একদিন উপস্থিত হলেন কলকাতার কয়েক মাইল দূরে একটি সন্ন্যাসী-মঠে, এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ-বাসনায়—যে-সন্ন্যাসী দেশের আচার্যবরিষ্ঠ। এই সাক্ষাৎকার তখন সংবাদপত্রের সংবাদ-বিষয় হয়নি। অন্যান্য কাগজের কথা বাদ দিচ্ছি—তিলকের মরাঠা বা কেশরী, বিবেকানন্দের উদ্বোধন, প্রবুদ্ধ ভারত বা ব্রহ্মবাদিন—কোথাও এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ পাইনি। সাক্ষাৎকারটি কেন সংবাদপত্রের সংবাদ হয়নি তা আমরা জানি না, কিন্তু এটা জানি, জগতের অধিকাংশ গভীর ও বৃহৎ ব্যাপার সংবাদপত্রের চোখের অন্তরালেই ঘটে থাকে।

প্রাসঙ্গিকভাবে জানাই, ভারতের জাতীয় চেতনাসৃষ্টিতে বিবেকানন্দের সর্ববৃহৎ ভূমিকা প্রতীয়মান ছিল বলে, তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা কর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীর চতুর্থ খণ্ডে (১৯১৮ সংস্করণ) একটি সমকালীন রচনার অংশ উদ্ধৃত হয়েছিল; তাতে পাই :

"তাঁর দেহত্যাগের কয়েক মাস আগে বড়দিনের সময়ে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নানা স্থান থেকে প্রতিনিধিবর্গ, সংস্কারকগণ, এবং জীবনের নানা পর্যায়ের বিরাট ব্যক্তিরা কলকাতায় সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই শহরে অবস্থানকালে, প্রতি অপরাহ্নে বেলুড়-মঠে আসতেন স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। স্বামীজী তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়সমূহের আলোচনায় আলোকিত করতেন। বস্তুতঃপক্ষে এই আলোচনাসভাগুলি যেন স্বতন্ত্র একটি কংগ্রেস হয়ে দাঁড়াত, যা আসল কংগ্রেসের অধিবেশনের চেয়ে ভাবে ও চরিত্রে উচ্চ ধরনের ছিল।"

একই জায়গায় পাই, লখনৌ অ্যাডভোকেটের সম্পাদক এইকালে স্বামীজীর দর্শনে এসে তাঁকে "উত্তর ভারতীয়দের পক্ষেও গৌরবজনক বিশুদ্ধ মার্জিত হিন্দীতে" কথা বলতে শুনেছিলেন, এবং দেখেছিলেন, "ভারতের জাগরণের জন্য নিজ পরিকল্পনার কথা বলবার সময়ে স্বামীজীর মুখ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।"

বিবেকানন্দ ও তিলকের এই সর্বশেষ সাক্ষাতের বিষয়ে তথ্য আমরা কয়েকটি সূত্র থেকে পেয়েছি, সেগুলি হল :

(ক) বেদান্ত কেশরী পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলা তিলকের স্মৃতিকথা (জানুয়ারি, ১৯৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত); (খ) প্রহ্লাদনারায়ণ দেশপাণ্ডে কর্তৃক ১৯১৫ সালে তিলকের কাছ থেকে সংগৃহীত স্মৃতিকথা, ("লোকমান্য তিলক যাঁচ্য়া আঠবণী ওয়া আখ্যায়িকা, খণ্ড তিসরা" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত), যা মোটামুটি বেদান্ত কেশরীর বিবরণের সঙ্গে এক; (গ) বিনায়ক বিষ্ণু রানাডের বিবরণ (একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। ইনি স্বামীজীর সঙ্গে তিলকের সাক্ষাতের কালে বেলুড়-মঠে উপস্থিত ছিলেন; (ঘ) মহেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রদত্ত বিবরণ; স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী নিশ্চয়ানন্দের কাছ থেকে শোনা সংবাদ তিনি পরবর্তীকালে প্রকাশ করেছেন; (ঙ) ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণ; তিলকের সহযোগী বিপ্লবী বসু-কাক্কা যোশীর কিছু উক্তি ইনি জানিয়েছেন; (চ) গিরিজাশংকর রায়চৌধুরীর বর্ণনা, তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে; (ছ) কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা; (জ) "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণ"-লিখিত স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীর চতুর্থ খণ্ডের সংবাদ; এই খণ্ড ১৯১৮ সালে, তিলকের জীবনকালেই প্রকাশিত হয়; এর মধ্যে তিলকের নামোল্লেখ না করে ঐ সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়েছে।

প্রথমে স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীর বিবরণটুকু দেওয়া যাক :

"এই বৎসর (১৯০১) ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ দলে-দলে বেলুড়-মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা স্বামীজীকে আধুনিক ভারতের দেশপ্রেমিক-ঋষি বলে মনে করতেন—তাই তাঁকে দর্শন এবং শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে স্বামীজী প্রায়শঃ ইংরাজিতে কথা না বলে হিন্দীতে বলতেন, যা তাঁদের মনে নিশ্চিতভাবে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। **একদিন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ এক নেতার সঙ্গে নিজের সর্বাধিক প্রিয় এক বিষয়ে কথোপকথনকালে স্বামীজী মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দেড় ঘণ্টাকাল এপাশ-ওপাশ পায়চারি করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে গভীর ভাবাবেগপূর্ণ অনর্গল বাক্য উৎসারিত হয়েছিল।**"

কোনোই সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের ঐ "সর্বোচ্চ এক নেতা"—বালগঙ্গাধর তিলক।

উক্ত শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদান্ত কেশরীতে সংকলিত তিলকের আত্মকথা এই :

"কলকাতায় এক কংগ্রেস-অধিবেশনকালে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড়-মঠে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের অতি সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। আমরা একসঙ্গে চা-পান করেছিলাম। কথাবার্তার সময়ে স্বামীজী কিছু রহস্য ক'রে বলেছিলেন, খুব ভালো হয় যদি আমি সংসারত্যাগ করে তাঁর বাংলাদেশের কাজের ভার গ্রহণ করি—সেক্ষেত্রে তিনি মহারাষ্ট্রে গিয়ে আমার কাজের ভার নেবেন। 'দূর দেশে যেমন প্রভাব বিস্তার করা যায়, নিজের দেশে তেমনটি হয় না'—তিনি বলেছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে প্রহ্লাদনারায়ণ দেশপাণ্ডে সংকলিত তিলক-স্মৃতিতে যা পাই তাতে বক্তব্যের ঐক্য থাকলেও ভঙ্গি-পার্থক্যের জন্য মাত্রাভেদ ঘটে গেছে। সে লেখা এই :

"যখন আমি [তিলক বলেছিলেন] ১৯০১ সালে কংগ্রেসে যোগ দিতে কলকাতায় যাই, তখন বিবেকানন্দের বেলুড়-মঠে গিয়েছিলাম। সেখানকার স্বামীজীরা সকলেই আমাদের প্রাণখোলা অভ্যর্থনা জানান। শহরের উপান্তে গাছে-ঘেরা মঠ দেখে আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল। আমরা বিবেকানন্দের সঙ্গে কয়েক বিষয়ে আলোচনা করি। 'ধর্ম' তাঁর মুখ্য আলোচনার বিষয় হলেও জনগণ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তিনি সম্যক্ অবহিত ও উৎসুক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে-কোনো বিষয়ে আলোচনাই গভীর আনন্দের বস্তু। আলোচনার সময়ে বুঝতে পারলাম—জনগণের শিক্ষা, ঐক্য, এবং জাগরণের বিষয়ে তাঁর কী তীব্র আগ্রহ। বিবেকানন্দ কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—'নিজ প্রদেশে মানুষের বুদ্ধির সক্রিয় প্রভাব সত্বর বিস্তৃত হয় না। আপনি ধর্মে বিশ্বাসী—সন্ন্যাস নিয়ে চলে আসুন বাংলাদেশে; এখানকার মানুষকে শিক্ষা ও ধর্ম দিয়ে জাগ্রত করে তুলুন; আর আমি একই উদ্দেশ্যে যাই মহারাষ্ট্রে।' আমি তখনি বললাম, আমি কখনই সন্ন্যাস নেব না। বিবাহিত জীবনেই আমি সবকিছু করতে পারি। তাছাড়া আমি এও মনে করিনা যে, নিজ প্রদেশে মানুষের বুদ্ধি সক্রিয় শক্তিবিকাশ করতে পারে না। আমার মতে, যিনি নিজ প্রদেশে সামনের সারিতে থাকেন, অপর প্রদেশে কিংবা সমগ্র দেশে অগ্রবর্তী আসন লাভ করার সম্ভাবনা তাঁর আছে।"

বেদান্ত কেশরীর বিবরণের সঙ্গে দেশপাণ্ডে-বিবরণের পার্থক্য—প্রথমক্ষেত্রে তিলক স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনার বিষয় প্রায় জানান নি, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে তা বলেছেন। দেখা যায়, ধর্ম ছাড়া যে-বিষয়টি আলোচনায় প্রাধান্য পায়, তা হল, জনগণের সমস্যা। সাধারণ মানুষের জাগরণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর স্থায়ী উৎকণ্ঠার কথা এখানে পুনশ্চ জানা গেল।

উভয় বিবরণেই আছে : স্বামীজী তিলককে সন্ন্যাস নিয়ে বাংলায় এসে কাজ করতে বলেছিলেন। প্রথম বিবরণ অনুযায়ী, স্বামীজী রহস্য করে ওকথা বলেন। দেশপাণ্ডে-বিবরণে রহস্য করে বলার কথা নেই। ফলে অর্থমাত্রার প্রভূত পরিবর্তন ঘটে গেছে।

তিলককে স্বামীজী রহস্য করেই সন্ন্যাস নিতে বলেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। আবার একথাও বলতে হবে, তিনি রহস্য করে প্রাণের কথাই বলেছিলেন। একই অনুরোধ তিনি জাপানী ওকাকুরাসহ অনেককেই করেছেন।

তিলক সন্ন্যাসী হতে চাননি। তিনি নিশ্চয় স্বামীজীর রহস্যোক্তিকে রহস্য করেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে তিলক যে, সন্ন্যাস অপেক্ষা গৃহীর কর্মসন্ন্যাসে অধিক আস্থাশীল ছিলেন, তা বেদান্ত কেশরীর বিবরণেও পাই। সেখানে তিনি বলেছেন, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ও স্বামীজী একমত হয়েছিলেন যে, গীতা সংসারত্যাগের কথা প্রচার করেনি; ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে, নির্লিপ্তভাবে কাজের উপদেশই গীতায় দেওয়া আছে। অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্বামীজীর মত সম্বন্ধে তিলকের ধারণা যথার্থ নয়।

এক্ষেত্রে আমরা যোগ করতে পারি, সন্ন্যাসের ব্যক্তিমুক্তির লক্ষ্যের কথা বাদ দিলেও, ভারতের জাগরণের জন্য অন্ততঃ ভারতীয় নেতা ও কর্মীদের কিছু সময়ের জন্য সন্ন্যাসী-তুল্য জীবনযাপন করতে হবে—স্বামীজী তা স্পষ্ট বুঝেছিলেন। সে কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল পরে। পরবর্তী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী, এবং অরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসীতুল্য।৮

দেশপাণ্ডে-বিবরণের শেষাংশ সর্বথা গ্রাহ্য নয়। সেখানে দেখি—"নিজ প্রদেশে প্রতিভার সমাদর হয় না"—স্বামীজীর এইকথা শুনে তিলক যেন স্বামীজীকে রীতিমতো সর্বশিক্ষা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, স্বামীজী তখন আর 'শিক্ষিত' হবার অবস্থায় ছিলেন না। উল্টো-দিকে, তিলক যথেষ্টই জানতেন, স্বামীজী কোন গভীর বেদনা থেকে ঐ রহস্যোক্তি করেছেন। এই সাক্ষাতের আগে তিলকের পত্রিকাতেই স্বামীজী-প্রসঙ্গে কয়েকবার লেখা হয়েছে "প্রফেট নিজ দেশে সম্মানিত হন না।" তাছাড়া বিবেকানন্দ-বিরোধীদের চরিত্র তিলক যথেষ্ট জানতেন, সে-বিষয়ে নিজ কাগজে লিখেছেনও। এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে ঐ বিশাল বেদনাময় ব্যক্তিত্বকে উক্ত পরিপক্ক উপদেশ দেওয়ার চালাকি করা সম্ভব ছিল না। তিলক জানতেন, স্বামীজী আপস

৮ সন্ন্যাস সম্পর্কে তিলকের সঙ্গে শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীদের মতভেদ ছিলই। মরাঠিতে লেখা তিলকের সুবৃহৎ গীতারহস্যের ক্ষুদ্র এক ইংরাজি সারসংক্ষেপ করেন জনৈক ভি এস যোশী। এই পুস্তিকার উপরে প্রবুদ্ধ ভারত অগস্ট ১৯১৬ সংখ্যায় মন্তব্য করে। তিলকের মতামতকে যথাযথ-ভাবে ঐ পুস্তকে উপস্থিত করা হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে প্রবুদ্ধ ভারত ঈষৎ সংশয় প্রকাশ ক'রে বলে—দেখা যাচ্ছে, তিলক অদ্বৈতবাদী ছিলেন, এ-ব্যাপারটি যোশীর পছন্দের বিষয় নয়।

তথাপি যোশী-উপস্থাপিত তিলকের মতের একাংশের প্রতিবাদ প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক করে-ছিলেন। তিলকের অভিযোগ ছিল, শঙ্করাচার্য নিজ মতের সমর্থনে গীতার মূল পাঠের অনুচিত ব্যাখ্যা করেছেন। সে কথার সত্যতা কিছুটা স্বীকার করে সম্পাদক বলেন, ও-রকম ব্যাপার শঙ্করাচার্য অতি অল্প ক্ষেত্রেই করেছেন। তাছাড়া কাল-প্রয়োজনও ছিল। বৈদিক অদ্বৈতবাদের উপর যখন সর্ব-দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছিল—মন ও বুদ্ধির সেই বিশৃঙ্খলার যুগে মূল ধর্মাধার কারা হবেন সেই প্রশ্নের মীমাংসারূপে শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসাশ্রমের উপর জোর দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস এবং কর্ম-যোগের মধ্যে তিলক যে-ভেদরেখা টানতে চেয়েছিলেন, প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক তাতেও আপত্তি করেন। তাঁর মতে, শঙ্করাচার্য কর্মবিরতি চেয়েছিলেন, একথা সত্য নয়। ভারত-ইতিহাসের এক প্রধান কর্মবীর শঙ্করাচার্য—তিনি কর্মবিরত ছিলেন? কোন্ আধুনিক দেশপ্রেমিকের জীবন তাঁর থেকে কর্মময়?—সম্পাদকের প্রশ্ন। অবতারদের নিরন্তর কর্মময় জীবনের কথা বাদ দিয়ে, সন্ন্যাসী-দের জীবন পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে চার প্রকার যোগেরই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে —সম্পাদক দাবি করেছিলেন।

কিন্তু সত্যই কি তিলক শঙ্করাচার্যকে কর্মত্যাগের আদর্শ-প্রচারক ভেবেছিলেন? কিছু পরে আমরা স্বামীজীর দেহান্তে লেখা তাঁর যে-শোকপ্রবন্ধ হাজির করব, তাতে তো শঙ্করাচার্যকে প্রচণ্ড কর্মবীর রূপেই দেখি!!

করার পাত্র নন, তিনি রাজনৈতিকও নন, উত্থানের বার্তা দিতে তিনি এসেছেন--তাঁর বিরোধিতা থাকবেই সমকালে। ঐ জাতীয় মেসেজ একেবারে সমকালে কার্যকর হয়না—তা রূপায়িত হয় যখন ঐ মেসেজের মধ্যে লালিত মানুষ সমাজের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থায় আসে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে স্বদেশী আন্দোলন, এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী পর্বগুলিতে, বাংলা ও বৃহত্তর ভারতবর্ষ স্বামীজীর বাণীকে প্রাণ দিয়ে সত্য প্রমাণ করেছিল। উল্টোপক্ষে দেখি, এই সাক্ষাতের ৬ মাস পরে বিবেকানন্দের বিষয়ে শোকপ্রবন্ধে তাঁকে শঙ্করাচার্য বলার জন্য তিলক নিজ প্রদেশে সংস্কারপন্থীদের কাছ থেকে সবিশেষ গঞ্জনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেকথা আগেই বলেছি। [৩য়, ২১৭-২০]।

বেদান্ত কেশরীর বিবরণে স্বামীজীর সঙ্গে তিলকের রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার কথা নেই—তা কিছু আছে দেশপান্ডে-বিবরণে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় এ-বিষয়ে অল্প সংবাদ পাই :

"এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে [ডঃ দত্ত লিখেছেন]—১৯২৫ খ্রীঃ গৌহাটিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে পুনার চিত্রশালা প্রেসের বসুকাকা আমাকে বলেছিলেন, স্বামীজী যখন বালগঙ্গাধর তিলকের গৃহে অতিথিরূপে বাস করেছিলেন (তিনি অন্য নামে পরিচিত ছিলেন), তখন তাঁদের আলোচনাকালে বসুকাকা উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে তিলক বলেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের জন্য তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করবেন, এবং স্বামীজী কাজ করবেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে।" ['স্বামী বিবেকানন্দ,' পৃ. ২০৩]।

স্পষ্টই বোঝা যায়, ডঃ দত্তের স্মৃতি কিছু প্রতারণা করেছিল। বসুকাকা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিলকের বাড়িতে বিবেকানন্দ-তিলক আলোচনার কথা বলেন নি—বলেছিলেন ১৯০১ ডিসেম্বরে কংগ্রেস-উপলক্ষে কলকাতায় আগত তিলকের সঙ্গে স্বামীজীর আলোচনা কথা। বসুকাকা যে, ঐসময়ে তিলকের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন, তা তিলকের জীবনীতেই আছে।

বিবেকানন্দ ও তিলকের রাজনৈতিক আলোচনা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সংবাদ দিয়েছেন তিলকের আর এক সহযাত্রী বিনায়ক বিষ্ণু রানাডে। ইনি নাগপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত তিলকের সঙ্গে এক ট্রেনে আসেন—বেলুড়েও তিলকের সঙ্গে যান। এঁর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিকথা ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। ইনি লিখেছেন :

"আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাইয়া স্বামীজী আশ্রমে লইয়া গেলেন। আমরা দুগ্ধ ও ফল গ্রহণ করিলাম। তারপর আকর্ষণীয় আলোচনা হইল। তাহার মূল্যবান অংশ মনে আছে। **স্বামীজী প্রধানতঃ বলিলেন, 'আমরা পরপদানত। আমাদের রাজনৈতিক কার্যাবলীকে আত্মনির্ভর হইতে হইবে। আমাদের পদ্ধতি হইবে ধ্বংসাত্মক [প্রতিরোধাত্মক?]। তাহা এমন হইবে যাহাতে শাসকগণ হাঁটু গাড়িয়া নতিস্বীকারে বাধ্য হয়'।"**

ইংরাজ-শাসকদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রায় শেষ কথা এখানে পেলাম। স্বামীজীর জীবনীতে বিনায়ক বিষ্ণু রানাডের প্রদত্ত এই তথ্যের গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত। এইকালে এই জাতীয় কথা স্বামীজী নানা জনকে বলেছেন। তখনি ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব কিনা, সে-বিষয়ে তাঁর মনে যদিও দ্বিধা ছিল, (ব্যাপক শিক্ষাগত প্রস্তুতি ছাড়া ও-জিনিসকে সফল করা যায়না বলেই তিনি মনে করতেন)—কিন্তু নির্ভয় সংগ্রাম যে চাই, সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে কোনোই অস্পষ্টতা ছিল না। আবেদন-নিবেদন নয়, সক্রিয় প্রতিরোধ—হিংসা বা অহিংসা, যে-পথেই হোক। ঢাকায় তরুণদের এইকালেই তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ নিতে উৎসাহ দিয়েছেন, জাতিকে জাগাতে বোমার দরকার, এমন কথাও নাকি বলেছেন। এসব তথ্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বইয়ে পাওয়া যায়। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ

ব্যক্তিগত আলাপে স্বামীজীর মুখে শোনা এই ধরনের উক্তির কথা আমাদের বলেছেন। অন্য সূত্রেও তা পাই। রানাডে-প্রদত্ত বিবরণ তাই নির্ভরযোগ্য।

তবে স্বামীজী উপযুক্ত পাত্র ছাড়া এসব কথা বলতেন না। বিনায়ক রানাডে যথার্থই লিখেছেন :

"স্বামীজী জানতেন, বলবন্তরাও তিলকই একমাত্র মানুষ যিনি উপরে-কথিত ধারায় কার্যাবলী চালিয়ে যেতে পারবেন।"

বিবেকানন্দ তিলকের শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উঠবার সম্ভাবনা আছে—এইকালে উভয়ের মধ্যে কবার সাক্ষাৎ হয়েছিল? বেদান্ত কেশরী ও দেশপাণ্ডের বিবরণ এবং বিনায়ক রানাডের স্মৃতিকথা—সকল ক্ষেত্রেই মাত্র একবার সাক্ষাতের কথাই আছে, এবং আলোচনাকালে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতেও একবার সাক্ষাতের কথা আছে। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থে ভিন্ন সংবাদ পাই। মহেন্দ্রনাথ-পরিবেশিত অনেক অজ্ঞাত চকমপ্রদ সংবাদের সমর্থন সমকালীন তথ্যসূত্র থেকে পেয়েছি বলে চট করে, বিনা বিচারে, তাঁর কথা উড়িয়ে দিতে পারি না। স্বামী নিশ্চয়ানন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ মহেন্দ্রনাথ এইভাবে পরিবেশন করেছেন :-

"এক বৎসর কলকাতায় কংগ্রেস হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তিলক কলকাতায় এসেছিলেন। স্বামীজীর শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁর সঙ্গে সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ ছিল। তিলক একদিন অপরাহ্ণে নৌকা করে এসে মঠের দক্ষিণ অংশে বেলতলার দিকে নৌকা লাগিয়ে উঠলেন, এবং নিজের নাম-লেখা একখানি কার্ড একটি বৃদ্ধ সাধুকে দিলেন, যাতে স্বামীজী শীঘ্র তাঁর আসার খবর পান। বৃদ্ধ সাধুটির বিবেচনাশক্তি কোনো বিশেষ কারণবশতঃ একটু ভিন্নপ্রকারের ছিল। তিলক মঠে দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃদ্ধ সাধু মঠবাড়ির এদিক-ওদিক ঘুরে তিলককে বললেন—স্বামীজীর শরীর অসুস্থ, তিনি এখন সাক্ষাৎ করবেন না। তিলক অতি বিনীতভাবে বললেন, 'আচ্ছা, স্বামীজীকে সময়মতো কার্ডখানি দেবেন।' এই বলে তিনি নৌকা করে চলে গেলেন।

"সন্ধ্যার পর স্বামীজী নীচে নামলে বৃদ্ধ সাধুটি তাঁকে কার্ডখানি দিলেন। স্বামীজী কার্ডে তিলকের নাম দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিলক কোথায়? বৃদ্ধ সাধুটি বললেন, সে ব্যক্তি অপরাহ্ণে এসেছিলেন, এখন চলে গেছেন। স্বামীজী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং নানাপ্রকার ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। শেষে আমাকে বলতে লাগলেন, তুই তো মরাঠি, তুই তো তিলককে জানিস, তুই কেন আমাকে খবর দিসনি? তারপর স্বামীজী নিজের হাতে তখনি তিলককে একখানি পত্র দিলেন এবং বৃদ্ধ সাধুটিকে আদেশ দিলেন, তোমার শাস্তি-স্বরূপ এই চিঠি নিয়ে হাওড়া গিয়ে ডাকঘরে দিয়ে আসতে হবে। স্বামীজী মহা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আদেশ পালন করতেই হবে।...

"তিলক পত্র পেয়ে দু'একদিনের ভেতর মঠে এলেন। মঠবাড়ির দক্ষিণ দিকের মাঠে পায়চারি করতে-করতে স্বামীজীর সঙ্গে নানাপ্রকার কথা কইতে লাগলেন। সেখানে কারও যাওয়ার আদেশ ছিল না। দূর থেকে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝা গেল যে, স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে মাথা ও হাত নেড়ে কথা কইছেন, আর তিলক ধীর ও শান্তভাবে সেইসব কথা শুনছেন। কিন্তু কী কথাবার্তা হয়েছিল, তা আমরা কেউ বিশেষ-কিছু জানিনা।

"তিলক আগে শুধু মরাঠা দেশের ব্রাহ্মণদের জন্য নানা চেষ্টা করেছিলেন। স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন যে, একটা জাতিকে তুলতে হলে জাতের মাত্র একটা অংশ তুললে চলবে না। গরীব, দুঃখী, নিম্নশ্রেণীর সকলকে না তুললে জাত উঠবে না। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসা-অবধি তিলকের মনোভাবের পরিবর্তন হল। তিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্যও নানাপ্রকার

চেষ্টা করতে লাগলেন। [স্বামীজীর সংস্পর্শে আসা অবধি লোকমান্য তিলকের মনোভাবের যে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল, এইকথা নিশ্চয়ানন্দ বারংবার বলতে লাগলেন]। যাহা হউক তিলক মাঝে-মাঝে মঠে আসতেন ও স্বামীজীর সহিত তাঁর নানা বিষয়ের আলোচনা হত।

"...একদিন অপরাহ্নে তিলক এসে মোগলাই চা তৈয়ার করলেন। জায়ফল, জায়ত্রী, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, জাফরান ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য দিয়ে একটা সিদ্ধ জলের ক্বাথ তৈয়ার করলেন, তাতে চা, দুধ ও চিনি দিয়ে মোগলাই চা করলেন। এক হাণ্ডা চা হয়েছিল। তিলক বললেন, 'একবাটি করে চা খাবেন, বেশি খাবেন না। চা পান করতে সুস্বাদু হয়েছিল। সেজন্য অনেকেই দু'তিন বাটি খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ করে বললেন, 'হাণ্ডাসুদ্ধ চা-তো রইল, পরে দরকার হয় তো খাবেন।' চা এত উগ্র হয়েছিল যে, যত সময় যেতে লাগল ততই শরীরের ভিতর উষ্ণতা প্রবল হতে লাগল, দ্বিতীয়বার চা পান করতে কারো ইচ্ছা রইল না।" ["নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান", পৃ. ১২-১৪]।

প্রত্যক্ষদর্শীর একটা সজীব বিবরণ পেলাম। এতে পূর্বে উদ্ধৃত বিবরণগুলির সঙ্গে প্রধান পার্থক্য—তিলকের একাধিকবার আগমন সংবাদ কেবল এতেই আছে। সুতরাং এর বিশ্বাস্যতা প্রশ্নাধীন। নূতনতর কোনো তথ্য না পেলে বিষয়টির সুনিশ্চিত মীমাংসা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ানন্দের বিবরণের পক্ষে বলা যেতে পারে—তিলকের সঙ্গীরা একাধিকবার তাঁর আগমনের কথা না জানতে পারেন, কারণ তিলক যদি বিশেষ প্রয়োজনে মঠে গিয়ে থাকেন, গোপনেই যাবেন। আর পরবর্তীকালে তিনি সেই গোপন সাক্ষাতের কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এই সাক্ষাৎকার যে সত্যই গোপন রাখতে চাওয়া হয়েছিল তার এক প্রমাণ—রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো পত্রিকাতে তখন এই সংবাদ প্রকাশিত হয়নি, অথচ তিলকের তখন যে বিরাট সর্বভারতীয় খ্যাতি, তাতে বিষয়টি সাধারণভাবে উল্লিখিত হওয়াই উচিত ছিল। নিশ্চয়ানন্দের বিবরণের পক্ষে আর একটি পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায়। পূর্বোক্ত বিনায়ক রানাডের বিবরণের একাংশে আছে : "কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হইলে বলবন্তরাও তিলক আমন্ত্রিত হইয়া বিবেকানন্দের মঠে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মনে হইল উভয়ের এই সাক্ষাৎ যেন ঈশ্বরবিধান। দেশসেবায় নিযুক্ত দেশপ্রেমিক যে, স্বামীজীর উপদেশ ও শুভেচ্ছা লাভ করিবেন, ইহা দৈবনির্দেশের ব্যাপার।" লক্ষণীয় "আমন্ত্রিত হইয়া" কথাটি। তিলক আসছেন শুনে স্বামীজী অবশ্যই তাঁকে অগ্রিম আমন্ত্রণ জানাতে পারেন, কিন্তু বেশি সম্ভব মনে হয়—যেকথা নিশ্চয়ানন্দ বলেছেন—তিলক প্রথমবার স্বয়ং এসেছিলেন, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার পরে স্বামীজীর উৎকণ্ঠিত আমন্ত্রণপত্র তাঁর কাছে পৌঁছেছিল, এবং তিনি এসে-ছিলেন। আর মরাঠি সন্ন্যাসী নিশ্চয়ানন্দের কাছে মরাঠা-গৌরব তিলকের আগমন ব্যাপার প্রাণের জিনিস ছিল বলে ঘটনাগুলির খুঁটিনাটি সবকিছু তিনি মনে রেখেছিলেন। তিনি যে-রকম বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে সেসব ভিত্তিহীন না হওয়াই সম্ভব।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর লেখায় আলোচ্য সাক্ষাৎকারের আর এক চিত্র :

"এবার ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস। কংগ্রেস হইতে কতিপয় সদস্য, বিশেষতঃ মিঃ তিলক, ধূলিপায়ে বেলুড়-মঠে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতে আসিলেন। ঠাকুরঘর হইতে পূজা শেষ করিয়া স্বামীজী অবতরণ করিতেছেন, এমন সময়ে তিলক-মহারাজকে পুরোভাগে রাখিয়া সদস্যেরা জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। স্বামীজী দেশাত্মবোধের বাণী বজ্রগম্ভীর স্বরে নিনাদিত করিলেন।"

এই বর্ণনার উৎস কী, গিরিজাশঙ্কর জানান নি। তিনি কি কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনে লিখেছেন?

এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীর আর একটি ক্ষুদ্র বর্ণনা কিন্তু আমরা পেয়েছি। কুমুদ-

বন্ধু সেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখে পাঠিয়েছিলেন :

"বেলুড়-মঠে তিলক স্বামীজীর সম্মুখে যুক্তকরে দাঁড়িয়েছেন, এবং দামোদর হরি চাপেকরদের কথা বলিতেছিলেন। সেদিন আমি মঠে উপস্থিত ছিলাম, এবং ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" ['স্বামী বিবেকানন্দ', পৃ. ২০৪]।

কুমুদবন্ধু সেন ২২.১.৫৭ তারিখে স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবনে স্বামীজীর জন্মোৎসব-সভায় বিবেকানন্দ-তিলক সাক্ষাৎকারের বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেন বলে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন। "স্বামীজী [আলোচনাকালে] লোকমান্য তিলককে জিজ্ঞাসা করেন, কেন চাপে-করদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা হচ্ছে না?"৯

বিবেকানন্দ-তিলকের শেষ সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি বিনায়ক রানাডের সংযত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনার অংশ দিয়ে :

"বলবন্ত রাও তিলক এবং আমরা দশ-বার জন দক্ষিণী গঙ্গা পার হইয়া মঠভূমিতে অবতরণ করিলাম। বলবন্ত রাওকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া স্বামীজী তাঁহাকে হাত ধরিয়া নৌকা হইতে নামাইলেন। তারপর তাঁহাকে স্বামীজী বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আমরা ভাবিলাম, ইহা বাংলা ও মহারাষ্ট্রের মিলন।"

আশি বছর পরে আমরা জেনেছি—ঐ মিলন শুধু বাংলা ও মহারাষ্ট্র নামক দুটি প্রদেশের নয়—ভারতের আত্মশক্তি ও প্রাজ্ঞ কর্মশক্তির মিলনও বটে।

॥ ৬ ॥ তিলক-প্রবর্তিত শিবাজী-উৎসব ও তার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া : স্বামীজীর ঐ সম্পর্কে আগ্রহ : শিবাজী-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার পরে কোন্ গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তিলক পুনা ফিরে গিয়েছিলেন, তার আকার আমরা পরে দেখব। স্বামীজী আর মাত্র সাত মাস জীবিত থাকবেন। তারই মধ্যে তিনি একবার তিলক-প্রবর্তিত এক আন্দোলনের ব্যাপারে তীব্র আগ্রহ

৯ কুমুদবন্ধু সেন তিলকের বিবেকানন্দ-অনুরাগের আরও খবর দিয়েছেন। বেদান্ত কেশরীতে অগস্ট ১৯৪৮ সংখ্যায় "স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ" প্রবন্ধে তিনি ১৯০৫ সালে বোম্বাই শহরে প্রথম প্রকাশ্য রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের বিবরণ দেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য কালীপদ ঘোষ এবং কুমুদবন্ধু সেন। তিলকের আইনজীবী বন্ধু মিঃ সেটলুর (স্বামীজীর পরিচিত এবং উৎসাহী অনুরাগী) এই উৎসবে বিশেষ সহযোগিতা করেন। স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেছিলেন।

এই সভায় যোগদানের জন্য তিলককে আমন্ত্রণ জানিয়ে কুমুদবন্ধু পত্র লেখেন। ঔরঙ্গাবাদ থেকে তিলক উত্তরে বলেন (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫)—তিনি অন্য কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সভায় যোগ-দান করতে সমর্থ নন। তিলক পত্র শেষ করেন এই বলে :

"Both the Master and the Pupil are held in high esteem by me, and I wish every success to your movement, which has my full sympathy."

এর অল্পদিন পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে বোম্বাইয়ে বক্তৃতা করতে আসেন। "বালগঙ্গাধর তিলক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রদত্ত চারটি বক্তৃতার একটিতে সভাপতির ভাষণে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং বোম্বাইয়ের জনগণের উদ্দেশ্যে সেখানে একটি সন্ন্যাসী-পরিচালিত রামকৃষ্ণ-মঠ স্থাপনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। এমন-কি তিনি কেশরীতে প্রধান সম্পাদকীয় রচনায় বলেন, কলিকাতা ও মাদ্রাজের মতো বোম্বাইতেও মিশনের একটি কেন্দ্র থাকা উচিত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উপস্থিতিতে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার সভাপতি হন স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণ; সেক্রেটারি—ডাঃ বৈদ্য; কয়েকজন বাঙালীসহ বোম্বাইয়ের বিখ্যাত কিছু নাগরিক কমিটির সদস্য। তিলককে সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি অস্বীকার করেন এই বলে—তিনি রাজনৈতিক কর্মী, তাঁর নাম থাকলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে। সদস্য না হয়ে, বাইরে থেকে তিনি অধিক সাহায্য করতে পারবেন।"

প্রকাশ করবেন। সেইসংগে তিলকের তুলনায় অন্য অনেক দেশনেতার মেরুদণ্ডহীনতার রূপও দেখবেন। তিলক-প্রবর্তিত ঐ আন্দোলনের নাম শিবাজী-উৎসব। কয়েক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় এই শিবাজী-উৎসবের জন্যই তাঁর শিবাজী বন্দনার বিখ্যাত কবিতা লিখে প্রকাশ্য সভায় পাঠ করবেন। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে এই শিবাজী-উৎসব গুরুত্বপূর্ণ। শাসকগোষ্ঠী ঐকালে অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে একে দেখেছিল।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিলক পুনা শহরে শিবাজী-উৎসবের সূচনা করেন। উদ্দেশ্য : একদিকে জাতীয় বীরের চরিত্রচিন্তা জনগণকে শক্তি, সাহস ও আদর্শ দান করবে, অন্যদিকে উৎসবসূত্রে মিলিত মানুষেরা নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করতে পারবে। এই উৎসবের পরিকল্পনা করে তিলক প্রথমশ্রেণীর বাস্তববুদ্ধি দেখিয়েছিলেন। কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে সম্মিলিত আন্দোলনের সূচনা হলেও মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবী-নিয়ন্ত্রিত ঐ আন্দোলন সক্রিয় সংগ্রামের পথ দেখাতে তখন সমর্থ নয়। এক্ষেত্রে জনগণের ভাবাবেগকে জাগাতে পারে—সংগ্রামী বীরের উদ্দীপনাময় দৃষ্টান্ত। তাঁর নামে সমবেত মানুষরা সক্রিয় আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবার মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করবে। তিলক এই আন্দোলনকে সারা ভারতে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন।

অপরদিকে একে ইংরাজ শাসকরা অত্যন্ত অপছন্দ করেছিল। বাস্তব রাজনীতিতে পরিপক্ক তারা, আবেদন-নির্ভর কংগ্রেস তাদের কাছে বিপজ্জনক নয়, কিন্তু যদি জনগণ বীর-পূজার আবেগে সমবেত হয়—ব্যাপারটা দুশ্চিন্তার কারণ বটে।

শিবাজী-উৎসবের সংগে তিলক গণপতি-উৎসবও পুনরারম্ভ করেন। পেশোয়াদের আমলে ধুমধামের সংগে এই উৎসব হত, পরে স্তিমিত হয়ে যায়। মুসলমানী দাংগা ও ক্রীশ্চান মিশনারি আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজকে সংঘবদ্ধ করাই ছিল গণপতি-উৎসবের উদ্দেশ্য। একে তিলক ধর্মীয় উৎসব বলেছেন—কিন্তু শিবাজী-উৎসব যে রাজনৈতিক উৎসব—তিনি স্পষ্টভাবেই তা জানিয়েছিলেন।

সাহেবী কাগজগুলি এই দুই উৎসবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আক্রমণ শুরু করে। গণপতি-উৎসব আপেক্ষিকভাবে মিশনারি-দংশন বেশি লাভ করে, আর শিবাজী-উৎসব পায় সাম্রাজ্য-বাদী শাসক-দংশন।

বাংলার সংগে গণপতি-উৎসবের নয়, শিবাজী-উৎসবেরই রাজনৈতিক চেতনাগত সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এরই অনুকরণে পরবর্তীকালে বাংলাদেশে প্রতাপাদিত্য উৎসব হয়েছিল—সরলাদেবীর প্রবর্তনায়।

শিবাজীর বীরকাহিনী বাঙালীর মনকে এইকালে গভীরভাবে আকর্ষণ করছিল। রমেশ-চন্দ্র দত্তর 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত', কিংবা সত্যচরণ শাস্ত্রীর শিবাজী জীবনী খ্যাতি অর্জন করে। 'মরাঠা' পত্রিকায় ১ ডিসেম্বর, ১৮৯৫ তারিখের মন্তব্য থেকে দেখি, সেখানে প্রশংসার সংগে বলা হয়েছে, সত্যচরণ "উপাদান সংগ্রহের জন্য দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই প্রদেশে ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন, যার ফল হয়েছে দাক্ষিণাত্যের মহাবীরের আকর্ষণীয় জীবনী।" সখারাম গণেশ দেউস্কর নানা প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও বক্তৃতার দ্বারা শিবাজী চরিত্রকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করায় সচেষ্ট ছিলেন।

শিবাজী-উৎসবকে সর্বভারতীয় উৎসব করার আগ্রহে তিলক ১৮৯৫ সালে পুনায় কংগ্রেস উপলক্ষে আগত নেতৃবৃন্দকে উৎসবের সমর্থন করার জন্য আহবান করেন। ১৫,০০০ লোকের এক বিরাট সমাবেশে (সেকালে ১৫০০০ লোকের সভা বিরাটের মধ্যেও বিরাট) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সেই সম্মেলনের উপরে লিখিত সম্পাদকীয়তে মরাঠা (৫ জানুয়ারি, ১৮৯৬) বিশেষ জোরের সংগে দেখিয়ে দেয়—সভায় কেবল মরাঠিরা যোগ দেননি, পঞ্জাব, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরাও সমবেত হয়ে শিবাজীর প্রতি

শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। "শিবাজী স্মৃতি-আন্দোলনের কুৎসা করে কোনো-কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমালোচক বলেছেন, এ কেবল মহারাষ্ট্রীয় আন্দোলন, অন্য প্রদেশবাসীর এই আন্দোলনে কোনো সহানুভূতি নেই।...গত রবিবারের সভা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে, এই আন্দোলনের প্রতি ভারতের সকল প্রদেশের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এই সভা আরও প্রমাণ করেছে...'মরাঠা-ডিচ' সত্ত্বেও বাঙালীরা, স্বীয় পূর্বপুরুষদের উপর শিবাজীর নির্দয় আচরণ সত্ত্বেও মাদ্রাজীরা, 'সুবিপুলভাবে' লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও গুজরাটিরা—অতীতকে ভুলে বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বীরকে সম্মান করতে প্রস্তুত। মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় আনন্দ চার্লু, এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণী আমাদের গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।"

শিবাজী-উৎসবের উপর শাসকদের কোপদৃষ্টি এমনই পড়েছিল যে, অনেক বিবেচক ভারতীয় এই উৎসবে যোগ দিতে ভয় পেয়েছিল। র‍্যান্ড ও আয়ার্স্ট হত্যাকাণ্ড এবং তিলকের গ্রেপ্তারের আগেই, এই ভীতির বিস্তারের দিকে নজর রেখে, জনৈক লেখক ৬ জুন, ১৮৯৭, তারিখের মরাঠা পত্রিকায় আশ্বাস দিয়ে লিখেছিলেন—ইংরাজ রাজপুরুষেরা অতীব উদার, তাঁরা এত উদার যে, মুসলমানেরা তুরস্ক-সুলতানের বিজয়ে আনন্দপ্রকাশ করলেও তাঁরা কিছু বলেন নি। সুতরাং শিবাজী-উৎসবে যোগ দিতে ভয় পাও কেন?

শিবাজী-উৎসব তিলকের রাজনৈতিক জীবনে কোন্ দুর্দৈব ঘটিয়েছিল (নাকি শুভ সংঘটন!), তার কথা আগেই বলেছি। শিবাজী-সভায় বক্তৃতার জন্যই তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হন। [৪র্থ, ৭-৮]। টাইমস অব ইন্ডিয়ায় 'জাস্টীস' ছদ্মনামে জনৈক সংস্কারপন্থী তিলকের ভাষণের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন (যার জন্য মূলতঃ তিলকের শাস্তি হয়), তৎসহ তিনি শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁর হত্যার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন; তদুপরি, উৎসবে শিবাজীর মৃন্ময়মূর্তি রাখায় মূর্তিপূজা নামক ভীষণ কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে—এই আর্তনাদসহ রানাডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন—রানাডে মূর্তিপূজাকে এত ঘৃণা করেন, অথচ তিনিই এই উৎসবের সূচনাকর্তা! মরাঠা উত্তর দিতে গিয়ে রানাডে প্রসঙ্গে বলে—যে-রানাডে মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করেন, তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন বহুসংখ্যক মূর্তির পূজা হয়। আফজল খাঁ'র হত্যার বিষয়ে বলে—ইংরেজের পেনাল কোডের দ্বারা শিবাজীর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কের বিচার হতে পারে না, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মানদণ্ডে তার বিচার হওয়া উচিত।

তিলকের শাস্তিতেও শিবাজী-উৎসব বন্ধ হয়নি—বন্ধ হয়নি তার বিরুদ্ধে সাহেবী সংবাদপত্রের বিষোদ্গার। কলকাতার 'ইংলিশম্যান' এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব দিল। ইংলিশম্যানের বিবেচনায় মরাঠা-জাতি "দস্যুজাতি," আর শিবাজী "অত্যাচারী দস্যুদলের নায়ক;" "জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যাকাণ্ডের দ্বারা শিবাজী পশ্চিমভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, এবং ভারতের দক্ষিণাংশের লুণ্ঠিত অর্থে সমৃদ্ধ করেছিলেন নিজেদের লোককে।" এর উত্তরে ১ মে, ১৮৯৮ তারিখে মরাঠা *The Englishman is Un-English* নামক সম্পাদকীয়তে নানা কথার সঙ্গে লেখে : "শিবাজীর বিরুদ্ধে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যার অভিযোগ পুরনো বস্তাপচা হয়ে গিয়েছে। সেগুলি যদি সত্যও হয়, তাহলে এইমাত্র প্রমাণিত হয়—মরাঠাদের মতো সামরিক জাতি কিছু লোককে হত্যা করেছিল, ঠিক যেমন দোকানদারের জাত সাম্রাজ্যলাভের জন্য জালিয়াতি জুয়াচুরির আশ্রয় নেয়।" কলকাতার বেঙ্গলী অবশ্য এতখানি কড়া কথা বলার শক্তি বা ইচ্ছা সংগ্রহ করতে পারেনি। মার্জিত মন্দগতি দীর্ঘ এক সম্পাদকীয়তে সে বলেছিল, শিবাজীর অন্যায়ের আমরা সমর্থক নই, তবে ইংলিশম্যান যেভাবে জাতিবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, তা মারাত্মক, ইত্যাদি।

মাঝের কয়েক বছর ছেড়ে, ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের শিবাজী-উৎসবের কথায় চলে আসতে

পারি, যার সঙ্গে আমাদের আলোচনার বিশেষ যোগ।

এই বৎসর জুন মাসে পুনায় শিবাজী-উৎসবে তিলকের বক্তৃতার যে-বিবরণ পাই, তাতে বুঝতে পারি, কারাবাস এই মরাঠি ব্রাহ্মণের চিত্তকে জীর্ণ করতে পারেনি। গেরিলাযুদ্ধে মরাঠাদের সাফল্যপ্রসঙ্গে তিনি বলেন : "মরাঠারাই ভারতে প্রথম বুঝতে পারে, আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যবাহিনীর বিরুদ্ধে একমাত্র গেরিলাযুদ্ধই কার্যকরী। এ-ব্যাপারে কৃতিত্বের জন্য মরাঠারা রাজপুত, শিখ ইত্যাদি অপর সামরিক জাতিগুলির তুলনায় যুদ্ধে অধিক সাফল্য অর্জন করেছিল।" বুয়র বা ফিলিপিনোরা "অ্যাংলো-স্যাক্সন সাম্রাজ্যবাদের প্রবল পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে এই গেরিলাযুদ্ধে দক্ষতার জন্যই" —একথা বলার পরে তিলক যোগ করেন—"ইংরেজ বা আমেরিকানদের বিরুদ্ধে বুয়র বা ফিলিপিনোদের সাফল্য অপেক্ষা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মরাঠাদের সাফল্য অধিক।" একই রচনায় দেখা যায়, বাঙালীরা শিবাজী-উৎসবের সমর্থনে অগ্রসর। 'মরাঠা', ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করেছিল এই প্রসঙ্গে। কংগ্রেস সর্বভারতীয় জাতীয়তা সৃষ্টিতে অগ্রসর; এখন বাঙালী, মরাঠি, পঞ্জাবী, মাদ্রাজী—এইভাবে চিন্তা না করে সকলে নিজেদের ভারতীয় ভাবছে—এবং শিবাজীর মতো চরিত্রকে তাই সর্বভারতীয় সম্পদ হিসাবেই গণ্য করা উচিত —ইণ্ডিয়ান মিরার বলেছিল।

কলকাতায় শিবাজী-উৎসব পালনের উদ্যোগ আয়োজন অনেকদিন ধরেই চলছিল। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় তার প্রস্তুতি-সভা পর্যন্ত হয়েছিল।১০ উৎসব কিন্তু তখন হতে পারেনি, যা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে। এই অনুষ্ঠানের মূলে সখারাম গণেশ দেউস্করের বিশেষ চেষ্টা ছিল, যিনি ১৮৯৬ সাল থেকে ঐ চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন।

মধ্যবর্তীকালে উৎসব না হতে পারার কারণ নয়—বর্গীর হাঙ্গামার বিরুদ্ধে বাঙালীর বিরূপ সংস্কার (ইংলিশম্যান ঐ সংস্কারের জাগরণে বড়ই সক্রিয় ছিল)—দ্বিধার কারণ সেই একই সাহেব-ভীতি, যা মরাঠিদের একাংশকে পর্যন্ত বিচলিত করেছিল। ১৯০২ সালে উৎসবের আয়োজন করেও উদ্যোক্তারা ফ্যাসাদে পড়লেন—সভাপতি মেলে না! শাসকদের রক্তচক্ষুর সামনে কে সভাপতি হবার ঝুঁকি নেবে? উদ্যোক্তারা বিপাকে পড়ে ছুটলেন বেলুড়ে, স্বামীজীর কাছে। ভগ্নস্বাস্থ্য সন্ন্যাসী তখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। রাজনীতি তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। তবু মৃত্যুপথযাত্রী সন্ন্যাসী দেশের পৌরুষের এই অবক্ষয়ের গ্লানিতে অস্থির হয়ে পড়লেন। নিশ্চয় এইসময়ে তিলকের পৌরুষের চেহারাটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তাঁর যন্ত্রণা এতদূর পৌঁছেছিল যে, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার নীতিভঙ্গ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন—মারাত্মক শারীরিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তো ছিলই। স্বামীজীর স্মরণীয় চিত্রটি এই :

১০ মরাঠা'য় ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬, সংবাদ :

"গত ২২ নভেম্বর কলিকাতা সিটি কলেজে শিবাজী স্মৃতি-আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনার জন্য বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল-এর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণু বলবন্ত বোপার্দিকর নামক জনৈক দক্ষিণী ভদ্রলোক ঐ সভায় শিবাজী সম্বন্ধে একটি রচনা পাঠ করেন। ঐ দিনের প্রধান বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাবু জ্ঞানচন্দ্র রায়, বি-এ, এবং মিঃ ঘনশ্যাম দেউস্কর [সখারাম গণেশ দেউস্কর?] বি-এ। সভাপতি তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষণে বলেন, দাক্ষিণাত্য হইতে উদ্ভূত এই স্মৃতি-আন্দোলন অতি যোগ্য ব্যাপার এবং যাঁহারা ইহা পালন করিতেছেন তাঁহারা সর্ববিধ প্রশংসার পাত্র। বাংলাদেশে এই আন্দোলন আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। সুমহান শিবাজীর স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব প্রধান কর্তব্যরূপে ভারতবাসীর নিকট সমুপস্থিত। আমরা আশা করি, গত বৎসরের পুনা উৎসবের মতো এই বৎসর শিবাজী স্মৃতিউৎসব অনুষ্ঠিত হইবে; শুধু তাই নয়, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা ভারতের অন্যত্রও বিস্তৃত হইবে।"

"বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা ১৯০১ [১৯০২] খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় শিবাজী-উৎসবের উদ্যোগ করেন। অন্য প্রদেশগুলির আদর্শ বীরদের চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়সাধনই উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কেউই প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের সভাপতি হতে রাজি হলেন না। তাঁরা সরকারের শ্যেনদৃষ্টির ভয়ে থরহরি। অবশেষে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র এবং সাহিত্যিক—তাঁর ছোটভাই যতীশকে পাঠালেন বেলুড়-মঠে স্বামীজীর কাছে, অসুবিধার কথা জানিয়ে—যদি স্বামীজী উৎসবের সভাপতি হতে রাজি হন। সব শুনে স্বামীজী কেঁদে ফেললেন, এবং বললেন, বেটী বলি চায়। ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের কাছে গিয়ে সভাপতি হতে বলো। কেউ যদি সভাপতি না হয়, আমিই সভাপতি হব।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ডায়েরিতে কিন্তু স্বামীজীকে সভাপতিত্বের অনুরোধ করার জন্য সখারাম গণেশ দেউস্কর এসেছিলেন, এমন লেখা আছে। তাঁর সঙ্গে অবশ্য যতীশ সমাজপতি থাকতে পারেন, কিংবা তিনি অন্যসময় আসতেও পারেন। ব্রহ্মানন্দের ১৫ জুনের ডায়েরি-বিবরণ এই :

"Mr Sakharam Deuskar, Sub-editor of the Hitabadi, came here this afternoon and asked our Swamiji to preside in the meeting. Swami denied owing to his bad health."

নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতি হতে রাজি হয়েছিলেন।

এ ঘটনা ১৯০২, জুন মাসের। স্বামীজী কয়েকদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন।

কলকাতার এই প্রথম শিবাজী-উৎসবের সমকালীন বিবরণগুলি আমরা দেখেছি। কলকাতার দেশীয় সংবাদপত্রগুলি উৎসবের সমর্থনে কিছুটা এগিয়ে আসে; ইণ্ডিয়ান মিরার, বেঙ্গলী, তদুদ্দেশ্যে সম্পাদকীয় লেখে। ২১ জুন, বেঙ্গলী লেখে—শিবাজী সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত; তিনি মহাভারতীয় বীরত্ব দেখিয়েছেন; যা ছিল পৌরাণিক কল্পনাবস্তু, তাকে বর্তমানকালে বাস্তবায়িত করেছেন তিনি। শিবাজী ভারতের শেষ ছত্রপতি। উৎসব-সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজীকে ভারতীয় হিন্দুর ঐক্যবিধায়ক শক্তি বলে বর্ণনা করেন। সভাপতি নরেন্দ্রনাথ সেন—কেন তিনি "প্রকাশ্যভাবে এই উৎসবে যুক্ত হয়েছেন," তার কারণ প্রসঙ্গে বলেন—শিবাজীর ধর্মোৎসাহ ও রাজনৈতিক ঋষিত্বই সেই কারণ। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তব্য, পশ্চিমভারতে যেহেতু রামমোহন, কেশব সেন সম্মান পান, আমাদেরও উচিত পূর্বভারতে সেইভাবে শিবাজীকে সম্মান করা। উৎসব চারদিন চলেছিল—সভা হয় বিডন স্ট্রীটের ক্লাসিক থিয়েটারে।

সভায় যাকে বলে টিকি ধরে নাড়া দিয়েছিলেন ইংলণ্ড-প্রবাসী ডাক্তার শরৎচন্দ্র মল্লিক (তখন কলকাতায় এসেছেন)। নেতাদের কাপুরুষতার মুখোশে টান দিয়ে তিনি বলেন :

"শিবাজী-উৎসব নিজের জন্য যে-খ্যাতি অর্জন করেছে তা মোটেই ঈর্ষাযোগ্য নয়। আমাদের ইতিহাসের ওহেন প্রধান এক চরিত্র, সাধারণ বীরত্ব-ধারণার বহু ঊর্ধ্বে যাঁর বীর্য প্রতিষ্ঠিত—তিনি যে কেন তাঁর প্রাপ্য পাবেন না, তা আমার ধারণার অতীত। ..আমরা আমাদের মত প্রকাশ ক'রে শাসকদের কোনো ক্ষতিই করছি না। লোকে বলছে, বলাটা খুব ভালো, না-বলাটা আরও ভালো।...এই সমাবেশ আকারে নিশ্চিত আরো অনেক বড় হতে পারত যদিনা আমাদের তথাকথিত কিছু দেশপ্রেমিক অকারণ ভয়ে ও অদ্ভুতরকম স্বার্থবুদ্ধিতে চালিত হতেন। ওঁরা আবার দেশপ্রেমিক! ধিক্! 'দেশপ্রেমিক' শব্দটা কলুষিত করে কাজ নেই, যে-শব্দ গ্যারিবল্ডি, ক্রমওয়েল, শিবাজী প্রভৃতির চরিত্রের প্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। শুনেছি, কিছু লোক এমন কাপুরুষ যে, উৎসবের জন্য বেনামে চাঁদা পাঠিয়েছে। অনেকের

শুধু মৌখিক সহানুভূতি। আবার দাসমনোভাবসম্পন্ন এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, এই উৎসবের নাম শুনলেই যাঁদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়।" [বেঙ্গলী, ২২ জুন, ১৯০২]।

কলকাতার প্রথম শিবাজী-উৎসব সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।১১ ফলে তা 'ইংলিশ-ম্যানের' ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। বর্গীর হাঙ্গামার কথা তুলে প্রাদেশিক বিদ্বেষ জাগাবার চেষ্টা সে করে। দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে উত্তর দেবার চেষ্টাও দেখা যায়। ধৈর্যহারা হবার পাত্র ছিল না মডারেট বেঙ্গলী। ভক্তিভরে জানাল—মরাঠা-বীরকে সর্বভারত যে, অর্চনা করার মানসিকতা অর্জন করেছে—হে ইংরাজ—সে তোমারি দান! তুমিই তো আমাদের দেশপ্রেমের মহান শিক্ষা দিয়েছ। বেঙ্গলী নানাভাবে, কখনো প্রজ্ঞাগর্ভ ধীরতার সঙ্গে, কখনো বেদনাপূর্ণ আক্ষেপের সঙ্গে, ইংলিশম্যানের চরিত্রশোধনের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে 'নরমতা' ছিল না মরাঠার বাঘনখে। মরাঠা লিখেছিল, ইংলিশম্যানের পক্ষে শ্রেণীবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এইভাবেই তো ইংলিশম্যানেরা ভারতে রাজ্যবিস্তার করেছে। বাঙালীদের শিবাজী-বন্দনা করতে দেখে ইংলিশম্যানের বিতৃষ্ণ বিস্ময়—অহো, এ যেন গ্লাসগো'র লোকেরা ডাকাত রব্ রয়-এর মূর্তিস্থাপন করছে! মরাঠা ঐ ঐতিহাসিক বিদ্রূপের ঐতিহাসিক উত্তর দিতে গিয়ে প্রশ্ন করল—বাঙালীর শিবাজী-পূজা যদি বিচিত্র হয় তাহলে স্কট দেশপ্রেমিক উইলিয়ম ওয়ালেসের স্মৃতিউৎসবে ইংরাজের যাওয়া বারণ কিংবা প্রথম চার্লসের হত্যাকারী ক্রমওয়েলের প্রশস্তি করা তাদের পক্ষে দারুণ পাপকর্ম। মরাঠা অতি মারাত্মক খোঁচা দিল সমসাময়িক একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত তুলে। সিন্ধিয়া তখন বৃটিশ অভিষেক-উৎসবে যোগ দিতে ইংলন্ড যাচ্ছিলেন; অথচ তাঁর পূর্বপুরুষ কিছুদিন আগেও ইংরেজকে শত্রুজ্ঞান করে লড়াই করেছেন; তাহলে, সিন্ধিয়া-বংশের বৈরিতার স্মৃতির জন্য, বর্তমান সিন্ধিয়ার পক্ষে মনপ্রাণ দিয়ে অভিষেক-উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভব?

নিবেদিতা ও অন্যান্যের লেখায় শিবাজী সম্পর্কে স্বামীজীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছি। স্বামীজী দীর্ঘ সময় নিয়ে অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে শিবাজীর কথা বলে যেতেন! তখন মনে হত, তাঁর গেরুয়া বস্ত্রের ভিতরে যোদ্ধার বর্ম উঁকি দিচ্ছে। স্বামীজীর "ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ" রচনার মধ্যে মোগল শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মরাঠা শক্তির কথা আছে : "দাক্ষিণভারতকে পদানত করিবার জন্য মুসলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে-অঞ্চলের কোথাও একটি শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণবিজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই সেই ভূখণ্ডের পার্বত্য প্রদেশ হইতে, মালভূমির নানাপ্রান্ত হইতে, কৃষকগণ অশ্বারোহী যোদ্ধাবেশে দলে-দলে কাতারে-কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। রামদাস-প্রচারিত, তুকারাম-সমুদ্গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প; এবং অতি অল্প

---

১১ এলাহাবাদের 'কায়স্থ সমাচার' জুলাই ১৯০২, এই উৎসবের উপরে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখে। এই উৎসবকে দেশী ও সাহেবী, উভয় প্রকার সংবাদপত্রই 'কাললক্ষণ' বলেছে, তবে ঐ কাল-লক্ষণের বিপরীত ব্যাখ্যাও তারা করেছে; দেশী সংবাদপত্রের কাছে যা সর্বভারতীয় ঐক্যের অগ্রগতির সূচক, তাই হয়েছে সাহেবী কাগজের কাছে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ।

["...Whereas the Anglo-Indian Press, led by the *Englishman* of Calcutta, point to the incident as an instance of the growing spirit of unrest in Bengal; as an indication of political dissatisfaction with the powers that be, and as an aggressive and defiant method of expressing that dissatisfaction by exalting the Mahratta leader..."]

—এ সকল কথা এই পত্রিকায় লেখা হয়েছিল। মরাঠাদের দ্বারা একদা লুণ্ঠিত লাঞ্ছিত বাঙালী-

সময়ের মধ্যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্যবসিত হইল।" [৫—৩৯৩]। কিন্তু স্বামীজী ব্যক্তিগত আলোচনায় শিবাজী সম্বন্ধে ঠিক কী ধরনের কথা বলতেন, তার বিশেষ বিবরণ আমরা পাইনি। একটি ব্যতিক্রম বোধহয় ঘটেছে। ডাঃ নানজুণ্ডা রাওয়ের একটি লেখা দেখেছি, যার মধ্যে স্বামীজী-কথিত শিবাজী প্রসঙ্গ তিনি উপস্থিত করেছেন। বেদান্ত কেশরীতে জুলাই ১৯১৪ সংখ্যা থেকে ছাড় দিয়ে-দিয়ে তাঁর *Echoes of the Teachings of Swami Vivekananda* নামে একটি লেখা অনেকদিন বেরিয়েছিল। তার মধ্যে *An Evening Talk on Sivaji* প্রসঙ্গ বেরোয় নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯১৪—এপ্রিল, অগস্ট ১৯১৫—ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল ১৯১৬ সংখ্যাগুলিতে। লেখাটি অসমাপ্ত থাকে। স্বামীজীর কথার তাৎক্ষণিক কোনো নোট ডাঃ রাও রাখেন নি, সেকথা তিনি স্বীকার করেছেন; স্মৃতির উপরই নির্ভর করেছিলেন; এবং স্বামীজীর বক্তব্যের নির্দোষ উপস্থাপনও যে ঘটেনি, তাও জানিয়েছেন। এই সঙ্গে আমরা দেখি, ডাঃ রাও, স্বামীজীর বক্তব্যের সঙ্গে অন্যান্য ঐতিহাসিক রচনা বা গাথা-কাহিনীর বক্তব্যকে জুড়ে দিয়েছেন, নিজের ব্যাখ্যাযোজনাও করেছেন, আর তার ফলে ঠিক কোথায় স্বামীজীর কথা শেষ হয়েছে আর কোথায় অন্যের বক্তব্য আরম্ভ হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তথাপি ঐ স্মৃতিকথায় স্বামীজী কোন্ পরিবেশে কথাগুলি বলেছিলেন, সে চিত্র চিত্তাকর্ষক; সেইসঙ্গে শিবাজী-চরিত্রকে কোন্ দৃষ্টিতে তিনি দেখতেন—তাঁর আলোকময় ঐতিহাসিক কল্পনা কোন্ শিবাজীকে অনুসরণ করত—তার আভাস আমরা পেয়ে যাই।

পরিবেশটি ছিল এইরকম :

"সুন্দর চন্দ্রালোকিত রাত্রি। পরলোকগত মিঃ [মন্মথনাথ] ভট্টাচার্যের মাদ্রাজ সাউথ বীচের বাংলোর বারান্দায় স্বামীজী বসেছিলেন এবং খেতড়ির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ মুনসী জগমোহনলালের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলছিলেন।...অফিসের কাজকর্মের পরে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে প্রণিপাত ক'রে বসেছি—সহসা তিনি শিবাজীর প্রশস্তিসূচক একটা হিন্দীগান তাঁর সিদ্ধকণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন, যার শেষ দুই লাইনেব বক্তব্য : 'দাবানল যেমন অরণ্যের ক্ষেত্রে, চিতাবাঘ যেন মেষপালের ক্ষেত্রে, সিংহ যেমন সমুচ্চ হস্তীর ক্ষেত্রে, সূর্য যেমন নৈশ অন্ধকারের ক্ষেত্রে, কৃষ্ণ যেমন কংসের ক্ষেত্রে—তেমনি শিবাজী-সিংহ ম্লেচ্ছ-নিবহের ক্ষেত্রে।' সঙ্গীতটি দীর্ঘ—সেটি পরে শিখে নিয়েছিলাম। কিন্তু, আমি যে বিদ্যালয়জীবনে শিখে ফেলেছি—শিবাজী ধূর্ত, নীতিহীন দস্যু, 'ভুঁইফোড় ডাকাত', লুঠেরা, বেইমান খুনে! সুতরাং সহসা স্বামীজীকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম -শিবাজীর প্রশস্তিসূচক ঐ কথাগুলি কি যুক্তিযুক্ত? তাঁর উত্থান কি ভাগ্যচক্রে নয়? এই লুঠেরা কি

দের কদাপি শিবাজী-উৎসব করা উচিত নয়, ইংলিশম্যানের এই উপদেশের উত্তর 'মরাঠা' যেভাবে দিয়েছিল—সেই কথাগুলির প্রতিধ্বনি এই পত্রিকা করেছিল, এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, হয়ত শিবাজী-উৎসবে মুসলমান, খ্রীস্টান বা পার্শীরা মনপ্রাণ দিয়ে যোগদান করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে আকবর-উৎসব করলে কেমন হয়! যাইহোক, ১৯০২ সালে কলকাতার শিবাজী-উৎসবই যে, উৎসবটিকে সর্বভারতীয় মর্যাদা দিয়েছিল, সে-বিষয়ে কায়স্থ সমাচারের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"The Sivajee festival...would not probably have been heard of this year but for the celebration of the festival in Calcutta, amidst the greatest enthusiasm...having been presided over by Babu Narendra Nath Sen...and the list of speakers having comprised such an eminent and distinguished name as that of Mr. Surendra Nath Banerjee... There is no doubt however that had it not been for the Calcutta celebration, the incident would not have attracted half the attention, which it has done." ["The Sivajee Celebration and a National Celebration", *Kayastha Samachar,* July 1902, Pages 14-15]

সমধর্মী আরও কতকগুলি লোক জুটিয়ে নিয়ে নিছক কূটকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা একটি রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হয়নি? স্বামীজী তৎক্ষণাৎ গান থামিয়ে পূর্ণচক্ষে আমার দিকে তাকালেন, তাঁর সারা মুখে ধিক্কার ও ক্রোধের আগুন, বললেন : 'ধিক্ ডাক্তার, ধিক্! তুমি নিজে মরাঠি, তবু তুমি গত তিনশো বছরে যিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি—স্বয়ং শিবাবতার—তাঁর বিষয়ে ঐ জ্ঞান অর্জন করেছ! জানো না—তাঁর জন্মের বহু পূর্ব থেকে সে-বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী হয়েছে! মহারাষ্ট্রের সকল ঋষি-মহাত্মারা যবন-অত্যাচার থেকে হিন্দুদের পরিত্রাতারূপে তাঁর অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা করেছেন ব্যাকুল আগ্রহে! মুঘল-বাহিনীর ধ্বংসকারী, লুণ্ঠনকারী শক্তির পদতলে বিমর্দিত ধর্মকে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন! হায়, বিদেশীদের লেখা ইতিহাসপাঠের এই ফল। তাদের তো তোমাদের বিষয়ে কোনোই সহানুভূতি নেই, তোমাদের রীতি-নীতি, ঐতিহ্য সংস্কৃতি, তাদের কাছে অশ্রদ্ধেয়, কারণ সে-বস্তু তারা বোঝেই না। শিবাজীর অপেক্ষা বড় বীর কে আছেন—তাঁর থেকে বড় ঋষি, বড় ভক্ত, বড় রাজা? মহাকাব্যগুলিতে মহানায়কের যে-রূপাঙ্কন করা হয়েছে—শিবাজী তার জীবন্ত বিগ্রহ। জাতীয় চেতনার প্রতিনিধি-পুরুষ তিনি, ভারতের যথার্থ সন্তান। ভবিষ্যৎ ভারত অদূর বা দূর ভবিষ্যতে কী হবে, তা তিনিই দেখিয়ে গেছেন—স্বাধিকার-সম্পন্ন কতকগুলি অঙ্গরাজ্য—এক সাম্রাজ্য-ছত্রতলে অবস্থিত।' স্বামীজীর কথা শুনে আমি প্রায় বজ্রাহত; নিজেকে কী-যে ক্ষুদ্র, নির্বোধ, অজ্ঞ মনে হল কি বলব! তথাপি, স্বামীজীর আগ্নেয় বাগ্মিতা-প্রবাহও আমার জিজ্ঞাসাকে নিবৃত্ত করতে পারল না, কারণ শিবাজীর বিষয়ে যে-কথাই বলা হোক না কেন, বিজাপুরের মস্ত পাঠান সেনাপতি আফজল খাঁ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার সমর্থনে কোনো ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। যে-পরিস্থিতিতে শিবাজী আফজলকে হত্যা করেন, সামান্য নীতিবোধসম্পন্ন মানুষও তাতে শিউরে না উঠে পারবে না। কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে, দুষ্ট কৌতূহলের সঙ্গেও বটে, আমি দেখতে চাইলাম, স্বামীজী কিভাবে শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতার দোষস্খালন করেন। আমি তাঁকে শিবাজীর খাঁটি জীবনকথা কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। শিবাজীর জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক যা, যার জন্য তাঁর জীবন কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হচ্ছে—সে সম্বন্ধেই বা তাঁর বক্তব্য কি জানতে চাইলাম।

"তখন স্বামীজী গভীর আবেগ ও উদ্দীপনার সঙ্গে শিবাজীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন, আমরা অত্যন্ত আগ্রহ ও অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তা শুনে গেলাম। স্বামীজী, অসাধারণ ঐকান্তিকতা, সুগভীর প্রীতি ও কোমলতার সঙ্গে বলে গিয়েছিলেন, আমাদের মন তা কেড়ে নিয়েছিল, আত্মায় জেগেছিল শিহরণ।"

কথাসূচনায় কিন্তু স্বামীজী আফজল খাঁ হত্যা-প্রসঙ্গ আনেন নি—তিনি শিবাজীর সমকালীন ইতিহাস, শিবাজীর পরিবেশ, স্বপ্ন ও সাধনার কথাই বলেছিলেন--তারপর এনেছিলেন আফজল-প্রসঙ্গ। শেষোক্ত ব্যাপারে তিনি গোড়াতে ঘটনার উপাদানসূত্রের বিচার করেন। শিবাজীর নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি বিষয়ে ইংরাজ ঐতিহাসিকরা অন্ধভাবে মুসলমান ঐতিহাসিকদের উপর নির্ভর করেছেন। স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন—ঐ সময়টিতে ঠিক কি ঘটেছিল তা দূরব্যবধানে ঠিকভাবে নির্ধারণ করা দুরূহ, এবং এক্ষেত্রে মুসলমান ঐতিহাসিক ও মরাঠি কাহিনীকারদের বিবরণ অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ও বিপরীত। মুসলমান ঐতিহাসিকরা যেখানে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলেছেন (গ্রাণ্ট, ডাফ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা যা অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন), সেখানে মরাঠি কাহিনীকাররা দেখিয়েছেন, শিবাজী ও-কাজ করেছিলেন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

নানজুণ্ডা রাওয়ের বর্ণনা অনুযায়ী, শিবাজী কোন্ পরিস্থিতিতে আফজলের সম্মুখীন হন, স্বামীজী তা বিস্তারিত বলেন। তিনি দেখিয়ে দেন, আফজলের সঙ্গে শিবাজীর লড়াই ছিল মরণ বাঁচনের—ব্যক্তিগত দিক দিয়ে নয়—রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে। অত্যাচারিত হিন্দুদের

পক্ষে প্রতিরোধ সংগ্রাম ক'রে শিবাজী রাজ্যবিস্তার করছিলেন। পূর্বে অনেক সময়ে ভারতে দুই রাজ্যে যুদ্ধ হয়েছে, হিন্দু রাজাদের মধ্যে কিংবা হিন্দু ও মুসলমান রাজার মধ্যে—গোটা ব্যাপারটি ছিল দুই বা ততোধিক রাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আফজল খাঁ শিবাজীর সঙ্গে লড়াইকে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। শিবাজীর পক্ষে 'কল্যাণ' অধিকার করা হলে বিজাপুরের সত্যকার টনক নড়েছিল। যদিও শিবাজী বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত সুবিচার করেছিলেন, মুসলমান সেনাপতি ও তাঁর কন্যাকে যথোচিত সম্মান দেখিয়েছিলেন, কিন্তু বিজাপুরের নবাব তাতে শান্ত না হয়ে শিবাজীর পিতাকে প্রথমে সতর্ক, পরে কার্যতঃ বন্দী করেন—শিবাজীর উপর চাপ সৃষ্টির জন্য। শিবাজী গোড়ায় কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়েন, শেষপর্যন্ত নিজের এক তেজস্বিনী পত্নীর পরামর্শে যুদ্ধই স্থির করেন, এবং যত্নে চেষ্টায় অধিকাংশ মরাঠি জায়গীরদারের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হন। তখন বিজাপুরের নবাব, বিখ্যাত পাঠান সেনাপতি আফজল খাঁকে ১২ হাজার অশ্বারোহী, ১০ হাজার পদাতিক ও গোলন্দাজবাহিনী দিয়ে শিবাজীকে চূর্ণ করতে পাঠান। আফজল, শিবাজী ও তাঁর পিতা শাহজী সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ করতেন। শোনা যায়, আফজলের জন্যই শিবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকালমৃত্যু ঘটে। যুদ্ধযাত্রা ক'রে আফজল জঘন্যতম ধর্ম-দ্বেষ দেখাতে থাকেন। বাহিনীসহ তুলজাপুরে এসে শিবাজীর পারিবারিক দেবী ভবানীর মূর্তি ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দেন; তারপর পান্ধারপুরে এগিয়ে ভাঙেন বিঠোবার মূর্তি, মন্দিরের মধ্যে গোহত্যা করেন। এই যুদ্ধকে তিনি বিকট ধর্মযুদ্ধের চেহারা দিলেন বলে উভয়পক্ষেই তীব্র ঘৃণা ও হিংসা জাগল। শিবাজীর পক্ষে এতবড় সংকটক্ষণ অল্পেই এসেছে। দেবী ভবানীর উপাসক তিনি; মনে করতেন, প্রার্থনাকালে দেবীর নির্দেশ লাভ করেন, তাঁর ধারণা হল, দেবী বিমুখ হয়েছেন। শিবাজী যখন জানতে পারলেন—ভবানীর মূর্তি ধ্বংস করা হয়েছে, মন্দির হয়েছে কলুষিত—তখন ভাবলেন, প্রতিশোধ না নিতে পারলে পাপস্খালন হবে না। তাঁর মা জিজাবাঈও তাঁকে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে জয় অসম্ভব। একমাত্র উপায়—যদি আফজলকে কোনোভাবে অরণ্যমধ্যে বাহিনীসমেত টেনে আনা যায়, তাহলে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী বা গোলন্দাজ বাহিনী শিবাজীর পার্বত্য সৈন্যদলের কাছে টিকতে পারবে না। কিন্তু কি করে তাঁকে টেনে আনা যাবে? অপরদিকে আফজলও ভাবছেন, যদি কোনোভাবে শিবাজীকে বের করে এনে বন্দী বা হত্যা করা যায় তাহলেই কেল্লা ফতে, কারণ সেনাপতির পতন মানে বাহিনীর পতন, ভারতবর্ষে। আফজল সেই উদ্দেশ্যে এক ব্রাহ্মণ দূত পাঠিয়ে কৌশলে শিবাজীকে আমন্ত্রণ জানালেন; শিবাজীও কৌশলে তার মোকা-বিলা করতে চাইলেন। শেষপর্যন্ত স্থির হল, উভয়ে মিলিত হবেন নিরস্ত্রভাবে আলোচনার জন্য, সৈন্যবাহিনী থাকবে দূরে। আপাততঃ সেইভাবেই উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সেই সময়ে সংঘর্ষ ঘটে, এবং আফজলের মৃত্যু হয়। দোষ গিয়ে পড়ে শিবাজীর উপর। তিনি জামার ভিতরে লৌহত্রাণ পরেছিলেন, মাথায় ছিল একই জিনিস, বাম হাতের আঙুলে ছিল নখাকৃতি ধারালো অস্ত্র, এবং ডান হাতের আস্তিনে লুকানো ছিল ক্ষুদ্র ছুরিকা। শিবাজী অবশ্যই নিরস্ত্র হয়ে দেখা করতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিরক্ষা করেন নি, কিন্তু আফজলও কি তা করে-ছিলেন? পারসিক, ইংরাজ এবং মরাঠি—সকল ঐতিহাসিকই বলেছেন, আফজল তরবারি নিয়ে শিবাজীকে আক্রমণ করেছিলেন। তাহলে আফজল কোন্ সদুদ্দেশ্যে তরবারি নিয়ে গিয়ে-ছিলেন? আফজলের পূর্বকাহিনী এবং শিবাজীর পূর্বকাহিনীর ভিত্তিতে স্বামীজী সিদ্ধান্ত করেছিলেন, (অন্ততঃ ডাঃ রাও তাই বলেছেন)—শিবাজী, আফজলের কুমতলব অনুমান ক'রে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেখা করতে যান, এবং আফজল যখন আলিঙ্গনের ছলে তাঁকে চেপে ধরে, ঢোলা পোশাকের ভিতর থেকে তরবারি বের ক'রে আঘাত করতে উদ্যত হন, তখন শিবাজী প্রথমে বাঘনখ বিঁধিয়ে নিজেকে মুক্ত করেন। তারপর আফজল তাঁর মাথায় তরবারির

আঘাত করলে, শিবাজী ছুরি বিঁধিয়ে তাঁকে মেরে ফেলেন। শিবাজী আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ও-কাজ করেছিলেন। শিবাজীকে তখনি এককভাবে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব, যদি প্রমাণ করা যায়—আফজল নিরস্ত্র ছিলেন, এবং তরবারি নিয়ে শিবাজীকে আঘাত করেন নি।

স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে নিরপেক্ষ ইতিহাসের প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা শিবাজীর যথার্থ চরিত্র, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মহিমা, বুঝতে সমর্থ ছিলেন না বলে মুসলমান কাহিনীকারদের বিদ্বিষ্ট বিবরণকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন, বিশেষতঃ এইজন্য যে, মরাঠি কাহিনীকাররা শিবাজীর দৈবীশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে অলৌকিক ঘটনার জাল বিস্তার করে গিয়েছিলেন, আর তা পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী মনে গ্রাহ্য বিবেচিত হয়নি। কিন্তু (স্বামীজী বলেছিলেন) আওরঙ্গজেব, বিজাপুর নবাবগণ, ও শিবাজীর বিবরণ সংবলিত অনেক পারসিক পাণ্ডুলিপি আছে, যাদের মধ্যে মরাঠি-কাহিনীকারদের তথ্যাংশের মোটামুটি সমর্থন মেলে, শিবাজীর অতিলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস অবশ্য সেখানে নেই। শিবাজীকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে তাঁর অভ্যুদয়কালীন ইতিহাস অনুধাবন করা প্রয়োজন। আওরঙ্গজেব তখন ভারতের বৃহৎ ভূখণ্ড শাসন করছিলেন সামর্থ্যে ও উৎপীড়ন-সামর্থ্যে; তিনি বাহু বিস্তার করছিলেন দাক্ষিণাত্যে; তাঁর ধর্মান্ধতা, নিষ্ঠুরতায় সকলে শঙ্কিত; শক্ত শরীর ও মনের মরাঠারা নিজেদের দুর্গম পার্বত্যনিবাসে পর্যন্ত আশ্রয়হারা হবার ভীতিবোধ করছিল; সেই ধর্মনিষ্ঠ মানুষগুলি রাগে জ্বলছিল স্বধর্মের লাঞ্ছনায়, কিন্তু নেতা নেই—কে দেবে নেতৃত্ব এই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতের দৈহিক ও নৈতিক শক্তিকে সংহত আকারে প্রকাশ করতে? মহারাষ্ট্রের ইতিহাস যেমন দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, তেমনি ধর্মে ও সাধনায় ঘনীভূত। স্বামীজী সমকালীন মহারাষ্ট্রীয় আচার্যগণের সাধনার রূপকে উন্মোচন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তুকারাম, নামদেব, একনাথ, সর্বোপরি—সমর্থ রামদাস। শিবাজীর জন্মকথা ও পরবর্তী কীর্তিকাহিনী স্বামীজী বর্ণনা করেন, কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেন—শিবাজীর যুদ্ধজয় ও শাসনতান্ত্রিক সাফল্যকথা বিবৃত করা তাঁর অভিপ্রায় নয়—তিনি সেই বিরাট মানুষটির বিরাট চরিত্র ও মহান জীবনোদ্দেশ্যকেই তুলে ধরতে আগ্রহী। স্বামীজী বিশেষভাবে শিবাজীর উপরে তাঁর মা জিজাবাঈয়ের গভীর প্রভাবের কথা বলেন। স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা এই নারী আশ্চর্য দৃঢ় চরিত্রের—সমস্ত স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন পুত্রকে; অধিকতর আশ্চর্যের কথা, সে স্বপ্ন দেশ ও ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। শিবাজীকে হতে হবে দেশ ও ধর্মের রক্ষাকর্তা। আরণ্য নির্জনতার মধ্যে, সর্বপ্রকার বিপদ ও কাঠিন্যের মধ্যে, বেপরোয়া উল্লাসে বর্ধিত সেই বালক—কিভাবে মাতার বীর্যে, অশঙ্কিত স্নেহে, দাদাজী কোণ্ডদেবের সতর্ক শাসনে, পূর্ণতর যৌবনে এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—সেকথা বলবার কালে স্বামীজী বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন একটি বিষয়ে—মাতা জিজাবাঈ শিবাজীর মনে জ্বলন্ত সত্যের মতো স্থাপন করেছিলেন অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবানীকে। শিবাজী সত্যই হয়েছিলেন ভবানীর হাতের মুক্ত খড়্গ। সে খড়্গ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায়, অন্যায়ের সংহারে উদ্যত। শিবাজীর ধর্মব্রতী চরিত্রে ছিল দারুণ আকর্ষণী শক্তি এবং প্রভাবশালী মহিমা, যার জন্য হিন্দু-মরাঠিরাই নয়, মুসলমানেরাও অনেকে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে উঠেছিলেন। সকল ধর্মের নারীর প্রতি সম্মান এবং সকল ধর্মের শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা শিবাজীর চরিত্রে অবিচল। "এ সকল সম্ভব হয়েছিল শিবাজীর মনের গঠনে ধর্মের গভীর প্রভাব ছিল বলে। তাঁর সুখদুঃখময় জীবনের শেষপর্যন্ত তিনি ধর্মনিষ্ঠ। ধর্মপ্রেরণা কী সৃষ্টি করতে পারে, তা শিবাজী নিজের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন। একটা ব্রত সম্পাদন তাঁকে করতে হবে, এই চেতনা তাঁকে ব্যক্তিস্বার্থ থেকে দূরে রেখেছিল, সমগ্র জীবনকে দেশ ও দেশবাসীর জন্য নিযুক্ত করায় প্রণোদিত করেছিল।" শিবাজীর চরিত্রে ধর্মপ্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ দেবার সময়ে স্বামীজী সমকালীন অন্যান্য ভারতীয় সাধুদের

তুলনায় মরাঠি সাধুদের একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উত্তরভারত ও উত্তরপশ্চিম ভারতের আচার্যগণ [গুরু নানক, কবীর, তুলসীদাস, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি] যেখানে ধর্মসত্য উচ্চারণে এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মভাবের সমন্বয়সাধনে নিযুক্ত ছিলেন, সেখানে মহারাষ্ট্রীয় সাধক ও আচার্যগণ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গেও ধর্মকে যুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। দেখা যায়, সাধকদের ধর্মসত্য এবং বীরগণের কর্মসত্যের দ্বারা মরাঠিদের প্রাণশক্তি সম্মিলিত ও উদ্বোধিত। "এইসকল সাধকগণ তাঁদের নিরন্তর উপদেশ নির্দেশের দ্বারা মরাঠাদের মনে জাতীয় চেতনার সূচনা ও বিকাশের অসাধারণ কার্য ক'রে গেছেন।...এঁদেরই অন্যতম—মহাপুরুষ সমর্থ রামদাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব শিবাজীকে রাজনৈতিক অগ্রগতি ও রাজ্যবিস্তারে প্রণোদিত করেছিল। শিবাজী তুকারামের দ্বারাও প্রভাবিত হন, এবং যখন সাধু গোস্বামীর কাছে ধর্মজীবনে অগ্রগতির জন্য গুরু-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তখন প্রথমে তুকারামের কাছে যান শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য। শূদ্র সাধু তুকারাম সবিনয়ে রাজগুরু হতে অস্বীকার করেন। ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত শিবাজীকে ভবানী স্বপ্নদর্শন দিয়ে ব'লেন, তোমার গুরু হবেন রামদাস, তাঁর কাছেই যাও। শিবাজীর আবেগ ও উৎকণ্ঠা রামদাসকে জয় করেছিল, তিনি শেষপর্যন্ত শিবাজীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন, এবং ক্ষাত্রিয়ধর্ম পালনের জন্য নির্দেশ দিয়ে উপহার দিয়েছিলেন একটি নারিকেল, একমুষ্টি ধূলি, দুই মুষ্টি অশ্ববিষ্ঠা এবং চার মুষ্টি-পরিমাণ প্রস্তর। এই উপহারের তাৎপর্য শিবাজী বুঝেছিলেন। নারিকেল ঐশ্বর্যের সূচক; বাকি দ্রব্যগুলি ইঙ্গিত করছে—শিবাজীকে বহু দেশ জয় করতে হবে, বহু বাহিনী গঠন করতে হবে, এবং জয় করতে হবে বহু দুর্গ। রামদাস কিভাবে শিবাজীর মনে দেশপ্রেম ও ধর্মপ্রেমের অগ্নি একসঙ্গে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন স্বামীজী তার বিশদ বর্ণনা করেন, সেইসূত্রে রামদাসের উদ্দীপক শক্তিবাণীর স্মরণ করেছিলেন [যা নানজুণ্ডা রাওকে স্বামীজীর নিজ বাণীর কথা স্বতঃই স্মরণ করিয়েছিল; তিনি উভয়ের তুলনা করেছিলেন, এবং কালপরিবর্তনে স্বামীজী কিভাবে তাঁর বাণীকে বিশ্ববাণী করে তুলেছিলেন, তাও বলেছিলেন]। স্বামীজী—রামদাস ও শিবাজী, গুরু ও শিষ্যের অপূর্ব সম্বন্ধসূচক কাহিনীটি বলেছিলেন, যা ভারতের রাজকুলের ইতিহাসে অসামান্য এক কাহিনী, এবং যাকে রবীন্দ্রনাথ সামান্য কয়েক বছর পরে একটি কবিতায় অমর রূপদান করেন।

"একটি ঘটনার কথা শোনা যাক [স্বামীজী বললেন] যা পার্থিব বস্তু সম্বন্ধে শিবাজীর অনাসক্তির সর্বোচ্চ প্রমাণ, এবং গুরুর জন্য তিনি কোন্ বিরাট ত্যাগ করতে সমর্থ ছিলেন, তার স্মারক।...কথিত আছে, একদিন শিবাজী সাতারার দুর্গে বসে আছেন, দেখলেন—গুরু রামদাস নগরীতে ভিক্ষা করতে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর চিটনিস [প্রধান লিপিকর] বালাজি আবাজিকে ডেকে নির্দেশ লিখে, সেটিতে রাজমোহর অঙ্কিত ক'রে, সেটি নিয়ে পথে বেরিয়ে, রামদাসের কাছে গেলেন, এবং তাঁর ভিক্ষার ঝুলিতে সেটি অর্পণ করলেন। রামদাস শুধোলেন, কাগজে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়? কাগজটি খুলে দেখলেন, তাতে লেখা আছে, শিবাজী তাঁর গোটা রাজ্য গুরুকে অপর্ণ করেছেন। রাজ্যহারা হবার পরে শিবাজী কী করতে চান, রামদাস এই প্রশ্ন করলে শিবাজী বললেন, তিনি মহান গুরুর সেবায় পরবর্তী জীবন কাটাবেন। 'বেশ কথা', রামদাস বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে।' রাজার কাঁধে তিনি নিজের ভিক্ষার ঝুলি চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে গুরুর জন্য ভিক্ষা করতে বললেন। কোনো দ্বিধা বা সংকোচ না রেখে শিবাজী ঐ কাজে বেরিয়ে পড়লেন, সাতারা দুর্গের দ্বারে-দ্বারে পর্যন্ত ভিক্ষা করলেন. তারপর প্রয়োজন-পরিমাণে বস্তু সংগৃহীত হলে রামদাসের সঙ্গে নদীতীরে উপস্থিত হয়ে তাঁর সামনে ভিক্ষাদ্রব্য মেলে ধরলেন। রামদাস দুটি চাপাটি প্রস্তুত করে, একটি নিলেন নিজে, অন্যটি দিলেন শিবাজীকে। আহারের পরে রামদাস প্রশ্ন করলেন—'এই নতুন জীবন কেমন লাগছে?' শিবাজী বললেন, 'আমি আনন্দিত।' তখন রামদাস বললেন—'তোমার রাজ্য

এবার তুমি ফিরে নাও।' গভীর দুঃখে শিবাজী বললেন—'প্রভু, আমাকে যা করতে বলবে সব করব, কিন্তু দয়া করে দত্তাপহরম্-এর [দত্তবস্তু পুনর্গ্রহণের] অপরাধে অপরাধী করবে না।' রামদাস বললেন—তুমি কি আমার আদেশ শুনবে?' শিবাজী বললেন—'নিশ্চয়ই' 'তাহলে ফিরে যাও তোমার প্রাসাদে, আর গুরুর নামে দেশশাসন করো।' শিবাজী সম্মত হলেন, এবং সেইদিন থেকে এ-রাজ্য যে, সন্ন্যাসীর, তারই চিহ্নস্বরূপ তিনি গৈরিক বস্ত্রকে নিজ পতাকা করলেন। এই হল সুবিখ্যাত ভাগোয়া ঝাণ্ডা।১২

১২ শিবাজীর গৈরিক পতাকার উৎসকথা বাংলা কাব্যে বা নাটকে যথেষ্ট। এখানে আমরা বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত 'প্রতিনিধি' কবিতাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কবিতাটি রচনার তারিখ, ৬ কার্তিক, ১৩০৪, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের অক্টোবর। সময় হিসাবে, স্বামীজীর উক্ত বর্ণনার প্রায় চার বছর পরে লেখা। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বামীজীর এ বিষয়ক মনোভাব জানা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না, এবং মনে হয়, উভয়ে একই ধরনের উৎস থেকে কাহিনীটি সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি অ্যাক্‌ওয়ার্থ সাহেব-অনূদিত মরাঠি গাথা ইংরাজি অনুবাদ থেকে কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন—স্বামীজী সেখান থেকে নিতে পারেন [ঐ বই কবে প্রকাশিত হয়েছিল?] কিংবা নিজ পরিব্রাজক-জীবনে সরাসরি মরাঠি লোকগাথা শুনেও জানতে পারেন, অথবা অন্য ইতিহাস থেকে। ডাঃ নানজুণ্ডা রাও স্বীকার করেছেন, আগেই দেখেছি, তিনি স্বামীজীর বক্তব্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র করতে পেরেছিলেন। স্বামীজী ঐ ঘটনার বর্ণনাকালে কোন বিশেষ আবেগ এনেছিলেন, চরিত্রের উক্তিসমূহে কোন্ বিশেষ মাত্রাদান করেছিলেন, তার ফলে কোন নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছিল [এক্ষেত্রে স্বামীজীর অসামান্য ক্ষমতার কথা পরিচিত সকলে মেনেছেন]—তা জানার উপায় আমাদের নেই। অপরপক্ষে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি সরাসরি পেয়ে যাচ্ছি। দেখি যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রয়োজনে, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিযোগে, রামদাস ও শিবাজী মনোলোকের উপর বিচিত্র বর্ণপাত করেছেন। স্বামীজীর কাছে [ডাঃ রাওয়ের বর্ণনা যদি সঠিক হয়] গুরুকে রাজ্যদানের মধ্যে শিবাজীর প্রচণ্ড চিত্তশক্তি ও মহান ত্যাগাদর্শই প্রতিফলিত হয়েছিল অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে— সমস্ত উদার মহিমা সত্ত্বেও, শিবাজীর মনে ঐ ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম আত্মাভিমান সক্রিয় ছিল। "সবই যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত," তাঁর ভিক্ষা করার মধ্যে শিবাজী বস্তুতৃষ্ণা দেখেছিলেন, এবং গুরুকে রাজ্য সমর্পণ করার দ্বারা একধরনের বৈরাগ্যশিক্ষা দিতে চেয়ে ছিলেন। শিবাজীর পক্ষে এই ধরনের চিন্তার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে। প্রথমতঃ, শিবাজী এ ধর্ম জেনেও কি জানতেন না—ভারতীয় সন্ন্যাসীদের রীতি কি?—মাধুকরীর অন্নকে সন্ন্যাসীরা কোন পবিত্র সঞ্চয় মনে করেন? দ্বিতীয়তঃ, শিবাজীর মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনে অবশ্যই এ-প্রশ্ন ওঠা উচিত ছিল—"সবই যাঁর হস্তগত," তিনি সেসব বস্তুকে ভোগ না ক'রে যদি ভিক্ষা ক'রে ফেরেন তাহলে তার ভিন্ন তাৎপর্য থাকতে পারে। ওর পরবর্তী কাহিনী অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বর্ণনা করেছেন [শিবাজীর রাজ্যদান থেকে গুরুর নামে তার পুনর্গ্রহণ, ও স্মারক হিসাবে গৈরিক পতাকা গ্রহণ], তা স্বামীজীর বর্ণনার অনুরূপ।

সূচনায় শিবাজীর ভাবনার অংশ বাদ দিলে, যখন রামদাসের কথায় চলে আসি, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে দীর্ঘায়ত নমস্কার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। না, রামদাস কর্তৃক রাজ্যগ্রহণ ক'রে, পরে তাকে ধর্মরাজ্যরূপে পালনের জন্য শিবাজীকে প্রতিনিধি করার ঘটনার জন্য আমাদের ঐ ভাবাবেগ নয়—ও-কাহিনী মূলেরই অনুগত—আমাদের আবেগ রামদাসের মুখে বসানো শিব সঙ্গীতটির জন্য। এ যে কী অপরূপ জিনিস, বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ভিখারী শিবের জন্য নিবিড় ভালবাসা ছত্রে ছত্রে—কিন্তু তা স্তুতিমুখর নয়, বুকে মোচড়-দেওয়া অভিমানে ভরা। সন্ন্যাসীর দেবতা শিবের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী রামদাসের ঐ নিগূঢ় অভিমানের মর্মে কাঁপছে পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো ভালবাসার মধুবিন্দুটি। সব হারানো বৈরাগীর কি লীলা থাকে? থাকে, আছে, এখানে তা দেখি। সন্ন্যাসীদের বুকের কাঁপনটিকে রবীন্দ্রনাথ—সন্ন্যাস-বিরোধী—কি ক'রে এমনভাবে অনুভব করলেন অথবা এরই নাম কবিপ্রতিভার দৈবী লীলা! গানের ছত্রগুলিকে উৎকলন না করে পারছি না :

"হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার
সুখে আছে সর্ব চরাচর—

"বর্ণনার এই অংশে এসে স্বামীজী অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, মথিত কণ্ঠে বলেন, 'এমন বিরাট ও বিশুদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে বলব—পার্বত্যমূষিক, লুঠেরা, ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক? ঐ মহাবীর সম্বন্ধে ঐকথাই তোমরা শিখেছ! ঐ মহাবীর—যাঁর কাছে রাজ্য তৃণখণ্ড ছাড়া কিছু নয়, গুরুর নির্দেশে যিনি নিজ দুর্গে ভিক্ষা করতে কুণ্ঠিত হননি! শিবাজী সম্বন্ধে অমন ঘৃণ্য, কলুষিত উক্তি রেখে যাচ্ছ অধস্তন পুরুষদের শিখবার জন্য—ধিক্ তোমাদের!"

॥ ৭ ॥ স্বামীজীর দেহত্যাগে তিলকের প্রবন্ধ

স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তিলক কি-ধরনের মনোভাব নিয়ে পুনায় ফিরে গিয়েছিলেন, তা কয়েকমাস পরেই প্রকাশিত হল। স্বামীজীর দেহান্তে কেশরী পত্রিকায় ৮ জুলাই, ১৯০২, স্বামীজীর চিত্রসহ একটি দীর্ঘ শোকপ্রবন্ধ লিখলেন তিলক। প্রবন্ধের তলায় লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু এটি তিলকেরই রচনা, কারণ এন সি কেলকার কর্তৃক এটি তিলকের রচনা বলে চিহ্নিত হয়ে তিলকের রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এবং তাঁর প্রামাণ্য জীবনীকারেরা এটি তাঁর রচনা হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। এই প্রবন্ধমধ্যে তিলক স্বামীজীর জীবন ও কর্মকাণ্ডের মুক্ত প্রশস্তি করেন। এই কাজ করবার সময়ে তিলকের মতো স্থিতধী

মোরে তুমি হে ভিখারী, যার কাছ হতে কাড়ি
কবেছ আপন অনুচর। .
ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি—
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু,
সবার সর্বস্বধন চাহি। ..
আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার মাঝে
কে তুমি আড়ালে করো বাস। .
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই,
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।"

স্বামীজীর বাংলা কবিতায় নয়, কিছু ইংরাজি কবিতায় এবং চিঠিতে অনুরূপ অনুভূতির প্রকাশ অজস্র দেখেছি। কিছু অংশ আগে উদ্ধৃত করেছি—তাঁর মহাসমাধি বর্ণনার অধ্যায়ে আরও কিছু উদ্ধৃত করব।

আরও একটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। রামদাস যখন শিবাজীর উপরে ধর্মসহ রাজ্য চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তখন "নৃপশিষ্য নতশিরে, বসি রহে নদীতীরে, চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।" ও চিন্তা কিসের? অবশ্যই তা হল—মহাদায় বহনের "বেদনা অপার।" বিবেকানন্দের মতো বিরাট চরিত্রের মানুষ রামকৃষ্ণ-অর্পিত দায়ভার বহনের জন্য কোন্ দারুণ দাহ নিশিদিন সহ্য করেছেন, কিংবা শেষপর্যন্ত তাতেই দগ্ধ হয়ে গেছেন—সে বস্তু বহু শত পৃষ্ঠা ব্যয় করেও সামান্য অংশেও আমি প্রকাশ করতে পারিনি। এখানে আমি বিবেকানন্দ নয়—অন্য একজনের কথা, যিনি প্রতিভায় উন্নত কিন্তু জীবনের এক পর্বে চরিত্রে সেই পর্যায়ে উন্নত নন—সেই গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-সম্পর্ক-কথা স্মরণ করতে বলব। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি 'বকলমা' দিয়েছিলেন। ধর্মজীবন যাপনের ঝঞ্ঝাটমুক্ত গিরিশ অব্যাহতির আনন্দে অট্টহাস্য করতে গিয়েই আঁতকে স্তব্ধ হয়ে যান, যখন দেখেন—তাঁর প্রতিশ্রুতি কোন্ কালাগ্নিকে বহন ক'রে তাঁরই দিকে ছুটে আসছে। সর্বস্ব হারিয়ে গিরিশ যে-সর্বস্বকে পেয়েছিলেন—তারই 'প্রতিনিধি' হয়ে তাঁকে বাকি জীবন কাটাতে হয়েছিল। সেই 'সর্বস্ব'-এর নির্দেশ ছিল—থিয়েটার ত্যাগ করা চলবে না, থিয়েটার লোকশিক্ষার বাহন, থিয়েটারের রঙ মেখে, পাদপ্রদীপের আলোয় কালভৈরবের নাচ তুমি নাচো—অশিবের মাঝখানে—শিবের লীলাগানে।

পুরুষ অবশ্যই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেছিলেন, কারণ তিনি এর মধ্যে বিবেকানন্দকে নব শংকরাচার্য বলে অভিহিত করেন, যা করার ঝুঁকি ছিল—বিশেষতঃ নিজ প্রদেশের রক্ষণশীল-দের কাছে এর জন্য জবাবদিহির সম্ভাবনা ছিলই। তিলক সর্বশ্রেণীর বিবেকানন্দ-বিরোধীদের চিনতেন। বিবেকানন্দকে শংকরাচার্যের তুল্য বলায় সমাজসংস্কারকদের কটু উত্তেজনার চেহারা এক্ষেত্রে আমরা আগেই দেখেছি। এসব সম্ভাবনার কথা জেনেও তিলক ঐ ধরনের কথা না লিখে পারেন নি কারণ যাঁকে ভারতের নব শংকরাচার্য বলে মনে করেছেন, তাঁর লোকান্তরে তাঁকে শ্রেষ্ঠ নমস্কার জানানোর পবিত্র কর্তব্য পালন না করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

লেখাটি অনুবাদে উপস্থিত করছি। এর মধ্যে অল্পস্বল্প তথ্যভ্রান্তি আছে, যা ঐকালে অস্বাভাবিক নয়।

শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের চিরসমাধিতে প্রস্থান

সহস্র-সহস্র হিন্দু, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তের সংবাদে শোকার্ত না হইয়া পারিবেন না। স্বামী বিবেকানন্দ গত শুক্রবার কলিকাতার নিকটবর্তী বেলুড়-মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীবিবেকানন্দ-স্বামীর নাম জানেনা এমন হিন্দু আছে কিনা সন্দেহ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড়বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের নিকট সহস্র-সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যে-অধ্যাত্মবিজ্ঞান বর্তমান আছে তাহার অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়া সে-বিষয়ে শ্রদ্ধা জাগরিত করা, সেইসঙ্গে ঐ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উৎসভূমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি সৃষ্টি করা—অল্প শক্তির কাজ নহে। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞানের প্রবাহ এমনই দ্রুতগতিতে বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাকে বিপরীতমুখী করিতে হইলে অসাধারণ সাহস ও অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি এই কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম ইহার বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা নিছক যুক্তিনির্ভর। ইহা ছাত্রকে ধর্মচিন্তা হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। শুধু তাই নয়, অধিকন্তু তাহা নিজ ধর্মসহ সকল ধর্মের কুৎসা করিতে উৎসাহিত করে। যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দেরও একই প্রবণতা ছিল। স্বামীজী পূর্বাশ্রমে বঙ্গদেশীয়। তাঁহার বর্তমান বয়স ৩৫ বা ৪০। বৎসর-কুড়ি পূর্বে তাঁহার শিক্ষাজীবন শেষ হয়। ইহার দ্বারাই বোঝা যায়, সেইসময়ে তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল, কারণ কলিকাতা বা পুনা বা বোম্বাই—সকল স্থানেই ইংরাজি শিক্ষার প্রকৃতি অভিন্ন। স্বামীজীর পূর্ব নাম নরেন্দ্রনাথ সেন [দত্ত] তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। কথিত আছে, বাল্যে এক জ্যোতিষী তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, এই বালক কোনদিন বিবাহ করিবে না। ১৮ বা ১৯ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস করেন। সেইসময় হইতে তাঁহার মনে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে আগ্রহের সূত্রপাত হয়। তাহার পূর্বে তিনি নাস্তিক ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাচার্যের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি প্রশ্ন করিতেন—আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? এই প্রশ্নের দ্বারা তাঁহাদের বিব্রত করিয়া দিতেন। কিন্তু যখন হইতে তিনি শ্রীস্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্রবে আসিলেন, তখন হইতে তাঁহার মনোজগতে পরিবর্তনের সূচনা হইল, এবং পরিশেষে তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন সুপরিচিত—সে জীবনকথা ম্যাক্সমূলার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দেহাবসান হয়। তাঁহার শিষ্যগণ জনগণের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারের দ্বারা তাঁহার ভাব প্রচার করিতে শুরু করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের সহিত এই কাজে যোগদান

করেন এবং আমেরিকাবাসীদের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সহিত পরিচিত করান। প্রথমে স্বামীজী ভারতের নানাস্থানে এবং হিমালয়ে কয়েক বৎসর পরিচয় গোপন করিয়া সিদ্ধ মহাপুরুষগণের সন্ধানে পরিভ্রমণ করেন। এই পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি ১৮৯১-৯২ খ্রীস্টাব্দে পুনায় আসেন। পুনা হইতে তিনি মহাবালেশ্বরে যান। সেখান হইতে যান বেলগাঁও, ধারওয়াদ, মাদ্রাজ ও রামেশ্বরে। তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণের অভিপ্রায় মাদ্রাজেই জাগে; সেখানকার লোকের অর্থসাহায্যেই তিনি আমেরিকা যান। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিকাগো-প্রদর্শনীর সময়ে সেখানে সর্বধর্মের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সেই ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠার সমুদয় গৌরব স্বামী বিবেকানন্দের। ধর্মমহাসভার পরে কয়েক বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া তিনি সেখানে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচার করেন। এই কাজ চালাইবার জন্য তিনি সেখানে মঠ-প্রতিষ্ঠা ও শিষ্যগ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকা বর্তমানে সর্ব শাস্ত্র ও মতের সম্মেলনভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এহেন দেশে অসাধারণ পুরুষ ভিন্ন অদ্বৈতের আলোচনা ও প্রতিষ্ঠা ঘটানো সম্ভব নহে, বিশেষতঃ যেখানে খ্রীস্টান মিশনারিরা সদলে উপস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভারতের হিন্দুদের মধ্যে 'হিন্দুত্ব' বা হিন্দুধর্মই একমাত্র সংযোগ-সূত্র, এবং হিন্দুধর্মের মতসমূহ এমনই মহান যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও সেই মত-গুলিকে কেবল ভারতে নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও প্রচার করা সম্ভব। আজ হিন্দুর যদি কিছু থাকে এই ধর্মই আছে। যদি সে ধর্মত্যাগ করে তাহা হইলে সে নিজেকে জগতের কাছে ঘৃণার ও উপহাসের পাত্র করিয়া তুলিবে। 'হিন্দুধর্ম কি তাহা সঠিকভাবে জানো; তাহার নীতি-গুলির অনুশীলন করো; শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে সেগুলি যাচাই করো; এবং সেইসকল ধর্ম-নীতিকে সমগ্র জগতে বিস্তার করিয়া নিজ নাম ও নিজ দেশের নামকে অক্ষয় করো।' এইসকল কথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভক্তি নিশ্চয় ধর্মের প্রধান 'লক্ষণ', কিন্তু অদ্বৈত-জ্ঞানের সহিত যুক্ত না হইলে ধর্ম পঙ্গু হইয়া যাইবে। ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিলেই তিনি এই কথাগুলির উপর জোর দিতেন। তিনি কখনো খ্রীস্টানদের বলেন নাই—তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করো। তিনি বলিতেন, 'তোমরা নিশ্চয় খ্রীস্টের উপাসনা করিবে, কিন্তু যেহেতু দার্শনিক সিদ্ধান্তে তোমাদের ধর্ম দুর্বল, তাই তোমরা তোমাদের ধর্মের মধ্যে আমাদের অদ্বৈত-সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করো। তোমাদের আচার্যগণ অবশ্য অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে অবহিত থাকিয়াই তোমাদের ধর্মনীতি রচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ বা রাজযোগ যেহেতু সত্য ধর্মের বিভিন্ন পথ, তাই অন্য কোনো ধর্মের সহিত অদ্বৈততত্ত্বের বিরোধ নাই, ইহা সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। যাহাদের নিকট বংশপরম্পরায় এই জ্ঞান রহিয়াছে তাহাদের অবশ্য-দায়িত্ব এই জ্ঞানকে প্রচার করা।' স্বামীজী সর্বসময়ে এই উপদেশই দিতেন। হিন্দুকে ধর্মবিষয়ে শিথিল-স্বভাব দেখিয়া তাঁহার বেদনার সীমা ছিলনা। তিনি ইহাও অনুভব করিয়াছিলেন যে, ধর্মজাগরণ ভিন্ন জাতিজাগরণ সম্ভব নহে, এবং তাহার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকায় শিষ্য তৈয়ারী করিয়া, এবং অদ্বৈত প্রচার করিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি প্রথমে সিংহলে যান, সেখান হইতে মাদ্রাজে। তারপরে কলিকাতায়। এবং তারপর হিমালয়ের আলমোড়া-মঠে। সমস্ত যাত্রাপথে তাঁহার উপর অজস্রধারে প্রশস্তি বর্ষিত হইতে থাকে। এইকালে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে তিনি উৎসাহ ও উদ্দীপনা ঢালিয়া দিয়াছেন। হুগলী নদীর ধারে বেলুড়ে তিনি আমেরিকানদের অর্থসাহায্যে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্মনীতি প্রচার করিতে পারে, এমন শিষ্যধারা তিনি সৃষ্টি করিয়া-ছেন। মঠভূমিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সমাধিমন্দিরও নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার সহকারিগণ আলমোড়া হইতে 'প্রবুদ্ধভারত' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতেছেন। ১৮৯৬-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষকালে পাঞ্জাব রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মিগণ রাজপুতানায় গিয়া দুঃস্থরা যাহাতে মিশনারিদের কবলে না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করেন। শ্রীবিবেকানন্দের ইচ্ছা

ছিল—ভারতের সর্বত্র প্রচারক প্রেরণ করেন। কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক কর্মী না পাওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় অপূর্ণ থাকে। তবে তিনি কলিকাতা, আলমোড়া, আজমীর, মাদ্রাজ ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে প্রচারক নিয়োগে সমর্থ হইয়াছেন। আমেরিকাতেও তাঁহার দু'একজন শিষ্য স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে এক প্রদর্শনী হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেইকালে ফরাসিভাষা শিক্ষা করিয়া সেখানে সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে ফরাসী ভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এইজন্য তিনি সেখানকার সংবাদপত্রসমূহে বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। বৎসরাধিককাল তিনি হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। জাপনীরা তাঁহাকে তাহাদের দেশে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল, কিন্তু উক্ত অসুস্থতার জন্য তিনি যাইতে পারেন নাই। গত শুক্রবার তিনি যথারীতি ভ্রমণ করিয়া ফেরেন, তারপরে অস্বস্তিবোধ করিতে থাকেন। একজন শিষ্যকে ডাকিয়া, দেহত্যাগ করিব, এইরূপ বলেন। তারপর তিনবার গভীর শ্বাস লইয়া তিনি ঊর্ধ্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা যে তার পাইয়াছি, তাহা হইতে এই কথা জানিয়াছি। স্বামীজী যে এইভাবে যৌবনেই দেহত্যাগ করিবেন—ইহা দেশের পক্ষে অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পূর্ণভাবে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' ছিলেন, যেমন ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অক্কালকোট মহারাজ। স্বামী বিবেকানন্দই নানা বহির্দেশে হিন্দুধর্মের মহিমা স্থাপনের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, উৎসাহ এবং আত্মিক শক্তির দ্বারা উক্ত কার্যকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জনগণ আশাভরে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, এই ভিত্তির উপরে গঠিত সৌধের সর্বোচ্চ চূড়া স্বামীজী স্বয়ং তাঁহার শ্রীহস্তে নির্মাণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু স্বামীজীর অকাল দেহত্যাগে সে আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে। **দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে শংকরাচার্যই একমাত্র মহাপ্রাণ ব্যক্তি যিনি কেবল আমাদের ধর্মের শুদ্ধতার কথা বলিয়া যান নাই, যিনি কেবল মুখে বলেন নাই যে, এই ধর্ম আমাদের শক্তি ও সম্পদ, এই ধর্মকে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য—তিনি তাহাকে কার্যে পরিণতও করিয়াছিলেন। সেই একই জাতীয় মানুষ স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আবির্ভূত।** কিন্তু তাঁহার কার্য এখনো অসম্পূর্ণ। সেই কার্য সমাপন করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যগণ বা অন্য সকলকে আমরা আহ্বান করিতেছি। যদি আমাদের কোনো সম্পদ থাকে তাহা এই ধর্ম। আমাদের গৌরব গিয়াছে, স্বাধীনতা গিয়াছে, আর সবকিছুই গিয়াছে—শুধু আছে ধর্ম, যাহা অসাধারণ বস্তু। পৃথিবীর সর্ব সভ্য জাতির সহিত সংঘাতের কালে ইহা আত্মরক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারিয়াছে—ইহার শুদ্ধতা প্রমাণিত হইয়াছে। যদি এই ধর্মকে ত্যাগ করি, তাহা হইলে আমরা ঈশপের গল্পের রত্নত্যাগী মোরগের মতো উপহাসের পাত্র হইব। এখন এমন সময় আসিয়াছে যখন খোলা বাজারে প্রতিযোগিতা করিয়া আমাদের সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। সৌভাগ্যের বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ সেই কাজ করিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে এমনকিছু শক্তি পাইতাম যাহা আমাদের এক জাতিরূপে সংগঠিত করিয়া দিত। সন্দেহ নাই যে, তিনি তাঁহার কর্ম-অনুযায়ী মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আমাদের উপর ন্যস্ত দায় উদ্ধার করিয়া, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের মধ্যে স্বামীজীর ভাবধারা অব্যাহত রাখেন, যাহাতে আমরা, প্রাচীন ঋষিগণের আধুনিক বংশধরগণ, অদ্বৈততত্ত্বের সকল বস্তুকে জীবনে বরণ করার গৌরব অর্জন করিতে পারি। স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে আমরা তাঁহাকে দুই-তিনবার পুনা আসার অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। একবার তিনি পীড়িত ছিলেন, অন্যবার অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। এই সকল কারণের জন্য পুনাবাসী দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার ভাষণ শুনিতে পায় নাই।

॥ ৮ ॥ স্বামীজী তিলককে কী চোখে দেখতেন?

স্বামীজীর বিষয়ে তিলকের লেখা পেলেও তিলকের বিষয়ে স্বামীজীর লেখা কার্যতঃ পাইনি। স্বামীজীর চিঠিতে তিলকের বিক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র আছে। স্টার্ডিকে ৮ অগস্ট, ১৮৯৬, চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন, "নামটি হল বালগঙ্গাধর তিলক, এবং বইটির নাম ওরিয়ন।" পরিষ্কার বোঝা যায়, স্বামীজী তিলকের বইটির সঙ্গে স্টার্ডিকে পরিচিত করাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ভারততাত্ত্বিক-রূপে তিলকের উল্লেখ স্বামীজী একবার করেছেন তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে : "পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দুদের 'বেদ' অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান আকারে ছিল।" [৬-১১৩]। তিলককে স্বামীজী একাধিক পত্র লিখেছেন, এই উল্লেখ পেলেও সেসব চিঠি পাইনি। পাওয়া গেলে বোঝা যেত, স্বামীজী লিখিতভাবে তিলককে কোন্ সমুচ্চ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

তিলকের সম্বন্ধে স্বামীজীর বিপুল শ্রদ্ধার কথা রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে সবিশেষ জানা ছিল। স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) আমাকে বলেছেন, তিলকের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পরে স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বলেছিলেন—আজ সত্যকারের একজন 'মানুষ' দেখলাম। ভরত মহারাজ একথা সমকালীন সন্ন্যাসীদের কাছেই শুনেছেন।

বেদান্ত কেশরীর অগস্ট, ১৯৫৬ সংখ্যায় তিলকের উপর দীর্ঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে স্বামী তুরীয়ানন্দের তিলক সম্পর্কিত উক্তি উদ্ধৃত ছিল। ১৯০৫ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দ এক পত্রে লিখেছিলেন : "শ্রীযুক্ত তিলক সম্বন্ধে আমার সমুচ্চ ধারণা, এবং বিরাট শ্রদ্ধার কথা তুমি জানো। স্বামীজীর কাছ থেকে তাঁর চরিত্রের কত না প্রশংসার কথা শুনেছি।" তুরীয়ানন্দ আরও বলেছিলেন, অপরিচিত সন্ন্যাসীরূপে স্বামীজী যখন ভারতভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি তরুণ তিলককে তাঁর সমালোচক বন্ধুদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে ভারতের ঐতিহ্য ও সন্ন্যাসধর্মকে সমর্থন করতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তিলকের শেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তুরীয়ানন্দ বলেন, উভয়ের কথাবার্তার বিষয়বস্তু যদিও লিখিত হয়নি কারণ আলোচনাকালে কাউকেই সেখানে যেতে দেওয়া হয়নি, তথাপি এটা পরিষ্কার যে, তাঁরা ভারতের বহুবিধ সমস্যার বিষয়েই আলোচনা করেছিলেন—এবং সেগুলির সমাধানের জন্য কোন্ পরিকল্পনা নেওয়া যাবে—সে সম্বন্ধেও।

রামকৃষ্ণ সংঘের মধ্যে তিলক সম্বন্ধে স্বামীজীর পরবর্তীকালেও শ্রদ্ধা অব্যাহত ছিল—তিলকের মৃত্যুর পরে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকীয় মন্তব্যে [অগস্ট, ১৯২০] তার পরিচয় আছে। তার অংশ উপস্থিত করেই অধ্যায় শেষ করব।

তিলককে ঐ সম্পাদকীয়তে 'মহারাষ্ট্রের প্রাণ' এবং 'ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যু 'জাতীয় বিপর্যয়।' তিলকের বিরাট পাণ্ডিত্য, অসাধারণ চরিত্র, এবং ত্যাগের উল্লেখ করার পরে বলা হয়—তিনি এদেশের মানুষের কাছে আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। সম্পাদকীয় শেষ হয় এই বলে :

"বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানে, সুদৃঢ় স্বাধীনতাচেতনায়, অসাধারণ মনস্বিতায়, তিলক তাঁর পার্শ্ববর্তী মানুষদের তুলনায় বহু ঊর্ধ্বে বিরাজিত। সব জড়িয়ে একথা বলা যাবে, তিলক নিঃসন্দেহে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সর্বাধিক সম্মানিত সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর লোকান্তরে পৃথিবী হারিয়েছে এক বিরাট পণ্ডিত ও বিরাট পুরুষকে, আর আমাদের দেশ হারিয়েছে এক যথার্থ দেশপ্রেমিককে। সত্যই তিনি আধুনিক ভারতগগনে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের অন্যতম।"

আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি—এ কথাগুলির মধ্যে স্বামীজীর কথার প্রতিধ্বনি ছিল।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

বিবেকানন্দ—ওকাকুরা

॥ ১ ॥

বুদ্ধগয়া ও কাশী ভ্রমণের সময়ে স্বামীজীর এমন একজন বিদেশী সংগী ছিলেন, যাঁর নাম আধুনিক ভারতের কলাশিল্প ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দু'এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে। তাঁর নাম কাকুজো ওকাকুরা।

ওকাকুরা কে—কেন তিনি ভারতে এসেছিলেন—কেনই-বা স্বামী বিবেকানন্দের সংগী হয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সঠিক সংবাদ অনেকদিন ধরে প্রচারিত থাকলেও, ভ্রান্ত ধারণার পরিমাণ অল্প নয়। একটি ভ্রান্ত ধারণা হল, ওকাকুরা ঠাকুর-পরিবার ও রবীন্দ্রনাথের সংগে পরিচিত হবার জন্যই ভারতে এসেছিলেন। অথচ একটু নজর দিলেই দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ নিজে এক চিঠিতে, এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ওকাকুরা-স্মৃতিতে বলেছেন, নিবেদিতাই ওকাকুরার সংগে তাঁদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন। ভ্রান্ত ধারণার কারণ অবশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন এবং ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে নানা ধরনের লেখালেখি প্রচুর হয়েছে, এবং সেইসকল সূত্রে অনেক সময়ই ওকাকুরার সংগে ঠাকুর পরিবারের সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাই সহজ সিদ্ধান্ত—ওকাকুরা ঠাকুর-পরিবারের সূত্রে ভারতে না এসে পারেন না। সাহিত্যবিষয়ক লেখকগণ অবশ্যই ধর্মবিষয়ক ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারেন না, এবং সেই অনাগ্রহের অধিকারে তাঁরা বিবেকানন্দ-জীবনী বা পত্রাবলী নাও পড়তে পারেন!

বিবেকানন্দ ওকাকুরা সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞাত তথ্যাদির সংগে নূতন জিনিস যোগও হচ্ছে কিছু কিছু। সংবাদ-উৎসগুলি মোটমাট হল : স্বামীজীর পত্রাবলী (বহুপূর্বে এবং অল্প পূর্বে প্রকাশিত১), নিবেদিতার পত্রাবলী, মিস ম্যাকলাউডের পত্র ও স্মৃতিকথা, স্বামীজী সম্পর্কিত আরও কিছু স্মৃতিকথা (যথা 'কাশীধামে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত স্বামী সদাশিবানন্দের স্মৃতিকথা, 'স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কিছু স্মৃতি), প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্যগণ-লিখিত স্বামীজীর ইংরাজি জীবনী, সমকালীন সংবাদপত্র, ব্রহ্মানন্দের ডায়েরি এবং প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় জাপানী মহিলা ইয়াসুকো হোরিওকার একাধিক প্রবন্ধ।২

এইসকল সূত্র থেকে যে-সব প্রসঙ্গ উঠে আসে, তাদের কিছু অংশ আগে উত্থাপিত হয়েছে। জাপান সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। আমি বর্তমান খণ্ডে যন্ত্রশিল্পায়নে জাপানের সাফল্যের কথা বলবার সময়ে স্বামীজীর বক্তব্য উপস্থিত করেছি। জাপানের নিসর্গ সৌন্দর্য, জাপানীদের প্রকৃষ্ট রুচি, তাদের শিল্পবোধের কথাও বিক্ষিপ্তভাবে বলেছি। কলাশিল্পের ক্ষেত্রে ভারত-জাপান সংযোগ, স্বামীজীর সঙ্গে এ-ব্যাপারে ওকাকুরার ভাববিনিময়ের কথা 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের এক খণ্ডে পরিবেশিত হবে। নিবেদিতা-ওকাকুরার বৈপ্লবিক চেষ্টা, ও সে সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রতিক্রিয়াও একই গ্রন্থে বিস্তারিত বলব। বর্তমান অধ্যায়ে ধর্ম-দর্শন ব্যাপারে স্বামীজীর সঙ্গে ওকাকুরার সম্পর্ক এবং উভয়ের ব্যক্তিগত যোগাযোগই বিশেষভাবে আলোচ্য।

॥ ২ ॥

চিকাগো ধর্মমহাসভার বিশ্বব্যাপক প্রভাবের আর একটি প্রমাণ—এইখানে জাপানেও একটি ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা হয়েছিল—এবং স্বামীজীকে সেখানে নিয়ে যাওয়াই ওকাকুরার ভারতে আগমনের বহির্গত উদ্দেশ্য।

জাপানে স্বামীজীকে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছিল, সেটা আদিতে ধর্মমহাসভাসূত্রে কিনা বলা শক্ত। যাইহোক স্বামীজীকে জাপানে আমন্ত্রণের ব্যাপারে মিস ম্যাকলাউড মধ্যস্থতা করেছিলেন, এবং ওকাকুরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

স্বামীজী সম্বন্ধীয় একটি স্মৃতিকথায় পাই, জাপানের সরকারী মহলও স্বামীজীকে নিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট ছিল। তা ধর্মমহাসভাসূত্রে, কিংবা তা ছাড়াই করা হয়েছিল, বলতে পারব না।৩

মিস ম্যাকলাউড ১৯০১ সালে মার্চ মাস নাগাদ জাপানে গিয়ে বেশ কয়েকমাস সেখানে থাকেন। সেই সময়ে ওকাকুরার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়। তিনি তখন অবশ্যই বিবেকানন্দ ও তাঁর মহিমা এবং ভারতবর্ষ ও তার শিক্ষার কথা ওকাকুরাকে বলেছিলেন। তিনি কয়েকমাস ওকাকুরার কাছে শিল্পশিক্ষাও করেন,৪ এবং ওকাকুরার বক্তব্যকে খসড়া আকারে

৩ মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন :

"একদিন বিকাল চারটে নাগাদ জাপানী কনসাল বেলুড় এলেন, স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে ভিতরের বারান্দায় বেঞ্চে বসানো হল, যেখানে স্বামীজী অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। স্বামীজীকে মান্য অতিথির আগমনের বিষয়ে জানানো হলেও কনসালকে বেশ খানিক অপেক্ষা করতে হল। . স্বামীজী কনসালের কাছে একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন। দোভাষীর মারফত কথা হল। রীতিমাফিক অভিনন্দন বিনিময়ের পরে কনসাল তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন : 'আমাদের মিকাডো আপনাকে জাপানে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি আমার মারফত আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনার সুবিধামতো যত শীঘ্র সম্ভব আপনি জাপানে চলুন। জাপান আপনার মুখে হিন্দু ধর্মকথা শুনতে উৎসুক।' স্বামীজী বললেন, 'আমার বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থায় জাপান যাওয়া সম্ভব হবে মনে হচ্ছে না।' কনসাল বললেন, 'সেক্ষেত্রে আমি কি আপনার অনুমতি নিয়ে মিকাডোকে জানাতে পারি, যখন আপনার শরীর কুলোবে তখন আপনি যাবেন?' স্বামীজী বললেন, 'এই শরীর তেমন অবস্থায় আর কোনোদিন আসবে কিনা সন্দেহ।'" ['রেমিনিসেনসেস' ৫৭]।

৪ শ্রীমতী হোরিওকা লিখেছেন : "ওকাকুরার পুত্র ওকাকুরার উপরে লিখিত তাঁর দুটি পুস্তকে বলেছেন, মিস ম্যাকলাউড এবং ক্যালিফোর্নিয়া ওকল্যাণ্ডের জনৈক জোসেফিন এম হাইড, বক্তৃতায় ওকাকুরার কাছ থেকে জাপানী শিল্প-ইতিহাস সম্বন্ধে পাঠ নিয়েছিলেন।...এই বক্তৃতাগুলি অবশ্যই ১৯০১ মে থেকে ডিসেম্বর মাসের সূচনাকাল—এই সময়ের মধ্যাংশে দেওয়া হয়। .. এইসকল বক্তৃতার কোনো নোট যদিও পাওয়া যায় না, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ তা আইডিয়ালস্ অব

লিখে (তার মধ্যে শিল্পবিষয়ক বক্তব্যের সঙ্গে রাজনৈতিক বক্তব্যও ছিল বলে আমাদের অনুমান) নিবেদিতার কাছে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেন—ভাববিনিময়ের জন্য, তৎসহ লেখাগুলি পরিমার্জনার জন্য। ওকাকুরা এইসব কারণে, কিংবা আমাদের অজ্ঞাত অতিরিক্ত অন্যান্য কারণে, স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ওকাকুরার তখনকার পরিচয়—শিল্পশাস্ত্রী রূপেই। তাঁর জন্ম, ১৮৬২ ডিসেম্বর মাসে; সামুরাই (ক্ষত্রিয়) বংশোদ্ভূত; একটি আমেরিকান মিশনারি স্কুলে কিছু ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত। এক বৌদ্ধ পুরোহিতের কাছে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রপাঠও কিছু করেন; পুরাতনী সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ প্রীতি বাল্যাবধি; ১৮৮০ সালে কলেজ ছাড়ার পর থেকে ক্লাব সোসাইটি ইত্যাদির সংগঠনে তৎপর; ১৮৮৬ সালে জাপানের ইম্পিরিয়াল আর্ট কমিশনের সদস্যরূপে ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করেন; টোকিওর 'নিউ আর্ট স্কুলে'র অধ্যক্ষ হন; কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় শিল্পরীতি অনুসরণের জন্য চাপ দেওয়া হলে পদত্যাগ ক'রে, তরুণ শক্তিমান শিল্পীদের নিয়ে 'নিপ্পন বিজিৎসু' বা 'হল অব ফাইন আর্টস' স্থাপন করেন।

স্বামীজীর পত্র থেকে জাপানী আমন্ত্রণ, তাকে গ্রহণ করার জন্য মিস ম্যাকলাউডের তাগিদ, নির্বন্ধে পড়ে তাতে স্বীকৃতি, কিন্তু শেষে স্বাস্থ্যের কারণে অস্বীকার—ক্রমান্বয়ে এইসব সংবাদ পাব। মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজীর ২০ মার্চ, ১৯০১, চিঠিতে মিস ম্যাকলাউডের জাপানে অবস্থানের সম্ভাবনার কথা আছে। কিছুদিনের মধ্যে মিস ম্যাকলাউডের পত্র ও ওকাকুরার আমন্ত্রণ এসে যায়। স্বামীজী ১৪ জুন মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন : "জাপান, বিশেষতঃ জাপানী শিল্প, উপভোগ করছ জেনে খুবই আনন্দিত। তুমি ঠিকই বলেছ যে, জাপানের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হবে। জাপান যে-সাহায্য করবে তার মধ্যে থাকবে প্রভূত সহানুভূতি ও সম্মান, অপরপক্ষে পাশ্চাত্যের সাহায্য সহানুভূতিহীন এবং ধ্বংসাত্মক। তাই ভারত ও জাপানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। ...এখন প্রিয় জো, জাপানে যদি আমাকে যেতেই হয় তাহলে এবার সারদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার হবে, কাজটা চালু করার জন্য। সেইসঙ্গে লি হুং চ্যাং-এর [চীনের বিশ্ববিখ্যাত রাজনৈতিক পুরুষ এবং মন্ত্রী] নিকট মিঃ ম্যাক্সিম যে-পত্রটি দেবেন বলে প্রতিশ্রুত সেটিও অবশ্যই চাই। . এইমাত্র মিঃ ওকাকুরার কাছ থেকে ৩০০ টাকার একটি চেক এবং আমন্ত্রণপত্র এসে গেল। খুবই লোভনীয়। তবু—মা-ই জানেন।" ১৮ জুন স্বামীজী একই জনকে জানালেন, তিনি ওকাকুরাকে প্রাপ্ত টাকার রসিদ পাঠিয়েছেন। বললেন, "তোমার সকল চাতুরীর জন্য প্রস্তুত।...যা হোক, আমি সত্যই যাবার জন্য চেষ্টা করছি। তবে জানই তো, যেতে একমাস, ফিরতে একমাস, আর থাকা মাত্র দিন কয়েকের জন্য! তা হলেও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার নিতান্ত মন্দ শরীর, আর কিছু আইনঘটিত ব্যাপারে একটু দেরী হতে পারে।"

একই তারিখে ওকাকুরাকে লেখা স্বামীজীর চিঠি ছিল অত্যন্ত আবেগতপ্ত, যা জাপান সম্পর্কে তাঁর অনুরাগের পরিমাণ দেখিয়ে দেয় :

"আপনাকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করতে অনুমতি করুন। কোনো গত জন্মে আমরা নিশ্চয় তাই ছিলাম। আপনার ৩০০ টাকার চেক যথাসময়ে পৌঁছেছে। তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

"আমি সদ্য ভাবছিলাম জাপানে যাব। কিন্তু একটা না একটা বাধা, এবং স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থার দরুন ব্যাপারটাকে ত্বরান্বিত করতে পারিনি।

"জাপান আমার কাছে স্বপ্নভূমি—এত সুন্দর যে [একবার দেখলে] সারাজীবন মনে ধাওয়া করে।

"সর্বপ্রকার প্রীতি ও আশীর্বাদ জানাই।"

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জাপান যাওয়ার অসম্ভাব্যতা স্বামীজী বুঝতে পারেন। মিস ম্যাকলাউডকে অসামর্থ্য জানিয়ে লিখলেন : "তোমার জাপানী বন্ধু খুবই সহৃদয়তা দেখিয়েছেন কিন্তু আমার শরীর এত খারাপ যে, মনে হয় না জাপানকে দেবার মতো যথেষ্ট সময় আমার অবশিষ্ট আছে।...তাছাড়া, যেতে-আসতে দু'মাস লেগে যাবে, থাকতে পারব তো এক মাস—তাতে তো কাজ করার বিশেষ সুযোগ থাকবে না, কি বলো? সুতরাং তোমার জাপানী বন্ধু পাথেয় হিসাবে যে-টাকা পাঠিয়েছেন, তুমি তাঁকে সে টাকা দিয়ে দিও। যখন নভেম্বরে ভারতে আসবে তখন তা আমি তোমাকে শোধ করে দেব।" স্বামীজী সিস্টার ক্রিস্টিনকে ৬ জুলাই-এর চিঠিতে একই ধরনের কথা লিখলেন, বাড়তি কারণ হিসাবে "দীর্ঘ ভ্রমণে অনিচ্ছার" কথাও বললেন।

স্বামীজী 'না' করে দিলেও মিস ম্যাকলাউড হাল ছাড়েন নি। তাঁর তাগিদে স্বামীজী কখনো ভেবেছেন যাবেন, আবার তারপরেই সে ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন। ক্রিস্টিনকে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর লিখলেন, "সদ্য ভাবছিলাম জাপান যাব, কারণ মিস ম্যাকলাউডের নিতান্ত জেদ। ...এইমাত্র ওঁর কাছ থেকে টেলিগ্রাম, সেইসঙ্গে চিঠি এল। ওঁর যখন এত নির্বন্ধ, তখন যাওয়ার কথাই চিন্তা করছি।" কয়েকদিনের মধ্যে তিনি মত বদলালেন, এবং ক্রিস্টিনকে লেখা চিঠি থেকে তা দেখা যায়। ৮ অক্টোবর একই জনকে লেখা চিঠিতে পাকাপাকিভাবে জাপান ভ্রমণের বাসনাত্যাগের কথা বললেন।

মিসেস বুলকে মিস ম্যাকলাউড ৩০ অক্টোবর আলোচ্য প্রসঙ্গে যে-চিঠি লেখেন, তাতে অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে :

"স্বামীজী যখন জাপানে এলেন না, তখন মিঃ ওকাকুরা দু'মাসের জন্য ভারতে যাবার কথা ভাবছেন। তবে যেহেতু 'প্রাচীন মন্দির সংরক্ষণ কমিটির' সভা ডিসেম্বরের গোড়ার দিকের আগে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না (ঐ কমিটির সভাপতি তিনি), তাহলে আমি যদি পূর্ব পরিকল্পনামতো ৩০ নভেম্বর যাত্রা করি, উনি হয়ত আমার সঙ্গে যেতে পারবেন না। সুতরাং আমার যাত্রা সপ্তাহখানেক কি দিন-দশ পেছিয়ে দেওয়াই উচিত মনে হয়, কেননা সেক্ষেত্রে তিন সপ্তাহের সমুদ্রযাত্রাকালে ওঁর তত্ত্বাবধানে থাকার স্বস্তি ও আনন্দ পাব, সেই সঙ্গে মিঃ হোরি-র সঙ্গও। মিঃ হোরি এক তরুণ ব্রহ্মচারী, মঠে থাকবার জন্য যাচ্ছেন, ঐকান্তিক স্বভাবের জাপানী, সাত বছর ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে আছেন।

"জাপান সরকার প্রাচীন মন্দির সংরক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর ১৫০,০০০ ইয়েন অর্থাৎ আমাদের হিসাবে ৭৫,০০০ ডলার দেন। এটি মিঃ ওকাকুরার জীবনের প্রধান এক কাজ (অপরটি জাপানের শিল্পধারা উজ্জীবিত রাখার জন্য বিজিৎসু বা ফাইন আর্টস হল স্থাপন)—তাই ভারতে যাবার আগে এর সভায় উপস্থিত থাকার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ..

"মিঃ ওকাকুরা তোমার সঙ্গে সাক্ষাতে অত্যন্ত উৎসুক। তিনি বলেন, তিনি জানেন তোমাকে তাঁর ভাল লাগবেই। খুবই নম্র মধুর মানুষ তিনি—ডাঃ বসুর চরিত্রের যে-গুণ তুমি পছন্দ করো।. .কি বিচিত্র! আমি সেইসব প্রাচ্যবাসীকে পছন্দ করি যাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ছোঁয়া নেই, যাঁরা নিজেদের সংস্কৃতিধারার উপর অবস্থিত, সেইসঙ্গে আমাদের মধ্যে যা ভালো আছে তা দেখতে সমর্থ।

"রবিবার সাত জন হিন্দু তরুণকে মধ্যাহ্নভোজনে ডেকেছিলাম—সেইসঙ্গে মিঃ ওডা, তাঁর পত্নী ও পুত্র, এবং এক মোঙ্গল সন্ন্যাসী—সব জড়িয়ে জন-ষোল। সকলে হিন্দুরীতিতে মেঝেয় বসে খেলাম। গান বাজনাও ছিল। এগারোটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মনোরম কেটে-

ছিল।...পরের বুধবার মিসেস হিউজেস আমার এখানে মধ্যাহ্নভোজনে আসছেন, মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।"

মিস ম্যাকলাউড জাপানী দলের সঙ্গে তাঁর ভারতে আগমনের ইচ্ছার কথা স্বামীজীকে জানিয়েছিলেন। স্বামীজী তা জেনে, ৮ নভেম্বর মিস ম্যাকলাউডকে আনন্দপ্রকাশ ক'রে, লিখলেন : "জাপানী বন্ধুদের নিয়ে আসছ জেনে খুব খুশি। সাধ্যে যা কুলোবে, সেইভাবে সর্বপ্রকারে মনোযোগ তাঁদের দেব।...জানিনা, তোমার জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে উড়িষ্যার মন্দির দেখা সম্ভব হবে কিনা! আমাকেই মন্দিরের ভিতরে যেতে দেবে কিনা জানিনা—ম্লেচ্ছ খাদ্য খেয়েছি তো! লর্ড কার্জনকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।" স্বামীজী ক্রিস্টিনকে ১২ নভেম্বরের চিঠিতে জাপানী বন্ধুদের আসার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। ২৫ নভেম্বরের চিঠিতে তা নিয়ে কৌতুকও করেছেন : "মিস ম্যাকলাউড,...হাঁ, স্বয়ং তিনি, জাপান থেকে ভারতে আসছেন—সঙ্গে জাপানী 'কনভার্ট'গণ। তাঁরা অবশ্য পুরুষ, কেননা উনি হলেন লেডি মিশনারি।"

ইয়াসুকো হোরিওকার প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি, ওকাকুরা কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন ১৯০২ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে মঠে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১২ জানুয়ারি কলকাতায় স্বামীজীর বন্ধু-বান্ধবরা ওকাকুরা ও তাঁর সঙ্গীদের সংবর্ধনা ও প্রীতিভোজ দেন।

স্বামীজী ওকাকুরাকে পছন্দ করেছিলেন। ফলে জাপান যাবার ইচ্ছা তাঁর মনে আবার উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে। ২৩ জানুয়ারি ক্রিস্টিনকে তিনি লেখেন :

"মিস ম্যাকলাউড তাঁর জাপানী বন্ধুদের—শিল্প-অধ্যাপক মিঃ ওকাকুরা, ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী হোরি-কে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছেন। শেষোক্ত জন ভারতে এসেছেন সংস্কৃত ও ইংরাজি শিক্ষা করতে,৫ আর প্রথম জন, জাপানী সংস্কৃতি ও শিল্পের মাতৃভূমি ভারতকে দেখতে চান। ভালো কথা, মিসেস বুল ও নিবেদিতা কয়েকদিনের মধ্যে এসে পড়বেন.আশা

৫ স্বামীজী হোরিকে খুব ভালবাসতেন। ইংরাজি জীবনীতে পাই, "[ওকাকুরা ও বেভাং ওডা-র সঙ্গে] হোরি নামক একটি অল্পবয়স্ক বালক এসেছিল। ওকাকুরা ও হোরি মঠের অতিথিরূপে সানন্দে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা স্বামীজীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। স্বামীজীও অপরপক্ষে তাঁদের সঙ্গে বহু মজায় মেতে উঠতেন। তিনি ছেলেটির সঙ্গে মহাস্ফূর্তিতে ছেলেখেলা করতেন।"

জাপানীদের চেহারা দেখে বয়স বোঝা শক্ত। শ্রীমতী হোরিওকা বলেছেন, হোরি সিটোকু-র বয়স ঐসময় ২৫। তিনি আরও জানিয়েছেন, বেলুড়-মঠে থাকাকালে হোরির ম্যালেরিয়া হয়। ওকাকুরা তাঁকে ১০ জুন পীড়িত ও শ্রান্ত দেখে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে স্থানান্তরিত করেন। ১৯০৩ সালে আর এক জাপানীর সঙ্গে হোরি ভারতভ্রমণে বেরিয়ে কাশ্মীর শ্রীনগরের কাছে একটা জায়গায় দুই ঘোড়ার গাড়ির সংঘর্ষে বাঁ হাতে আঘাত পান, এবং ধনুষ্টংকার হয়ে ২৭ বছর বয়সে মারা যান।

স্বামীজীর জাপানে না যাবার একটা কারণ বোধহয়, তিনি বুঝেছিলেন—তাঁর জীবনাদর্শকে গভীর অংশে বুঝতে জাপান তখন সমর্থ নয়। হোরির উচ্চ ভাবের প্রশংসা করার পরে তিনি খোলাখুলি নিজের ঐ বিষয়ক মত মিসেস বুলকে লেখেন, ১৪ জুন, ১৯০২ :

"যুবক হোরির এখানে জ্বর হয়েছিল। সে দিন-কয়েকের মধ্যেই সেরে ওঠে এবং কিছুদিনের জন্য ওকাকুরার সঙ্গে গেছে। তার ধর্মভাব দেখে সবাই তাকে ভালবাসে। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তার ধারণাগুলি খুব উচ্চ এবং তার অভিলাষ এই যে, জাপানে সে খাঁটি ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী-সংঘ স্থাপন করবে।"

এর পরে স্বামীজী লেখেন, বিবাহসম্বন্ধের পবিত্রতা ও অচ্ছেদ্যতার আদর্শকে জাতিগতভাবে গ্রহণ না করলে ব্রহ্মচর্যের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী সংঘ সম্ভব নয়। সেজন্য স্বামীজী জাপানে হোরি-আকাঙ্ক্ষিত, ব্রহ্মচর্য-নির্ভর সন্ন্যাসী-সংঘের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করেন নি। পত্রের ঐ অংশ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। [৩—২৫৩]

করা যাচ্ছে। এই গোটা দলটি জাপানে যাবেন, এমন কথা বলছে—অবশ্য নিবেদিতা বাদ, কেননা সে এখানে কাজের জন্য থেকে যাবে।

"মনে বাসনা, জাপান যাবার চেষ্টাচরিত্র করব, সম্ভব হলে চীনেও। আঃ, কি যে চাই, তুমি নিবেদিতার সঙ্গে জাপান যাবার দলে জুটে পড়ো।"

কয়েকদিন পরেই, ২৭ জানুয়ারি, স্বামীজী ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া ও বারাণসী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। ইংরাজি জীবনীতে আছে, স্বামীজী আগেই কাশীভ্রমণ স্থির করে ফেলেছিলেন। বুদ্ধগয়া যাওয়ার অনুরোধে সম্মতি জানিয়ে তিনি ওকাকুরাকে বলেন, "তথাগত যেখানে বোধিলাভ করেছেন সেখানে, আর যেখানে তিনি মানবের জন্য প্রথম বাণী প্রচার করেন সেখানে [বারাণসীতে], আপনার সঙ্গে তীর্থযাত্রা করতে পারলে গভীর আনন্দলাভ করব।" কয়েকটি স্মৃতিকথায় এই ভ্রমণসূত্রে ওকাকুরা-প্রসঙ্গ পেয়েছি। নরেশচন্দ্র ঘোষ, যাঁর ডাক নাম গোর, এই ভ্রমণে স্বামীজীর সঙ্গী হয়েছিলেন। বুদ্ধগয়া ভ্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

"স্বামীজীর দলের সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় চলেছি। জাপান থেকে ওকাকুরা এসেছেন—তাঁকে নিয়ে বুদ্ধগয়া দেখাতে স্বামীজী যাচ্ছেন। মিস ম্যাকলাউডও সঙ্গে। কানাই মহারাজ প্রধান সেবক। তাঁর সহায়কারী নেদা ও আমি। হাওড়া থেকে তখন গয়া যেতে হলে বাঁকিপুরে বদল করতে হত। ভোরে গাড়ি বাঁকিপুরে এল, সঙ্গে-সঙ্গে গয়া যাবার গাড়ি। ওকাকুরার কাছে তদানীন্তন লাটসাহেব লর্ড কার্জনের একখানি পরিচয়পত্র ছিল। তাই এই দলটিকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য সরকারী মহল প্রস্তুত ছিল। সবাই মিলে ডাকবাংলোতে ওঠা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পাহারা মোতায়েন।.. ম্যাকলাউড ও ওকাকুরার জন্য বাবুর্চির ব্যবস্থা, স্বামীজীর জন্য তাঁর প্রিয় খাদ্যগুলি প্রস্তুত করলেন কানাই মহারাজ।.. স্বামীজী বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করলেন। তারপর চা-পানাদি শেষ হলে সকালবেলা বুদ্ধগয়া যাত্রা হল।...বুদ্ধগয়ার ..মঠের অধীশ,...বয়স আন্দাজ আটাশ-ত্রিশ, শিষ্যদের নিয়ে স্বামীজীকে সুস্বাগত জানাবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।...নামবামাত্র স্বয়ং মোহন্ত-মহারাজ স্বামীজীকে প্রণাম করলেন এবং সমস্ত দলটিকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে চললেন। আগে স্বামীজী—পশ্চাতে ম্যাকলাউড ও ওকাকুরা।. স্বামীজীকে গদীতে বসালেন। ম্যাকলাউড ও ওকাকুরা স্বামীজীর পাশে গদীর উপরই বসলেন। নিজে নীচে হাতজোড় করে স্বামীজীর পায়ের কাছে বসে রইলেন।...বলতে লাগলেন বারবার—'ধন্য আমি! আহা, ভাগ্য আমার।'

"সাত-আটদিন বুদ্ধগয়ায় থাকা হল। স্বামীজী প্রত্যহ মন্দিরে যেতেন। আমাদের সকলকে প্রত্যেক প্রস্তরমূর্তির ভাব, শিল্পনৈপুণ্য, ঐতিহাসিকতা বুঝিয়ে দিতেন। ..একদিন কয়েক মাইল দূরে বৌদ্ধ গুহাগুলি দেখতে যাওয়া হল। স্বামীজী ডাণ্ডিতে; ম্যাকলাউড, ওকাকুরা ও আমি হাতীতে; নাদু ও কানাই মহারাজ বোধহয় ঘোড়ায়।.. তিন-চারটি গুহা খুব সুন্দর। ভিতরে দেওয়ালের গায়েও বেশ চমৎকার সব খোদিত মূর্তি।...সব দেখেশুনে সন্ধ্যা নাগাদ ফেরা হল।" ['স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন']।

ওকাকুরাকে নিয়ে স্বামীজীর মজা করার কথাও এই স্মৃতিকথায় পাই। বুদ্ধগয়ায় এক বাঙালী ভদ্রলোক স্বামীজীর দলের জন্য এক কলসী তালের রস এবং এক কলসী খেজুর রস পাঠাতেন। "স্বামীজী ওকাকুরাকে তালের রস খাওয়াতে বলতেন। আমরা সবাই খেজুর রস খেতাম। ওকাকুরার নেশা হত। ওঁকে নিয়ে রগড় করতেন খুব।"৬

৬ স্বামীজী ওকাকুরাকে সকৌতুকে অনেক সময়ে 'খুড়া' বা 'খুড়ো' বলতেন। কথাটি 'অক্রূর খুড়ার' ভগ্নাংশ। 'ওকাকুরা' কেবল ধ্বনিসাদৃশ্যে 'অক্রূর খুড়া' হননি—পৌরাণিক কাহিনী-সাদৃশ্যও ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "অক্রূর যেমন মথুরা হইতে কৃষ্ণকে লইতে আসিয়া ছিলেন, সেইরূপ ওকাকুরা মহাশয়ও জাপান হইতে স্বামীজীকে লইতে আসিয়াছেন; সেইকারণে আমরা তাঁহাকে অক্রূর খুড়া বলিয়া থাকি।"

বুদ্ধগয়ার পরে কাশী ভ্রমণ। সেখানে ওকাকুরাকে কিভাবে স্বামীজী বিশ্বনাথ দর্শন করিয়েছিলেন, যে-বিষয়ে নরেশচন্দ্র ঘোষ বলেন : "ওকাকুরাকে স্বামীজী কালাপেড়ে ধুতি সিল্কের পাগড়ি ইত্যাদি পরিয়ে সাজালেন। লোকে দেখে মনে করল নেপালের রাজবংশীয় কেউ এসেছেন। বিশ্বনাথ দর্শন করতে পাঠালেন। ওকাকুরার সঙ্গে পনর-কুড়িজন গেলেন।"

মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী সদাশিবানন্দের কাছ থেকে কাশীতে স্বামীজী-বিষয়ক যে-স্মৃতি-কথা সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করেছেন [গ্রন্থনাম 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ'], তার মধ্যে পাই :

"একদিন স্বামীজী, [কাশীতে, কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে] নিরঞ্জন-স্বামী, শিবানন্দ-স্বামী, ও ওকাকুরা প্রভৃতি সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন, আমি ও চারুবাবু [পরে স্বামী শুভানন্দ] তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সময় অপরাহ্ণ, স্বামীজী জনমণ্ডলীর সহিত নানারকম কথাবার্তা বলিতেছিলেন। মাঝে মাঝে ওকাকুরার সহিত ইংরাজিতে কথাবার্তা হইতেছিল। বিষয়টা বোধহয় ভারতভ্রমণের।"

কাশীতে চিত্ররসিক কালিদাস মিত্রকে স্বামীজী কিভাবে চিত্রপ্রসঙ্গে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় উৎসাহিত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সদাশিবানন্দের প্রাসঙ্গিক স্মৃতি আগেই উদ্ধৃত করেছি [বর্তমান খণ্ড, পৃ ৮৩]। কালিদাস মিত্র একদিন আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর জাপানযাত্রার কথা তোলেন।—"মিত্র-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজী, আপনি নাকি জাপান যাবেন?' প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'জাপান গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ওকাকুরা সেইজন্যই এসেছেন। জাপানটি বেশ দেশ। তারা শিল্পবিদ্যা দৈনন্দিন কার্যেও প্রয়োগ করেছে। আমি আমেরিকা যাবার কালে জাপান দেখে যাই। দেখলাম, গৃহগুলি বংশনির্মিত ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সম্মুখে একটি করে বাগান আছে, ঘরগুলি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জাতটা খুব উন্নতি করছে। ঠাকুরের কৃপায় যদি আমার জাপান যাওয়া হয়, আমি তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব জাপানীরা পাশ্চাত্যবিদ্যা খুব অধিকার করেছে, ধর্মে বৌদ্ধ, কিন্তু ধর্মের দিকে খুব অনাস্থা বেদান্তভাব তাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে তাদের খুব মঙ্গল হবে।' মিত্র-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাতে ভারতের কি উপকার হবে?' স্বামীজী বলিলেন, 'উভয় জাতির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে উভয় জাতিরই মঙ্গল হবে, এবং তাতে উভয় জাতিই সমভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে'।" ['কাশীধামে', ৭৫-৭৬]।

ওকাকুরা স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে নিয়ে উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন ১০ ফেব্রুয়ারি। এই ভ্রমণের সংবাদ দিয়ে ঐ তারিখে স্বামীজী মিসেস বুলকে যে-চিঠি লেখেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ আগেই উদ্ধৃত করেছি [বর্তমান খণ্ড, পৃ ১২৯-৩০]—যেটি স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টির ব্যাপারে খুবই মূল্যবান—তা দেখিয়ে দেয়, স্বামীজী ওকাকুরাকে ভারতশিল্প অনুধাবনে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজীর ১: ফেব্রুয়ারির চিঠিতে এই ভ্রমণের উল্লেখ আছে; ["খুড়ো (ওকাকুরা) আর নিরঞ্জন আগ্রায় গেছে; আজ তাদের পত্র আসতে পারে"]; তা আছে ১৮ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে; ["খুড়ো আর নিরঞ্জন গোয়ালিয়র হতে পত্র লিখেছে"]; এবং ২১ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে; ["খুড়োর ক-দিন হল চিঠিপত্র পাইনি। অজন্তা গেছে—এই শেষ খবর"]।

ওকাকুরা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এবে তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু এইসঙ্গে স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার পরিকল্পনাতে ছেদ পড়েনি। এবার জাপানে নিয়ে যাবার জন্য নতুন একটা কারণ উপস্থিত করা হল।

॥ ৩ ॥

জাপানী পুরোহিত রেভাঃ ওডা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন—২ এপ্রিল।৭ স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীতে [চতুর্থ খণ্ড· (১৯১৮ সং) পৃ. ৩৭-৩৮] এইসূত্রে লেখা হয়েছে :

"দুজন পণ্ডিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি জাপান থেকে মঠে এসেছিলেন। তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্য—স্বামীজীকে জাপানের ধর্মমহাসভায় যাওয়ার জন্য প্রণোদিত করা। অদূরে ভবিষ্যতে ঐ মহাসভা অনুষ্ঠিত হবার কথা। তাঁরা বললেন, 'আপনার মতো বিখ্যাত ব্যক্তি যদি যান, তাহলে ঐ সম্মেলনের সাফল্য অবধারিত। আপনাকে অবশ্যই সেখানে গিয়ে আমাদের সাহায্য করতে হবে। ধর্মজাগরণ এখন জাপানের বিশেষ প্রয়োজন। সেই বহু ঈপ্সিত উদ্বোধন আনতে পারেন—তেমন মানুষ আপনি ছাড়া তো আর কাউকে দেখি না।' একথা বলেছিলেন জাপানের বৌদ্ধ-মঠের বিখ্যাত অধ্যক্ষ রেভাঃ ওডা। স্বামীজী তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী মিঃ ওকাকুরার গভীর আন্তরিকতা দেখে রাজি হয়ে পড়লেন। অসুস্থতা ছিল—কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ তিনি মানবজাতির আর একটি অংশকে সাহায্য করতে পারছেন। তাঁদের কাছে স্বামীজী ভগবান বুদ্ধের মহান জীবন ও তাঁর শিক্ষার দার্শনিক অংশের বিষয়ে এমন প্রবল ভক্তি ও অন্তদৃষ্টির সঙ্গে বলে চললেন যে, তাঁরা তাঁর বিশাল হৃদয় ও সর্বাত্মক প্রতিভার রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেলেন।"

ইচ্ছা থাকলেও প্রধানতঃ স্বাস্থ্যের কারণে স্বামীজী মনস্থির করতে পারছিলেন না। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন—নতুন একটা দেশে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করতে হলে যে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন তা তাঁর একেবারেই নেই। সেই চিন্তা থেকে অন্যান্য চিন্তা এসে-ছিল। নিবেদিতার একটি খণ্ডিত পত্রে (যার উপরে অন্যের হাতে তারিখ লেখা আছে—২১ এপ্রিল) যদিও স্বামীজীকে রোগমুক্ত এবং দীপ্ত দেখাচ্ছে বলা হয়েছে, কিন্তু সেটা যে স্বাস্থ্যের সত্যকার পুনরুদ্ধার নয়, তা কিছু পরেই দেখা যায়। এই চিঠিতেই জাপান যাওয়ার ব্যাপারে স্বামীজীর দ্বিধার আরও কারণ নিবেদিতা জানিয়েছেন : "কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি নিদেন সারা, জাপানে থাকছ না, এই চিন্তায় তিনি দিশাহারা। তিনি 'তাঁর জাপানীদের' এখনো জানেন না'—আর সেকথা সত্য। যদি তোমাদের দুজনের কেউ সেখানে গৃহস্থালীর ভার নিয়ে থাকতে তাহলে অন্ততঃ একটি বিষয়ে তিনি নিশ্চয়তা বোধ করতেন। সেটা বেশ বুঝতে পারছি। চিকাগোয় যেভাবে গিয়েছিলেন তেমন 'অজানা ভিখারী' এখন আর তিনি নন। বিরাট একটি নাম এবং বিরাট একটি কর্মাদর্শের দায় এখন বহন করছেন—তার মর্যাদা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। আর [জাপানীদের সঙ্গে] পরিচয়ের স্পর্শও গভীর নয়—তুমি যাঁকে এনেছ [ওকাকুরা], তাঁর সঙ্গেও নয়। আর অপরজনের [ওডা] সম্বন্ধে তিনি খোলা-খুলিভাবে বিমূঢ়। একটি জিনিস স্পষ্ট—তাঁকে তপ্ত কড়া থেকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায় না—যা বিদেশী সাহায্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। বুঝতে পারছ?" পত্রটি মিস ম্যাকলাউডকে লেখা।

৭ স্বামী ব্রহ্মানন্দের ২ এপ্রিলের ডায়েরিতে পাই :

"মিঃ ওকাকুরা, জাপানী পুরোহিত মিঃ রেভাঃ ওডাকে সঙ্গে নিয়ে মঠে এসেছেন। দুজনেই এখানে আহার করেছেন। মিঃ ওকাকুরা উত্তরপাড়ায় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলেন—সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসেন।"

৫ মে তারিখে আর একটি উল্লেখ ঐ ডায়েরিতে আছে :

"শরৎ মহারাজ [সারদানন্দ] কলকাতায় নিবেদিতার বাড়িতে গিয়েছিলেন—নিবেদিতা ও ওকা-কুরার সঙ্গে দেখা করতে। ওঁরা আজ আলমোড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।"

কাছাকাছি সময়ের একটি চিঠিতে [২৫ এপ্রিল?] নিবেদিতা লিখেছেন, "আমার একটি ইচ্ছা—তিনি [ওকাকুরা] দেশে ফিরে যান।...সেখানে তিনি স্বামীজীর দোভাষীর কাজ করুন—তাহলে তাঁর [স্বামীজীর] সাফল্য সুনিশ্চিত।"

এর কয়েকদিন আগেই কিন্তু স্বামীজী জাপান যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। মিস ম্যাকলাউডকে ২১ এপ্রিল লিখেছেন : "মনে হচ্ছে, জাপান যাওয়ার সংকল্পটা ফেঁসে গেল। মিসেস বুল চলে গেলেন, তুমিও যাচ্ছ। আমার সঙ্গে জাপানীদের তেমন পরিচয় নেই।"

স্বামীজী যখন পরিষ্কার জানালেন, তিনি জাপান যাচ্ছেন না, তখন থেকে ওকাকুরার সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা শিথিল হয়েছিল; ওকাকুরাও ভিন্নতর কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তদনুযায়ী নানাদিকে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যস্ত। মঠে অবশ্য তাঁর যাতায়াত ছিলই। মার্চ কি এপ্রিল মাসে মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠিতে দেখি, ওকাকুরা নৌকায় মঠে আসবার সময়ে ঝড়ে নৌকা উল্টে হাবুডুবু খেয়েছেন। নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী ১৯ এপ্রিল, ওকাকুরা, ওডা ও হোরি পুনশ্চ বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন। ২৮ এপ্রিল তাঁরা বেলুড়ে ফিরে ছিলেন। ওডা ১ মে জাপানের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন। তারপরে ওকাকুরা নিবেদিতাদির সঙ্গে মায়াবতী যান। এই মায়াবতী গমনের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। ওকাকুরা হঠাৎ সেই স্থান ত্যাগ করেন। স্বামীজী ২৭ মে, ক্রিস্টিনকে কিছুটা সন্দিগ্ধভাবে লেখেন : "তাহলে জায়গাটা মিঃ ওকাকুরার সইল না?—কেন? নিশ্চয় তাঁকে কোনোকিছু উত্ত্যক্ত করেছে, নচেৎ হঠাৎ চলে গেলেন কেন? ওখানকার সৌন্দর্য কি তাঁর পছন্দ হয়নি—যথেষ্ট মহীয়ান ছিলনা তা? নাকি জাপানীরা সুমহান জিনিস পছন্দই করে না—তারা কেবল সুচারু সুন্দরই চায়?...মার্গট কেমন আছে? সেকি এখনো ওখানে? অথবা মিঃ ওকাকুরার সঙ্গে চলে গেছে?" [না, মায়াবতীর সৌন্দর্য ওকাকুরা খুবই পছন্দ করেছিলেন। ১৮ মে জাপানের ফাইন আর্টস একাডেমীর সদস্যদের কাছে লেখেন : "এই স্থানটি নেপাল-সীমান্ত থেকে ৪০ মাইল দূরে এবং হিমালয় থেকে (অর্থাৎ হিমালয়-চূড়া থেকে) ৬০ মাইল দূরে। এখানকার পোস্ট অফিস ভারতের উত্তরতম স্থানে অবস্থিত। প্রতিদিন উঁচুতে উঠে-উঠে এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০০০ ফুট উঁচুতে আছি। জানলার বাইরে দেখা যায় তুষারাবৃত শিখরগুলি, যেন স্বর্গের অর্ধাংশকে শুভ্র যবনিকা ঢেকে রেখেছে। সর্বোচ্চ শিখর নন্দাদেবী, ২৬০০০ ফুট উঁচু। জাপানের কোমাগাটাকের মতো দেখতে, কিন্তু অনেক বৃহৎ ও উচ্চ। বাতাস পরিষ্কার। সকালে ও সন্ধ্যায় শীতঋতু-সূচনার তুল্য শিহরণ বোধ করি। পার্বত্যপথের উপর দিয়ে প্রায়ই হরিণ চলে যায়; চন্দ্রালোকিত রাত্রে শোনা যায় বাঘের ডাক।"]৭

ওকাকুরা ১০ জুন মঠে ফেরেন। কিন্তু তিনি আর মঠে থাকেন নি। ১৪ জুন স্বামীজী মিসেস বুলকে লিখেছেন : "ওকাকুরা শহরে ফিরে এসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুরের অতিথি হয়েছিলেন। একদিন মঠে এসেছিলেন, কিন্তু আমি বাইরে ছিলাম। আশাকরি শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এবং তাঁর ভবিষ্যৎ অভিপ্রায় জানতে পারব।" একই তারিখে ক্রিস্টিনকে লেখা চিঠিতে এই অতিরিক্ত সংবাদ আছে : "ওকাকুরা কলকাতায় আর কয়েক সপ্তাহ থাকবেন, তারপর যাবেন বোম্বাই। তিনি ইচ্ছা করেছেন, [কলকাতা] শহরের কাছাকাছি একটা বাড়ি নিয়ে থাকবেন—যাতে বাঙালীদের রীতিনীতি ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারেন।"

ওকাকুরা কয়েক সপ্তাহ নয়, কয়েক মাস ভারতে থেকে যান। ৬ অক্টোবর ভারত ত্যাগ করে যান জাপানের উদ্দেশ্যে—তার আগে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছেন—সে-প্রসঙ্গ নিবেদিতার পত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

॥ ৪ ॥

স্বাভাবিক কারণেই ওকাকুরার রাজনৈতিক অভিপ্রায় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়নি, কিন্তু তাঁর কিছু কিছু ভ্রমণ কথা এবং জাপানে ধর্মমহাসভা সংগঠনে তাঁর প্রয়াসের কথা কাগজে বেরিয়েছে।

২৪ এপ্রিল, ১৯০২, মাদ্রাজ মেলে খবর দেওয়া হয় : "জাপানী সরকারের প্রত্নত: কমিশনের সদস্য, এবং টোকিও ফাইন আর্ট একাডেমীর ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ ওকাকুরা এখন ভারতভ্রমণ করছেন। তিনি গত বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে বুদ্ধগয়া যাত্রা করেছেন।" ১৯ জুলাই, ১৯০২, 'হিন্দু' কাগজে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় বেরোয় "জাপানে প্রস্তাবিত প্রাচ্য ধর্ম মহাসম্মেলন" সম্বন্ধে। বলা হয়, আগামী অক্টোবর মাসে টোকিওয় এই ধর্মমহাসভা বসছে। তারপর 'হিন্দু'তে পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উৎসাহিত আলোচনা থাকে। সগৌরবে বলা হয়, এশিয়া থেকেই চিরদিন ধর্মের আলো ছড়িয়েছে। স্বতঃই এইসূত্রে চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা স্মরণ করা হয়, যিনি সেখানে আত্ম-সন্তুষ্ট অহংকৃত মিশনারিদের বিজয়বাসনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন, যেজন্য পরবর্তী প্যারিস ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। জাপানের বৈষয়িক উন্নতির প্রসঙ্গ আসে তারপর। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে জাপান অদ্ভুত ঐহিক উন্নতি করেছে, কিন্তু সে তো প্রাচ্যদেশ, তার ধর্ম বৌদ্ধ—তাই সে এখন ঐহিক ও আধ্যাত্মিকের সামঞ্জস্য চাইছে, তদনুযায়ী আয়োজন করেছে ধর্মমহাসভার। 'হিন্দু'র সম্পাদক ভারতীয় ধর্মসংঘগুলির কাছে ঐকান্তিক আবেদন জানিয়েছিলেন এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য, কারণ জাপানীদের কাছে ভারত পরম পুণ্যভূমি। সম্পাদক আরও একটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জাপান এতদিন কেবল বৌদ্ধধর্মকে জেনেছে, এবার সে যেন জানতে পারে, ঐ বৌদ্ধধর্মের উৎস-স্বরূপ বেদান্তধর্মকে। জাপান এই বেদান্তধর্মের নবজয়ক্ষেত্র হবার প্রস্তুত ভূমি। হিন্দুর এই মন্তব্য দেখিয়ে দেয় সমকালে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচারের দ্বারা ভারতবর্ষে কোন্ উচ্চ আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন।৮

---

৮ হিন্দু'র সম্পাদকীয়ের একাংশে আছে :

"It may be, that the Indian Vedanta will find in Japan a new field for illumination and conquest. It is not that we mean that the spirit of Buddhism has not embodied that ethical results of Vedantic thought. What we mean to say is that the Vedanta in its ontological side has still to win for Germany and other parts of the world wherein Buddhism prevails .. The Indian Vedanta may still make Japan know the beauty and rationality of the ontology that is expounded in that system of philosophy, pointing out...that the loveliness of Vedantic ethics is in no way inferior to that of Buddhistic ethics As children, therefore, of the same original paternal religious inspiration, Indian religions are bound to shake hands with Buddhism in Japan, and their friendly meeting in that land, which is in many respects to-day the wonder of the world, cannot also fail to have the stimulating effect upon the modern civilization of India, making her people to realise more largely than they do now the great value of patriotism and public spirit and of self-sacrifice in the cause of the country and religion." [*Hindu*, July 19, 1902, *The Proposed Oriental Religious Congress, Japan*]

১ হিন্দু-সম্পাদক এই রচনায় স্পষ্টই স্বামীজীর চিন্তার প্রতিধ্বনি করেছিলেন।

মাদ্রাজ টাইমসের ১৯ অগস্টের সংবাদে দেখা গেল : "স্বামী বিবেকানন্দ জাপানে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন। এক জাপানী ভদ্রলোকের মারফত তাঁর কাছে সেখানে যাবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল। তিনি কলকাতায় এসে অপেক্ষা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য।"

জাপানের ধর্মমহাসভা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। যদিচ মাদ্রাজ মেলের ২ সেপ্টেম্বরের সংবাদে দেখা যায়, স্যার বালচন্দ্র কৃষ্ণের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত কিয়োটোর ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধি পাঠাবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়, কিন্তু ব্যাপারটির সম্ভাব্যতা নিয়ে সংবাদপত্রে বিতর্কও শুরু হয়ে যায়। টোকিও থেকে বেঙ্গলীর নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেরিত এবং উক্ত কাগজে ২ নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, টোকিওতে ঐ ধরনের আয়োজনের চিহ্নমাত্র নেই :

"দুঃখ ও মানসিক কষ্টের সঙ্গে গত সপ্তাহে বেঙ্গলীতে আমাকে তারবার্তা পাঠাতে হয়েছে—এই শহরে আগামী ১৫ অক্টোবর, ১৯০২, ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই দায়িত্বহীন গুজবকে খণ্ডন ক'রে। ঐ গুজবের উপর নির্ভর করে জাপানে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ওরকম কোনো কিছুই হচ্ছে না। যতদূর বুঝেছি, ঐ পরিকল্পনাটি প্রথম প্রচারিত হয় ইস্টার্ন হোন্‌গন্‌জি-র বৌদ্ধ পুরোহিত রেভারেণ্ড ওডা'র দ্বারা, যখন তিনি গত বসন্তকালে স্বর্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে গিয়েছিলেন। পরলোকগত স্বামীজী তাঁকে এ-ব্যাপারে উৎসাহিত করেন [মোটেই ঠিক নয়], যার ফলে রেভাঃ ওডা চীন ভ্রমণ করে সেখানকার বৌদ্ধ পুরোহিতদের আমন্ত্রণ জানান —১৯০৩ সালে ওসাকা প্রদর্শনীসূত্রে প্রস্তাবিত ধর্মসম্মেলনে। আমরা আশা করছিলাম—স্বামী বিবেকানন্দ টোকিওতে আসবেন, এবং তাঁর সংগঠনী শক্তি ও মোহিনী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রেভাঃ ওডা'র পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করবেন। কিন্তু হায়, নির্মম নিয়তির বিধানে চিকাগো-খ্যাত সুমহান কমলারঙের পোশাকাবৃত সন্ন্যাসী অকালে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর লোকান্তর আমাদের মর্মান্তিক বেজেছে। সমগ্র ভারত জাতীয় জীবনের ঐ মহাক্ষতির জন্য যে-শোকাশ্রুপাত করছে, তাতে একদিকে আমাদের অশ্রুও যেমন মিশেছে, তেমনি অন্যদিকে আমরা প্রাচ্য ধর্ম-কংগ্রেসের সকল আশা ত্যাগ ক'রেছি।"

একই সংবাদে জাপানে বৌদ্ধধর্মসংঘের অবস্থার কথাও জানানো হয়। পশ্চিম হোন্‌গন্‌জি এবং পূর্ব হোন্‌গন্‌জি—এই দুই ভাগে বৌদ্ধরা বিভক্ত। প্রথম সম্প্রদায়ই শক্তিশালী, দ্বিতীয় সম্প্রদায়টি নয়—রেভাঃ ওডা যার পুরোহিত। তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তবে তাঁর পক্ষে ধর্মসম্মেলন ঘটানো সম্ভব নয়। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে ধর্মমহাসভার আয়োজন করে। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা না ক'রে ভারতে সে-বিষয়ে প্রচার করার জন্য জাপানের সংবাদপত্রে রেভাঃ ওডাকে তিরস্কার করা হয়। উল্টোদিকে, রেভাঃ ওডা এবং ওকাকুরা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন—তাঁরা ভারতে ঐ ধরনের কিছু প্রচার করেছেন। জাপানে ধর্মের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করে বেঙ্গলীর লেখক বলেন : "রেভাঃ ওডা যে বেশকিছু বিদেশী প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করে এনে ওসাকা মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে রাখতে পারবেন, এবং সভামঞ্চে আগন্তুকদের বর্ণবিচিত্র পাগড়ি ও কমলারঙের পোশাক বহু দর্শকও আকর্ষণ করবে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু চিকাগোর মানুষ যে-ধরনের ধর্মোন্মাদনা বোধ করেছিল, তার সামান্য অংশও এখানে দেখা যাবে কিনা, সে সন্দেহ নিশ্চয় করা যায়।"

ইণ্ডিয়ান মিরার এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান প্রচারক, (এবং তা বেঙ্গলীর প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র) ; স্বতঃই সে বেঙ্গলীর সংবাদের প্রতিবাদ করেছিল ১০ ডিসেম্বর, ১৯০২ সম্পাদকীয়তে [*The Japanese Religious Conference at Kioto*]। মিরার বলল—

সন্দেহ, গুজব ও বিরোধী প্রচার সত্ত্বেও কিয়োটোয় ধর্মসম্মেলন হচ্ছেই।—"কিয়োটো থেকে মিঃ ওকাকুরা প্রেরিত এই টেলিগ্রামটি সকল সন্দেহের নিরসন করে দেবে : 'কনফারেন্স হচ্ছেই। গুজব অস্বীকার করুন।' কোন্ সূত্রে বিরোধী গুজব ছড়িয়েছিল তা বোঝা শক্ত নয়। . তার উৎস জাপানপ্রবাসী কিছু ভারতীয় ছাত্র। তবে তাদের দোষের স্খালন আছে। স্বামী রামতীর্থ পর্যন্ত তাঁর সাম্প্রতিক জাপান-ভ্রমণের কালে ভ্রান্তভাবে মনে করেছিলেন—এই ধর্মসম্মেলন গালগল্প। এই শ্রদ্ধেয় হিন্দুসন্ন্যাসী জাপানযাত্রার কালে কিয়োটোয় রেভাঃ ওডার উদ্দেশ্যে লেখা একটি পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি প্রথমে টোকিওয় যান এবং খুবই সম্ভব কিয়োটোর সম্মেলনের কথা টোকিওয় প্রচারিত ছিল না। . আমরা এখন নিশ্চিত জেনেছি যে, পরের বৎসর এপ্রিল মাসে কিয়োটোয় সম্মেলন হচ্ছে।"

কোনো সম্মেলনই কিন্তু হয়নি। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ যাননি। ওডা বা ওকাকুরা মনে করেছিলেন, আয়োজনের অসম্পূর্ণতা পূরণ করে দিতে পারবেন একজন—স্বামী বিবেকানন্দ। সেইজন্যই তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা। আর তিনি যখন যেতে পারলেন না, তখন অনিবার্য হয়ে উঠল শিবহীন যজ্ঞের ব্যর্থতা।

॥ ৫ ॥

ওকাকুরা বিবেকানন্দের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। মিস ম্যাকলাউড উভয়ের যোগাযোগে মধ্যস্থতা করেন। মিস ম্যাকলাউড বলেছেন : "ভারতবর্ষই [অর্থাৎ বিবেকানন্দ] সেই চুম্বক যা মিঃ ওকাকুরাকে তাঁর বিজিৎসু-স্থাপনের সাত বৎসরের মগ্নতা থেকে ছিন্ন করে এনেছিল।" কিন্তু ওকাকুরা-গবেষক শ্রীমতী হোরিওকা মনে করেছেন, "যে-চুম্বক ওকাকুরাকে ভারতে আকর্ষণ করেছিল তার নাম জোসেফিন ম্যাকলাউড। তাঁর প্রয়াস ছাড়া ওকাকুরা ভারতে আসতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও ঘটত না। তাঁর প্রয়াস ছাড়া ওকাকুরার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎ হত না এবং 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' প্রকাশিতও হত না।"৯ শ্রীমতী হোরিওকা তাঁর প্রবন্ধে১০ বিবেকানন্দের সঙ্গে ওকাকুরার ধর্মধারণার ঐক্যের দিকটি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। স্বামীজী তাঁর জীবনের শেষ পর্বে মহাযান মতকে হীনযানের তুলনায় প্রাচীনতর বিবেচনা করেছিলেন—তাঁর সেই ধারণা ওকাকুরাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ওকাকুরা স্বয়ং মহাযানী মতের পক্ষপাতী, ভেবেছিলেন, মহাযানী মত খাঁটি বৌদ্ধমত নয় বলে জাপানে একশ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে যে-ধারণা সবল আছে, তার মোকাবিলা করার সুবিধা হবে স্বামীজীর মতের সাহায্য পেলে। স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তিনি পত্রে লিখে পাঠান :

"বিবেকানন্দ মনে করেন, মহাযান মত হীনযানের চেয়ে প্রাচীনতর এবং বৌদ্ধধর্ম এসেছে হিন্দুধর্মের ভিতর থেকেই। তিনি বুদ্ধকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য বলে শ্রদ্ধা জানান।

"আমার মতে, বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ একেবারে মহাযান মত। যদি এই ভারতীয় সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম, যাদের এতাবৎ পৃথক ধর্ম বলে মনে করা হয়েছে—তাদের ঐক্যের কথা প্রচার করেন, [যা তিনি আগে থেকেই প্রচার করে আসছিলেন] তাহলে তাঁর মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হবে ভারতের নতুন কণ্ঠস্বর, বিশেষতঃ জাপানে, যেখানে বর্তমানে প্রচণ্ড তর্কযোগে বলা হচ্ছে—মহাযান-মত বৌদ্ধমত নয়। জাপানের পণ্ডিতগণ মনোযোগ দিয়ে

শুনুন—ভারতের একজন পণ্ডিত-সন্ন্যাসী মনে করেন, মহাযান হীনযানের অপেক্ষা প্রাচীন।"

শ্রীমতী হোরিওকা উভয়ের চিন্তার ঐক্য দেখাতে গিয়ে ওকাকুরার 'আইডিয়ালস্ অব দি ইস্ট' গ্রন্থের অংশ এবং স্বামীজীর রচনার অংশ তুলনামুখে উদ্ধৃত করেছেন। ঐ ঐক্য স্বতঃস্পষ্ট। আমরা কেবল এখানে যোগ করব—ওরূপ ঘটার বিশেষ কারণ হল—নিবেদিতা সরাসরি স্বামীজীর অনেক চিন্তা ঐ বইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। [বইটির উপর নিবেদিতার ব্যাপক হস্তক্ষেপের বিষয়ে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি প্রকাশিতব্য 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের এক খণ্ডে]। এবং ওকাকুরার—"Life lies ever in the return to Self"—এই জীবনদর্শন বিবেকানন্দেরই—যা ওকাকুরা মিস ম্যাকলাউড মারফত পেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ ও ওকাকুরার মিলনের পরে কী ঘটেছিল, মিস ম্যাকলাউড স্মৃতিকথায় তা লিখেছেন :

"আমার জীবনের একটি পরম সুখের ক্ষণ এল যখন বেলুড়ে কয়েকদিন কাটাবার পরে মিঃ ওকাকুরা আমাকে যেন তীব্রভাবে বললেন, 'বিবেকানন্দ আমাদের—তিনি প্রাচ্যদেশীয়—তিনি তোমাদের নন।' শুনে আমি বুঝলাম—এঁদের মধ্যে যথার্থ একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। দু'একদিন পরে স্বামীজী আমাকে বললেন, 'মনে হচ্ছে বহুদিনের হারানো ভাই যেন আবার ফিরে এসেছে।' বুঝলাম—এই দুটি মানুষের মধ্যে যথার্থই বোঝাপড়া হয়েছে।"

কিন্তু উভয়ের ছিল ভিন্ন জগৎ। বিবেকানন্দকে বুঝলেও ওকাকুরা নিজের জগৎ ত্যাগ করতে রাজি হননি। "স্বামীজী যখন তাঁকে বললেন [মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন]—'তুমি কি আমাদের সংগে যোগদান করবে?'—মিঃ ওকাকুরা তখন বলেছিলেন, 'না, এই পৃথিবীর লেনদেন এখনো আমার শেষ হয়নি।' তাঁর এই কথা খুবই প্রাজ্ঞোচিত হয়েছিল।"

রূপের রসের বাসনায় আন্দোলিত ওকাকুরাকে মিস ম্যাকলাউড জানতেন। শ্রীমতী হোরিওকার প্রবন্ধে দেখি, ভারতে আসার আগে কোন্ তীব্র ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা ওকাকুরা সহ্য করছিলেন। ভারতে আসার পরে ঠাকুরবাড়ির এক কন্যার প্রেমেও তিনি পড়েছিলেন। স্বামীজীর কাছেও ক্রমে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় রোমাঁ রোলাঁকে জানান, "বিবেকানন্দ তাঁকে [ওকাকুরাকে] বলেছিলেন, 'এখানে আমার সঙ্গে আপনার কিছুই করণীয় নেই। এখানে তো সর্বস্ব ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি এখনো জীবনের মধ্যে আছেন।' ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে গিয়েছিলেন।"১১

ধর্মের প্রশস্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে তথাপি ওকাকুরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে, তাঁকে ভাই বলে গ্রহণ করতে, বিবেকানন্দের অসুবিধা হয়নি। শিল্পের সঙ্গে ধর্মের আত্যন্তিক ভেদ বিবেকানন্দ স্বীকার করতেন না। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে, তাঁর মহিমায় অভিভূত ওকাকুরা সানন্দ বিস্ময়ে লিখতে পেরেছিলেন—পৃথিবীতে অদ্বিতীয় এই পুরুষ :

"কয়েকদিন হল এসে পৌঁছেছি। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। সমুচ্চ ভাবসম্পন্ন বিরাট পণ্ডিত তিনি। এমন সুমহান মানুষ তিনি যে, সারা পৃথিবীর লোক তাঁকে সম্মান করে।...

"ইংরাজি ভাষায় বিশেষ অধিকার তাঁর আছে; আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে সমুৎ ব্যুৎপন্ন, দারুণ বাগ্মী; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাবসম্মিলন ঘটান; প্রচার করেন অদ্বৈত মত। এমন মানুষ আর কোথাও মিলবে না।"১২

১১ "দিনপঞ্জী", ১৬৭।

১২ টোকিওয় অবস্থানকারী বৌদ্ধ পুরোহিত ওডা টোকুনো-কে ওকাকুরা পত্রটি লেখেন, যার অংশ উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। গোটা পত্রটি ফেব্রুয়ারি ১৯০২ সংখ্যার বৌদ্ধ পত্রিকা 'ডেন্টো'-তে প্রকাশিত হয়।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

মহাসমাধি ও সমাধিমন্দির

॥ ১ ॥

স্বামীজী কখন থেকে প্রথম 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি গাইতে শুরু করেছেন, আমরা তা সঠিক জানিনা। ব্রাহ্মসমাজসূত্রে তিনি গানটি শেখেন, এবং দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম একান্ত সাক্ষাতে (তার আগে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে ঘরোয়া উৎসবে উভয়ের প্রাথমিক পরিচয় হয়ে গেছে) এই গানটি গেয়েছিলেন। "ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া, ধ্যানস্থ হইয়া [নরেন্দ্র] যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না [শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন]—ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।" ঐ গানের মধ্যেই ছিল "সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে?" সংসার-বিদেশে "বিদেশী" এই মানুষটি যথার্থতঃ কে—সেদিন তা শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বুঝে নিয়ে উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তিপূর্ণ ভাষায় নরেন্দ্রের প্রশস্তি করেছিলেন। [নরেন্দ্রের কাছে গোটা ব্যাপারটা অদ্ভুত উদ্ভট বলে মনে হয়েছিল; হতেই পারে, কারণ একটি সদ্যপরিচিত যুবককে কেউ যদি হাতজোড়ে করে বলতে থাকেন "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ; জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ"—তাহলে কোনো সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অন্য কিছু ভাবতে পারে না।]

বিবেকানন্দ জন্মমুহূর্ত থেকেই এই পৃথিবীতে বিদেশী—অন্ততঃ তিনি তাই অনুভব করেছেন—এবং সেই অনুভূতিকে বহন করেছেন জীবনান্ত পর্যন্ত। আবার তাঁর মতো এই পরদেশী পৃথিবীর প্রেমেও অন্য কোনো মানুষ পড়েননি। সেই তাঁর যন্ত্রণা। দুই প্রেমের টানাটানিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সকল গভীর জীবনীকারই এই দুই জীবনের নিরন্তর দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। কবি বিদ্যাপতি একটি গানে এহেন অবস্থার কথা উপমার সাহায্যে প্রকাশ করেছিলেন : "দুহুঁ দিশ দারু দহনে যৈছে দগধই আকুল কীট পরাণ" : কাষ্ঠখন্ড যদি একসঙ্গে দুই প্রান্তে পুড়তে থাকে, তাহলে মধ্যবর্তী কীটের যে-আকুলতা ঘটে সেইপ্রকার, ইত্যাদি। এই উপমাও বোধহয় বিবেকানন্দের জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে পারেনি—কোনো উপমাতেই কি তা পারা সম্ভব?—তাই পুনশ্চ ভাবতে চাই—তিনি যেন সেই বহির্মুখ পতঙ্গ—চরম দাহের উল্লাসে অধীর হবার জন্য যে পাখা মেলতে চাইছে, অথচ তাকে পক্ষচ্ছেদ ক'রে এই আলোকহীন পৃথিবীতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে—অন্যের মধ্যে অনুরূপ বহ্নিতৃষ্ণা জাগাবার জন্য!

আলঙ্কারিকতা থাক। যতিদেহে অলঙ্কার অনুচিত বাহুল্য। উলঙ্গ সত্যকে তিনি পেতে চেয়েছেন, স্বয়ং নগ্ন সত্য হয়ে উঠেছেন। আমরা তাঁর কণ্ঠেই তাঁর জীবনসত্য শুনব। বহু শত পৃষ্ঠা ধরে, তাঁর পৃথিবী নামক বিদেশ-প্রেমের রেখা আঁকার চেষ্টা করেছি, (ব্যর্থ হয়েছি শোচনীয়ভাবে সেই চেষ্টায়), এবার কিছুটা সাফল্য পাবই তাঁর নিজ নিকেতনের বার্তা শ্রবণে কারণ এখানে কথা বলবেন প্রধানতঃ তিনিই। আত্মসাক্ষাৎকারের কিছু অসামান্য সাহিত্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, সূর্যস্খলিত উল্কার অনিঃশেষ সৌরভাষণ সেখানে মিলবে।

সত্যই নরেন্দ্রনাথ বালক নচিকেতার মতো প্রশ্ন করে দ্বারে-দ্বারে ফিরেছিলেন—তোমরা কি জানো অমৃতসত্যের কথা? "আবরণ করো উন্মোচন জ্যোতিষ্মান, অন্ধ আঁখি জ্বলিতেছে

দৃষ্টিপিপাসায়।" রামকৃষ্ণরূপী মহামৃত্যু তাঁকে সেই সত্য সহসা-স্পর্শে যখন দান করলেন, তখন বালক সে সময়ের মতো সব হারানোর শূন্যতায় হাহাকার করে বলেছিল—"ওগো তুমি এ আমার কী করলে—আমার যে বাবা মা আছে!" সেই মুহূর্তে ধরা পড়ে গেল গোটা বিবেকানন্দের আকার : আমি জানতে চাই মৃত্যুসত্য, কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখেছে পৃথিবীর জীবন-সত্য। এই দুই সত্যের টানাপোড়েনের খেলা নিয়েই বিবেকানন্দের পার্থিব জীবন।

স্বামীজীর পত্রাবলী ওল্টালে দেখব—প্রথম থেকেই কর্মোদ্দীপনার সঙ্গে বৈরাগ্যভাবনার মিশ্রণ। ১৮৯৩ সালের শেষ থেকে ১৮৯৪ সালের বেশ কিছু অংশ পর্যন্ত দেখি—তিনি কর্মোদ্দীপনার কাছে বৈরাগ্যভাবনাকে স্তিমিত হতে দিয়েছেন, কারণ ঐকালে সর্বসমক্ষে নায়করূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি সংগঠন কার্যের সূচনা করেছেন। কিন্তু কণ্ঠ পর্যন্ত যাঁর 'কালী', তিনি কতদিন আর 'সুখ-বনমালী'র কুঞ্জ নির্মাণ করবেন? ১৮৯৪ সালের শেষ দিক থেকে আবার 'সন্ন্যাসীর গীতি' তাঁর কণ্ঠে ভরাট হয়ে বাজতে লাগল, পাশ্চাত্ত্যের শিষ্য ও বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠিতে তার বিশেষ পরিচয় পাই, যদিও ভারতীয়দের কাছে লেখা পত্রে কাজের ডাক চড়া সুরে বাঁধা রইল। সেই কর্তব্যকর্মের নির্ঘোষ তিনি ধ্বনিত করে বেড়ালেন ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে—কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয়।

প্রয়োজনের সেই বহিরঙ্গ ভূমিকা। অন্তরঙ্গরূপে তিনি বলছেন ভিন্ন কথা। অনেক আগেই, ১৫ মার্চ, ১৮৯৪, ডেট্রইট থেকে লিখেছেন : "আমি বাস্তবিকই 'ঝঞ্ঝাসদৃশ' নই, বরং ঠিক তার বিপরীত। আমার যা কাম্য তা এখানে লভ্য নয়, আর এই ঝঞ্ঝাবর্তময় আব-হাওয়াও আমি সহ্য করতে পারছি না।" [৬-৪০৫]। "হায়, যদি কয়েক বৎসরের জন্য নির্বাক হতে পারতাম।...বস্তুত এইসকল পার্থিব স্পন্দের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করিনি। আমি স্বভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ ও কর্মবিমুখ। আদর্শবাদী হয়ে জন্মেছি, স্বপ্নরাজ্যেই বাস করতে চাই। জাগতিক বিষয় আমাকে উত্ত্যক্ত করে তোলে এবং আমার দুঃখের কারণ হয়।" মে ১৮৯৪ : "আমি কোনোদিন 'মিশনারি' ছিলাম না, হবও না। আমার স্বস্থান হিমালয়ে। পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে পরিতৃপ্ত অন্তরে এইকথা আজ আমি বলতে পারি, 'হে প্রভু, আমার ভ্রাতৃগণের ভয়ঙ্কর যাতনা আমি দেখেছি; যন্ত্রণামুক্তির পথ আমি খুঁজেছি এবং পেয়েছি; প্রতিকারের আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু।'" [৬-৪২৫]। ১৮৯৫ সালের ২৪ জানুয়ারি, যখন বিশ্বমঞ্চে পূর্ণ প্রকাশিত—তখনই লিখেছেন : "বক্তৃতা এবং অধ্যাপনাতে বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে।...একটি লেখবার খাতা আমার কাছে আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে এতে লেখা রয়েছে—'এবার একটা একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে।' কিন্তু তাহলে কি হয়, এইসব কর্মভোগ বাকি ছিল। . দুনিয়া তার ভালো-মন্দ নিয়ে নানা আকারে চলতে থাকবে, ভালো-মন্দের নামভেদ ও স্থানভেদ হবে, এই মাত্র। আমার হৃদয় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও বিশ্রামের জন্য তৃষিত। 'একাকী বিচরণ করো! একাকী বিচরণ করো! যিনি একাকী অবস্থান করেন, কাহারও সহিত কদাচ তাঁহার বিরোধ হইতে পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না—অপরেও তাঁহার উদ্বেগের হেতু হন না।' সেই কৌপীন, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন ভোজন—হায়, এরাই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়!" [৭-৮০-৮১]।

কিন্তু বিবেকানন্দের নিয়তি—জনারণ্যে তাঁকে বিচরণ করতে হয়েছে, আর যখন তাঁর নির্মম মুক্ত মুখ প্রব্যথিত করেছে অন্যকে, তখন বলা হয়েছে, সংহর! সংহর! ঢাকো মুখ, পরো মুখোশ। সেই ছলনার আহ্বানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সত্যের বিরল এক আত্মকথা এই :

"মধুরভাষী হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতকটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি ঐরূপ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যেখানে উহাতে অন্তরস্থ

সত্যের সঙ্গে উৎকট-রকম আপস করিতে হয়, সেখানে আমি পিছাইয়া আসি।...সাধারণ মানুষের কর্তব্য তাহার 'ঈশ্বর'-স্বরূপ সমাজের আদেশসকল পালন করা; জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না।...সমাজের সঙ্গে যে ব্যক্তি নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলেন, তাঁহার পথ কুসুমাবৃত, আর যিনি তাহা করেন না তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকগণ নিমেষেই বিনাশপ্রাপ্ত হন, আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী। আমি সত্যকে একটা অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ক্ষয়কারী পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। উহা যেখানে পড়ে সেখানেই ক্ষয় করিতে-করিতে নিজের পথ করিয়া লয়।.. ভগিনি, আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টমুখে আপস করতে পারি না, তার জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি পারি না। আমি সারা জীবন তার জন্য ভুগিয়াছি, কিন্তু উহা করিতে পারি নাই। পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পারি নাই। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হইতে দিবেন না।. .যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধন নশ্বর, নাম ও যশ নশ্বর, এমন-কি পর্বতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়; বন্ধুত্ব ও প্রেম শূন্যে হারাইয়া যায়; একমাত্র সত্যই বিরাজ করে। হে সত্যরূপী ঈশ্বর! তুমিই আমার একমাত্র পথপ্রদর্শক হও।...'হে সন্ন্যাসিন্, তুমি নির্ভয়ে দোকানদারী ত্যাগ করিয়া, শত্রু-মিত্র ভেদ না রাখিয়া, সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকো।'...আমার ধনের কামনা, যশের কামনা, ভোগের কামনা নাই। ভগিনি, এ-সকলই আমার নিকট ধূলিতুল্য তুচ্ছ।.. হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বলিয়াছ—যাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও '. .জীবন কিছুই নহে, মৃত্যু ভ্রম মাত্র।.. হৃদয় ভয় পাইও না।...ভগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে, আমাকে শীঘ্র গৃহে ফিরিতে হইবে। আমার আদব-কায়দা পরিপাটি করিবার সময় নাই। আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহাই বলিবার সময় করিতে পারিতেছি না। তুমি সৎস্বভাব এবং দয়াবতী, আমি তোমার জন্য সব করিব; কিন্তু রাগ করিও না, আমি তোমাদের সকলকে শিশু দেখি।...আমার স্বদেশবাসীগণ এবং বিদেশীয়-গণ, সকলেই নির্বোধ। এই নির্বোধ জগৎ আমাকে যাহা-যাহা করিতে বলিতেছে, তাহা করিতে গেলে আমাকে নিম্নস্তরের জীববিশেষে পরিণত হইতে হইবে। তদপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। মিসেস বুল ভাবেন, আমার কোনো কার্য আছে। তুমিও যদি সেইরূপ ভাবিয়া থাকো, তাহা হইলে ভুল, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য কোনো জগতে আমার কোনোই কার্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, উহা আমি নিজের ভাবে বলিব।. .কী, যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব? ভগিনি, দুঃখিত হইও না—কিন্তু তোমরা শিশুমাত্র;. তোমরা এখনো সেই উৎসের সন্ধান পাও নাই, যাহা 'হেতুগর্ভকে প্রলাপে পরিণত করে মর্ত্যকে অমর করে, জগৎকে শূন্যে পরিণত করে, এবং মানুষকে দেবতা করিয়া দেয়।' শক্তি থাকে তো লোকে যাহাকে 'জগৎ' নামে অভিহিত করে, সেই মূর্খতার পাশসমূহ হইতে বাহির হইয়া আইস। আর যদি, যাহারা এই আভিজাত্য নামক ঝুটা ঈশ্বরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, তাহার উদ্দণ্ড কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহস করে, তাহাদের উৎসাহ দিতে না পারো—অন্ততঃ চুপচাপ থাকো, কিন্তু আপস ও মনস্তুষ্টি করার মতো মেকি অসার জিনিসের দ্বারা তাহাদিগকে পুনরায় পঙ্কমগ্ন করিতে চেষ্টা করিও না।

"আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি—এই স্বপ্নকে—উৎকট দুঃস্বপ্নকে—তাহার গির্জা ও প্রবঞ্চনাসমূহকে, তাহার শাস্ত্র ও বদমাইশিগুলাকে, তাহার মিষ্টমুখ ও কপট হৃদয়কে, তাহার ধর্মধ্বজিতার আস্ফালন ও অন্তঃসারশূন্যতাকে, সর্বোপরি তাহার ধর্মের নামে দোকানদারীকে : কী! সংসারের ক্রীতদাসসমূহ কি বলিতেছে তদ্দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করিব! ছিঃ ভগিনি, তুমি সন্ন্যাসীকে চেনো না।" [৭—৮২-৮৫]।

১৮৯৭ সালে, ভারতবর্ষে বিবেকানন্দ যখন গৌরবের শিখরাসীন, তখনই তিনি নিজের

মৃত্যুঘণ্টা নিনাদিত করেছিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যে চোট লেগেছিল, তাই মৃত্যুভাবনা জেগেছিল, একথা পুরো সত্য হতে পারে না, বিবেকানন্দের অনেক বিচিত্র ভবিষ্যৎবাণীর মতো এখানেও দুর্জ্ঞেয় কোনো উৎস-কণ্ঠ ছিলই। মেরী হেলকে ২ মার্চ, ১৮৯৮ লিখলেন: "আমার জন্য উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই, কারণ রোগটা বড় জোর দু'তিন বৎসর আমাকে টেনে নিয়ে যাবে।...আমার কোনো খেদ নেই। কেবল কাজটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি।...আর মৃত্যুকে আমি জয় করেছি বহুদিন আগে যখন জীবনকে ছেড়েছি।" [৮-৩২]। ৯ জুলাই, ১৮৯৭, মেরী হেলকে লিখেছিলেন, "আমার সময় অল্প; যা বলার আছে, না ঢেকে বলে যেতে হবে; ওতে কেউ বিরক্ত বা আহত হবে, ভাবলে চলবে না।" ঐ চিঠিতে আরও পরিষ্কারভাবে বললেন, "বড় জোর, তিন-চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে।" সুতরাং "লোকে কি বলে না বলে, তাতে কি এসে যায়। ওরা তো সব শিশুমাত্র।...কি! যে আমি পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তুর অসারত্ব উপলব্ধি করেছি—সেই আমি বালকের বকবকানিতে নিজ পথ থেকে বিচ্যুত হব!—আমাকে দেখে তাই মনে হয় বুঝি?" [৭—৩৬৪-৬৫]।

১৮৯৭, ১১ অগস্ট তিনি আর্যসমাজের ভূতপূর্ব প্রচারক অচ্যুতানন্দকে বলেছিলেন "আমি আর পাঁচ-ছয় বৎসর জীবিত থাকব।" ['ভারতে বিবেকানন্দ', ৪৪৪]। পরবৎসর লাহোরে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে একই কথা বলেন। "কলকাতা ফেরার পথে তিনি লাহোরে কয়েকদিনের জন্য আমার অতিথি হয়েছিলেন [নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন]; এই সময়ে নিজের অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর মনে পূর্বছায়াপাত হয়েছিল। একেবারে স্বচ্ছন্দ অবিচলিত কণ্ঠে বলে গেলেন, 'আমি আর তিন বছর বাঁচব। এখন চিন্তা, এই সময়ের মধ্যে আমার ভাবগুলিকে কার্যে পরিণত করতে পারব কি না!' তিনি ঠিক তিন বছর পরেই কার্যতঃ দেহত্যাগ করেন।" [রেমিনিসেনসেস, ২০]। ১৯০১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় বলেন—আর মাত্র এক বছর আছি।

॥ ২ ॥

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে স্বামীজীর পক্ষে নিজ মৃত্যুর সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করা অদ্ভুত কিছু ব্যাপার ছিল না, কারণ তার অল্প আগেই অমরনাথের ঘটনা ঘটে গেছে। অমরনাথের ঘটনার অল্প আগে, ২১ জুলাই, ১৮৯৮, কাশ্মীরে বিতস্তাতীরে, স্বামীজী দু'টুকরো পাথর হাতে তুলে নিয়ে, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা প্রভৃতিকে বলেছিলেন "সুস্থ অবস্থায় আমার মন এটা-ওটা নিয়ে থাকতে পারে, ইচ্ছাশক্তিকে অপেক্ষাকৃত নমনীয়ও মনে হতে পারে, কিন্তু যেমনই এতটুকু যন্ত্রণা না পীড়ার ছোঁয়া লাগে, কিংবা ক্ষণেকের জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হই, অমনি—(হাতের পাথর দুটি সজোরে ঠুকে)—এইরকম কঠিন হয়ে যাই, কারণ আমি ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করেছি।" ['হিমালয়ে', ১০৫-৬]।

এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজীর অমরনাথ যাত্রা অমরনাথে পৌঁছে কী হয়েছিল, নিবেদিতার কথাতে শোনা যেতে পারে :

"...স্বামীজী গুহায় প্রবেশ করলেন। উদ্ভাসিত মুখে অর্ধবৃত্তাকার স্থানটির একপ্রান্তে প্রথমে, পরে অন্তপ্রান্তে, তিনি নতজানু হলেন। স্থানটি বিশাল—এমন যে, ভিতরে বৃহৎ গির্জা ধরে যেতে পারে। তার মধ্যে বিশাল তুষার-শিব এক গহ্বরের সঘন ছায়ায় অবস্থিত—যেন নিজ সিংহাসনে আসীন। কয়েক মিনিট—তারপরেই গুহাত্যাগ করবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

"স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত তাঁর কাছে। মহাদেবের পাদস্পর্শ করেছেন। অসীম চেষ্টায় তাঁকে আত্মসংবরণ করতে হয়েছিল—পাছে ভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়েন।...শরীরের শ্রান্তি এমন

অবস্থায় গিয়েছিল যে, হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যেতে পারত।...তা না হয়ে হৃদ্‌যন্ত্র চিরদিনের জন্য আকারে বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর গুরুর কথাগুলি প্রায় ফলে যাচ্ছিল : 'ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, আর দেহ রাখবে না।'

"পরে তিনি প্রায়ই বিহ্বলকর দর্শনের কথা বলতেন, যা তাঁকে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে মনে হয়েছিল।...সর্বদা বলতেন, অমরনাথ কৃপা করে তাঁকে বর দিয়েছেন-স্বেচ্ছায় না হলে তাঁর মৃত্যু নেই।" ['নিবেদিতা লোকমাতা', ৩৭-৩৮]।

অমরনাথে শিবদর্শনের পরে ক্ষীরভবানীতে শক্তিদর্শন। শুভ্র সমাধির পরে করাল মৃত্যু। এই দুই ভাবের যুগ্মলীলার অনেক কথা 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে বলেছি। সে যাইহোক, এর অল্পদিনের মধ্যে, ২৭ অগস্ট, ১৮৯৮, স্বামীজী সিস্টার ক্রিস্টিনকে এমন একটি পত্র লিখেছেন, যা কম্পমান যবনিকার ভিতরে দৃষ্টিপাত করার দুর্লভ সুযোগ আমাদের দিয়েছে। অমরনাথের পরে স্বামীজী যে সত্যই এই জীবনের স্তর ভেঙে চিরজীবনের মধ্যে অবাধ পদক্ষেপ করার অনুমতি পেয়েছিলেন; তার আভাস ঐ পত্রে আছে। কাশ্মীরের কল্পনাতীত সৌন্দর্যের মধ্যে কিভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন, তা বলেছিলেন--সেখানে 'সমস্ত কিছুর বহিরঙ্গ দিকটিতে অন্ততঃ ভগবানের সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত," 'রিপ ভ্যান উইংকল্ এর ছাঁচে ঢালা তন্দ্রাচ্ছন্ন জীবন"—সেখানে অবস্থিত থেকে তিনি কর্তব্য-ভেজেন অসাদের কথা না মনে পারেন নি, কারণ "আমরা জগতের কাজে অংশগ্রহণ করি বা না-করি, জগৎ নিজের ভাবে চলে যাবেই। মোহের ঘোরে আমরা নিজেদের ধ্বংস করে ফেলি মাত্র।...নিজেদের নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে অপরকে স্বার্থপর করে তোলার কোনো অধিকার আমাদের নেই।" এমনই অবিচলিত আত্ম-বিস্তার ও আত্মদর্শনের কালে যেসব ভাবনা তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল, তাদের কথা লেখেন :

"গত তিন বছর অন্য সমস্ত কিছুর চেয়ে মানবস্মৃতিই ভিতর থেকে জাগছে। এই কি নিয়তি[১] কিংবা এ হল অতীতের গভীর-প্রোথিত স্মৃতি, যাকে নতুন শরীর পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলতে পারে না? জীবনে এখন ভাটার টান, সময় বহমান, শরীরের প্রতি অণুপরমাণুতে পরিবর্তন, আর মুখের পর মুখ ভিড় করে আসছে, চলে যাচ্ছে, যেমন স্বপ্নে হয়। তবু সেই ভিড়ের মধ্যে কোনো-কোনো মুখ এমন ধাক্কা দিয়ে গেঁথে যায়, যা জাগিয়ে তোলে গতস্মৃতি। ওলটপালট হয়ে যায় সমস্তই, জীবনের ধাও-ধাও তরঙ্গ নতুন দিকে উল্টোস্রোতে বইতে থাকে—যতই কেন দৃঢ় মনে তাদের প্রতিরোধ করতে চাওয়া হোক। আর তখন, জানোই তো, দাঁড় টানার কঠিন শ্রমের পরে, দাঁড়ে হাত রেখে চুপ করে বিশ্রাম করাই ভালো। মনকে নিজের গতিতে চলতে দিয়ে মজা দেখার কত মজা। যাক না সে পাগলা বেগে ছুটে! আমি বাধা দিই না। অনন্ত কাল ধরে বুদ্‌বুদ্ তৈরী করার কাজ সে করছে। আরও কিছুকাল করুক না! আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি আমাকে বলেছেন, আমাকে আর একবার এই পৃথিবীতে আসতে হবে। তাই হোক! আর, প্রতি কাজেরই তো কারণ থাকবে টান করে বাঁধা ধনুকের ছিলাকে মুক্ত হতে হলে কারো স্পর্শেই তো তা ঘটবে! আয়না নিজের আকার দেখার ভাগ্য করেনি—এ জন্মে ঠিক তাই ঘটছে। ঐ আয়নায় কোনো-কোনো মুখের প্রতিফলন ঘটবে—ঘটুক। কোনো একটি ক্ষুদ্র পদপাতের ভ্রান্তি নতুন এক শরীরে পৃথিবী-ভ্রমণের ছুতো হয়—হোক। এই হল আমার বর্তমান ভাবনার আকার। আমি বিকাশের রূপ দেখে যাচ্ছি।" [প্রবুদ্ধ ভারত, 'স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্রাবলী', সেপ্টেম্বর,

১ মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন : "একবার স্বামীজী বললেন, এই শরীর আর সারবে না। একে ছেড়ে দিয়ে নতুন শরীর নিতে হবে কাজ সাঙ্গ করার জন্য।" ['রেমিনিসেনসেস', ৩৬৬]

খেতড়ির মহারাজাকে লেখা নভেম্বর (?) ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে লিখলেন, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে। ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে জীবনতরী বয়ে চলেছে। তার থেকে এই মহৎ শিক্ষা লাভ করেছি—জীবন দুঃখময়, দুঃখ বই আর কিছু নেই।" [৮-৫০]। এই বছরই ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৮ তারিখে লিখলেন : "আমার থেকে সর্বদিকে নিজেকে কর্ম-বন্ধনে আর কোনো মানুষ জড়ায় নি, আবার আমার থেকে অন্য কেউ তার থেকে মুক্ত হবার চেষ্টাও করেনি। আমাকে পথ দেখায় কে—তোমার কী মনে হয়—মস্তিষ্ক, না হৃদয়? মা-ই পথপ্রদর্শক। যা ঘটেছে, ঘটছে, ঘটবে—সবই তাঁর বিধানে।"

সুতরাং বিবেকানন্দ কাজ করে গেলেন, কারণ "সবই মায়ের কাজ।" জাতির বাস্তব প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ও প্রখর বুদ্ধি সমভাবে সক্রিয় রইল, কর্মের নির্দেশ কর্মীর দল যথারীতি পেতে লাগলেন—কিন্তু বিবেকানন্দের ভূমিকা এখন কেবল যন্ত্রের যন্ত্রীর অভিমানটুকু বিসর্জিত।

ভারতীয় কাজ সম্বন্ধে যদি এই তাঁর মনোভাব হয়, তাহলে পাশ্চাত্যের কাজ সম্বন্ধে মনোভাবের রূপ সহজেই বোধগম্য। ভারতের ক্ষেত্রে তাঁকে অন্ন ও আত্মা, দুইই দেবার কথা ভাবতে হয়েছে, পাশ্চাত্যে আত্মার বাণী দেওয়াই কেবল দায়িত্ব। সুতরাং যখন ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি দ্বিতীয় ও শেষবারের জন্য পাশ্চাত্যযাত্রা করেছেন, তখন বৈরাগ্যের ধূসরতা মনকে ছেয়ে আছে, যদিও তৃতীয় নয়নের আলোকবিচ্ছুরণ দেখে কখনো-কখনো মনে হয়েছে—সে বুঝি পৃথিবীরই পাদপ্রদীপ! ইতিমধ্যেই অমরনাথে তিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছেন। বিবেকানন্দ সেই মানুষ যিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর পেলে মৃত্যু-ইচ্ছাই করেন। অবশ্য তাঁর কাছে জীবনমৃত্যুর ভেদরেখা কোনোদিনই গভীর নয়, জানতেন, মৃত্যুতে আছে মুক্তি—জীবনের কারাগার থেকে। কিন্তু 'পরাধীন' জীবনের প্রেমে দেহের কারাবাসের শাস্তি একদিন যে স্বীকার করেছিলেন—যে-উদ্দেশ্যে করেছিলেন, এখন দেখলেন, সেই একই উদ্দেশ্য তাঁর দেহের লয় দাবি করছে। এই পর্যায়ে আমেরিকায় পৌঁছেই স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে তাঁর এই স্মরণীয় কথাবার্তা হয় :

"একদিন স্বামী অভেদানন্দকে স্বামীজী বললেন, 'ভাই, আমার দিনশেষ হয়ে আসছে · বড় জোর তিন-চার বছর আছি।' তাতে গুরুভাই বললেন, 'এরকম বলো না তুমি। তোমার শরীর দ্রুত সেরে যাচ্ছে। এখানে কিছুদিন থাকলে তা পুরো সেরে যাবে; আবার আগের শক্তিসামর্থ্য ফিরে পাবে। তাছাড়া তোমার অনেককিছু করার আছে। এই তো সবে শুরু।' স্বামীজী তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর দিলেন, 'ভাই, আমার কথাটা বুঝলে না। আমার মনে হচ্ছে ক্রমেই আমি বিরাট হয়ে যাচ্ছি। এমনই তার বিস্তার যে, মনে হয় এই শরীর আর তাকে ধরে রাখতে পারবে না। আমি এখন ফেটে পড়ার মুখে। রক্তমাংসের খাঁচা আর আমাকে কোনো মতে আটকে রাখতে পারবে না।" [ইংরাজি জীবনী (একখণ্ডে), ৬৬২-৬৩]।

এই সুগভীর হেতুর অনুরূপ আকারের না হলেও, আর একটি কারণে তাঁর দেহত্যাগের প্রয়োজন হয়েছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন। মহাসমাধির কয়েকমাস আগে মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে কথাবার্তায় পাই :

"বেলুড়-মঠে একদিন, যখন সিস্টার নিবেদিতা শরীরচর্চার পুরস্কার বিতরণ করছিলেন আমি মঠে স্বামীজীর শয়নঘরে দাঁড়িয়ে, জানলা থেকে তা দেখছিলাম [মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন]—স্বামীজী বললেন, 'আমি মোটেই চল্লিশ দেখব না।' তাঁর বয়স ৩৯ চলছে জানতাম। বললাম, 'কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধ তাঁর বড় কাজ চল্লিশ থেকে আশির মধ্যেই তো করেছেন।' স্বামীজী বললেন, 'আমি আমার বাণী দিয়েছি, এবার যাব।' 'কেন যাবেন?'—জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'বড় গাছের ছায়া ছোট গাছকে বাড়তে দেয় না। অপরকে জায়গা করে দেবার জন্য আমাকে বিদায় নিতে হবে।'" [রেমিনিসেনসেস, ২৫০-৫১]।

১৮৯৯, ১৪ জুলাই স্বামীজী স্টার্ডিকে লিখেছেন : "আমার আয়ু ফুরিয়ে এল।" সেপ্টেম্বর মাসে করুণ-মধুর পরিহাস মিশিয়ে মেরী হেলকে লিখেছেন : "সুদীর্ঘকাল তুমি আমাকে চিঠি লেখোনি, সুতরাং এ-চিঠি তোমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু দেখছ, আমি কত ভাল-মানুষ, কারও সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না—বিশেষতঃ মৃত্যু যখন দ্বারে।" অল্প আগে, অগস্ট মাসে, মেরী হেলবয়েস্টারকে লেখা এক চিঠিতে ফুটল গভীর জীবনসত্য :

"আমি একান্তভাবে চাই, কোনো দুঃখ যেন কাউকে স্পর্শ না করে। কিন্তু একথাও সত্য, একমাত্র দুঃখই আমাদের জীবনের গভীরে দৃষ্টিপাত করার শক্তি দেয়—তাই নয় কি? আমাদের যাতনার ক্ষণে চিরদিনের বন্ধদুয়ার খুলে যায় আর সেখানে প্রবেশ করে আলোর বন্যা।

"বয়স বাড়ে আর আমরা শিখি। হায়, লব্ধ জ্ঞান আমরা এ-জগতে কাজে লাগাতে পারি না। যে-মুহূর্তে মনে হয় কিছু শিখেছি, তখনি রঙ্গমঞ্চ থেকে দ্রুত বিদায় নিতে হয়। তাই হল মায়া।

"এই খেলার জগৎ থাকত না, খেলাও চলত না, যদি আমরা খেলুড়েদের চিনে ফেলতাম। চোখ বেঁধে আমাদের খেলা। খেলায় কেউ আমরা বদমাশের ভূমিকা নিই, কেউ বীরের, কিন্তু সবই খেলা। সান্ত্বনা ঐখানেই। মঞ্চে দৈত্যদানা, বাঘ-সিংহ, কি নেই, কিন্তু সবারই মুখে জাল বাঁধা; তারা চেঁচায় কিন্তু কামড়াতে পারে না। জগৎ আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যদি চাও, ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত শরীর নিয়েও তুমি মনে গভীরতম শান্তি পেতে পারো। আর তা পাবার উপায়—আশা ত্যাগ করা। ওটা কোনো ক্লীবের নৈরাশ্য নয়—ও হল বিজয়ীর বিজিত বস্তুর প্রতি ঘৃণা, যাকে সে সংগ্রাম করে অর্জন করেছে, তারপর তাকে অযোগ্য বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।" [৮-৬০-৬১]।

স্বামীজী প্রায় একই ধরনের কথা লিখলেন সিস্টার ক্রিস্টিনকে, ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯। ১ নভেম্বর এঁকেই লিখলেন : "জীবন অনন্ত নয়, তার জন্য গভীর কৃতজ্ঞ। পৃথিবীতে যারা সর্বোচ্চ আর শ্রেষ্ঠ সাহসী, যাতনাই তাদের বিধিলিপি। কাউকে না কাউকে এ-জগতে দুঃখভোগ করতেই হবে; আমি খুশি যে, প্রকৃতির কাছে বলিপ্রদত্তদের একজন আমি।" [৮-৭৪]। ১৫ নভেম্বর এঁকেই লিখলেন : "আমার মতো স্নায়ুপ্রধান ধাতের শরীর কখনো বা মহাসঙ্গীত-সৃষ্টির যন্ত্র হয়, কখনো-বা অন্ধকারে কেঁদে মরে।" [৮-৭৪]। একই দিনে মিসেস বুলকে লেখা চিঠিতে হারানো নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য মর্মান্তিক আকুলতা : "ভারতে লেখা আপনার চিঠিপত্রে পরোক্ষভাবেও যেন আমার সম্বন্ধে কোনো সংবাদ না থাকে—এইটি শুধু চাই।..কিছু সময়ের জন্য, অথবা চিরদিনের জন্য গা-ঢাকা দিতে চাই। অভিশপ্ত হোক আমার প্রসিদ্ধির দিনটি।" [৮-৭৫]

অল্পদিনের মধ্যে, ৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, নিবেদিতাকে লেখা চিঠিতে আত্মউন্মোচন :

"কারো-কারো প্রকৃতিই এমন যে, তারা দুঃখ পেতেই ভালবাসে। যদি আমি নিজের দেশবাসীর জন্য বুক ভেঙে কাজ না করতাম—অন্যের জন্য তা করতে হত, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।...আমরা সবাই সুখের পিছনে ছুটছি, সত্য, কিন্তু কেউ-কেউ থাকে দুঃখ পেয়ে সুখী হয়—বিচিত্র, নয় কি! এতে ক্ষতি নেই, তবে সুখ ও দুঃখ, দুই-ই সংক্রামক। ইঙ্গারসোল একবার আমাকে বলেছিলেন, যদি তিনি ঈশ্বর হতেন তাহলে ব্যাধির বদলে স্বাস্থ্যকে সংক্রামক করতেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি—স্বাস্থ্য ব্যাধির চেয়ে বেশি যদি না হয়, ব্যাধির তুল্যই সংক্রামক।" [৮—৮৩-৮৪]

একই চিঠিতে বিদ্রূপ করেছিলেন, লোককল্যাণব্রতী মানুষদের আত্মাভিমানের বিরুদ্ধে :

"প্রফেটরা যখনি মানুষের অবস্থা দেখে দুঃখিত হন, তখনি তাঁদের মুখ ঝুলে পড়ে, বুক চাপড়াতে থাকেন, সকলকে ডেকে বলেন, তেঁতুল খাও, কয়লা চিবোও, গায়ে ছাই মেখে গোবরের গাদায় বসে থাকো আর গোঙানি ও চোখের পানিতে মাখামাখি কথা বলো।..

যদি তুমি জগতের বোঝা বইতে চাও, তা বও, কিন্তু দোহাই, তোমার গোঙানি আর শাপ-শাপান্ত যেন শুনতে না হয়। তোমার জ্বালার চোটে আমাদের ভড়কে দিও না; এমন না মনে হয়, তোমার কাছে না এসে নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়েই ভালো ছিলাম। যে-মানুষ সত্যসত্যই জগতের দায় ঘাড়ে নেয়, সে জগৎকে আশীর্বাদ করতে-করতে নিজের পথে চলে যায়। তার মুখে নিন্দা সমালোচনার শব্দমাত্র থাকে না। তার মানে নয় জগতে মন্দ নেই, তার মানে তিনি নিজের কাঁধে সব তুলে নিয়েছেন।"

একই সত্যের নানা দিক থাকে। নিবেদিতাকে উপরের চিঠিতে স্বামীজী লিখলেন, জগতের দুঃখের ভার বইবার ক্ষেত্রে অভিযোগ করা চলবে না—সেই তিনিই কয়েকদিন পরে (১২ ডিসেম্বর) মিসেস বুলের কাছে চিঠিতে প্রায় উল্টোকথাই লিখলেন—পৃথিবীর জন্য ভালবাসায় কোন্ অসহ্য কষ্ট পেতে হয়েছে। বক্তব্যে এমন পার্থক্য ঘটার কারণ—নিবেদিতাকে তিনি জগতের কর্মক্ষেত্রে উৎসর্গ করেছিলেন, তাই নিবেদিতার কাছে তিনি নিজের চরিত্রের সেই দিকগুলি তুলে ধরেন, যেখানে আছে বজ্রদৃঢ় সহন, আর মিসেস বুল তাঁর 'ধীরা মাতা'—তাঁর কাছে খুলে ধরলেন সন্তানের যুদ্ধক্ষত রক্তাক্ত হৃদয় :

"দৈবের সহায়তা সত্যই হয়ত পেয়েছি, কিন্তু উঃ, তার প্রতিটি বিন্দুর জন্য কি পরিমাণে না রক্তমোক্ষণ করতে হয়েছে!.. তবে আমি নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে-করতে প্রাণ দিতে হবে হাল ছাড়া চলবে না। . আমার জীবনের ভুলভ্রান্তিগুলো খুব বড় বটে, কিন্তু তার প্রত্যেকটির কারণ অত্যধিক ভালবাসা। এখন ভালবাসার উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। হায়, যদি তা কিছুমাত্র না থাকত ! ভক্তির কথা বলছেন! হায়, যদি নির্বিকার ও কঠোর বৈদান্তিক হতে পারতাম! শান্তির পিয়াসী আমি, কিন্তু ভক্তির আলয় হৃদয় আমার—তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে সংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম।" [৮—৮৫-৮৬]।

"কাজ করতে চাই না, চাই নীরবতা আর বিশ্রাম। কিন্তু কর্মফল বা বিধিলিপি আমাকে ঠেলে দিচ্ছে—কাজ! কাজ! যেন গরুর পাল আমরা, কসাইখানার দিকে তাড়িত, চাবুকের চোটে ছুটতে-ছুটতে নখের ধার থেকে এক খাবলা ঘাস খেয়ে নিচ্ছি।" [ক্রিস্টিনকে—৪ মার্চ ১৯০০; ৮—১০৬]।

"আমি সারা জীবন মায়ের কাজ করেছি। এখন তা শেষ। আর তাঁর চরকায় তেল দিতে রাজি নই। তিনি অন্য কর্মী বেছে নিন। আমি ইস্তফা দিলাম।" [মিসেস বুলকে—৭ মার্চ ১৯০৮; ৮—১০৮]।

"সারা জীবন আমি জগতের জন্য খেটেছি, কিন্তু সে জগৎ আমার দেহের এক খাবলা মাংস কেটে না নেওয়া পর্যন্ত এক টুকরো রুটিও আমাকে ছুঁড়ে দেয়নি।" [মেরী হেলকে—১৭ জুন, ১৯০০; ৮—১৪২]।

"এই তো জীবন—খেটে মরো, খেটে মরো! আর তাছাড়া কী-বা করার আছে! খেটে মরো খেটে মরো! হয়ত একটা কিছু ঘটবে, কোনো একটা পথ খুলে যাবে। আর যদি তা না হয়—হয়ত কোনোদিন হবেই না—তাহলে—তাহলে—কী তাহলে? আমাদের সকল চেষ্টাই যে একটা মরশুমের জন্য মৃত্যু-নামক চরম পরিণতিকে ঠেকিয়ে রাখতে! হে মৃত্যু! হে সর্ব রোগহর মৃত্যু! তুমি যদি না থাকতে দুনিয়ার অবস্থা কি দাঁড়াত! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ পৃথিবীকে যে-রূপে দেখছি, সে রূপে সে সত্য নয়, নিত্য নয়।

"ভবিষ্যৎ কি রকম হবে—ভালো কিছু? ফুঃ! সে ভবিষ্যৎ তো বর্তমানেরই সৃষ্টি তাহলে তার চেহারা যদি আরও বেশি খারাপ হয়, না অন্ততঃ এরই মতো খারাপ। অহো স্বপ্ন স্বপ্ন দেখে যাও। স্বপ্নের ইন্দ্রজাল এই জীবনের হেতু—এই জীবনের প্রতিকারও তাই স্বপ্ন—স্বপ্ন দেখে চলো। স্বপ্ন—স্বপ্ন দিয়ে স্বপ্ন ভাঙো। আমার সংবাদ? সংবাদ নেই। পুরো সংবাদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারছি না। সংবাদ মানে পুরনো সংবাদ।...এখানে [প্যারিসে

মহা-মহা ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছি। কেউ-কেউ খুবই তারিফ করছেন—কথাবার্তার। কথা—সেই অনন্ত গোলকধাঁধার পৃথিবীর সঙ্গে, যেখানে অদৃষ্টের অন্তহীন লাটাইয়ের সুতোর প্রান্ত কেউ কখনো খুঁজে পায় না, যদিও সবাই মনে করে তাকে পেয়েছে, অন্ততঃ খুশি হয়ে তাই ভাবে, আত্মপ্রতারণার সুখে।...ভালই হোক, মন্দই হোক, আমরা এ-সংসারে নিজের-নিজের অংশ অভিনয় করে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব—তখন এইসব নিয়ে প্রাণখুলে হাসব। এইটুকু নিশ্চয় করে বুঝেছি।" [ক্রিস্টিনকে, ২৮ অগাস্ট, ১৯০০; প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮]

অভিনয়! তবু অভিনয়ের মধ্যেও অশ্রুজল কোনো-কোনো অভিনেতার বুক নিংড়ে চোখ দিয়ে নামে। মেরী হেলকে তাঁর পিতার মৃত্যুতে স্বামীজী একখানি চিঠি লেখেন (২ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০)—পত্রসাহিত্যের সম্পদ সেই রচনার শেষ অনুচ্ছেদ এই :

"জীবনে এতদিন পর্যন্ত তুমি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ, আর আমাকে জ্বলতে, কাঁদতে হয়েছে—সারাক্ষণ। এখন ক্ষণকালের জন্য তুমি জীবনের অপর দিকটা দেখতে পেলে। এ-ধরনের অবিরাম আঘাতে-আঘাতে আমার জীবন তৈরী হয়েছে—এর চেয়েও শতগুণ ভয়ঙ্কর আঘাত—দারিদ্র্যের, বিশ্বাসঘাতকতার আর নিজের নির্বুদ্ধিতার যন্ত্রণা। এটা নৈরাশ্যবাদ? এখন তুমি বুঝবে, কী করে তা আসে। শুধু একটি কথা বলি, এবং তার মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই—যদি আমরা পরস্পরের দুঃখ বিনিময় করতে পারতাম, আর তোমাকে দেবার মতো আনন্দভরা মন যদি আমার থাকত তাহলে নিশ্চয় বলছি—চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে তা বিনিময় করে নিতাম।"

শিবস্বরূপ বিবেকানন্দ! তাঁর কণ্ঠের নীলগরলদ্যুতি দেখলাম। এবার দেখতে পাব ললাটের চন্দন-চন্দ্রালোক। সিস্টার ক্রিস্টিনকে স্বামীজী তাঁর অন্তর্গত উদাসী অধ্যাত্ম-ভাবনার কথা সবচেয়ে বেশি লিখেছেন—তাঁকে লেখা কয়েকটি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করছি পরপর :

"আমি যেন ঐ অসীম নীলাকাশ। মাঝে-মাঝে সে আকাশে মেঘোদয় হলেও আমি সেই একই অনন্ত নীল।

"আমি এখন সেই শান্তির স্বাদ পেতে চাইছি যা আমার এবং প্রত্যেকের মধ্যে চিরদিন রয়েছে। এই হাড়মাসের খাঁচা আর সুখদুঃখের মিথ্যা স্বপ্ন—এগুলো আবার কি?" [২৫ মার্চ, ১৮৯৯; ৮—১১৬]

"এখন এত স্থির আর শান্ত হয়ে গেছি, যা কোনোদিন ছিলাম না।...আমার তরী শান্তির বন্দরের নিকটবর্তী হচ্ছে, সেখান থেকে তাকে আর ঠেলে দেওয়া হবে না। জয় জয় মা। আর আমার নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাভিলাষ নেই। ধন্য হোক মা'র নাম। রামকৃষ্ণের দাস আমি। আমি যন্ত্রমাত্র, আর কিছু নই, কিছু জানতে চাই না। জয় শ্রীগুরুমহারাজ কি জয়।" [৭ এপ্রিল, ১৯০০; ৮-১২৪]

"কর্ম চিরকালই অশুভকে নিয়ে আসে। আমি স্বাস্থ্য হারিয়ে অশুভের মূল্য দিয়েছি। এতে আমি খুশি, মনের উন্নতিই এতে হয়েছে—আমার জীবনে এমন একটা স্নিগ্ধ কোমলতা ও প্রশান্তি এসেছে, যা আগে কখনো ছিল না।...মায়ের কাজ মা-ই করছেন, তার জন্য মাথা ঘামাই না। আমার মতো পতঙ্গ প্রতি মুহূর্তে হাজার-হাজার মরছে, কিন্তু মায়ের কাজ সমভাবেই চলেছে।...মায়ের ইচ্ছাস্রোতে গা ভাসিয়ে একলা আজীবন চলে এসেছি। যখনই ব্যতিক্রম ঘটাতে গেছি, অমনি আঘাত পেয়েছি।...সুখে আছি, মনের শান্তিতে ডুবে আছি, মনের বৈরাগ্য আগের থেকেও প্রবল, নিকটজনের প্রতি ভালবাসা ক্রমেই কমছে, আর মায়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। দক্ষিণেশ্বরে বটবৃক্ষমূলে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের

স্মৃতি আবার জেগে উঠছে মনে। কর্ম? কর্ম আবার কি? কার কর্ম? কার জন্য কর্ম?...আমি মুক্ত।" [১২ এপ্রিল, ১৯০০; ৮—১২৯]।

"আমেরিকায় উপার্জিত সব টাকা ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি মুক্ত, পূর্বের মতোই ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী। মঠের সভাপতির পদও ত্যাগ করেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মুক্ত। ও-ধরনের দায়িত্ব আর আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে না।...'গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখিরা রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান গায়, তারপর ডানা মেলে উড়ে যায় সুদূরে নীল আকাশে তেমনি আমার জীবনেরও সমাপন।' জীবনে অনেক কঠিন সমস্যার মুখে পড়েছি, সাফল্যও পেয়েছি প্রচুর, আর সাফল্যের মুখে মূল্যহীন হয়ে গেছে বাধা ও বেদনার আঘাত। লক্ষ্যে পৌঁছেছি আমি। যে-মুক্তার সন্ধানে জীবনসমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম, তাকে পেয়েছি—পেয়েছি জীবনের পুরস্কার—আমি আনন্দিত।

"তাই মনে হচ্ছে, জীবনের এক নতুন অধ্যায় খুলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, মা যেন সন্তর্পণে সস্নেহে আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। বাধার পথে আর নয়, এখন পাখির পালকের বিছানা।" [১৪ অক্টোবর, ১৯০০; ৮—১৬৩]।

স্বামীজীর এই মনোভাবের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা ১৮ এপ্রিল ১৯০০ তারিখের পত্রে। 'যাই প্রভু যাই', 'যাই মা যাই'-আকুলিত সেই পত্রটি বহুলাংশে আগেই উদ্ধৃত করেছি এই খণ্ডে [পৃ. ১৫৮-৫৯]।

॥ ৩ ॥

সদ্য উদ্ধৃত চিঠিগুলি মোটামুটি ১৮৯৯-১৯০০ সময়ের। উদ্ধৃত অংশের সুরই এই কালের স্থায়ী সুর। বহিরঙ্গ কর্ম অবশ্যই ছিল। ক্যালিফোর্নিয়া, প্যারিসে, তাঁর কাজের উল্লেখ করেছি। আঘাত আক্রমণ বিশ্বাসঘাতকতা ছিল। স্টার্ডি, মিস মুলার, অভয়ানন্দের উৎকট আচরণের কথাও পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে বলেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের আর্থিক ও অন্যবিধ দায়দায়িত্বের বোঝা ছিল। মঠের সম্পত্তি তাঁর নামে ছিল, ট্রাস্ট ডীড করে দেননি; অবিলম্বে তা করার বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল পাশ্চাত্ত্য ভক্তদের, তা নিয়ে টানাপোড়েন চলেছিল, মঠের পরিচালনগত অসুবিধাও তাতে হচ্ছিল, কারণ বালি মিউনিসিপ্যালিটি মঠকে স্বামীজীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধরে নিয়ে [বালি মিউনিসিপ্যালিটির সদ্‌বুদ্ধিতে, বেলুড় মঠ স্বামীজীর বাগানবাড়ি] বিরাট কর চাপিয়েছিল, মামলা চলছিল তা নিয়ে।২ স্বামীজী মঠের কর্তৃত্ব ত্যাগে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি অব্যাহতি চাইছিলেন। মিসেস বুলকে ১৭ জানুয়ারি ১৯০০, লিখলেন : "আমার কাছে এটা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে, আমায় মঠের সব ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে।...আমার কাছে এই সর্বোচ্চ ত্যাগের আহ্বান এসেছে—উচ্চাশা, নেতৃত্ব ও যশকে বিসর্জন দিতে হবে। সে তপস্যার জন্য মন প্রস্তুত।. সারদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও আপনার নামে মঠের ট্রাস্ট-ডীড করে দিতে চাই। সারদানন্দের কাছ থেকে কাগজপত্র পেলেই কাজটা করে দেব। তারপর শান্ত হব। আমি চাই বিশ্রাম, এক মুষ্টি অন্ন, খানকয়েক বই, এবং লেখাপড়ার কাজ।" [ইংরাজী গ্রন্থাবলী, ৮ম, ৪৯১; বাংলা ৮-৯৫]। মঠ পরিচালনা ও আর্থিক ব্যাপারে অল্পস্বল্প মতভেদ হচ্ছিল। এ-ব্যাপারে স্বামীজীর আবেগপ্রবণ অভিমানী হৃদয়ের জন্য কিছু বেশি জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। যে প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা ও মনঃশক্তি তাঁর—সে বস্তু যে, সেই পরিমাণে অপরের নেই, থাকতে পারে না, তা তিনি অনেক সময় ভুলে যেতেন।

২ স্বামীজী মিসেস বুলকে ১২ ডিসেম্বর, ১৮৯৯, লেখেন : "ভালো কথা, মিউনিসিপ্যালিটি অত্যধিক কর বসিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করতে চায়। সেটা আমারই দোষ, কারণ আমিই ট্রাস্ট করে মঠটি সাধারণ-সম্পত্তি করে দিইনি।" [৮—৮৫]।

তাছাড়া কল্পনার বাস্তব প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ। স্বামীজী তাঁর সীমাবদ্ধ জীবনকালের কথা ভেবে অবুঝ ও অধীর হয়ে উঠতেন। বিশেষতঃ টাকাকড়ির হিসাবের ব্যাপারে তাঁর উত্তেজনার সীমা থাকত না। বিদেশী বন্ধুরা ভারতীয় কাজে অর্থসাহায্য করে, অবিলম্বে তার হিসাব চাইতেন। স্বামীজী নিজে হিসাবে পারদর্শী নন, কিন্তু হিসাবের মূল্য বুঝতেন। বিশেষতঃ যখন সময়মতো হিসাব না পেলে বিদেশী বন্ধুরা অভিযোগ করতেন, তখন সেটাকে তিনি ব্যক্তিগত ও জাতীয় অপমান বলে মনে করতেন। তখন হিসাব না দেবার জন্য অসম্ভব রাগা-রাগি করতেন, বেশি ঝাঁঝ গিয়ে পড়ত স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর। স্বামীজী এইসব রাগারাগির সময়ে একটি কথা ভুলে যেতেন—টাকাকড়ির যে-হিসেব সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পক্ষে করা শক্ত, তা সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দের পক্ষে কম শক্ত নয়। সে যাই হোক, ব্রহ্মানন্দের উপর রাগের ঝোঁকটা বিশেষ পড়ার কারণ—স্বামীজী জানতেন—সত্য মিথ্যা যে-রাগই তিনি করুন, রাজা [ব্রহ্মানন্দ] তা পিতার স্নেহে সহ্য করবে, আর ব্রহ্মানন্দ জানতেন—নরেনের মনে রাগ নেই, শুধু মুখেই তর্জন।

হিসেবপত্রের ব্যাপারে বিদেশী দাতাদের তাগিদ, সেইসঙ্গে স্বামীজীর বিষয়বৈরাগ্য—এইসব জড়িয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিষয়ব্যাপারে তাঁর আচরণের সমালোচনা হয়ত কোনো গুরুভাই করেছিলেন (ব্যাপারটা স্বামীজীর অতি স্পর্শকাতর মনের অনুমানও হতে পারে) —তা নিয়ে গভীর বেদনা পান। পূর্বে উদ্ধৃত ১৭ জানুয়ারি, ১৯০০, চিঠিতে মিসেস বুলকে মঠের কর্তৃত্ব ত্যাগের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কর্তৃত্ব অক্টোপাশের মতো তাঁর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল। এক্ষেত্রে তিনি নিজের মধ্যে সন্ন্যাসীর মৃত্যু-সম্ভাবনা দেখে আতঙ্কিত হচ্ছিলেন। তাঁর এই গভীর চিত্তসংকট মিসেস বুলের কাছে ধরা পড়েছিল। মিসেস বুল স্বামীজীকে ১ মে, ১৯০০, ধীর বিবেচনাপূর্ণ এক পত্র লিখলেন, যাতে বললেন—না, বিষয়ে জড়িয়ে আপনাকে বিষয়ী হতে হবে না। [স্বামীজী প্রচণ্ড অভিযোগ করে বলেন, ব্যাপার যা দেখছি তাতে আমাকে শেষপর্যন্ত বিষয়ী হয়ে পড়তে হবে।]—আপনি বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসীই থাকুন, তাতেই পৃথিবীর মঙ্গল।

স্বামীজী মঠের সব কিছু হস্তান্তর করেছিলেন, কিন্তু কোনো-কোনো অবাঞ্ছিত কাঁটা তাঁর মনকে বিঁধেছিল। অগস্ট, ১৯০০, তুরীয়ানন্দকে লেখা, বিশেষরকম খণ্ডিত এক পত্রে তার আভাস পাই।—"...লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মনঃকষ্ট। কাজেই...সব লিখে-পড়ে আলাদা হয়ে গেছি। এখন আমি লিখে দিচ্ছি যে, কারও একাধিপত্য থাকবে না। সব কাজ মেজরিটির হুকুমে হবে।...সেইমতো ট্রাস্ট-ডীড করিয়ে নিলেই আমি বাঁচি। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি, ব্যাস্। গুরুমহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি।...দলিল করে পাঠিয়েছে সর্বেসর্বা কর্ত্রাত্তির! কর্ত্তাত্তি ছাড়া বাকি সব সই করে দিয়েছি।...প্রাণ ধরে সই করে দিয়েছি। এখন থেকে যা করব, সে আমার কাজ।...আমি এখন আমার কাজ করতে চললুম। গুরুমহারাজের ঋণ প্রাণ বার করে শুধে দিয়েছি। তাঁর আর দাবিদাওয়া নেই।"৩ [৮-১৫০-৫১]।

৩ একই প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে স্বামীজী ২৫ অগস্ট, ১৯০০, লেখেন: "আমি মিসেস বুলকে মঠ থেকে টাকা তুলে নেবার সুযোগ দিয়েছিলাম; কিন্তু তিনি ও-বিষয়ে কিছু বললেন না, আর এদিকে ট্রাস্টের দলিলগুলি দস্তখতের জন্য পড়ে ছিল। সুতরাং আমি বৃটিশ কনসালের অফিসে গিয়ে সই করে দিয়েছি। কাগজপত্র এখন ভারতের পথে। এখন আমি স্বাধীন, আর কোনো বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ কার্যব্যাপারে কোনো ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বা পদ রাখিনি। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতির পদও আমি ত্যাগ করেছি।...কুড়িটি বছর রামকৃষ্ণের সেবা করলাম।...এখন কাজ থেকে অবসর নিলাম। বাকি জীবন আপনভাবে কাটাব।" [৮-১৫১-৫২]

॥ ৪ ॥

স্বামীজীর "আমার কাজ"-এর একটির কথা জানি—নিজের মায়ের জন্য একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। পৃথিবীতে স্বামীজীর শেষ ঋণ ছিল তাঁর মায়ের কাছে, এবং বংশের কাছে। সেই ঋণ মেটাবার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন জীবনের অন্তিম পর্বে। এ ব্যাপারে যাঁদের স্বারস্থ হয়েছিলেন, তাঁদের একজন খেতড়ির মহারাজা। ভিক্ষাকে বিবেকানন্দ ঘৃণা করতেন, আবার তিনি চিরভিক্ষুক সন্ন্যাসী। দেশ ও জনগণের জন্য তিনি নানাজনের কাছে ভিক্ষাপাত্র হাজির করেছেন। খেতড়ির মহারাজার সুকৃতি—একেবারে ব্যক্তিগত অর্থাৎ পারিবারিক ব্যাপারে, তাঁর কাছে স্বামীজী প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

মাতৃঋণ সন্ন্যাসীকেও বোধহয় স্বীকার করতে হয়। আর বংশের প্রতি ঋণ? জানিনা। তবে দেখি, স্বামীজী ২২ নভেম্বর, ১৮৯৮, খেতড়ির রাজাকে লিখেছেন, "বংশলোপ নিবারণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিতে চাই।" স্বামীজীর এই ইচ্ছার পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অপেক্ষা নিজের মায়ের ইচ্ছা প্রবলতর ছিল সন্দেহ নেই। তিনি একবার এক পত্রে লিখেছিলেন, যদি তাঁর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ বিয়ে করতে চান, তাঁকে দূর করে দেবেন। তবে শেষপর্যন্ত ভূপেন্দ্রনাথকে সংসারী করার ইচ্ছার পিছনে হয়ত এই ভাবনা সক্রিয় ছিল—যে-রক্তধারা দুর্গাচরণ (পিতামহ) ও বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসী সৃষ্টি করতে পারে, সে রক্তধারা প্রবাহিত থাকা দরকার। আর এক্ষেত্রে তিনি মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথকেই অধিক বিবাহযোগ্য মনে করেছিলেন—মানবচরিত্র বিচার করেই নিশ্চয়।

মাতৃঋণ পরিশোধের জন্য স্বামীজী তাঁর অভ্যস্ত রাজকীয়তা পর্যন্ত ত্যাগ করে দীন ভিখারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। খেতড়িকে উল্লিখিত পত্রে লেখেন: "মহারাজার কাছে আজ একটি আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন নিয়ে হাজির হচ্ছি—এই জেনে যে, আপনার কাছে মন খুলতে আমার একটুও লজ্জা নেই, এবং আমি আপনাকে এ-জীবনে একমাত্র বন্ধু বলে মনে করি। যদি পরে যা লিখছি, তা আপনার মনে সাড়া জাগায়, ভালো, আর যদি না জাগায়, আমার নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা করবেন, যেমন বন্ধুরা করে থাকে।

"আপনি জানেন, প্রত্যাবর্তনের পর থেকে আমি ভুগছি। কলকাতায় আপনি আমাকে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং এই অনারোগ্য ব্যাধি সম্বন্ধে বিব্রত না-হতে অনুরোধ করেছিলেন। স্নায়বিক উত্তেজনা থেকে এই ব্যাধি ঘটেছে, আর যতক্ষণ না উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা কমছে, ততক্ষণ কোনো বায়ু পরিবর্তনেই সুরাহা হবে না।

"এই দু'বছর বিভিন্ন স্থানে বায়ু পরিবর্তন করেও, প্রতিদিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে—এখন আমি মৃত্যুদ্বারে। [স্বামীজীর এই সময়ের মারাত্মক স্বাস্থ্যের অবস্থার কথা নিবেদিতার বহু পত্রে আছে]। তাই মাননীয় মহারাজের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, বন্ধুত্ব ও ঔদার্যের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমার বুকের মধ্যে একটি পাপ সর্বদাই পীড়া দেয়—পৃথিবীর সেবা করার জন্য আমি আমার মায়ের সম্বন্ধে শোচনীয় উদাসীনতা দেখিয়েছি। আবার, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ বাইরে চলে যাওয়ায় [মহেন্দ্রনাথ তখন বিশ্বভ্রমণ করছিলেন, তাঁর প্রায় কোনো খোঁজখবরই ছিল না] মা শোকে একেবারে মুহ্যমান। এখন আমার শেষ ইচ্ছা—কয়েক বছরের জন্য যেন মায়ের সেবা করতে পারি। আমি মায়ের সঙ্গে বাস করতে, এবং বংশলোপ নিবারণ করতে, ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিতে চাই। এমন করতে পারলে আমার এবং আমার মায়ের শেষ দিনগুলি শান্তিতে কাটবে। মা এখন একটা যা-তা কুঠরিতে আছেন। তাঁর জন্য ছোট ভালো একটা বাড়ি করে দিতে, এবং ছোট ভাইয়ের জন্য কিছু সংস্থান করতে চাই। ওর পক্ষে ভালো রোজগেরে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এখন, রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব একজনের পক্ষে এই ব্যবস্থা করে দেওয়া কি খুব বড় কাজ, বিশেষত যাঁকে ভালবাসেন এবং বন্ধু বলে মনে করেন, তাঁর জন্য? আর কার কাছে আবেদন জানাব জানি না। ইউরোপ থেকে যে-

টাকা পেয়েছি, তার সবই 'কাজ'-এর জন্য—এবং তার শেষ পাইপয়সা পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি অন্যের কাছে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সাহায্য চাইতে পারি না। আমার পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে মহারাজের কাছে খুলে বললুম, এবং তা অন্য কেউ জানবে না।"

চিঠির শেষে স্বামীজী লেখেন, 'এ একেবারে ব্যক্তিগত চিঠি। আপনি পারবেন কি পারবেন না, দয়া করে তার করে জানাবেন কি?'৮

খেতড়িকে লেখা স্বামীজীর পরবর্তী ১ ডিসেম্বরের চিঠি থেকে বোঝা যায়, মহারাজা কিছু অনুকূল উত্তর দিয়েছিলেন। স্বামীজী এবার জানান, একটা ছোট বাড়ির খরচ লাগবে ১০,০০০ টাকার মতো। সেইসঙ্গে স্বামীজী, খেতড়ি তাঁর মায়ের জন্য যে-মাসিক ১০০ টাকা অর্থসাহায্য করে আসছেন, সেটি মায়ের জীবনকাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে, এবং নিজের জীবনকাল পর্যন্ত মাসিক ১০০ টাকা সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শেষোক্ত ব্যাপারে এই মধুর আশ্বাস তিনি খেতড়িকে দেন, "আশা করি, আপনার এই ঝঞ্ঝাট দীর্ঘ-স্থায়ী হবে না কারণ মাত্র কয়েক বছরই বাঁচব বলে মনে করি।" প্রার্থিত সাহায্য আসুক বা না-আসুক, ইতিমধ্যে খেতড়ি যা করেছেন, সেজন্য স্বামীজী কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন : "এই পৃথিবীতে আমি যা হয়ে উঠেছি, সে আপনারই সাহায্যে। আপনি আমাকে আমার বিকট [পারিবারিক] দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে, পৃথিবীর সম্মুখীন হওয়া, সেইসঙ্গে কিছু কাজ করা, সম্ভবপর করেছিলেন।" [বেণীশংকর, ১৭০-৭৫]। [স্বামীজীর জীবনে খেতড়ির মহারাজের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা আগে করেছি - ১ম খণ্ড, ১৬-১৯, ৭২-৭৪; ৩য় ১৪-১৫]।

আলোচ্য প্রসঙ্গে শ্রীমতী লুই বার্ক 'সেকেণ্ড ভিজিট' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি সংগতভাবেই অনুমান করেছেন, শেষপর্যন্ত খেতড়ির রাজার পক্ষে দশহাজার টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি, এবং স্বামীজীও তাঁর মাকে আলাদা বাড়ি তৈরী করে দিতে পারেন নি। তার পরিবর্তে তিনি ৬ হাজার টাকা দিয়ে নিজের খুড়ীর কাছ থেকে পৈতৃক বাড়ির একটা অংশ কিনে নেন। মঠ-তহবিল থেকে এর জন্য তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করতে হয়।

কিন্তু স্বামীজী এই ব্যাপারে দারুণভাবে ঠকেন। ৬ অগস্ট, ১৮৯৯, মিসেস বুলকে লেখেন : "দুশ্চিন্তা? সম্প্রতি তা যথেষ্ট। আমার খুড়ীকে আপনি দেখেছেন—তিনি আমাকে ঠকাবার জন্য তলে-তলে চক্রান্ত করেন। তিনি ও তাঁর পক্ষের লোকজন আমাকে বলেন, ৬০০০ টাকায় বাড়ির অংশ বিক্রি করবেন—আর সেটা আমি সরল বিশ্বাসে ৬০০০ টাকা দিয়ে কিনি। তারপর তাঁরা বাড়ির অধিকার দেবেন না—এই বিশ্বাসে যে, আমি সন্ন্যাসী হয়ে, জোর করে বাড়ির দখল নেবার জন্য কোর্টে যাব না।" ['সেকেণ্ড ভিজিট,' ৬৫]।

এর ফলে মামলা হয়, এবং কয়েক বছর গড়ায়। মামলাতে যথেষ্ট খরচ হয়। স্বামীজীকে সে খরচের টাকাও সাময়িকভাবে মঠ-তহবিল থেকে নিতে হয়। পূর্বোক্ত পাঁচ হাজার টাকা, এবং এই মামলার খরচের টাকার দুশ্চিন্তা স্বামীজীকে একেবারে অস্থির করে ফেলেছিল। তাঁর ব্যক্তিগত টাকা বলতে সেইসব টাকা যা তাঁর অনুরাগীরা তাঁর নিজস্ব খরচের জন্য দিতেন, কাজের জন্য নয়, (নিজস্ব খরচের কিছু টাকা ক্যাপ্টেন সেভিয়ার দিয়েছিলেন, খেতড়ির রাজা দিয়েছেন, মিস ম্যাকলাউডও অল্পস্বল্প দিতেন); এইসঙ্গে ছিল—গ্রন্থ বা প্রবন্ধসূত্রে, কিছুটা বক্তৃতাসূত্রে উপার্জিত অর্থ। আমরা দেখতে পাই, স্বামীজী শেষপর্যন্ত ধার নেওয়া সব টাকা শোধ করতে পেরেছিলেন, এবং তাঁর দেহান্তের ঠিক আগে তাঁর অনুকূলেই পৈতৃক বাড়ির ব্যাপারে আপস হয়।৫

স্বামীজী সত্যই শেষপর্যন্ত নিজের মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারেননি। তাঁর মতো মানুষের পক্ষে শারীরিকভাবে সবকিছু করার দরকার হয়না—তিনি ইচ্ছা করেছিলেন, তাই যথেষ্ট। সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর উক্ত আকাঙ্ক্ষার ঔচিত্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে। কিছুটা আত্মসমর্থনে এক্ষেত্রে তিনি সন্ন্যাসীরা যাঁকে 'আচার্য' বলে মান্য করেন, তাঁর জীবনকথা

আছে। 'পেট্রিয়ট-প্রফেট' বইয়ে পাই, সম্পত্তি নিয়ে ঝঞ্ঝাট স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের জীবনকালেই আরম্ভ হয়। অজস্র উপার্জনশীল, উদার ও অমিতব্যয়ী বিশ্বনাথ দত্তকে তাঁর খুল্লতাত কালীপ্রসাদ দত্ত—যিনি "যৌথ পরিবারের উপার্জনহীন কর্তা"—সবিশেষ দোহন করতেন। সে-বিষয়ে ভুবনেশ্বরী দেবী অনুযোগ করলে বিশ্বনাথ বলেছিলেন, "খুড়ো আমাকে শৈশবে দেখেছেন। তাঁর জন্য গায়ের মাংস পর্যন্ত কেটে দেব।" কিন্তু শেষপর্যন্ত মাংস খাবলানো কাণ্ডটা এমন স্তরে পেঁছেছিল যে, বিশ্বনাথকে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আলাদা বাসা করে থাকতে হয়। "দেহান্তের কয়েক বছর পূর্বে থেকে বিশ্বনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে [নরেন্দ্রনাথ] বলতেন, তিনি কিভাবে কাকার পরিবারের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। এইকালে একবার অন্তর্যাতনায় চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'আগে আমি যাব, তারপর আমার ছেলেরা ওদের দূর করে দেবে।'"

শেষপর্যন্ত কিন্তু উল্টোটাই ঘটেছিল। বিশ্বনাথের পরিবারকেই দূর হয়ে যেতে হয়। ভুবনেশ্বরী দেবী অবিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তির একটা অংশ কিনেছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসাদের পুত্রবধূ, তারকনাথ দত্তের পত্নী, জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্যের মতলবে পড়ে ভুবনেশ্বরী দেবীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। সে মামলায় তিনি হেরে যান। তাঁর স্বামী তারকনাথ দত্ত যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, তাই ধনী বিধবার সম্পত্তিতে কামড় বসাবার জন্য অনেক লোভী আত্মীয়স্বজন জুটেছিল, যাদের মতলবে তিনি ঐ মামলা বাধান। ফল হয়, শেষজীবনে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন, যদিও উস্কানিদাতারা মোটা টাকা গুছিয়ে নিয়েছিল। "জীবনের একেবারে শেষ ভাগে তিনি স্বামীজীর কাছে সাহায্যভিক্ষা করলে তিনি তাঁকে মোটা টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। জীবনের শেষ দিনগুলিতে খুড়ী আমার বড় বোন ও অন্যান্যদের কাছে বলতেন, বড় মেয়ে ও শাশুড়ির তাগিদে পড়ে তিনি মামলা করেছেন।" ['পেট্রিয়ট-প্রফেট,' ৯৭, ১৩৯-৪০]।

"স্বামী বিবেকানন্দ" বইয়ে ভূপেন্দ্রনাথ প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন, সেইসঙ্গে স্বামীজীর জীবনীকারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জুড়ে দিয়েছেন—তাঁরা না জেনেই নাকি লিখেছেন—তারকনাথ দত্তের পত্নীর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মামলা হয়, ইত্যাদি, যা বস্তুতঃ বিশ্বনাথ দত্তের স্ত্রীর সঙ্গে তারকনাথ দত্তের স্ত্রীর মামলা। [১২৮]। কথাটা ঠিক, কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ পুরো ঠিক বলেন নি। তাঁর প্রশংসনীয় গ্রন্থে তিনি মাঝে-মধ্যে স্বয়ং স্বামীজীর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের ঝাঁঝ ফুটিয়ে তুলেছেন—স্বামীজী তাঁর মাকে বিশেষ দেখেন নি, যে-সৎকর্মটি ভূপেন্দ্রনাথ করেছেন!! ভূপেন্দ্রনাথ অবশ্যই যুগান্তর মামলার পূর্ব পর্যন্ত মাকে দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ ভুলে গিয়েছিলেন, সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ বিদেশযাত্রার আগে খেতড়ির মহারাজাকে দিয়ে তাঁর মা ও ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, ভাইদের শিক্ষাব্যবস্থাও তার মধ্যে ছিল। খেতড়ি প্রবর্তিত একই ব্যবস্থা স্বামীজীর দেহান্তের পরেও, ভুবনেশ্বরী দেবীর দেহান্ত পর্যন্ত, বলবৎ ছিল, যা বেণীশঙ্কর শর্মা তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন। অপরপক্ষে ভূপেন্দ্রনাথ কিন্তু দেশসেবায় জেলে গিয়ে, এবং তারপরে বিদেশে প্রস্থান করে, তাঁর মায়ের জন্য কোন্ ব্যবস্থা করেছিলেন আমরা জানি না। ওকাজটা স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই করতে হত।

স্বামীজী যে পাশ্চাত্ত্য থেকে ফেরার পরে ভুবনেশ্বরী দেবীর জন্য পৈতৃক বাড়ির অংশ কিনে দিয়েছিলেন, সে সংবাদও ভূপেন্দ্রনাথ পরিষ্কার জানতেন না, বা বহুদিন পরে বই লেখার সময়ে ভুলে গিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, স্বামীজী তারকনাথ দত্তের বিধবা বধূকে অর্থসাহায্য করেছিলেন (যা ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন)—তার শর্ত ছিল, উনি ভুবনেশ্বরীর প্রাপ্য যে-অংশ অন্যায়ভাবে অধিকার করে আছেন, সেটি ফিরিয়ে দেবেন। সেখানেও কতখানি চক্রান্তের শিকার স্বামীজীকে ও স্বামীজীর মাকে হতে হয়, তা আমরা স্বামীজীর পত্র, এবং সম্পত্তি মামলার সংবাদসূত্রে জানিয়েছি। ভূপেন্দ্রনাথ কিন্তু শেষোক্ত মামলাটির আসল চরিত্র কী ছিল, তা পরিষ্কার করতে তুলতে পারেন নি, যদিও স্বামীজীর জীবনীকারদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ করেছেন। যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি এই কথাটা চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছিলেন, জীবনীগ্রন্থ লেখা হয় রচনাকালে প্রাপ্ত তথ্যের উপরে নির্ভর করেই। অধিক তথ্যের দ্বারা পূর্ব তথ্য খণ্ডিত বা সংযোজিত হলে সেটা জীবনীকারেরা সানন্দে স্বীকার করেন, যদিনা তাঁরা বিশেষ স্বার্থবুদ্ধিতে চালিত হন।

স্মরণ করেছিলেন। ১৭ জানুয়ারি, ১৯০০, মিসেস বুলকে স্বামীজী লেখেন :

"এটা আমার কাছে ক্রমেই স্বচ্ছতর হয়ে উঠছে, মঠের কাজ ছেড়ে দিয়ে কিছু সময়ের জন্য যেন মায়ের কাছে ফিরে যাই। আমার জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তাঁর শেষ দিনগুলিতে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আনবার চেষ্টা আমাকে অবশ্যই করতে হবে। জানেন কি, ঠিক এই কাজটিই মহান শঙ্করাচার্যকে করতে হয়েছিল! শঙ্করাচার্যকে তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি দিনে তাঁর মায়ের কাছে ফিরে যেতে হয়েছিল!" [ইংরাজি গ্রন্থাবলী, ৮—৪৮৯-৯০]।

॥ ৫ ॥

শান্তির একটি আশ্রয়, নির্জনতা, কিছু বই, সামান্য আহার—স্বামীজী এই চেয়েছিলেন। হিমালয়ে তেমন ঠাঁই করে নেওয়াই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। শেষপর্যন্ত বেলুড়েই যথাসম্ভব সেই শান্তিনীড় রচিত হল।

দিনগুলি কেমন কেটেছিল, তার উত্তম বিবরণ আছে স্বামীজীর ইংরাজি ও বাংলা জীবনীগুলিতে। আমি বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না, কেবল কয়েকটি খণ্ডচিত্র তুলে আনব।

মঠে যখন থাকতেন, বৃহত্তর পৃথিবীকে যথাসম্ভব প্রত্যাখ্যান করতেন। "পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিবার পর স্বামীজী মঠেই থাকিতেন এবং মঠের কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন। কখনও নিজ হস্তে মঠের জমি কোপাইতেন, কখনও গাছ-পালা, ফল-ফুলের বীজ রোপণ করিতেন, আবার কখনো-বা চাকর-বাকরের ব্যারাম হওয়ায় ঘরদ্বারে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিয়া, নিজ হস্তে ঝাঁটা ধরিয়া ঐসকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া বলিতেন, 'আপনি কেন?' —তাহা হইলে স্বামীজী বলিতেন, 'তা হলই বা। অপরিষ্কার থাকলে মঠের সকলের যে অসুখ করবে!' ঐকালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুষিয়াছিলেন। বড় একটা ছাগলকে হংসী বলিয়া ডাকিতেন ও তারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগল-ছানাকে 'মটরু' বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুঙুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা আদর পাইয়া স্বামীজীর পায়ে-পায়ে বেড়াইত এবং স্বামীজী তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের বালকের মতো দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। কিছুদিন পরে 'মটরু' মরিয়া যাওয়ায় স্বামীজী বিষণ্ণচিত্তে শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'দ্যাখ আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই সেটাই মরে যায়।'" [৯—২৩৩-৪]

'স্বামী শিষ্য সংবাদের' এই বিবরণের সঙ্গে যোগ করা যায় স্বামীজীর জীবনী থেকে প্রাপ্ত আরও কিছু সংবাদ। আমরা জেনেছি, কৌপীন পরা অবস্থায় স্বামীজীকে এই জীব-কুলের মধ্যে খেলা করতে দেখে অনেকেই বালক কৃষ্ণের কথা ভাবতেন।[৬] [এতে আশ্চর্য হবার

৬ "স্বামীজীর সর্বজীবে প্রেম-ভালবাসা সম্বন্ধে অখণ্ডানন্দ বলিতেন : স্বামীজী মঠে এক প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা করেছিলেন—চীনে হাঁস, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, নানারকমের পায়রা, কুকুর, সারস বেড়াল, মেড়া ইত্যাদি পুষেছিলেন। তাদের যত্ন করে খাওয়াতেন, আদর করতেন, একদৃষ্টে সস্নেহে তাকিয়ে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ গোধন নিয়ে কি-রকম খেলা করতেন—এই দৃশ্য দেখলে তার অনেকটা ধারণা হয়। তখন স্বামীজীর মুখচোখের ভাব কি অদ্ভুতরকম বদলে যেত, তা আর কি বলব। একেই বলে জীবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম।" [অন্নদানন্দ, ১৮৫]।

যেহেতু গোষ্ঠলীলা, সুতরাং দিব্য বালকদের কলহের অংশ বাদ যেতে পারে না। তার রূপ :

"মঠের বাগানের পার্শ্বে খোলা মাঠজমিতে স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। স্বামীজী ও মহারাজ [ব্রহ্মানন্দ] এই মাঠ ও বাগানের একটি সীমা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি উক্ত সীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত, তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তুলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত। ...মনে হইত যেন দুইটি দিব্যভাবাপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ত হইয়াছেন।" ["স্বামী ব্রহ্মানন্দ, উদ্বোধন-প্রকাশিত (২য় সং, ১৩৫৫), ২০৪]

কিছু নেই, কারণ স্বামীজীর মুখের শিশুকোমলতা সর্বদাই দৃশ্যমান ছিল। ইংলণ্ডে তাঁকে দেখে নিবেদিতার মনে র‍্যাফেলের আঁকা সিস্টিন চাইল্ড-এর ছবি জেগেছিল]। যেসব সংবাদ পেয়েছি তার থেকে আমরা উক্ত জীবকুলের সৌভাগ্যে নির্মল ঈর্ষা বোধ করতে পারি। "মাঝে-মাঝে ছাগলী 'হংসী'র নিকট যাইয়া তিনি দুধের জন্য সাধ্যসাধনা করিতেন, যেন দুধ দেওয়া না-দেওয়া হংসীর ইচ্ছাধীন।" 'বাঘা' নামক ধূর্ত ভক্ত কুকুরটির কথা স্বামীজীর জীবনী-পাঠকদের জানা আছে। গম্ভীরানন্দের বর্ণনায় তার রূপ : "মঠের কুকুরটির নাম ছিল বাঘা। বাঘা অন্য সব প্রাণীগুলির উপর সর্দারী করিত এবং ভাবিত, মঠে তাহার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। একবার অত্যধিক দুষ্টামীর জন্য তাহাকে গঙ্গার পরপারে নির্বাসনে যাইতে হয়। কিন্তু বাঘা এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে সম্মত ছিল না, সে মঠকে ভালবাসিত, বিশেষতঃ স্বামীজীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। সারাদিন অতীব দুঃখে কাটাইয়া সে সন্ধ্যাকালে এক ফন্দী আঁটিল ও খেয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল। নৌকার মাঝি ও আরোহীরা তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও সে নামিল না, বরং দন্ত বাহির করিয়া ও গর্জন করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। অগত্যা তাহাকে নির্বিবাদে পার হইতে দেওয়াই উচিত মনে করিয়া সকলে স্থান ছাড়িয়া দিল। এপারে আসিয়া সে রাত্রিটা এদিক-ওদিকে লুকাইয়া কাটাইল। ভোর চারিটায় স্বামীজী স্নানাগারে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে পায়ে কি-একটা ঠেকায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন ও চাহিয়া দেখিলেন—বাঘা। বাঘা তাঁহার পায়ে লুটাইয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে ক্ষমাভিক্ষা ও পুনঃপ্রবেশাধিকার যাচ্ঞা করিতে লাগিল। সে ঠিক বুঝিয়াছিল, এই বিপদ হইতে উদ্ধারকর্তা একমাত্র স্বামীজী। তাই অপর সকলের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে ঠিক যেখানে স্বামীজীর শরণ লওয়া চলিবে সেখানেই অপেক্ষা করিতেছিল। স্বামীজী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া আদর করিলেন ও আশ্বাস দিলেন; অধিকন্তু সকলকে বলিয়া দিলেন, বাঘা যাহাই করুক, আর তাহাকে তাড়ানো চলিবে না।"৭

বাঘা কিন্তু স্বামীজীর স্নেহের 'পাপ-আশঙ্কা মতো' স্বামীজীর সামনে মরেনি; স্বামীজীর দেহান্তের বেশ কয়েক বছর পর পর্যন্ত মঠবাস ক'রে এই ধর্ম-পুত্র সারমেয়টি গত হয়। তাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। অথচ তার গয়া-গঙ্গা স্বামীজীর ঠাঁইতেই। তাই পর-দিন দেখা গেল, তার মৃতদেহ মঠের সীমানার মধ্যে পলিমাটিতে পড়ে আছে। তখন তার পারলৌকিক জেদের কাছে নতিস্বীকার ক'রে মঠের জমিতেই তার সমাধি দেওয়া হয়। ব্যাপারটা কাকতালীয়। তবে কাকতালীয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে নানা ধরনের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়, অবশ্যই।

৭ বাঘা-লীলার একটি চমৎকার কাহিনী 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থে আছে :

'এই সময় একদিন হাবড়ার [হাওড়ার] কালেক্টর কুক-সাহেব কোনো কার্যোপলক্ষ্ণে [কার্যটি গুরুতর ' বালী মিউনিসিপ্যালিটির আহ্লাদী ধারণামতো, বেলুড়-মঠ সত্যই বিবেকানন্দের বাগান বাড়ি কিনা, তদন্ত করবার জন্য] দুপুরবেলা মঠে আসেন। সাহেব ফটকে প্রবেশ করিতেই সারসটি ডাকিয়া উঠিল, এবং তাহার ডাক শুনিয়া কুকুরটিও তথায় উপস্থিত হইল। একপার্শ্বে সারস, অপর পার্শ্বে কুকুরসহ সাহেব মাঠ পার হইয়া, মঠগৃহের নিকট আসিয়া উপনীত হইলে—স্বামীজী, ও মহারাজ প্রভৃতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কুক-সাহেব বলিলেন, 'আপনাদের পূর্বেই সারস ও কুকুর আমাকে অভিবাদন করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। জীবনে এমন সাদর অভ্যর্থনা কখনও পাই নাই।'" [পৃ ২০৪]।

কুক-সাহেব তাঁর খ্রীস্টীয় মঠ-সম্বন্ধীয় ধারণার সঙ্গে এই মঠের চেহারার ঐক্য দেখে আনন্দিত হন এবং অনুকূল রিপোর্ট দেন। এখানে বালী মিউনিসিপ্যালিটির অকৃতজ্ঞ কর্মকর্তাগুলি, এবং এই কৃতজ্ঞ পশুগুলির আচরণের পার্থক্য থেকে বুঝতে পারি—মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর কোন্ দুঃখে মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করার ইচ্ছা করেছিলেন!

স্বামীজীকে জীবজগতের মধ্যে দেখার আনন্দ আমরা আর একটু উপভোগ করে নেব—তাঁর নিজের লেখা থেকেই। ৬ জুলাই, ১৯০১, ক্রিস্টিনকে লিখেছেন : "আমার আছে কয়েকটি ছাগল আর ভেড়া, একটি হরিণ এবং কতকগুলি গরু। তার উপর ফুলের বাগান, মাছের পুকুর এবং সবজীখেত।" ২ সেপ্টেম্বর একই জনকে পত্রে উক্ত চিড়িয়াখানায় নবতর সংযোজনের সংবাদ দিয়েছেন। জেনেছি, সেখানে আরও আছে—পাতিহাঁস, রাজহাঁস এবং মেষ। "বিরাট শরীর, রোমহীন, ঘোরবর্ণ" কয়েকটি নারী-মহিষের ভাবী স্বাস্থ্যকর আগমনসংবাদ দিয়েছেন, কেননা মোষগুলি "বিপুল পরিমাণে দুধ দেয়।" ২৭ মে, ১৯০২, এক পত্রে 'সদ্য দুটি ছাগলছানা, তিনটি ভেড়া, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে"—এই শুভসংবাদের সঙ্গে কিছু শোকসংবাদও ছিল—"একটি ছাগলছানা পুকুরে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।"

স্বামীজী যখন কৌতুকে হাসছিলেন, তখনি করুণায় চোখের কোণে অশ্রু টলটল করছিল। "আমি এখন থামছি [তিনি ১২ নভেম্বর ১৯০১ ক্রিস্টিনকে লিখেছেন]। মিনিট পাঁচেকের জন্য শুধু যাচ্ছি পাতিহাঁস আর রাজহাঁসগুলোকে দেখে আসতে—যদিও ডাক্তারের আদেশ, সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে। একটা রাজহাঁস একেবারে বোকা, আর ভীতু—সবসময় হতাশ আর কাতর। সে একলা থাকতে চায়, বড্ড দুঃখী; অন্য জায়গার একটি [সিস্টার ক্রিস্টিনকে ইঙ্গিত ক'রে] রাজহংসীর মতোই।" স্বামীজী এর পরে ইংরাজিতে অনুবাদ করে যোগ করে দিলেন সুপরিচিত বাংলা ছড়াটি :

আমার কথাটি ফুরলো
নটে গাছটি মুড়লো,
কেনরে নটে মুড়লি,
ছাগলে কেন খেলো।
কেনরে ছাগল খেলি,
মালি কেন ঘাস দেয় না।
কেনরে মালি ঘাস দিস না
পিঁপড়ে কেন কামড়ায়।
কেনরে পিঁপড়ে কামড়াস।
কুটুস কুটুস কামড়াবো,
গর্তের মধ্যে সেঁধুবো।

ছড়াটি উদ্ধৃত করে স্বামীজী যা বললেন, তাতে ও-ছড়া আর ছেলে ভুলানো রইল না : —"গল্পের শেষে বলা হয় ঘুমপাড়ানি ছড়াটি। ছড়াটি আমাদের সকলের পক্ষে সত্য! আমাদের জীবনের এইসব ঝঞ্ঝাট—এগুলো নিছক পিঁপড়ের কামড—নয় কি?"

স্বামীজীর চিঠি থেকে দিনচর্যাগুলো আরো দেখা যাক :

"[৬ জুলাই, ১৯০১]। খুব সকালে উঠে ছাগলের দুধ দুই, তাদের খাওয়াই। একটা পুতপুতে কুকুরছানা, আর চমৎকার কালো একটা ছাগলছানা আমার খুব প্রিয়। একজোড়া ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করি। গরম বেড়ে ওঠে—দশটা পর্যন্ত একটা ক্যাম্পখাটে শুয়ে থাকি। দুটো মস্ত আমগাছ, একটা কাঁটালগাছ ও একটা নিমগাছ মিলে মঠবাড়ির সামনে সুন্দর ছায়াকুঞ্জ তৈরী করেছে—তার তলাটি আমার খুব পছন্দের জায়গা। ফলের সময় শেষ হয়ে গেছে। দুটো গাছের হাজার কয়েক আম আমরা খেয়েছি। এখনো কিছু কাঁটাল আছে। তুমি কাঁটাল দেখোনি, বিরাট ফল, কোনো-কোনোটি এত বড় হয় যে, তাগদওয়ালা লোকও তুলতে হিমসিম খেয়ে যায়।...এ হল সেরা আমের সময়। পৃথিবীতে এমন জিনিসটি হয় না। তারপর

নদীতে ইলিশ উঠছে। লিখছি আর দেখছি—ঘরের গায়ে ঢেউ ধাক্কা খেয়ে উছলে উঠছে। নীচে শত-শত মাছধরার নৌকা, সবাই ইলিশ ধরায় ব্যস্ত। আমাদের ইলিশ তোমাদের আমেরিকান ইলিশের চেয়ে বহুগুণে উৎকৃষ্ট। এমন পরিবেশে একটা বিরক্তিকর জিনিস আছে—বিরাট নদীর উপর দিয়ে ছোট-ছোট স্টিমারের অবিরাম যাওয়া-আসা। বড্ড শব্দ করে ওগুলো। এ বছর বর্ষা তেমন ঝেঁপে আসেনি. কয়েক পশলা হয়েছে মাত্র, যেখানে দরকার ছিল মুষলধারে বৃষ্টি। লোকে ভয় পাচ্ছে। আকাশভরা মেঘ কিন্তু বৃষ্টি নেই। দিবারাত্র অনর্গল বৃষ্টি হওয়া দরকার। তবে, মা-ই জানেন। এখনো বৃষ্টির আশায় আছি। বৃষ্টি অবশ্য আমার সয়না, সুতরাং আমার পক্ষে লাভই বলতে হবে। তবু, আমি দশ বছর কি আরো বেশিদিন বাংলার বৃষ্টি দেখিনি—তা দেখতে চাইছি। বাংলার গাছ-গাছালি কিভাবে বেড়ে ওঠে যদি দেখতে! এমন বাড় যে, বাগান পরিষ্কার রাখা যায় না—ঘাস আর আগাছা যেন লাফিযে-লাফিয়ে উঠে পড়ে।"

"[২ সেপ্টেম্বর, ১৯০১]। এখনো চাঁদ ওঠেনি, কিন্তু নদীতে সূর্যাস্তপরের আভা। আমাদের প্রবলা গঙ্গা (এখন এই বর্ষাকালে তিনি সত্যই প্রবলা) বাড়ির প্রাচীরে আছড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আবছা অন্ধকারে অগণিত নৌকা এপাশে-ওপাশে ওঠানামা করছে, ইলিশ ধরবে তারা।.. বাইরে বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। যে-মুহূর্তে বৃষ্টিঝরা থামে, আমার সর্বাঙ্গ ঝরে তখন—এমনই গরম। সারা গা ঘামাচিতে ভরা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কোনো মহিলা এখানে নেই। এই অবস্থায় যদি ঢাকাঢুকি দিয়ে থাকতে হত তাহলে পাগলা হয়ে যেতাম।...রাত্রে আজ আহার নয়, দুপুরে বেশ খানিক ইলিশ খেয়েছি। তারপর আমাকে [লেখার] বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত ভেবে যেতে হবে। আর কতকগুলি বিষয় আমি শুয়ে-শুয়ে সবচেয়ে ভাল ভাবতে পারি, কারণ তাহলে গোটা ব্যাপারটি স্বপ্নে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।"

"[৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০১]। হাঁ, বৃষ্টি এসে গেছে, পূর্ণবেগে। মুষলধারে বৃষ্টি—দিনরাত ঝরছে—ঝরছে—ঝরছে! নদী ফুলে ফেঁপে উঠে দুকূল ভাসিয়ে ছুটেছে, পুকুর-দীঘি একাকার। মঠের জমির জল বার করার জন্য গভীর নর্দমা কাটা হচ্ছে, সে কাজে হাত লাগিয়ে এই ফিরেছি। কোনো-কোনো জায়গায় জল কয়েক ফুট দাঁড়িয়ে যায়। আমার বিশালকায় সারসটি, সেইসঙ্গে রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলি মহা স্ফূর্তিতে আছে। আমার পোষা কৃষ্ণসার মৃগটি মঠ থেকে পালিয়েছিল. তাকে খুঁজে বের করতে কয়েকদিন বেশ উদ্বেগে গেছে। গতকাল দুর্ভাগ্যক্রমে একটি পাতিহংসী মারা গেছে। প্রায় সপ্তাহখানেক তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের এক রহস্যপ্রিয় প্রবীণ সাধু বললেন, 'মশায়, এই কলিযুগে বেঁচে সুখ নেই—যখন হাঁসেরও জলে সর্দি লাগে আর ব্যাঙ হাঁচতে শুরু করে।' একটি রাজহংসীর পালক খসে যাচ্ছিল। অন্য কোনো প্রতিকার জানা না থাকায়, একটা টবের জলে সামান্য কার্বলিক এসিড মিশিয়ে, কয়েক মিনিটের জন্য তাকে তাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—উদ্দেশ্য এস্পার-ওস্পার। যাহোক, সে এখন ভালই আছে।"

একদেহে স্বামীজী বহু দেহ ধারণ করেছিলেন, এক ক্ষণে—অনন্ত ক্ষণ। তাঁর মাত্র কয়েক বছরের জীবন বহু জীবনের সমাহার। তাই নানা ভাবের তরঙ্গস্রোত নূতন-নূতন আবেগে আহ্বানে উচ্ছ্বাসে দেহতটে আছড়ে পড়ত। এই হয়ত প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে আছেন, যেকথা কয়েকবছর আগে এক পত্রে লিখেছেন (৬ জুলাই, ১৮৯৬)—তারই মূর্ত বিগ্রহ—লীলায় মাতোয়ারা : "কোনো-কোনো দিন ভাবোন্মাদ হয়ে পড়ি। মনে হয়, আশীর্বাদ করি সকলকে, প্রতিটি বস্তুকে; সবকিছুকে ভালবেসে আলিঙ্গন করি। পরিষ্কার দেখতে পাই, কোনো কিছুকে যদি বলি পাপ, সেটা মতিভ্রম। তেমনি ভাবের ঘোরে আছি এখন।...আশীর্বাদ করি সেই দিনটিকে যেদিন জন্মেছি। এখানে এসে কতনা দয়া আর ভালবাসা পেয়েছি! যে-অনন্ত প্রেম

থেকে আমার আবির্ভাব, তাই আমার প্রতিটি কাজকে, ভাল বা মন্দ (মন্দ শুনে ভয় পেয়ো না), নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। কারণ আমি তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি—কোন্ কালেই বা তাছাড়া অন্যকিছু ছিলাম! তাঁরই সেবায় ছেড়েছি সর্বকিছু, ছেড়েছি প্রিয়জনদের—আমার সুখকে—আমার জীবনকে। তিনিই আমার লীলাময় প্রেমিক, আমি তাঁর খেলার সাথী। এই জগতের কান্ডকারখানার কোনো কারণ নেই—তিনি কি কারণে বাঁধা পড়েন?—সব তাঁর খেয়াল, তাঁর খেলা। খেলার রাজা খেলছেন গোটা নাটক জুড়ে, হাসি নিয়ে আর কান্না নিয়ে। ভারি মজা, ভারি মজা! এ বড়ো মজার জগৎ—আর মজার রাজা তিনি—অনন্ত প্রেমের প্রভু। মজা! মজা! ভাই বলো, সাথী বলো, তারা সবাই স্কুলের ছেলের মতো—জগতের ক্রীড়াক্ষেত্রে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর তারা চেঁচামেচি করছে। তাই নয় কি? কাকে ভাল বলব, কাকে মন্দ—সবই তো তাঁর খেলা। লোকে ব্যাখ্যা চায়—তাঁকে ব্যাখ্যা করা যায় বুঝি? তাঁর মাথা-মুন্ডু নেই, বিচারের ধারে-কাছে যান না। আমাদের মাথায় একটু-আধটু যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তিনি আমাদের বেকুব বানিয়েছেন! এবার কিন্তু আর ঠকাতে পারছেন না, খুব হুঁশিয়ার আছি। দুটি-একটি বিষয় শিখে নিয়েছি: যুক্তিবিচার, বিদ্যাবুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বর থেকে দূরে, অনেক দূরে রয়েছে—ভাব, যার নাম প্রেম। আঃ সাকি! পেয়ালা পূর্ণ করো—প্রেমমদিরা পানে পাগল হয়ে যাই!"

চঞ্চল খেলার জগতে নাচ-গানের মধ্যে কখনো-বা তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। দেহত্যাগের ঠিক আটদিন পূর্বের ঘটনা—২৭ জুন: "শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল—স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মেজেতে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। মুখ অপূর্বভাবে পূর্ণ, যেন চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ একেবারে স্থির।...স্বামীজীর সেই ধ্যানস্থ মূর্তি দেখিয়া সে অবাক হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল, এবং বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও স্বামীজীর বাহ্য হুঁশের কোনো চিহ্ন না দেখিয়া নিঃশব্দে ঐস্থানে উপবেশন করিল। আরও অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে স্বামীজীর ব্যবহারিক জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের যেন একটু আভাস দেখা গেল; তাঁহার বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ-সাত মিনিট বাদেই স্বামীজী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'কখন এলি?'" [৯-২৫৬]।

আরও কয়েক মাস আগেকার ঘটনা। জগৎরহস্যের মধ্যে বিস্ফারিতনেত্র বিবেকানন্দের এক বর্ণনা এই:

"কিছুক্ষণ পরে শিষ্য ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আজ অমাবস্যা, আঁধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে—আজ কালীপূজার দিন।' স্বামীজী শিষ্যের ঐ কথায় কিছু না বলিয়া জানালা দিয়া পূর্বাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, 'দেখছিস, অন্ধকারের কি এক অদ্ভুত গম্ভীর শোভা!' কথা কয়টি বলিয়া সেই তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে-দেখিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখন সকলেই নিস্তব্ধ, কেবল দূরে ঠাকুরঘরে ভক্তগণপঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তবমাত্র শিষ্যের কর্ণগোচর হইতেছে। স্বামীজীর সেই অদৃষ্টপূর্ব গাম্ভীর্য, ও গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে বহিঃপ্রকৃতির নিস্তব্ধ স্থিরভাব দেখিয়া শিষ্যের মন একপ্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইবার পরে স্বামীজী আস্তে-আস্তে গাহিতে লাগিলেন:

> 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি,
> তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।'

গীত সাঙ্গ হইলে স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে-মধ্যে 'মা মা কালী কালী' বলিতে লাগিলেন। ঘরে আর তখন কেহই নাই। কেবল শিষ্য স্বামীজীর আজ্ঞা-পালনের জন্য অবস্থান করিতেছে। স্বামীজীর সেই সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতে

লাগিল, তিনি যেন এখনো কোন্ এক দূর দেশে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া পীড়িত হইয়া বলিল, 'মহাশয় এইবার কথাবার্তা বলুন।' স্বামীজী তাহার মনের ভাব বুঝিয়াই যেন মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'যাঁর লীলা এত মধুর, সেই আত্মার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য কত দূর বল দিকি?' শিষ্য তখনো তাঁহার সেই দূর-দূর ভাব সম্যক্ অপগত হয় নাই দেখিয়া বলিল, 'মহাশয়, ওসব কথায় এখন আর দরকার নাই। কেনই বা আজ আপনাকে অমাবস্যা ও কালীপূজার কথা বলিলাম—সেই অবধি আপনার যেন কেমন একটা পরিবর্তন হইয়া গেল।' শিষ্যের ভাবগতিক দেখিয়া স্বামীজী গান ধরিলেন : 'কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী—কালী সুধা-তরঙ্গিণী।' " [৯-২১৫-১৬]।

দ্বৈতের লীলা আস্বাদন ভক্তরা করেন, সে লীলায় মাতোয়ারা রূপের কথা আমরা জানি. কিন্তু অদ্বৈতের সাক্ষাৎ অনুভূতির সঞ্চার বিরলদৃষ্ট—স্বামীজী একদিন কিভাবে তা করেছিলেন, তার আশ্চর্য এক সংবাদ 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে'ই আছে। এও স্বামীজীর জীবনের শেষ পর্বের ঘটনা। স্বামীজী উদ্দীপ্ত হয়ে পৌরুষ-বীর্যের কথা বলছিলেন : "হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে, 'আমি বীর্যবান্, আমি মেধাবান্, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান্' বলতে-বলতে দাঁড়িয়ে উঠব।"

তারপর :

"ঐরূপ বলিতে-বলিতে স্বামীজী নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে আমগাছ আছে, তাহারই তলায় একখানা ক্যাম্পখাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন, অদ্যও সেখানে আসিয়া পশ্চিমাস্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তখনো ফুটিয়া বাহির হইতেছে। উপবিষ্ট হইয়াই উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে দেখাইয়া তিনি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন : 'এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। একে উপেক্ষা ক'রে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয় ধিক তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখতে পাচ্ছিস্ নে?—এই—এই—!'

"এমন হৃদয়স্পর্শীভাবে স্বামীজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে 'চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে'—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাই। স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুরঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামীজী 'এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম' বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল, একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও তখনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'যা, এখন ঠাকুরপূজায় যা!' স্বামী প্রেমানন্দের তবে চেতনা হয়। ক্রমে সকলের মনই আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার কর্মে গমন করিল।" [৯—২২০-২১]।

অথচ স্বামীজী স্বয়ং এলোমেলো হয়ে পৃথিবীর উপর ঔদাসীন্যের পদক্ষেপ করছিলেন। শিষ্য একদিন দেখলেন, আহিরিটোলায় গঙ্গার ঘাটের দিকে হাঁটছেন একজন, তাঁর বাম হাতে শালপাতার ঠোঙায় চানাচুর, বালকের আনন্দে তা খাচ্ছেন—লোকটি আবার সন্ন্যাসী। কাছে এলে দেখা গেল, তিনি অন্য কেউ নন, স্বয়ং বিবেকানন্দ! আর বিবেকানন্দ যখন, তখন অবশ্যই উদার; শিষ্য প্রণাম করা মাত্র তাঁকে উক্ত সুখভোজ্য বস্তুটি উপহার দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন : "চারটি চানাচুর ভাজা খা-না—বেশ নুন-ঝাল আছে।" [৯-২৪৯]। এর কিছুদিন আগেই স্বামীজী এক পত্রে লিখেছেন, "আমি অলিভার টুইস্টের মতো—সর্বদাই আরও চাই, আরও চাই করছি।...আমি ফকির ভিখারী।" [৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০১; প্রবুদ্ধ ভারত, মে,

ভিখারী কিন্তু অহংকারযোগে আত্মবিশ্বাসী। মাসখানেক আগে [৬ অগস্ট, বলেছেন : "আমি খুব উত্তেজনাপ্রবণ; আবার ধৈর্য ধরে অপেক্ষাও করি; আর আমটি আমার ঠিক মুখে এসেও পড়ে।" এই সুখ-দুঃখ, পাওয়া না-পাওয়ার আলোছায়া

আসল কথাটি ঢেকে রাখতে পারেনি। শেষপর্যন্ত বলেই ফেললেন : "আমি সুখে থাকার চেষ্টা করছি না। কেন করব? কেন মানুষ সুখী হওয়ার মতো অসুখীও হবে না—যখন দুটোই অর্থহীন—কেবল সময় কাটানোর ছল।" [সেপ্টেম্বরের শেষ, ১৯০১; প্রবুদ্ধ ভারত মে ১৯৭৮]। তাই যদি হয়, তাহলে ভাল ক'রে গেয়েই যাইনা কেন অভিমানের বিদায়গান :

"শিষ্য—আচ্ছা মহাশয়, আপনি ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত অন্য সকলের কথাই বলেন। আপনার নিজের সম্বন্ধে ঠাকুর যা বলিতেন, সেকথা তো কোনোদিন কিছু বলেন না?

"স্বামীজী—আমার কথা কি বলব? দেখছিস তো, আমি তাঁর দৈত্যদানার ভিতরকার কেউ-একটা হব। তাঁর সামনেই কখনো-কখনো গালমন্দ করতুম—তিনি শুনে হাসতেন।

"বলিতে-বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল স্থির-গম্ভীর হইল। গঙ্গার দিকে শূন্যমনে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। দেখতে-দেখিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে নৌকাও মঠে পৌঁছিল। স্বামীজী তখন আপন মনে গান ধরিয়াছেন :

"[কেবল] আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র সার হল
এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।" [৯—২৫৩-৫৪]

এই অভিমান-বিষণ্ণ বালকের উদাস কণ্ঠস্বরের পিছনে উদ্যত হয়ে ছিল তৃতীয় নয়নের অগ্নিহাস্য। "উটপাখির মতো বালিতে মুখ লুকিয়ে ভাবছ, কেউ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না?" উটপাখির মতো আত্মবঞ্চনার জগৎ নয়—সত্যের নির্মম নগ্ন রূপের সম্মুখীন হও। "লোকে চায় চিরন্তন স্বর্গ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—তিনি ছাড়া চিরন্তন আর কিছু নেই। নিশ্চিত জানি, একমাত্র তিনিই সহ্য করতে পারেন—চিরন্তন নিরর্থকতাকে।" যখন চারপাশে গুঞ্জন উঠছে, যা শীঘ্রই গর্জনে পরিণত হতে পারে, তখন স্বামীজী "সকল বোধের অতীত এমন এক শান্তি"কে পেয়েছিলেন, যা আনন্দ বা দুঃখ—সকলেরই ঊর্ধ্বে। "দুই বৎসর ধরে মৃত্যু-উপত্যকার উপর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্রার ফলে" ঐ জগতে তিনি উত্তীর্ণ।—

"এখন আমি সেই মহাশান্তি—অনন্ত নীরবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন আমি বস্তুকে তার স্ব-স্বরূপে দেখছি—সবকিছু সেই শান্তিতে বিধৃত—পূর্ণ নিজ ভাবে। 'যিনি আত্ম-তৃপ্ত, আত্মরতি, তাঁরই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে'—এই মহান শিক্ষাকে লাভ করতে হয় অসংখ্য জন্ম-মৃত্যু স্বর্গ-নরকের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে—আত্মা ছাড়া আর কিছু আকাঙ্ক্ষার বিষয় হতে পারে না। 'আত্মাকে লাভ করাই শ্রেষ্ঠ লাভ।' 'আমি মুক্ত।' তাই আমার আনন্দের জন্য অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। 'অসীমে একাকী আমি, কারণ মুক্ত আমি—ছিলাম মুক্ত—চিরদিন থাকব মুক্ত।' এই হল বেদান্ত। এতকাল এই মত প্রচার করেছি—আর এখন—আঃ কি আনন্দ!—প্রতিদিন তাকে উপলব্ধি করছি! হাঁ, হাঁ, আমি মুক্ত, মুক্ত! আমি একা—একা—অদ্বিতীয়!...হাঁ, এখন আমি খাটি বিবেকানন্দ হতে চলেছি। কখনো মন্দকে উপভোগ করেছ? হাঃ হাঃ, হে নির্বোধ বালিকা, কি বললে তুমি?—সবকিছু ভালো? ফুঃ! বলো, ভালো আছে, মন্দ আছে। হাঃ হাঃ! আমি ভালোকে ভোগ করি মন্দকে ভোগ করি। আমি যীশু, আমি জুডাস! দুইই আমার মজা, আমার খেলা। হাঃ হাঃ।" [৮—২১৪-১৫]।

৪ঠা জুলাই, ১৯০২, রাত্রি ৯টার কয়েক মিনিট পরে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেন।

॥ ৬ ॥

আমি জানি, স্বামী বিবেকানন্দের মতো জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই নিত্য মুহূর্ত—তবু, তাঁর বিদায়কালের নিকটবর্তী সময়ে তাঁকে কিভাবে দেখা গিয়েছিল, জানতে বিশেষ ইচ্ছা হয়। অবশ্য সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া শক্ত, কেননা কেউই তাঁর দেহান্তের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, যদিও ইঙ্গিত তিনি যথেষ্টই দিয়েছিলেন। আমি প্রাপ্তব্য সংবাদসূত্রগুলি

থেকে স্বামীজীর জীবনের শেষ সপ্তাহের বিবরণ যথাসম্ভব সংকলন করতে চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে সংবাদ-উৎস হিসাবে আমি স্বামীজীর প্রামাণ্য ইংরাজি ও বাংলা জীবনীগুলি, ভগিনী নিবেদিতার পত্র ও প্রবন্ধ, উদ্বোধন পত্রিকার ১ শ্রাবণ, ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামীজীর দেহত্যাগ সংবাদ, নব্যভারত পত্রিকার আশ্বিন, ১৩০৯ সংখ্যায় শ্রীম-লিখিত "স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রচারকার্য" প্রবন্ধের শেষাংশে স্বামীজীর দেহত্যাগ সংবাদ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী নিত্যানন্দ-লিখিত পত্র প্রভৃতিকে ব্যবহার করেছি।

স্বামীজীর দেহত্যাগের দিন স্বামী প্রেমানন্দ মঠেই ছিলেন। সুতরাং তাঁর বিবরণ একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর। তাই এইসূত্রে স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত তাঁর ৩০ অগস্টের পত্রটি অতিমূল্য। অবশ্য পত্রে ঘটনার বিবরণ দেবার সময়ে তিনি প্রতিটি ঘটনা ক্রম-অনুসারে সাজিয়েছিলেন, এমন মনে হয়না। স্বামী সারদানন্দ, যদিও স্বামীজীর দেহত্যাগকালে মঠে ছিলেন না, কিন্তু রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে এসে হাজির হন, এবং সেইসময়ে ও পরে খুঁটিনাটি সব জেনে নেন। তিনি স্বভাব-সতর্ক মানুষ; তাই অভেদানন্দকে লেখা তাঁর ৭ অগস্টের চিঠির গুরুত্ব যথেষ্ট—যে-গুরুত্ব আছে উদ্বোধনের মহাসমাধি বিবরণেরও, কারণ মনে হয় ঐ বিবরণ কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা—হয়ত স্বামী শুদ্ধানন্দের। তাছাড়া সংঘ পত্রিকায় ওহেন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছাপবার সময়ে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল, ধরে নিতে পারি। নিবেদিতা দেহত্যাগের পরদিন উপস্থিত হলেও তাঁর পাশ্চাত্যস্বভাব অনুযায়ী বিচক্ষণতার সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন, এবং সাবধানতার সঙ্গে তা পরিবেশন করেন। শ্রীম সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে পরে সংবাদ জোগাড় করে লিখেছিলেন। স্বামী নিত্যানন্দ বেলুড় মঠ থেকে ২৭ আষাঢ় ১৩০৯, এক পত্রে স্বামীজীর দেহত্যাগ সংবাদ দেন (উদ্বোধনে শ্রাবণ ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত)। কিন্তু তিনি ঐদিন মঠে উপস্থিত ছিলেন কিনা জানিনা, সম্ভবতঃ ছিলেন না, এবং বর্ণিত ঘটনাগুলির সময়জ্ঞাপনে যথেষ্ট সতর্ক হননি। স্বামীজীর ইংরাজি জীবনীর বিবরণ বিভিন্ন সংবাদ যাচাই ক'রে প্রস্তুত—সুতরাং তার আপেক্ষিক নির্ভরযোগ্যতা অধিক। প্রমথনাথ বসু বা স্বামী গম্ভীরানন্দ ইংরাজি জীবনীর উপরে বিশেষ নির্ভর করেছেন।

সকল সংবাদসূত্র থেকেই পাওয়া যায়—দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব হতে স্বামীজীর শরীর অপেক্ষাকৃত ভালো হয়ে উঠেছিল। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ উভয়েই তাঁদের ঐকালীন পত্রে সেকথা জানিয়েছেন। ['যুগনায়ক'-এ (৩য়) উদ্ধৃত, ৪৬১, ৪৬৪]। 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে'ও তা আছে : "কবিরাজী ঔষধে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক শুদ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া থাকায় স্বামীজীর শরীরে আজকাল যেন চন্দ্রকান্তি বাহির হইতেছে, এবং তাঁহার সুবিশাল নয়নের জ্যোতি অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।" [৯-২১৩]। ১৯০১-এর শেষভাগের এই বিবরণ। আরও কয়েকমাস পরেও একই অবস্থা বজায় ছিল। নিবেদিতা লিখেছেন : [২৮.৮. ১৯০২-এর চিঠি?] "নিরাময়ের জন্য কঠোর চেষ্টা করেন। উষ্ণতম তিনমাস তাঁকে একবিন্দু জল খেতে দেওয়া হয়নি—কেবল দুধের উপর রাখা হয়। তাঁকে জ্যোতির্ময় দেখাত, লন্ডনে যেমন দেখেছি।" এই সঙ্গে নিবেদিতা যোগ করেন : "এই মাসগুলিতে তিনি মঠের সকলকে রাত সাড়ে তিনটে-চারটেয় তাগিদ দিয়ে উঠিয়ে দিতেন। গঙ্গা স্নান করে তাদের মন্দিরে বসতে হত ধ্যানের জন্য। কিন্তু তাঁর স্নায়ু জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল —উন্নতি কেবল শরীরের। শরীর মন বা স্নায়ুর অবস্থা যাই হোক না কেন, অপরূপ ঐশ্বরিক আলোক অপ্রতিহতভাবে দীপ্ত হতে দীপ্ততর হয়েছে।" শেষ দিনগুলির প্রবল বৈরাগ্যভাবের কথা প্রেমানন্দ ও সারদানন্দও তাঁদের পত্রে বলেছেন। "প্রায় দুই মাস হতে ছেলেদের নিয়মিত ধ্যানভজন করাতেন, এবং নিজেও উহাতে যোগ দিতেন। কিছুদিন হতে বৈরাগ্যের ভাব খুব প্রবল দেখতুম। 'কিমর্থং কস্য কামায় শরীরং অনুসঞ্জরেৎ'—প্রায় এই শ্লোক আওড়াইতেন।

আর জিজ্ঞাসা করতেন—'হাঁরে, ঠাকুর কোন্ দুটি গান শেষে শুনতে ভালবাসতেন?'—বলে 'ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী', ও 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে'—এই গানগুলি গাহিতেন।" [প্রেমানন্দের পত্র, ২০ অগস্ট, ১৯০২]। "ইদানীং পূর্বের ন্যায় বৈরাগ্যভাবটা খুব প্রবল হইয়াছিল। রাত্রি ৪টার সময় সকলকে লইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া জপ-ধ্যান করিতেন এবং সর্বদাই বলিতেন, 'আমার কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে. এখন তোরা সব দ্যাখ শোন, আমায় ছুটি দে।' কখনও বলিতেন, 'আমার মৃত্যু শিয়রে; কাজকর্ম ও খেলা ঢের করা গিয়াছে, যা কাজ করিয়া দিয়েছি তাই এখন জগৎ নিক, তাই বুঝতে এখন ঢের দিন লাগবে। ও-খেলা কি চিরকাল করতে হবে? ও করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি।" [সারদানন্দের পত্র, ৭ অগস্ট, ১৯০২]।

দেহত্যাগের "দু'চার দিন আগে" স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী বলেছিলেন—[সারদানন্দ জানিয়েছেন] "এবার যা হয় একটা এস্পার-ওস্পার করিব; হয় শরীরটা ধ্যান-জপ করিয়া সারিয়া, কাজে ভালো করিয়া লাগিব, না হয় তো ভগ্নশরীর ছাড়িয়া দিব।" এই কথাগুলি আমাদের আলোচ্য শেষ সপ্তাহটির মধ্যেই পড়ে, কিন্তু ঠিক কোন্ দিন বলেন জানিনা। দেহ-ত্যাগই অভিপ্রেত, তার অনেক ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের শিষ্যদের দেখবার জন্য খুবই উৎসুক ছিলেন, সেই মর্মে অনুরোধও জানিয়েছেন। নিবেদিতা লিখেছেন : মৃত্যুর অল্পদিন আগে গুরুভাইরা পুরনো দিনের কথা আলোচনা করছিলেন। একজন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "স্বামীজী, তুমি এখন জানতে পেরেছ তুমি কে?" স্বামীজী অপ্রত্যাশিত উত্তর দেন : "হাঁ, জেনেছি।" [ইংরাজি জীবনী, ৪র্থ, ৭০] এই উত্তর স্তম্ভিত করে দিয়েছিল গুরুভাইদের, কারণ এই জানার অর্থ তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই শুনেছেন। "ও নিজেকে জানতে পারলে আর থাকবে না।" সদানন্দ, স্বামীজীর দেহত্যাগের দু'মাস আগে বাইরে চলে যান। স্বামীজীকে শেষ দেখা আর তাঁর হয়নি। কিন্তু শেষের সুর তিনিও শুনে গিয়েছিলেন। "৪ মে তারিখে চলে যাবার আগেই সদানন্দ বুঝেছিলেন, কিছু ঘটবে, কারণ স্বামীজীর করুণা 'অসম্ভব-রকম বেড়ে গিয়েছিল।' খুব নত কোমল ও লাজুকভাবে তিনি তাকাতেন, নিজের মনে হাসতেন। ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন—'এবার ও চলে যাবে, ঠাকুরের মতোই, কারণ প্রতিদিন ঠাকুরকে দেখছি ওর মধ্যে।'" [নিবেদিতার ২৮. ৭. ১৯০২, চিঠি]।

ইঙ্গিত অনেকই ছিল, আভাসে অনেকেই বুঝেছিলেন, তবু বোঝেননি। নিবেদিতা লিখেছেন : "আমরা কি অধিকন্তু স্মরণ করিনি—তাঁর যৌবনের সেই অসাধারণ নির্বিকল্প সমাধির কথা—যার অন্তে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : 'এই তোমার আমটি। একে বাক্সবন্দী ক'রে রাখলুম। কাজ শেষ ক'রে আবার এটি খাবে।' এই কাহিনীর কথক সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিলেন, 'তার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি; আমরা জানতে পারব, কখন তার সময় হয়েছে; কারণ তিনিই বলে দেবেন—আমটি আবার তিনি খেয়েছেন।' কি বিচিত্র, পিছনের দিকে ফিরে, সেই সময়টির প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে, আমরা বুঝতে পারি—কতভাবে প্রত্যাশিত ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন, তা ধ্বনিত হয়েছিল কর্ণে কিন্তু পশেনি সেখানে, উপনীত হয়েছিল মনের দুয়ারে—সে দ্বার রুদ্ধ ছিল।"

বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে শেষ সপ্তাহ সম্বন্ধে যেসব সংবাদ পেয়েছি, এবার তারিখ অনুযায়ী যথাসম্ভব সেগুলি পরিবেশন করব। স্বাভাবিকভাবে সর্বাধিক সংবাদ মিলেছে শেষ দিনটি, অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই সম্বন্ধে। পূর্ববর্তী কয়েকদিনের সংবাদের বড়ো অংশ মিলেছে নিবেদিতার চিঠিপত্র থেকে।

২৮ জুন, শনিবার : প্রমথনাথ বসুর লেখা স্বামীজীর বাংলা জীবনীতে আছে, স্বামীজী দেহত্যাগের এক সপ্তাহ আগে স্বামী শুদ্ধানন্দকে বাংলা পাঁজি আনতে বলেন, এবং সেই-

দিনের তারিখ থেকে পরবর্তী কতকগুলি পাতা উল্টে, পাঁজিটি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে দেন। অতঃপর কয়েকদিনে তাঁকে নিবিষ্টচিত্তে পাঁজির পৃষ্ঠা ওল্টাতে দেখা গেছে; মনে হত, তিনি বিশেষ দিনের অনুসন্ধান করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকেও এইভাবে দেহত্যাগের আগে পাঁজির দিন সন্ধান করতে দেখা গিয়েছিল।

[পাঁজি আনানোর দিনটি আমরা এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ২৮শেই ধরছি, যদিও ইংরাজি জীবনীর চতুর্থ খণ্ডে ঐ দিনটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে "প্রায় একসপ্তাহ আগে।" প্রথমনাথ বসুর বই স্বামী শুদ্ধানন্দ পুরো দেখে দিয়েছেন বলে, এবং শুদ্ধানন্দই পাঁজি এনেছিলেন বলে তারিখটি প্রমথনাথ বসুর বই থেকেই গ্রহণ করছি।]

স্বামী ব্রহ্মানন্দের ডায়েরিতে আছে—এইদিন সকালে স্বামীজী পারিবারিক মামলা-সূত্রে, সেইসঙ্গে নিমন্ত্রণ রাখতে, কলকাতায় গিয়েছিলেন : "স্বামীজী কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর বোনের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে হাবুল এল, সহমানে মিটিয়ে নেবার কথা বলল। যদি মীমাংসা হয়, তাহলে স্বামীজী আরও হাজার টাকা দেবেন বললেন। তারা রাজি হল। হাবুলের সঙ্গে পলটু বাবুর অফিসে গেলাম। শর্তাদি জানিয়ে ওদের অ্যাটর্নি মিঃ এন সি বসুর কাছে একটি চিঠি পাঠান হল। উত্তরে ওদের অ্যাটর্নি শর্ত স্বীকার করে চিঠি দিলেন।"

একই দিনে স্বামীজী নিবেদিতার আবাসেও গিয়েছিলেন। বোনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাবার আগেই সেখানে যান। নিবেদিতার চিঠিতে পাই (৭. ৮. ১৯০২) :

"শনিবার সকাল। মঠে যাব—খুব সকালেই চিরকুট এল—স্বামীজী শহরে আসছেন। ৯টার সময় এলেন। সমস্ত বাড়ি ঘুরে দেখলেন। সবকিছু ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। সবকিছু পরীক্ষা করলেন। তাঁর নিজস্ব কম্বলে বসলেন। কতকগুলি লখনৌ-পুতুল এনেছিলাম, সে-গুলি নাড়াচাড়া করলেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্র, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন এবং ক্যামেরা দেখে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন। পরদিন অনুবীক্ষণটি তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। আমার পরি-কল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বিদ্যালয়-এর পরিবর্তে 'ইউনিভার্সিটি সেটল্মেণ্ট ওয়ার্ক'-এর কথাই বললাম। তিনি বললেন—'হাঁ, ঠিক।' তিনি যাবার মুখে, আমি বললাম, স্বামীজী, আপনাকে আবার এসে কাজের প্রতি আশীর্বাদ জানাতে হবে।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে সর্বদাই আশীর্বাদ করছি।' দরজা বন্ধ করার পরে বেট-কে বললাম, 'বেট, সেই পুরনো মাধুর্য।'"

এই দিনটিতে দুটি প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদিত হয়েছিল। স্বামীজী পারিবারিক দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যেন শেষ বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। আর তিনি আশীর্বাদ করতে পেরে-ছিলেন নিবেদিতার আবাস ও কার্যক্রমকে। স্বামীজীর দেহান্তের পরে ভারতের বৃহত্তর সামাজিক জীবনে নিবেদিতা স্বামীজীর ভাববিস্তারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

২৯ জুন : **রবিবার** : এই দিনের সমস্ত বিবরণই নিবেদিতার চিঠি ও লেখা থেকে পাওয়া। নিবেদিতা এইদিন মঠে এসেছিলেন। সকাল আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ মঠে পৌঁছে সেখানে থাকেন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

নিবেদিতা 'জাতি' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় 'জাতি'র পক্ষে লিখে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন—১০০ টাকা। [সর্বভারতীয় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন : যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান যদুনাথ মজুমদার ('হিন্দু' ও ব্রহ্মচারিন্' পত্রিকার সম্পাদক), বিচারক ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং যদুনাথ মজুমদার। বিচারকগণ ঐকমত হয়ে তাঁকে প্রথম করেন]। পুরস্কারের টাকা নিবেদিতা পাওয়ামাত্র মঠে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজী ভারি খুশি হন। এইদিন তিনি "আমাদের ছোট্ট মার্গটের"

কৃতিত্বে আনন্দপ্রকাশ করেন।

পূর্বদিন পারিবারিক মামলার যে নিষ্পত্তি হয়েছিল, সে সংবাদও এইদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে দেন, এবং বলেন—অপরপক্ষ তাঁর অনুকূলে আপসে মিটিয়ে নিয়েছে। নিবেদিতা জানতেন, ব্যাপারটা কয়েক বছর ধরে স্বামীজীকে কতখানি যন্ত্রণা দিয়েছে। সুতরাং নিষ্পত্তির কথা শুনে তাঁরও মনের ভার লাঘব হয়।

"স্বামীজী রুটি তৈরীর এক্সপেরিমেণ্ট সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।"

"স্বামীজীকে খুবই ভাল দেখাচ্ছিল।" সুতরাং নিবেদিতা নানা ধরনের প্রয়োজনীয় ও জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ পান। স্বামীজীর ভালো মেজাজ দেখে, সুযোগ বুঝে নিবেদিতা অভিযোগ ক'রে বলেন, "সদানন্দের কাছে আমার সম্বন্ধে অভিযোগ করে আপনি ভুল কাজ করেছেন। ওব ফলে সে মায়াবতীতে গিয়ে ঝঞ্চাট বাধিয়েছিল।" শুনে স্বামীজী এইমাত্র বলেন, "মার্গট, সে তোমায় ভালবাসে। বিশ্বস্ত কুকুরের মতো সে তোমাকে অনুসরণ করতে চায়। এবং সে ঈর্ষা বোধ করেছে।" নিবেদিতা দেখলেন, স্বামীজী শুধু এই কথাগুলি বললেন, কিন্তু কোনো সতর্কীকরণ বা তিরস্কার করলেন না।

এইদিন মিস ম্যাকলাউড প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন—"প্রেমের মতোই প্রেমময়ী সে!"

শিক্ষাবিষয়ক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠেছিল। আগেই বলেছি, নিবেদিতা ও ওকাকুরা ভারতে গুপ্ত রাজনৈতিক কাজে জোট বেঁধেছিলেন, এবং স্বামীজী নানা কারণে (কোন্ সঙ্গত কারণে, তা 'নিবেদিতা লোকমাতা'র এক খণ্ডে বিশ্লেষণ করব) নিবেদিতার ঐ কার্য অনুমোদন করেন নি; তা নিয়ে উভয়ের তীব্র মনকষাকষি হয়। এইদিন সেই প্রসঙ্গ নিবেদিতা তোলেন। সেইসঙ্গে পুনায় বা অন্যত্র বিধবাশ্রম ইত্যাদি স্থাপনের যে-প্রস্তাব ছিল, যা গোড়ায় স্বামীজীর অনুমোদন পেয়েছিল—সে প্রসঙ্গও ওঠে।

স্বামীজী বলেছিলেন : "ভারতে বিধবা ও অনাথদের জন্য 'হোম' তৈরী করা ভ্রান্তির কাজ। ওতে ভালোর চেয়ে মন্দ হবে বেশি। মিশনারিরা ওকাজ করে। কিন্তু ওরা তাদের কিনে নেয়, আর আতঙ্কিত করে। মিশনারিদের পিছনে আছে অর্থ আর তরবারি।"

মিশনারিদের এই অর্থ ও তরবারির প্রতাপের মূলে ভারতের পরাধীনতা। নিবেদিতা সুযোগ বুঝে, সাগ্রহে বললেন : "হাঁ, বুঝছেন না, সেইজন্যই তো আমি বলি—অন্য প্রশ্নটির [অর্থাৎ স্বাধীনতা-প্রশ্নের] মীমাংসা প্রথমে করা দরকার। তারপর শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান।"

স্বামীজী বললেন, "তা বটে! তা বটে! হয়ত তুমিই ঠিক বলছ। কিন্তু আমি এখন মৃত্যুর একেবারে কাছে এগিয়ে চলেছি। এসব পার্থিব ব্যাপারে আর মন নামাতে পারব না।"

নিবেদিতার গোঁ আর জেদের সমালোচনাও স্বামীজী করেছিলেন। একবার সরবে বলেন : "মার্গট, আমি সবই বুঝেছি। এখন চলেছে তোমার এই-এই কনভিকশনের কাল। তোমার টেগোর-কনভিকশন্ ছিল। এখন তোমার এই [ওকাকুরা] কনভিকশন্। অন্যগুলি যেমন গেছে, এও যাবে।"

তাই বলে ওকাকুরার বিরুদ্ধে স্বামীজীর কোনোই ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল না [যে-অভিযোগ কিন্তু নিবেদিতা অল্পদিন পরে করতে শুরু করবেন]। তিনি ওকাকুরার বিষয়ে 'অনেক সহৃদয় উক্তি" করেন। বলেছিলেন, "যদি সুস্থ থাকতেন তাহলে জমি-প্রশ্নটির মীমাংসা অনেক আগেই হয়ে যেত।" নিঃসন্দেহে তা বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের কাছে জাপানী মন্দিরের জন্য জমি সংগ্রহের প্রশ্ন। ওকাকুরা জাপানের পক্ষে ঐ জমি পেতে চান। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজী যখন বুদ্ধগয়ায় যান, তখন নিশ্চয় প্রশ্নটি উঠেছিল। ওকাকুরা মনে করেছিলেন, স্বামীজী তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব প্রয়োগ করলে, তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ বুদ্ধগয়ার মোহন্ত রাজি হয়ে যাবেন।

স্বামীজী ওকাকুরা সম্বন্ধে এইদিন বলেন : "বালকটিকে আমি ভালবাসি। অমন ভালোত্ব ও মহত্ত্ব আমি দেখিনি।" নিবেদিতা মনে করেছেন : "এ হল ওকাকুরার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ।"

দুপুরের দিকে কথাবার্তার সময়ে কিন্তু স্বামীজী খুবই বিরক্তিবোধ করেন, হয়ত "শারীরিক ক্লান্তির জন্যই।" নিবেদিতা খুবই কান্নাকাটি করেন। "তখন স্বামীজী আমাকে [নিবেদিতা লিখেছেন] সুন্দর এক আশীর্বাদ করেন। আমার মাথা সাদরে দুহাতে ধরে দুবার আশীর্বাদ করেন—পুরনো রীতিতে। আমি কেবল তাঁকে বলেছিলাম, যখন তিনি আমার সম্বন্ধে সন্দেহ করবেন, অথবা আমার কাজ অনুমোদন করবেন না—তখন যেন সেকথা বলে দেন—আর তাঁর মন যেন আমার থেকে সরিয়ে না নেন।"

এইদিনই, সম্ভবতঃ সকালের দিকে, স্বামীজী বলেন : "বিরাট তপস্যা ও ধ্যান আমার উপর নামছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্দিরে কাটাই এখন। তুমি না থাকলে, প্রায় দুপুর পর্যন্ত মন্দিরেই থাকতাম। অনুভব করছি—এখন মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে গেছি।"

স্বামীজী যেই শেষের শব্দগুলি উচ্চারণ করলেন অমনি টিকটিকি ডেকে উঠল। "এখানে প্রচলিত কুসংস্কার—টিকটিকির ডাক সত্য হয়।" "স্বামীজী আরও তিন-চার বছর আছেনই" —নিবেদিতার মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল ছিল বলে তিনি উক্ত "কুসংস্কারের" কোনো গুরুত্বই দেননি।

নিবেদিতা "চলে আসার আগে স্বামীজী গভীর মাধুর্যের সঙ্গে আশীর্বাদ করেন।"

৩০ জুন, সোমবার : স্বামী ব্রহ্মানন্দের ডায়েরি থেকে এইদিনের সামান্যমাত্র সংবাদ পাওয়া গেছে :

"আমাদের স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বোন দুপুর ১২টার সময় এসেছিলেন।"

১ জুলাই, মঙ্গলবার : ইংরাজি জীবনীর চতুর্থ খণ্ডেই কেবল এইদিনের সংবাদ মিলেছে —কিন্তু সেটি তাৎপর্যপূর্ণ।

"বিকালে মঠের একজনের সঙ্গে যখন স্বামীজী মঠের প্রশস্ত মাঠের এপাশে-ওপাশে পায়চারি করছিলেন, তখন তিনি গঙ্গার ধারে একটি বিশেষ স্থান দেখিয়ে গম্ভীরভাবে বলেন, 'যখন আমার শরীর যাবে, তখন ঐখানে দাহ করবে।'" [তাই করা হয়; তারই উপর সমাধিমন্দির নির্মিত হয়েছে]।

২ জুলাই, বুধবার : এইদিনের সংবাদও প্রধানতঃ নিবেদিতাসূত্রে পাওয়া গেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দের ডায়েরি থেকে অতিরিক্ত এই জানা যায়, ব্রহ্মানন্দ-স্বামী "পল্টুকে শান্তিরামের কাছ থেকে নিয়ে ৪০০ টাকা দেন—হাবুল ও তমুর দাবি অনুযায়ী।" এটি স্বামীজীর পারিবারিক গৃহসংক্রান্ত চুক্তিমতো করা হয়।

নিবেদিতা বেট-এর [বাড়ির ইউরোপীয় পরিচারিকা] অসুস্থতা সত্ত্বেও মঠে যান। সকাল ৯টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ছিলেন। নিবেদিতা স্বামীজীর শরীর ভালো দেখে, এবং তাঁর সাবধানে থাকা প্রয়োজন বুঝে, উত্তেজনাবৃদ্ধি ঘটতে পারে, এমন কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। বেশিক্ষণ থাকতে পর্যন্ত চাননি সেজন্য। নিবেদিতা গভীর আপশোস ক'রে পরে লিখেছেন, যদি জানতাম কী ঘটতে যাচ্ছে অচিরে, তাহলে প্রতিটি অসাধারণ মুহূর্তকে কিভাবে না গ্রহণ করবার চেষ্টা করতাম।—অথচ "ঐ জানাটা কি না অসহ্য হত!"

বুধবার সকালে পিছন দিকের বারান্দায় বসে নিবেদিতার সঙ্গে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল —তখন স্বামীজী বিশেষভাবে লেগেট-পরিবারের কথা বলেন। স্বামীজী সম্পর্কে এই পরি

বারে ছিল অতুলনীয় বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য। স্বামীজী বলেছিলেন : "মিঃ লেগেটের মতো কোনো মানুষ কখনো ভালবাসেনি।" এইসূত্রে তিনি লেডী বেটীর [অর্থাৎ মিসেস লেগেটের] অসুখের জন্য মিঃ লেগেটের গভীর দুঃখ ও বেদনার উল্লেখ করেন। মিঃ লেগেটের চরিত্রের বহু গুণের কথাও বলেন—তাঁর সচ্চরিত্রতা, ব্যবসায়িক সাধুতা। "মিসেস লেগেটের ভাবাতিশয্য থেকে দূরে থাকার ক্ষমতা, এবং কোনটি যথার্থ বাঞ্ছিত, তা বেছে নেবার বিরাট প্রজ্ঞা"র উল্লেখও করেন। মিস ম্যাকলাউড সম্বন্ধে তিনি বলেন : "জো'র মধ্যে দুটি জিনিসের অসাধারণ মিশ্রণ ঘটেছে—এক, তার মধ্যে আছে শিশুসুলভ বিশ্বাস [বলাবাহুল্য সে বিশ্বাস স্বামীজী সম্পর্কেই। ঐ কথাগুলি স্বামীজী ধীরে বলেছিলেন, এবং "কত না কোমল মধুর হয়ে উঠেছিল কণ্ঠস্বর"]। অন্যদিকে ডাঃ এলমার গেটস্ সম্বন্ধে উদ্ভট সন্দেহ।" জো সম্বন্ধে আরও বলেন, "ও পবিত্রতার মতোই পবিত্র, মমতার মতোই মমতাময়ী।" নিবেদিতা দেখলেন, স্বামীজী অতীত-স্মরণ যখন করছিলেন, তখন ঐ পরিবার তাঁর মন জুড়ে ছিল—সে "অতীত তাঁর কাছে নিত্য বর্তমান।" [সন্দেহ নেই, এই পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই স্বামীজী লেগেটদের কথা নিবেদিতার কাছে বেশি করে বলেছিলেন]।

অন্যান্যদের কথাও উঠেছিল। দলত্যাগিনী অভয়ানন্দ তখন আবার এসেছেন ভারতে। স্বামীজী সহাস্যে তাঁর বিষয়ে কথা বলেছেন। যখন পুরনো কাহিনী বলতে গিয়ে মজার ভঙ্গিতে 'গেজেট' কথাটা বলেছিলেন, তখন নিবেদিতা বুঝলেন, স্বামীজী হেল ভগিনীদের কথাই ইঙ্গিত করেছেন। মঠের জীবজন্তুর কিছু গল্পও স্বামীজী করেছিলেন।

এই বুধবারেই একটি অতীব অর্থপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, যার তাৎপর্য তখনি নিবেদিতার কাছে প্রকটিত না হলেও অচিরে হয়েছিল—এবং তিনি বিস্ময়ে সম্ভ্রমে অভিভূত হয়েছিলেন। স্বামীজীর প্রতিটি জীবনীতেই সেই ঘটনাটি সন্ধ্যাতারকার মতো জ্বলজ্বল করছে।

এইদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে খেতে বলেছিলেন। দিনটি একাদশীর, স্বামীজী নিজে নিরম্বু উপবাস করেছেন। কিন্তু খাওয়াবার সময়ে পরিবেশন নিজেই করলেন। আয়োজন বাহুল্যহীন—সাদা ভাত, কাঁটালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, এবং বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা দুধ। খাওয়ার সময় নানা কৌতুক-গল্প করলেন। বাধা দেওয়া সত্ত্বেও পাখা নিয়ে নিজে বাতাস করতে লাগলেন সস্নেহে। ভোজনশেষে এমনকি হাতে জল ঢেলে, তোয়ালে দিয়ে হাত মুছিয়ে দিলেন।

অপ্রত্যাশিত এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার—শিষ্যার পক্ষে। নিবেদিতা স্বতঃই প্রতিবাদ করলেন। বললেন, "স্বামীজী, এ কী করছেন, যা-তা লাগছে। এসব কাজ তো আপনার জন্য আমারই করা উচিত।"

শুনে স্বামীজী হেসে উঠলেন। নিজস্ব বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললেন, "যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন!"

নিবেদিতার মুখে এসে গিয়েছিল—"কিন্তু সে তো শেষ সময়ে।"

কথাটা তিনি বলেন নি, মুখে আটকে গিয়েছিল। এবং ঐ দুটি ঘটনা যে সমরূপ, তাও তখন বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারেন নি—স্বামীজীর সকরুণ হাসির অর্থও। নিবেদিতার গড্-ফাদার' রমেশচন্দ্র দত্তর সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। সে সাক্ষাৎ হবার কথা নিবেদিতার আবাসে। সেই সূত্রে নিবেদিতা স্বামীজীকে বললেন : "আরও আট-দশ দিন লেগে যাবে বাড়িটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে, যাতে আপনি ও গড্ফাদার ওখানে সাক্ষাৎ করার জন্য উপস্থিত হতে পারেন।" স্বামীজী উত্তরে কোনো কথা বলেন নি, কেবল বেদনাঘন দুঃখের হাসি হেসেছিলেন।

নিবেদিতা পরে বুঝতে পারেন—স্বামীজী জানতেন, বুধবারই তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ—আর দেখা হবে না।

নিবেদিতা চলে যাবার সময়ে মনে কোনো ছায়া নিয়ে গেলেন না—সেখানে শুধু আনন্দ আর আলোক। "কী আশীর্বাদ! কী মাধুর্য! অবর্ণনীয়! অনির্বচনীয়!"

৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার : এইদিনের যৎসামান্য সংবাদ পেয়েছি নিবেদিতার চিঠিতে : "স্বামী সারদানন্দ আমার কাছে পুরো একটা তৈরী-করা ব্রাউন পাঁউরুটি আনলেন—স্বামীজী সেটি পাঠিয়েছেন। তার শেষ গুঁড়ো পর্যন্ত আমি খেয়েছি। শুক্রবার সন্ধ্যায় খাওয়া শেষ হয়।"

[নিবেদিতা মহা ভাগ্যবতী। স্বামীজীর পাঠানো বস্তু তাঁর কাছে মহাপ্রসাদ—যার শেষ অংশ তিনি ঠিক সেইসময়ে গ্রহণ করেছেন যখন স্বামীজী এই পৃথিবীতে শেষ ধ্যানে উপবিষ্ট। হিন্দুমতে কথাটা "মহাপ্রসাদ।" নিবেদিতা অবশ্যই তাঁর খ্রীস্টীয় সংস্কারে ও-বস্তুকে খ্রীস্টের "রুটিপ্রসাদ" দানের সমতুল বলে মনে করেছিলেন—আর স্বামীজী তো আক্ষরিকভাবে "রুটি-প্রসাদই" পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতা যে, পরে সত্যই ওকথা ভেবেছিলেন তার প্রমাণ—"আচার্যদেব" গ্রন্থে খ্রীস্টের পুনরুত্থানের অনুরূপ স্বামীজীর পুনরুত্থান-ইঙ্গিতের কথা বলার সময়ে লিখেছিলেন : "আমরাও কি [যীশুর] অনুরূপ পুনরাগমনের চকিত ঝলক [স্বামীজীর ক্ষেত্রে] পাইনি—যাকে 'পুনরুত্থান'-কাহিনীর পাশেই স্থাপন করা যায়? স্বয়ং আচার্যদেব সচেতন স্পষ্টভাষায় যে-কথা বলেছেন, তা কি আমাদের সহসা মনে পড়েনি, এবং তার তাৎপর্য উপলব্ধ হয়নি? [আচার্যদেব বলেছেন :] 'আমি অনেকবার লোকান্তরিত আত্মাদের এ-জগতে ফিরে আসতে দেখেছি; একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরের সপ্তাহে দেখেছি সেই জ্যোতির্ময় মূর্তিকে।' আমরা এইসব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। [আমরা অনুভব করলাম :] অদৃশ্য প্রভুকে পুনর্দর্শনের জন্য শিষ্যরাই শুধু ব্যাকুল হন না, তার থেকে অধিক গভীর আকূতি স্বয়ং অবতার বোধ করেন—তাঁর ছেড়ে-আসা শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়ে সান্ত্বনা ও আশীর্বাদ জানাতে। **'পথিপার্শ্বে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, তখন কি আমাদের হৃদয় শিখাময় হয় নাই**?'—এমনই উদ্দীপ্ত ক্ষণ কি আমরা বহুবার পাইনি, জানিনি? আচার্যদেবের মহাসমাধির পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে আমরা বিশ্বাসই করেছিলাম—তিনি সত্যসত্যই আমাদের মধ্যে বর্তমান আছেন। **'রুটিপ্রসাদ ভাগ করিয়া লইবার সময় তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল**।' এও ঠিক।"]

৪ জুলাই, শুক্রবার : মহামুক্তির দিন।

[এই দিনটির উদ্দেশ্যেই স্বামীজী লিখেছিলেন—"হে সূর্য! ছড়াইছ মুক্তি দিকে-দিকে।" বলা চলে, স্বয়ং 'পুরুষ'—তাঁর 'পুরুষ-সূক্ত' রচনা করেছিলেন—'৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি' কবিতায়]।

শেষ দিনের ঘটনা বলে, ৪ জুলাইয়ের অনেকগুলি বিবরণ মেলে, যাদের মধ্যে তথ্যগত অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে, যদিও সেগুলি গুরুতর কিছু নয়।

সকল বিবরণেই পাই, সকালে চা খাবার সময়ে তিনি গুরুভাইদের সঙ্গে অতীত দিনের আলোচনা ও গল্প করেছিলেন। হাসিঠাট্টাও বাদ যায়নি। প্রেমানন্দের বিবরণে আছে : "ঐদিন প্রাতঃকালে উঠে যেমন স্ফূর্তি কচ্চেন সেইরূপ স্ফূর্তি হাসি বিদ্রূপ আমার সঙ্গে কত হল। যেমন গরম দুধ ও ফলাদি খান, সেইরূপ খেলেন, ও আমায় খাওয়াইবার জন্য কত আগ্রহ করলেন।" [নিত্যানন্দ লিখেছেন : "প্রাতে চা, কাফি, ফল ও দুগ্ধ যেরূপ খাইয়া থাকেন, সেইরূপই খাইয়াছিলেন।]

একদিকে স্বামীজী সকালে অতীতচারণা করেছেন, যেন পিছনের ইতিহাসকে সস্নেহে বিদায়ী স্পর্শ দিয়েছেন, অন্যদিকে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। পরদিন ছিল শনিবার

ও অমাবস্যা—তাই তাঁর ইচ্ছা হল, ঐদিন কালীপূজা করা হোক। "কিঞ্চিৎ পরেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা, 'কালীমাতার পরম ভক্ত ও সাধকাগ্রণী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় স্বামীজী সানন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এই যে, ভট্টাচার্য মহাশয়ও এসেছেন।' তৎক্ষণাৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বোধানন্দকে পূজার সমস্ত আয়োজন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তাঁহারাও ঐ কার্যে ব্রতী হইলেন।"

সকালে মঠের জন্য ইলিশ মাছ কেনা হয়। এই ঘটনা ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যের আগমনের পূর্বে না পরে জানি না। সম্ভবতঃ পূর্বেই, কারণ স্বামী প্রেমানন্দ সকালের জলযোগের কথা বলার পরেই সেকথা বলেছেন। "তারপর গঙ্গার একটা ইলিশ মাছ এঁ বৎসর এই প্রথম কেনা হল; তার দাম নিয়ে আমার [প্রেমানন্দের] সঙ্গে কত রহস্য হতে লাগল। একজন বাঙাল ছেলে ছিল, তাকে বল্লেন, 'তোরা নূতন ইলিশ পেলে নাকি পূজা করিস? কি দিয়ে পূজা কত্তে হয় কর্।'"

[অধিকাংশ বিবরণেই পাওয়া যায়—স্বামীজী, প্রেমানন্দের সঙ্গে মঠে বেদবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তা কখন করেন? প্রেমানন্দের বিবরণ থেকে মনে হয়—সকালেই ঐ আলোচনা তিনি করেন। কিন্তু বেশির ভাগ বিবরণে সেটি বৈকাল-ভ্রমণের সময়ে করা হয়। সুতরাং ঐ জায়গাতেই তার উল্লেখ করব।]

এর পরে স্বামীজী "বেড়াতে বেড়াতে" প্রেমানন্দকে বলেন : "আমায় কেন নকল করবি? ঠাকুর নকল কত্তে বারণ কত্তেন। আমার মতো উড়ন-চড়ে হবি নে।"

এরপর ঠাকুরঘরে গিয়ে স্বামীজীর সুদীর্ঘকাল ধ্যানের কথা সকল বিবরণেই আছে। জীবনীতে বলা হয়েছে, বহুদিন তিনি একটানা এতক্ষণ ধ্যান করেননি। সময় কতক্ষণ? এবং কখন ধ্যান করতে যান? সারদানন্দ, নিবেদিতা, উদ্বোধনের মহাসমাধি-বিবরণ, প্রমথ বসুর জীবনী, ও ইংরাজি জীবনীতে তিনঘণ্টা ধ্যানের কথা আছে। কিন্তু প্রেমানন্দ-বিবরণে তা আড়াই ঘণ্টার মতো, কারণ অন্য বিবরণে স্বামীজী যেখানে আটটার সময়ে ঠাকুরঘরে গেছেন, সেখানে প্রেমানন্দ বলেছেন, উনি গিয়েছিলেন, আন্দাজ সাড়ে আটটার সময়ে। [নিত্যানন্দ বিবরণে আছে, স্বামীজী সাতটায় স্নান করে ঠাকুরঘরে যান। সাতটায় ঠাকুরঘরে যাওয়ার কথা কেউ বলেন নি, এবং হিসেবমতো তা হয়ও না, সুতরাং তা গ্রাহ্য নয়।]

ধ্যান আক্ষরিকভাবে একটানা হয়নি। কারণ প্রেমানন্দ যখন প্রায় সাড়ে নটার সময়ে (অর্থাৎ স্বামীজীর ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা-দেড়েক ধ্যানের পরে) ঠাকুরঘরে ওঠেন তখন সেই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছিল—যা প্রেমানন্দের বর্ণনায় এই :

"আমায় দেখে কহিলেন—'আমার আসন ঠাকুরের শয়নঘরে ক'রে চারিদিকের দরজা বন্ধ ক'রে দে।' অন্যদিন আমি পূজা করিলেও, ঐ পূজাঘরের এককোণে স্বামীজী বসিয়া ধ্যান করিতেন। আজ অন্য মত করিলেন।"

স্বামীজী ঐ অবস্থায় ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়েছিলেন।

[ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কোন্ বিনিময় হয়েছিল—তা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ কারো হয়নি। পূর্বে অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে স্বামীজী যা বলতেন—"ও রহস্য আমার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে"—এখনও প্রশ্ন করলে কি তাই বলতেন? আমরা সপ্তর্ষিমণ্ডলগত দুজ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশের অর্বাচীনতা এখানে দেখাতে চাই না।]

এগারোটার সময়ে যখন ঠাকুরঘরে শোনা গিয়েছিল স্বামীজীর সুমধুর সঙ্গীত—তখনই সকলে বুঝেছিল, স্বামীজীর ধ্যানভঙ্গ হয়েছে।—"ধ্যানান্তে একটি সুন্দর শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতে লাগিলেন। অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গানটি এই—'মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী, হৃদিপদ্ম করে আলো।'" প্রমথনাথ বসুর বইয়ে আছে, স্বামীজী "ধ্যানের পর 'কে বলে তারিণী তোমায় তিমিরবরণী?'—এই গানটি গাহিতে-

গাহিতে ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।" এই দ্বিতীয় গানটি যদি প্রেমানন্দ-বিবরণের 'মা কি আমার কালো' গানের বদলে না বসে থাকে [দুটি গানেরই প্রথম ছত্র একই ভাবদ্যোতক] তাহলে বলতে হবে, স্বামীজী নামবার সময়ে ভিন্নতর গান গেয়েছিলেন।

সারদানন্দের বিবরণে আছে, স্বামীজী ধ্যানান্তে "স্বহস্তে ঠাকুরের বিছানা ঝাড়িয়া দিলেন।"

এরপরে স্বামীজী প্রাঙ্গণে পায়চারি করতে-করতে নিজের মনে অস্ফুটে যেকথা বলতে থাকেন, প্রেমানন্দ ঘটনাচক্রে তা শুনতে পান। অবিস্মরণীয় সে উক্তি।

স্বামীজী বলেছিলেন : "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত—বিবেকানন্দ কি করে গেল! কালে কিন্তু এমন কত-শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।"

[নিঃসন্দেহে অসাধারণ উক্তি। এর প্রথমাংশে মনে হয়, স্বামীজীর আত্মাভিমান প্রকাশ পেয়েছে, কিংবা সার্থক আত্মদর্শন। দ্বিতীয়াংশে কি দারুণ আত্মশাসন' বিবেকানন্দই কোনো শেষ প্রকাশ নয়। কালপ্রয়োজনে অনুরূপ আবির্ভাব যুগে-যুগে হবে। এই ঐশ্বরিক আত্মশাসনের ক্ষেত্রে অবশ্য বিবেকানন্দ মোটেই মৌলিক নন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'সম্ভবামি যুগে-যুগে' বলে পথ দেখিয়ে গেছেন।]।

এর ঠিক পরে স্বামীজী কী করেছিলেন, সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হতে পারছি না। স্বামীজী, শুক্ল যজুর্বেদের একটি শ্লোকের ভাষ্যকারগণকৃত ব্যাখ্যা অস্বীকার ক'রে, নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন—একথা প্রায় সকল বিবরণেই আছে। কিন্তু কোন্ সময় সেটি দেন? প্রেমানন্দ-বিবরণ থেকে মনে হয়, সকালে প্রাতরাশের পরে তিনি ঐ আলোচনা করেন। উদ্বোধনের মহাসমাধি-সংবাদেও একই কথা। স্বামী নিত্যানন্দও তাই লিখেছেন। সারদানন্দ কিন্তু আমেরিকাস্থ অভেদানন্দ এবং ডাঃ লোগান—উভয়ত্র লিখে পাঠান, স্বামীজী ঐ ব্যাখ্যা করেন—মধ্যাহ্নভোজনের বিশ্রামের পরে শাস্ত্র পড়াবার সময়ে। আর ইংরাজি জীবনী, প্রমথ বসুর জীবনী ও গম্ভীরানন্দের জীবনী—তিন স্থানেই বলা হয়েছে—স্বামীজী ঐ ব্যাখ্যা করেছিলেন ধ্যানের পরে এবং মধ্যাহ্নভোজনের পূর্বে যে আধ ঘণ্টার মতো সময় থাকে—সেই সময়ে। স্বামীজী এগারোটা নাগাদ নীচে নামেন, এবং সময়ের হিসেব করে মনে হয়েছে—সাড়ে এগারোটার সময়ে খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। আমি ঐ শ্লোকব্যাখ্যাকে এখানে স্থাপন করলেও, অন্য দুটি সময়-সম্ভাবনাকে স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করতে সমর্থ নই। এমনও হতে পারে—স্বামীজী দুবার পূর্বোক্ত প্রসঙ্গ তোলেন। যাইহোক, ইংরাজী জীবনী অনুযায়ী প্রমথনাথ বসুর বিবরণ এই :

"তাহার পর [ধ্যানান্তে মঠ-প্রাঙ্গণে পায়চারির পর] স্বামীজীর আদেশে শুদ্ধানন্দ-স্বামী মঠের লাইব্রেরি হইতে শুক্লযজুর্বেদ গ্রন্থ আনিয়া ভাষ্যসমেত ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন :

'সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মিশ্চন্দ্রমাগন্ধর্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম।

স ন ইদং ব্রহ্মক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা ॥'

(শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত বাজসনেয় সংহিতার মাধ্যন্দিনী শাখার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪০শ শ্লোক)।

"কিন্তু মহীধরকৃত ভাষ্য স্বামীজীর মনোমত হইল না। তিনি বলিলেন, 'এ ব্যাখ্যা আমার মনে লাগছে না। ভাষ্যকার 'সুষুম্না' পদের যে-ব্যাখ্যাই করুন, পরবর্তীকালে তন্ত্রাদিতে দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্না নাড়ী বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারই বীজ এই বৈদিক মন্ত্রে নিহিত রহিয়াছে। তোরা এইসব শ্লোকের প্রকৃত মর্ম প্রণিধান করবার চেষ্টা করবি। শাস্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে নিজে-নিজে চিন্তা করবি, তা হলেই মৌলিক ব্যাখ্যা বার করতে পারবি।"

এই প্রসঙ্গে স্বামী নিত্যানন্দ লিখেছেন : "তিনি ঐ দিবস প্রাতে সুষুম্না নাড়িতে মন

উঠাইয়া লওয়া যায় এবং ঐ মন আর ফিরিয়া আসে না, এরূপ বলিয়াছিলেন এবং বেদান্ত হইতে উক্ত সুষুম্নার মন্ত্রটি ২/৩ বার পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মর্ম তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই।"

[ইংরাজি জীবনীতে, এই মন্ত্রব্যাখ্যা এবং পরদিন কালীপূজা সম্বন্ধে আগ্রহ—এই দুটি জিনিসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—এর দ্বারা বোঝা যায়, ষট্‌চক্রভেদ ও তৎসাধন-প্রক্রিয়ার চিন্তা স্বামীজীর মনে উঠেছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগ কিভাবে হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা বিশ্বাসীরা এখান থেকে সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন।]

মধ্যাহ্নভোজনের শুরু আনুমানিক সাড়ে এগারোটায়। অন্যান্য দিনের সঙ্গে এইদিনের পার্থক্য—স্বামীজী সাধারণভাবে নিজের ঘরেই ইদানীং খাচ্ছিলেন, কিন্তু এদিন সকলের সঙ্গে একত্রে ভোজন করেন। সারদানন্দ লিখেছেন : "বেশ ক্ষুধার সহিত ইলিশ মাছের ঝোল, ভাজা ইত্যাদি দিয়া ভাত খাইলেন।" প্রেমানন্দ সেই "অতি তৃপ্তির" ভোজনের কথা বলে, যোগ করেছেন : "[স্বামীজী] কহিলেন—একাদশী করে খিদেটা খুব বেড়েছে, ঘটিবাটি গুলো ছেড়েছি কষ্টে।"

আহারের পর "নানা কথা কয়ে স্বামীজী কিছু বিশ্রাম করলেন।" সারদানন্দ বলেছেন, স্বামীজী এক ঘণ্টা বিশ্রাম করেন। নিত্যানন্দ বলেছেন : "প্রসাদ খাইয়া ১৫/২০ মিনিট ঘুমাইলেন।" প্রেমানন্দ বলেছেন : "একটার পর আমায় তুলে দিয়ে বলিলেন—'চল পড়িগে। সন্ন্যাসী হয়ে দিবানিদ্রা খারাপ। আমার আজ ঘুম হল না। একটু ধ্যান করে মাথাটা কিছু ধরেছে, ব্রেন উইক হয়েছে, দেখছি।'"

অন্যান্য দিন অপেক্ষা এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা আগে স্বামীজী সাধু-ব্রহ্মচারীদের ক্লাস নেন। ক্লাস দুপুর একটা থেকে দেড়টার মধ্যে আরম্ভ হয়েছিল। তা চলে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। [সারদানন্দ, অভেদানন্দকে লেখা পত্রে বলেছেন, দু'ঘণ্টা; ডাঃ লোগানকে লেখা পত্রে বলেছেন, দু'ঘণ্টার বেশি। প্রেমানন্দের বিবরণে প্রায় তিন ঘণ্টা। উদ্বোধনের বিবরণে আড়াই ঘণ্টা; নিত্যানন্দের বিবরণে "প্রায় আড়াই ঘণ্টা"। প্রমথ বসুর জীবনীতে তিনঘণ্টা।] পাঠের বিষয়—সারদানন্দ বলেছেন, ব্যাকরণ ও যোগ। কিন্তু বাকি সকল বিবরণেই আছে ব্যাকরণ। সুতরাং ব্যাকরণই ধরে নেওয়া শ্রেয়ঃ। কিন্তু কোন্ ব্যাকরণ? প্রেমানন্দ বলেছেন পাণিনি। নিত্যানন্দও তাই। বাকি বিবরণগুলিতে আছে, স্বামীজী প্রধানতঃ বরদরাজের লঘুকৌমুদী পড়ান। আমরা এক্ষেত্রে লঘু কৌমুদীই ধরে নেব। তবে পাণিনি ব্যাকরণও কিছু পরিমাণে আলোচিত হতে পারে। ক্লাস হয়েছিল লাইব্রেরি-ঘরে।

ক্লাসে উপস্থিত একজনের স্মৃতিকথা ইংরাজি জীবনীতে উদ্ধৃত আছে :

"তিন ঘণ্টা পড়ানো চলে। কিন্তু এতটুকু একঘেয়ে বোধ হয়নি। কারণ স্বামীজী পড়ানোর ফাঁকে-ফাঁকে কখনো মজার গল্প, কখনো সরস মন্তব্য করছিলেন। এইভাবেই তিনি পড়াতেন। কোনো-কোনো সূত্রের শব্দ নিয়ে তামাশা করেছেন, মজাদার শব্দশ্লেষও করেছেন—যাতে ব্যাপারটি স্মরণে থাকে। এই বিশেষ দিনটিতে এমন করবার সময়ে তিনি বলেছিলেন—তাঁর কলেজ-বন্ধু দাশরথি সান্যালকে তিনি একই পদ্ধতি অনুসরণ করে এক রাত্রে ইংলণ্ডের ইতিহাস শিখিয়েছিলেন। ব্যাকরণ ক্লাসের পরে স্বামীজী অবশ্য একটু ক্লান্তি বোধ করেন।"

স্বামীজী বিকালের দিকে "এক কাপ গরম দুধ ও জলপান করে," চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে বেড়াতে বেরোন। সঙ্গী ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ। বেরুবার আগে প্রেমানন্দের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দেশ নিয়ে কিছু হাসিঠাট্টা করেছিলেন—একথা আছে ইংরাজি জীবনীতে সংকলিত একটি বিবরণে। স্বামীজী বেলুড় বাজার পর্যন্ত গিয়েছিলেন। যাতায়াত মিলিয়ে মাইল দুই ভ্রমণ। বেশ কিছুকাল তিনি একসঙ্গে এতখানি বেড়ান নি। মোটামুটি সাড়ে

পাঁচটা নাগাদ ফেরেন। [সারদানন্দ অবশ্য বলেছেন—৪-৫টা পর্যন্ত ভ্রমণ]।

ভ্রমণকালে স্বামীজী কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তার মধ্যে প্রধান হল—মঠে বেদবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব। প্রেমানন্দ প্রশ্ন করেন : "বেদ পড়ে কী হবে?" স্বামীজী বলেন : "আর কিছু না হোক, কুসংস্কারগুলো যাবে।"

প্রেমানন্দ আলোচ্য প্রসঙ্গে আরও বলেছেন : "মঠে একটি বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন—এ ইচ্ছা ক'দিন হতে খুব প্রবল হয়েছিল।. .[এইদিন] বেদসংক্রান্ত পুস্তক আনাইবার জন্য পুনা ও বোম্বাই নগরে তিনখানা চিঠি লেখা হয়।" চিঠিগুলি স্বামীজী কখন লেখান—সকালে না বিকালে--জানিনা।

ভ্রমণকালে, অথবা ভ্রমণশেষে মঠে ফিরে, স্বামীজী আর একটি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার বিষয় দেখিয়ে দেয়—পৃথিবীর ইতিহাস, ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি বিষয়ে, তিনি শেষ অবধি কতখানি সচেতন ছিলেন। বহির্গত পৃথিবীকে স্বামীজী যতই প্রত্যাখ্যান করবার চেষ্টা করুন, তাতে সম্পূর্ণ সফল হননি। এক্ষেত্রে খুবই দুঃখের বিষয়—আলোচনার উল্লেখমাত্র পেয়েছি—কিন্তু বক্তব্য পাইনি।

সারদানন্দ ঐ প্রসঙ্গে লিখেছেন : "[বিকালে] বেড়াইতে-বেড়াইতে পৃথিবীর সকল জাতির সভ্যতা কেমন করিয়া হইল, এ-সম্বন্ধে যত ইতিহাস গল্পচ্ছলে তাঁহাকে [প্রেমানন্দকে] বলেন।" প্রেমানন্দ কিন্তু বলেছেন—ঐ আলোচনা হয়েছিল মঠে ফেরার পরে। এখানে তাঁর কথাই আমরা মানতে বাধ্য। তিনি লিখেছেন : "সাড়ে পাঁচটার পর মঠে ফিরিয়া আমায় European civilization-এর হিস্টরি তন্ন-তন্ন করে বুঝাইলেন। তারপর History of Colonies-এর কথা বলিলেন।"

তার আগে, বেড়াবার সময়ে কিছু হালকা বিক্ষিপ্ত কথাও হয়। যেমন : "একটা বাগান দেখিয়া [প্রেমানন্দ, অভেদানন্দকে লিখেছেন] তোমাদের লেগেট সাহেবের বাগানের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সে দেশে অল্প লোকে মেশিনের সাহায্যে বড-বড় বাগান কেমন সাফাই রাখে।"

মঠে ফিরে স্বামীজী শৌচাদি করেন ও বলেন : "আজ শরীর যেমন সুস্থ, এমন অনেকদিন বোধ করি না।" [নিত্যানন্দ, শৌচাদির ব্যাপার আরও পরে, সান্ধ্য ধ্যানের ঠিক আগে, নির্ধারণ করেছেন : "শেষে তামাক খাইতে-খাইতে পায়খানা হইতে আসিয়া ব্রজেন্দ্রকে বলিলেন, 'আমার শরীর আজ খুব ভাল আছে।' "]। প্রেমানন্দ লিখেছেন : "কার্যগতিকে শরৎ [সারদানন্দ], রাখাল [ব্রহ্মানন্দ] দুচার দিন কলকাতায় ছিল।" স্বামীজী বিকালেই বাগবাজারে বামকান্ত বসু লেনে বলরাম ভবনে, যা তখন রামকৃষ্ণ মিশনের কলকাতা কেন্দ্র—খবর পাঠালেন, তিনি খুবই সুস্থ আছেন। সন্ধ্যার মুখে মঠে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গে আলাপ ও কুশল প্রশ্নাদি করেন। সকালে স্বামী প্রেমানন্দকে যা বলেছিলেন, এখন শিষ্যদেরও সেইকথা বলেন : "কেউ যদি কখনো আমাকে নকল করে—তাকে পদাঘাতে খেদিয়ে দেবে। আমাকে নকল করতে চেয়ো না।" [একথা অবশ্য বেড়াতে যাবার আগেও কথাপ্রসঙ্গে বলতে পারেন।]। স্বামী প্রেমানন্দ সন্ধ্যারতির জন্য ঠাকুরঘরে গেলেন—তারও পরে স্বামীজী খানিকক্ষণ পূর্বোক্ত পণ্ডিত ও সাধক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। স্বামী নিত্যানন্দ বলেছেন : "শশী মহারাজের পিতার সহিত পরদিন কালীপূজা করিবেন বলিয়া অনেক গল্প ও তন্ত্র-বিষয়ক আলোচনা করিলেন।" এঁর সঙ্গে পুরনো দিনের স্মৃতির পর্যালোচনা হয়েছিল, এবং আমরা ধরে নিতে পারি, কালীপূজা-সূত্রে সাধনপ্রসঙ্গও এসেছিল।

তারপর সন্ধ্যারতির ঘণ্টা যখন বাজল তখন স্বামীজী নিজের ঘরে গেলেন। স্বামীজীর কাছে সর্বদাই কেউ না কেউ যেন থাকে, এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন ডাঃ স্যাণ্ডার্স। সেদিন সেবক ছিলেন "ব্রজেন্দ্র বলে একটি বাঙাল ছেলে।"

স্বামীজী ব্রজেন্দ্রকে বলেন : "আমায় দুছড়া মালা দে। যা বাইরে গিয়ে জপধ্যান কর। না ডাকলে আসবি না।"

স্বামীজী যখন জপে বসেন তখন সন্ধ্যা সাতটা।

ধ্যানাসনে বসার ব্যাপারে আবার তিনি প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় করলেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে বসেছিলেন—অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরের দিকে।

[স্বামীজীর এই একান্ত ধ্যান-জপের সময়ে, আবার প্রশ্ন করি, কী বিনিময় হল? যখন আকাশে আকাশ মিশাইল, তখন কী ঘটে, তা কি আমরা জানি, না জানা সম্ভব?]

ঘণ্টাখানেক পরে [কেউ-কেউ বলেছেন পৌনে এক ঘণ্টা] স্বামীজী ব্রজেন্দ্রকে ডাকলেন। গরম বোধ হচ্ছিল বলে দরজা জানলা খুলে দিতে বললেন। মেঝেয় বিছানা পাতা ছিল, তার উপর শুলেন। হাতে জপমালা। ব্রজেন্দ্রকে মাথায় বাতাস করতে বললেন। ব্রজেন্দ্র ধীরে-ধীরে তা করতে লাগলেন। কিছু পরে স্বামীজী বললেন, "আর বাতাস করতে হবে না। একটু পা টিপে দে।" ব্রজেন্দ্র তাই করতে লাগলেন। স্বামীজীর নিদ্রাবেশ হল। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা-খানেক কাটল। এতক্ষণ চিত হয়ে শুয়েছিলেন [সারদানন্দ তাই বলেছেন]; এবার বাম পাশে ফিরলেন। ডান হাত ঈষৎ কাঁপল দু-চার সেকেণ্ডের জন্য। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিল। তারপর শিশুর কান্নার মতো শব্দ যেন। [শ্রীম লিখেছেন : "ছোট ছেলে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে যেরূপ দ্যায়লা করে ও হাসে কাঁদে, সেইরূপ একবার কাঁদিয়া উঠিলেন।" নিত্যানন্দ লিখেছেন : "এরূপ তাঁহার নিদ্রাবস্থায় মাঝে-মাঝে হইত বলিয়াই ব্রজেন্দ্র কিছু মনে করে নাই।"] মিনিট-দুই ঐভাবে থাকার পরে গভীর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মিনিট দুই স্থির। আবার এক গভীর দীর্ঘশ্বাস। "মাথাটি নড়িয়া উঠিল এবং চক্ষু ভ্রূমধ্যে স্থির হইয়া রহিল, আর মুখে অপূর্ব জ্যোতি ও হাসি দেখা গেল।"৮

সময়—৯টা বেজে কয়েক মিনিট সম্ভবতঃ দশ মিনিট।

["জীবনের সন্ধ্যাসঙ্গীত স্তব্ধ, পৃথিবী নীরব আর মুক্তির অরুণোদয়"—নিবেদিতা পত্রে লিখেছেন। 'আচার্যদেব গ্রন্থের অমর বাক্যগুলি এই : "ধ্যানের পক্ষে ভর করে তাঁর আত্মা পাখা মেলে চলে সেখানে যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন নেই দেহখানি পড়ে রইল পৃথিবীতে, ভাজ-করা পোশাকের মতোই।"]

ব্রজেন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। সমাধি, কিন্তু যেন অপরিচিত রূপ। ছুটলেন অন্যান্যদের ডেকে আনতে। তখন সবে খাওয়ার ঘণ্টা পড়েছে। স্বামী অদ্বৈতানন্দকে সামনে পেয়ে ব্রজেন্দ্র আর্ত হয়ে ডেকে বললেন, "কি হয়েছে দেখুন!" দু'এক মিনিট পরেই স্বামী প্রেমানন্দ উপস্থিত হলেন—দেখলেন "মহাসমাধিস্থ।" সঙ্গে-সঙ্গে ডেকে পাঠালেন ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টা-চার্যকে। প্রেমানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দ সমাধি ভাঙাবার জন্য "রামকৃষ্ণ" নাম কানে শোনাতে লাগলেন। স্বামীজী শুয়ে আছেন চিত হয়ে, "কি সে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল! কি সে স্বর্গীয় তেজঃপূর্ণ বিস্ফারিত নেত্র! কেবল কৌপীন-পরিহিত সে সুন্দর শরীরে এক অপূর্ব কান্তি।" "দেখে মনেই হচ্ছিল না, তাঁর কোনো অসুখ ছিল বা তিনি এখন গত—এত সতেজ, সজীব, স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের মতো রূপময়, বিশাল পদ্মআঁখির তারকা দুটি ঊর্ধ্ব-গত কিন্তু উন্মুক্ত শ্বেতাংশে জ্যোতিচ্ছুরণ।" এ দৃশ্য কেবল প্রেমানন্দই দেখেন নি অন্য সকলেই দেখেছিলেন। সুতরাং ব্যাকুল আশায় রামকৃষ্ণ নামোচ্চারণ করছিলেন তাঁরা। ফল

৮ শ্রীম'র বিবরণ ঈষৎ পৃথক। সেখানে আছে কান্নার মতো শব্দের পরে প্রথম দীর্ঘশ্বাস, তারপরে মাথা বালিশ থেকে পড়ে গেল, তারপর আর একটি দীর্ঘশ্বাস, এবং মনে হল "সমাধিস্থ।"

হল না। অদ্বৈতানন্দ বোধানন্দকে বললেন, নাড়ি দেখো। বোধানন্দ নাড়ি ধরে, কিছুক্ষণ দেখে, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। অদ্বৈতানন্দ নির্ভয়ানন্দকে বললেন, "হায়, হায়! কি দেখছ? যাও, ছুটে যাও, মহেন্দ্র ডাক্তারকে ডেকে আনো।" বরাহ-নগরে থাকেন ডাঃ মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, তাঁকে আনতে লোক ছুটল। অন্য একজন ছুটলেন কলকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দকে খবর দিতে।

ডাক্তার এলেন। সাড়ে দশটা নাগাদ ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ এসে গেলেন। স্বামীজীর বুকে আছড়ে পড়লেন ব্রহ্মানন্দ—নেতা—জ্যেষ্ঠভ্রাতা—সখা—আমার নরেন—। সারদানন্দ যখন কষ্টে তাঁকে তুলে আনলেন, তখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ব্রহ্মানন্দ বলছেন : "হিমালয় সরে গেল সামনে থেকে।"

স্বামীজীর দেহের বাহ্য আকার তখন এমন যে তাঁকে গতপ্রাণ বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। যোগীর শরীর, সমাধিতে এমন নিশ্চল হতেই পারে। ডাক্তার মজুমদার তাঁকে ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন—দেখলেন, হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ। যদি কৃত্রিম উপায়ে তাকে আবার সচল করা যায়, সেজন্য স্বামীজীর দুহাত অর্ধচন্দ্রাকারে সামনে-পিছনে ঘোরাতে বললেন। সে চেষ্টা হল। রাত্রি বারটা নাগাদ ডাক্তার সিদ্ধান্ত করলেন—না, উনি আর জীবিত নেই। [অর্থাৎ দেহত্যাগের তিন ঘণ্টা পরেও বাহ্যতঃ শরীরের এমন আকার যে, ডাক্তার পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন আশা করতে পেরেছিলেন!!]। দেহত্যাগের ঠিক কারণ নির্ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে ডাক্তার বললেন—হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দেহান্ত হয়েছে।

লোকান্তরকালে স্বামীজীর বয়স—উনচল্লিশ বৎসর, পাঁচ মাস, চব্বিশ দিন।

৫ জুলাই : পরিশিষ্ট হিসাবে দেহান্তের পরদিনের ঘটনার সংবাদ দিচ্ছি।

মহাশোকের পরদিন সকালে যাঁরা হাজির হলেন, তাঁরাও দেখেন, "ঠিক যেন শিব শুয়ে আছেন! কোনো অঙ্গের কোনোরূপ বিকৃতি হয় নাই। ইচ্ছা করে যেন শরীর ত্যাগ।" "সে মুখমণ্ডল দর্শন করে অনেকের দুঃখশোক দূর হয়েছিল।"

"নিবেদিতা প্রভাতে এসেছিলেন। দুপুর দুটোর সময় শরীর নীচে আনা হয়, তার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দেহের পাশে স্থির হয়ে বসে বাতাস করছিলেন।"

"পরদিন সকালে দেখা গেল, চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ এবং নাসিকা ও মুখ দিয়া অল্প রক্ত পড়িয়াছে।" ডাক্তার বিপিনচন্দ্র ঘোষ বললেন, সন্ন্যাসরোগে দেহান্ত হয়েছে। অন্য ডাক্তাররাও ছিলেন, তাঁরা ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। "অপরাপর ডাক্তারগণ বলিলেন, মস্তিষ্কের ভিতর কোনো স্থান ফাটিয়া গিয়াছে।" আর সন্ন্যাসীগণ গতদিনের সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে স্থির করেছিলেন : "জপ ও ধ্যান করিতে-করিতে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া দেহাবসান হইয়াছে।"

"দুটোর সময় নীচের দালানে দেহ নামাইয়া আনা হইল। তারপর উহা গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া, অলক্তক-রঞ্জিত চরণদ্বয়ের চিহ্ন গ্রহণ করা হইল। তদনন্তর ঐ পুণ্যদেহ প্রদক্ষিণ করিয়া ধূপ-ধুনা প্রজ্জ্বলন ও শঙ্খ-ঘণ্টা নিনাদ সহকারে দীপারতি সম্পাদিত হইল। তারপর সকলে একে-একে স্বামীজীর শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শ করিতে লাগিলেন, কেহ-বা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণরেণু গ্রহণ করিতে লাগিলেন।... অনন্তর সকলে 'জয় গুরুমহারাজজীকি জয়!' 'জয় স্বামীজী মহারাজজীকি জয়!' ধ্বনিতে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া, স্বামীজীর নির্দেশমতো পূর্বকথিত বিল্ববৃক্ষের সমীপস্থ গঙ্গাতীরে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন।"

পরিশিষ্টেরও পরিশিষ্ট আছে। দুটি কাহিনী, অলৌকিক অথবা আধ্যাত্মিক, আমি উপস্থিত করছি। প্রথমটি—স্বামীজীর শিষ্যতুল্য গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দের [অন্নদানন্দ-প্রণীত] জীবনী থেকে। স্বামীজীর দেহান্তকালে অখণ্ডানন্দ মঠে ছিলেন না।

"শূন্যদৃষ্টি, শূন্যহস্ত স্বামী অখণ্ডানন্দ অতি উদাসীনভাবে নগ্নপদে মঠে পৌঁছিলেন। কাহারও সহিত দেখা করা নাই, কথাবার্তা নাই—সোজা স্বামীজীর ঘরের দিকে চলিলেন। তাঁহার এই উন্মনা ভাব, মলিন বেশ, দেখিয়া গুরুভ্রাতাদের মনে ভয় হইল—কি জানি কি করিয়া বসে!

"স্বামীজীর ঘরে ঢুকিয়া অখণ্ডানন্দ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। [গুরুভ্রাতাদের] ভয়—ভাবনায় পরিণত হইল। এমন সময় স্বামী প্রেমানন্দ ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রিয় ভ্রাতাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখন উভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। সে কান্না ভাবঘন, তাহার কোনো ভাষা নাই।

"অখণ্ডানন্দের স্বাভাবিক অবস্থা তবু ফিরিল না; কোনো কিছুতে মন নাই; সর্বদা আনমনা—কখনো গঙ্গাতীরে, কখনো-বা স্বামীজীর ঘরে।...ভাবিতে লাগিলেন, 'সত্যি কি স্বামীজী নেই! ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে মনে হয়েছিল, জীবনের সব শেষ হয়েছে, হিমালয়ে যাই। স্বামীজীর আহ্বানেই হিমালয় ছেড়ে আসি। সেই স্বামীজীই যখন ছেড়ে গেলেন, তখন আর কেন? এ জীবনের সব প্রয়োজন শেষ হয়েছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে অখণ্ডানন্দ একদিন সকালে কালীঘাটে স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। উদ্দেশ্য—তাঁহার নিকট স্বামীজীর শেষ দিনকার প্রসঙ্গ শুনিয়া হৃদয়ের বেদনা লাঘব করিবেন। ফিরিবার পথে ট্রাম লাইনের উপর ভাবিতেছেন—'আর কেন, এখানেই জীবনের শেষ করে দিই।' ট্রাম তখনও কিছু দূরে। এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে দণ্ডায়মান গৈরিক আলখাল্লা-পরিহিত সহাস্যবদন জ্যোতির্ময় মূর্তি! শুনিলেন, স্বামীজী বলিতেছেন—'আমি কি মরে গেছি?' স্বামীজীর অদর্শনের ঠিক সাতদিন পরে সহসা এই দর্শন ও শ্রবণ অপার আনন্দে অখণ্ডানন্দের মনপ্রাণ ভরিয়া তুলিল। এদিকে ট্রামের ঘন-ঘন ঘণ্টাধ্বনিতেও তাঁহার চমক ভাঙে নাই। কণ্ডাকটার নামিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল—'ক্যা বাউরা হো গয়া?' এতক্ষণে চমক ভাঙিল।"

একই স্থানে অতঃপর লেখা আছে—"মঠে ফিরিবার পথে চৌরঙ্গীতে ভগিনী নিবেদিতার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে এই দর্শনের সংবাদ দিলে, নিবেদিতা জানাইলেন—ইতিপূর্বে তিনিও স্বামীজীর দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছেন।"

নিবেদিতা ঠিক স্বামীজীর "দর্শনলাভ" করেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু চিতাশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট থেকে তিনি স্বামীজীর নিশ্চিত উপস্থিতির প্রত্যয়লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় কাহিনীটি আমরা মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০২, পত্র থেকে উপস্থিত করছি :

"তোমার জন্য আসল বার্তা কিন্তু এসেছিল চিতাগ্নি থেকেই। দুটোর সময়ে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে আছি—বিছানার উপর পাতা একটি বস্ত্রখণ্ডের দিকে তাকিয়ে আমি সারদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ওটাও কি পোড়ানো হবে? ওটাই যে শেষবার আচার্যদেবকে আমি পরতে দেখেছি।' সারদানন্দ সেই কাপড়টি আমাকে দিতে চাইলেন। আমি নিতে পারলাম না; শুধু বললাম, 'যদি য়ুমের [মিস ম্যাকলাউডের] জন্য পাড়ের কাছে কোণের একটুকু কেটে নিতে পারি—।' কিন্তু ছুরি বা কাঁচি কিছুই ছিল না আমার কাছে। তাছাড়া কাজটা দেখতেও ভালো হত কিনা সন্দেহ। সুতরাং কিছু করলাম না। ছটার সময়ে—পাঁচটার সময়ে কি?—আমার প্রথম চিঠিতে সময়টি ঠিক লেখা আছে, মনে হয় ছটাই হবে—হঠাৎ কে যেন আমার জামার হাতায় টান দিল। চোখ নামিয়ে দেখি—অগ্নি ও অঙ্গার থেকে অনেক দূরে আমার

পায়ের কাছে উড়ে এসেছে ঠিক সেই দুই-তিন ইঞ্চি বস্ত্রখণ্ড—আমার প্রার্থিত। সমাধির অপর পার থেকে সে যেন তাঁর পত্র, তোমার জন্য।...ব্যাপারটা গিরিশবাবুকে শোনালে তিনি শুধু শান্তভাবে বললেন—এ জিনিস অপরিচিত নয়।' তাঁর কাছে এ জিনিস খুবই স্বাভাবিক—কারণ স্বামীজী—আমাদের স্বামীজী—**মারা যাননি**—দেখতে পাচ্ছ না—**তিনি এখন স্বয়ং তিনি**—মৃত নন—জীবিত জীবিত চিরজীবিত।" ['নিবেদিতা লোকমাতা', ১ম, ১০৬]।

"কী অসাধারণ মহান হয়েছিল শেষ দৃশ্য, তা কি জানো? [নিবেদিতা লিখেছেন].. সান্ধ্য ধ্যানের অন্তে নিঃশব্দ দেহত্যাগ। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের মতো।—'আমার মরণ হবে মহা-মরণ! হর! হর! হর!—বলতে-বলতে চলে যাবো'—বহুদিন আগে তিনি একদা বলেছিলেন। সেকথা সত্য হল! মালা এখনো শুকোয়নি, বর্ম অটুট, সবই ঠিক আছে—তিনি চলে গেলেন।" "পৃথিবীর কাছে 'বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত মানুষটির দৈহিক অস্তিত্ব এখন এক মুষ্টি ভস্মমাত্র! পাঁচ বৎসর ধরে আমাদের নদীতীরে নিঃসঙ্গে জ্বলেছে যে-আলোক—তা এখন নির্বাপিত। দেশে-দেশে প্রতিধ্বনিত সুমহান স্বরধ্বনি—মৃত্যুতে নীরব। এই বিশাল আত্মার কাছে জীবন এনেছে ঝঞ্ঝা, হেনেছে আঘাত—সমাপন কিন্তু শান্তি! শান্তি! সান্ধ্য আরাত্রিকের শেষ শব্দ যখন মিলিয়ে গেল—ঘনিয়ে এল মহাকালীর মহারাত্রি—তখনই এল মৃত্যুর আশীর্বাদ, নিঃশব্দে। আহত ক্লান্ত দেহ শায়িত রইল—বিজয়ী আত্মা ফিরে গেল 'নিজ নিকেতনে'—চির সমাধিতে।"

॥ ৭ ॥

তারপর?

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জার্মান-আমেরিকান মিস এ ক্রিশ্চিনা অ্যালবার্স, যিনি স্বামীজীর তিরোধানে একটি বেদনাগভীর কবিতা লিখেছিলেন১—বিবেকানন্দ-বিরহিত বেলুড়-মঠ দেখে এলেন একদিন। সেখানে ঘনীভূত তপস্যার নিঃশব্দ আয়োজনকেও অনুভব করলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০২, ইণ্ডিয়ান মিরারে লিখলেন :

"নীরবতা: আমার মন-নয়নে ভেসে উঠছে এক পরমা শান্তির দৃশ্যপট।..সেই দিনটির অভিজ্ঞতা এখনো আমার মনকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে, যেমনভাবে সুন্দর পুষ্পবাগিচার সৌরভ অনুসরণ করে আমাদের, উদ্যানদ্বার পিছনে বন্ধ হয়ে গেলেও। পবিত্র দৃশ্যটি স্বপ্নের মতো জড়িয়ে আছে আমাকে। সেই পবিত্র গঙ্গা, শান্ত মহিমায় প্রবাহিত; ..ইতস্ততঃ নৌকাগুলি যার উপরে ছন্দোময় ভঙ্গিতে সঞ্চালিত হচ্ছে মাঝিদের কৃষ্ণ শরীর; ..ঘন বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন দুই তট।..রামকৃষ্ণ মিশনের বারান্দা থেকে দৃশ্যটি দেখছিলাম। এই মঠের শান্ত পবিত্র ভাবাবহই পরিবেশের সর্বোত্তম গৌরব। এখানে কুড়ি জনের বেশি সাধু প্রতিদিন তাঁদের পবিত্র চিন্তার ঘনীভূত শক্তিকে বিকীর্ণ করেন, বাতাস ভাবগর্ভ হয়ে ওঠে তার দ্বারা, তা বয়ে নিয়ে যায় কল্যাণ ও প্রেমের বার্তা সর্বদিকে। [এখানে] পবিত্র মন্দিরে, যা দীর্ঘদিন

১ ইণ্ডিয়ান মিরার (১০ জুলাই, ১৯০২) এবং ব্রহ্মবাদিনে (জুলাই, ১৯০২) প্রকাশিত ক্রিশ্চিনা অ্যালবার্সের কবিতার কয়েক লাইন :

"Weep India of thy noblest son bereft !
Ahy genius claimed him as her very own.
Upon his brow her glorious mark she left,
His soul was kindred to the gods alone...
He tread the path that patriots have trod,
And loved his country as he loved his God."

মহান আচার্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভস্মকে ধারণ ক'রে আছে—সেখানেই একটি কলসে স্থাপিত হয়েছে তাঁর শিষ্যের দেহাবশেষে। উভয়ের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সাধুরা পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন কারণ ওঁরা জীবনে ছিলেন এঁদের প্রিয়—স্মরণে এখন চিরপবিত্র।"

ক্রিশ্চিনা অ্যালবার্স পবিত্র বেদনাকে অন্তরে নিয়ে যখন মঠ ত্যাগ ক'রে এসেছিলেন, তখন গঙ্গায় সন্ধ্যা নেমেছে, বিছিয়ে গেছে গোধূলির ছায়াবসন—তাঁর মনে হল, ভারতের আত্মা এখানে আছে—"সংঘাতের কোলাহলের মধ্য থেকে যেন শোনা যাচ্ছে হৃৎস্পন্দনের ধ্বনি; বিরাট জীবনের উৎসার এখানে বস্তুকে প্রাণদান করছে।" "এই শান্তির উপত্যকা যখন ত্যাগ করে এলাম, তখন দিবসের অভিজ্ঞতায় পরিশুদ্ধ আমি, অনুভব করলাম—এই দিনটি আমার আত্মায় চিরজাগ্রত থাকবে।"

ক্রিশ্চিনা অ্যালবার্স স্বামীজী-বিষয়ক কবিতার শেষে লিখেছিলেন :

"His monument, washed in nations tears,
Will be a holy shrine in future years."২০

স্বামীজীর দুই গুরুভাই, সারদানন্দ ও প্রেমানন্দ, অবশ্য কবিতায় নয়, গদ্যেই স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দকে—পূর্বে-উল্লিখিত পত্রগুলিতে। সারদানন্দ লেখেন : "তাঁহার সমাধিস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিবার কথা হইয়াছে। যদি তাঁহার বন্ধুরা এ-বিষয়ে কিছু সাহায্য করেন তো পাঠাইও।" প্রেমানন্দ লেখেন : "যে-স্থানে দাহ হয় সে-স্থানে একটি শিবমন্দির ও তাহার সম্মুখে নাটমন্দির স্থাপন করিবার ইচ্ছা। চেষ্টা কিছু-কিছু হইতেছে।"

আরও বাইশ বছর পরে সে চেষ্টা সফল হয়। সোমবার, ১৪ মাঘ, ১৩৩০, ইংরাজি ২৮ জানুয়ারি ১৯২৪—বেলুড়-মঠে স্বামীজীর জন্মোৎসব দিবসে "শ্রীবিবেকানন্দের ওঁকার মন্দিরের" প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়।

উক্ত বাইশ বছরে এই সম্পর্কে কী ঘটেছিল—কত তরঙ্গ সরিয়ে স্বামীজীর মন্দির শেষ-পর্যন্ত মাথা তুলেছিল—তার কাহিনী লিখেছি উদ্বোধনের আশ্বিন ১৩৮৫ সংখ্যায় "বিবেকানন্দ মন্দির" প্রবন্ধে। সেখান থেকে সংক্ষেপে কয়েকটি সংবাদ তুলে আনছি।

সমাধিমন্দিরের নির্মাণকার্য অবিলম্বে শুরু করা যায়নি—তা আরম্ভের মোটামুটি সময় ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাস। বিলম্বে আরম্ভের কারণ, এবং আরব্ধ কার্য শেষ হতে আরও ১৭ বৎসর লাগার কারণ—আর কিছু নয়—অর্থাভাব। মধ্যবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ "আধুনিক ভারতবর্ষের পিতা"-র স্মৃতিমন্দির নির্মাণের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন জানিয়ে, সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন, [যথা মরাঠা কাগজে ১৪ জানুয়ারি, ১৯১২ সংখ্যায়] "রামকৃষ্ণ মিশন চায়, স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে গঙ্গাতীরে একটি মন্দির নির্মাণ করতে, যার মধ্যে লোকান্তরিত আচার্যের চিতাভস্ম রক্ষিত হবে, সেইসঙ্গে থাকবে একটি বৈদিক বিদ্যালয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও দর্শনগ্রন্থের একটি গ্রন্থাগার, এবং ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্য সভাকক্ষ।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই মহান স্বপ্নে উদ্বোধিত ছিলেন : "আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস স্মৃতিমন্দিরের গম্বুজের শীর্ষ সাগরবাহিনী পবিত্র গঙ্গাতীরে ঊর্ধ্বাকাশে মাথা তুলে দাঁড়াবে—তা হবে ভারতের দেশপ্রেম ও ধর্মচেতনার প্রতীক।"

মন্দিরটি ক্রমে গড়ে উঠেছিল। তার স্থাপত্য-পরিকল্পনা, আমরা অনুমান করি—স্বামী বিজ্ঞানানন্দের—যিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম পর্বের গৃহ ও মন্দিরাদির স্থাপত্য-

পরিকল্পনা করতেন—এবং স্বামীজীর সঙ্গে বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ছক তৈরী করার অমর গৌরবের অধিকারী।১১

আমরা দেখি, ১৯০৮ সালে আরম্ভ হয়ে মন্দিরটি অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকে—১৯২০-২১ সালে তোড়জোড় করে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত করা হয়—বৃদ্ধ বিজ্ঞানানন্দেরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। কঠোর পরিশ্রম তিনি ঐ সময়ে করেছিলেন, যা যুবক সাধুদের পর্যন্ত নিজেদের অক্ষমতার "লজ্জায় অধোবদন" করে দিয়েছিল।

বিজ্ঞানানন্দ কিন্তু মন্দির নির্মাণকালে মাসের পর মাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে-কঠোর পরিশ্রম করছিলেন, তা বস্তুতঃ শারীরিক পরিশ্রম ছিল না—তা ছিল সুগভীর ধ্যান এবং ব্যুত্থিত কর্ম। এই ধ্যানের সূত্রপাত হয় এলাহাবাদ থেকেই। [এলাহাবাদে শ্রীরাম-কৃষ্ণ-মঠে বিজ্ঞানানন্দ থাকতেন, এবং সেখানে থেকে আসেন মন্দির নির্মাণ করতে।]। স্বামী সদাশিবানন্দের স্মৃতিকথায় পাই। ["প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ" গ্রন্থে সংকলিত] : "ইহার প্রায় বৎসরখানেক পরে [আন্দাজ ১৯২০] পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে বিজ্ঞানানন্দজী স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্মাণ উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য বেলুড় মঠে যাইয়া অবস্থান করেন। এলাহাবাদে থাকিতে আমরা দেখিয়াছি, সেইসময় পূজনীয় বিজ্ঞান-মহারাজ স্বামীজীর ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন থাকিতেন। তখন তিনি আমাদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা অপেক্ষা স্বামীজীর কথাই বেশি বলিতেন। প্রায় প্রত্যহ স্বামীজীর উপদেশ ও তাঁহার মহাজীবনের অপূর্ব ঘটনাবলী আলোচনা করিতেন। প্রায়ই তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে যাইয়া সপ্তর্ষির যে-মূর্তিটি আছে, তাহা তন্ময় হইয়া দর্শন করিতেন। আবার আমাদিগকে বলিতেন, কল্পে-কল্পে যে-সকল সপ্তর্ষিমণ্ডল হয়, তাঁহারাই বিশ্বমঙ্গলের একমাত্র নিয়ন্তা। এইসময়ে তিনি জয়পুরবাসী একজন প্রবীণ চিত্রশিল্পীর দ্বারা সপ্তর্ষিমণ্ডলের একখানি তৈলচিত্র অংকন করান, ও তাঁহার শয়নকক্ষে তাহা রাখেন। মহারাজজী বলিতেন, 'বিশ্বের সর্বত্র স্বামীজী আছেন; কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলেই তাঁর স্থান। তিনি সেখান থেকেই জগতের সর্বকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।'"

আধ্যাত্মিক দর্শনাদি সম্পর্কে বিশ্বাসের দায় আমি অবশ্যই পাঠকদেব উপরে চাপাচ্ছি না। আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংবাদ—স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের ভার নেবার পূর্ব থেকেই, নির্মাণকালেও অবশ্যই—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবে একে-বারে মগ্ন থাকতেন—যা দেখিয়ে দেয়, ঐ মন্দিরগঠনের পিছনে কোন্ ভাবশক্তি সক্রিয় ছিল।

স্বামীজীর মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে—মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত স্বামীজীর ধ্যানমগ্ন রিলিফ মূর্তি। এই মূর্তি পাকাপাকিভাবে মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ হয় সম্ভবতঃ ১৯১৬ সালের গোড়ায়, যদিও সেটি কয়েক বছর আগেই নির্মিত হয়ে মন্দিরমধ্যে রক্ষিত হয়েছিল। এই মূর্তি নির্মাণের ইতিহাসও চিত্তাকর্ষক।

১১ উদ্বোধন, মাঘ ১৩৫৬ সংখ্যায় স্বামী জগদীশ্বরানন্দের "স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহাবাজেব কথাসংগ্রহ" প্রবন্ধে আছে :

"ইউরোপেব প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক সি জে জুং কলিকাতায় আসিয়া বেলুড়-মঠে যান এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিঃ জুং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মন্দিরের পরিকল্পনা কি আপনাকে স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন?' তদুত্তরে বিজ্ঞান-মহারাজ বলেন : 'হাঁ তিনি আমাকে ideas দিয়েছিলেন, এবং নক্সা করতে বলেছিলেন। প্রথম নক্সাটি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী করে তাঁকে দেখাই। ঐটি তিনি পছন্দ করলেন না। এইরূপে দুই তিনবার নক্সা করে তাঁকে দেখানো হয়। শেষেরটি দেখে তিনি বলেন, অনেকটা হয়েছে। মূলতঃ তাঁর পরি-কল্পনা অনুসারে এই মন্দির নির্মিত।"

প্রথমেই জানিয়ে রাখি—মূর্তিটি নির্মিত হয়েছিল মিসেস লেগেটের অর্থে। তাঁর অর্থেই মন্দিরের পিছনের পোস্তাও নির্মিত হয়। মিস ম্যাকলাউডের অর্থে মন্দিরের সংকীর্ণ সিঁড়ি নূতনভাবে প্রস্তুত করা হয়। তিনি মন্দিরশীর্ষের ত্রিশূলের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যও অর্থব্যয় করেন।

স্বামীজীর মূর্তি নিবেদিতার ব্যবস্থাপনায় নির্মিত হয়েছিল।

নিবেদিতার জীবনের একেবারে শেষভাগের চিঠিপত্রে এই মূর্তিনির্মাণ প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে—১৯১১ সালের এপ্রিল মাস থেকে তার সূচনা। নিবেদিতা এইকালে অনুভব করেছেন, তাঁর প্রস্থানের দিন ঘনিয়েছে। অল্পদিন আগে তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ "দি মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম" প্রকাশ করতে পেরেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণকথা ধারাবাহিকভাবে বেরিয়ে গেছে ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায়—"নোটস্ অব সাম ওয়ান্ডারিংস্ উইথ দি স্বামী বিবেকানন্দ।" স্বামীজীর পত্রাবলীর সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন, এবং স্বামীজীর কয়েকটি গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন। এবার চাইলেন প্রণামের মন্দির ও মূর্তিকে—যেখানে যুগ-যুগ ধরে মানুষ নত হবে স্বয়ংজ্যোতি পুরুষের স্মরণে।

নিবেদিতা অনেকগুলি চিঠিতে মূর্তির মাপ, রূপ ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তখন ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন গতিশীল হলেও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিভার উদয় হয়নি, অথচ বিদেশ থেকে নয়, এদেশ থেকেই স্বামীজীর মূর্তি নির্মাণ করতে হবে।

জয়পুরের এক শিল্পী মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁকে নির্দেশাদি দিয়ে মূর্তিনির্মাণের তত্ত্বাবধানের জন্য গণেন্দ্রনাথ প্রেরিত হন জয়পুরে। এই মূর্তিনির্মাণের পিছনে যে-প্রবল ও পবিত্র ইচ্ছার বেগ গতিশীল ছিল, তা জয়পুরের উক্ত শিল্পীকে (হায়, তাঁর নাম আমরা জানি না!) প্রভাবিত করেছিল। নিবেদিতা ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১১ তারিখে (যার ঠিক এক মাস পরে পরে তাঁর দেহান্ত হয়) মিসেস লেগেটকে মূর্তির বিবরণ দিয়ে লেখেন :

"ভাস্কর তাঁর কার্যারম্ভ করেছিলেন প্রস্তরগত স্বামীজীর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যসহ পূজা-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে : 'হে স্বামীজী! আবির্ভূত হও আমার হস্তে!' সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত তিনি কাজ করেন, কাজের ফাঁকেই খেয়ে নেন। আমাকে তিনি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন—যদি শেষপর্যন্ত কাজটি সন্তোষজনক না হয়, তাহলে এক পাইপয়সাও নেবেন না, সব টাকা ফেরত দেবেন।

"ব্যাপারটি নিয়ে আমি অবশ্যই শিহরিত। ডাঃ [জগদীশচন্দ্র] বসু শুরুতেই আমাকে দিয়ে এই কথাটি লিখিয়ে নিয়েছেন : 'এই কাজ সমগ্র জাতীয় জীবনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।' কোনো সন্দেহ নেই তাতে—যদি যথাযোগ্যভাবে তা সম্পাদিত হয়।"

নিবেদিতা রিলিফ মূর্তি দেখে যেতে পারেন নি, কারণ ঐ চিঠি লেখার আটদিনের মধ্যে, ২২ সেপ্টেম্বর, তিনি দার্জিলিঙযাত্রা করেন এবং ১৩ অক্টোবর তাঁর দেহাবসান হয়। মূর্তি-সমাপ্তির সংবাদও তিনি পেয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না। নিবেদিতার বড় ইচ্ছা ছিল, ১৯১১ সালের শীতকালের মধ্যে স্বামীজীর মূর্তি যথাস্থানে স্থাপিত হবে। তা হয়নি। তার জন্য আরও ১২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই মধ্যবর্তীকালে বিবেকানন্দ-ভক্তির ক্ষেত্রে নিবেদিতা যাঁকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ তীর্থযাত্রীরূপে পেয়েছিলেন—সেই মিস ম্যাকলাউড একই স্বপ্নরেখা অনুসরণ করে গেছেন। আমরা তাই শিহরিত হয়ে ভাবি—স্বামীজীর মূর্তি ও মন্দিরের মূলে কতজনের কতদিনের স্বপ্ন ও কল্পনার সম্মিলন! এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল যতখানি না অর্থে, ততোধিক বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ও রক্তে। কী যন্ত্রণা স্বামী ব্রহ্মানন্দের —অসমাপ্ত মন্দিরের দিকে তাকিয়ে, তার সমাপনের জন্য! কী ব্যাকুল স্বপ্নময় আবেগ ভগিনী নিবেদিতার! কতখানি তপস্যাপূত দেহের শ্রম স্বামী বিজ্ঞানানন্দের! কি পরিমাণ

শ্রদ্ধার উৎসর্গ মিসেস লেগেট ও মিস ম্যাকলাউডের—রামকৃষ্ণ-সংঘের সাধু-সন্ন্যাসীদের—এবং জ্ঞাত অজ্ঞাত কত মানুষের!

নিবেদিতা একবার লিখেছিলেন—ত্রিশকোটি নরনারী-সমন্বিত সমগ্র জাতীয় জীবনই বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির। নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার ক্ষুদ্রায়তন প্রতিমাও প্রয়োজন। তা স্থাপিত হয়েছে বেলুড়-মঠে গঙ্গাতীরে, যেখানে স্বামীজীর নরদেহ ভস্মীভূত হয়েছিল।

বেলুড়-মঠের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে, একেবারে গঙ্গাতটে, বিবেকানন্দ-মন্দিরের সংকীর্ণ পথ দিয়ে প্রবেশ ক'রে, যখনই স্বামীজীর ধ্যানমূর্তির সামনে নত হয়েছি—তখনই ভিতর থেকে ভেসে-আসা সূক্ষ্ম সৌগন্ধ্যে, আর বিচিত্র অপূর্ব এক প্রভাবে, মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কি নিবিড়! কি গভীর!

যেন শুনেছি :

"পাদুকা উন্মোচন করো। যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো, সে অতি পবিত্র ভূমি।"

নির্ঘণ্ট

[এই নির্ঘণ্টে অবিরাম উল্লিখিত বেদ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, পুরাণ, বাইবেল, কোরান, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মহম্মদ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মঠ মিশন, রামকৃষ্ণ আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ অন্তর্ভুক্ত হয়নি।]